সূচীপত্র

ভূমিকা

প্রায় সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর পরে 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' প্রকাশিত হইল। ১৩৩০ সালে অধুনা-লুপ্ত 'নব্যভারত' মাসিক পত্রে ইহার প্রথম আরম্ভ হয়। প্রায় বৎসরাধিক কাল ধারাবাহিকভাবে উক্ত মাসিকপত্রে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়া উহার লোপের সঙ্গে লেখাও বন্ধ হইয়া যায়। তারপর ১৩৩৫ সালে 'বঙ্গবাণী' মাসিকপত্রে আবার পূর্ব সূত্র অনুসরণের চেষ্টা করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে 'বঙ্গবাণী'ও কিছুদিন পরে উঠিয়া যাওয়ায় লেখাতে দ্বিতীয়বার ব্যবচ্ছেদ-রেখা পড়ে। পুনরায় কিয়ৎকালব্যাপী বিরতির পর 'উদয়ন'-এ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের আলোচনা আরম্ভ করি—এবং এই তৃতীয় চেষ্টা এক বৎসর স্থায়ী হয়। 'উদয়ন'-এর অপ্রত্যাশিত অস্ত-গমনের পর আমারও উদ্যম শিথিল হইয়া পড়ে। প্রেসিডেন্সী কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক-পরম্পরার নির্বন্ধাতিশয্যে এই প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে। রাজসাহী কলেজে বদলি হইবার পরে রাজসাহী কলেজ ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠায় কয়েকটি অধ্যায় স্থানলাভ করে। ইতিমধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুগ্রহপূর্বক গ্রন্থটির প্রকাশভার লওয়াতে, ইহাকে কোনও প্রকারে শেষ করিবার একটা প্রেরণা লাভ করি এবং শেষ পর্যন্ত এই প্রেরণা হইতেই ইহার পরিসমাপ্তি সম্ভব হইয়াছে। রচনার এই ইতিহাস হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে, বাহিরের তাগিদ ভিতরের ক্ষীণ ইচ্ছাকে ঠেলা না দিলে কল্পনা কার্যে পরিণত হইত না।

এই গ্রন্থের পরিকল্পনা ও সমাপ্তির জন্য আমি আমার স্নেহভাজন পূর্বছাত্রবৃন্দ ও দুই একজন সহকর্মীর নিকট বিশেষভাবে ঋণী। প্রথম প্রেরণা আসে অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান্ প্রভাসচন্দ্র ঘোষের নিকট হইতে। ইনি আমার সমস্ত বাধা-আপত্তি ও বাংলা ভাষায় রচনার অনভ্যস্ততার সংকোচ তাঁহার প্রবল ইচ্ছা-শক্তি ও প্রচণ্ড তাগিদের বলে খণ্ডন করিয়া সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে আমাকে প্রথম অবতীর্ণ করান। আমার আর দুইজন ভূতপূর্ব ছাত্র, অধুনাতন ইংরাজী সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকদ্বয়ের নিকট আমার ঋণ এত বেশী যে তাহা উপযুক্তভাবে স্বীকার করা অসম্ভব। শ্রীমান্ ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রীমান্ তারাপদ মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত ইহার সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। ইঁহাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—ইঁহাদের সমালোচনা ও উপদেশ আমার অগ্রগতির প্রত্যেক পদক্ষেপ নিয়মিত করিয়াছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মাসিকপত্রিকার পৃষ্ঠা হইতে প্রবন্ধগুলির পুনরুদ্ধার, গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের যথাযথ বিন্যাস ও মুদ্রাঙ্কণকালে সংশোধনভার—এই সমস্ত বিষয়ের দায়িত্ব লইয়া ইঁহারা আমার পথ সুগম না করিলে আমার প্রারব্ধ কার্য কখনই শেষ হইত না। গ্রন্থের মধ্যে যদি কোন প্রশংসাযোগ্য উপাদান থাকে, সেই প্রশংসার বেশীর ভাগই যে ইঁহাদের প্রাপ্য সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। আর একজন ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রীমান্ শৌরীন্দ্রনাথ রায় এই বিষয়ে ইঁহাদের সহযোগিতা করিয়া আমার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীমান্ নির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার প্রধান অধ্যাপক সুপণ্ডিত রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়ও দুই একটি মূল্যবান্ উপদেশের দ্বারা গ্রন্থের অপূর্ণতা

হ্রাস করিবার হেতু হইয়াছেন—তিনিও আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহোদয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বাধীনে আমার এই গ্রন্থের প্রকাশ-ভার লইয়া ইহার গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন ও মুদ্রাঙ্কন-সময়ে কয়েকটি অসমাপ্ত অধ্যায় লিখিবার অনুমতি দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। মুদ্রণকার্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় এবং এই কার্যে যাহাতে অত্যধিক বিলম্ব না হয় তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় যত্নের ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এইবার গ্রন্থে অবলম্বিত প্রণালী সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচ্য গ্রন্থের সংখ্যাধিক্যবশতঃ প্রত্যেক গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব হয় না—লেখকেরা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন-রীতির বিবৃতি ও প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যরথীদের একটা সংক্ষিপ্ত উৎকর্ষ-নিরূপণ-চেষ্টাতেই আপনাদিগকে সীমাবদ্ধ রাখেন। বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের তালিকা খুব দীর্ঘ না হওয়ায় প্রত্যেক লেখকের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করার প্রয়াস পাইয়াছি। বিশেষতঃ বঙ্গ-সাহিত্যে সমালোচনা এখনও প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করিয়া বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। সেইজন্য পাঠকের সম্মুখে কেবল শেষ মীমাংসাটি (conclusion) উপস্থাপিত না করিয়া যুক্তিধারার প্রত্যেক শৃঙ্খলটি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, যাহাতে তাঁহারা আমার অনুসৃত পদ্ধতি ও দোষ-গুণ-বিচার সম্বন্ধে সবিস্তারে পরিচিত হইয়া নিজ নিজ মত গঠন করিতে পারেন। হয়তো আলোচনা অতি দীর্ঘ হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ ন্যায়সংগত আপত্তি তুলিতে পারেন। এ অভিযোগ আমি সবিনয়ে স্বীকার করিয়া লইতেছি। গ্রন্থটি মাসিকপত্রিকার জন্য প্রথম লেখা হয় বলিয়া গোড়া হইতেই একটু বিস্তৃত আলোচনার দিকে ঝুঁকিয়াছিল। এক্ষণে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়ও ইহার প্রথম-উদ্দেশ্যঘটিত অতিবিস্তারকে সংক্ষিপ্ত ও সংকুচিত করা সর্বদা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং ইহাকে ঠিক সাহিত্যের ইতিহাস বলিয়া না লইয়া রস-বিচারমূলক দীর্ঘ-প্রবন্ধসমষ্টি বলিয়া স্বীকার করিলে ইহার প্রতি সুবিচারের সম্ভাবনা বেশী হইতে পারে।

গ্রন্থের অন্যান্য দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধেও আমি যথেষ্ট সচেতন আছি। আমাদের দেশে ঐতিহাসিক মাল-মশলার অভাব সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রেও অনুভূত হয়। কোন লেখকের গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক আলোচনার চেষ্টা করিলে প্রথম প্রকাশের তারিখ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 'বসুমতী' আফিস হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীসমূহ আমাদের একটা প্রকাণ্ড অভাব মোচন করিয়াছে ইহা সত্য; তথাপি এই সমস্ত গ্রন্থাবলীতে কোন সমালোচনামূলক ভূমিকা বা গ্রন্থগুলিকে কালানুক্রমিক রীতিতে সাজাইবার চেষ্টার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক গবেষণার দিকে আমার নিজেরও কোন প্রবণতা নাই। কাজেই সাল, তারিখ প্রভৃতি বিষয়ে হয়ত অনেক স্থানেই ভুল-ভ্রান্তি হইয়াছে। গ্রন্থটিকে প্রধানতঃ রস-বিশ্লেষণের চেষ্টা হিসাবে লইয়া পাঠক এই জাতীয় ত্রুটিকে একটু ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন ইহা আশা করা যাইতে পারে।

তারপর গ্রন্থের ভাষা লইয়াও অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনার অবসর থাকিতে পারে এরূপ আশঙ্কা ভিত্তিহীন নহে। আমার যে কিছু সামান্য সমালোচনা-জ্ঞান তাহা প্রধানতঃ ইংরেজী সাহিত্য হইতেই আহৃত। বাংলা ভাষায় সমালোচনার পরিভাষাও এ পর্যন্ত তৈয়ারি হয় নাই। সুতরাং সমালোচনাকে বাধ্য হইয়া ইংরেজী ভাব ও ভাষার অনুবর্তন করিতে হয়। সেইজন্য গ্রন্থের ভাব ও ভাষার মধ্যে যদি বৈদেশিক গন্ধ সময় সময় উগ্র হইয়া উঠে, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ

নাই। সূক্ষ্ম ও দুরূহ বিষয়ের আলোচনার জন্য ভাষাও সব সময় আশানুরূপ সরলতা লাভ করিতে পারে নাই; হয়ত স্থানে স্থানে অতিরিক্ত গম্ভীর বা দুর্বোধ্য হইয়া থাকিবে। অনভিজ্ঞতা, অক্ষমতা ও স্থলবিশেষে অনিবার্যতা ছাড়া ইহার আর কোন কৈফিয়ৎ নাই। তবে আমার মনে হয়, পাঠক যদি এ বিষয়ে তাঁহার প্রত্যাশা কিছু খর্ব করেন, তবে আশাভঙ্গজনিত দুঃখের তীব্রতাও সেই পরিমাণে হ্রাস হইবে। সমালোচনার পরিভাষার সহিত পরিচয়-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ও ভাবের মধ্যে বৈদেশিকতাও আমাদের অভ্যস্ত হইয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে প্রথম যুগের পাঠকেরা যে উৎকট অস্বাভাবিকতায় প্রতিহত হইয়াছিলেন, তাহা আর অনুভূত হয় না—বরং তাঁহার লিখন-ভঙ্গীই এখন শিক্ষিত, অনুশীলন-মার্জিত বাঙালীর অন্তরতম প্রকাশ বলিয়া অভিনন্দিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাই অবশ্য বাঙালী পাঠকের এই যুগান্তরকারী রুচি-পরিবর্তনের প্রধান কারণ। কিন্তু তথাপি ইহা সাধারণ সত্য যে, অপরিচয়ের বিরুদ্ধতা একটা অস্থায়ী সাময়িক মনোভাব মাত্র। আরও একটা কথা বোধ হয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ভাবের তাগিদ অনুসারে ভাষাও নিয়ন্ত্রিত হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যের সুললিত পদ-বিন্যাস সাহিত্য-সমালোচনার মত নীরস, বস্তুতন্ত্র-প্রধান কারবারে চলে কি না তাহা চিন্তার বিষয়। এখানে যে বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে হয়, তাহা ঠিক 'অমিয় ছানিয়া' প্রস্তুত নয়! এই কৈফিয়ৎ সত্ত্বেও ব্যবহার-নৈপুণ্যের অভাব জন্য যে অনেক ভাষা-গত ত্রুটি আছে তাহা স্বীকার করিতে কোন বাধা দেখি না। যদি গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হয় তবে এই ত্রুটি-সংশোধনের একটা সুযোগ পাওয়া যাইবে।

ভূমিকার প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে যে, এই গ্রন্থের অনেক অংশ বহু পূর্বের লেখা। বিশেষতঃ গ্রন্থ ছাপিতে দেওয়ার সময় আধুনিক লেখকদিগের যে সমস্ত রচনা অসম্পূর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে সেগুলি ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হইয়া থাকিবে। হয়ত বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে নূতন পুস্তকও লিখিত হইয়া থাকিবে। আমার আলোচনায় এই সমস্ত নূতন গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত হইবার সময় পায় নাই—এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিও স্বীকার করিতেছি।

বঙ্গ-সাহিত্যের একটা বিশেষ বিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস-রচনার এই প্রথম উদ্যম—সুতরাং প্রথম উদ্যমের অপূর্ণতা ইহার মধ্যে অনিবার্য। যে সমস্ত জীবিত লেখক-লেখিকার রচনা ইহাতে আলোচিত হইয়াছে, তাঁহাদের সাহিত্য এখনও নূতন নূতন উন্মেষের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে শেষ মত-গঠনের এখনও সময় হয় নাই। তাঁহাদের বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবার কোন দাবী নাই, ইহা স্বীকার না করিলেও চলে। কোন কোনও শক্তিশালী উদীয়মান লেখক হয় স্থানাভাবজন্য, না হয় অনবধানতা-প্রযুক্ত গ্রন্থমধ্যে অন্তর্ভুক্ত হন নাই। যাহা হউক, অপূর্ণতার তালিকা দীর্ঘতর করিয়া কোন লাভ নাই। গ্রন্থের উন্নতির জন্য যিনি যে নির্দেশ দিবেন, তাহা উপযুক্ত বিবেচিত হইলে সাদরে ও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। ইতি—

কলিকাতা
২৪শে মাঘ, ১৩৫৫

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'র প্রথম সংস্করণ প্রায় তিন বৎসর পূর্বে নিঃশেষিত হইয়াছে। যুদ্ধকালীন বাধা-নিষেধের জন্য দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণ-কার্যে এত বিলম্ব ঘটিল। এই অপরিহার্য বিলম্বের জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। গত দুইবৎসর যাবৎ গ্রন্থখানি সম্বন্ধে নানা শ্রেণীর পাঠক ও সাহিত্যানুরাগীর নিকট হইতে নানা প্রকারের অনুরোধ ও অনুযোগ-পত্র পাইয়াছি। বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের তাগিদই সর্বাপেক্ষা প্রবল ছিল। প্রধানতঃ সুবিখ্যাত প্রকাশক 'মডার্ণ বুক এজেন্সী'র উৎসাহ ও কর্মতৎপরতার জন্যই নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতে পারিয়াছে। এজন্য তাঁহারা বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ।

নূতন সংস্করণে গ্রন্থখানির কিছু উন্নতি-বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। অনেক আধুনিক লেখকের রচনার পূর্ণতর আলোচনা করা হইয়াছে ও গ্রন্থের বিষয়-বস্তুর সন্নিবেশেও নূতন প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। অনেক বিরুদ্ধ সমালোচকের মতে প্রথম সংস্করণে মহিলা ঔপন্যাসিকদের গ্রন্থালোচনায় অতিরিক্ত স্থান দেওয়া হইয়াছিল। বর্তমান সংস্করণে সমস্ত বইটির পরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পূর্ব-প্রদত্ত স্থানের কিঞ্চিৎ সংক্ষেপ করা হইয়াছে। সর্বশুদ্ধ পুস্তকটির আয়তন প্রায় দুই শত পৃষ্ঠা বাড়িয়াছে। আশা করা যায়, এই নূতন ব্যবস্থায় ইহা সাহিত্যরসিকদের পরিতৃপ্তি-বিধানের জন্য আরও উপযোগী হইয়াছে।

প্রথম সংস্করণে আমার কলিকাতা হইতে অনুপস্থিতির জন্য অনেক ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছিল। এবার যথাসাধ্য সেগুলির সংশোধন হইয়াছে। বাক্যের দৈর্ঘ্যহ্রাস ও রচনার সরলতা সম্পাদনের দিকেও পূর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগী হইয়াছি। ভরসা করি, এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে গ্রন্থখানি অধিকতর সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হইবে।

প্রথম সংস্করণের বিষয়ে পণ্ডিতমণ্ডলী ও সাধারণ পাঠকের নিকট হইতে যে সমস্ত প্রতিকূল ও অনুকূল অভিমত পাওয়া গিয়াছিল, সেগুলির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই বর্তমান সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। যথাসম্ভব সমস্ত যুক্তিপূর্ণ অভিমতই গ্রহণ করা হইয়াছে। তবে আমার সমালোচনার মূল দৃষ্টিভঙ্গী অপরিবর্তিতই রহিয়াছে। উপন্যাস-সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমপ্রসার এমন একটি বৃহৎ ব্যাপার যে, ইহাকে নানা দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা ও নানা মূলসূত্রের সাহায্যে আলোচনা করা সম্ভব। সুতরাং ভবিষ্যতে নূতন নূতন সমালোচক এই দুরূহ কার্যে ব্রতী হইয়া ইহার মধ্যে আলোচনার অভিনবত্ব প্রবর্তন করিবেন ইহা আশা করা যাইতে পারে। আমরা সাগ্রহে নবযুগের নূতন আলোচনা-পদ্ধতির প্রতীক্ষা করিব।

পরিশেষে গ্রন্থমধ্যে আমার বিচার-পদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত-নির্ণয়ে যে অপরিহার্য ভ্রান্তি-প্রমাদ ঘটিয়াছে পূর্বস্বীকৃতির দ্বারাই তাহার গুরুত্ব লাঘব করিতে চাই। ভবিষ্যৎ আলোচনার ফলে এই সমস্ত ত্রুটির আবিষ্কার ও সংশোধন হইবে ও লেখকদের চিরন্তন মূল্য অভ্রান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমার এই সামান্য প্রচেষ্টার দ্বারা যদি সেই পরিণতির পথ কিয়ৎপরিমাণে পরিষ্কৃত হইয়া থাকে তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে। ইতি—

দোলপূর্ণিমা, ১৩৫৪
ইং ২৫শে মার্চ ১৯৪৮
৩১নং সাদার্ণ এভিনিউ, কলিকাতা

বিনীত
শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

তৃতীয় সংস্করণে বিশেষ কিছু পরিবর্তন করা হয় নাই। তবে কয়েকজন লেখকের রচনার আলোচনা ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অতি-আধুনিক তরুণ লেখকদের মধ্যে যে নূতন সম্ভাবনা ও শিল্পোৎকর্ষের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহারও কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। উপন্যাস-সাহিত্য যেরূপ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে, ইহাতে যেরূপ নূতন আঙ্গিক ও আলোচনা-পদ্ধতির পরীক্ষা চলিতেছে, তাহাতে সমালোচনার ইহার সহিত তাল রাখিয়া চলা প্রায় অসম্ভব। বোধ হয় অদূর ভবিষ্যতে উপন্যাসের আদর্শ ও রূপ সম্বন্ধে আমাদের পূর্বনির্দিষ্ট ধারণার সম্প্রসারণ করিয়া নূতন সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে হইবে। সমাজবিন্যাসের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে ব্যক্তি-মানসের যে আবেগ-সংঘাত নূতন পথে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার উপরেও উপন্যাসের গঠন-বিন্যাস ও ভাবকেন্দ্র নির্ভরশীল। আগামী অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা উপন্যাসের যে কিরূপ বৈপ্লবিক রূপান্তর—সাধন ঘটিবে তাহা নিশ্চিতরূপে অনুমান করাও সম্ভব নয়। উপন্যাসের মধ্যে যে জীবনধারা নূতন নূতন বাঁক ফিরিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে যেন মনে হয় যে, প্রচলিত সমালোচনা-সেতুর তলা হইতে ইহা অনেকখানি সরিয়া গিয়াছে। যাহা হউক এ সব ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের জল্পনা-কল্পনা বর্তমান গ্রন্থে অপ্রাসঙ্গিক। পরিবর্তনশীল সাহিত্য-জগতে সাহিত্যের মূল্যায়ন-পদ্ধতিও অনিবার্যভাবে পরিবর্তিত হইবে—আমার গ্রন্থের শেষ দিকে হয়ত তাহার কিছু পূর্বসূচনা আভাসিত হইয়াছে।

বুদ্ধ পূর্ণিমা, ১৩৬৩
ইং ২৪শে মে, ১৯৫৬
৩১ নং সাদার্ণ এভিনিউ, কলিকাতা

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

প্রথম অধ্যায়

(১) প্রাচীন ও মধ্য যুগের সাহিত্যে উপন্যাসের পূর্ব-সূচনা

ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের দেশে যে সব নূতন ধরনের সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে উপন্যাসই প্রধানতম। এই উপন্যাসের অনুরূপ কোনবস্তু আমাদের পুরাতন সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শুধু আমাদের দেশ বলিয়া নহে, পৃথিবীর কোন দেশেরই পুরাতন সাহিত্যে উপন্যাসের দর্শন মিলে না। উপন্যাসের প্রধান বিশেষত্বই এই যে, ইহা সম্পূর্ণ আধুনিক সামগ্রী। পুরাতন যুগের আকাশ-বাতাসের মধ্যে ইহার জন্ম সম্ভবপর নয়। আধুনিক যুগের সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক একেবারে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ। সর্ব শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে উপন্যাসই সর্বাপেক্ষা গণতন্ত্রের প্রভাবান্বিত। এই গণতন্ত্রের মূল ভিত্তির উপরেই ইহার প্রতিষ্ঠা। উপন্যাস যে সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, তাহা অতীত কালের সমাজ হইতে অনেকগুলি গুরুতর বিষয়ে বিভিন্ন হওয়া চাই। প্রথমতঃ, মধ্যযুগের সামাজিক শৃঙ্খল হইতে মানুষের মুক্তিলাভ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্‌বোধন উপন্যাস-সাহিত্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। মধ্য-যুগে সমাজ কতকগুলি সনাতন অপরিবর্তনীয় শ্রেণীতে বিন্যস্ত থাকে এবং মানুষ নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব উপলব্ধি না করিয়া আপনাকে কোন একটি সামাজিক শ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে ও সেই শ্রেণীর মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া দেয়। এই শ্রেণী-বিশেষের মধ্যে আত্মবিলোপ ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল, ও উপন্যাসের আবির্ভাবের পক্ষে একটি প্রধান অন্তরায়। কিন্তু আধুনিক যুগের মানুষ আর আপনাকে একটি শ্রেণীর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া রাখিতে চায় না; সমুদয় সামাজিক শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিজের ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তোলা তাহার একটি প্রধান আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইয়াছে। এই ব্যক্তিত্ব-বোধের সঙ্গে সঙ্গেই উপন্যাসের আবির্ভাব। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নতম শ্রেণীর মানুষের মনেও যে একটা আত্মমর্যাদা-বোধ জাগিয়া উঠে ও যাহা সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর লোক, শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, তাহাও উপন্যাস-সাহিত্যের একটি প্রধান উপাদান। উপন্যাসের উপর গণতন্ত্রের প্রভাব এখানেও সুপরিস্ফুট। প্রাচীন সাহিত্যের বিষয় প্রধানতঃ অতি-মানুষ বা উচ্চশ্রেণীর মানুষের কীর্তিকলাপ; ইহা সাধারণ লোকের বিশেষ ধার ধারে না। যে সমস্ত স্থলে সাধারণ মানুষ প্রাচীন সাহিত্যের নায়কের পদে উন্নীত হইয়াছে, সেখানেও সে দেবানুগৃহীত পুরুষ বলিয়া—নিজের মনুষ্যত্বের জোরে নহে। পক্ষান্তরে, অতি সামান্য লোকের দৈনিক জীবন লিপিবদ্ধ করা ও উহা হইতে জীবন-সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ, ব্যাপক ধারণা ফুটাইয়া তোলাই উপন্যাসের প্রধান কার্য। সুতরাং কোন দেশের সামাজিক অবস্থার এই নবজাগ

পরিবর্তন সংসাধিত না হইলে, তাহা উপন্যাসের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করিতে পারে না। এই সমস্ত কারণের জন্যই উপন্যাসের আধুনিকত্ব; বর্তমান যুগের পূর্বে, গণতন্ত্রের ক্রম-বিকাশের পূর্বে, ইহার আবির্ভাব সম্ভব ছিল না।

অবশ্য উপন্যাস যে একেবারে নিরবচ্ছিন্ন বিস্ময় বা অজ্ঞাত প্রহেলিকার মত সাহিত্য-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা নহে। প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যেও ইহার ক্ষীণ সংকেত ও সুদূর ইঙ্গিত খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কাব্যে, ধর্মগ্রন্থে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কবিতায়, আখ্যায়িকায় (narrative poetry) ও নাটকে, যেখানেই লেখকের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমাজের একটি বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়, যেখানেই চিত্রাঙ্কনের চেষ্টা দেখা যায় বা সামাজিক মনুষ্যের সম্পর্ক ও সংঘাত ফুটিয়া উঠে, সেখানেই উপন্যাসের ভাবী ছায়াপাত হইয়া থাকে। উপন্যাসের জন্ম হইবার পূর্বেই, উহার লক্ষণ ও উপাদানগুলি বিক্ষিপ্ত—বিপর্যস্তভাবে সাহিত্যের মধ্যে ছড়ান থাকে। তারপর যথাসময়ে কোন প্রতিভাবান্ লেখক এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত উপাদান সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া ও তাহাদিগকে একটি বাস্তব আখ্যায়িকার মধ্যে গাঁথিয়া দিয়া, এক প্রকার নূতন সাহিত্যের জন্ম দান করেন ও চির-প্রবাহমান সাহিত্য-স্রোতকে একটি নূতন প্রণালীতে সঞ্চারিত করেন।

(২) প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য ও আখ্যায়িকা

আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যেও সমস্ত ছদ্মবেশের মধ্য দিয়া উপন্যাসের প্রথম অঙ্কুর ও আদি লক্ষণগুলি আবিষ্কার করা যায়। আমাদের রামায়ণ-মহাভারতে ও পৌরাণিক সাহিত্যে, সমস্ত অলৌকিক ঘটনা ও ঐশীশক্তির বিকাশের মধ্যে, সময়ে সময়ে বাস্তব সমাজচিত্রের ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া ও বাস্তব মনুষ্যের অকৃত্রিম সুখ-দুঃখের মৃদু প্রতিধ্বনি আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে। মাঝে মাঝে দেব-দেবীর স্তুতিগান ও ভক্তি-উচ্ছ্বাসের ভিতর দিয়া, অতিপ্রাকৃতের কুহেলিকাময় যবনিকা ভেদ করিয়া, যে ধ্বনি আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে, তাহা দেশকালনিরপেক্ষ মানবহৃদয়েরই বাণী বলিয়া আমরা চিনিতে পারি। প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে এই সমস্ত বাস্তবতার ছাপ-মারা দৃশ্য খুঁজিয়া বাহির করা ও আধুনিক সাহিত্যের সহিত তাহাদের প্রকৃত যোগসূত্র আবিষ্কার করা কাব্যামোদীর একটি প্রধান আনন্দ। সংস্কৃত গদ্য-সাহিত্য—'কথাসরিৎসাগর', 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি', 'দশকুমারচরিত', 'কাদম্বরী' ইত্যাদির মধ্যেও বিশেষত্ববর্জিত, প্রথাবদ্ধ বর্ণনা-বাহুল্যের অন্তরালে উপন্যাসের মৌলিক উপাদানগুলি বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায়। বৌদ্ধ জাতকগুলির মধ্যে এই বাস্তবতার রেখা স্পষ্টতর ও গভীরতর হইয়া দেখা দেয়। বস্তুতঃ, সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে, সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত তুলনায়, বাস্তবতার সুরটি অধিকতর তীব্র ও নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বোধ হয় ইহার একটি কারণ এই যে, বৌদ্ধধর্ম অনেকটা গণ-তন্ত্রের দ্বারা প্রভাবান্বিত, ইহা হিন্দুধর্মের সনাতন শ্রেণীবিভাগগুলি ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া মানুষকে একটি নূতন ঐক্য ও সাম্যের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছে এবং চিরপ্রথাগত রাজন্য ও অভিজাতবর্গের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া মধ্যশ্রেণীর লোকের বাস্তব জীবনকে নিজ বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

(৩) পঞ্চতন্ত্র ও বৌদ্ধ জাতক

স্থূলভাবে দেখিতে গেলে বৌদ্ধ জাতকগুলি ঈসপের গল্প বা সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতির অনুরূপ ও তাহাদের সহিত একশ্রেণীভুক্ত। বৌদ্ধধর্মের মহিমা-প্রচার ও বুদ্ধের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয়-দানই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য; সুতরাং অনৈসর্গিক, অতিপ্রাকৃত ব্যাপার ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণেই বর্তমান আছে। আবার ঈসপের গল্পের মত পশুপক্ষীর ব্যবহার ও কথোপকথনের মধ্য দিয়া মানুষের চরিত্র-সমালোচনা ও তাহাকে নীতিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টাও খুব পরিস্ফুট। তথাপি বাস্তব রসধারা ইহাদের মধ্যে প্রচুরতর স্রোতে প্রবাহিত; সর্বত্রই একটা সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-শক্তি, গল্প বলিবার একটা বিশেষ নিপুণতা ও কৌশল এবং বাস্তব জীবনের সহিত একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ ইহাদিগকে সম-জাতীয় অন্যান্য গল্প হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ত্রে' নীতিজ্ঞান বাস্তবতাকে অভিভূত করিয়াছে; গল্পের অতি ক্ষীণ ও সূক্ষ্ম আবরণের ভিতর দিয়া নীতিশিক্ষার কঙ্কাল সুস্পষ্টভাবেই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পশুপক্ষীর কথোপকথনের মধ্যে কোন বিশেষ সরসতা, গল্প বলিবার ভঙ্গীর মধ্যে কোন বিশেষ উৎকর্ষ বা নাটকোচিত গুণ-বিকাশের চেষ্টা, কিছুই খুঁজিয়া পাই না। লেখকের দৃষ্টি কেবল মানব-জীবন সম্বন্ধে খুব সাধারণ রকম অভিজ্ঞতা-প্রসূত নীতিজ্ঞান বা ব্যবহার-চাতুর্যের প্রতিই আবদ্ধ আছে। এই নীতিটিকে সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে স্মরণীয়ভাবে গাঁথিয়া তুলিবার চেষ্টাতেই তিনি সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন; তাঁহার অনুভূতিকে বহির্জগতের অনন্ত-বৈচিত্র্যপূর্ণ, ঘাত-প্রতিঘাত-চঞ্চল দৃশ্য হইতে নিবর্তিত করিয়া অন্তর্জগতের শুষ্ক নীতি-নিষ্কাশন কার্যেই প্রেরণ করিয়াছেন। গল্পগুলিও যেন দেবভাষার শব্দাড়ম্বরে এবং সমাস ও সন্ধি-বাহুল্যে ব্যথিত-গতি হইয়া নিতান্ত ক্ষীণ ও মন্থর পদে চলিয়াছে। তাহারা যেন তাহাদের অন্ত-র্নিহিত নীতিসারটুকু বাহির করিয়া দিতেই অত্যন্ত ব্যগ্র; কোনমতে নিজাদিগকে নিঃশেষ করিয়া তাহাদের কুক্ষিগত নীতিটুকু উদ্‌গার করিয়া দিলেই যেন তাহারা বাঁচে। শিক্ষা দিবার প্রবল আগ্রহেই তাহারা আপনাদের জীবনীশক্তিকে নিস্তেজ করিয়া দিয়াছে। অবাধ্য, দুঃশীল রাজপুত্রদিগকে নীতিশিক্ষা দিবার জন্যই যে তাহাদের জন্ম এবং প্রগাঢ়-পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বিষ্ণুশর্মা যে তাহাদের লেখক—তাহাদের এই গৌরবময় ইতিহাস সম্বন্ধে তাহারা মুহূর্তের জন্যও আত্মবিস্মৃত হয় নাই। তাহারা তাহাদের এই বিশেষ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কত-টুকু সফলতা লাভ করিয়াছিল, দুঃশীল রাজপুত্রদের দুঃশীলতাকে এক অবসর-সংক্ষেপ ছাড়া অন্য কোন দিকে সীমাবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল কি না, তাহার কোন প্রমাণ উপস্থিত নাই, এবং এই অখণ্ডনীয় প্রমাণের অভাবে যদি আমরা তাহাদের সংস্কারকোচিত শক্তিতে সন্দিহান হই, তবে বোধ হয় আমাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

অবশ্য ঈসপের গল্পগুলি গল্পের মৌলিক উদ্দেশ্য হইতে এতটা বিপথগামী হয় নাই। তাহাদের মধ্যেও নীতি-প্রচার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, এবং প্রত্যেক গল্পের শেষে নীতিটি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকিলেও, নীতি গল্পকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিতে পারে নাই। ঈসপের গল্পগুলি সহজ, সরল ভাষায় রচিত, অলঙ্কার-বাহুল্যে অযথা ভারাক্রান্ত নহে; সংস্কৃত

'পঞ্চতন্ত্রের' ন্যায় তাহাদের বাস্তব জীবনের সহিত ব্যবধান এত বেশি নয়। তথাপি গল্প হিসাবে তাহাদের কোন বিশেষত্ব নাই; গল্পটি বলিবার মধ্যে এমন কোন বিশেষ ভঙ্গী, এমন কোন সরসতা নাই, যাহা আমাদের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে। গল্পের অন্তর্নিহিত রসটি ফুটাইয়া তোলা বা সরস কথোপকথনের মধ্য দিয়া তাহার আখ্যান-অংশটিকে সজীব ও লীলায়িত করিয়া তোলার কোন চেষ্টা নাই। গল্পটি যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে, যেন এক নিঃশ্বাসে সারিয়া দিয়া তাহার মধ্য হইতে উপদেশটি বাহির করিয়া লইতেই লেখক ব্যস্ত। গল্পের মধ্যে বাস্তবতার একটি ক্ষীণ সুর আমাদের কানে প্রবেশ করে বটে, কিন্তু এই ক্ষীণ বাস্তবতার মধ্যে জীবনের সহিত কোন নিবিড় সংস্পর্শের আভাস পাওয়া যায় না। মোট কথা, ইহাদের মধ্যে খাঁটি গল্পের প্রতি লেখকের অবিমিশ্র অনুরাগের পরিচয় বড় একটা মেলে না। মানব-সমাজের যে আদিম অবস্থায় গল্প-বর্ণিত ঘটনাগুলি জীবনের প্রকৃত সমস্যার বিষয় ছিল, আমরা সেই অবস্থা হইতে এখন বহুদূরে সরিয়া আসিয়াছি; সেই ঘটনাগুলি এখন আমাদের বাস্তব-জীবনের মধ্যে আর প্রতিফলিত হয় না। কেবল তাহাদের অন্তর্নিহিত উপদেশগুলি আমাদের বর্তমান জটিলতর অবস্থার মধ্যে কথঞ্চিৎ প্রয়োগ করা হয় মাত্র; অর্থাৎ আমাদের নিকট গল্পের কোন মূল্য নাই, উপদেশটিরই যৎকিঞ্চিৎ মূল্য আছে। সামাজিক যে অবস্থায় বক সিংহের গলায় নিজের ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিয়া পুরস্কার চাহিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিল, বা সিংহচর্মাবৃত গর্দভ আপনাকে সিংহ বলিয়া পরিচয় দিতে উদ্‌যোগী হইয়াছিল, আমাদের বর্তমান জীবনে সেই অবস্থাগুলির পুনরাবৃত্তি আমরা কল্পনা করিতে পারি না; তাহাদের নীতি-অংশটুকুই আমাদের অভিজ্ঞতার অংশীভূত হইয়া বর্তমানের অধিকতর জটিল ও সমস্যা-সংকুল পথে আমাদিগকে সাবধানে পদক্ষেপ করিতে শিক্ষা দেয় মাত্র। অবশ্য ঈসপের দুই একটি গল্পের মধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সমস্যার চিহ্ন পাওয়া যায়, যেমন অন্য জন্তুর বিরুদ্ধে সাহায্য পাইবার জন্য অশ্বের মনুষ্যকে আহ্বান ও মনুষ্যের নিকট তাহার অধীনতা-স্বীকার নিঃসন্দেহ একটি জটিল রাজনৈতিক সমস্যার আভাস দেয়; কিন্তু মোটের উপর পূর্ব মন্তব্য ঈসপের অধিকাংশ গল্প সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

গল্প-হিসাবে বৌদ্ধ জাতকগুলি 'পঞ্চতন্ত্র' ও ঈসপের গল্প হইতে সর্বতোভাবেই শ্রেষ্ঠ। বাস্তব জীবনের চিহ্ন, বাস্তব সমস্যার ছাপ ইহাদের প্রত্যেকটির উপর অত্যন্ত গভীরভাবে মুদ্রিত। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া, ইহার সহিত আমাদের যেরূপ বিস্তারিত ও ব্যাপক পরিচয় আছে এমন বোধ হয় মুসলমানধর্ম ছাড়া আর কোন ধর্মের সহিত নাই। ইহার রীতি-নীতি ও অনুশাসন, ইহার কার্য-প্রণালী ও ধর্ম-বিস্তার-চেষ্টা, বিশেষতঃ সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ, প্রাত্যহিক সম্পর্ক—এ সমস্তই আমাদের নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত। হিন্দুধর্মের ভিতরে একটা প্রবল অনাসক্তির, একটা বিশাল ঔদাসীন্যের ভাব জড়িত রহিয়াছে। ঋষির তপোবন গৃহীর প্রাত্যহিক জীবন হইতে বহুদূরে অবস্থিত; তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সংস্পর্শের চিহ্ন অতি বিরল। তপোবনের আদর্শ শান্তি গৃহস্থের শত শত ক্ষুদ্র কলরবে, তুচ্ছ কোলাহলের দ্বারা বিচলিত হয় নাই। কচিৎ কোন তত্ত্বজিজ্ঞাসু রাজা ঋষির চরণোপান্তে শিষ্যের ন্যায় আসিয়া

প্রণত হইয়াছেন ; ঋষিও তাঁহাকে তত্ত্বকথা শুনাইয়া তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করাইয়াছেন ; তাঁহার পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ কৌতূহল-প্রবৃত্তির পরিচয় দেন নাই। অথবা সময়ে সময়ে ঋষিই কোন বিশেষ প্রয়োজনে তপোবনের পবিত্র গণ্ডি ছাড়াইয়া রাজধানীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং কার্য শেষ হইলেই নিজ আশ্রমের নিভৃত, ছায়াস্নিগ্ধ কোণে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। মোট কথা, হিন্দুধর্মে এক বিরল প্রয়োজন ছাড়া তপোবন ও গার্হস্থ্যাশ্রমের মধ্যে কোন চিরস্থায়ী সংযোগ-সেতু নির্মিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্মে কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত—সেখানে আশ্রম ও গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন যোগ রহিয়া গিয়াছে। ভিক্ষুরা প্রতিদিনই গ্রাম বা নগরের মধ্যে ভিক্ষাচর্যা ও ধর্মদেশনার জন্য যাইতেন এবং গৃহস্থ-জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র সমস্যার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত হইতেন—আশ্রম হইতে গ্রামের পথখানি সর্বদাই গমনাগমনের কোলাহলে মুখরিত থাকিত। গ্রামবাসীরা তাহাদের প্রত্যেক তুচ্ছ কলহ বা অশান্তির কারণ লইয়া বুদ্ধের চরণে নিবেদন করিতে আসিত এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা ও সমাধানের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ লইয়া ফিরিত। এই সাধারণ জীবনের সহিত নৈকট্যই বৌদ্ধ জাতকগুলির গল্পাংশে উৎকর্ষের কারণ হইয়াছে।

এই বাস্তব-নৈকট্যের নিদর্শন জাতকগুলির মধ্যে অজস্র প্রাচুর্যের সহিত বিক্ষিপ্ত। ভিক্ষুদের ধর্মজীবনের নানা সমস্যা, তৎকালীন সামাজিক রীতি-নীতি, মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর জনসাধারণের জীবন-যাত্রা, এমন কি পশুপক্ষীর ও বুদ্ধদেবের চরিত্র-চিত্রণ—সর্বত্রই এই বাস্তবতা-প্রবণ মনোবৃত্তির সুস্পষ্ট ছাপ অঙ্কিত হইয়াছে। এমন কি ইহাদের ভাষা ও উপমা-উদাহরণ-নির্বাচনের মধ্যেও এই বাস্তবতার চিহ্ন সুপ্রকট। সামান্য দুই একটি উদাহরণ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা এই বিষয়টি পরিস্ফুট করা যাইতে পারে।

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধর্মজীবনের প্রত্যেক সমস্যা, প্রত্যেক প্রকারের প্রলোভন, ধর্মবিষয়ক প্রত্যেক প্রকারের মতভেদ ও বাদানুবাদ, ভিক্ষুদের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য ও ঈর্ষা, ধর্মোপদেশ-পালনে নিষ্ঠা ও শৈথিল্য, ভক্তি ও ভণ্ডামি—এই সমস্ত ব্যাপারেরই একটা নিখুঁত, জীবন্ত ছবি জাতকের মধ্যে অঙ্কিত হইয়াছে। প্রব্রজ্যা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই যে মানুষের প্রকৃতিগত আশা ও আকাঙ্ক্ষা, ভোগ-পিপাসা ও উচ্চাভিলাষ বিলয়প্রাপ্ত হয় না তাহা ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই পরিস্ফুট হইয়াছে। নির্বাণ-প্রদ শাসনে অবস্থিত হইয়াও ভিক্ষুরা উৎকৃষ্ট ভোজ্য, চীবর ও বাসস্থানের মোহ অতিক্রম করিতে পারে নাই, অন্তরের গূঢ় শঠতা ও অভিমান বিসর্জন দিতে পারে নাই। আশ্রমের মধ্যেই এই আদিম ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে; ভিক্ষুরা পরস্পর কলহ করিতেছে, ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া মিথ্যানিন্দা প্রচার করিতেছে; স্বীয় পাণ্ডিত্যাভিমানে অহংকার-স্ফীত হইতেছে; কোন নির্বোধ বুদ্ধির অতীত বিষয়ে পাণ্ডিত্য দেখাইতে গিয়া হাস্যাস্পদ হইতেছে। কেহ বা অপর সকলকে সঞ্চয়ের দোষ দেখাইয়া তাহাদেরই পরিত্যক্ত পাত্র-চীবরে আপন ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে; কেহ বা জীর্ণ চীবরকে উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত করিয়া তাহার দ্বারা অপরকে প্রবঞ্চিত করিতেছে, ও তৎপরিবর্তে নূতন চীবর ঠকাইয়া লইতেছে (বক-জাতক ৩৮)। এই প্রকারের বাস্তব জীবনের ঘটনাসন্নিবেশে জাতকগুলি বিশেষ উপভোগ্য ও সরস হইয়া উঠিয়াছে।

আবার সাধারণ গার্হস্থ্য-জীবন-বর্ণনাতেও এই বাস্তবতার প্রাধান্য বিশেষভাবে উপলব্ধি:

করা যায়। বিষয়-নির্বাচনে ও বর্ণনা-ভঙ্গীতে একটা নূতনত্ব, সাধারণ পরিচিত প্রণালীকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা সর্বত্রই পরিস্ফুট। সাধারণতঃ গল্প যে সমস্ত বাঁধা-ধরা মামুলি ঘটনাতেই (conventional situation) আবদ্ধ থাকে, জাতকে তাহা হয় নাই। শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে গিয়া কিরূপে বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; ধূর্তেরা অর্থলোভে কিরূপে ধনীদের মদ্যে বিষ মিশাইয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল; এক মূর্খ শৌণ্ডিক কিরূপে তাহার মদ্য অতিরিক্ত লবণাক্ত করিয়া স্বীয় ব্যবসায় নষ্ট করিয়াছিল; এক প্রত্যন্তপ্রদেশের শাসন কর্তা কিরূপে দস্যুদের সহিত লুণ্ঠিত ধনের অংশ লইবার ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদিগকে জনপদ লুণ্ঠন করিতে দিয়াছিল (খরস্বর-জাতক); একজন বণিক্ কিরূপে নিজ অমঙ্গলসূচক নামের ভয় হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিল (কালকর্ণী ও নাম-সিদ্ধিক-জাতক); একজন দাসপুত্র কিরূপে আপনাকে নিজ প্রভুর পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া সেবাগুণে প্রভুর ক্ষমা ও প্রসাদ পাইয়াছিল (কটাহক-জাতক); একজন নাপিতপুত্র কিরূপে উচ্চকুলজাত লিচ্ছবি বংশের রমণীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল (শৃগাল-জাতক); এক গৃহস্থ কিরূপে মহামারীর সময়ে গৃহত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলাইয়া নিজ জীবন রক্ষা করিয়াছিল (কচ্ছপ-জাতক);—এই সমস্ত জীবনের বিচিত্র, বিবিধ ঘটনায় জাতকগুলি পূর্ণ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অন্যান্য প্রাচীন গল্পের সহিত তুলনায় জাতকের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে নীতি-প্রচারের জন্য গল্পকে বলি দেওয়া হয় নাই। গল্পটিকে মনোহর ও চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিবার জন্য লেখক বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে পশু-বিষয়ক গল্প ও অনৈসর্গিকের অবতারণা যথেষ্ট আছে—কোন দেশেরই প্রাচীন সাহিত্য হইতে এই অতিপ্রাকৃত অংশ বর্জন করা সম্ভবপর ছিল না—কিন্তু সমস্ত বাধা সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে বাস্তব রসধারার প্রবাহ খণ্ডিত ও প্রতিহত হয় নাই। পশু-বিষয়ক গল্পের মধ্যেও যে পরিমাণ পরিহাসরস, বাস্তব-বর্ণনা ও পশুদের প্রকৃত স্বভাব ও ব্যবহার ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা পাওয়া যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে তদনুরূপ কিছুই দেখিতে পাই না। কুন্তলকুক্ষি সৈন্ধব-জাতক, কৃষ্ণ-জাতক, বক-জাতক, কাক-জাতক—এই সমস্তই পশু-বিষয়ক জাতকগুলির বাস্তবতা-প্রাধান্যের উদাহরণ। 'পঞ্চতন্ত্রে' যে জরদ্গবের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাহাকে আমরা কোন মতেই গৃধ্র বলিয়া কল্পনা করিতে পারি না; তাহার গৃধ্রোচিত কোন লক্ষণই আমরা খুঁজিয়া পাই না। যে পঙ্কনিমগ্ন শার্দূল ধর্মশাস্ত্রের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পথিককে কঙ্কণ লইবার জন্য আহ্বান করিতেছে, তাহাকে আমরা কোন মতেই বনের বাঘ বলিয়া চিনিতে পারি না; সংস্কৃত শ্লোকের আতিশয্যে, সাধুভাষার আড়ম্বরে তাহার শার্দূল-প্রকৃতি, ব্যাঘ্রোচিত নখর-দংষ্ট্রা একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ঈসপের গল্পগুলিতে যেমন একদিকে নীতি-কথার বাহুল্য নাই, তেমনি অপরদিকে সরস বাস্তব বর্ণনারও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, পশুদের বিশেষ প্রকৃতি ফুটাইয়া তুলিবার কোন চেষ্টা দেখা যায় না। অবশ্য জাতকেও যে এই দোষের অভাব আছে, তাহা বলা যায় না; সেখানেও হস্তী, মর্কট, তিত্তির প্রভৃতি পশুপক্ষীর মুখে বুদ্ধমাহাত্ম্যকীর্তন ও পঞ্চশীলের গুণগান শোনা যায়। কিন্তু লেখক ইহার মধ্যেও এমন বাস্তব বর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন, পশুপক্ষীদের প্রকৃতিসুলভ দুই একটি লক্ষণের এমন সুকৌশলে উল্লেখ করিয়াছেন যে, উহাদের প্রকৃত রূপ চিনিতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না।

আরও নানাদিক্ দিয়া জাতকের মধ্যে এই বাস্তবতাগুণের স্ফুরণ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত ও সাধারণ লোকের কাহিনী যে পরিমাণে স্থান পাইয়াছে, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের অন্য কোন বিভাগে সেরূপ দেখা যায় না। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে জনসাধারণের যেরূপ প্রভাব দেখা যায়, হিন্দুধর্মে ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না। কাজেই জাতকের মধ্যে শিল্পী, বণিক্, শ্রেষ্ঠী, কর্মকার, সূত্রধর, প্রভৃতি সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে। বরঞ্চ রাজা-উজীরের বর্ণনাগুলি অনেকটা মামুলি ধরনের ও বিশেষত্ববর্জিত; কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর চিত্রে লেখকের সত্যানুরাগ ও বাস্তবানুগামিত্বের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়।

আবার বুদ্ধের নিজের চরিত্রও যতদূর সম্ভব অতিরঞ্জন-বর্জিত হইয়া চিত্রিত হইয়াছে। অবশ্য লেখক বুদ্ধ-চরিত্রের অলৌকিক মাহাত্ম্য দেখাইতে বিশেষ কৃপণতা করেন নাই; কিন্তু তথাপি সংস্কৃত ভাষার স্বাভাবিক অত্যুক্তি-প্রবণতার সহিত তুলনা করিলে জাতকের ভাষার মধ্যেও একটা সংযম ও পরিমিত ভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়। বোধিসত্ত্ব যে কেবল রাজকুল ও অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহা নহে; তাঁহাকে সময়ে সময়ে নিতান্ত নীচকুলোদ্ভূত করিয়াও দেখান হইয়াছে। তিনি যে সকল সময়ে একটা আদর্শ, অপরিম্লান পুণ্য-জ্যোতির মধ্যে বাস করিয়াছেন তাহাও নহে, অনেক জাতকেই তাঁহার পদস্খলন ও নির্বুদ্ধিতার চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে। তিনি অনেক জাতকে নিতান্ত নীচ ও হেয়বৃত্ত্যনুসারী বলিয়াও প্রদর্শিত হইয়াছেন—এমন কি একটি জাতকে তিনি চোরের সর্দার রূপেও বর্ণিত হইয়াছেন। সকল ধর্মেই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাকে আদর্শ-চরিত্র ও অতিমানবগুণের অধিকারী বলিয়া দেখান হয়, কিন্তু জাতকে বুদ্ধের পূর্বজন্ম-সমূহের বৃত্তান্ত-বর্ণনে এই সর্বধর্ম-সাধারণ প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করা হইয়াছে। বোধিসত্ত্বের চরিত্র-বর্ণনে বাস্তবানুরক্তির পরিচয় দিয়া জাতককার যে আশ্চর্য সাহস দেখাইয়াছেন, তাহা প্রাচীন সাহিত্যে সুলভ নহে।

এই বাস্তব ফ্রেমে আঁটা বলিয়া জাতকগুলির গল্পাংশে উৎকর্ষ এত বেশি। 'পঞ্চতন্ত্র' বা ঈসপের গল্পগুলিতে তাহাদের বর্তমান উপলক্ষ্য সম্বন্ধে কোন পরিচয় মেলে না; বাস্তব জীবনে তাহাদের ভিত্তি সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ থাকি। তাহারা যেন কতকগুলি সর্বদেশ-সাধারণ, মানব-প্রকৃতি-সুলভ কাল্পনিক অবস্থার চিত্র বলিয়া মনে হয়—কোন বিশেষ-দেশের মৃত্তিকার সহিত তাহাদিগকে সংশ্লিষ্ট করিতে পারা যায় না, কোন বিশেষ জাতির জীবনীরস তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় না। কিন্তু বৌদ্ধ জাতক সম্বন্ধে আমরা সেরূপ কোন অসুবিধা ভোগ করি না; আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার মধ্যেই তাহাদের মূল গভীরভাবে প্রোথিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে উপন্যাসলেখকের মনোভাব (mentality) সম্পূর্ণভাবে প্রকট। জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারগুলির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও সরস বর্ণনাই ভাবী ঔপন্যাসিকের প্রথম গুণ; প্রাচীন সাহিত্যে ঠিক এই মনোবৃত্তির অভাবই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাচীন লেখকেরা যেন এই ক্ষুদ্র ঘটনাগুলির গৌরব ও কথাসম্পদ্ স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা ধর্মতত্ত্ব বা দার্শনিক মতের অভ্রভেদী স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া তাহার তলে এই ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকর ঘটনাগুলি প্রোথিত করিয়া ফেলেন। মহাকাব্যে জীবনের বীরত্বপূর্ণ, বৃহৎ বিকাশগুলিকেই ফুটাইয়া তোলেন, প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র কাহিনীগুলিকে, ঘরের ছোটখাটো হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখগুলিকে সাহিত্যের অযোগ্য বলিয়া অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিয়া যান। অথচ এই অতিপরিচিত ক্ষুদ্র বস্তুগুলিকে লক্ষ্য ও

তাহাদের অন্তর্নিহিত রসটি উপভোগ করিবার প্রবৃত্তিতেই উপন্যাসের মৌলিক বীজ নিহিত আছে। সেই জন্য ইংরেজী সাহিত্যে চসারকেই আমরা ভাবী ঔপন্যাসিকের নিকটতম জ্ঞাতি ও পূর্বপুরুষ বলিয়া সহজেই অনুভব করি। তিনি ঔপন্যাসিক না হইলেও উপন্যাসের উপাদান ও ঔপন্যাসিক মনোবৃত্তি তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে যদি-বা বহু অনুসন্ধানের পরে দুই একটি বাস্তব-চিহ্নাঙ্কিত দৃশ্যের সন্ধান মিলে, কিন্তু তখনই যেন মনে হয় যে, লেখক নিজ দুর্বলতায় লজ্জিত হইয়া এই বাস্তবতার চিহ্নটি যথাসাধ্য লোপ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন; বাস্তব অংশগুলিকে কল্পনা বা আদর্শবাদের সাহায্যে যথাসম্ভব রূপান্তরিত করিয়া, এই দরিদ্রের সন্তানগুলিকে সাহিত্যোচিত রাজবেশ পরাইয়া সাহিত্যের আসরে উপস্থিত করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যে বাস্তবতার এই বিরাট্ দৈন্যের মধ্যে জাতকগুলির বাস্তব প্রতিবেশ যে সমস্ত দুষ্প্রাপ্য বস্তুর ন্যায়, আরও উপভোগ্য হইয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ইহাদের মধ্যে ঔপন্যাসিক উপাদানের প্রাচুর্য দেখিয়া সত্যই মনে হয় যে, পরবর্তী যুগে যদি এই গল্পের ধারা অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত থাকিত, বাস্তবের সহিত নিবিড় স্পর্শের বাধা না ঘটিত, তবে বোধ হয় আমরাই সর্বপ্রথমে উপন্যাস-আবিষ্কারের গৌরব লাভ করিতে পারিতাম; এবং তাহা হইলে বোধ হয় উপন্যাসকে ইংরেজী সাহিত্যের অনুকরণে, বিদেশীয়-ভাব-বিকৃত হইয়া, খিড়কি দরজা দিয়া আমাদের সাহিত্যে প্রবেশলাভ করিতে হইত না।

পূর্বে যাহা লিখিত হইল তাহা হইতে সহজেই বোধ হইবে যে, জাতকগুলি উপন্যাসোচিত গুণে বিশেষ সমৃদ্ধ; তাহাদের মধ্যে যে কেবল বাস্তব উপাদানই পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে তাহা নহে; একটা প্রবল বাস্তবতাপ্রবণ মনোবৃত্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। এই দুই বিষয়েই তাহারা যে উপন্যাসের পথপ্রদর্শক ও অগ্রদূতের গৌরব দাবী করিতে পারে, তাহা নিঃসন্দেহ।

(8) মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্য—কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস ও মুকুন্দরাম

তারপর, যখন আমরা আমাদের বঙ্গসাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন ইহার মধ্যেও অনেকটা অনুরূপ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গভাষা সংস্কৃতের উত্তরাধিকারী; সুতরাং ইহা সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন উপাখ্যান-আখ্যায়িকাগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে। বোধ হয় নবজাত বঙ্গভাষার প্রথম চেষ্টা হইয়াছিল সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ ও প্রাচীন আখ্যায়িকাগুলি ভাষান্তরের দ্বারা আত্মসাৎ করা। এই ভাষান্তরের দ্বারাই বঙ্গসাহিত্য বাস্তবতার দিকে আর এক পদ অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। কেন না, যখন এই অনুবাদের কার্য আরম্ভ হইল, তখন শিশু বঙ্গভাষা প্রাচীন উপাদানগুলিকে অনেকটা নিজের ছাঁচে ঢালিয়া লইয়া, নিজের প্রকৃতির অনুযায়ী করিয়া লইতে সচেষ্ট হইল। দেব-ভাষার অতিরঞ্জনস্ফীত, অলংকার-মুখর, শব্দৈশ্বর্যভারাক্রান্ত বর্ণনাগুলিকে কতকটা কাটিয়া-ছাঁটিয়া, কতকটা সংযত করিয়া, বঙ্গভাষা আপনার মধ্যে গ্রহণ করিল; বাস্তবতার চিহ্নগুলিকে স্ফুটতর করিয়া প্রাচীন উপাখ্যান-সমূহকে আপন সামাজিক অবস্থার সহিত মিলাইয়া লইতে চেষ্টা করিল; প্রাচীন সমাজের চরিত্রগুলির মধ্যে আধুনিক বর্ণযোজনা ও রস-সঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে বাঙ্গালীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য প্রদান করিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতে এইরূপ রূপান্তরের, এইরূপ ভাবগত গভীর পরিবর্তনের, এমন কি সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টিরও অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। তরণীসেন-বধ ও

চন্দ্রকেতু-বিষয়া উপাখ্যান এইরূপে রন্ধ্রে রন্ধ্রে বঙ্গদেশের বিশেষ ভাবমাধুর্য দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া, বাঙ্গালীর ভক্তি-রস ও সুকুমার স্নেহ দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া, আমাদের বাস্তব-জীবনের একটি পৃষ্ঠায় রূপান্তরিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসের অঙ্গদ-রায়বার নামক সর্গে আমাদের বাঙ্গালীর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-রসিকতা, খাঁটি বাঙ্গালীর রহস্যরুচি সংস্কৃত সাহিত্যের অটল গাম্ভীর্যের মধ্যে এক অশোভন, বিসদৃশ চাপল্যের বেশে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সংস্কৃত সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া বঙ্গসাহিত্য ধীরে ধীরে বাস্তবতার পথে পদক্ষেপ করিয়াছে, ও পুরাতন উপাদানের মধ্যে নিজের বিশেষ প্রকৃতি ও রসবোধ ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে।

আবার অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও সংস্কৃতপ্রভাবমুক্ত বঙ্গসাহিত্যে এই বাস্তবতার ধারা আরও প্রবল ও অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের লৌকিক ধর্মসাহিত্য, ইহার চণ্ডী ও মনসার কাব্যে, বাস্তবচিত্রগুলি আরও স্ফুট ও প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে; ইহাদের অলৌকিক আখ্যানগুলি ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া কাব্যের অপ্রধান অংশে পরিণত হইয়াছে, ও কেবল অতীতের ধারার সহিত যোগসূত্র অক্ষুন্ন রাখিবার উপায়মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। দেবতা মানুষের অধীন হইয়াছেন—দেবকীর্তি-বর্ণনা উজ্জ্বল বাস্তব-চিত্রের নিকট নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। এই শ্রেণীর প্রধান কাব্য মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'তে, স্ফুটোজ্জল বাস্তব-চিত্রে, দক্ষ-চরিত্রাঙ্কনে, কুশল ঘটনাসন্নিবেশে, ও সর্বোপরি, আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্বন্ধ-স্থাপনে, আমরা ভবিষ্যৎকালের উপন্যাসের বেশ সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পাইয়া থাকি। মুকুন্দরাম কেবল সময়ের প্রভাব অতিক্রম করিতে, অতীত প্রথার সহিত আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিতে, অলৌকিকতার হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই বলিয়াই একজন খাঁটি ঔপন্যাসিক হইতে পারেন নাই। দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এযুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয়-মাত্র নাই।

(৫) রূপকথা, চৈতন্যচরিত গ্রন্থ ও ময়মনসিংহ-গীতিকা

আমাদের লৌকিক গল্প ও রূপকথার মধ্যেও উপন্যাস-সাহিত্যের বিস্ময়কর পূর্বসূচনা পাওয়া যায়। বাস্তবিক, প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে রূপকথাই ইহার অবাস্তবতা সত্ত্বেও উপন্যাসের দিকে সর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইয়াছে। অন্ততঃ দুইটি দিক্ দিয়া উপন্যাসের সহিত ইহার সাদৃশ্য বেশ স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। প্রথমতঃ, উপন্যাসের মতই ইহার আখ্যানভাগ ইহার সর্বপ্রধান বিষয়-বস্তু ও আকর্ষণ; ইহা একটি খাঁটি, অবিমিশ্র গল্প—ধর্মকাব্যের মত ইহার গল্পাংশটি শুধু কোন ধর্মতত্ত্ব-প্রমাণ বা দেবতার মাহাত্ম্য-কীর্তনের উপায়মাত্র নহে। দ্বিতীয়তঃ, ইহার মধ্যে যথেষ্ট অলৌকিকতা থাকিলেও, ইহার আকাশ-বাতাসে মায়া-মোহ-ইন্দ্রজালের একটি ঘন প্রলেপ থাকা সত্ত্বেও, একটু সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, লেখক ইহাতে মানুষের লৌকিক ও সামাজিক ব্যবহারেরই পরিণাম দেখাইয়া তাহারই উপর নিজ সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং মূলতঃ ঔপন্যাসিকেরও যে উদ্দেশ্য, রূপকথার লেখকেরও অনেকটা তাহাই; এবং ধর্মকাব্যকারের অপেক্ষা রূপকথাকার এই উদ্দেশ্য, আরও প্রত্যক্ষভাবে, আরও সরল ও প্রবলভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন

—ধর্মের কুহেলিকার মধ্যে ইহাকে বিশেষ ম্লান হইতে দেন নাই। মোট কথা, ধর্ম-কাব্যের সহিত তুলনায় রূপকথা ধর্মের অনধিকার-প্রবেশ হইতে অধিকতর মুক্ত; ও সেইজন্য খাঁটি আখ্যায়িকার গুণসমূহ ইহার মধ্যে প্রকটতর হইয়াছে। এই সমস্ত দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে উপন্যাসের সহিত ইহার নিকট সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না।

চৈতন্যদেবের চরিতগ্রন্থসমূহেও ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের সামাজিক জীবনের নির্ভর-যোগ্য বিবরণ মিলে। তাঁহার নিজের জীবনের ঘটনাগুলি অনেক সময়ে চরিতকারদের উচ্ছ্বসিত ভক্তি ও তাঁহার দেবত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাসের জন্য অলৌকিকত্বের রং মাখানো হইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর তৎকালীন সমাজের রীতি-নীতি, চাল-চলন, রুচি-আদর্শ, সাধারণ লোকের দৈনিক জীবন-যাত্রা, তীর্থপর্যটন, ধর্মবিষয়ক বিচার-বিতর্ক, প্রভৃতি বিষয়ের যে বিবরণ এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে সংকলন করা যায়, তাহা বাস্তবের সত্য প্রতিচ্ছবি। চৈতন্য-দেবের আবির্ভাব কেবল যে আমাদের ধর্মজীবনের নূতন অধ্যায় উদ্ঘাটন করিয়াছে তাহা নহে, আমাদের ঐতিহাসিক বোধকেও উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার জীবনের সহিত সম্পর্কিত তুচ্ছতম ঘটনাও সযত্নে লিপিবদ্ধ হইয়া বিস্মৃতি-বিলোপ হইতে রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার ভাব-সমৃদ্ধ জীবন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের প্রবল আগ্রহ অসংখ্য ভক্তকে মহাকাব্য, কড়চা, জীবনচরিত, নাটক, ধর্মব্যাখ্যা, প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থরচনায় প্রণোদিত করিয়াছে—সাহিত্যের মরাখাতে একটি কূলপ্লাবী জোয়ার আনিয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থে যে ঐতিহাসিক সত্য-নিষ্ঠার খাঁটি আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে তাহা নহে—ভক্তিপ্লাবনে বৈজ্ঞানিক আলোচনার সন্দেহপ্রবণ সতর্কতা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে! তথাপি এই ধর্মোন্মাদের প্রভাবে একটা ঐতিহাসিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী, প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট সংবাদ-সংগ্রহ ও যথাশক্তি তাহার সত্যতা যাচাই করিয়া ভবিষ্যৎ কালের জন্য লিপিবদ্ধ করিবার আগ্রহপূর্ণ প্রবণতা, সর্ব-প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণে ব্রতী ভক্ত ও অনুচরবর্গ নবদ্বীপ হইতে পুরী ও বৃন্দাবনে অবিরত গমনাগমনের দ্বারা যে পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই পথে ধ্যানমগ্ন ভক্তি-বিহ্বলতা ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি তথ্যানুসন্ধিৎসা হাত ধরিয়া পাশাপাশি যাত্রা করি-য়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস যত সর্বব্যাপী হইয়া পড়িল, ততই এই তথ্যানুরক্তি, অলৌকিকত্ব আবিষ্কারে উন্মুখ কল্পনা ও আপন আপন গোষ্ঠী-গুরুর মাহাত্ম্য-প্রচারাকাঙ্ক্ষী অন্ধভক্তির দ্বারা অভিভূত হইয়া, অতিরঞ্জন-স্ফীত কিংবদন্তীর পর্যায়ে অবনমিত হইল। কাজেই চৈতন্যোত্তর সাহিত্যে ইহা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

এই সম্পর্কে ময়মনসিংহের নিরক্ষর কৃষিজীবীর মুখ হইতে সংগৃহীত ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত অধুনা-বিখ্যাত ''ময়মনসিংহ-গীতিকা'র' নাম উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত গীতি-আখ্যায়িকার রচনাকাল ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক বলিয়া অনুমিত হয়। এই অনুমান ঠিক হইলে ইহাদের আবিষ্কার আমাদের সাহিত্যিক ক্রম-বিবর্তনের একটি লুপ্ত অধ্যায় পুনরুদ্ধার করিয়াছে। কৃত্তিবাস-কাশীদাস-মুকুন্দরামের যুগ ও ভারতচন্দ্রের যুগের মধ্যে যে একটি বৃহৎ ব্যবধান অনুভূত হয়, ময়মনসিংহ-গীতিকা তাহা পূরণ করিয়াছে। বাস্তব-রসপ্রধানতার দিক্ দিয়া মুকুন্দরামের নিঃসঙ্গ বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আমাদের যে ধারণা, তাহা এই সমস্ত রচনার দ্বারা খণ্ডিত ও বিশেষভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। ধর্মগ্রন্থ-প্রণয়নের

ফাঁকে ফাঁকে মুকুন্দরাম যে বাস্তব-রসধারা সঞ্চারিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি একেবারে একাকী নহেন, পরন্তু তিনি একটা নূতন সাহিত্যের ধারা প্রবর্তিত করেন, এবং এই বাস্তবতা-সৃষ্টিতে তাঁহার অনেক সহকর্মী ও অনুচর ছিল—এই তথ্য এই সমস্ত আখ্যায়িকার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদের শূন্যপ্রায় সাহিত্যিক মানচিত্রে ইহাদের দ্বারা অনেক নূতন নগর-গ্রামের অবস্থিতি চিহ্নিত হইয়াছে।

সুতরাং ইতিহাস-সংগঠনের দিক্ দিয়া ইহাদের মূল্য সামান্য নহে। ইহারা মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্রের ব্যবধানের উপর সংযোগ-সেতু নির্মাণ করিয়াছে, মুকুন্দরামের একটা বৃহৎ জ্ঞাতি-গোষ্ঠী-পরিবারের সন্ধান দিয়াছে ও ভারতচন্দ্রের কৃত্রিম-কারুকার্যপূর্ণ, তীব্রদ্যুতি-ঝলসিত রাজপ্রাসাদের ভিত্তিমূলে যে বাস্তব-জীবনের মৃত্তিকা-স্তর বিদ্যমান তাহা উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছে। আবার রূপকথার সহিতও ইহাদের একটা নিকট আত্মীয়তা আশ্চর্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। গীতি-আখ্যানের সহিত 'কাজল-রেখা' নামক রূপকথাটির একত্র সন্নিবেশ এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-রহস্যটি স্ফুটতর করিয়াছে। আমাদের সাহিত্যিক আকাশে নিশীথ-তারকার ন্যায় রূপকথার যে অপরূপ ফুল ফুটিয়াছে, এই আখ্যানগুলি তাহার বৃন্ত ও মূল; বাস্তব-জীবনের যে স্তর হইতে এই রূপকথা রস আহরণ করিয়াছে সেই বিস্মৃতপ্রায় প্রতিবেশের উপর ইহারা আলোক-পাত করিয়াছে। আকাশের সুদূর কুহেলিকাচ্ছন্ন নক্ষত্রটিও আমাদের সংসার-যাত্রার শত-প্রয়োজন-চিহ্নিত মৃৎ-প্রদীপরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। রূপকথার নাম-গোত্রহীন, রহস্যাবগুণ্ঠিত অস্তিত্বের জন্মস্থান-নির্ণয় হইয়াছে ও বংশ-পরিচয় মিলিয়াছে। কয়লা ও হীরকখণ্ড যেমন মূলতঃ অভিন্ন, তেমনি বাস্তবতামূলক করুণ উৎপীড়ন-কাহিনী ও রূপকথার অবাস্তব দৈব-সংঘটন একই প্রতিবেশ-প্রভাব ও মনোবৃত্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তি।

এই সাদৃশ্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা কতকটা প্রতিক্রিয়া ও কতকটা সমধর্মত্বমূলক। বাস্তবের কঠোর অভিঘাত দৈবানুকূল্যের প্রতি একটা করুণ লোলুপতা জাগায় ও পাতালপুরীর অবাস্তব ঐশ্বর্যের স্বপ্ন দেখিতে প্রণোদিত করে। যেখানে অত্যাচার শত বাহু বিস্তার করিয়া কণ্ঠ চাপিয়া ধরিতে চায়, সেখানে মানুষ অনুকূল দৈবের অতর্কিত প্রসাদলাভ কল্পনা করে। ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখা উপহাসের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্বমূলক গূঢ় সত্যও নিহিত আছে। সেইজন্যই ময়মনসিংহ-গীতিকায় যে প্রতিবেশের পরিচয় মেলে, তাহার মধ্যে খুব স্বাভাবিক কারণেই রূপকথা জন্মলাভ করিয়াছে। উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগের উৎপীড়নমূলক নিরোধই রূপকথার সূতিকাগার।

আর একদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে এই উভয় প্রকার রচনাকে সমধর্মী বলিয়া মনে হইতে পারে। যথেচ্ছাচারমূলক শাসন-পদ্ধতি ও জীবন-যাত্রার মধ্যেই দৈবের অতর্কিত আবির্ভাবের প্রচুরতম অবসর। অত্যাচারীর কবল হইতে উদ্ধার-লাভের মধ্যেই দৈবানুগ্রহ আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। যেখানে প্রাত্যহিক জীবনে বজ্রপাতের মত বিপদ্ আসিয়া পড়ে, সেখানে খুব স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই অপ্রত্যাশিত উদ্ধার অনুকূল দৈবশক্তির ইঙ্গিত দেয়। যেখানে রাক্ষস-খোক্কসের ছড়াছড়ি, সেইখানেই শুকসারীর মুখ দিয়া বিপন্মুক্তির রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। যে দুশমন কাজী মলুয়াকে তাহার স্বামী-বক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে,

অদৃষ্টচক্রের খুব স্বাভাবিক আবর্তনে সে শূলে প্রাণ দিয়া ভগবানের নিগূঢ় ন্যায়নীতির মহিমা ঘোষণা করিয়াছে। কমলা উৎপীড়নের নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রে গৃহত্যাগিনী হইয়া দৈবপ্রসাদের ন্যায়ই 'মৈষাল বন্ধু' ও রাজকুমারের দর্শন পাইয়াছে। যে ঝঞ্ঝাবাত গৃহের নিরাপদ্ বেষ্টনী হইতে টানিয়া বাহির করে, তাহাই আবার পথিক-জীবনের নিরাশ্রয়তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য মিলাইয়া দেয়,—পথে বাহির হইলেই ঘর-ছাড়া রত্ন কুড়াইয়া পায়। 'মলুয়া' গল্পটির মধ্যে রূপকথার লক্ষণ সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকট; যে 'মন-পবনের নাও'-এ চড়িয়া নায়িকা নিরুদ্দেশ-যাত্রা করিয়াছে, তাহা রূপকথার অতল সমুদ্রে পাড়ি দিতেই অভ্যস্ত।

বাহ্য অভিভবের বাহ্য উপশম আছে, অনুকূল দৈব দুর্দৈবের প্রতিষেধক। কিন্তু আভ্যন্তরীণ সমাজপীড়নের কোনও সুলভ সমাধান নাই। যে সামাজিক সংকীর্ণতা মলুয়ার সুখের পথে শেষ অন্তরায় হইয়াছে তাহার প্রতিবিধান দৈবেরও ক্ষমতাতীত। কাজীর শূলের ব্যবস্থা হইল, কিন্তু দুর্বলচিত্ত চান্দবিনোদ বা তাহার আচারমূঢ় আত্মীয়-স্বজনের জন্য সেরূপ কোন আশুফলপ্রদ প্রতিকারের ব্যবস্থা নাই। কারকুনকে নরবলি দিয়া আখ্যায়িকা হইতে বিদায় দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু অর্থ-লোভী আত্মীয়াধম ভাটুক ঠাকুরের আসন সমাজবক্ষে স্থিরতর রহিয়াছে। অত্যাচারী কাজী, দেওয়ান, প্রভৃতি প্রবল প্রতিক্রিয়ার বেগে জ্যা-নির্মুক্ত ধনুকের ন্যায় দূরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু নেতাই কুটনী, চিকণ গোয়ালিনী, প্রভৃতি জীব, যাহারা অপরের লালসার বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়া আসিতেছে ও পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি-পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে, তাহারা চিকিৎসাতীত দুষ্ট ব্রণের ন্যায় সমাজ-দেহে অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছে। এই দিক্ দিয়া বর্তমান কালের সমাজ-জীবনের সহিত ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের একটা অক্ষুণ্ণ যোগ-সূত্র রহিয়া গিয়াছে।

এই বাস্তব উপাদানের প্রাচুর্যের জন্যই উপন্যাস-সাহিত্যের অগ্রদূতের মধ্যে ময়মনসিংহ-গীতিকার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। আখ্যায়িকাগুলির মধ্যে তৎকালীন সমাজের যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা আংশিক হইলেও বাস্তবতার দিক্ দিয়া একেবারে নিখুঁত। কি প্রকৃতি-বর্ণনা, কি রূপ-বর্ণনা ও চরিত্র-চিত্রণ—সর্বত্রই এই অকুণ্ঠিত বাস্তবতার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। সংস্কৃত-প্রভাবে অনুপ্রাণিত বঙ্গসাহিত্যের ভিতর দিয়া আমরা বঙ্গ-সমাজ ও প্রকৃতির যে চিত্র পাই, তাহা ঠিক খাঁটি জিনিসটি নয়, তাহার মধ্যে দেব-ভাষার সংশোধন ও পরিমার্জন-চেষ্টা যেন বিশেষভাবে প্রকট। সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল শাল্মলীতরু, বা তমালতালীবনরাজিনীলা সমুদ্র-বেলাভূমি, এমন কি বৈষ্ণব সাহিত্যের কেলিকদম্বকুঞ্জ—ইহারা কেহই বাঙ্গালার বহিঃ-প্রকৃতির খাঁটি প্রতীক নহে—ইহাদের মধ্যে একটা ভাবমূলক আদর্শবাদ নিছক বস্তুতন্ত্রতার চারিদিকে একটি সুষমাময় বেষ্টনী রচনা করিয়াছে। যুগব্যাপী অনুকরণের ফলে এইরূপ প্রকৃতি-বর্ণনা বৈশিষ্ট্যহীন প্রথাবদ্ধতায় দাঁড়াইয়াছে। সেইরূপ মনে হয় যেন পৌরাণিক আদর্শ আমাদের অন্তঃ-প্রকৃতিকে প্রভাবান্বিত করিয়া ইহার স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ-লীলাকে এক বিশেষ ছন্দের নিগড়ে নিয়মিত করিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার অন্তর-বাহিরের আসল স্বরূপটি চিনিতে হইলে আমাদিগকে সংস্কৃত-প্রভাব-নির্মুক্ত পল্লী-সাহিত্যের দিকে চোখ ফিরাইতে হইবে। আমাদের বহিঃ-প্রকৃতির মধ্যে যেমন একটা অসংস্কৃত আরণ্য উগ্রতা, ঘন-বিন্যস্ত তরুলতার দুর্ভেদ্য জটিলতা, খাল-বিল-জলাভূমি-পার্বত্যনদীর দুর্লঙ্ঘ্য বাধা-সংকুলতা আছে, সেইরূপ আমাদের অন্তরেও নম্র কমনীয়তা ও ধর্মানুরাগের সহিত একটা দুর্দমনীয় তেজ-

ম্বিতা, দৃপ্ত আত্মসম্মান-বোধ ও আবেগের অন্ধ মাদকতা ছিল। আমাদের ধমনীতে যে অনার্য রক্ত প্রবাহিত ছিল, তাহাই আর্য সভ্যতা ও ধর্ম-সংস্কৃতির প্রভাব উল্লঙ্ঘন করিয়া এইরূপ উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ময়মনসিংহ-গীতিকায় আমরা এই আরণ্য বহিঃ-প্রকৃতি ও অন্তঃ-প্রকৃতির সাক্ষাৎ পাই, যাহা বঙ্গসাহিত্যের অন্যত্র সুদুর্লভ। ইহার নায়িকারা শাস্ত্রের অনুশাসন-বাহুল্যের দ্বারা বিড়ম্বিত না হইয়া সতীত্বের আসল মর্যাদা ও গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, দেশাচার লঙ্ঘন করিয়া নিজ হৃদয়বাণীর অনুবর্তন করিয়াছেন। ইঁহাদের অন্তরের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ শাস্ত্রানুশীলনের শান্তিবারি-সেচনে একেবারে স্তিমিত-নির্বাপিত হইয়া যায় নাই। ইঁহাদের চরিত্রদৃঢ়তা ও দুঃসাহসিকতা ইঁহাদিগকে অসাধারণ গৌরবমণ্ডিত করিয়াছে।

নায়িকাদের চরিত্র-চিত্রণের ন্যায় তাহাদের রূপ-বর্ণনাতেও গতানুগতিকতাহীন বাস্তবতার নিদর্শন পাওয়া যায়। যে সমস্ত উপমার সাহায্যে তাহাদের সৌন্দর্য স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, সেগুলি সমস্ত সংস্কৃত কাব্য-অলংকার-সাহিত্য হইতে সংগৃহীত নহে; লেখকদের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-শক্তি বাঙ্গালার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি হইতে সেগুলির অধিকাংশকে আহরণ করিয়াছে। তাঁহাদের চক্ষুর স্বাভাবিক গতি বাঙ্গালার নিজস্ব বহিঃ-প্রকৃতির দিকে; আখ্যায়িকার ফাঁকে ফাঁকে প্রকৃতির এই অপযাপ্ত আরণ্য-সম্পদ্ উঁকি মারিয়া আমাদের সৌন্দর্যবোধকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে। পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষাও এই বাস্তবতাকে আরও তীব্রতর করিয়াছে—ভাষার তীক্ষ্ণ, অকুণ্ঠিত সরলতা গভীর ভাবপ্রকাশকে বেদনা-মাধুর্যে পূর্ণ করিয়াছে। নায়িকাদের শোকোচ্ছ্বাস গ্রাম্য কথ্য ভাষার সংযোগে একেবারে আমাদের মর্মস্থল স্পর্শ করে, সাহিত্যিক ভাষার অলংকার-শিঞ্জন হৃদয়-বাণীর অকৃত্রিম সুরটিকে চাপা দেয় নাই। এই সমস্ত দিক্ দিয়াই ময়মনসিংহ-গীতিকা উপন্যাস-সাহিত্যের উৎপত্তির সহিত ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কান্বিত। বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যের আর কোথাও অবিমিশ্র বাস্তবতার এমন তীক্ষ্ণ, তীব্র আত্মপ্রকাশ দেখা যায় না। আখ্যায়িকাগুলির কোথাও কোথাও অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ বা দেবকীর্তি-প্রচারের প্রয়াস আছে। কিন্তু মোটের উপর যে মনোবৃত্তির প্রাদুর্ভাব, তাহা অকৃত্রিম বাস্তব-প্রীতি, তীক্ষ্ণ পযবেক্ষণ-শক্তি, প্রতিবেশের ও সমাজ-আবেষ্টনের নিখুঁত চিত্রাঙ্কন। ভাব-প্রকাশে কথ্য ভাষার প্রয়োগ ইহাদিগকে উপন্যাসের আরও নিকটবর্তী করিয়াছে। পল্লী-সাহিত্যের ধারা যদি আমাদের সাহিত্যে অক্ষুণ্ণ থাকিত, গ্রামের অখ্যাত আবেষ্টন ও অশিক্ষিত গায়কের সংস্পর্শের পরিবর্তে ইহা যদি কেন্দ্রস্থ সাহিত্যের পদমর্যাদা লাভ করিত, ভারতচন্দ্রের বিকৃত, কুরুচিপূর্ণ প্রভাব যদি আমাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে কৃত্রিম প্রণালীতে প্রবাহিত না করিত, তবে সম্ভবতঃ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের জন্ম-দিন আরও অগ্রবর্তী হইত। উপন্যাস-সাহিত্যের পূর্ব-সূচনার দিক্ দিয়া ময়মনসিংহ-গীতিকার প্রয়োজনীয়তা সর্বথা স্বীকার্য।

(৬) মুসলমানী গল্প-সাহিত্য

ইংরেজী সাহিত্যের সহিত পরিচয় হইবার পূর্বে বঙ্গসাহিত্য বাস্তবতার পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, ও ভাবী উপন্যাসের আগমনের জন্য আপনাকে কতদূর প্রস্তুত করিয়াছিল, আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়া তাহার উপসংহার করিব। ইংরেজী সাহিত্যের সম্পর্কে আসিবার পূর্বে বঙ্গসাহিত্য আর একটি বৈদেশিক সাহিত্যের সংস্পর্শ লাভ করিয়াছিল—

তাহা মুসলমান-সাহিত্য। মুসলমান-সাহিত্যের গল্পভাণ্ডারও নিতান্ত দরিদ্র ছিল না। 'আরব্য উপন্যাস', 'হাতেম তাই', 'লায়লা-মজনু', 'চাহার-দরবেশ', 'গোলে-বকাওলি', প্রভৃতি আখ্যায়িকা-গুলি নিশ্চয়ই বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে এক অচিন্তিতপূর্ব রহস্য ও সৌন্দর্যের জগৎ উন্মুক্ত করিয়াছিল। কিন্তু এই সমস্ত আখ্যায়িকা যে বঙ্গসাহিত্যের উপর কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, পরবর্তী সাহিত্য সে সাক্ষ্য দেয় না। এই বৈদেশিক গল্পগুলি রাজনৈতিক প্রতি-কূলতা, সামাজিক বিরোধ ও রুচিগত অনৈক্যের সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া যে বাঙ্গালী পাঠকের মর্মস্থল স্পর্শ করিতে পারিয়াছিল, তাহা মনে হয় না। বাঙ্গালী পাঠক সম্ভবতঃ ইহার সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল সৌন্দর্য ও অপরিচিত সমাজ-ব্যবস্থাকে অনেকটা সন্দেহ ও বিরোধের চক্ষে দেখিয়াছিল, ও ইহার সম্মোহন প্রভাব হইতে নিজেকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। তথাপি ইহার প্রভাব একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থতালিকা খুঁজিলে দেখা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, যখন ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শে আমাদের উপন্যাস-সাহিত্য ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল, এবং মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে ও অনুবাদের কল্যাণে বৈদেশিক সাহিত্য-সম্ভার আমাদের সাহিত্য-শালায় জমা হইতেছিল, তখন এই শ্রেণীর মুসলমানী গল্পের অনুবাদ আমাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার একটা প্রধান অঙ্গ হইয়াছিল। উহারা কিয়ৎ পরিমাণে পাঠকের হৃদয় স্পর্শ বা রুচি আকর্ষণ করিতে না পারিলে, আমাদের সাহিত্যিক উদ্যমের একটা মুখ্য অংশ কখনই উহাদের অনুবাদের প্রতি নিয়োজিত হইতে পারিত না। অন্ততঃ এই সমস্ত গল্পের মধ্যে যে একটা চমকপ্রদ (sensational), বর্ণ-বহুল romance, একটা নিয়ম-সংযমহীন সৌন্দর্য-বিলাসের অপরিমিত প্রাচুর্য আছে, তাহাই আমাদের একশ্রেণীর পাঠকের ধর্মশাস্ত্রস্বাদক্লিষ্ট, অবসাদগ্রস্ত রুচিকে অনিবার্য বেগে আকর্ষণ করিয়াছিল। এই আকর্ষণ যে নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় ইহাদিগকে আত্মসাৎ করিবার জন্য, ইহাদিগকে নিজের বেশ-বর্ণে রূপান্তরিত করিবার জন্য বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় নাই। বর্তমান উপন্যাসের মধ্যে যে এই ধারা রক্ষিত হইয়াছে, তাহারও বিশেষ কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। তবে ইহার অব্যবহিত-পরবর্তী যুগে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-ঘটিত ও মুসলমানী মায়া-ইন্দ্রজাল-বেষ্টিত যে এক প্রকারের ছদ্ম-ঐতিহাসিক (pseudo-historical) উপন্যাসের আবির্ভাব হয়, তাহার সহিত বোধ হয় ইহাদের কতকটা সম্বন্ধ থাকিতে পারে। পরবর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাসে দিল্লী-আগ্রার রাজসভার মণি-মাণিক্য-দীপ্ত ঐশ্বর্য বা মুসলমান রাজা-বাদশাহের খামখেয়ালী অস্থিরমতিত্ব বর্ণনায় ঐতিহাসিক সত্য ও এই কাল্পনিক আখ্যায়িকা-জগতের প্রেরণা কি পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করা সহজ নহে। মোটের উপর ইহাই বঙ্গসাহিত্যের উপরে মুসলমানী গল্পের প্রভাবের একমাত্র নিদর্শন।

ইংরেজী উপন্যাসের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত হইবার পূর্বে বঙ্গসাহিত্যে বাস্তবতার ধারা কতখানি প্রবাহিত হইয়াছিল, ও উপন্যাসের পূর্বলক্ষণ ইহাতে কতটা পাওয়া যায়, এ পর্যন্ত তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল। প্রাচীন ও মধ্য-যুগের সাহিত্য হইতে বাস্তব-রস-সিক্ত জীবনের খণ্ডাংশগুলি পৃথক্ করিয়া তাহাদিগকে উপন্যাসের দিকে অগ্রসরণের চিহ্ন বলিয়া ধরিয়া লওয়াতে কেহ কেহ আপত্তি করিতে

পারেন। কিন্তু একটু ভাবিলেই দেখা যাইবে যে, এ আপত্তি বিশেষ মারাত্মক নহে। ইহা নিশ্চিত যে, যে-সমস্ত ধর্মশাস্ত্র, কাব্যগ্রন্থ ও গল্প-আখ্যায়িকা হইতে এই সমস্ত বাস্তবতার চিহ্নাঙ্কিত অংশ বাছিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাদের লেখকদের মধ্যে কাহারও উপন্যাস লিখিবার কল্পনা ছিল না, বা উপন্যাস বলিয়া যে সাহিত্যের একটা দিক্ আছে, তাহারও অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা অজ্ঞ ছিলেন। তথাপি এই বাস্তব অংশগুলিকে উপন্যাসের পূর্বলক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। গল্প বলিবার ও শুনিবার প্রবৃত্তি মানুষের একটি স্বাভাবিক ধর্ম; এবং এই সর্বদেশসাধারণ গল্পের মধ্যেই উপন্যাসের মৌলিক বীজ নিহিত ছিল। এই গল্প বলিবার বিশেষ একটি ভঙ্গীকে—গল্পের মধ্য দিয়া মানুষের প্রকৃত জীবনের ছবি আঁকিবার চেষ্টা, ঘটনা-সংঘাতে তাহার চরিত্রস্ফুরণের উদ্‌যোগ, সামাজিক মানুষের মধ্যে যে অহরহঃ একটা আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহারই সূক্ষ্ম আলোচনা, ও এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়া মনুষ্য-জীবন সম্বন্ধে একটা বৃহত্তর, ব্যাপকতর সত্যকে ফুটাইয়া তোলা—ইহাকেই উপন্যাস বলা যাইতে পারে। সুতরাং যেখানেই গল্পের মধ্য দিয়া—তা সে গল্প যে উদ্দেশ্যেই লিখিত হউক না কেন—বাস্তবের প্রতি আকর্ষণের কোন লক্ষণ দেখা গিয়াছে, সাধারণ রক্তমাংসের নরনারীর চিত্র অস্পষ্ট ছায়া-রেখাতেও চারিদিকের কুহেলিকা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে, সেখানেই উপন্যাসের মৌলিক বীজের দর্শন লাভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সাহিত্যিক ক্রমবিকাশের ইহাই সাধারণ নিয়ম। বিশেষতঃ আমাদের ন্যায় ধর্ম-প্রধান, বাস্তবতাবিমুখ, পরমার্থপর সাহিত্যে, যেখানে সমগ্র পার্থিব ব্যাপারকে মরীচিকার ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্র হইতে নিশ্চিহ্নভাবে মুছিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, যেখানে উচ্চতর ধর্মের নামে আমাদের প্রকৃত জীবনের ভাষার নির্মমভাবে কণ্ঠরোধ করা হইয়াছে, সেখানে এই সমস্ত অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ বাস্তব-চিত্রেরও মূল্য ও ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা আরও বেশি। অন্ততঃ এইগুলিই আমাদের উপন্যাস-রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য যথাসম্ভব আয়োজন; বাস্তবতার দিকে এইটুকু প্রবণতা লইয়াই আমরা ইংরেজী উপন্যাসের পদাঙ্ক অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এই আয়োজনের পর্যাপ্ততার উপরেই আমাদের নিজের উপন্যাস-সাহিত্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নির্ভর করিয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়ে এই ধার-করা উপন্যাস-সাহিত্য আমরা কতদূর আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছি, কতদূর ঘনিষ্ঠভাবে ইহাকে আমাদের সামাজিক জীবনের কেন্দ্রস্থলের সহিত যোগ করিতে পারিয়াছি, তাহাই আলোচিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপন্যাসের উদ্ভব ও প্রথম যুগের সামাজিক উপন্যাস

(১)

ইংরেজী উপন্যাসের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পূর্বে বঙ্গসাহিত্য বাস্তবতার পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল ও উপন্যাসের আগমনের জন্য আপনাকে কতখানি প্রস্তুত করিয়াছিল, পূর্ব অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে ইংরেজী উপন্যাসের সহিত পরিচয়ের ফলে বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের কিরূপে আবির্ভাব হইল ও তৎকালীন সমাজের পরিস্থিতি কিরূপ ছিল, তাহার কিছু আলোচনা করিতে হইবে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ হইতে ইংরেজী শিক্ষা-সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর মনে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালীর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষানুরাগের বিচ্ছিন্ন ও অনিয়মিত, স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রিত স্ফুরণকে সুসংবদ্ধ, কেন্দ্র-সংহত রূপ দিল। কিন্তু তাহারও পূর্বে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালী-সমাজে একটা অভূতপূর্ব আলোড়ন চলিতেছিল। রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম ইংরেজের সহিত সম্পর্ককে ব্যবসায়িক বা অর্থনৈতিক ভিত্তি হইতে বুদ্ধি ও মননশক্তিগত ভিত্তিতে উন্নয়ন করিয়া এক বিপ্লবকারী পরিবর্তনের সূচনা করিলেন। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, বাঙ্গালী কেবল ইংরেজদিগের বাণিজ্য বা সাম্রাজ্য-বিস্তারের বাহন মাত্র নহে—ইংরেজদের শিক্ষা-সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদ তিনিই সর্বপ্রথম আমাদের সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক আলোচনায় প্রয়োগ করিয়া বাঙ্গালীর সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়া দিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম ও আচারকে একদিকে খৃষ্টান মিশনারীদের অযথা আক্রমণ ও অপরদিকে গোঁড়া রক্ষণশীলদের অন্ধ ও মূঢ় বাৎসল্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে মনোভাব অবলম্বন করিলেন, যে স্বাধীন চিন্তা, দৃঢ় যুক্তিবাদ ও তীক্ষ্ণ বাস্তববোধের প্রয়োগ করিলেন, তাহাতেই বঙ্গদেশের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎ চিরকালের জন্য নিরূপিত হইল।

এই বাদ-প্রতিবাদের কোলাহল-মুখর, উত্তেজিত প্রতিবেশে উপন্যাসের জন্ম হইল। দীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া অনুসৃত ধর্মানুষ্ঠান ও আচার-ব্যবহার যখন আক্রমণের বিষয়ীভূত হয়, তখন আলোচনার ধারা যুক্তিতর্কের মন্থর প্রণালী ছাড়াইয়া হৃদয়াবেগের বেগবান্ প্রবাহের সহিত সংযুক্ত হয়—তথ্যবিচার সাহিত্যপদবীতে উন্নীত হয়। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষের মার্জিত দীপ্তি ও শাণিত তীক্ষ্ণতা এই মানস উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ যুক্তিতর্কের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যালোকস্পৃষ্ট বর্ষাফলকের মত ঝলকিত হয়। এই শ্লেষপ্রধান মনোভাব ক্রমশঃ আশু-প্রয়োজনীয়ের সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়াইয়া নিরপেক্ষভাবে সমস্ত সমাজ-জীবনের উপর বিস্তৃত হয়। সমাজ-জীবনের ব্যাধি-বিকার, আতিশয্য-অসঙ্গতির প্রতি মন সহসা

সচেতন হইয়া উঠে—এই নব-জাগ্রত দেবতার জন্য বলি খুঁজিয়া বেড়ায়। সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার শ্লেষাত্মক পর্যবেক্ষণ ও ইহার হাস্যোদ্দীপক, বিসদৃশ দিকগুলির ব্যঙ্গচিত্র-অঙ্কন উপন্যাসরচনার অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্তর।

(২)

এই সময়ে (১৮১৮) সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা কিছুদিন ধরিয়া মনোমধ্যে সঞ্চিত শ্লেষ-প্রবণতাকে অভিব্যক্তির ক্ষেত্র ও প্রেরণা যোগাইল। সংবাদপত্রের সহিত উপন্যাসের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। উপন্যাসের প্রথম খসড়া সংবাদপত্রের স্তম্ভেই রচিত হইয়াছে। খবরের কাগজের সম্পাদক পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য দেশের মধ্যে যাহা কিছু বিচিত্র, কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটিতেছে তাহা সংগ্রহ ও সরবরাহ করিতে সচেষ্ট থাকেন। নানারকমের উড়ো পাখী—আজগুবি খবর, অপ্রত্যাশিত ও চমকপ্রদ ঘটনা, যাহা মনকে নাড়া দেয় ও হাস্য-কৌতুকের সৃষ্টি করে—এই সাংবাদিক বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় বাসা বাঁধে। নানাবিধ সামাজিক সমস্যার লঘু, সরস আলোচনা, নানা বিরুদ্ধ মতবাদের সংঘর্ষ, প্রতিপক্ষের কুৎসা-রটনা ও তাহার দুর্নীতির নানা মুখরোচক উদাহরণ ইহাকে বাস্তব জীবনের সত্য ও উপভোগ্য প্রতিচ্ছবির মর্যাদা দেয়। সংবাদপত্রের দর্পণে সমাজ নিজ বহিরবয়ব ও মনোবাসনার নিখুঁত প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়।

বাস্তব জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবিগুলি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া, ঘটনার ধারাবাহিকতা ও শিল্পী-মনের সচেতন উদ্দেশ্যের সহিত যুক্ত হইয়া, এক সম্পূর্ণ। অন্তঃ-সংগতি-বিশিষ্ট কাল্পনিক চিত্রে সংহত হয়। ইহাই সজ্ঞান উপন্যাস-সৃষ্টির প্রথম অঙ্কুর। শ্রেণীবিশেষের জীবনের বিচ্ছিন্ন অধ্যায়গুলি কিরূপে কাল্পনিক চরিত্রের সমগ্রতায় পরিণত হইল, তাহার প্রথম দৃষ্টান্ত পাই ১৮২১ খৃঃ অঃ 'সমাচারদর্পণ'-এ "বাবু" চরিত্র আলোচনায়। সম্পাদক তাঁহার কাগজের দুইটি সংখ্যায়—২৪এ ফেব্রুআরী ও ৯ই জুন—১৮২১—বড়লোকের আদুরে-গোপাল, শিক্ষা-চরিত্রহীন ছেলের জীবনযাত্রা ও মতিগতির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছেন। এই তিলকচন্দ্র উপন্যাস-জগতের প্রায় আধুনিককাল পর্যন্ত প্রসারিত বাবু-বংশের আদিপুরুষ। ইনি মোসাহেব-মণ্ডলে পরিবেষ্টিত ও আত্মাভিমানপুষ্ট হইয়া, বাহ্য আড়ম্বরে অন্তরের অন্তঃসারশূন্যতা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়া, নানা হাস্যকর অসংগতির সৃষ্টি করিয়াছেন ও লেখকের বিদ্রূপ-বাণবিদ্ধ হইয়া পাঠকের শিক্ষাবিধান ও মনোরঞ্জনের দ্বৈত-উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় হইয়াছেন। এই আদি 'বাবু'র চরিত্রে দুঃশীলতা ও ব্যসন-বিলাস অপেক্ষা মোসাহেব-মহলে প্রতিপত্তি বজায় রাখার প্রচেষ্টার প্রতি বেশি জোর দেওয়া হইয়াছে।

(৩)

ইহার পর দুই বৎসর পরে (১৮২৩ খৃঃ অঃ) প্রকাশিত প্রমথনাথ শর্মার রচিত 'নববাবু-বিলাস' প্রথম উপন্যাসের গৌরব দাবী করে। প্রমথনাথ শর্মা "সমাচার-চন্দ্রিকা" ও "সংবাদ-কৌমুদী" পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক ও নিষ্ঠাবান্ হিন্দুসমাজের মুখপাত্র, ধর্মসভার কার্যাধ্যক্ষ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছদ্ম-নাম। সম্ভবতঃ ইনিই 'সমাচার-দর্পণ'-এ প্রকাশিত তিলকচন্দ্রের জীবন-কাহিনীর সংকলয়িতা। এই অনুমান সত্য হইলে 'নববাবু-বিলাস' 'সমাচার-দর্পণ'-এর "বাবু" কাহিনীর পরিবর্ধিত সংস্করণ—প্রথম মৌলিক পরিকল্পনার অপেক্ষাকৃত পল্লবিত বিস্তার।

ইহাতে বাবু-জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতাচার, খেয়ালী অস্থিরমতিত্ব, সৌজন্য ও সুরুচির অভাব, বাল্যকালে হিতকর শাসন-সংযমের উল্লঙ্ঘন ও পরিণামে দুর্গতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু লেখকের প্রধান লক্ষ্য ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রস্ফুরণ নহে, সমস্ত সমাজ-প্রতিবেশের চিত্রাঙ্কন। বাবু অপেক্ষা যে সমাজে বাবুর উদ্ভব তাহার প্রতিই তাঁহার মনোযোগ বেশি।

এই সময়ের কলিকাতা-সমাজে যে বিলাস ও ব্যভিচারের স্রোত বহিয়া গিয়াছে, তাহার সহিত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার যে খুব প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল, তাহা মনে হয় না। যে 'বাবু' এই সমাজের বিশিষ্ট সৃষ্টি, তিনি ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষার বিশেষ ধার ধারেন না। 'নববাবু-বিলাসে'র ৩৫ বৎসর পরে রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল-এর (১৮৫৭). নায়ক মতিলাল শেরবোর্ণ সাহেবের স্কুলে কিছুদিন যাতায়াত করিয়াছিল, কিন্তু কয়েকটা ইংরেজী শব্দ ও কিছু ইংরেজী হাব-ভাব ও চাল-চলন শিক্ষা ব্যতীত তাহার বিদ্যা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। কাজেই ইহাদের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাকে ঠিক দায়ী করা যায় না। এই দিক্ দিয়া ইহাদের সহিত পরবর্তী যুগের হিন্দু কলেজে শিক্ষিত, ইংরেজী আচার-ব্যবহারের সত্যকার অনুরাগী, সমাজবিদ্রোহী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত, নিজ মতবাদের জন্য দুঃখবরণে প্রস্তুত, দৃঢ়চেতা যুবকসম্প্রদায়ের প্রভেদ। মতিলাল ও মাইকেল মধুসূদনের মুখে হয়ত একই রকমের বুলি, তাহাদের বিলাতী খানাপিনা ও সুরার দিকে সাধারণ প্রবণতা—কিন্তু মানস আদর্শের দিক্ দিয়া ইহারা সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়।

আসল কথা, বাবু সমাজের অমিতাচারের জন্য দায়ী ইংরেজী শিক্ষা বা নৈতিক আদর্শ নহে, ইংরেজী বাণিজ্যের প্রসার। এই যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যের সহিত প্রথম সম্পর্ক স্থাপনের ফলে দেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির একটা ক্ষণস্থায়ী জোয়ার আসিয়াছিল। বাঙ্গালী বেনিয়ান এদেশে ইংরেজের পণ্যদ্রব্য প্রচলিত করিয়া ও ইংরেজের বাণিজ্য-বিস্তারের জন্য কাঁচামাল যোগাইয়া তাহাদের বিপুল লাভের কিছু কিছু অংশ পাইতেছিল। এই অপ্রত্যাশিত ধনাগমের অহংকারে স্ফীত হইয়া এই বৈদেশিক-প্রসাদপুষ্ট ব্যক্তিগুলি এক নূতন অভিজাত সম্প্রদায় গঠন করিতেছিল। কেহ দালালি করিয়া, কেহ নিমক-মহালের ইজারা লইয়া, কেহ বা ইংরাজের রাজস্ব-সংগ্রহ-ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া ইংরেজের সৌভাগ্যলক্ষ্মী যে স্বর্ণপদ্মের উপর আসীনা হইয়াছিলেন, তাহার দুই একটা পাপড়ি নিজ ধনভাণ্ডারে সঞ্চয় করিতেছিল। এই সময়ে কলিকাতার বনিয়াদি পরিবারবর্গের অভ্যুদয়ের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইল। মহানগরী সমুদ্র-গর্ভোত্থিতা ঐশ্বর্যদেবীর ন্যায় আকাশস্পর্শী অট্টালিকাশ্রেণীতে নিজ সমৃদ্ধির দীপ্তি প্রতিফলিত করিয়া জন্মলাভ করিল। সমস্ত শহরের আকাশে-বাতাসে একটা আনন্দ ও উত্তেজনার তরঙ্গ প্রবাহিত হইল। উচ্ছ্বসিত প্রাণস্রোত, আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস-ব্যসন—ব্যঙ্গবিদ্রূপ-প্রহসনের নানা উদ্ভাবনে, চড়কের গাজনে, বারোয়ারি উৎসবে, কবির লড়াই-এ, সুরা-সংগীতের উন্মত্ত ভোগলিপ্সায়—বিজয়-অভিযানে নির্গত হইল। অখ্যাত ক্ষুদ্র পল্লীসমষ্টি রাজধানীতে রূপান্তরিত হইয়া রূপের উজ্জ্বলতায়, লক্ষ লক্ষ নবাগত জনসংঘের সম্মিলিত হৃৎস্পন্দনে, বিরাট ঐক্যের সচেতনতায় যেন নব-যৌবনের দৃপ্ত শক্তিমত্ততায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই আশা ও সীমাহীন সম্ভাবনার পুলকোৎফুল্ল প্রতিবেশে বাবুর উদ্ভব। সে যেন জীবনোৎসবের এই ফেনিল, মত্ত বিক্ষোভের প্রথম স্বল্পায়ু রঙীন বুদ্বুদ। আর পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এই উদ্দাম, অসংস্কৃত জীবন-

প্রবাহের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির উগ্র উন্মাদনা, বিদ্রোহী নীতিবোধ ও নিগূঢ় সৌন্দর্যানুভূতির সহিত যুক্ত হইয়া এক উচ্চতর সৃষ্টির বীজ বপন করিবে—বাবুর স্থূল ভোগবিলাস কবি ও সমাজ-সংস্কারকের সূক্ষ্মতর জীবনরসোপভোগে পরিবর্তিত হইবে। 'নববাবু-বিলাস' (১৮২৩), প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৭) ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোমপ্যাঁচার নক্সা' (১৮৬২)—এই তিনখানি উপন্যাসে বাবু-চরিত্র ও বাবু-প্রসূতি সমাজ-জীবন আলোচিত হইয়াছে। 'নববাবু-বিলাসে'র কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 'হুতোমপ্যাঁচার নক্সা' ঠিক উপন্যাস নহে—নবপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতা নগরীর উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত আমোদ-উৎসবের বিচ্ছিন্ন খণ্ড-চিত্রের ও সরস ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনার শিথিল-গ্রথিত সমষ্টি। ঐশ্বর্যের নূতন জোয়ারে নাগরিক জীবনযাত্রায় যে সমস্ত উদ্ভট অসংগতি ও রুচিবিকারের দৃষ্টান্ত, ফূর্তি-ইয়ার্কির নূতন নূতন প্রকরণ, উপভোগের যে মত্ত আতিশয্য ভাসিয়া আসিয়াছে, লেখক তাহাদের উপর তীব্র-শ্লেষপূর্ণ কশাঘাত করিয়া নিজ পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা, প্রাণশক্তির প্রাচুর্য ও ভাঁড়ামির পর্যায়ভুক্ত অমার্জিত রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। এই বিশৃঙ্খল, প্রাণবেগচঞ্চল দৃশ্যগুলির মধ্যে কোন ব্যক্তিত্ব-সমন্বিত চরিত্র সৃষ্ট হয় নাই—সুতরাং উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ চরিত্র-চিত্রণেরই ইহাতে অভাব।

(৪)

এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে 'আলালের ঘরের দুলাল'ই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সমধিক উপন্যাসের লক্ষণ-বিশিষ্ট। এই শ্রেষ্ঠত্ব—বাস্তব বর্ণনা, চরিত্র-চিত্রণ ও মননশীলতা—সমস্ত দিকেই পরিস্ফুট। ইহাতে যে বাস্তব প্রতিবেশের চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা 'নববাবু-বিলাস' ও 'হুতোম'-এর সঙ্গে তুলনায় গভীরতর স্তরের। প্রথমোক্ত দুইটি গ্রন্থে কেবল হাল্‌কা ফূর্তির উপযোগী পটভূমিকা—গাজনতলা, কবির আসর, রাস্তার জনপ্রবাহ ও বেশ্যালয়—বর্ণিত হইয়াছে। 'আলাল'-এর প্রতিবেশ আরও পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যবহুল, জীবনের নানামুখীনতাকে অবলম্বন করিয়া রচিত। ইহাতে কেবল রাস্তাঘাটের কর্মব্যস্ততা ও সজীব চাঞ্চল্য নাই, আছে পারিবারিক জীবনের শান্ত ও দৃঢ়মূল কেন্দ্রিকতা, আইন-আদালতের কৌতূহলপূর্ণ কার্যপ্রণালী, নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজ-শাসনের যে সুকল্পিত বহির্ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ব্যক্তিজীবনের গতিচ্ছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া আনিতেছে, তাহার সম্পূর্ণ চিত্র। চরিত্রাঙ্কনে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব আরও সুপ্রকট। মানুষ যে ঘটনা-প্রবাহে ভাসমান খড়কুটা মাত্র নয়, তাহার ব্যক্তিত্ব যে নদীতরঙ্গ-প্রহত পর্বতের ন্যায় কম্পিত হইলেও স্থানভ্রষ্ট হয় না—ইহাতে চরিত্র-চিত্রণের এই আদর্শই অনুসৃত হইয়াছে। বাবুরাম বাবু নিজে, তাঁহার গৃহিণী ও কন্যাদ্বয়, মতিলাল ও তাহার দুষ্ক্রিয়ার সহযোগিবৃন্দ—ইহারা সকলেই ঘটনা-তরঙ্গে গা ভাসাইলেও এই তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত জলকণা মাত্র নহে—ইহারা জীবন্ত, ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষ, 'বাবু'র ন্যায় চর্মের ক্ষীণ আবরণে ঢাকা কঙ্কাল, বা শ্রেণীর প্রতিনিধি মাত্র নহে। তাছাড়া, লেখকের পরিকল্পনায় এমন একটা সাবলীল সজীবতা আছে, যাহাতে ঘটনার সহিত পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট মানুষগুলি আরও অধিক পরিমাণে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঠকচাচা উপন্যাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত সৃষ্টি; উহার মধ্যে কূটকৌশল ও স্তোকবাক্যে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার অসামান্য ক্ষমতার এমন চমৎকার সমন্বয় হইয়াছে যে, পরবর্তী উন্নত শ্রেণীর উপন্যাসেও ঠিক এইরূপ সজীব চরিত্র মিলে না। বেচারাম, বেণী, বক্রেশ্বর, বাঞ্ছারাম প্রভৃতি চরিত্রও—কেহ বা অনুনাসিক উচ্চারণে, কেহ বা সংগীত-প্রিয়তায়, কেহ বা কোন

বিশেষ বাক্য-ভঙ্গীর পুনরাবৃত্তিতে—স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছে। এই বাহ্য বৈশিষ্ট্যের উপর ঝোঁক ও ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জন-প্রবণতায় (caricature) প্যারীচাঁদ অনেকটা ডিকেন্সের প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। কেবল রামলাল ও বরদাবাবু চরিত্র-স্বাতন্ত্র্যের দিক্ দিয়া ম্লান ও বিশেষত্ববর্জিত, কতকগুলি সদ্‌গুণের যান্ত্রিক সমষ্টি মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। কৃত্রিম সাহিত্য-রীতি বর্জনে ও কথ্য ভাষার সরস ও তীক্ষ্ণাগ্র প্রয়োগে 'আলাল'-এর বর্ণনা ও চরিত্রাঙ্কন আরও বাস্তবরস-সমৃদ্ধ হইয়াছে।

'আলালের ঘরের ঢুলাল'ই বোধ হয় বঙ্গভাষায় প্রথম সম্পূর্ণাবয়ব ও সর্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস। প্যারীচাঁদের অন্যান্য পুস্তকগুলি—'মদ খাওয়া বড় দায়,' 'অভেদী', 'আধ্যাত্মিকা' প্রভৃতি—অল্প-বিস্তর উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত; তাহারা সম্পূর্ণ উপন্যাস নয়, কেবল উপন্যাসের কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদের সমষ্টি মাত্র। কিন্তু তাঁহার ভাল-মন্দ সমস্ত রচনার মধ্যে বাস্তবতার সুরটি এতই তীব্র ও নিঃসন্দিগ্ধভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, বাস্তবের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা এতই বেশি যে, তাহারা এই হিসাবে বঙ্গসাহিত্যে প্রকৃতই অতুলনীয়। দীনবন্ধু মিত্রের দুই একটি নাটক ছাড়া বঙ্গসাহিত্যে আর কাহারও রচনায় বাস্তবজীবনের খাঁটি অবিমিশ্র রসটি এত সুপ্রচুর ও অজস্র ধারায় প্রবাহিত হয় নাই। প্যারীচাঁদের রচনায় এই বাস্তবরস রোমান্সে রূপান্তরিত হয় নাই, উচ্চ আদর্শের (idealisation) কৃত্রিম প্রণালীতে সঞ্চারিত হইয়া ইহার স্রোতোবেগ মন্দীভূত হয় নাই, বিশ্লেষণের দ্বারা ইহা ক্ষুণ্ণ ও প্রতিহত হয় নাই; ইহা আপনার আদিম ও স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে শতসহস্র ধারায় বহিয়া চলিয়াছে, আপনাকে শোধিত, সংস্কৃত ও উচ্চতর আর্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবার কোন চেষ্টাই করে নাই। অবশ্য ইহা যে একটি অবিমিশ্র গুণ তাহা বলিতেছি না, কিন্তু এই বাস্তব-প্রবণতা বঙ্গসাহিত্যে এতই দুর্লভ সামগ্রী যে, ইহা স্বতঃই আমাদের বিস্ময় ও প্রশংসা আকর্ষণ করে।

নূতন ও পুরাতনের যে বিরোধের চিত্র সমসাময়িক উপন্যাসে প্রতিফলিত হইয়াছে, সেই বিরোধের আলোচনায় প্যারীচাঁদ মিত্র আশ্চর্য অপক্ষপাত বিচারবুদ্ধি দেখাইয়াছেন। নব্য-যুগের নূতন সভ্যতার প্রতি তিনি যথেষ্ট সুবিচার করিয়াছেন; তাঁহার সমসাময়িক অন্যান্য ঔপন্যাসিকের ন্যায় ইহাকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্বেষ ও সন্দেহের চক্ষে দেখেন নাই। সেইরূপ পুরাতন প্রথা ও আচার-ব্যবহারের মধ্যে যাহা কিছু শোভন, সুযুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণীয় তাহাকেও তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিতই বরণ করিয়া লইয়াছেন। আবার ইংরেজী শিক্ষার প্রবল বন্যায় মদ্য-পান, নাস্তিকতা, গুরুজনে অভক্তি, প্রভৃতি যে সমস্ত আবর্জনারাশি ও পঙ্কিলতা আমাদের সমাজে প্রবেশ করিতেছিল, তাহাদের উপরেও তিনি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি খড়গহস্ত ছিলেন পুরাতন দলের ভণ্ডামি ও সংকীর্ণতার উপর—ইহা-দিগকেই তিনি সর্বাপেক্ষা অমার্জনীয় অপরাধ মনে করিতেন, এবং ইহাদেরই উপর তাঁহার তীক্ষ্ণতম বিদ্রূপাস্ত্র বর্ষিত হইয়াছে। হিন্দুজাতির সনাতন নীতিজ্ঞান তাঁহার মধ্যে যথেষ্ট প্রবল ছিল, এবং সময়ে সময়ে একটু অশোভন তীব্রতার সহিতই আত্মপ্রকাশ করিত। তাঁহার 'আলালের ঘরের ঢুলাল' ও অন্যান্য খণ্ড-উপন্যাসে এই নীতিজ্ঞান, এই ধর্ম ও সুরুচির পক্ষ-পাতিত্ব, কলাকুশলতার দিক্ হইতে সমর্থনযোগ্য না হইলেও, ধর্মভাবের দিক্ হইতে বিশেষ প্রশংসনীয়। অবশ্য এই নীতিজ্ঞানপূর্ণ মন্তব্যসমূহ যে উপন্যাসের উৎকর্ষ বর্ধন করে

তাহা নহে, তবে তাহারা লেখকের ধর্মপ্রবণ ও তত্ত্বান্বেষী চিত্তের একটি সম্পূর্ণ চিত্র প্রদান করে।

স্থতরাং 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ আমরা লেখকের মননশীলতার পরিচয় পাই—ইংরেজী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ, অপক্ষপাত মনোভাবে, ইহার কুফলের প্রতি অন্ধ না হইয়া ইহার স্থফলের প্রতি সচেতনতায়, লেখকের সমন্বয়কারী, চিন্তাশীল দৃষ্টি-ভঙ্গীতে। রামলাল ও বরদাবাবু এই নূতন শিক্ষা পদ্ধতির শ্লাঘ্যতম ফল; তাহাদের উদার ক্ষমাশীলতা, পরদুঃখ-কাতরতা ও উন্নত নৈতিক আদর্শ অবশ্য সনাতন ধর্মসংস্কৃতির বিরোধী নহে; তথাপি এই সমস্ত সদ্‌গুণ ও স্থকুমার বৃত্তি, যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে সমাজে শিথিলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রচুরতর স্থযোগ-স্থবিধা স্বষ্টি হইতেছিল, তাহার সহিতই প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট।

এতদ্‌ব্যতীত প্যারীচাঁদ মিত্র ভাষা-সংস্কারের মধ্য দিয়াও নিজ তীক্ষ্ণ মননশক্তি ও স্বাধীন-চিত্ততার পরিচয় দিয়াছেন। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের সংস্কৃত-বহুল, গুরুগম্ভীর ভাষার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সরল ও সতেজ কথ্য ভাষা সাহিত্যে প্রথম প্রবর্তনের কৃতিত্ব তাঁহারই। উপন্যাসরচনার জন্য যতটা না হউক, ভাষাসংস্কার-প্রচেষ্টার জন্যই বিশেষভাবে তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়তা অর্জন করিয়াছেন।

উপন্যাস-হিসাবে 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর স্থান সম্বন্ধে আলোচনা সম্পূর্ণ করিবার পূর্বে ইহার ত্রুটি ও অপূর্ণতার কতকটা আভাস দেওয়ার প্রয়োজন। 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম পূর্ণাবয়ব উপন্যাস এবং বাস্তবরসে বিশেষ সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাকে খুব উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে স্থান দিতে পারা যায় না। কেবল বাস্তব চিত্রাঙ্কন, বা জীবন-পর্যবেক্ষণই উচ্চ অঙ্গের উপন্যাসের একমাত্র গুণ নহে। বাস্তব উপাদানগুলিকে এরূপভাবে সাজাইতে হইবে, যেন তাহাদের কার্যকারণ-পরম্পরার মধ্য দিয়া জীবনের জটিলতা ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে একটা গভীর ও ব্যাপক ধারণা পাঠকের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে, মানব-হৃদয়ের গভীর সনাতন ভাবগুলি যেন তাহাদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বাহ্যঘটনার উপরেও একটা অচিন্তিত-পূর্ব গৌরব-মুকুট পরাইয়া দিতে পারে। উচ্চ অঙ্গের উপন্যাসের ইহাই কৃতিত্ব। যে উপন্যাস কেবল বাস্তববর্ণনাতেই পর্যবসিত, যাহা দৈনিক তুচ্ছতার উপর কল্পলোকের রঙ্গিন আলোক ফেলিতে পারে না, যাহা আমাদের সাধারণ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঐশ্বর্যপূর্ণ অনুভূতির নিগূঢ় লীলা দেখাইতে পারে না, তাহার স্থান অপেক্ষাকৃত নীচে। এই কারণে 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের সহিত একাসনে স্থান পাইবার অনুপযুক্ত। আরও একটি কারণ ইহার উৎকর্ষের বিরোধী। প্রত্যেক উচ্চ অঙ্গের উপন্যাসে motive অথবা উপন্যাস-বর্ণিত ঘটনার মৌলিক কারণটি সূক্ষ্ম ও গভীর হওয়া চাই; কেবল বাহ্যঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে উচ্চ অঙ্গের উপন্যাস স্বষ্ট হইতে পারে না। যে কারণে Goldsmith-এর 'Vicar of Wakefield' প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না—কেন না ইহা একটি অচল, অটল ধর্মপরায়ণতার প্রতিমূর্তির বিরুদ্ধে বাহ্য বিপদ্‌রাশির নিষ্ফল আক্রমণ মাত্র—সে কারণেই 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস-জগতে খুব উচ্চ আসন অধিকার করিতে পারে না। ইহাতে যে সংঘাতটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বাহিরের জিনিষ—অন্তর্জগতের গভীরতর সংঘাতের কোন চিহ্ন ইহাতে পাওয়া যায় না। কুসঙ্গের জন্য আদুরে ছেলের পদস্খলন, এবং বিপদের ও সৎসঙ্গের

ফলে তাহার নৈতিক পুনরুদ্ধার ইহার বর্ণনীয় বস্তু, ইহাতে অন্তর্বিপ্লবের কোন পরিচয় দিবার সুযোগ নাই। মতিলালের অনুশোচনা ও সংশোধন বহির্ঘটনার চাপে, অন্তরের প্রেরণায় নহে। পরবর্তী যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' বা 'গোবিন্দলাল'-এর চরিত্রে যে অন্তর্বিপ্লবের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে এখানে তাহার আভাস মাত্র নাই। সুতরাং 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা উপন্যাসের পথ-প্রদর্শক মাত্র, ইহার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ হইবার স্পর্ধা রাখে না। পরবর্তী যুগের উচ্চতর স্তরের উপন্যাসের সঙ্গে ইহার ব্যবধান বিস্তর। তথাপি, অতীতের সহিত তুলনায় ইহার উৎকর্ষ সহজেই বোধগম্য হয়। 'নববাবু-বিলাস' হইতে মাত্র ৩৫ বৎসরের ব্যবধানে 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ প্রথম সম্পূর্ণাবয়ব উপন্যাসের বিবর্তন বহু দিনের প্রত্যাশিত সম্ভাবনাকে সার্থক রূপ দিয়াছে। 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস-সাহিত্যের কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া প্রথম অনিশ্চয়াত্মক যুগের অবসান ও আসন্ন পূর্ণ-পরিণতির ঘোষণা করে। ইহার মাত্র ৮ বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে উপন্যাসের মহিমান্বিত, প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল যৌবনের আরম্ভ।

(৫)

'আলালের ঘরের দুলাল'-এ ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবের যে স্তর চিত্রিত হইয়াছে তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ হইতে উনবিংশের প্রথম পাদ (১৭৭৫-১৮২৫)—এই অর্ধ শতাব্দীর সত্য প্রতিচ্ছবি। প্যারীচাঁদ মিত্রের নিজের যুগে এই প্রভাব সমাজ-জীবনে আরও ব্যাপক, বদ্ধমূল ও সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়াশীল হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার নিগূঢ় উন্মাদনা সমাজের মর্মস্থল পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া ইহার গভীরতর রূপান্তর-সাধনে ব্যাপৃত ছিল। পরবর্তী যুগের উপন্যাসে সমাজের এই নব-জীবনস্পন্দন, এই নবীন আদর্শের অনুপ্রেরণা সাহিত্যিক প্রতিভার উদ্‌বোধন করিয়াছে। ইংরেজী সাহিত্য ও উপন্যাসের সহিত যখন আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল, তখন আমাদের মধ্যে স্বভাবতঃই অনুকরণস্পৃহা প্রবল হইল ও আমাদের নিজের সমাজ ও পরিবারের মধ্যে উপন্যাসের উপযোগী উপাদান আমরা খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। তখন সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যাহা আমাদের দৃষ্টি সর্বাপেক্ষা বেশি আকর্ষণ করিল, তাহা ইংরেজী সভ্যতার সহিত সংস্পর্শ-জনিত আমাদের সমাজ ও পরিবারের মধ্যে একটা তুমুল বিক্ষোভ ও আন্দোলন। এই বিক্ষোভ ও আন্দোলনই আমাদের নব-উপন্যাস-সাহিত্যের প্রথম এবং প্রধান উপাদান হইয়া দাঁড়াইল। ইংরেজী সভ্যতার তীব্র মদিরা তখন নব্য-বঙ্গ-সমাজে একটা উৎকট উন্মাদনা জাগাইয়া তুলিয়াছে; বাঙ্গালী যেন দীর্ঘকালব্যাপী জড়তা ও অবসাদের পর একটা নূতন জীবনস্পন্দন অনুভব করিয়াছে, ও একটা নূতন আদর্শের সন্ধান পাইয়া দিগ বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য হইয়া তদভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। সনাতন বন্ধনসকল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; পুরাতন নৈতিক ও সামাজিক বিধিনিষেধগুলি তাহাদের পূর্বপ্রভাব হারাইয়াছে। পরিবারে পরিবারে একদিকে বিদ্রোহের উৎকট অভিব্যক্তি, অন্যদিকে গুরুজন-অভিভাবকদিগের মধ্যে একটা বিস্ময়বিমূঢ়, হতবুদ্ধি ভাব; যেন পুরাণধর্মশাস্ত্রবর্ণিত, অনাচারময় ম্লেচ্ছযুগ আসিয়া পড়িয়াছে, যেন তাঁহাদের সম্মুখে নরকের দ্বার সহসা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। বিস্ময়ের প্রথম মোহ কাটিয়া গেলে, বয়স্কদের এই হতবুদ্ধি, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব

একটা বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষে রূপান্তরিত হইল ; এবং তরুণ বিদ্রোহীদের দার্ঢ্য ও অহংকার প্রাচীনদের এই বিদ্বেষ ও বদ্ধমূল কুসংস্কারের পাষাণপ্রাচীরে প্রতিহত হইয়া ঘরে ঘরে একটা তুমুল অশান্তি ও খণ্ডবিপ্লব জাগাইয়া তুলিল। আমাদের বঙ্গসাহিত্যে যখন উপন্যাসের প্রথম আবির্ভাবের সূচনা হইল, তখন সমাজ ভাবী ঔপন্যাসিকের সম্মুখে এই বিদ্রোহ ও বিপ্লবের চিত্রখানি তুলিয়া ধরিল,—এবং আমাদের প্রথম যুগের উপন্যাসগুলি এই বিক্ষোভকেই নিজ বর্ণনার বিষয় করিয়া লইয়াছে।

অবশ্য ইহা সত্য নহে যে, এই বিদ্রোহের উন্মাদনা ও আবেগ আমাদের প্রথম যুগের উপন্যাস-সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। যাহারা বিদ্রোহের পতাকা লইয়া সমাজ ও পরিবারের বন্ধন কাটিয়া বাহির হইয়াছিল, বঙ্গসাহিত্যের চর্চা করা বা নিজেদের অভিজ্ঞতার বিষয় লইয়া উপন্যাস লেখা তাহাদের কল্পনাতেও আসে নাই। এই বিদ্রোহী তরুণদলের মধ্যে দুই একজন ভবিষ্যৎ জীবনে দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে সাহিত্য-সেবাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন বটে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বোধ হয় অনুকূল-দৈবপ্রেরিত হইয়াই তাঁহার সমস্ত বিজাতীয় আচার-ব্যবহারের মধ্যে তাঁহার মনঃকোকনদে দেশীয় সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ-মধু গোপনে সঞ্চয় করিতেছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর ন্যায় কেহ কেহ-বা পরিণত বয়সে আত্মজীবনকাহিনী লিখিয়া তাঁহাদের তরুণ-জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি একটা স্নেহ-বিদ্রূপ-মণ্ডিত কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই প্রবল ভাবাবেগ উপন্যাসে প্রতিফলিত করার কথা কাহারও মনে হয় নাই। পক্ষান্তরে অভিভাবক-গুরুজনেরাও বিপথগামীদের সুমতির জন্য দেবতার দ্বারে মাথা ঠুকিয়া শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁহাদের মনের গভীর বেদনাকে উপন্যাসের মধ্যে অভিব্যক্ত করার কথা তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

[কিন্তু যুধ্যমান উভয়পক্ষের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও এই বিরোধের কাহিনী ধীরে ধীরে উপন্যাসের বর্ণনীয় বস্তু হইয়া উঠিতেছিল। বিরোধের প্রথম উগ্রতা কাটিয়া গেলে, বাঙ্গালার ঔপন্যাসিকেরা ইহার উপন্যাসের বিষয়বস্তু হইবার উপযোগিতা ক্রমশঃ স্পষ্টতরভাবে আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। আমাদের একান্ত বৈচিত্র্যহীন ও বিধিবদ্ধ জীবনযাত্রার মধ্যে, নীরস দৈনন্দিন কার্যের ঘন-সন্নিবেশের অবসরে যে কোন প্রকারের সতেজ জীবনস্পন্দন, কোন গভীর ভাবের গোপন প্রবাহ ধরা যাইতে পারে, ইহা আমাদের প্রথম যুগের ঔপন্যাসিকদের অজ্ঞাত ছিল। কাজেই তাঁহারা আমাদের জীবনের মধ্যে একটা বাহ্য-ঘটনাবৈচিত্র্যের জন্য একেবারে উন্মুখ হইয়াছিলেন। অন্তর্জগতে বাহ্যঘটনার একান্ত অভাবের মধ্যেও যে একটা নীরব ঘাতপ্রতিঘাত চলিতে পারে, একটা গভীর ভাবগত আলোড়নের সম্ভাবনা আছে, তাহা এই বর্তমান সময়ে মাত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শ আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিল, তাহা আমাদের জীবনের ঘটনাবৈচিত্র্যের অভাব কথঞ্চিৎ পূরণ করিয়া সহজেই ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বিশেষতঃ, এই ইংরেজী শিক্ষা, যাহাদিগকে প্রকাশ্য বিদ্রোহে উত্তেজিত করিতে পারে নাই, তাহাদের মধ্যেও পারিবারিক বৈষম্য গভীরতর করিয়া তুলিয়া তাহাদের জীবনেও একটা বৈচিত্র্য ও জটিলতার সঞ্চার করিয়াছিল। আমাদের দেশে পূর্বে যে সকল পরিবারেই রাম-লক্ষ্মণের আদর্শ সম্পূর্ণরূপে অনুসৃত হইত, বা একটা সার্বজনীন

সৌভ্রাত্র বিরাজিত ছিল, তাহা নহে; তবে আদর্শ ও জীবনযাত্রাপ্রণালীর ঐক্যের জন্য ভ্রাতৃবিরোধ তত প্রবল হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু নূতন সভ্যতার প্রবর্তনের পরে পরিবারের মধ্যে অবস্থা-বৈষম্য বিশেষভাবে প্রকট হইয়া পারিবারিক বিচ্ছেদের পথ প্রশস্ত করিতে লাগিল। সেইজন্যও এই সমস্ত পারিবারিক বিচ্ছেদের কাহিনী বিশেষভাবে উপন্যাসের পৃষ্ঠাগুলি অধিকার করিতে লাগিল।

আরও একটা কারণে এই সমস্ত বিষয় উপন্যাসের অঙ্গীভূত হইল। যে বিদ্রোহী দল প্রথম যৌবনের উন্মাদনায় সমাজ ও পরিবারের বন্ধন অস্বীকার করিয়াছিল, তাহারা অধিকাংশ স্থলেই সমাজের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে পারে নাই। প্রথম উচ্ছ্বাসের মুখে সামাজিক ও পরিবারিক যে সমস্ত দাবী তাহারা উপেক্ষা করিয়াছিল, পরবর্তী অবসাদের সময়ে সেই সমস্ত দাবী প্রবলতরভাবে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং এই স্বাধীনতাপ্রয়াসীরা হয় নিষ্ফল ক্ষোভে জীবন শেষ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, অথবা সমাজের সহিত একটা আপোষ-সন্ধি করিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়াছিল। এই প্রত্যাবর্তনের দৃশ্য, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে মনু-পরাশরের দিন হইতে যে নীতিবিদ্ পুরুষটি জাগ্রত আছেন তাঁহার পক্ষে, আমাদের শাশ্বত, অতন্দ্র নীতিজ্ঞানের পক্ষে পরম তৃপ্তিকর হইয়াছিল। এই অনাচারীদের পরাজয়ে আমাদের ঔপন্যাসিকেরা সনাতন-নীতি-লঙ্ঘনের অবশ্যম্ভাবী শাস্তি, পাপের অনিবার্য প্রায়শ্চিত্তই দেখিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের নৈতিকজ্ঞানের দিক্ দিয়াও এই বিরোধের চিত্র বিশেষ আদরণীয় বোধ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। আমাদের বর্তমান উপন্যাসের মধ্যেও ইংরেজী সভ্যতার সম্পর্কজনিত এই পারিবারিক বিপর্যয়ের চিত্র একটা প্রধান স্থান অধিকার করিতেছে; 'স্বর্ণলতা'র দিন হইতে নিতান্ত আধুনিক দিন পর্যন্ত এই ধারা আমাদের উপন্যাসক্ষেত্রে সমান প্রবলভাবে প্রবাহিত হইয়াছে, এবং অদূর ভবিষ্যতেও ইহার শুষ্ক হইবার বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস

(১)

পূর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে,'আলালের ঘরের দুলাল' ও পরবর্তী স্তরের উপন্যাসের (বঙ্কিম ও রমেশচন্দ্রের) মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান। কাল হিসাবে প্যারীচাঁদ, বঙ্কিম ও রমেশচন্দ্রের প্রায় সমসাময়িক। তাঁহার 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে) রমেশচন্দ্রের 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৫), 'জীবন-প্রভাত' (১৮৭৮) ও 'জীবন-সন্ধ্যা' (১৮৭৯), এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৬), 'ইন্দিরা,' 'যুগলাঙ্গুরীয়,' 'রাধারাণী' (১৮৭৭) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), প্রভৃতির পরে—প্রকাশিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উপন্যাসের পুরাতন ও নূতন আদর্শ উভয়ই একসঙ্গে বর্তমান ছিল; সময়ের দিক্ দিয়া ইহাদের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান ছিল না।। উপন্যাস-সাহিত্যে উচ্চতর আদর্শের এই অতর্কিত আবির্ভাব সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। সুতরাং এই পরিবর্তনের গভীরতা ও প্রকৃত রূপটি বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য।

এই নূতন উপন্যাসে আমরা প্রধানতঃ দুইটি পরিবর্তন লক্ষ্য করি: (১) উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম সূচনা ও পরিণতি; (২) বাস্তবতা-প্রধান সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসের মধ্যে এক নূতন গভীরতা ও ভাব-সমৃদ্ধির সঞ্চার। যেমন একবিন্দু শিশিরে বিশাল সূর্যের পরিধি প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ আমাদের তুচ্ছ দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে গভীর ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা মানব-জীবনের বিপুলতা ও বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হইয়াছে। আমরা 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর আলোচনার সময়ে, ইহার সমস্ত গুণ ও উপভোগ্য বাস্তব রসের মধ্যে, এই দ্বিতীয় বিষয়ে ত্রুটি ও অপূর্ণতা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। ইহার গল্পের মধ্যে কেবল একটি সংকীর্ণ ও সাধারণ ধর্মনীতির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়; জীবনের আবেগ ও উচ্ছ্বাস,ইহার বিশালতা ও রহস্যময়তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। 'আলালের ঘরের দুলাল' পড়িয়া আমরা জীবন-সমস্যার জটিলতা, জীবনের ভাবসমৃদ্ধি ও উদারতা সম্বন্ধে কোন ধারণা করিতে পারি না। ইহাতে কতকগুলি বাস্তব চরিত্রের, কতকগুলি রক্ত-মাংসের মানুষের সমাবেশ হইয়াছে সত্য; কিন্তু এই সমাবেশের দ্বারা লেখক জীবন সম্বন্ধে কোন বৃহৎ, ব্যাপক সত্য ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। নূতন যুগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে এই অভাব বিশেষভাবে পূর্ণ হইয়াছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম আবির্ভাবের তারিখ অনিশ্চিত।* ক্রমপরিণতির দিক্ দিয়া বোধ হয় ঐতিহাসিক উপন্যাসই সামাজিক উপন্যাসের পূর্ববর্তী। আমাদের বাস্তব-পর্যবেক্ষণ-শক্তি উপন্যাস-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিকশিত হইবার পূর্বেই আমরা ইতিহাসের কল্পনাময়, অনেকটা অবাস্তব রাজ্যে স্বচ্ছন্দগতিতে বিচরণ করিতেছিলাম। উপন্যাস-রচনার প্রাথমিক যুগে সামাজিক অপেক্ষা ঐতিহাসিক উপন্যাসই যে অধিকসংখ্যায় রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি সত্য ও কল্পনার,সাধারণ ও অসাধারণের, এমন কি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ; বাস্তব-জীবনের সহিত ইহাদের যোগসূত্র নিতান্ত ক্ষীণ,অদৃশ্যপ্রায়

---

* শ্রীযুক্ত কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচিত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭) এই শ্রেণীর উপন্যাসের প্রথম নমুনা। ইহার একটি আখ্যায়িকা 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়' শিবজীর সহিত আরংজেবের কন্যা রোসিনারার প্রেম-কাহিনী। ভারতবর্ষ, ১৩৪৯, বৈশাখ, দ্রষ্টব্য।

ছিল। উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে আদর্শ, ইহাদের মধ্যে তাহার একান্ত অভাব ছিল। বাস্তবিক, ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃত আদর্শ দুরধিগম্য; ইতিহাসের বিশাল সংঘটনের ছায়াতলে আমাদের ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের চিত্র আঁকিতে হইবে; দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার সহিত ঐতিহাসিক ঘটনার যোগসূত্রগুলির মধ্যে সম্পর্কটি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। একদিকে ইতিহাসের বিপুলতা, ঘটনাবৈচিত্র্য ও বর্ণ-সম্পদ্ ক্ষুদ্র প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে, অন্যদিকে আমাদের বাস্তব-জীবনের কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খল, সত্যের কঠোর বন্ধনের দ্বারা ইতিহাসের কল্পনা-প্রবণতা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে; এবং সর্বোপরি, উভয়ের মধ্যে মিলনটি সম্পূর্ণ ও অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিতে হইবে—যেন সমস্ত উপন্যাসটির আকাশ-বাতাসের মধ্যে একটা নিগূঢ় ঐক্য আনিতে পারা যায়।

আমাদের প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির কুহেলিকাময়,সত্য-কল্পনাজড়িত আকাশ-বাতাসের মধ্যে এই নিগূঢ় ঐক্যের সন্ধান একেবারেই মিলে না। ইহাদের ঐতিহাসিক উপাদান-গুলি অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অবাস্তব রকমের; ইতিহাস কেবল বাস্তবের কঠিন সত্য হইতে মুক্তি-লাভের একটা উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে; কেবল অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনাবাহুল্যের অবসর দিয়াছে মাত্র। ইহারা প্রকৃত ইতিহাসও নয়, প্রকৃত উপন্যাসও নয়। আমাদের দেশে প্রকৃত ইতিহাস-রচনা কোন কালে ছিল না, অতীত যুগের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন। অতীত যুগের মানুষের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য, আমাদের সঙ্গে তাহার আচার-ব্যবহার, আমোদ-প্রমোদের প্রভেদ, ইত্যাদি বিষয়ে কোন প্রকার সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের ঐতিহাসিকদেরই নাই, ঔপন্যাসিকদের ত কথাই নাই। অতীতের মানুষ যে আমাদেরই মত রক্ত-মাংসের জীব, আমাদের মত তাহাদেরও আশা-আকাঙ্ক্ষাজড়িত বাস্তব-জীবন ছিল, তাহারা যে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক তত্ত্বে নিমগ্ন থাকিয়া স্বপ্নময় জীবন অতিবাহিত করিত না, আমাদেরই মত তাহাদের জীবনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বিরোধী ভাবের আলোড়ন ছিল, তাহা আমরা স্পষ্টভাবে উপলব্ধিই করিতে পারি নাই। সুতরাং অতীতের দিকে যাত্রা আমাদের পক্ষে একটা নিতান্ত স্বপ্নপ্রয়াণ বা অন্ধকারের মধ্যে লম্ফপ্রদানের মতই হইয়াছে। ইতিহাসের সহিত বাস্তব-জীবনের একটা অন্তরঙ্গ মিলনের সংঘটন করাও ঔপন্যাসিকদিগের কলাকুশলতার অতীত ছিল। সুতরাং সব দিক্ দিয়াই এই প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিকে নিতান্তই ব্যর্থ প্রয়াসের নিদর্শন বলিয়া ধরিতে হইবে।

(২)

এই সমস্ত তথা-কথিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিষয়-বস্তু কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার জন্য আমাদের স্বভাবতঃই আগ্রহ হইতে পারে। বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থতালিকা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাই যে, ১৮৭৫ হইতে ১৮৮২।৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই জাতীয় অনেকগুলি উপন্যাসের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাদের বিষয়-বস্তুর পর্যালোচনা করিলেই তাহাদের অবাস্তবতা ও অনৈতিহাসিকতার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এই ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া কাব্য ও উপন্যাস দুই-ই রচিত হইয়াছে; এবং ইহাদের মধ্যে ভেদ-রেখা নিতান্তই সূক্ষ্ম বলিয়া বোধ হয়। মোট কথা, উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্য বা বিশেষত্ব সম্বন্ধে লেখকদের কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না; ইহা কাব্যেরই একটা শাখা বলিয়া বিবেচিত হইত, এবং কাব্যসুলভ কল্পনা-প্রবণতা ও অবাস্তবতা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইত।

এই শ্রেণীর উপন্যাসের দুই একটা উদাহরণ দিলেই তাহাদের স্বরূপ বুঝা যাইবে। বিনোদবিহারী গোস্বামী প্রণীত 'পূর্ণশশী' (১৮৭৫) কাশ্মীরের রাজপুত্রের সহিত উদাসিনী রাজকন্যার বিবাহের আখ্যান। ললিতমোহন ঘোষ প্রণীত 'অচলবাসিনী' (১৮৭৫) একজন হিন্দু দুর্গাধ্যক্ষের সহিত একটি মুসলমান মহিলার বিবাহবর্ণনা। হারাণচন্দ্র রাহা প্রণীত 'রণচণ্ডী' (১৮৭৬) কাছাড়ের ইতিহাস-মূলক গল্প, নবদ্বীপের রাজা কর্তৃক কাছাড় আক্রমণ ও তৎপরবর্তী ঘটনাসমূহের বিবরণ। 'চন্দ্রকেতু' (১৮৭৭) কেদারনাথ চক্রবর্তী প্রণীত—ইহার ঐতিহাসিকতা অপেক্ষাকৃত বেশী বলিয়া মনে হয়; যে জাতি তাহার অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ তাহার উন্নতি অসম্ভব—অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের এই উক্তির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত, ইহার উপাখ্যানভাগ বক্তিয়ার খিলিজি কর্তৃক বঙ্গবিজয় ও লক্ষ্মণসেনের রাজ্যচ্যুতির পর গোরাচাঁদ নামক একজন ছদ্মবেশী মুসলমান ফকির কর্তৃক বঙ্গের কিয়দংশের পুনরুদ্ধার। রাখালদাস গাঙ্গুলীর 'পাষাণময়ী' (১৮৭৯) আলিবর্দীর রাজত্বকালে বঙ্গে বর্গী আক্রমণের বর্ণনার সহিত মিশ্রিত প্রেম-কাহিনী। আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রণীত 'রাজকুমারী' (১৮৮০) বিক্রমপুরের একজন হিন্দু রাজার সহিত মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরবাসী একজন অনার্য রাজার যুদ্ধ-কাহিনী। হেমচন্দ্র বসু প্রণীত 'মিলন কানন' (১৮৮২) সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের একটি প্রেমাভিনয়ের বর্ণনা—জাহাঙ্গীর বুন্দির রাজকন্যার প্রেমপ্রার্থী ছিলেন, এই রাজকন্যা রাজ্যের প্রধান সেনাপতির প্রতি প্রণয়াসক্তা ছিলেন, অবশেষে নূরজাহানের প্রভাবে জাহাঙ্গীরের বিরতিও প্রেমিকযুগলের মিলন—ইহাই 'মিলন-কাননের' বর্ণনীয় বস্তু। নীলরতন রায়চৌধুরীর 'যাবনিক পরাক্রম' (১৮৮১) পেশোয়ার দেশে হিন্দু-মুসলমান-সম্পর্কিত প্রেমের বিবরণ। তারকনাথ বিশ্বাসের 'সুহাসিনী' (১৮৮২) মূলতঃ একটি পারিবারিক উপন্যাস। সুহাসিনী ও তাহার সখী নীরজা উভয়েই একটি যুবকের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী, নীরজা যুবকের প্রেমলাভে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া সুহাসিনীর সহিত তাহার বিচ্ছেদ জন্মাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই পারিবারিক উপন্যাসের মধ্যে সিরাজদ্দৌলাকে আনিয়া লেখক ইহাকে একটি ঐতিহাসিক বর্ণ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়েরও একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস ঐ গ্রন্থতালিকার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

(৩)

এই উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করিলেই ইহাদের ঐতিহাসিকতার দাবী কতদূর সমর্থন-যোগ্য তাহা জানা যাইবে। ইহাদের কতকগুলি কেবলমাত্র ইতিহাসের উপাখ্যানের উপরই প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কোন সংযোগ ইহাদের মধ্যে নাই। ইহারা যুদ্ধ, ধর্মবিরোধ ও রাজনৈতিক ঘটনা লইয়াই ব্যস্ত। এই সমস্ত প্রবল বিক্ষোভ সাধারণ মানুষের জীবনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, তাহার ক্ষুদ্র প্রাত্যহিক জীবনে কিরূপ বিপ্লব আনয়ন করে, কিরূপ প্রবল বন্যার বেগে তাহার সাংসারিক সুখ-দুঃখের উপর বহিয়া যায়, তাহার কোনই নিদর্শন দেয় নাই। সুতরাং প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে একটি প্রধান গুণ তাহা ইহাদের মধ্যে একেবারেই দুর্লভ। তারপর ইহাদের ঐতিহাসিক উপাখ্যানগুলিও প্রায় সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অবাস্তব, ইহাদের ইতিহাসের মধ্যেও যথেষ্ট মায়া-ইন্দ্র-জালের অবসর আছে। কাশ্মীরের রাজপুত্রের সহিত উদাসিনী রাজকন্যার বিবাহ; একজন ছদ্মবেশী মুসলমান ফকির কর্তৃক বঙ্গদেশ জয়—এই সমস্ত গল্প যেন রূপকথার অফুরন্ত ভাণ্ডার

হইতে সংগৃহীত বলিয়া মনে হয়। ইতিহাসের কঠোর দিবালোক অপেক্ষা কল্পলোকের রঙ্গিন আলোই যেন ইহাদের প্রকৃতির অধিকতর অনুগামী।

অপর কয়েকটি উপাখ্যান প্রকৃত ইতিহাস নহে, সম্ভাবিত ইতিহাসের কাল্পনিক রাজ্য হইতে গৃহীত, অর্থাৎ যে-সমস্ত ঘটনা প্রকৃতপক্ষে ঘটিয়াছিল, তাহা নহে,—যাহা ঘটিতে পারিত, যাহা ঘটা অসম্ভব ছিল না, তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত; নবদ্বীপের রাজার কাছাড় আক্রমণ বা বিক্রমপুরের রাজার সহিত পূর্বদেশবাসী কোন অনার্য রাজার যুদ্ধ এই অনিশ্চিত কাল্পনিক বা অজ্ঞাত ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত। এই বিষয়েও প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের সহিত ইহাদের প্রভেদ বেশ সুনির্দিষ্ট। স্কট বা অন্যান্য ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকের ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ সম্পূর্ণ ভিন্ন-প্রকৃতির। তাঁহারা সর্বজন-বিদিত, সুপরিচিত ঐতিহাসিক আখ্যানগুলিকেই আপনাদের উপন্যাসের অঙ্গীভূত করিয়াছেন। ক্রুসেড, স্যাক্সন ও নর্মানদের পরস্পর দ্বেষ ও জাতি-বিরোধ; রাজপক্ষ ও পার্লিয়ামেণ্ট-পক্ষীয়দের দ্বন্দ্ব-কাহিনী; বার্গাণ্ডির ডিউক চার্লসের সহিত ফ্রান্সের রাজা একাদশ লুই-এর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রভৃতি ইতিহাসবিশ্রুত ঘটনা সমূহই তাহাদের উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য প্রাচীন বা মধ্যযুগের বিবরণে তাঁহারা ইহাদের প্রকৃত স্বরূপটি, প্রাণের আসল স্পন্দনটি ধরিতে পারিয়াছেন কিনা সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কিন্তু তাঁহাদের বর্ণিত উপাখ্যানগুলির ঐতিহাসিকতা অবিসংবাদিত। এই বিষয়ে কিন্তু আমাদের ঔপন্যাসিকেরা যেন প্রাচীন পুরাণকার বা সংস্কৃত লেখকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। যেমন'রামায়ণ মহাভারত'-এ বা 'হিতোপদেশ','দশকুমার-চরিত' ও 'কাদম্বরী'-প্রমুখ সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যে আমরা সুপরিচিত স্থানসমূহের নাম—কাশী, কাঞ্চী, দাক্ষিণাত্য, গুর্জর, কাশ্মীর, প্রভৃতি দেশের—উল্লেখ পাইয়া থাকি, অথচ এই নামগুলিই তাহাদের বাস্তব-জগতের সহিত একমাত্র যোগ-সূত্র; সেইরূপ এই সমস্ত আধুনিক উপন্যাসে বাস্তবতা কেবল ঐতিহাসিক স্থানোল্লেখেই পর্যবসিত হইয়াছে—কাছাড়, কাশ্মীর, বিক্রমপুর, প্রভৃতি সুপরিচিত নামই তাহাদের বাস্তবতার একমাত্র চিহ্ন। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসের লক্ষণ ইহার মধ্যে একেবারেই নাই। কাশ্মীররাজ কাছাড়রাজ হইতে একেবারেই অভিন্ন. বিক্রমপুররাজ্যের সৈন্যের সহিত মেঘনাতীরবর্তী অনার্য রাজার সৈন্যের কোনই প্রভেদ দেখা যায় না। নামগুলি সম্পূর্ণ আকস্মিক-ভাবে, নিতান্তই যদৃচ্ছাক্রমে নির্বাচিত হইয়াছে। এমন কি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেও ভেদ-রেখা নিতান্তই অস্পষ্ট; বড় জোর হিন্দু অত্যাচারিত ও মুসলমান অত্যাচারী, পরস্পর পরস্পরের ধর্ম ও আচারদ্বেষী—এই পর্যন্ত পার্থক্য দেখান হইয়াছে; কোথাও হিন্দু ও মুসলমানকে কেবলমাত্র বিরোধী জাতির প্রতিনিধিভাবে না দেখিয়া, ব্যক্তিগতভাবে দেখা হয় নাই, এবং তাহাদের ব্যক্তিত্বসূচক গুণের কোনই বিশ্লেষণ হয় নাই। সুতরাং এই সমস্ত তথাকথিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা যে বিশেষ মূল্যবান্ নহে, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

এই ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে একটি তৃতীয় শ্রেণী পৃথক্ করা যায়। ইহারা ঐতি-হাসিক ঘটনার সহিত গার্হস্থ্য-জীবনের একটা সংযোগ ও সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বিপুল ঐতিহাসিক ঘটনার অন্তরালে যে আমাদের সাধারণ পারিবারিক জীবনের ক্ষীণস্রোত অবিচ্ছিন্ন-ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে,এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রের প্রবল প্রবাহ এই ক্ষীণস্রোতে সঞ্চারিত হইয়া ইহার গতিবেগ-বৃদ্ধি ও ইহাতে ঘূর্ণাবর্ত সৃজন করে তাহার কথঞ্চিৎ জ্ঞানের পরিচয় ইহাদের

মধ্যে পাওয়া যায়। অবশ্য এই তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসে আমরা যেটুকু গার্হস্থ্য বা পারিবারিক চিত্র অঙ্কিত দেখি তাহা প্রধানতঃ প্রেমবিষয়ক। এই প্রেম-কাহিনী নিতান্তই বিশেষত্ব-বর্জ্জিত ও প্রাণহীন; কেবল কতকগুলি প্রথাবদ্ধ আলংকারিক শব্দবিন্যাস ও নিতান্ত অর্থহীন উচ্ছ্বাসমাত্র। তাহার মধ্যে মানব-চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের বা প্রণয়ের উদ্দাম বেগের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রেম-কাহিনী হিসাবে এই সমস্ত উপন্যাসের কোন মূল্য নাই। ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত এই প্রেম-কাহিনীর সমন্বয়সাধনেও লেখকেরা বিশেষ কোন কৌশল দেখাইতে পারেন নাই। হয়ত কোন প্রবল-প্রতাপান্বিত সম্রাট্ কোন গৃহস্থ-ঘরের সুন্দরীর রূপমুগ্ধ হইয়া তাহাকে নিজ স্নেহচ্ছায়ামণ্ডিত গৃহকোণ হইতে, তাহার প্রণয়ভাজন পুরুষের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করিয়া তাহার শান্তিময় জীবনে একটি বিষাদময় জটিলতার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এরূপ স্থলে পরিণাম প্রায়ই হয় সম্রাটের আত্মসংবরণ ও অনুতাপ; না হয় নায়ক-নায়িকার আত্মহত্যা। অথবা কোনও কোনও স্থলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রণয়মিলন দেখাইয়া লেখক নিজ উপন্যাসের মধ্যে একটু নূতনত্ব আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন—প্রায়ই কোন উচ্চপদস্থ মুসলমান মহিলা হিন্দুবীরের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহার পায়ে নিজ জাত্যভিমান ও ধর্মগৌরব বিসর্জন দিয়াছেন। এইরূপ আকারেই ইতিহাস সাধারণ গার্হস্থ্য-জীবনের উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; সুতরাং সহজেই বুঝা যায় যে, এ সমস্ত ক্ষেত্রে ইতিহাসের সহিত প্রাত্যহিক জীবনের যোগসূত্র নিতান্ত ক্ষীণ। স্কটের উপন্যাসে যেমন ইতিহাস ও গার্হস্থ্য-জীবনের মধ্যে একটা নিগূঢ়, অন্তরঙ্গ ঐক্য, একটা প্রাণের যোগ আছে, গার্হস্থ্য-জীবন ইতিহাসের ক্ষেত্র হইতে যেমন আপন রসমাধুর্য ও আকার-বৈচিত্র্য টানিয়া লইয়াছে, এখানে তাহার ছায়াপাত মাত্র হয় নাই। এখানে ইতিহাস একটা দুরন্ত দানবের মত গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিয়া তাহার সুখ-শান্তি ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতেছে মাত্র; তাহার সহিত কোন জীবন্ত সম্বন্ধ বা প্রাণের যোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছে না।

রমেশচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িকদিগের রচিত এই সমস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটু সবিস্তার আলোচনা করা গেল; কেন না এই সমস্ত ব্যর্থ-প্রয়াসের মধ্য দিয়াই আমরা ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শের গুরুত্ব সহজে উপলব্ধি করিতে পারিব। রমেশচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত ইহাদের তুলনা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হইবে। আমরা এই দুই মনীষীর গ্রন্থ-সমালোচনার সময়ে দেখিতে পাইব যে, ইঁহারা, বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্র, অনেকটা পূর্ববর্ণিতরূপ বিষয়ের মধ্যেও কিরূপে আপনাদের উচ্চতর কলাকৌশল ফুটাইয়া তুলিয়াছেন ও গার্হস্থ্য-জীবনের সহিত ইতিহাসের বৃহত্তর ব্যাপারগুলিকে নিপুণ হস্তে গাঁথিয়াছেন। বিষয়-নির্বাচন-সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত এই সমস্ত লেখকের বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল না। গৃহস্থ-সুন্দরীর প্রতি প্রবল অত্যাচারীর রূপমোহ অনেকটা 'চন্দ্রশেখর'-এর বিষয়-বস্তু; মুসলমানীর হিন্দুবীরের সহিত প্রেম 'দুর্গেশনন্দিনী'র আখ্যায়িকার সারাংশ-সংকলন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত অতি সাধারণ, নিতান্ত বিশেষত্ব-বর্জিত বিষয়ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার দ্বারা কিরূপ আশ্চর্যভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে, জীবনের জটিলতা ও প্রেমের বিপুল আবেগ ইহাদের মধ্যে কিরূপ স্পষ্ট-ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা তুলনার দ্বারা আরও পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। সাধারণ মনুষ্যের সহিত তুলনাই প্রতিভাবানের গৌরব স্ফুটতর করিয়া তোলে।

চতুর্থ অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা

(১)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বঙ্গসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূত্রপাত ও সাধারণ লেখকের হস্তে ইহার দোষ-ত্রুটি-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে রমেশচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা করিতে হইবে। পূর্ব ইতিহাস-সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ বঙ্গসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পরিপুষ্টির দিকে যে গুরুতর বাধা-বিঘ্ন ছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই সমস্ত বাধা-বিঘ্ন-সত্বেও রমেশচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র যে উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিতে পারিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের সহজ প্রতিভার জন্য।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সাহিত্যিক রচনা-সম্বন্ধে বঙ্কিম ও রমেশ প্রায় সমসাময়িক; বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'ই প্রথম উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক উপন্যাস, বঙ্কিমের দৃষ্টান্তই ইংরেজী-সাহিত্যপুষ্ট রমেশচন্দ্রকে বঙ্গসাহিত্যের দিকে আকর্ষণ করে। সুতরাং প্রথম প্রবর্তকের যে গৌরব তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাপ্য। ক্রমবিকাশের দিক্ হইতে রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলিই খাটি, অবিমিশ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদাহরণ। (বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি অপেক্ষাকৃত জটিল ও মিশ্র ধরনের, তাহাদিগের মধ্যে ইতিহাস অনেকাংশে কল্পনারঞ্জিত ও রূপান্তরিত হইয়া দেখা দিয়াছে। বঙ্কিমের আদর্শবাদ, জাতির ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে তাঁহার প্রবল আশা-আকাঙ্ক্ষা; তাঁহার উচ্ছ্বসিত দেশভক্তি ঐতিহাসিক উপাদানগুলিকে বিশেষভাবে অনুরঞ্জিত করিয়া তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির উপর কোথাও বা মহাকাব্যের বিশালতা, কোথাও বা গীতিকাব্যের উন্মাদনা আনিয়া দিয়াছে।) ঐতিহাসিক উপন্যাসের সত্যনিষ্ঠা-সম্বন্ধে যে কঠোর দায়িত্ব, তাহা তিনি সর্বত্র স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। 'আনন্দমঠে' একটা অখ্যাত সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের মধ্যে তিনি নিজের উদ্দীপ্ত স্বদেশপ্রেম ও জ্বলন্ত বিশ্বাস সঞ্চার করিয়া, তাহাকে একটা ভাবপূত, জ্ঞান-গৌরব-মণ্ডিত, মহিমান্বিত আদর্শের আকার দান করিয়াছেন, একটা সুদূরপ্রসারী রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্মনৈতিক বিপ্লবের গৌরব আরোপ করিয়াছেন; অতীত ইতিহাসের চিত্রপটের উপর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার উজ্জ্বল বর্ণ বিন্যস্ত করিয়াছেন। অতীতকালের স্বরূপটিকে অনাবৃত করিয়া দেখাইতে তাঁহার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই। (প্রেমিক যেমন সমগ্র বাস্তব-জগৎকে নিজ আদর্শ স্বপ্নের সাদৃশ্যে রূপান্তরিত করে, কবি ও স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রও অতীত ইতিহাসকে দেশভক্তির প্রবল শিখায় গলাইয়া, কল্পনার উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত করিয়া, তাহার উপর নিজ বিশাল, রাজোচিত মনের প্রভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। ইহা আর যাহাই হউক, ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে, এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে ইহার বিচার ও রসগ্রহণ চলিতে পারে না।)

'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'রাজসিংহ' এবং কতকটা 'চন্দ্রশেখর' ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য ঐতি-

হাসিক উপন্যাস-সম্বন্ধে অনেকটা এই কথা বলা যাইতে পারে। 'মৃণালিনী'তে ঐতিহাসিক অংশ অতিশয় ক্ষীণ ও আনুমানিক বলিয়াই মনে হয়; হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রেম যে-কোন আধুনিক যুগে ঘটিতে পারিত; তাৎকালিক সমাজ ও ইতিহাসের বিশেষ চিহ্ন উহার উপর মুদ্রিত নাই। বঙ্কিমের প্রধান শক্তি ঐতিহাসিক আবেষ্টন-সংগঠনের বা ইতিহাসের শুষ্ক অস্থির মধ্যে প্রাণসঞ্চারের কার্যে নিয়োজিত হয় নাই, পরন্তু মনোরমার প্রহেলিকাময় চরিত্রের বিশ্লেষণেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'দেবী চৌধুরাণী'তে দার্শনিক তত্ত্ব-প্রিয়তা ইতিহাসকে অভিভূত করিয়াছে, ভবানী পাঠক সন্তান-ব্রত গ্রহণ করিলেই অনায়াসে আনন্দমঠে স্থান পাইতে পারিত। তবে 'দেবী চৌধুরাণী' মূলতঃ পারিবারিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক নহে; সুতরাং ইহার ঐতিহাসিক অংশকে সেরূপ প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। 'সীতারাম'ও মূলতঃ চরিত্র-বিশ্লেষণের উপন্যাস, সীতারামের নৈতিক পদস্খলনের চিত্রটি ফুটাইয়া তোলাই ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য; ইতিহাস ইহার অপ্রধান অংশ মাত্র। বিশেষতঃ সীতারামের ঐতিহাসিক অংশ, ক্ষীণ হইলেও যথেষ্ট সত্যনিষ্ঠার সহিত চিত্রিত হইয়াছে,আদর্শবাদের দ্বারা রূপান্তরিত হয় নাই। সীতারামকে প্রথম প্রথম একজন আদর্শ, দূরদর্শী হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া চিত্রিত করা হইলেও, তাঁহাকে কোন অসম্ভব অকালোচিত বাষ্পময় ভাবের দ্বারা স্ফীত করা হয় নাই, একজন সাধারণ অত্যাচার-পীড়িত, স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীরূপেই দেখান হইয়াছে। সুতরাং এখানে আদর্শবাদের দ্বারা ইতিহাস ক্ষুণ্ণ ও বিকৃত হয় নাই। সেইরূপ 'চন্দ্রশেখর'-এও যে ঐতিহাসিক অংশটুকু আছে তাহাও আখ্যায়িকার মূল বস্তু নহে। তথাপি এখানে ইতিহাস কেবল পশ্চাৎ-পট মাত্র নহে, আখ্যায়িকার মধ্যে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট। বাংলায় ইংরেজের প্রাদুর্ভাব কেবলমাত্র রাজনৈতিক সংঘটন নহে, ইহা শৈবলিনীর গার্হস্থ্য-জীবনের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইতিহাসের নিগূঢ় উদ্দেশ্যের বাহন ইংরেজ, নবাব মীরকাসিম ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখর উভয়েরই দুর্গতির হেতু। দলনী ও শৈবলিনী উভয়েই নিয়তির মর্মান্তিক ব্যঙ্গে ইতিহাস-প্রসারিত একই নাগপাশে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে—দুইটি আখ্যায়িকা একই সূত্রে অতি নিপুণভাবে গ্রথিত হইয়াছে। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে দলনীর আত্মোৎসর্গ ও বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের গৌরবময় ব্যর্থ প্রচেষ্টা ভাবের একই সুরে বাঁধা। সুতরাং 'চন্দ্রশেখর'-এ ইতিহাসের সহিত ব্যক্তিগত জীবনের একটা সন্তোষজনক সমন্বয় হইয়াছে বলা যাইতে পারে। খুব সন্নিহিত অতীতের কাহিনী বলিয়া ইহার প্রতিবেশচিত্রও সুপরিচিত ও অপেক্ষাকৃত তথ্যবহুল।

'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'রাজসিংহ' এই দুইটি উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা অন্যান্য উপন্যাস হইতে একটু ভিন্ন স্তরের—ইহঁারা মূলতঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস; ঐতিহাসিক ব্যক্তিই ইহাদের নায়ক এবং তাহাদের ভাগ্য-বিপর্যয়ই ইহাদের আখ্যান-বস্তু। অবশ্য ঐতিহাসিক উপাখ্যানে ইতিহাস-খ্যাত পুরুষই যে নায়ক হইবে, তাহার কোন প্রয়োজন নাই। বরঞ্চ স্কটের উপন্যাসে ঐতিহাসিক ব্যক্তিরা নায়কপদে উন্নীত না হইয়া অপ্রধান অংশই অধিকার করিয়াছেন। Ivanhoe-তে Richard I, Quentin Durward-এ Louis XI, Kenilworth-এ Elizabeth ও Leicester, Peveril of the Peak-এ James I, Woodstock-এ Charles II ও Cromwell, প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিই ঐ সমস্ত উপন্যাসে অপ্রধান অংশ অধিকার করে; এবং কাল্পনিক ব্যক্তিরাই নায়কের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার দুইটি কারণ আছে—প্রথমতঃ, ঐতিহাসিক

চরিত্রগুলি পাঠকের বিশেষ পরিচিত বলিয়া, তাহাদিগকে কল্পনার সাহায্যে রূপান্তরিত করার পক্ষে বিশেষ বাধা আছে; ঔপন্যাসিকের রুচি ও আদর্শ অনুযায়ী তাহাদিগকে পরিবর্তিত করা চলে না। সুতরাং লেখক যে সমস্ত বিপ্লব-অভিঘাত দেখাইতে চাহেন, সমসাময়িক যে সমস্ত বিরোধের ধারা পরিস্ফুট করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা কাল্পনিক চরিত্রের ভিতর দিয়াই ফুটাইয়া তোলা তাঁহার পক্ষে সহজ হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক যুগেরই সাধারণ জীবন, রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে স্কট-এর জ্ঞান এতই ব্যাপক ও গভীর ছিল, প্রত্যেক শতাব্দীরই বিশেষ প্রাণস্পন্দন তিনি এতই সূক্ষ্ম সহানুভূতির সহিত ধরিতে পারিতেন যে, সমাজচিত্রের কেন্দ্রস্থলে রাজাকে স্থাপন করা তাঁহার প্রয়োজন হইত না। সুতরা' তাঁহার উপন্যাসে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি বাস্তবতার একমাত্র নিদর্শন বলিয়া প্রবর্তিত হয় নাই। রাজাদিগকে আখ্যায়িকার মধ্যে না আনিলেও উহাদের বাস্তবতাব কোন হানি হইত না; রাজাদের প্রবর্তনের জন্য উহাদের বাস্তবতার গৌরব আরও বাড়িয়াছে মাত্র, আরও সংশয়হীন ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে মাত্র। এই সমস্ত কারণের জন্যই স্কট তাঁহার ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে আখ্যায়িকার অপ্রধান অংশে নিয়োজিত করিতে সাহসী হইয়াছেন।

কিন্তু আমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বিভিন্ন যুগের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে আমরা এতই অজ্ঞ যে, আমাদের নিকট এক যুগ হইতে অপরের ভেদ রেখা অতি ক্ষীণ ও অস্পষ্ট। সুদূর হিন্দু অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এমন কি মুসলমান অধিকারের পরেও কোন শতাব্দীরই বিশেষ-রূপসম্বন্ধে, সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে আমাদের বেশ স্পষ্ট ধারণা নাই। চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ—সমস্ত শতাব্দীই আমাদের চক্ষে একাকার, বিস্মৃতির বৈচিত্র্যহীন ধূসর বর্ণে পরিব্যাপ্ত; এই অন্ধকারের মধ্যে রাজাগণের নাম ও উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনাই যাহা কিছু ক্ষীণ আলোকরেখাপাত করিতেছে। আমাদের অতীত ইতিহাসের কোন অধ্যায়কে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত করিবার একমাত্র উপায় তৎকালীন রাজার নামের দিকে দৃষ্টিপাত করা; উপন্যাসবর্ণিত ঘটনা কোন্ যুগে ঘটিয়াছিল তাহার সম্বন্ধে ধারণা করার একমাত্র উপায় সেই সময়ের শাসনকর্তার কাল-নির্ধারণ—সে সময়ে রাজা কে ছিল,—আকবর, জাহাঙ্গীর, আরংজেব, সিরাজদ্দৌলা, কি মীরকাসিম এই প্রশ্নজিজ্ঞাসা; আভ্যন্তরীণ প্রমাণের দ্বারা কিছুই জানিবার উপায় নাই। এইজন্যই বঙ্গসাহিত্যে যাঁহারা প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সেই কাযের কঠোর দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই রাজা ও সম্রাট্-জাতীয় পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের কল্পনার জাল বুনিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত সত্যনিষ্ঠ রমেশচন্দ্র রাজপুত ও মহারাষ্ট্র ইতিহাসের রোমান্সের অপেক্ষা বিস্ময়কর, অথচ অবিসংবাদিত সত্যের উপর নিজ উপন্যাস-সৌধ নির্মাণ করিয়াছেন। কল্পনাকুশল বঙ্কিমচন্দ্র অধিকাংশ উপন্যাসেই ঐতিহাসিক উপাদানের রূপান্তর সাধন করিয়া ইতিহাসের মর্যাদা লঙ্ঘন করিতে সংকুচিত হন নাই। দুই একটিতে ইতিহাসের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনাবিন্যাসেই নিজ শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন।

(২)

ঐতিহাসিকতার দিক্ দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে মোটামুটি চারিটি শ্রেণীবিভাগ করা যায়। (১) যে সমস্ত উপন্যাসে ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা ও দায়িত্বজ্ঞানের চিহ্ন অধিকতর

সুস্পষ্ট—'দুর্গেশনন্দিনী', 'চন্দ্রশেখর' ও 'রাজসিংহ' এই তিনখানি উপন্যাস এই পর্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র ঐতিহাসিকতা ক্ষীণ বটে, সামাজিক চিত্রাঙ্কনের দিক্ দিয়া ইহার মধ্যে বাস্তবপ্রিয়তা বা সত্যনিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। তথাপি ইহার নায়ক একজন ঐতিহাসিক পুরুষ, এবং ইহাতে যে ঐতিহাসিক চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা অন্ততঃ কল্পনার আতিশয্য দ্বারা বিকৃত ও রূপান্তরিত হয় নাই। বিশেষতঃ ইহার ঐতিহাসিকতা ইহার মূল অংশ, 'মৃণালিনী'র মত অবান্তর বিষয় নহে; ইহার ঐতিহাসিক অংশ বাদ দিলে আখ্যায়িকার মূল বিষয়ই নষ্ট হইয়া যায়। 'রাজসিংহ'-এ ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে; ইহা একটি প্রকৃত ইতিহাসবর্ণিত ব্যাপারেরই বিবৃতি। রাজসিংহের প্রতি চঞ্চলকুমারীর অনুরাগ এই ঐতিহাসিক যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে রোমান্সের অনুরঞ্জন আনিয়া দিতেছে, এবং তাহাদের পশ্চাতে নূতন শক্তির যোগ করিয়া তাহাদের গতিবেগ বর্ধিত করিতেছে। অবশ্য ইতিহাসের বিশাল ঘটনার সহিত সাধারণ জীবনের যে অন্তরঙ্গ যোগ আমরা ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসেই পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয় নাই। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, ইতিহাস কোন দিনই আমাদের সাধারণ সামাজিক জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; এবং গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্তন ও রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যেও আমাদের দৈনন্দিন জীবন নিজ শান্ত, অপরিবর্তিত প্রবাহ রক্ষা করিয়াছিল।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসে ইতিহাস কল্পনার বর্ণে রঞ্জিত হইয়া নিজ সত্যরূপ বিসর্জন দিয়াছে, ভাবপ্রাবল্য সত্যনিষ্ঠাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। 'আনন্দমঠ' এই শ্রেণীর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

(৩) তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসে ইতিহাস নিতান্তই ক্ষীণ ও অসম্পূর্ণভাবে মূল আখ্যায়িকার মধ্যে গ্রথিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর উপন্যাসে ইতিহাস কেবল ঘটনাবৈচিত্র্যের কারণমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে, কোন উচ্চতর কলাকুশলতার প্রয়োজনে নিযুক্ত হয় নাই। 'মৃণালিনী'তে ঐতিহাসিক অংশ—মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়—চরিত্রসৃষ্টির উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করে না। মৃণালিনী-হেমচন্দ্রের প্রেম, মনোরমার রহস্যময় দ্বৈত-ভাব কোন বিশেষ কালের সৃষ্টি বলিয়া মনে হয় না, ইহারা সর্বকাল-সাধারণ। 'চন্দ্রশেখর'-এ লরেন্স ফস্টরের সহিত শৈবলিনীর গৃহত্যাগ, এবং মীরকাশিম ও ইংরেজদের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধজালে দলনী বেগম ও শৈবলিনীর জড়িত হওয়া ইতিহাসের সহিত পারিবারিক জীবনের যোগের প্রমাণ। অবশ্য শৈবলিনী-প্রতাপের ভিন্নাভিমুখী প্রেম, এবং শৈবলিনীর চিত্তবিকার ও প্রায়শ্চিত্ত—ইহাদের সহিত রাজনৈতিক ঘটনাগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই; দুইটি সূত্রকে পৃথক্ করা সম্ভব। স্কট্ বা থ্যাকারের ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাস ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে এরূপ বিচ্ছেদসাধন সম্ভবপর নহে। গার্হস্থ্য জীবন যেন ইতিহাস-বৃন্তে ফুলের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, যুগের বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থা হইতে নিজ রস ও বর্ণ গ্রহণ করিয়াছে, ছোট-বড় শত বন্ধনের নাগপাশে ইতিহাসের সহিত বিজড়িত হইয়াছে। এই প্রভেদের কারণ বোধ হয় এই যে, আমাদের দেশে ইতিহাস-ধারার গতি ও প্রবাহ ইউরোপ হইতে বিভিন্ন। ইতিহাস কখনও কখনও আমাদের সামাজিক জীবনকে বজ্রমুষ্টিতে চাপিয়া ধরিলেও, ইহার সুকুমার বিকাশগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ

করিলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহার মুষ্টি অতি শিথিল। সাধারণ লোক অতি গুরুতর রাজনৈতিক বিপ্লবকেও নিজ প্রাণের মধ্যে কখনও গ্রহণ করে নাই—যতদিন সম্ভব ইহাকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছে; যখন নিতান্তই ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন ইহার প্রচণ্ড শক্তির তলে মাথা নত করিয়া দিয়াছে; কিন্তু কোন দিনই ইহাকে অন্তরের বস্তু বলিয়া লইতে পারে নাই, ইহাকে হৃদয়ের আলোড়নের দ্বারা প্রাণবান্ করিয়া তুলিতে চাহে নাই। পাঠান গিয়াছে, মোগল আসিয়াছে; ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্রগুলি রক্ত-রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এই পরম নিশ্চেষ্ট, পারমার্থিক জাতি তাহার ঔদাসীন্য ত্যাগ করিয়া এই রক্তপাতের সহিত নিজ হৃদয়-রক্তের জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করে নাই, এই শোণিতোৎসবে নিজ প্রাণমন রাঙ্গাইয়া দেয় নাই।

(৪) "সীতারাম' বা 'দেবী চৌধুরাণী' খাটি পারিবারিক উপন্যাস। ইহাদের মধ্যে যাহা-কিছু ঐতিহাসিকতা, তাহা কেবল ইহারা অতীত যুগের আখ্যায়িকা বলিয়া। কোন গুরুতর ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত ইহাদের সংযোগ নাই।' সীতারাম ইতিহাসের পুরুষ হইলেও, প্রধানতঃ তাঁহার নৈতিক ও গার্হস্থ্য জীবনের সমস্যাই আলোচিত হইয়াছে। 'দেবী চৌধুরাণী'তে ইতিহাস একেবারেই অনুপস্থিত; তবে ইতিহাস ও ধর্মের ক্ষেত্র হইতে নিঃসৃত একটি কাল্পনিক আদর্শের জ্যোতি ইহার সামাজিক জীবনের উপর বিচ্ছুরিত হইয়াছে। এই দুইটি উপন্যাসকে ঐতিহাসিক আখ্যা না দিয়া, বা অতীতের সমাজচিত্র বলিয়া মনে না করিয়া, কেবল ব্যক্তিবিশেষের জীবন-সমস্যা-হিসাবে আলোচনা করিলেই ভাল হয়।

'কপালকুণ্ডলা'তেও রোমান্সের অপরূপ মায়ার পার্শ্বে ইতিহাস নিতান্তই ক্ষীণ ও বিশেষত্ব-বর্জিত বলিয়াই বোধ হয়; ঐতিহাসিক অংশটুকু যেন মায়াময় সৌন্দর্যের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে। কপালকুণ্ডলার অনুপম, সমাজবন্ধনমুক্ত চরিত্রমাধুর্যের সঙ্গে চক্রান্তকুটিল রাজনৈতিক ইতিহাসের সংযোগ বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এখানেও ইতিহাসের উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর আছে।

এতক্ষণ যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকেরা ইতিহাসের যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, দৈনিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে ভাবে ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, বঙ্কিম তাহা পারেন নাই। তবে বঙ্কিমের সপক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ইউরোপীয় আদর্শ অনুসরণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল, এবং স্বাভাবিক বাধা সত্ত্বেও তিনি যতটা সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রতিভারই পরিচয়। স্থানে স্থানে তিনি কেবল প্রতিভাবলেই কোন অতীত যুগের ঠিক প্রাণস্পন্দনটি ধরিয়াছেন, বা কোন ইতিহাস-বিখ্যাত পুরুষের আসল ব্যক্তিত্বটুকু ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন, ইহা প্রমাণের অভাব-সত্ত্বেও অনুভব করা যায়। 'চন্দ্রশেখর'-এ জনসন ও গলস্টন প্রতাপের গৃহদ্বারের রুদ্ধ কপাটে যে পদাঘাত করিয়াছিল, সেই পদাঘাতেই ভারতে প্রথম যুগের ইংরেজদের বলদৃপ্ত, মদগর্বিত আত্মাভিমানের যেন মূর্ত বিকাশ—এই এক পদাঘাতই শত শত লিখিত প্রমাণ অপেক্ষা সুস্পষ্টতরভাবে তাহাদের প্রকৃতির আসল রহস্যটি আমাদের নিকট প্রকাশ করে। 'মৃণালিনী'তে মুসলমান বিপ্লবের পর বক্তিয়ার খিলিজির সম্মুখে প্রভুদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক পশুপতির যে বিবেকভীরু, কর্তব্যবিমূঢ়, অর্ধ-অনুশোচনা-অর্ধ-আত্মপ্রসাদমিশ্রিত ভাব তাহা ঠিক ঐতিহাসিক সত্য না হউক, উচ্চাঙ্গের ঐতি-

হাসিক কল্পনার (historical imagination) পরিচয় দেয়। 'রাজসিংহ'-এ আরংজেবের যে কুটিল, ভাবগোপনদক্ষ, হাসির আবরণের মধ্যে বজ্রকঠিন প্রকৃতিটির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা আধুনিক ঐতিহাসিকও সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইবেন না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র একটি প্রমাণনিরপেক্ষ সহজ সংস্কারের দ্বারা ইতিহাসের একেবারে মর্মস্থানে গিয়া হাত দিয়াছেন, সমস্ত জটিল ঘটনা-বিন্যাসের মধ্যে যুগবিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের আসল স্বরূপটি টানিয়া বাহির করিয়াছেন।

বঙ্কিমের ঐতিহাসিকতা-সম্বন্ধে আলোচনা শেষ হইল। পরে যখন এই সমস্ত উপন্যাস আলোচিত হইবে, তখন কেবল তাহাদের কলাকৌশলের দিক্‌টাই লক্ষ্য করিতে হইবে, ঐতি-হাসিক অংশ সম্বন্ধে অভিমতের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হইবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

রমেশচন্দ্র

(ক) ঐতিহাসিক উপন্যাস

(১)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এখন রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির আলোচনা করিলেই বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের একটি বিভাগ সম্পূর্ণ হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অবিমিশ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের নিদর্শন বঙ্গসাহিত্যে এক রমেশ-চন্দ্রের উপন্যাসেই পাওয়া যায়। বঙ্কিমের সহিত তুলনায় কল্পনাকুশলতা তাঁহার অনেক কম। এই কল্পনাকুশলতার অভাবই সাধারণতঃ তাঁহার ভাবদৈন্যের কারণ ও জীবন-সমস্যার গভীর আলোচনার পক্ষে অন্তরায় হইলেও, অধিকতর সত্যনিষ্ঠার হেতু হইয়াছে। রমেশচন্দ্র কল্পনার আতিশয্য বা আদর্শবাদের দ্বারা ইতিহাসকে রূপান্তরিত করিতে চাহেন নাই, পরন্তু যথাসাধ্য সত্যচিত্রণেরই প্রয়াসী হইয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের প্রতিকূল আকাশ-বাতাসের মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যতদূর বৃদ্ধি ও পরিণতি হওয়া সম্ভব রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

রমেশচন্দ্রের চারিখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসকে স্থূলতঃ দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম উপন্যাসদ্বয়—'বঙ্গ-বিজেতা' ও 'মাধবী-কঙ্কণ'—এক শ্রেণীর অন্তর্গত; শেষের দুইখানি উপন্যাস—'জীবন-প্রভাত' ও 'জীবন-সন্ধ্যা'-কে অপর শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথম শ্রেণীতে কল্পনার আধিপত্য; দ্বিতীয় শ্রেণীতে সত্যনিষ্ঠার অধিক প্রাদুর্ভাব—কল্পনা ঐতিহাসিক সত্যের অনুগামী হইয়াছে। প্রথম দুইখানি উপন্যাসের বর্ণনীয় বস্তু ও মুখ্য চরিত্রগুলি প্রধানতঃ কাল্পনিক; কেবল ঐতিহাসিক আবেষ্টনের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই তাহারা ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। পরবর্তী উপন্যাসদ্বয় প্রধানতঃ ইতিহাসের সংশয়হীন ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত; তাহাদের মধ্যে যে সমস্ত কাল্পনিক বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে, তাহারা কেবল বৃহত্তর ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির মধ্যে যোগসূত্র রচনা করিতেছে; তাহাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে শূন্য স্থানটুকু আছে, তাহাদিগকে রসে ও বর্ণে ভরিয়া তুলিতেছে। অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক সত্যের চারিদিকেও কল্পনা-শক্তির ক্রীড়ার যথেষ্ট অবসর আছে। ইতিহাসের শুষ্ক অস্থির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইলে, ঐতিহাসিক বাহ্য ঘটনাকে মানুষের প্রকৃত জীবনের ও হৃদয়াবেগের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিতে হইলে, এক কথায় ইতিহাসকে মানব-মনের নিগূঢ় রসলীলার সহিত সম্পর্কান্বিত করিতে হইলে কল্পনার সাহায্য অপরিহার্য। রমেশচন্দ্রের শেষের দুইখানি উপন্যাসে যে কল্পনার পরিচয় পাই, তাহা মুখ্যতঃ এই জাতীয়। তাহা ঐতিহাসিক সত্যের বিরোধী নহে, অনুগামী; তাহা ইতিহাসকে বিকৃত করে

না, কেবল বিস্মৃতি-মলিন সত্যের রেখাগুলির উপর উজ্জ্বল আলোকপাত করিতে চেষ্টা করে মাত্র। সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্রের গতি কাল্পনিকতা হইতে সত্যনিষ্ঠার দিকে ; প্রথম উপন্যাসদ্বয়ে যে ইতিহাস অপ্রধান ছিল, শেষের উপন্যাস দুইখানিতে তাহা প্রধান হইয়াছে। ইহার কারণ বোধ হয় রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক জ্ঞানের প্রসার এবং রাজপুত ও মহারাষ্ট্র ইতিহাসের বীরত্বকাহিনীতে একটা প্রবল, প্রচুর রসধারার আবিষ্কার।

'বঙ্গ-বিজেতা' (১৮৭৩ খৃঃ অঃ) রমেশচন্দ্রের প্রথম রচনা ; একটা অপরিণত হস্তের চিহ্ন ইহার সর্বত্রই বিরাজমান। ইহার ঐতিহাসিক অংশ রমেশচন্দ্রের স্বভাবসিদ্ধ সত্যনিষ্ঠার সহিত লিখিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা একেবারে শুষ্ক, নীরস ও প্রাণহীন ; কোন স্কুলপাঠ্য ইতিহাস হইতে সংকলন বলিয়া বোধ হয়। জীবনের বেগবান্ স্পন্দন ইহার মধ্যে নাই ; মানবের সাধারণ জীবন ও মানব-মনের গূঢ় রসধারার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই। এমন কি কোন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পুরুষের পরিচিত মূর্তি হইতে একটা ক্ষীণ জীবন-স্পন্দনের অনুরণনও এই গ্রন্থবর্ণিত যুগের উপর সংক্রামিত হয় নাই। অবশ্য রাজা টোডরমল্লকে এই যুগের কেন্দ্রস্থ পুরুষ বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে ; কিন্তু তিনিও বিশেষ জীবন্তভাবে চিত্রিত হন নাই এবং তাঁহার সমসাময়িক ইতিহাসধারার উপর কোন বিশেষত্বের চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। গ্রন্থের শেষে টোডরমল্ল যখন ইচ্ছাপুরে আহূত হন, তখন হিন্দু রাজার সভাড়ম্বর ও অভ্যর্থনাবিধির একটি চিত্র দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে ; কিন্তু এ বর্ণনাও বিশেষত্ববিহীন বলিয়া আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। পরবর্তী গ্রন্থসমূহে রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়দের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক যে সত্য ও জীবন্ত চিত্র পাই, তাহার সহিত তুলনায় এই চিত্র নিতান্ত নিষ্প্রভ ও অস্পষ্ট বলিয়া বোধ হয়। এইখানেই আমরা বঙ্কিমের সঞ্জীবনী কল্পনাশিখার অভাব অনুভব করি ; কল্পনা ও সত্যের মধ্যে সত্যই আদরণীয়, কিন্তু সত্য যেখানে প্রাণহীন, সেখানে কল্পনার রাজ্য হইতেও জীবনস্পন্দন-আনয়ন আর্টের পক্ষে অধিকতর কাম্য।

চরিত্রসৃষ্টির দিক্ দিয়াও এক বিরাট্ প্রাণহীনতা এই গ্রন্থের পাতাগুলি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ইন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, সতীশচন্দ্র, বিমলা, প্রভৃতি সমস্ত চরিত্র conventional, বিশেষত্ববর্জিত। তাহাদের সকলের মধ্যেই একটা অস্পষ্টতা, বা ক্ষীণতা বা জীবনী-শক্তির অভাব প্রকট হইয়া উঠিয়াছে ; তাহাদের কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারে জীবনের গোপন রহস্যটি প্রকাশিত হয় নাই, সেই অবর্ণনীয় কিন্তু অনায়াসবোধ্য জীবনের সুরটি বাজিয়া উঠে নাই। গল্পের villain শকুনিও এই অস্পষ্টতার হাত এড়ায় নাই, সেও সম্পূর্ণ conventional. মহাশ্বেতার জিঘাংসাপূর্ণ হৃদয়ে বাস্তবতার ক্ষীণ স্পন্দন কতকটা অনুভব করা যায়। গ্রন্থের ছায়াময় অস্পষ্টতার মধ্যে কেবল সরলা ও অমলার সখিত্বটুকুই কতকটা বাস্তবের সুস্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে ও সহজেই অন্যান্য চিত্র হইতে পৃথক্ হইয়া উঠিয়াছে। প্রেমের চিত্রগুলির সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা যাইতে পারে ; বিশেষতঃ উপেন্দ্রনাথ ও কমলা গ্রন্থমধ্যে বাস্তব-অবাস্তবের ভিতর যে ক্ষীণ ভেদ-রেখা আছে, তাহা অতিক্রম করিয়া একেবারে স্বপ্নের রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছে। এখানেও রমেশচন্দ্র অপেক্ষা বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠত্ব অনায়াসেই অনুভব করা যায়। ইন্দ্রনাথের প্রতি বিমলার গোপন আকর্ষণ জগৎসিংহের প্রতি আয়েষার ব্যর্থ প্রেমের একটা অক্ষম অনুকরণ মাত্র। বঙ্কিম নিজ প্রতিভার বলে এই সাধারণ প্রেমের চিত্রটিকে একটি

dramatic climax, নাটকোচিত চরম পরিণতিতে লইয়া গিয়াছেন, এবং উহার মধ্যে মানব-মনের গূঢ় মাধুর্য ও বেদনা ঢালিয়া দিয়া উহাকে আর্টের উচ্চস্তরে উঠাইয়া লইয়াছেন। রমেশচন্দ্র কল্পনাদৈন্যবশতঃ ইহার মধ্যে রসধারা প্রবাহিত করিতে পারেন নাই, কেবল একটা শুষ্ক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র।

'বঙ্গ-বিজেতা'তে রমেশচন্দ্র তাঁহার ভবিষ্যৎ পরিণতির বিশেষ কিছু পরিচয় দেন নাই; কেবল ভবিষ্যতের আলোকে দুইটি দিক্ দিয়া তাঁহার ক্রমোন্নতির ক্ষীণ সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, যুদ্ধবিগ্রহ-বর্ণনায় প্রথম হইতেই তাঁহার কতকটা সিদ্ধহস্ততার পরিচয় পাওয়া যায়; তাঁহার প্রথম রচনায় সমস্ত অপরিপক্কতা ও অস্পষ্টতার মধ্যে এই এক যুদ্ধবর্ণনার মধ্যে তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ বাস্তবপ্রিয়তা ও একটা প্রকৃত আবেগ দেখা যায়। তাঁহার রক্তের মধ্যে কোথাও একটা রণোন্মাদ, একটা যুদ্ধ-সংগীতের ঝংকার সুপ্ত ছিল; তাঁহার পরবর্তী উপন্যাসসমূহে এই যুদ্ধ-সংগীত মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে এবং একটা গীতিকাব্যোচিত উন্মাদনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

আর দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতি-বর্ণনায়ও তাঁহার কতকটা সজীবতা ও দক্ষতার চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রকৃতির শান্তস্তব্ধ গাম্ভীর্য যেন তিনি হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রকৃতি-বর্ণনায়ও এই গভীর ভাব, এই প্রত্যক্ষ অনুভূতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য বঙ্কিমের কবিত্বময় প্রকৃতি-বর্ণনা বা রবীন্দ্রনাথের গূঢ় অন্তরঙ্গ স্পর্শটি তাঁহার মধ্যে পাওয়া যায় না; কিন্তু প্রকৃতির শান্ত সৌন্দর্য-সম্বন্ধে তাঁহার একটা সহজ সরল অনুভূতি, একটা জীবন্ত রসবোধ আছে। পরবর্তী উপন্যাসসমূহে এই গুণগুলি আরও বিকশিত হইয়াছে।

'বঙ্গ-বিজেতা'র তিন বৎসর পরে (১৮৭৬ খৃঃ অঃ) রমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস 'মাধবী-কঙ্কণ' প্রকাশিত হয়। এই তিন বৎসরের মধ্যে তিনি কলাকৌশল ও চরিত্রসৃষ্টিতে যে উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। 'বঙ্গ-বিজেতা' একজন অপরিপক্ক তরুনের রচনা; 'মাধবী-কঙ্কণ' একেবারে প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের রচনা। এই দুই-এর মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান।

'মাধবী-কঙ্কণ' মূলতঃ একটি পারিবারিক উপন্যাস; ইতিহাস ইহার অপ্রধান অংশ। উপন্যাসের নায়ক গৃহত্যাগী হইয়া রাজনৈতিক জালের মধ্যে জড়িত হইয়া পড়েন, এবং ভারত-ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে তখন যে রোমাঞ্চকর নাটকের অভিনয় হইতেছিল তাহাতে একটি নিতান্ত সামান্য অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। কাজে কাজেই ইতিহাস গল্পের একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ নহে; কিন্তু নায়কের ভাগ্য-বিপর্যয়ের সহিত ইহা একটি অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ, ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির এমন একটা বাস্তব, তথ্যপরিপূর্ণ, জীবন্ত চিত্র দেওয়া হইয়াছে যে, আমরা একটা গুরুতর রাজনৈতিক বিপ্লবের তরঙ্গ-চাঞ্চল্য আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি। স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটা প্রধান আকর্ষণ এই যে, ইহারা আমাদিগকে এই নীরস, যন্ত্রবদ্ধ, বণিগ্ধর্মী জীবন হইতে অতীতের এক বীরত্বপূর্ণ, গৌরবমণ্ডিত যুগে লইয়া যায়, যেখানে আমরা একটি মুক্ততর, বিশালতর জীবনের আস্বাদ পাই, যেখানে জীবন দুইটি পরস্পর-বিরোধী মহান্ আদর্শের দ্বন্দ্বক্ষেত্র, যেখানে কেবল বাঁচিয়া থাকিবারই প্রবল চেষ্টায় মানুষের সমস্ত জীবনী-শক্তি ব্যয়িত হইত না। রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসেও

আমরা এই বিপদ্‌সংকুল, গৌরবময়, বীরত্বকাহিনীপূর্ণ অতীত যুগে নীত হই। এই হিসাবে রমেশচন্দ্র স্কটের পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য। 'মাধবী-কঙ্কণে' এই অতীত যুগের যে খণ্ড চিত্র-গুলি দেওয়া হইয়াছে তাহারাও স্বতঃই আমাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, বিশেষ প্রমাণের অভাব সত্ত্বেও আমরা তাহাদের সাধারণ সত্যতা মানিয়া লইতে কুণ্ঠিত হই না। রাজমহলে সুজার দরবারের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তৎকালীন মোগলসম্রাট্‌দের যথেচ্ছাচারিতা ও তোষামোদপ্রিয়তা, মোগল আমলাতন্ত্রের কুটিলচক্রান্তজালে সত্য কিরূপে লুপ্ত হইত, রামের বিষয় শ্যামের নিকট হস্তান্তরিত হইত, আজিকার জমিদার কাল পথের ভিখারীতে পরিণত হইতেন, এই সমস্ত বিষয়ের একটি সুস্পষ্ট পরিচয় পাই। নর্মদাযুদ্ধে পরাজয়ের পর যশোবন্ত সিংহের মাড়ওয়ার প্রত্যাবর্তনকালে তাঁহার মেওয়ারী ও মাড়োয়ারী সৈন্যদলের মধ্যে যে একটা লঘু হাস্য-পরিহাসের,একটা জাতি-বিরোধমূলক কৃত্রিম কলহের ছোট ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা ইতিহাসের বিশাল ঘটনার অন্তরালে মানুষের সংকীর্ণ সামাজিক জীবনের বাস্তব ছবি বলিয়া বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে।

তারপর বারাণসীর, ও নরেন্দ্রের বন্দী হওয়ার পর দিল্লীনগরের, যে জনবহুল, সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ চিত্র ও মোগলরাজ-অন্তঃপুরের যে চমৎকার সৌন্দর্য-বর্ণনা পাই তাহা কবিত্ব-হিসাবে বঙ্কিমের 'রাজসিংহ'-এর উচ্ছ্বসিত বর্ণনা হইতে নিকৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে সত্যের সুরটি প্রকটতর হইয়া উঠিয়াছে। লেখকের আর একটি বিশেষ কলাকৌশল এই যে, মোগল-প্রাসাদের এই ঐন্দ্রজালিক সৌন্দর্য নরেন্দ্রের বিস্ময়াবিষ্ট, বিপদ্‌বিমূঢ় মনের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া, অনিশ্চয় ও সন্দেহের বাষ্পের মধ্যে দেখা দিয়া, আরও অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। ঐশ্বর্যের চিত্রগুলি যেন একটা উজ্জল ছায়াবাজির মত তাহার অর্ধবিকৃত মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া দ্রুত সঞ্চরণ করিয়া গিয়াছে। জেলেখার ব্যর্থ-প্রেমের করুণ কাহিনী নরেন্দ্রের স্বপ্নাবিষ্ট, উদাসীন মনের মধ্য দিয়া একটি ক্ষীণ প্রতিধ্বনির মত অনুরণিত হওয়ায় ইহার রহস্যময় সৌন্দর্যটি গাঢ়তর হইয়াছে। বাস্তবিক জেলেখার প্রেমটি, ইহার বিপদ্‌সংকুল আরম্ভ হইতে বিষাদময় পরিণতি পর্যন্ত, যেরূপ অভ্রান্তভাবে একটি সূক্ষ্ম যবনিকার অন্তরালে রাখা হইয়াছে, একটা আলো-আঁধারমেশা অস্পষ্টতার মধ্য দিয়া নীত হইয়াছে, তাহা খুব উচ্চ অঙ্গের কলাকৌশলের পরিচায়ক। এই অস্পষ্ট সাংকেতিকতাই (suggestiveness) এই প্রেমের রোমান্টিক সৌন্দর্যটি নিবিড়তর করিয়া তুলিয়াছে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ইতিহাসের দিক্ দিয়া রমেশচন্দ্র 'মাধবী-কঙ্কণ' এ যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উন্নতি কেবল ঐতিহাসিক বিষয়েই সীমাবদ্ধ নহে। নরেন্দ্র-হেমলতার অন্তর্গূঢ়, প্রতিরুদ্ধ প্রণয়ের যে করুণ চিত্রটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা উপন্যাস-সাহিত্যে বিরল। এই প্রেমের তীব্র জ্বালাময় আবেগ নরেন্দ্রকে গৃহছাড়া করিয়া তাহাকে কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় দেশ-দেশান্তরে ছুটাইয়াছে। ইহা হেমলতার মৌন, আত্মসংযমশীল হৃদয়ে বিষদিগ্ধ তীরের ন্যায় প্রবেশ করিয়া তাহার যৌবনের সরস সৌন্দর্য, মুখের তরল হাসি শুকাইয়া তুলিয়াছে। বঙ্গ-উপন্যাস-সাহিত্যে সাধারণতঃ যে সমস্ত প্রণয়চিত্র পাওয়া যায় তাহারা আমাদের সামাজিক বৈশিষ্ট্যের জন্য হয় বিশেষত্বহীন, নয় অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে; হয় তাহারা অতিরিক্ত সমাজ-বন্ধনের জন্য নির্জীব ও রসহীন হয়; নয় সমাজের বাস্তব অবস্থাকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া

এক শূন্যগর্ভ, অস্বাভাবিক আদর্শের দিকে উড়িয়া যায়। রমেশচন্দ্র অতি দক্ষতার সহিত তাঁহার প্রণয়চিত্রটিকে এই উভয়বিধ অতিরেক (excess) হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ইহা এক দিকে যেমন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সমাজোপযোগী হইয়াছে, অপর দিকে সেইরূপ তীব্র আবেগময় ও উচ্ছ্বসিত জীবনরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই বালক-বালিকাদের শৈশব-ক্রীড়ার মধ্য দিয়া নরেন্দ্রের উগ্র, রোষপ্রবণ, উদ্দাম প্রকৃতিটিতে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রেমের ব্যর্থ, বিষাদময় পরিণতির সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পাওয়া যায়। এই প্রেমচিত্রটিতে সর্বত্রই একটা সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণশক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। নরেন্দ্র ও শ্রীশ উভয়ের সঙ্গে হেমের ব্যবহারের একটা সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে তাহা লেখক অল্প কথায় কিন্তু অতি স্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নরেন্দ্রের উচ্ছ্বসিত, অদম্য—রোষাভিমান-ক্ষুব্ধ প্রণয় হেমের সমস্ত বাহ্য সংকোচ ও ছদ্ম ঔদাসীন্যের আবরণ ভেদ করিয়া নিজ দুর্নিবার বেগ তাহার হৃদয়ের গোপন স্তরে সঞ্চারিত করিয়াছে, নিজ মায়াময় স্পর্শে তাহার অন্তরের গভীর প্রেমকে সজাগ ও উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছে; শ্রীশের শান্ত, চাঞ্চল্যহীন ভালবাসা তাহার হৃদয়ে কেবল গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব জাগাইয়াছে। বাহ্যতঃ হেমের সমস্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি, আনুগত্য অসংকোচে শ্রীশকে আশ্রয় করিয়াছে; কিন্তু তাহার বালিকা-হৃদয়ের সমস্ত নীরব, ফুটনোন্মুখ প্রেম নরেন্দ্রের জন্য গোপনে সঞ্চিত রহিয়াছে। সেই জন্য তাহার পরিবারস্থ সকলেই, তাহার পিতা পর্যন্ত, তাহার প্রকৃত মনোভাব সম্বন্ধে অজ্ঞ রহিয়া গিয়াছেন, শ্রদ্ধাকে প্রেমের চিহ্ন বলিয়া ভুল করিয়াছেন। কেবল এক শৈবলিনীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সহানুভূতিই তাহাকে এই গোপন রহস্যের সন্ধান দিয়াছে।

আবার ত্রিংশ পরিচ্ছেদে হেমলতার বিবাহিত জীবনের, শ্রীশের সহিত দাম্পত্য প্রেমের যে ছোট ছবিটি দেওয়া হইয়াছে তাহার রেখাগুলি কত ক্ষীণ, কত বর্ণ-বিরল; সন্ধ্যার ধূসর ছায়ার মত একটা ম্লান, শান্ত-সংযত সৌন্দর্য তাহার উপর সঞ্চারিত হইয়াছে। ইহাতে প্রেমের উজ্জ্বল শক্তির, বিদ্যুদ্দীপ্তির কিছুই নাই। হেমের শুষ্ক মুখ ও যৌবনোচিত উচ্ছ্বাসের অভাবই তাহার অন্তরের গভীর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সাক্ষ্য প্রদান করে।

পক্ষান্তরে নরেন্দ্র ও হেমের মধ্যে যে দুইটি দৃশ্য অভিনীত হইয়াছে তাহারা যেন আগ্নেয় অক্ষরে লেখা। এরূপ কৃত্রিম উচ্ছ্বাস ও শব্দাড়ম্বর-বর্জিত, অথচ স্বচ্ছ, সরল, তেজঃপূর্ণ ভাষায় বাঙ্গালা উপন্যাসে আর কোথাও প্রেমের বাণী নিবেদিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ প্রথম বিদায়ের দিন নরেন্দ্রের হৃদয়ের প্রজ্বলিত অভিমানবহ্নি যেন তাহার প্রত্যেক বাক্যকে একটা বিদ্যুদ্‌গর্ভ শক্তি, একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দীপ্তি ও দাহ দিয়াছে। প্রত্যেকটি কথার মধ্যেই একটা বজ্রকঠোর অথচ স্নেহসজল প্রত্যাখ্যানের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। আর উপন্যাসের শেষভাগে মাধবী-কঙ্কণের যমুনায় বিসর্জনের দৃশ্যে, উদ্ধত বিদ্রোহের পর শান্ত বিসর্জনের ও মৃদু সান্ত্বনার সংযত মাধুর্য আমাদের হৃদয়কে আর এক রকমে স্পর্শ করে। এই দৃশ্যে হেমলতার কথাগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে অলংকারবাহুল্যের, নীতিকথার অযথা প্রভাবের পরিচয় পাই বটে, কিন্তু তথাপি মোটের উপর যে সুরটি শুনিতে পাই তাহা মানবহৃদয়ের গভীরতম ভাবের উপযুক্ত প্রকাশ। শুষ্ক, ছিন্ন মাধবী-কঙ্কণটি নরেন্দ্র-হেমলতার আপাতব্যর্থ কিন্তু অক্ষুণ্ণ-প্রভাবশীল প্রেমের একটি জীবন্ত রূপকে (symbol) রূপান্তরিত করিয়াছে। এই দুইটি দৃশ্যে রমেশচন্দ্রের প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় দেদীপ্যমান।

'মাধবী-কঙ্কণ'-এর এই দৃশ্যগুলি স্বভাবতঃই বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তুলনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। নরেন্দ্র-হেমলতার প্রেমের সহিত 'চন্দ্রশেখর'-এর প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রেমের একটা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এই উভয় প্রেমচিত্রের তুলনামূলক সমালোচনা করিলে রমেশচন্দ্রকেই শ্রেষ্ঠ আসন না দিয়া পারা যায় না। বঙ্কিম প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রেমের মধ্যে একটা তীব্র আবেগ ভরিয়া দিয়া, তাহাকে এক বর্ণবহুল রোমান্সের আবেষ্টনে ফেলিয়া, এবং একটা আদর্শ প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে তাহার অবসান ঘটাইয়া সমস্ত ব্যাপারটিকে বাস্তব-জগৎ হইতে অনেক উচ্চে, একটা সুদূর কল্পলোকের চন্দ্রালোকের মধ্যে উঠাইয়া লইয়াছেন। তিনি একজন ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় নানা অদ্ভুত ও বিচিত্র ব্যাপারের সংযোগে, বিবিধ রূপরসের সংমিশ্রণে, বাস্তব জীবনের প্রেমে কল্পলোকের আদর্শ সৌন্দর্য আরোপ করিয়াছেন। আদর্শলোকের এই সমস্ত আলোকরশ্মির সমাবেশে বাস্তবতার ক্ষীণ ভিত্তিটি একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছে। প্রথম যৌবনে যখন আমাদের চক্ষু হইতে মোহের অঞ্জন সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া যায় নাই, যখন একটা স্বপ্নময় আবেশ সুরভি-নিঃশ্বাসের মত আমাদের প্রাণের চারিদিকে ঘিরিয়া থাকে, তখন কল্পনার এই ইন্দ্রজাল, এই আকাশ-সৌধের বর্ণ-সমাবেশকৌশল ও বিরাট্ সমন্বয়-সৌন্দর্য আমাদিগকে একটা সুখের নেশার মত পাইয়া বসে, একটা মদির বিহ্বলতায় আমাদের বিচারবুদ্ধির সতর্ক দৃষ্টিকে ঝাপসা করিয়া দেয়। কিন্তু যখন অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে আমাদের বিচারবুদ্ধি যৌবনের মোহ কাটাইয়া জাগিয়া উঠে ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দ্বারা এই অপার্থিব সৌন্দর্যের বাস্তব সুরটি আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করে, তখনই আমরা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, এই সৌন্দর্যের মধ্যে বাস্তবতার সংমিশ্রণ কত অল্প; এবং যে যাদুবিদ্যার দ্বারা লেখক আমাদের সাধারণ জীবনের চারিদিকে এত অবাস্তব সুষমা পুঞ্জীভূত করিয়াছেন, তাহার বৈধতা সম্বন্ধে সন্দিহান হই। কিন্তু মোহভঙ্গের এই দুঃসহ দুঃখের মধ্যেও আমরা লেখকের অসাধারণ কল্পনাশক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। যে কল্পনার বলে তিনি এই স্বপ্নলোককে পৃথিবীর পরিচিত বেশে সাজাইয়াছেন, তাহা নিতান্ত সাধারণ শক্তি নহে। এই কল্পনাসৃষ্ট রোমান্স যে অপ্রাকৃত হয় নাই, ইহার মধ্যে যে একটা স্পষ্ট আভ্যন্তরীণ সংগতি ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে একটা গূঢ় সংযোগ আছে, ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের চরম কৃতিত্ব।

রমেশচন্দ্রের শক্তির প্রসার যে বঙ্কিম অপেক্ষা অনেক কম, এবং কল্পনার ইন্দ্রজালরচনা যে তাঁহার সত্যনিষ্ঠ প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী ইহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার এই সরল সত্যনিষ্ঠাই আমাদের পরিণত বিচারবুদ্ধির নিকট তাঁহার নরেন্দ্র-হেমলতার প্রেমচিত্রকে বঙ্কিমের প্রতাপ-শৈবলিনীর চিত্র অপেক্ষা অধিকতর মনোজ্ঞ ও রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। যেমন অনেক সময়ে সমস্ত সূক্ষ্ম কারুকার্য ও বর্ণপ্লাবন অপেক্ষা সবল, অকম্পিত হস্তের একটি সরল, বর্ণবিরল রেখা আর্টের দিক্ দিয়া অধিক আদরণীয় হয়, সেইরূপ রমেশচন্দ্রের এই বাস্তব প্রেমের সহজ অকৃত্রিম চিত্র বঙ্কিমের সমস্ত উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনা অপেক্ষা আমাদের হৃদয়কে অধিক গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে। ঐন্দ্রজালিক যে অল্প সময়ের মধ্যে বীজ হইতে বৃক্ষ ও বৃক্ষ হইতে ফল উৎপাদন করে, তাহা নিশ্চয়ই সমধিক বিস্ময়কর; কিন্তু মোটের উপর গাছের ফলই বেশি রসযুক্ত ও মিষ্ট। এক্ষেত্রে প্রকৃত ও গভীর রসের দিক্ দিয়া রমেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৩)

রমেশচন্দ্রের অপর দুইখানি উপন্যাস—'জীবন-প্রভাত' ও 'জীবন-সন্ধ্যা'—প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ঐতিহাসিক; সাধারণ মানবের জীবনের কথা তাহাদের মধ্যে খুব অল্প স্থান অধিকার করে। অবশ্য ইতিহাসের উদ্দীপনা, বিপুল ঘটনাপুঞ্জের পরস্পর সংঘাতের যে আকর্ষণ তাহা ইহাদের মধ্যে যথেষ্টই আছে; কিন্তু ইতিহাসের বিপুল বেগের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া ক্ষুদ্র গার্হস্থ্য-জীবনকে নিয়মিত করিবার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। এক কথায়, এই উপন্যাস দুইখানির মধ্যে আমরা উপন্যাসের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব অনুভব করি।

অবশ্য ইতিহাসের ক্ষেত্রেও মানবপ্রকৃতির স্ফুরণ ও মানবহৃদয়ের বিশ্লেষণের যথেষ্ট অবসর আছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎক্ষেপেও যেমন, আমাদের নিভৃত-গৃহকোণস্থিত, স্তিমিত দীপ-শিখাতেও তেমনি, একই উপাদান, একইরূপ স্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান আছে। সাধারণ জীবনের মুক্ত প্রান্তর ও সমতল ভূমি দিয়া যে নদী ধীর, শান্ত প্রবাহে বহিয়া যায়, ইতিহাসের উপলসংকুল, বাধাবিঘ্নভূয়িষ্ঠ ক্ষেত্রে তাহাই ফেনিল ও দুর্নিবার হইয়া উঠে। ইতিহাসের বিপুল ঝঞ্ঝাবর্তের মধ্যে পড়িয়া আমাদের এই ক্ষীণ জীবনস্পন্দন উগ্র ও প্রচণ্ড হইয়া উঠে, একটা হিংস্র, তীব্র ভীষণতা লাভ করে, এবং নানা বিচিত্র ও বিস্ময়কর বিকাশের মধ্যে ফুটিয়া বাহির হয়। রমেশ-চন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসে এইরূপ কোন চিত্র নাই। রাজপুত বীরের ইতিহাসবিশ্রুত আত্মবিসর্জনের, ও রাজপুতরমণীর চিতানলে স্বেচ্ছামৃত্যুবরণের যে দৃশ্য আমরা 'জীবন-সন্ধ্যা'তে পাই, তাহার একটা চিত্রসৌন্দর্য (picturesqueness) আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই মনস্তত্ত্ব-মূলক উচ্চতর সৌন্দর্য নাই।

রমেশচন্দ্রের উপন্যাস দুইখানিতে ঐতিহাসিক সংঘাতের অবসরে যে দুই একটি কোমলতর বৃত্তির চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অস্পষ্ট ও মলিন। তাঁহার নায়কেরা কেহ কেহ যুদ্ধ-কোলাহলের অবসরে প্রেমের তান ধরিয়াছেন বটে, বর্ম খুলিয়া রাখিয়া প্রেমিকের পুষ্পমাল্য পরিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রেম মোটেই জীবন্ত ও রসপূর্ণ হইয়া উঠে নাই। 'জীবন-প্রভাতে' রঘুনাথ ও সরযূবালার প্রেম নিতান্তই নির্জীব ও বিশেষত্ববিহীন; সঙ্কটকালের যে একটা দুর্নিবার বেগ, একটা হ্রস্ব,সংক্ষিপ্ত বাহুল্যবর্জিত ভাব 'রাজসিংহ'-এর প্রেমচিত্রে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার কিছুই এখানে দেখিতে পাই না। লক্ষ্মীবাঈয়ের শান্ত, গভীর, একনিষ্ঠ প্রেম অনুভব করা যায় বটে,কিন্তু তাহা বিশ্লেষণের দ্বারা সুস্পষ্ট হয় নাই। 'জীবন-সন্ধ্যা'য় তেজসিংহ-পুষ্পকুমারীর প্রেমেও কতকটা অভিমান এবং অলীকসন্দেহজাত জটিলতা থাকিলেও, জীবন-স্পন্দনের চিহ্ন বিশেষ স্ফুট নহে। তবে এখানে বিপদের কালো মেঘ প্রণয়াবেশের উপর যে একটা নিবিড় ছায়া ফেলিয়াছে, তাহার ক্ষীণ আভাস মাঝে মাঝে ভাসিয়া উঠে; বিশেষতঃ, ভীলবালিকার গোপন ঈর্ষা ও বালিকাসুলভ দুষ্টামি ইহার মধ্যে কতকটা বৈচিত্র্যের সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর এখানে ইতিহাসেরই একাধিপত্য; রণঢক্কার নিনাদে ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের ক্ষীণ, করুণ, রস-বিচিত্র সুরটি ঢাকিয়া গিয়াছে। ইতিহাস-মহাবৃক্ষের ছায়ায় আমাদের সাংসারিক ফুলগাছটি বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

তবে কেবল ইতিহাসের দিক্ দিয়া এই উপন্যাসদ্বয়ের নিতান্ত অল্প প্রশংসা প্রাপ্য নহে। মহা-রাষ্ট্রের উত্থান ও রাজপুতের পতন ভারতেতিহাসের দুইটি কীর্তিভাস্বর পৃষ্ঠা; এই দুইটি পৃষ্ঠাতে

যত অনুপম বীরত্ব, যত উচ্চ ও পবিত্র হৃদয়াবেগ, যত গৌরবময় অনুভূতি ঘনীভূত হইয়া ইতিহাসের তুষারশীতল পাষাণফলকে নিশ্চল হইয়াছিল, রমেশচন্দ্র সেগুলিকে কল্পনার শিখায় দ্রবীভূত করিয়া মানব-মনের সজীব ভাবপ্রবাহের সহিত তাহাদের পুনর্মিলন সাধন করিয়া দিয়াছেন। এইটিই তাঁহার প্রধান গৌরব। তিনি ইতিহাসের মধ্য দিয়া মানব-মনের বিস্ময়কর বিকাশ, ইহার বিস্ফোরক শক্তি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলির একটা সুস্পষ্ট ধারণা দিয়াছেন; ইতিহাসের চিত্র-সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; যুগে যুগে যে কয়েকটি শক্তিশালী পুরুষ নিজ ইচ্ছাশক্তি, উচ্চাভিলাষ, প্রভৃতির সংঘাতের দ্বারা ইতিহাস রচনা করেন, তাঁহাদিগকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

যাঁহারা হৃদয়বিশ্লেষণকে উপন্যাসের প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করেন, যাঁহারা প্রত্যেক মানুষকে শ্রেণীবিশেষের আবেষ্টন ও বাহ্য সংঘাতের অনুচিত প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া তাহার নিজ স্বাতন্ত্র্যবিকাশকে খুব সূক্ষ্মভাবে, যেন অণুবীক্ষণের মধ্য দিয়া, পরীক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহারা অবশ্য রমেশচন্দ্রের রচনায় চিত্র-সৌন্দর্যে বা ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির একটা সাধারণ বিকাশে সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না। বাস্তবিক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দিক্ হইতে রমেশচন্দ্র খুব উচ্চ প্রশংসার অধিকারী নহেন। স্কটের মত তাঁহারও মনস্তত্ত্বজ্ঞান নিতান্ত প্রাথমিক (elementary) রকমের; বাহ্য ঘটনার সংঘাত ফুটাইয়া তুলিতে তিনি এত ব্যস্ত, ইতিহাসের বৃহত্তর বিকাশ-গুলিতেই তিনি এত নিবিষ্টচিত্ত যে, অন্তর্জগতের দ্বন্দ্ব-বিপ্লব বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিতে তাঁহার অবসর হয় নাই। তিনি যে যুগের ঔপন্যাসিক, তখন আধুনিক উপন্যাসের বিশ্লেষণ-মূলক আদর্শ এতটা প্রাধান্য লাভ করে নাই। মানবচিত্তের উপর বহির্জগতের প্রভাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে আধুনিক ও পূর্বতন উপন্যাসের মধ্যে একটা মৌলিক প্রভেদ আছে। রমেশচন্দ্র যে সমস্ত ঔপন্যাসিকের আদর্শে অনুপ্রাণিত, তাঁহারা মানুষকে একটা বিশাল বাহ্যসংঘাতের মধ্যে স্থাপন করিয়া সেই সংকটকালে তাহার মানসিক অবস্থা ও ব্যবহার লক্ষ্য করিতে ভালবাসিতেন। বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক জগৎ হইতে একটা প্রকাণ্ড তরঙ্গ আসিয়া মানুষকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে উদ্যত; এক্ষেত্রে তাহার সুদীর্ঘ যুগব্যাপী চিন্তার, ধীর-মন্থর আত্মবিশ্লেষণের অবসর নাই। তাহাকে ক্ষণিক চিন্তার পর মতিস্থির করিতে হইবে; যে তরঙ্গ তাহার গৃহদ্বারে উপস্থিত, তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। সুতরাং ঘটনাবহুল ঐতিহাসিক উপন্যাসে খুব সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত বিশ্লেষণের স্থান নাই। এমন কি তাহার চিন্তাধারার মধ্যেও বহির্জগতের প্রভাব অত্যন্ত অধিক। বাহ্যঘটনার গতিবেগের সহিত তাল রাখিয়াই তাহাকে নিজের চিন্তা নিয়মিত করিতে হইবে। দুই বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিব, রাজনৈতিক কর্তব্যের সহিত পারিবারিক কর্তব্যের বিরোধ হইলে কাহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিব, দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে নিজ ব্যবহারের সুসংগতি ও সামঞ্জস্য কিরূপে রক্ষা করিব, জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া দুই পরস্পর-বিরোধী নীতির মধ্যে কাহাকে বরণ করিয়া লইব—ঐতিহাসিক উপন্যাসের চরিত্রদের মনের মধ্য দিয়া এইরূপ চিন্তাধারা প্রবাহিত হইতে থাকে, এবং উহাদের উপরে বহির্জগতের প্রভাব নিতান্ত সুস্পষ্ট। কাজে কাজেই ইহার নায়কেরা প্রায়ই অস্পষ্ট ও ছায়াময় হইয়া থাকে; তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িবার পূর্বে তীরে দাঁড়াইয়া তাহারা যে মুহূর্তমাত্র চিন্তার অবসর পায়, তাহাতেই তাহাদের অন্তঃপ্রকৃতির স্বরূপটি, চিত্তবিপ্লবের চিত্রটি যাহা কিছু

ফুটিয়া উঠে। তাহার পরই যখন তাহারা আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া তরঙ্গের সহিত ভাসিয়া যায়, তখন আর তাহাদের ব্যক্তিত্বটি খুব স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট থাকে না; কেবল তাহাদের মস্তকের উপর যশঃকিরীট সূর্যরশ্মিতে ঝলমল করিতে থাকে মাত্র। সুতরাং স্কট ও রমেশচন্দ্রের নায়কেরা প্রায়ই ইতিহাসের বিশাল ক্ষেত্রে অস্পষ্ট জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকেন; তাঁহাদের আসল ব্যক্তিত্বটি নিজ অনিন্দনীয় চরিত্রের অন্তরালে চাপা পড়িয়া যায়। আমাদের রঘুনাথজী হাবিলদার ও তেজসিংহ অনেকটা এই দুরবস্থার ভাগী হইয়াছেন; তাঁহারা আদর্শ বীরত্বের মূর্ত বিকাশ হইয়াছেন মাত্র, একটা সুস্পষ্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারেন নাই।

আধুনিক উপন্যাসে বাহ্যসংঘাতের প্রসার অনেকটা খর্ব করিয়া মানবচিত্তের স্বাধীনতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে, তাহার চিন্তা ও আত্মবিশ্লেষণের অবসর দীর্ঘতর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য বহির্জগতের সহিত একেবারে সম্পর্কচ্ছেদ সম্ভবপর নহে, কেননা মানব-মনের অধিকাংশ প্রবল প্রেরণাগুলিও এই বাহিরের জগৎ হইতেই আসে। তবেই এই বাহিরের ক্ষমতার একটা সীমা-নির্দেশ আবশ্যক, যাহাতে ইহা অন্তরের স্বাভাবিক বিকাশকে অযথা অভিভূত না করে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঘটনাবাহুল্যের মধ্যে মানুষ একপাশে সসংকোচে দাঁড়াইয়া আছে। আধুনিক উপন্যাসে ঘটনার ভিড় যতদূর সম্ভব কমাইয়া মানুষকে প্রধান আসন দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহার মানসিক বিক্ষোভের চিত্রটি অতি সূক্ষ্ম ও ব্যাপকভাবে আলোচিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে বাহ্যঘটনা অনেকটা দুর্দান্ত দস্যুর মত আসিয়া পড়িয়া মানুষের কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিতেছে এবং তাহাকে অধিক চিন্তার অবসর না দিয়া তাহার মুখ হইতে তৎক্ষণাৎ একটা জবাব আদায় করিয়া লইতেছে। সেই মুহূর্ত হইতে তাহার মানসিক পরিবর্তন বাহ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় চলিতে বাধ্য হইতেছে। আধুনিক উপন্যাসে বহির্জগতের এই দোর্দণ্ড আততায়ীর প্রতাপ অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণ ঘটনা মানুষের উপর জাল বিস্তার করে এবং ধীরে ধীরে তাহাকে শতবন্ধনের নাগপাশে জড়াইয়া ফেলে, তাহারা তাহার চিত্তকে অভিভূত না করিয়া আত্মবিশ্লেষণের যথেষ্ট অবসর দেয়; প্রত্যেক পাকটি কেমন করিয়া জড়াইয়া আসিতেছে এবং মানুষের মর্মস্থানে অল্পে অল্পে কাটিয়া বসিতেছে, ঔপন্যাসিক আমাদিগকে তাহা দেখাইবার সুযোগ পান। এইজন্যই আধুনিক উপন্যাসে বিশ্লেষণের প্রাধান্য এরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা এই গুণের অভাবের জন্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের সহিত বিবাদ করিতে চাহেন, তাঁহারা উহার উদ্দেশ্য ও সুবিধা-অসুবিধার কথা বিশেষরূপ বিবেচনা করেন না।

কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস বিশ্লেষণের অভাব অন্য দিক্ দিয়া পূরণ করে। ঘটনা-বৈচিত্র্যে, একটা সমগ্র যুগের ব্যাপক বর্ণনায়, উচ্চভাব ও আদর্শের বিকাশে ও বীরত্ব-কাহিনীর প্রাচুর্যে ইহা মানুষকে এমন একটি তৃপ্তি দেয়, এমন একটি বর্ণবহুল সৌন্দর্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করে, যাহা সাহিত্যের অন্য কোনও শাখা আমাদিগকে দিতে পারে না। অন্য সাহিত্যের পক্ষে যাহা হউক, বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে ইহা একটি অবিসংবাদিত সত্য যে, ঐতিহাসিক উপন্যাস বাস্তব-জীবনের শূন্যতা পূর্ণ করিয়া আমাদিগকে এক বিচিত্র রসের আস্বাদ দেয়; এবং রমেশচন্দ্র এই রস আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণেই দিয়াছেন। তিনি বঙ্গসাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছেন, এক শূন্য পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছেন। আমাদের ক্ষীণ ও বৈচিত্র্যহীন জীবনে

যে-জাতীয় অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব, তাহা তাঁহার উপন্যাসে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে পাই। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, জাতীয়-ভাগ্যবিধাতা বীরপুরুষদের জীবন্ত চিত্র, গুরুতর রাজনৈতিক সংঘর্ষের বিবরণ, যুদ্ধবিগ্রহের রোমাঞ্চকর, উদ্দীপনাপূর্ণ বর্ণনা—এই সমস্তই রমেশচন্দ্রের আখ্যান-বস্তু। দূতের ছদ্মবেশধারী শিবজীর মোগল-শিবিরে গমন, তাঁহার দুঃসাহসিক নিশীথ-অভিযান, রুদ্র-মণ্ডল দুর্গ-জয়ের জলন্ত বর্ণনা, দিল্লী হইতে বিপদসংকুল গোপন পলায়ন, বিশ্বাসঘাতক চন্দ্ররাও-এর বিচারকালে শিবজীর দীপ্ত তেজ ও বজ্রকঠোর দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, আহেরিয়ার মৃগয়া, রাঠোর-চন্দাবতের বংশপরম্পরাগত চির-বৈরিতা, রাজপুত-বীরের অসাধারণ স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও রাজপুতরমণীর ভয়ংকর আত্মাহুতি—এই সমস্ত দৃশ্য আমাদের মনের গভীরতম স্তরে মুদ্রিত হয়। ভারত-ইতিহাসে চাণক্যের পর আর কোন চতুর রাজনীতিজ্ঞ আমাদের নিকট সুপরিচিত নহেন এবং চাণক্যের রাজনীতিতেও দক্ষিণ হস্ত অপেক্ষা বাম হস্তেরই, সরল অপেক্ষা কুটিল গতিরই সমধিক প্রভাব লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ, এই রাজনীতির উপর একটা মহান্ আদর্শের গৌরব কোন জ্যোতীরেখা-পাত করে না। সুতরাং শিবজীর রাজনীতি-কুশলতা, যশোবন্ত সিংহের সহিত সাক্ষাৎকালে তাঁহার উচ্ছ্বসিত বাগ্মিতা, লোকচরিত্রে অসাধারণ অভিজ্ঞতা, আবার তাঁহার কঠোর অলঙ্ঘনীয় শাসনপ্রথা, বিদ্রোহীর প্রতি ব্যাঘ্রবৎ হিংস্র ভয়ংকরমূর্তি, দক্ষতর চাতুর্যের দ্বারা আরংজীবের শঠনীতির প্রতিরোধ—আমাদের মনে একটা নূতন রকমের কৌতূহল সৃষ্টি করে। 'জীবন-সন্ধ্যা'য় তেজসিংহ-দুর্জয়সিংহের মধ্যে একটা বংশগত চির-বিরোধ, প্রতাপসিংহের অদম্য উৎসাহ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, ও তাঁহার সামন্ত-গণের অবিচলিত প্রভুভক্তি ইউরোপের মধ্যযুগের feudalismএর সহিত ভারতের বীরযুগের একটা গভীর ভাবগত ঐক্যের সাক্ষ্য প্রদান করে। বিশেষতঃ, দেশব্যাপী প্রলয়ের মধ্যে রাঠোর-চন্দাবতের বিরোধ একটি বিশালতর অগ্নিবেষ্টনের মাঝখানে এক অনির্বাণ, ক্ষুদ্র অথচ আকাশস্পর্শী হোমানলশিখার ন্যায় জ্বলে। চতুর্দিকে অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে এই স্থির, অকম্পিত অনলজিহ্বাটি ক্ষমাহীন প্রতিহিংসার মত, ক্রূর দৈবের উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত, নিশ্চল অঙ্গুলির মত আরও তীব্র ও ভীষণ দেখায়। 'রাজসিংহ'-এ ইতিহাসের মহাকোলাহলের মধ্যে জেবউন্নিসার দীর্ণ, রিক্ত হৃদয়ের আকুল ক্রন্দন যেরূপ করুণতর স্বরে আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে, এখানেও এই পূর্বপুরুষের রক্তরঞ্জিত জ্ঞাতিবিরোধ, বিদেশীয় আক্রমণকারীর প্রতি সাধারণ বিদ্বেষ ও সাধারণ দেশানুরাগের উচ্চস্বর ছাড়াইয়া আরও উচ্চতর, তীব্রতর স্বরে আত্মপ্রকাশ করে। ইহাই এই উপন্যাসগুলিকে ইতিহাসের সমতলভূমি হইতে কাব্যের উন্নত, বন্ধুর স্তরে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে।

চরিত্রসৃষ্টির দিক্ দিয়া রমেশচন্দ্র যে খুব উচ্চ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই তাহা পূর্বেই বলিয়াছি এবং ইহার জন্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃতিই অনেকাংশে দায়ী। তথাপি তাঁহার শিবজী একটি সম্পূর্ণ রক্তমাংসের মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, শিবজী একটা অবিমিশ্র বীরত্বের বা নীতিজ্ঞানের মূর্ত বিকাশ মাত্র নহেন; তাঁহার একটি সুস্পষ্ট রকমের ব্যক্তিত্ব আছে। তাঁহার চতুরতা, তাঁহার সাময়িক ভুলভ্রান্তি, তাঁহার অসংযত রোষোচ্ছ্বাস ও পরুষতা—এইগুলিই তাঁহাকে সাধারণ উপন্যাসের আদর্শ-চরিত্র, প্রেমপ্রবণ, কিন্তু প্রাণহীন বীরের দল হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। শিবজী বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক

আফজল খাঁকে হত্যা করিয়াছিলেন কিনা, সে বিষয় সম্বন্ধে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বিশেষ নিবিষ্টচিত্তে বিচারবিতর্ক আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন—অনেকে যুক্তি-তর্ক, প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা শিবজীর চরিত্র হইতে এই কলঙ্ককালিমা মুছিয়া ফেলিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কিন্তু সাহিত্যসমালোচকের পক্ষে ঐ বিতণ্ডা নিতান্তই নিরর্থক—বরঞ্চ সাহিত্যের দিক্ হইতে এই কলঙ্কের জন্যই শিবজীর চরিত্রে একটা অনন্যসুলভ বৈশিষ্ট্য, একটা সতেজ প্রাণস্পন্দনের পরিচয় পাওয়া যায়। যদি শিবজীর চরিত্র হইতে কলঙ্করেখা নিঃশেষে মুছিয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের দেশপ্রীতি প্রসন্ন হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু শিবজী কলাবিদের হস্তচ্যুত হইয়া, যে অস্পষ্ট-জ্যোতির্মণ্ডলবেষ্টিত আদর্শ রাজগণ প্রেতের ন্যায় ইতিহাসের মরুভূমিতে বিচরণ করিয়া বেড়ান, তাঁহাদের দলবৃদ্ধি করিবেন মাত্র।

এই উপন্যাস দুইখানির মধ্যে আর একটি চরিত্রও বেশ সজীব হইয়া উঠিয়াছে—তাহা মোগল সম্রাট আরংজেবের। আরংজেবের চরিত্র তাহার অসাধারণ জটিলতা ও গভীরতার জন্য প্রায়শঃই বঙ্গ-সাহিত্যের ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। রমেশচন্দ্র আরংজেবের সম্পূর্ণ চিত্র দেন নাই, শিবজীর আখ্যায়িকার সহিত তাঁহার যতটুকু সংস্রব ছিল, তাহাতেই আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। আরংজেবের রাজ্যপ্রাপ্তির সময়ে ধর্মান্ধতা ও উচ্চাভিলাষ মিশ্রিত হইয়া তাঁহার অন্তঃকরণে যে তুমুল কোলাহল তুলিয়াছিল এবং স্বাভাবিক ধর্মজ্ঞান ও স্নেহ-মমতার সহিত যে ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়াছিল, তাহার চিত্র রমেশচন্দ্রের সীমার বাহিরে পড়িয়াছে। কিন্তু তিনি আরংজেবের পরিণত বয়সের কুটিল চক্রান্ত ও সন্দেহ-দিগ্ধ রাজনীতির যে চমৎকার চিত্রটি দিয়াছেন, তাহার সত্যতা ও কলাসৌন্দর্য আমরা স্বতঃই অনুভব করি। দানেশমন্দ ও রামসিংহের সহিত কথোপকথনের ভিতর দিয়া রমেশচন্দ্র প্রকৃত ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টির সহিত আরংজেবের আসল স্বরূপটি প্রকাশ করিয়াছেন, সমস্ত বাহ্যদৃশ্যের আবরণ ভেদ করিয়া একেবারে তাহার মর্মস্থলে গিয়া হাত দিয়াছেন। অল্প পরিসরের মধ্যে এবং বিশ্লেষণের সাহায্য ব্যতিরেকেও আরংজেবের চরিত্রটি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাদের অনুরূপ কোন চরিত্র 'জীবন-সন্ধ্যা'তে পাওয়া যায় না এবং এই হিসাবে 'জীবন-প্রভাত'ই শ্রেষ্ঠতর উপন্যাস।

কিন্তু যদিও চরিত্র-সৃজনের দিক্ দিয়া 'জীবন-সন্ধ্যা' অপেক্ষা 'জীবন-প্রভাত' শ্রেষ্ঠতর, তথাপি অন্য একটি বিষয়ে প্রথমোক্ত উপন্যাসখানি আপন শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিয়াছে। রমেশচন্দ্র প্রতাপসিংহের জীবনব্যাপী স্বাধীনতাসংগ্রামের সমস্ত ভীষণতা যেন মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছেন, সমগ্র দেশের উপর যে বিপদ্‌রাশি কৃষ্ণ-মেঘের ন্যায় ঘনীভূত হইয়াছে, তাহা যেন তাঁহার কল্পনাকে এক বৈদ্যুতিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এই ভীষণ সংকল্পের সমস্ত দুঃখ-ক্লেশ, সমস্ত আত্মত্যাগ যেন তাঁহার প্রাণের তারে ঘা দিয়া তাঁহার মুখ হইতে এক সুদীর্ঘ সংগীতোচ্ছ্বাস বাহির করিয়াছে। এই সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভূতি তাঁহার কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া সেই অতীত heroic age-এর আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস ও সাধারণ চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টিকে অত্যন্ত পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। উপন্যাসখানির সর্বত্রই যে একটা গীতিকাব্যোচিত উন্মাদনার পরিচয় পাই, তাহা তাঁহাকে এমন কি নূতন চারণ-সংগীত রচনা করিতেও প্রণোদিত করিয়াছে। উপন্যাসের কথোপকথনের মধ্যে দিয়াও একটা বাহুল্যবর্জিত, পুরুষোচিত

ছন্দ বহিয়া গিয়াছে। এই সহজ, সরল, তেজস্বী ভাষার মধ্যে দৃঢ়পেশীবদ্ধ, কর্মঠ শরীরের ন্যায় একটা সতেজ সৌন্দর্য আছে। আমাদের বঙ্গসাহিত্যে এই বীরোচিত, ওজস্বী, অতিনাটকীয়ত্ব-বর্জিত ভাষার প্রথম প্রবর্তনের গৌরব রমেশচন্দ্রের প্রাপ্য। এই গভীর ভাবগত ঐক্য 'জীবন-সন্ধ্যা'তে যেরূপ স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়, 'জীবন-প্রভাত'-এ ততদূর নহে; এবং ইহাই 'জীবন-সন্ধ্যা'র অন্যান্য অভাব পূরণ করিয়া ইহাকে 'জীবন-প্রভাত'-এর সমকক্ষ স্থান দেয়। 'জীবন-প্রভাত' ও 'জীবন-সন্ধ্যা' বঙ্গসাহিত্যে দুইখানি চমৎকার ঐতিহাসিক উপন্যাস; বঙ্গসাহিত্যে তাহারা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

(খ) সামাজিক উপন্যাস

(৪)

রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস ছাড়া দুইখানি সামাজিক উপন্যাস—'সংসার' ও 'সমাজ'—লিখিয়াছেন। এখন এই দুইখানি উপন্যাসের আলোচনা করিলেই রমেশচন্দ্রের প্রতিভার প্রসার ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ ধারণা জন্মিবে।

'সংসার' ও 'সমাজ'-এ রমেশচন্দ্র ইতিহাসের কোলাহল হইতে শান্ত পল্লীর সৌন্দর্যের মধ্যে, আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের কথায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই দুইখানি উপন্যাসে তিনি নূতন শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা এতদিন ইতিহাসের সুবিশাল ক্ষেত্রে স্মরণীয় ঘটনাসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; সমাজ ও পরিবারের ক্ষুদ্র ব্যাপার লক্ষ্য করিতে তিনি অবসর পান নাই। কিন্তু তাঁহার শেষ উপন্যাসদ্বয়ে তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইতিহাসের বিশাল ও সমাজের সংকীর্ণ, এই উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার তুল্য অধিকার ও সমান শক্তি আছে।

'সংসার' ও 'সমাজ'-এ তিনি পল্লীগ্রামের পারিবারিক জীবনের এমন একটি সুন্দর, রসপূর্ণ, সহানুভূতিমূলক চিত্র দিয়াছেন, যাহা বঙ্গসাহিত্যে নিতান্ত সুলভ নহে। প্রথম দৃষ্টিতে ইহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব দেখা যায় না, কোনরূপ উচ্চাঙ্গের সৃজনীশক্তি, উচ্চস্তরের সমালোচনা লক্ষ্য হয় না; মনে হয় যেন সমস্তই কেবল বাস্তব বর্ননা, পল্লীসমাজের নিখুঁত ফোটোগ্রাফ মাত্র। ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে Jane Austen পড়িতে পড়িতে অনেকটা এইরূপ ভাবের উদয় হয়। লেখিকা এমন সহজ, সরলভাবে ঘটনাবিরল, প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র দিয়া যান, এতই সাবধানে বিশ্লেষণ-বাহুল্য ও গভীরতা বর্জন করেন যে, আমরা মনে করি যে ইহার মধ্যে বিশেষ কিছু কলাকৌশল নাই এবং কেবলমাত্র সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির অধিকারী হইলেই আমরাও ঐরূপ লিখিতে পারিতাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই নাই; খুব উচ্চ রকমের কলাকৌশল না থাকিলে নিতান্ত সাধারণ উপাদান হইতে এত সুন্দর ও মর্ম-স্পর্শী উপন্যাস রচনা করা যায় না। যে আর্ট আত্মগোপন করিতে পারে, নিজের সমস্ত বাহ্য লক্ষণ প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে, তাহাই উচ্চতম আর্ট।

আধুনিক উপন্যাসে যে বিশ্লেষণ ও মন্তব্যের গুরুতর আতিশয্য দেখা যায়, তাহাকে কোন মতেই অবিমিশ্র গুণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। বক্তব্যের সহিত মন্তব্যের, বর্ননার সহিত বিশ্লেষণের একটা স্বাভাবিক সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন; বিশ্লেষণের আতিশয্যের দ্বারা সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হইলে আর্টের ক্ষতি হয়। বক্তব্য বিষয়টি বেশ গভীরাত্মক না

হইলে, মানব-মনের নিগূঢ়-লীলার পরিচায়ক না হইলে, তাহা অতিরিক্ত বিশ্লেষণের ভার সহ্য করিতে পারে না ; নিতান্ত সাধারণ বা শূন্যগর্ভ ব্যাপারকে চিরিয়া দেখাইয়া কোন লাভ নাই। বিশেষতঃ, যে বিশ্লেষণ দুই এক কথায় সারা যায়, সংকেত বা ইঙ্গিতের দ্বারা ফুটাইয়া তোলা যায়, তাহাকে আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা টানিয়া বুনিয়া পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটান ও সমস্ত বিষয়টিকে নিতান্ত তিক্ত ও নীরস করিয়া ফেলেন। যাহা পাঠকের সহজ বুদ্ধি, স্বাভাবিক সহৃদয়তা বা কল্পনাশক্তির উপরে অনায়াসে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহাকেও সুদীর্ঘ বিশ্লেষণের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়া লেখক প্রকারান্তরে পাঠকের বুদ্ধির অপমানই করেন। এই হইল একদিক্ ; আর একদিকে আমরা উপন্যাস-সাহিত্যের প্রারম্ভে—'আলালের ঘরের দুলাল'-এর মত উপন্যাস দেখিতে পাই। এখানে মন্তব্য ও সমালোচনার একান্ত অভাব ; লেখক কতকগুলি শুষ্ক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন মাত্র, বিশ্লেষণের দ্বারা তাহার অন্তর্নিহিত অর্থটি বাহির করিতে কোন চেষ্টা করেন নাই ; তাঁহার নিজের মন্তব্যের দ্বারা সেই ঘটনার কঙ্কাল-রাশি হইতে কোন প্রাণের রস নিষ্কাশিত করেন নাই, মানব-জীবন সম্বন্ধে কোন গভীর ও ব্যাপক ধারণা ফুটাইয়া তোলেন নাই। এইখানেই বিশ্লেষণের উপকারিতা। বিশ্লেষণ একেবারে বাদ দিলে উপন্যাস আর্টের গৌরব ও গভীরতা হারায় ; আবার বিশ্লেষণে অযথা ভারাক্রান্ত হইলে উপন্যাসের স্বচ্ছন্দগতি নষ্ট হয় এবং উহা নির্জীব ও রসহীন হইয়া পড়ে।

রমেশচন্দ্রের এই দুইখানি উপন্যাসে বর্ণনার অনুপাতে বিশ্লেষণ অনেকটা অপ্রচুরই বলিতে হইবে। তিনি মানব-হৃদয়ের গভীরতম তলদেশে, তাহার নিগূঢ় রহস্যের জন্মস্থানে প্রায়ই অবতরণ করেন নাই। তিনি জীবনের প্রাথমিক ভাবগুলি লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। তিনি যে সমস্ত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বিশেষ গভীরতা বা জটিলতা নাই, খুব গুরুতর অন্তর্বিপ্লবেরও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের নগেন্দ্রনাথ বা গোবিন্দ-লালের মত তাঁহার চরিত্রগুলির আভ্যন্তরীণ বিকাশ ও প্রবল অনুশোচনা তিনি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। 'সংসার'-এ শরৎ ও সুধার প্রেম-বিকাশ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র নিতান্ত সাধারণ ও বিশেষত্বহীন হইয়াছে ; কোন প্রবল আবেগ বা দুর্দমনীয় মনোবৃত্তির বৈদ্যুতিক শক্তি তাহাদের মধ্যে খেলিয়া যায় নাই। এই সমস্ত বিষয়ে রমেশচন্দ্রের স্বাভাবিক পারদর্শিতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হইলে ইহা সময়ে সময়ে একটা গীতিকাব্যোচিত উন্মাদনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ; কিন্তু সামাজিক জীবনের শান্ত, ক্ষীণ প্রবাহের মধ্যে ইহা কেবল সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তিতে পর্যবসিত হইয়াছে, কোনরূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই। রমেশচন্দ্র জীবনের শান্ত প্রবাহ শান্তভাবে অনুসরণ করিয়াছেন, ইহার গভীর আবর্ত ও সমস্যাসংকুল জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করেন নাই।

কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে তিনি যে সুন্দর, সজীব চরিত্রগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়। 'সংসার'-এ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তারিণীবাবু ও হেমচন্দ্রের কথোপকথনের দ্বারা বিষয়বুদ্ধিশালী তারিণীবাবুর চরিত্রটি কেমন সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে! অবশ্য তারিণীবাবুর মধ্যে বিশেষ কোনও গভীরতা নাই ; কিন্তু তাঁহার উপর বাস্তবতার ছাপটি একেবারে অবিসংবাদিত ; বাস্তব-পল্লীজীবনে তাঁহার সহিত আমাদের প্রায়ই সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। আবার অল্প কয়েকটি রেখার দ্বারা বিন্দু, কালী ও উমার মধ্যে চরিত্রগত ও অবস্থাগত

প্রভেদটিও অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। উমার হাস্যোজ্জ্বল, ঐশ্বর্যমণ্ডিত তরুণ জীবনে ভবিষ্যৎ দুঃখের ক্ষুদ্র বীজটি ও তাহার ক্রম-পরিণতি লেখক খুব সুকৌশলেই দেখাইয়াছেন। এমন কি কালীতারার তিনটি খুড়ীশাশুড়ীও দুই একটি কথার মধ্যেই খুব সজীব ও পরস্পর হইতে পৃথক্ ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছেন। রমেশচন্দ্রের চরিত্রসৃজন খুব গভীর না হইলেও সম্পূর্ণ বাস্তব ও স্বাভাবিক হইয়াছে এবং এই গভীরতার অভাবই চরিত্রগুলির স্বাভাবিকতার অন্যতম কারণ। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের পাতায় আমরা যে সমস্ত নরনারীর দর্শন পাই, বাস্তব সামাজিক জীবনে তাহারা আমাদের চিরসহচর—কেননা আমাদের সমাজের সাধারণ জীবনে গভীর জটিল ভাবের লোক প্রায়ই আমাদের নয়ন-গোচর হয় না।

সরল, দরিদ্র পল্লীবাসীর প্রতি করুণ ও গভীর সহানুভূতি এই বাস্তব কাহিনীকে একটা ভাবগত ঐক্য দিয়াছে এবং আর্টের উচ্চস্তরে উঠাইয়া লইয়াছে। ধন ও বংশগৌরব অপেক্ষা হৃদয়ের মিলন যে জীবনে অধিক সুখের আকর—এই সত্যই রমেশচন্দ্র দার্শনিকের যুক্তির দ্বারা নহে, আর্টিস্টের রসবোধের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 'সংসার' উপন্যাসে তাঁহার সমাজ-সংস্কারের উৎসাহ তাঁহার কলাকৌশলকে ছাড়াইয়া যায় নাই ; যদিও বিধবা-বিবাহের বৈধতা প্রমাণ করা তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি বর্তমান উপন্যাসে এই উদ্দেশ্য উদ্দাম হইয়া উঠিয়া আর্টের সীমা লঙ্ঘন করে নাই। শরৎ ও সুধার জীবন-কাহিনী ও প্রীতির সম্পর্কটি এমন করুণ সহানুভূতির সহিত চিত্রিত হইয়াছে যে, তাহাদের বিবাহকে আমরা আর্টের অনুমোদিত ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়াই গ্রহণ করি ; সৌভাগ্যক্রমে সংস্কারকের উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্নই থাকিয়া যায়।

কিন্তু পরবর্তী উপন্যাসে সমাজসংস্কারের এই উৎসাহ একেবারে উদ্‌বেল হইয়া উঠিয়া আর্টকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছে। 'সমাজ' উপন্যাসখানিকে বেশ সহজেই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—প্রথম অংশের ঘটনাস্থল 'তালপুকুর' ও প্রধান উদ্দেশ্য বাস্তব-চিত্রণ ; দ্বিতীয় অংশে গল্পটি এক সম্পূর্ণ নূতন ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে এবং একটা নূতন পরিবারের ইতিহাস ও ভাগ্যের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। এই অংশের ঘটনাস্থল প্রধানতঃ তালপুকুরের নিকটবর্তী সনাতনবাটী গ্রাম ; ইহার নায়ক সনাতনবাটীর জমিদার-বংশ এবং ইহার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য জাতিভেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা। এই দুই অংশের মধ্যে যোগসূত্র খুব সহজ ও স্বাভাবিক হয় নাই। প্রথম অংশের প্রধান রস আমাদের পূর্ব-পরিচিত তারিণীবাবুর বৃদ্ধবয়সে পুনর্বিবাহের ব্যাপার লইয়া ; ইহাতে হাস্যরস ও ব্যঙ্গেরই প্রাধান্য ; তবে পদদলিতা প্রথমা স্ত্রীর কাহিনীটি এক স্বল্পভাষী করুণায় অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার যে দৃশ্যটি সর্বাপেক্ষা বিচিত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাহা চতুর্থ পরিচ্ছেদে তারিণীবাবু ও গোকুলচন্দ্রের বিবাহবিষয়ক কথাবার্তার বিষয়ক। এ যেন একেবারে শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি ; আমাদের পারিবারিক জীবনে এরূপ রাজনীতিসুলভ কূটবুদ্ধির, বিনয়-সৌজন্যের আবরণে এরূপ ক্ষুরধার চাতুর্যের এমন সুন্দর, বাস্তবরসপূর্ণ দৃশ্য বঙ্গসাহিত্যে আর কোথাও পাই না। নববধূ বালিকা গোপবালার বিষয়বুদ্ধি ও উচ্চাভিলাষের যে সংকেত পাওয়া যায়, তাহাই আমাদিগকে তাহার গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠার পরের কূটবুদ্ধি ও নির্মমতার জন্য প্রস্তুত রাখে। আবার 'ঠাকুমা' ও 'দাদামহাশয়ের' ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে

দাম্পত্যনীতির সরল ব্যাখ্যার অম্ল-মধুর স্বাদটি আদর্শ-ক্লিষ্ট রুচিকে সজীব করিয়া তোলে। দ্বিতীয় অংশে, বাস্তব বর্ণনার অভাব না থাকিলেও, লেখকের উদ্দেশ্য ও সংস্কার-প্রবৃত্তিই অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। রমাপ্রসাদ সরস্বতী যেন একটি মূর্তিমান্ শাস্ত্রজ্ঞান; হিন্দু-সমাজের বিকৃত আচার-অনুষ্ঠানগুলির উচ্ছেদ-সাধনই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত। যোগ-মায়ার প্রতি প্রেম ও তাহার সহিত পুনর্মিলনই তাঁহার প্রাণের একমাত্র সজীব অংশ, এইখানেই সাধারণ মানুষের সহিত তাঁহার কথঞ্চিৎ যোগ দেখা যায়। সুশীলার সহিত দেবীপ্রসাদের বিবাহ ঘটাইয়া রমেশচন্দ্র তাঁহার সংস্কারকোচিত উৎসাহকে একেবারে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দিয়াছেন, আমাদের সমাজের বাস্তব অবস্থাকে একেবারে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন। শরৎ-সুধার বিবাহকে যেমন আমরা তাহাদের পূর্বজীবনের একটা স্বাভাবিক পরিণতিরূপেই দেখি, সুশীলা ও দেবীপ্রসাদের ক্ষেত্রে সেইরূপ কোন সমর্থনযোগ্য কারণ পাই না; এ বিবাহ সংস্কারকের অত্যুৎসাহের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে, আর্টের কোন ধার ধারে নাই। বিশেষতঃ, রমেশচন্দ্র তাঁহার উৎসাহাধিক্যে অন্ধ হইয়া বিধবা-বিবাহ ও অসবর্ণ-বিবাহের যে আসল সমস্যা তাহার সম্মুখীন হন নাই; বিবাহের পর যখন সমাজে সমস্যাটি জটিল হইয়া উঠিবার কথা তখনই নিতান্ত সুবিধাজনকভাবে তাহার উপর যবনিকাপাত করিয়াছেন। প্রত্যেক অভিজ্ঞ পাঠকই ভালরূপ জানেন যে, জনসাধারণের যে জয়নাদের মধ্যে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি হইয়াছে, বাস্তব-জীবনে সেইরূপ ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই; সেখানে জনসাধারণের কোলাহল সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকারই ধারণ করিয়া থাকে। এইখানে রমেশচন্দ্র কলাকৌশলের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট অপ্রত্যাশিত এক বাস্তবভীরুতার পরিচয় দিয়াছেন।

পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, এইবার তাহার একটি সংক্ষিপ্তসার দিয়া অধ্যায়ের উপসংহার করিব। রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক ও সামাজিক দুই প্রকার উপন্যাসেই নিজ ক্ষমতার পরীক্ষা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে তিনি সমধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—তাঁহার 'জীবন-প্রভাত' ও 'জীবনসন্ধ্যা' বঙ্গসাহিত্যে খাটি ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের অনেকগুলি গুণ আছে—তিনি বর্ণিত যুগের বিশেষত্বটুকু উপলব্ধি করেন, বীরত্ব-কাহিনীর উন্মাদনা নিজ রক্তের মধ্যে অনুভব করেন ও বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে একটা ভাবগত ঐক্য স্থাপন করিতে পারেন। অবশ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের আর একটা গুণ—সাধারণ সামাজিক জীবনের উপর ইতিহাসের বিশাল ঘটনাগুলির প্রভাব-চিত্রণ—তাঁহার রচনায় নাই; কিন্তু ইতিহাস সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের অভাবই ইহার কারণ। সামাজিক উপন্যাসে রমেশচন্দ্রের বিশেষ গুণ তাঁহার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও পল্লী-গ্রামের দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের প্রতি করুণ ও অকৃত্রিম সহানুভূতি। তাঁহার সামাজিক উপন্যাসে কোন গভীর বিশ্লেষণ নাই, কেননা তিনি যে সমস্ত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কোন বিশ্লেষণযোগ্য জটিলতা নাই। শরৎচন্দ্র তাঁহার 'পল্লীসমাজ'-এ যে গভীর স্তরে অবতরণ করিয়াছেন, তাহা রমেশচন্দ্রের ক্ষমতার অতীত। কিন্তু ইহার একটি কারণ এই যে, শরৎচন্দ্র পল্লীসমাজের বিকারগুলিকে অতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন; রমেশচন্দ্র তাহার স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থারই বর্ণনা করিয়াছেন, বিকৃতির দিক্‌টা কেবল উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহাকে ফুটাইয়া তোলেন নাই। সুতরাং শরৎচন্দ্র সমাজদেহের ক্ষতপ্রদেশে যত গভীরভাবে

ছুরিকা চালাইয়াছেন, রমেশচন্দ্র সমাজের সুস্থদেহে সেরূপ পারেন নাই। কিন্তু এই বিশ্লেষণ-শক্তির অপ্রাচুর্য সত্ত্বেও তাঁহার চরিত্রগুলি বেশ সজীব ও বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। অনেক সময় তাঁহার লঘু ও অন্তরঙ্গ স্পর্শটি ইংরাজী সাহিত্যের মহিলা ঔপন্যাসিকদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রমেশচন্দ্র আমাদের অনেক মহিলা ঔপন্যাসিকের অপেক্ষা অধিক মাত্রায় স্ত্রীজাতিসুলভ সাহিত্যিক গুণের অধিকারী। সামাজিক উপন্যাসে তাঁহার প্রধান অপূর্ণতা একটা প্রবল আবেগের অভাব—মানবজীবনের সংকট-মুহূর্তগুলি তাঁহার কল্পনাশক্তিকে খুব গভীরভাবে আন্দোলিত করে নাই। এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার প্রধান প্রভেদ। বঙ্কিমের আবেগ বা উন্মাদনা তাঁহার নাই; বঙ্কিমের ন্যায় জীবনের রহস্যময় দুর্জ্ঞেয়তা, জীবনসমস্যার জটিলতা, জীবনের চরম মুহূর্তগুলির ভাবৈশ্বর্য তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে বঙ্কিম অপেক্ষা তাঁহার সত্যনিষ্ঠা অধিক ছিল; তাঁহার উপন্যাসে বঙ্কিমের বিচিত্র রোমান্স ও ঐন্দ্রজালিক মোহ নাই। কিন্তু তাঁহার সরল সত্যনিষ্ঠাই কোন কোন সময়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হইয়াছে; 'মাধবীকঙ্কণ'-এ তিনি ব্যর্থপ্রেমের যে অগ্নিজ্বালাময় চিত্র দিয়াছেন, বঙ্কিমের উপন্যাসের রত্নভাণ্ডারের মধ্যেও তাহার অনুরূপ দৃশ্য আমরা কোথাও খুঁজিয়া পাই না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র

(১) উপন্যাস ও রোমান্স

বঙ্কিমের উপন্যাসসমূহের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ হইয়াছে। এখন কেবল কলাকৌশলের দিক্ দিয়া তাঁহার উপন্যাসাবলীর কালানুক্রমিক বিচার করিতে হইবে।

বঙ্কিমের হাতে বাঙ্গালা উপন্যাস পূর্ণ-যৌবনের শক্তি ও সৌন্দর্য লাভ করিয়াছে। রমেশ-চন্দ্রের উপন্যাসে যে ক্ষীণতা, কল্পনাদৈন্য ও ভাবগভীরতার অভাবের পরিচয় পাই, তাহার চিহ্ন বঙ্কিমের উপন্যাসে লুপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সব কয়টি উপন্যাসের মধ্যেই একটা সতেজ ও সমৃদ্ধ ভাব খেলিয়া যাইতেছে, জীবনের গভীর রস ও বিকাশগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং জীবনের মর্মস্থলে যে নিগূঢ় রহস্য আছে, তাহার উপর আলোকসম্পাত করা হইয়াছে। অবশ্য আধুনিক বাস্তব-প্রবণতার জন্য উপন্যাস সম্বন্ধে আমাদের রুচি ও আদর্শের অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে; উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা যেরূপ নিখুঁত বাস্তবতার দাবী করি, রোমান্সের আকাশ-বাতাসে পরিবর্ধিত বঙ্কিম ততখানি দাবী পূরণ করেন না। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে একটা সাধারণ সত্য ধারণা দেওয়া যদি ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব হয় এবং বাস্তবতা যদি সেই সত্যলাভের অন্যতম উপায়মাত্র হয়, তাহা হইলে বাস্তবাতিশয্যের অভাব বঙ্কিমের গুরুতর দোষ বলিয়া বিবেচিত হইবে না; কেননা, তাঁহার সমস্ত উপন্যাসের উপরেই একটি বৃহত্তর সত্যের ছাপ বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তথ্যের রন্ধ্রগুলি তিনি কল্পনার দ্বারা পূরণ করিয়াছেন; কিন্তু মোটের উপর তাঁহার জীবন-চিত্রণ সত্যানুগামী হইয়া উঠিয়াছে। তিনি জীবনকে বিচিত্র রসে পূর্ণ ও কল্পনার ইন্দ্রজালে বেষ্টন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সত্যের সূর্যালোকের পথ অবরুদ্ধ করেন নাই। ইহাই তাঁহার চরম কৃতিত্ব; তিনি সত্যকে রসহীনতা ও নির্জীবতার উপর প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। জীবনের সত্য চিত্র দিতে গিয়া তাহাকে শুষ্ক করিয়া ফেলেন নাই, পরন্তু বিচিত্র রসের উচ্ছ্বাসের মধ্যেই ইন্দ্রধনুবর্ণ-রঞ্জিত সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। এ সমস্ত বিষয়ের সাধারণ আলোচনা পরে হইবে। এখন আমরা বঙ্কিমের প্রত্যেক উপন্যাস বিশ্লেষণ করিয়া উহারা কতদূর পর্যন্ত মানবহৃদয়ের গভীরস্তরে প্রবেশ করিয়াছে, ও জীবন সম্বন্ধে সত্য ধারণা ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি স্থূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—এক শ্রেণী সম্পূর্ণ বাস্তব, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বর্ণনা ও ব্যাখ্যাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় শ্রেণী ঐতিহাসিক বা অসাধারণ ঘটনাবলীর উপরে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ উপন্যাসে 'novel' ও 'romance' বলিয়া যে দুইটি প্রধান বিভাগ আছে, বঙ্কিমের উপন্যাসেও সেই দুইটি বিভাগ বর্তমান।

এখন 'novel' ও 'romance'-এর মধ্যে যে মৌলিক প্রভেদটুকু আছে, তাহা আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে। প্রধানতঃ উহাদের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা বাস্তব-গুণের আপেক্ষিক

প্রাধান্য লইয়া। 'Novel' অবিমিশ্রভাবেই বাস্তব; ইহার মধ্যে কল্পনার ইন্দ্রধনুরাগসমাবেশের অবসর অত্যন্ত অল্প। ইহার প্রধান কাজ সমসাময়িক সমাজ ও পারিবারিক জীবন-চিত্রণ; সত্য-পর্যবেক্ষণ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণই ইহার প্রধান গুণ। যতদূর সম্ভব সমস্ত অসাধারণত্বই ইহার বর্জনীয়; কেবল আমাদের জীবন-প্রবাহের মধ্যে যে সমস্ত দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি উচ্ছ্বসিত, যে সমস্ত সংঘাত বিক্ষুব্ধ ও মুখরিত হইয়া উঠে, সেই রহস্যমণ্ডিত সত্যগুলির দ্বারাই ইহা অসাধারণত্বের সাময়িক স্পর্শ লাভ করিতে পারে। 'Romance'-এর বাস্তবতা অপেক্ষাকৃত মিশ্র ধরনের; ইহা জীবনের সহজ প্রবাহ অপেক্ষা তাহার অসাধারণ উচ্ছ্বাস বা গৌরবময় মুহূর্তগুলির উপরেই অধিক নির্ভর করে। অন্তরের বীরোচিত বিকাশগুলি, মনের উঁচুস্বরে বাঁধা ঝংকারগুলি, জীবনের বর্ণবহুল শোভাযাত্রা-সমারোহ—ইহাই মুখ্যতঃ রোমান্সের বিষয়বস্তু। সেইজন্য সূর্যালোক-দীপ্ত, অতিপরিচিত বর্তমান অপেক্ষা কুহেলিকাচ্ছন্ন, অপরিচিত অতীতের দিকেই ইহার স্বাভাবিক প্রবণতা। অতীতের বিচিত্র বেশ-ভূষা ও আচার-ব্যবহার, অতীতের আকাশ-বাতাসে লঘুমেঘখণ্ডের মত যে সমস্ত অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস ও কবিত্বময় কল্পনা ভাসিয়া বেড়ায়, রোমান্সলেখক সেইগুলিকেই ফুটাইয়া তুলিতে যত্ন করেন। অবশ্য এই সমস্ত অসাধারণত্বের মধ্যেও রোমান্স বাস্তব-জীবনের সহিত একটি নিগূঢ় ঐক্য হারায় না; জীবনের সহিত যোগসূত্র হারাইলেই ইহা একটি সম্পূর্ণ অসম্ভব পরীর গল্পের মত হইয়া পড়িবে। মধ্যযুগের রোমান্স এইরূপ সম্পূর্ণ বাস্তব-সম্পর্কশূন্য ছিল বলিয়া তাহার উপন্যাসশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইবার স্পর্ধা ছিল না, তাহার অন্তহীন, মায়াঘন অরণ্যানীর মধ্যে আমাদের বাস্তব-জীবনের প্রতিধ্বনি বড় একটা শুনা যাইত না। কিন্তু আধুনিক যুগের যে প্রবর্ধমান বাস্তব-প্রবণতার মধ্যে সামাজিক উপন্যাস জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা রোমান্সের উপরেও নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে ছাড়ে নাই। আধুনিক রোমান্সও বাস্তবতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া সত্যের কঠোর সংযম স্বীকার করিয়া লইয়াছে। রোমান্সের জগতেও আর অতিপ্রাকৃত বা অবিশ্বাস্যের কোন স্থান নাই। রোমান্সলেখককেও এখন বাস্তব বা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর সৌধ নির্মাণ করিতে হয়, মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের দ্বারা কার্য-কারণ-সম্বন্ধ স্পষ্ট করিতে হয়, ইহার বাতাসে যে বিচিত্র বর্ণের ফুল ফুটে, তাহাকে মৃত্তিকার সহিত সম্পর্কান্বিত করিয়া দেখাইতে হয়। তবে সামাজিক উপন্যাসের সঙ্গে ইহার একমাত্র প্রভেদ যে, বাস্তবতার বন্ধন ইহাকে একেবারে নাগপাশের মত সুদৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরে নাই, ইহার মধ্যে বিচিত্র ও অসাধারণ ব্যাপারের অপেক্ষাকৃত অধিক অবসর আছে। সাধারণ উপন্যাসের ন্যায় রোমান্সের ক্ষেত্রে বাস্তবতার দাবী এত প্রবল বা সর্বগ্রাসী নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সগুলি আলোচনার সময়ে সামাজিক উপন্যাসের সহিত রোমান্সের এই মৌলিক প্রভেদটি আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের নিম্নলিখিত উপন্যাসগুলিকে রোমান্স-শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে: দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫); (২) কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬); (৩) মৃণালিনী (১৮৬৯); (৪) যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪); (৫) চন্দ্রশেখর (১৮৭৫); (৬) রাজসিংহ (১৮৮১); (৭) আনন্দমঠ (১৮৮২); (৮) দেবীচৌধুরাণী (১৮৮৪); (৯) সীতারাম (১৮৮৭)। অবশ্য এই সমস্ত উপন্যাসে রোমান্সের উপাদান সমানভাবে ঘনসন্নিবিষ্ট নহে—কোথাও বা রোমান্স উপন্যাসের আকাশ-বাতাসে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা সামাজিক জীবনের রুদ্ধপথে [illegible]

বিদ্যুৎশিখার ন্যায় একটা অনৈসর্গিক দীপ্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আবার তাহাদের সাহিত্যিক সৌন্দর্যও সকল ক্ষেত্রে সমান হয় নাই ; কোথাও বা বাস্তবতার সহিত অসাধারণত্বের একটি চমৎকার সমন্বয় সাধিত হইয়া উপন্যাসখানি অনিন্দনীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে ; কোথাও বা অসামঞ্জস্য প্রকট হইয়া উপন্যাসকে অবাস্তবতাদুষ্ট করিয়াছে ও আমাদের বিচার-বুদ্ধি ও সৌন্দর্যবোধকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। এই সমস্ত দিক্ দিয়া আমাদিগকে উপন্যাসগুলির বিচার করিতে হইবে।

'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমের সর্বপ্রথম উপন্যাস। ইহা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। শচীশবাবু তাঁহার বঙ্কিম-জীবনীতে লিখিয়াছেন যে, বঙ্কিমের ভ্রাতারা দুর্গেশনন্দিনী সম্বন্ধে বিশেষ অনুকূল মত প্রকাশ করেন নাই এবং অনেকটা তাঁহাদের প্রতিকূল মন্তব্যে নিরুৎসাহ হইয়াই বঙ্কিম উহার মুদ্রাঙ্কন কিছুদিন স্থগিত রাখেন। অবশ্য তাঁহাদের প্রতিকূল সমালোচনার হেতু কি ছিল, তাহা আমরা জানি না ; কিন্তু সমসাময়িক সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই বিরুদ্ধ মত আমাদের নিকট একটা নিতান্ত বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। আজকাল যুগান্তর শব্দটি আমরা যখন তখন ও নিতান্ত সামান্য কারণেই, অনেকটা ভাষাতে তীব্রতা যোজনার জন্যই ব্যবহার করিয়া থাকি ; কিন্তু ইহা বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না যে, 'দুর্গেশনন্দিনী' বাস্তবিকই বঙ্গ-উপন্যাস-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। পূর্ববর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর সঙ্গে ইহার ব্যবধান বিস্তর। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস সম্পূর্ণ দানা বাঁধিয়া উঠে নাই, উপন্যাসের উপাদানগুলি অনেকটা বিক্ষিপ্ত ও আকস্মিকভাবে উপস্থিত থাকিয়া একটি রসমূলক ও মনস্তত্ত্বমূলক যোগসূত্রের প্রতীক্ষা করিতেছিল। বিশেষতঃ, ইতিহাসের বিশাল ক্ষেত্র উপন্যাসের নিকট রুদ্ধ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র একমুহূর্তে ইতিহাসের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া দিয়া উপন্যাসের সীমা, বিস্তার ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আশ্চর্যভাবে বাড়াইয়া দিলেন। ইতিহাসের ঘটনাবহুল, উদ্দীপনাময় ক্ষেত্র হইতে বিচিত্র রস ও বর্ণ সংগ্রহ করিয়া জীবনকে রঞ্জিত করিলেন, তাহার সাধারণ গতিবেগ বর্ধিত করিলেন ও আমাদের হৃদয়স্পন্দনকে দ্রুততর করিয়া দিলেন। ইতিহাসের সংকটপূর্ণ মুহূর্ত-গুলিতে জীবনে যে অসাধারণ আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সঞ্চার হয়, আমাদের সাধারণ জীবনের শীর্ণ নদীতে যে প্রবল স্রোতোবেগ প্রবাহিত হয়, তাহার পরিচয় দিলেন। অতএব 'দুর্গেশনন্দিনী' আমাদের উপন্যাসসাহিত্যে একটি নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে। যে-পথ দিয়া উহার অশ্বা-রোহী পুরুষটি অশ্বচালনা করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে রোমান্সের রাজপথ এবং বঙ্গ-উপন্যাসে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই এই রাজপথের রেখাপাত করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রথম রচনায় অপরিণতির চিহ্ন অনেক। ইহার ঐতিহাসিক তথ্যসমষ্টির বিরলসন্নিবেশের বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। মোগল-পাঠানের যুদ্ধবৃত্তান্ত নিতান্ত ক্ষীণ রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে; ঐতিহাসিক পুরুষগুলির—মানসিংহ, কতলুখাঁ, প্রভৃতির—চরিত্রও বিশেষ গভীরতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সহিত চিত্রিত হয় নাই। ঐতিহাসিক প্রতিবেশরচনা বঙ্কিমের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, বর্ণিত যুগের বিশেষত্ব ফুটাইয়া তোলাতেও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। তবে ঐতিহাসিক বিপ্লব একজন সাধারণ দুর্গস্বামীর ভাগ্যের উপর কিরূপ অতর্কিত বজ্রপাতের মত আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারই একটি চিত্র আমরা উপন্যাসটিতে পাই।

কয়েকটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদের মধ্যেই বঙ্কিম এই প্রলয়-ঝটিকার প্রথম আবির্ভাব হইতে শেষ পরিণতি পর্যন্ত দেখাইয়াছেন; উপন্যাসের ঘটনাধারা আশ্চর্য দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হইয়াছে। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে দিগ্‌গজ-বিমলার সমস্ত লঘুহাস্য-পরিহাসের অবাস্তবতাকে ছাপাইয়া এক অজ্ঞাত অথচ আসন্ন বিপদের শঙ্কা ঘনাইয়া উঠিয়াছে। দুর্গজয়ের বিবরণে, বীরেন্দ্রসিংহের বিচারের দৃশ্যে ও কতলুখাঁর হত্যাবর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চাঙ্গের বর্ণনা ও কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কারাগারে আয়েষার প্রেমাভিব্যক্তির দৃশ্যটিই উপন্যাসের কেন্দ্রস্থল। এখানে বঙ্কিমের প্রণালী বাস্তব ঔপন্যাসিকের প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তিনি আয়েষার মনে প্রথম প্রণয়সঞ্চার ও উহার ক্রমবৃদ্ধির কোন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেন নাই। তাহার সেবা ও সহানুভূতি যে কোন্ গোপন-মুহূর্তে প্রণয়ে রূপান্তরিত হইল বা ওসমানের প্রতি স্নেহের সহিত এই নবজাত প্রেমের কোন্ বিরোধ-সংঘর্ষ হইয়াছিল কি না, তাহার কোন পরিচয় তিনি দেন নাই, একেবারে অনিবার্য প্রেমের পূর্ণ বিকাশ দেখাইয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছেন। পারিবারিক বা সামাজিক উপন্যাসে আমরা এই সমস্ত ভাব-বিকাশের একটি সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ, একটি প্রকৃতিমূলক ব্যাখ্যা আশা করিয়া থাকি; এবং বঙ্কিমচন্দ্রও বর্তমান উপন্যাসে তিলোত্তমার ক্ষেত্রে ও তাঁহাব পরবর্তী দুই-একখানি উপন্যাসে—'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'বিষবৃক্ষ'-এ—এইরূপ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার প্রযোজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রথম উপন্যাসে, কতকটা ঐতিহাসিক ঘটনা-বাহুল্যের জন্য, ও কতকটা রোমান্স-সুলভ অপ্রত্যাশিত পরিণতির অবতারণার দ্বারা গল্পাংশের আকর্ষণ বৃদ্ধি করিবার জন্য, তিনি এরূপ মনস্তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণে হস্তক্ষেপ করেন নাই। মনস্তত্ত্ব-আলোচনার দিক্ হইতে ইহাকে একটি ত্রুটি বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

চরিত্র-সৃজনের দিক্ দিয়াও বঙ্কিম এই উপন্যাসে খুব উচ্চাঙ্গের কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, চরিত্র ফুটাইয়া তোলা এখানে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। ঘটনার প্রবল প্রবাহের মধ্যে তিনি কোথাও অধিকক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারেন নাই, ঐতিহাসিক স্রোতের মধ্যে গভীর চরিত্রবিশ্লেষণের অবসর পান নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অনেকগুলি চরিত্র অল্প দুই-একটি রেখায় বেশ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। দুই-তিনটি দৃশ্যের মধ্যেই বীরেন্দ্রসিংহের চরিত্রের অসীম দার্ঢ্য ও অহংকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। ওসমানের হৃদয়ে অনির্বাণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তীব্র হিংসার বিকাশ দেখাইয়া বঙ্কিম তাহাকে একটি বাস্তব-মূর্তি করিয়া তুলিযাছেন, একটা বিশেষত্বহীন আদর্শমাত্রে পর্যবসিত হইতে দেন নাই। এই হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ক্রোধই তাহাকে একটি বিশেষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, দেশকালোচিত উপযোগিতা আনিয়া দিয়াছে। স্ত্রীচরিত্রগুলির মধ্যে, তিলোত্তমা, বিমলা ও আয়েষার রূপ ও প্রকৃতির বিভিন্নতা বঙ্কিম কেবল অদ্ভুত শব্দসম্পদের দ্বারাই ফুটাইয়াছেন। তিলোত্তমা ও আয়েষা প্রায়ই নীরব, নিতান্ত স্বল্পভাষিণী; অথচ কেবল মাত্র নিপুণ শব্দচয়নের দ্বারা লেখক তাঁহাদের প্রকৃতিগত প্রভেদটি কবিত্বপূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিলোত্তমার বালিকাসুলভ, ব্রীড়াবনত প্রেম-বিহ্বলতা, ও আয়েষার মহীয়ান্ গাম্ভীর্য ও গভীর আত্মসংযম—ইহাদের মধ্যে এরূপ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে যে, তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধে ভুল করিবার আমাদের কোনও অবসর থাকে না।

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে ঘটনা-বৈচিত্র্য ও গল্পাংশের আকর্ষণই প্রধান; বিশ্লেষণ ও কথোপকথনের দ্বারা চরিত্র-চিত্রণের তাদৃশ চেষ্টা হয় নাই। তথাপি দুই-একটি স্থলে কথোপ-

কথনেও বঙ্কিম বেশ দক্ষতা ও কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। শৈলেশ্বর-মন্দিরে বিমলা ও জগৎসিংহের যে দুইবার কথোপকথন হইয়াছে, তাহার মধ্যে লেখকের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কেবল গল্প-রচনার দিক্ দিয়াও নবীন লেখকের যে দুই-একটি ত্রুটি-বিচ্যুতি পাওয়া যায় না, এমন নহে। বিমলা ও বীরেন্দ্রসিংহের মধ্যে সম্বন্ধটি অনাবশ্যক জটিলতা ও রহস্যে আবৃত করা হইয়াছে; এবং বিমলার দীর্ঘ আত্মপরিচয়পত্রে কতকগুলি ব্যাপারের অসম্ভাব্যতা পাঠকের অবিশ্বাস জাগাইয়া তোলে। দিগ্‌গজ-উপাখ্যানের সমস্তটাই, স্থানে স্থানে প্রকৃত রসিকতা থাকা সত্ত্বেও, মোটের উপর আতিশয্য ও অতিরঞ্জনের দ্বারা বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেক উপন্যাসেই যে সন্ন্যাসী-জাতীয় একটা চরিত্র আনয়ন করিয়া অতিপ্রাকৃতের অবতারণা করিবার পথটি খুলিয়া রাখেন, তাহার প্রথম নিদর্শন আমরা অভিরাম স্বামীতে পাইয়া থাকি। অভিরাম স্বামীর আখ্যায়িকার মধ্যে বিশেষ কোন কার্য নাই; তিনি কেবল বিমলা-বীরেন্দ্র-সিংহের গোপন সম্বন্ধের একটা জীবন্ত নিদর্শন-স্বরূপেই উপন্যাস-মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন; আর বীরেন্দ্রসিংহকে মোগল-পক্ষ-অবলম্বনের প্রবৃত্তি দিয়া গল্পের tragedyকে আসন্নতর করিয়া দিয়াছেন। তবে বঙ্কিম এই প্রথম উপন্যাসে তাঁহার সন্ন্যাসীকে একেবারে রমানন্দ স্বামী বা সত্যানন্দের মত আদর্শলোকের কুহেলিকার মধ্যে লইয়া যান নাই। তাঁহাকে এক জ্যোতিষ-জ্ঞান ছাড়া আর কোন অতিমানবোচিত গুণের অধিকারী করিয়া দেখান নাই; এমন কি তাঁহার যৌবনের পদস্খলনের পরিচয় দিয়া তাঁহাকে সাধারণ লোকের সমশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের আর্টের আর একটি লক্ষণও 'দুর্গেশনন্দিনী'তে সূচিত হইয়াছে। বঙ্কিম তাঁহার প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই বাস্তব-বর্ণনার মধ্যে অতিপ্রাকৃতের ছায়াপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন কোন উপন্যাসে এই অতিপ্রাকৃতের ছায়া সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া যায় না, মানুষের মানসিক অবস্থার সহিত একটা গূঢ় সাংকেতিকতার সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে। ইউরোপের নিতান্ত আধুনিক গল্প-নাটকে যে symbolism, রহস্যের যে ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা অনেকটা তাহারই অনুরূপ। ইহা প্রায়ই স্বপ্ন বা অন্য কোন গুরুতর মানসিক বিকারের রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, এবং কোন কোন স্থলে ইহার একটি সন্তোষজনক, মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ 'বিষবৃক্ষ'-এ কুন্দনন্দিনীর ও 'রজনী'তে শচীন্দ্রের স্বপ্ন উল্লেখ করা যাইতে পারে; শৈবলিনীর বিকারগ্রস্ত মস্তিষ্কের উপর নরক-বিভীষিকার প্রতিচ্ছায়া ইহার চরম দৃষ্টান্ত। যোগবলের দ্বারা শৈবলিনীর অমানুষিক শক্তিলাভও 'চন্দ্রশেখর'-এ স্থান পাইয়াছে; 'আনন্দমঠ'-এ গ্রন্থশেষে যে মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাই, তিনি অতিমানবেরও অনেক ঊর্ধ্বে। অবশ্য উপন্যাসের বাস্তবতার দিক্ দিয়া ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই অগ্রাহ্য ও সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য; বাস্তব-জগতের শেষ সীমা বা চরম সম্ভাবনার মধ্যেও আমরা তাহাদিগকে স্থান দিতে পারি না। কিন্তু সম্ভব হউক, অসম্ভব হউক, উপন্যাসের পক্ষে উপযুক্ত হউক, অনুপযুক্ত হউক, এই আলো-ছায়া-মিশ্র, রহস্য-সংকেতপূর্ণ বাস্তব-অবাস্তবের সীমান্ত-প্রদেশের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা ও গূঢ় আকর্ষণ ছিল। তাঁহার সমস্ত অবাস্তব ব্যাপারের মধ্যেও এমন একটা গূঢ় সংযম ও সংগতি, এমন একটা আন্তরিকতা ও অভ্রান্ত কল্পনা-সমৃদ্ধির পরিচয় পাই, যাহাতে

সেগুলিকে উচ্চ সৃজনী-শক্তির ফল বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা বাধ্য হই। তাহারা যে কেবল কল্পনার বিলাস-বিভ্রম নহে, পরন্তু লেখকের অন্তঃকরণের গভীর স্তরে যে তাহাদের মূল আছে, আমাদের স্বতঃই এইরূপ প্রতীতি জন্মে। বঙ্কিমের মধ্যে যে সুপ্ত কবিটি কবিতার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন নাই, তিনিই যেন প্রতিশোধ লইবার জন্য ঔপন্যাসিকের বাস্তব চিত্রগুলির উপর কল্পলোকের এক অসম্ভব আলোক নিক্ষেপ করিয়াছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে আরোগ্যলাভের পর তিলোত্তমা তাঁহার রোগশয্যার যে স্বপ্নবিবরণটি জগৎসিংহের নিকট বলিয়াছেন, তাহা এই নিগূঢ় সৌন্দর্যের আলোকে প্লাবিত হইয়া উঠিয়াছে, অথচ উপন্যাসোচিত বাস্তবতার সীমাও লঙ্ঘন করে নাই। এই একটি ক্ষুদ্র বর্ণনাতেই তাঁহার কল্পনা-শক্তির ভবিষ্যৎ বিকাশের বীজটি পাওয়া যায়।

অনেক লেখক আছেন, যাঁহাদের প্রতিভা বেশ ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া ক্রমশঃ চরম পরিণতি প্রাপ্ত হয়; তাঁহাদের ক্রমোন্নতির রেখাটি বেশ স্পষ্টভাবেই টানা যায়। তাঁহাদের রচনা-সম্বন্ধে কালানুক্রমিক আলোচনাই প্রশস্ত; কালানুক্রমিক আলোচনার দ্বারাই তাঁহাদের প্রতিভার ক্রমবিকাশটি বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র-সম্বন্ধে বোধ হয় এই প্রণালী তাদৃশ কার্যকরী হইবে না; কেননা তাঁহার প্রতিভা সময়ানুবর্তী হইয়া ধীরে ধীরে বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই, প্রায় প্রথম হইতেই একটা সর্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কেবল এক 'দুর্গেশ-নন্দিনী'কেই তাঁহার অপরিপক্ব হস্তের রচনা বলা যাইতে পারে; শুধু ইহার মধ্যেই কতকটা ক্ষীণতা ও অস্পষ্টতা, কতকটা গভীর অভিজ্ঞতার অভাব, কতকটা যৌবন-স্বপ্নাবেশের ছায়া অনুভব করা যায়। নবীন লেখক যে তাঁহার বাস্তব-জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাকে শব্দসম্পদ্ ও কল্পনা-রাগের দ্বারা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বেশ বুঝিতে পারি। 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রায় দুই বৎসর পরেই 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) প্রকাশিত হয়। 'কপালকুণ্ডলা'তে বঙ্কিম-প্রতিভা তাহার সমস্ত ধূম্রাবরণ ত্যাগ করিয়া একটি প্রদীপ্ত অনলশিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে; 'দুর্গেশ-নন্দিনী'র সমস্ত অনিশ্চয়, সমস্ত সংকোচ, পুরাতন প্রথার সশঙ্ক অনুবর্তন বঙ্কিম সবলে কাটাইয়া উঠিয়াছেন। 'কপালকুণ্ডলা'র যে গুণটি খুব তীব্রভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা উহার অন্তর্নিহিত ভাবটির অসামান্য মৌলিকতা। এখানে বঙ্কিমের প্রতিভা নিজ স্বরূপের পরিচয় পাইয়াছে, এবং সমস্ত অনুকরণ ত্যাগ করিয়া নিজের জন্য একটি সম্পূর্ণ নূতন পথ বাহির করিয়া লইয়াছে। অবশ্য এখন হইতে বঙ্কিমের প্রতিভা যে একেবারে নির্দোষ ও প্রমাদশূন্য হইয়াছে, তাহা বলিতেছি না; কিন্তু এ সময়ের ভুল-ভ্রান্তি একটু নূতন রকমের; অতি-সাহসের ফল, ভীরুতার নহে। সময়ে সময়ে বঙ্কিম আপন প্রতিভার উপর অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন করিয়া তাহাকে গুরুভারপীড়িত করিয়া তুলিয়াছেন; উপন্যাসের মধ্যে এমন সমস্ত প্রকৃতি-বিরুদ্ধ উপাদানের সমাবেশ করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রতিভাও সম্পূর্ণভাবে গলাইয়া মিশাইতে পারে নাই। সময়ে সময়ে উপন্যাসকে তিনি নিজ আদর্শবাদের ছাঁচে ঢালিতে গিয়া উহার মৌলিক প্রকৃতিটি রক্ষা করিতে পারেন নাই। কল্পনার মুক্তপক্ষে উড়িয়া নীল আকাশের এমন সুদূরদেশে পৌঁছিয়াছেন, যেখানে আমাদের সহজ বুদ্ধি ও বিশ্বাস পায়ে হাঁটিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিতে পারে নাই। কিন্তু এই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি দুঃসাহসের ফল, অক্ষমতার নহে; সুতরাং ইহারা 'দুর্গেশনন্দিনী'র ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এইজন্যই বলা

যায় যে, বঙ্কিমের প্রতিভা 'দুর্গেশনন্দিনী'র পরেই একেবারে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে, ক্রমবিকাশের মন্থর পথে অগ্রসর হয় নাই।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে যে রোমান্স ঐতিহাসিক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সাহিত্যসুলভ প্রেমের আশ্রয়ে ধীরে ধীরে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল, তাহা 'কপালকুণ্ডলা'তে একেবারে সমস্ত বাহ্য অবলম্বন ত্যাগ করিয়া নিজ অন্তর্নিহিত রসের দ্বারাই পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে গতানুগতিকতার যে একটা জড়তা ছিল, তাহা 'কপালকুণ্ডলা'তে কল্পনা-শক্তির অসামান্য সাহসিকতায় সতেজ ও লীলাচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সাগরতীরবাসিনী, কাপালিক-প্রতিপালিতা, চির-সন্ন্যাসিনী কপালকুণ্ডলার মূর্তি-কল্পনায় বঙ্কিম যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা একজন বাঙ্গালী ঔপন্যাসিকের পক্ষে বাস্তবিকই বিস্ময়কর। আমাদের রুদ্ধ-দ্বার, সংকীর্ণ-প্রসর বাস্তব-জীবনে রোমান্সের উদার আলোক ও মুক্ত বায়ু নিতান্তই বিরল-প্রবেশ। সময়ে সময়ে আমরা বৈদেশিক সাহিত্যের অনুকরণ করিয়া বিদেশপ্রচলিত প্রণালীর দ্বারা আমাদের বাস্তব-জীবনে রোমান্সের উচ্ছ্বসিত প্রবাহ বহাইতে চাহি, কিন্তু বাস্তব-জীবনের সহিত অসামঞ্জস্যের জন্য এই চেষ্টা সার্থক ও শোভন হইয়া উঠে না। যেমন প্রত্যেক দেশের মাটিতে এক এক বিশেষ রকম ফুল রঙ্গিন হইয়া উঠে, সেইরূপ প্রত্যেক দেশেই রোমান্স তথাকার বাস্তব-জীবনের সহিত এক নিগূঢ় ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ, সেই বাস্তব-জীবনেরই একটা উচ্চতর বিকাশ। যেমন যে রস আমরা পারিবারিক জীবনে ঘরকন্নার প্রাত্যহিক কাজের মধ্যে মনপ্রাণ দিয়া খুঁজি, তাহাই সাহিত্যে গানের সুর হইয়া বাজিয়া উঠে, সেইরূপ রোমান্সের স্বপ্নও আমাদের বাস্তব-জীবন-বৃন্তের রঙ্গিন ফুল মাত্র। ইউরোপীয় সাহিত্যে সাধারণতঃ ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বা বিচিত্র, বিরোধ-জটিল প্রেমের অপ্রত্যাশিত বিকাশের মধ্য দিয়া রোমান্সের অনুসন্ধান হয়, ইউরোপীয় সভ্যতার এই স্বাভাবিক বিকাশের পথেই রোমান্স জীবনে প্রবেশ লাভ করে। কিন্তু ইতিহাস বা প্রেমের মধ্যে যে রোমান্সকে পাওয়া যায়, তাহা আমাদের উপন্যাসে ঠিক স্বাভাবিক হয় না। বাস্তব-জীবনের ঠিক অনুবর্তন করে না। কেননা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, ইউরোপের মত আমাদের দেশে ইতিহাস বা রাজনৈতিক সংঘর্ষ সাধারণ জীবনের উপর তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করে নাই। প্রেমের চিরন্তন লীলা আমাদের সাহিত্যে বা জীবনে ছিল না, ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে; কিন্তু ইউরোপীয় সমাজে প্রেমের বিচিত্র ধারা যেরূপ নূতন নূতন বিস্ময়ের মধ্যে বিকশিত হইয়াছে, আমাদের দেশে সামাজিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ঠিক সেরূপ হইতে পারে নাই। প্রেম বাহিরের দিকে বৈচিত্র্য ও বিস্ময়কর উন্মেষ লাভ না করিয়া, অন্তর্মুখী, গভীর ও একনিষ্ঠ হইবার দিকে চলিয়াছে। অবশ্য আমাদের অতীত যুগের সামাজিক অবস্থা যে ঠিক বর্তমানের মত নীরস ও বৈচিত্র্যহীন ছিল তাহা নহে। আমাদেরও একটা বীরত্বমণ্ডিত, গৌরব-ময় যুগ ছিল, আমাদেরও জীবন এককালে দুঃসাহসিকতার রুদ্রতালে আবর্তিত হইত, আমাদেরও প্রেম হয়ত একটা গভীর ও প্রবল আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। কিন্তু আজকাল আমাদের জীবনের ধারা এরূপ পরিবর্তিত হইয়া পড়িয়াছে, পুরাতন প্রণালী হইতে এতদূর সরিয়া গিয়াছে যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিকল্পনা-দ্বারাও সেই পুরাতন দিনের জীবনযাত্রা পুনর্জীবিত করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সেই পুরাতন আবেগ কোন্ চিরবিস্মৃতির মরুভূমে একবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাই উপন্যাসে আমাদের অতীত যুগের কাহিনী নিষ্প্রাণ-স্বপ্নের

অভাববশতঃ এই ব্যাখ্যা নিতান্ত কাল্পনিক, ফাঁকা ফাঁকা রকমের ঠেকে। তথ্যের যে পরিমাণ ঘনসন্নিবেশ হইলে একটা বৃহৎ ঐতিহাসিক ব্যাপার আমাদের চক্ষে সত্য ও জীবন্ত হইয়া উঠে, তাহা বঙ্কিমের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব ছিল; সেইজন্য তিনি তথ্যের অভাব কল্পনার বাষ্প-স্ফীতিদ্বারা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হেমচন্দ্র, মাধবাচার্য, পশুপতি, লক্ষ্মণসেন, শান্তশীল —একটা বিশাল রাজনৈতিক সংকটের সন্ধিস্থলে এই সমস্ত অশরীরী প্রেতমূর্তিই জাতির ভাগ্য-নিয়ন্তা, ইহা ভাবিতে মন একটা ক্ষুব্ধ অতৃপ্তি ও অবিশ্বাসের ভারে পীড়িত হইতে থাকে—তাহারা বিশাল মুসলমান-প্লাবন-তরঙ্গের উপর ক্ষণস্থায়ী বুদ্‌বুদের মতই প্রতীয়মান হয়। এক জপসাধনারত ব্রাহ্মণ ও এক রাজ্যচ্যুত, প্রণয়োন্মত্ত রাজপুত্র—যাহাদের পিছনে অর্থ ও লোক-বলের কোনই পরিচয় পাই নাই—ইহারাই মুসলমান সাম্রাজ্য ধ্বংসের প্রধান ও একমাত্র উদ্‌যোগী, ইহা মনে করিলে ডন্ কুইক্সোট ও সাঙ্কোপাঞ্জার কথাই মনে পড়ে। বিশেষতঃ, যে হেমচন্দ্রের উপর মাধবাচার্য এত গভীর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন, যাহাকে মুসলমানজয়ের একমাত্র উপায় বলিয়া সমস্ত প্রণয়বিলাস হইতে দূরে রাখিতে চাহিয়াছেন, তাহার কার্য-কলাপ আলোচনা করিলে এই গুরু দায়িত্বের জন্য তাহার অনুপযুক্ততার কথাই আমাদের মনে জাগিয়া উঠে। আবার পশুপতির প্রায় অনতিক্রমেয় নির্বুদ্ধিতা, সম্পূর্ণ উদ্‌যোগহীন অবস্থায় আপনাকে এবং দেশকে শত্রুহস্তে সঁপিয়া দেওয়া, আমাদের অবিশ্বাসকে একেবারে কাণায় কাণায় ভরিয়া তোলে। লেখক নিজেও এই ত্রুটি, এই অবিশ্বাস্যতার বিষয়ে বেশ সচেতন ছিলেন এবং পাঠকের বিদ্রোহ পূর্ব হইতে অনুমান করিয়া একটা যেমন-তেমন রকমের কৈফিয়ত দিতে চেষ্টা করিয়াছেন—'ঊর্ণনাভ জাল পাতে, যুদ্ধ করে না।' বস্তুতঃ রাজনৈতিক সমস্ত ব্যাপারটির উপরেই একটা অভিনয়োচিত অবাস্তবতা, একটা তীব্রশ্লেষাত্মক (ironic) অসংগতি ছায়াপাত করিয়াছে।

পক্ষান্তরে, অবিশ্বাসের চরম সীমা অতিক্রমের পরে আমাদের মনে একটা বিশ্বাসের প্রতি-ক্রিয়া আরম্ভ হয়। ভাবিয়া দেখিলে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, আমাদের দেশে ইতিহাসের ধারাই কয়েকটি ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, কোন যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস সমসাময়িক কয়েকটি প্রধান ব্যক্তির কার্যাবলীর সমষ্টি মাত্র। জনসাধারণ নামে যে ব্যক্তিটি ইউরোপীয় ইতিহাসে তাহার প্রভাব প্রতি পদক্ষেপেই ব্যক্ত করিয়াছে, সে আমাদের দেশের ইতিহাসক্ষেত্র হইতে একেবারে নিশ্চিহ্নভাবেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমাদের অতীতযুগের কোন গুরুতর রাজনৈতিক ঘটনার আলোচনা করিতে গেলেই, কয়েকটি ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাই আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে এবং ইহা লইয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। যে জনসাধারণের জাগ্রত, সচেষ্ট মনোভাব এই বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টাগুলিকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিতে পারিত, তাহারা তাহাদের সমস্ত জীবনটাই এক অবিচ্ছিন্ন নিদ্রাঘোরে কাটাইয়া দিয়াছে; বিনীতভাবে আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছে, নিশ্চেষ্টভাবে মার খাইয়াছে, কিন্তু কোনও প্রকারে নিজেদের ইচ্ছাশক্তি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে নাই। আবার কবিকল্পনা যখন ইতিহাসকেই অনুসরণ করিয়া চলে, তখন কাল্পনিক চরিত্রগুলিকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের অপেক্ষা সজীবতর দেখিতে কিরূপে আশা করিতে পারি? ঐতিহাসিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মণসেনই যখন এক ক্ষীণজীবী, কেবল

কুসংস্কার ও অক্ষমতার একটা মাংসপিণ্ড মাত্র,* তখন কাল্পনিক চরিত্রগুলির মধ্যে দ্রুততর জীবনস্পন্দন ও গভীরতর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আশা করা অনুচিত বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং ঐতিহাসিক চিত্রের যে অসম্পূর্ণতা আমাদের অসন্তোষ উৎপাদন করে, তাহার জন্য বঙ্কিম অপেক্ষা আমাদের ইতিহাসধারার বিশিষ্টতাই দায়ী।

কেবল কল্পনাশক্তির দ্বারা গুরুতর ঐতিহাসিক সংঘটনের যতদূর মর্মোদ্‌ঘাটন করা যায়, তাহাতে বঙ্কিম কৃতকার্য হইয়াছেন। মহম্মদ আলির সহিত পশুপতির গুপ্ত পরামর্শ ও বক্তিয়ার খিলিজির শাঠ্য প্রকৃত ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অনুপ্রাণিত। 'যবনবিপ্লব' নামক অধ্যায়টি (চতুর্থ খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ) উচ্চাঙ্গের বর্ণনাশক্তির পরিচয় দেয়। কিন্তু বঙ্কিমের কল্পনা-শক্তির চরম বিকাশ, মানসিক বিপ্লব ও অগ্ন্যুৎক্ষেপ ফুটাইয়া তুলিবার অতুলনীয় ক্ষমতার পরিচয় স্থল—'ধাতুমূর্ত্তির বিসর্জ্জন' নামক অধ্যায়টি (চতুর্থ খণ্ড, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ)। এই অধ্যায়টি জীবন্ত বর্ণনাশক্তিতে ও জ্বালাময় শব্দপ্রয়োগে Dickensএর বর্ণনার সহিত তুলনীয়। 'মৃণালিনী'তে বঙ্কিমের কলাকৌশল ও চরিত্রাঙ্কন-ক্ষমতা 'দুর্গেশনন্দিনী' অপেক্ষা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

(২) রোমান্সের আতিশয্য—'চন্দ্রশেখর,' 'আনন্দমঠ,' 'দেবীচৌধুরাণী,' 'সীতারাম'

'মৃণালিনী'র পাঁচ ও ছয় বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের দুইখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস—'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪) ও 'রাধারাণী' (১৮৭৫) প্রকাশিত হয়। এই দুইখানি অনেকটা আধুনিক ছোট গল্পের অনুরূপ—উপন্যাসের বিস্তৃতি ও প্রগাঢ়তা ইহাদের নাই। বিশেষতঃ, ইহাদের প্রধান আকর্ষণ ঘটনা-বৈচিত্র্যে, চরিত্র-চিত্রণে নহে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যেমন অনেক সময়ে অনেক অসাধারণ, অপ্রত্যাশিত ঘটনার আবির্ভাব হয়, সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অযাচিত অনুগ্রহ লাভ হয়, এই উপন্যাস দুইখানিও সেইরূপ আশাতীত শুভাদৃষ্টের, বিস্ময়কর মিলের (coincidence) কাহিনী। 'যুগলাঙ্গুরীয়' ও 'রাধারাণী' ঠিক একই জাতীয় উপন্যাস; প্রভেদের মধ্যে এই যে, প্রথমখানি অতীত যুগের কাহিনী, ও দ্বিতীয়টি ঘটনাকাল-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আধুনিক। কিন্তু এই প্রভেদ কেবল নামমাত্র। 'যুগলাঙ্গুরীয়'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস মনে করিবার কোন কারণ নাই; কোনরূপ ঐতিহাসিকতার ক্ষীণ আভাসমাত্রও ইহাতে নাই। তবে উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাকে অতীত যুগের শ্রেষ্ঠ বণিক্ সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া বঙ্কিম তাহাদের প্রেম-কাহিনীকে কতকটা স্বাভাবিকতা দিতে ও আধুনিক যুগের সন্দেহ-প্রবণতা ও অবিশ্বাস হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হিরণ্ময়ী-পুরন্দরের প্রেমে যা কিছু অসামাজিকতা বা অসাধারণত্ব আছে, তাহা সুদূর অতীতের আশ্রয়লাভে আমাদের চক্ষু এড়াইতে অনেকটা সমর্থ হইয়াছে।

'রাধারাণী'তে এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মাত্রা পূর্ণভাবেই অনুভব করা যায়। 'রাধারাণী'র

---

*পরবর্তী ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, লক্ষ্মণসেন অন্ততঃ যৌবনকালে শক্তিশালী, দিগ্‌বিজয়ী সম্রাট্ ছিলেন—এমন কি শত্রুপক্ষও তাঁহার যশকীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বার্দ্ধক্যের এই শোচনীয় বিপর্যয়ের কোন ব্যাখ্যা মিলে না।

প্রেম সম্পূর্ণ আধুনিক যুগের বলিয়া, ইহার স্বাভাবিকতা ও সুসংগতি রক্ষা করিতে লেখককে অনেকখানি বেগ পাইতে হইয়াছে। রাধারাণীর সহিত রুক্মিণীকুমারের বোঝা-পড়া দীর্ঘ চারি অধ্যায় ধরিয়া চালাইতে হইয়াছে, এবং এই চারি অধ্যায়ের মধ্যে লেখক পদে পদে একটা অস্বাভাবিক বাধা অনুভব করিয়াছেন ও নানাবিধ কৈফিয়তের দ্বারা তাহা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি বঙ্কিমের সহজ প্রতিভা এই সমস্ত বাধা-বিঘ্নের দ্বারা প্রতিহত হইয়াও তাহাদের উপর আংশিক বিজয় লাভ করিতে পারিয়াছে। বঙ্কিমের ক্ষমতার প্রধান পরিচয় এই যে, তিনি এই একটা ছেলেমানুষী গল্পের মধ্য দিয়াও—যেখানে গভীর চরিত্র-চিত্রণের কোন অবসর নাই সেখানেও—একটা মধুর ও গভীর রস সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন এবং বর্ণনীয় বিষয়ের সমস্ত অসংগতি কাটাইয়াও যে সমাধানে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আমাদের চক্ষে বিসদৃশ ঠেকে না।

'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-সমূহের মধ্যে অন্যতম। ইহাতে আমাদের পারিবারিক জীবনের সহিত বৃহত্তর রাজনৈতিক জগতের সম্মিলন প্রায় স্বাভাবিকভাবেই সংসাধিত হইয়াছে। সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে আদর্শ, তাহার দিকে 'চন্দ্রশেখর' পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলি অপেক্ষা বেশি অগ্রসর হইয়াছে। যদি কখনও রাজনৈতিক জগতের প্রবল প্রবাহ আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া থাকে ও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে একটা বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়া থাকে, তবে তাহা অরাজকতা ও জাতীয় ভাগ্যবিপর্যয়ের যুগগুলিতে। 'চন্দ্রশেখর'-এ এইরূপ একটা যুগ-পরিবর্তনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। তখন বঙ্গে মুসলমান-রাজত্ব ধ্বংসোন্মুখ ও ইংরেজ বণিকগণ অর্থ-উপার্জনের মোহে মুগ্ধ হইয়া সাম্রাজ্য-স্থাপন অপেক্ষা প্রজা-শোষণের দিকেই অধিকতর মনোযোগী ছিল। এই আধুনিক যুগের ইতিহাস 'দুর্গেশ-নন্দিনী' বা 'মৃণালিনী'র ঐতিহাসিক অংশের মত একেবারে শূন্যগর্ভ ও কল্পনাসর্বস্ব হয় নাই। ইংরেজ-সাম্রাজ্যের প্রথম পত্তন এই সে দিনের কথা; বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের যুগের সহিত তাহার মাত্র শতবর্ষ ব্যবধান। খুব নিকট অতীতের ব্যাপার বলিয়া সে যুগের স্মৃতি বাঙ্গালীর মনে উজ্জ্বল হইয়াই জাগরূক ছিল; বিশেষতঃ ইংরেজ তাহার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া, তাহার মুখ্য ঘটনাগুলিকে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতে দেয় নাই। সুতরাং 'চন্দ্রশেখর'-এর ঐতি-হাসিক চিত্রগুলিতে তথ্যের অপেক্ষাকৃত ঘনসন্নিবেশ হইয়াছে; সেই যুগের একটা মোটামুটি ব্যাপক ধারণা করিতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় না। নবাগত ইংরেজ শাসকদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, দুঃসাহসিকতা ও সর্বপ্রকার নৈতিক সংকোচহীনতার চিত্রটি উপন্যাসে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ, দেশবাসীদের সহিত তাহাদের সম্পর্কটি একটা অপরিচয়ের রহস্যে মণ্ডিত হইয়া এক বিচিত্র রোমান্সের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

'চন্দ্রশেখর'-এর রোমান্স প্রধানতঃ এই সর্বব্যাপী অরাজকতা ও কেন্দ্র-শক্তির শিথিলতা হইতে উদ্ভূত। অরাজকতা, প্রবল বৈদেশিক শক্তির অভিভব অনেক সময় আমাদের শান্ত, স্রোতোহীন পারিবারিক জীবনের উপর অতর্কিত দৈববিপ্লবের মত আসিয়া পড়ে এবং ইহাতে একটা অননুভূতপূর্ব গতিবেগ ও বৈচিত্র্য সঞ্চার করে; আমাদের অন্তঃপুরের ব্রীড়াসংকুচিত কুল-টিকে বাহিরের প্রবল ও পঙ্কিল বন্যায় ভাসাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু এই জাতীয় রোমান্স প্রায়ই বিশেষ গাঢ় ও গভীর হয় না। বৈদেশিক শত্রুর অভিভবে আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে যে

বিক্ষোভ জাগিয়া উঠে, তাহাতে অন্তর্বিপ্লবের কোন গূঢ় সৌন্দর্য থাকে না, কেবল একটা বাহ্য ঘটনাবৈচিত্র্য থাকে মাত্র। আর অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের সংঘর্ষে, যেখানে একপক্ষ কেবল পাইবার লোভে আক্রমণ করিতেছে এবং অপর পক্ষ, ব্যাকুল, দুর্বলভাবে অপ্রতিবিধেয় শক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার বৃথা চেষ্টা করিতেছে, সেখানে আমাদের মনে বিচিত্র সৌন্দর্যবোধ অপেক্ষা করুণরসেরই সমধিক উদ্রেক হইয়া থাকে, সমবেদনার অশ্রুজলে রোমান্সের সৌন্দর্য কোথায় ভাসিয়া চলিয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক অনেক লেখকই এই শ্রেণীর কাহিনীকে তাঁহাদের উপন্যাসের বিষয় করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই ইহার স্বাভাবিক করুণরস-প্রবণতাকে অতিক্রম করিয়া ইহার মধ্যে রোমান্সের বিচিত্র সৌন্দর্যসৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তাঁহারা কেহই বঙ্কিমের কল্পনাসম্পদ্, গূঢ় কলাকৌশল ও মানব-মনের সহিত গভীর পরিচয়ের অধিকারী ছিলেন না। বঙ্কিম তাঁহার সমসাময়িক লেখকদের অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ, 'চন্দ্রশেখর'-এর সহিত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি' উপন্যাসের তুলনা করিলেই, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রথচক্রতলে নিষ্পেষিত একটি ক্ষুদ্র সুন্দর প্রজাপতি দেখিলে আমাদের মনে যে ভাব হয়, শ্রীশচন্দ্রের উপন্যাসখানিও অনেকটা সেইরূপ ভাবেরই উদ্রেক করে, পাঠকের মনকে একটি অবিমিশ্র কারুণ্য-রসে ভরিয়া তোলে, কিন্তু তাহার মধ্যে অন্য কোন উচ্চতর কলা-কৌশলের নিদর্শন পাই না। 'ফুলজানি' উপন্যাসের সরলা স্নেহময়ী নায়িকার উপর যে কেন একটা এরূপ নির্মম বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহার এক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ছাড়া অপর কোনরূপ ব্যাখ্যা আমরা খুঁজিয়া পাই না। তাহার নিজ চরিত্রে এরূপ ভীষণ পরিণামের কোন বীজ লুকাইয়া ছিল বলিয়া লেখক আমাদিগকে দেখান নাই। প্রতিকূল-দৈব-পীড়িতা নায়িকা বাণ-বিদ্ধা হরিণীর মত নিতান্ত অকারণেই আমাদের সম্মুখে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে।

বঙ্কিমের প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি শৈবলিনীকে চক্রপিষ্ট পতঙ্গের মত কেবল বাহ্যশক্তি-নিপীড়িত করিয়াই দেখান নাই। যে প্রবল ঝটিকা তাহাকে তাহার শান্ত গৃহকোণ ও সুরক্ষিত সমাজ-জীবন হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছে, তাহার প্রকৃত জন্ম তাহার নিজ অশান্ত হৃদয়তলে। লরেন্স ফস্টরের সহিত তাহার সম্পর্ক অত্যাচারিত-অত্যাচারীর সম্পর্কের ন্যায় নহে। বিদ্যুৎ-শিখা যেমন মেঘের আশ্রয়ে থাকিয়া আত্মপ্রকাশ করে, সেইরূপ শৈবলিনীর অন্তর্গূঢ় জ্বালাময়ী প্রবৃত্তি ফস্টরের রূপমোহ ও দুঃসাহসিকতাকে অবলম্বন করিয়া বাহিরে আসিয়াছে ও দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঘটনাচক্রের যে পরিণতি হইয়াছে তাহাতে উভয়েরই দায়িত্ব আছে, যে অগ্নি জ্বলিয়াছে, তাহাতে উভয়েই ইন্ধন যোগাইয়াছে। শৈবলিনীর মনে গূঢ় পাপের অঙ্কুর না থাকিলে শুধু ফস্টরের পাপ ইচ্ছা ও প্রবল আগ্রহ তাহাকে গৃহাশ্রয় হইতে আকর্ষণ করিতে পারিত না, আবার ফস্টরের দুঃসাহসিকতার অপ্রত্যাশিত আশ্রয় না পাইলে শৈবলিনীর মনের গোপন পাপ অন্তরেই চাপা থাকিত, প্রকাশ্য বিদ্রোহের অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া উঠিত না। সুতরাং শৈবলিনীর কাহিনীটি সাধারণ অত্যাচারের কাহিনী অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন এবং ইহার মানসিক সম্পর্ক ও প্রতিক্রিয়াগুলি অনেক অধিক সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে আলোচিত হইয়াছে। আর বিশেষতঃ শৈবলিনী ও ফস্টরের মধ্যে কে যে অত্যাচারী ও কে যে অত্যাচারিত তাহা বলা কঠিন। ফস্টর বলপ্রয়োগ করিয়া শৈবলিনীকে লইয়া গেলেও শৈবলিনীর [illegible] উপর জয়লাভ করিয়াছে; এমন কি সে ফস্টরকে নিজ গূঢ়তর অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার [illegible]

ব্যবহার করিতে চাহিয়াছে, এবং এক অপ্রত্যাশিত দিক্ হইতে বাধা না আসিলে শৈবলিনী যে তাহার দ্বারা নিজ মনোরথ-সিদ্ধির পথ পরিষ্কার করিয়া লইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আরও অনেক দিক্ দিয়া 'চন্দ্রশেখর' সাধারণ ঔপন্যাসিকের অত্যাচারকাহিনী হইতে বিভিন্ন। যেমন শৈবলিনীর বিপদ্ তাহার অন্তরস্থ দুর্বলতার ফল, সেইরূপ ইহার পরিণতিও একটা গুরুতর অন্তর্বিপ্লব ও প্রায়শ্চিত্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য উপন্যাসে মৃত্যু যে সুলভ সমাধানের পথ দেখাইয়া দেয়, বঙ্কিমের প্রতিভা তাহা গ্রহণ করে নাই। শৈবলিনীর উৎকট প্রায়শ্চিত্তের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, সাধারণ মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দিক্ দিয়া তাহার মূল্য কত বলা সুকঠিন। সাধারণ মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা এ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত হইবে কি না তাহাও বলা দুরূহ। এত বড় একটা যুগান্তরকারী, বিপ্লবপূর্ণ অনুভূতির জন্য শৈবলিনীর চিত্তক্ষেত্র ঠিক প্রস্তুত ছিল কি না তাহাও সন্দেহের বিষয়। বঙ্কিম যেরূপ অচিন্তনীয় দ্রুত গতিতে ও অসাধারণ আবেষ্টনের মধ্যে এই মানসিক পরিবর্তন ঘটাইয়াছেন, তাহা হয়ত মানব-হৃদয়ের ধীর, বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা অপেক্ষা যাদুবিদ্যারই অধিক অনুরূপ। কিন্তু সমস্ত দৃশ্যটির মধ্যে যে অপরূপ কল্পনাসমৃদ্ধির ও আশ্চর্য কবিজনোচিত অন্তর্দৃষ্টির (poetic vision) পরিচয় পাই, তাহা গল্প-সাহিত্যে তুলনারহিত। তাহা মিল্টন ও দান্তের নরকবর্ণনার সহিত প্রতিযোগিতার স্পর্ধা করিতে পারে। বঙ্কিম এখানে কবির বিশেষ অধিকার দাবী করিয়া, ঔপন্যাসিকের যে কর্তব্য —মন্থর পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্ব-বিশ্লেষণ, অবিচলিত ধৈর্যের সহিত কার্যকারণের শৃঙ্খলা-রচনা—তাহা হইতে নিজেকে অব্যাহতি দিয়াছেন, এবং প্রতিভার বিদ্যুৎশিখার সম্মুখে সমালোচকের চক্ষুও তাহার বিচারবুদ্ধি পরিচালনা করিতে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংগতির ত্রুটি ধরিতে সংকুচিত হইয়া পড়ে।

'চন্দ্রশেখর'-এর রোমান্স মুখ্যতঃ মনস্তত্ত্বমূলক হইলেও ইহার মধ্যে চমকপ্রদ সংঘটনের অভাব নাই। ফস্টরের নৌকা হইতে শৈবলিনীর উদ্ধার ও শৈবলিনীর প্রত্যুপকার, গঙ্গা-বক্ষে প্রতাপ শৈবলিনীর স্মরণীয় সন্তরণ, মুসলমান কর্তৃক আমিয়টের নৌকা আক্রমণ ও ইংরেজদের মৃত্যুভয়-হীন বীরত্বের প্রকাশ—এই সমস্ত বিবরণের গল্প-হিসাবে আকর্ষণী শক্তি বড় কম নহে। মোটের উপর বঙ্কিম এই সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনায় ও রাজনৈতিক জটিলতাজালের বিবৃতিতে বেশ দক্ষতাই দেখাইয়াছেন, কোথাও অর্বাচীন-সুলভ অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন নাই—যুদ্ধের প্রত্যক্ষজ্ঞানরহিত বাঙ্গালী লেখকের পক্ষে ইহা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। অবশ্য এ বিষয়ে বঙ্কিম যে একেবারে ভ্রমপ্রমাদশূন্য, তাহা বলা যায় না, বিশেষতঃ, শৈবলিনীর দ্বারা প্রতাপের উদ্ধার-ব্যাপার যে সম্পূর্ণ সম্ভব, পাঠকের মনে সে বিশ্বাস না-ও হইতে পারে। প্রতাপের দ্বারা শৈবলিনীর উদ্ধার, প্রথম ঘটনা বলিয়া এবং ইংরেজদের পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত বলিয়া বরং বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যে একই চাতুরীর পুনরাবৃত্তি আমাদের বিশ্বাস-প্রবণতায় একটু রূঢ় রকমেরই আঘাত দেয়। বিশেষতঃ ইংরেজ-নৌকার পশ্চাদ্ধাবনের আসন্ন সম্ভাবনার মধ্যে প্রতাপ-শৈবলিনীর গঙ্গা-বক্ষে স্বচ্ছন্দ-বিহার ও তাহাদের জীবনের প্রধান সমস্যার সমাধানচেষ্টা একটু অসাময়িক বলিয়াই বোধ হয়। আবার উপন্যাসের মধ্যে রমানন্দ স্বামীর ন্যায় অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের অবতারণা এবং শৈবলিনীর সম্বন্ধে তাঁহার সদা-সতর্ক দৃষ্টি ও অভ্রান্ত ব্যবস্থা আমাদের বিশ্বাসকে বিদ্রোহোন্মুখ করিয়া তোলে। কিন্তু এই বাস্তবতা-

প্রিয় যুগের কঠোর পরীক্ষায় বঙ্কিম সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হইতে না পারিলেও মোটের উপর তাঁহার ঘটনাসমাবেশ-কৌশল যে খুব উচ্চ প্রশংসার যোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমের ঘটনাসমাবেশ-কৌশলের চরম বিকাশ শৈবলিনী-কাহিনীর সহিত দলনী-উপাখ্যানের গ্রন্থনে। এই দুইটি করুণ, বিষাদময় কাহিনী একসূত্রে গাঁথিয়া বঙ্কিম যে কি আশ্চর্য গঠন-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন, উপন্যাসখানির ভাবগৌরব ও সার্থকতা কতখানি বাড়াইয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়-মগ্ন হইতে হয়। যে রাজনৈতিক ঝটিকা দরিদ্র গৃহস্থ-গৃহের পূর্ব হইতে শিথিলিত-মূল লতাটিকে সহজেই উড়াইয়া আনিয়াছে, তাহা নবাবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রেয়সী মহিষীকে সমস্ত সম্ভ্রম-গৌরবের মাঝখান হইতে টানিয়া আনিয়া একেবারে সর্বনাশের অতল গহ্বরের শিরোদেশে উপস্থাপিত করিয়াছে। শৈবলিনীর ন্যায় দলনীও প্রথমে ভ্রান্তি দ্বারা বাহিরের সর্বনাশকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে,অসাবধান মক্ষিকার ন্যায় রাজনৈতিক উর্ণনাভজালের সহস্র বন্ধনে আপনাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। দলনী জীবনের ট্র্যাজেডি ও ইহার অপ্রতিবিধেয় নির্মম শক্তি ক্রূর দৈবের নিষ্ঠুর পরিহাসের মতই আমাদিগকে একটা গভীর ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলে। ইহা আমাদিগকে স্বতঃই মেটারলিংকের "Luck" নামক প্রবন্ধের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং ঐ প্রবন্ধে তিনি নিরীহ, নির্দোষ ব্যক্তির উপর ক্রুদ্ধ নিয়তির অত্যাচারের যে সমস্ত রোমাঞ্চকর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একটা প্রধান স্থান লাভ করে। দলনী স্বামীর অমঙ্গল-সম্ভাবনায় ভীত হইয়া একবার দুর্গের বাহিরে পা দিয়াই প্রতিকূল দৈবরূপ যে দুরন্ত দানবকে জাগাইয়া তুলিল, তাহার ক্ষমাহীন হিংসা তাহাকে মৃত্যু পর্যন্ত অনুসরণ করিয়াছে। সে বিপদ্ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে যতই চেষ্টা করিয়াছে, ততই সাংঘাতিকভাবে নিয়তির দুশ্ছেদ্য জালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। যে-কেহ তাহার আনুকূল্য করিতে চেষ্টা করিয়াছে, সে-ই তাহার হিতৈষণা দ্বারা তাহাকে সর্বনাশের অতল পংকে আরও গভীরভাবেই ডুবাইয়া দিয়াছে। যে কাল নিশীথে গুরগন খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় দলনীর দুর্গ-প্রবেশপথ রুদ্ধ হইল, সেই রাত্রে সন্ন্যাসিবেশী চন্দ্রশেখর তাহার সহায়তা করিতে গিয়া তাহাকে সর্বনাশের পথে আর এক পদ অগ্রসরই করিয়া দিলেন। আশ্রয়ব্যপদেশে তাহাকে সমস্ত রাজধানীর মধ্যে এমন একটি বাটীতে লইয়া গেলেন, সেখানে সর্বনাশ তাহার কৃষ্ণ চিহ্ন অংকিত করিয়া দিয়া গিয়াছে, যেখানে বিপদ্ নূতন জাল পাতিয়া তাহার প্রতীক্ষাতেই বসিয়া আছে। সেই রাত্রেরই শেষ ভাগে একটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভ্রান্তির বশে দলনী অতল গহ্বরের দিকে আর এক ধাপ নীচে নামিয়া গেল ; শৈবলিনীভ্রমে ইংরেজ তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল এবং নবাবের আগতপ্রায় ক্ষমার সীমার বাহিরে, আসন্ন উদ্ধারের স্পর্শ হইতে দূরে ফেলিয়া দিল। মহম্মদ তকির অনবধানতা ও দলনীর বিরুদ্ধে তাহার মিথ্যা অভিযোগ-সৃষ্টি, দলনীর নির্বন্ধাতিশয্যে ফস্টর কর্তৃক তাহার পরিত্যাগ, কুলসমের সহিত বিচ্ছেদ, ব্রহ্মচারীর নিষেধসত্ত্বেও মুঙ্গের যাত্রার কৃতসংকল্পতা—ঘটনার প্রত্যেক পদক্ষেপই দলনীর গলদেশে নিয়তির যে রজ্জু ঝুলিতেছিল, তাহার বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া দিয়াছে। শেষে নিয়তি যে বিষপাত্র পূর্ণ করিয়া তাহার ওষ্ঠে তুলিয়া দিল তাহাতে অপূর্ব মাধুর্য রসের অমৃত সঞ্চার করিয়া দলনী তাহা পান করিল এবং অদৃষ্টের অবিচ্ছিন্ন পীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভ করিল।

এই অসাধারণ অদৃষ্ট-মন্থনে একদিকে যেমন বিপদের হলাহল ফেনাইয়া উঠিয়াছে, তেমনি

আর একদিকে অন্তরের আলোড়নে ভাবের অমৃত বিষকে ছাপাইয়া বাহিরে আসিয়াছে। বাহিরের বিপদসংঘাতের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরেও একটা গভীর আলোড়ন চলিয়াছে এবং হৃদয়ের গভীর বৃত্তি ও ভাবসমূহ আশ্চর্য সমৃদ্ধির সহিত অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ, যে অধ্যায়ে (ষষ্ঠ খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ) কুলসমের তিক্ত, তীব্র সত্য-ভাষণে নবাবের দলনী বিষয়ে ভ্রান্তির নিরসন হইল, তাহাতে মীরকাসেমের অসহ্য মনঃপীড়া ও নিষ্ফল অনুতাপ গৈরিক অগ্নিস্রাবের ন্যায়ই আমাদিগকে দগ্ধ করে। অন্যান্য তীব্রভাবপূর্ণ দৃশ্যের মধ্যে সুষুপ্তা শৈবলিনীর সম্মুখে বসিয়া চন্দ্রশেখরের খেদপূর্ণ চিন্তা, ইংরেজ-হস্ত হইতে উদ্ধারের পর শৈবলিনীর সহিত প্রতাপের অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ, শৈবলিনী ও প্রতাপের গঙ্গা-সন্তরণ, দলনীর বিষপান, মৃত্যুকালে প্রতাপের আজীবন-রুদ্ধ প্রেমের জ্বালাময় অভিব্যক্তি এবং সর্বোপরি বিরাট্ কল্পনার দ্বারা মহিমান্বিত শৈবলিনীর উৎকট প্রায়শ্চিত্তের বিবরণ আমাদের মনের মধ্যে সুগভীর রেখায় কাটিয়া বসে এবং বিচিত্র-ভাব-নিলয় এই মানব হৃদয় ও গূঢ়-রহস্যাবৃত এই মানবজীবনের প্রতি একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ে আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে।

অবশ্য ভাষাগত উপযোগিতার দিক্ দিয়া সমস্ত দৃশ্য যে সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই, তাহার আভাস পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। কথোপকথনের সময়ে, একটা আলংকারিক শব্দাড়ম্বর সময়ে সময়ে বাস্তবতার সুরটিকে ঢাকিয়া ফেলে, পুষ্পাভরণপ্রাচুর্যে মৃত্তিকার রস ও গন্ধ অন্তরালে পড়িয়া যায়। বঙ্কিমের যুগে বাস্তব-জীবনের ভাষা সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করে নাই; করিলেও আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের ভাষা ভাবের এত উচ্চগ্রামে বাঁধা চলিত কি না সন্দেহ। সে যাহাই হউক, মোটের উপর কতকগুলি দৃশ্য কতকটা ভাষাগত অতিরঞ্জনের জন্য, আদর্শ সৌন্দর্য হইতে কিঞ্চিন্মাত্র ভ্রষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কথোপকথনের দিক্ দিয়া যাহা হউক, বর্ণনা ও ব্যঞ্জনায় এই ভাব-সমৃদ্ধ, অর্থগৌরবপূর্ণ ভাষা একটা সর্বাঙ্গসুন্দর সার্থকতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। নিদ্রিতা শৈবলিনীর সৌন্দর্য বর্ণনা, প্রতারণাশীল প্রভাত-বায়ুর বিপদ্-গর্ভ ক্রীড়াশীলতা, শৈবলিনীর পর্বতারোহণের পর প্রকৃতির ভয়ানক বিপ্লব ও মানুষের সুখে-দুঃখে তাহার নির্মম উদাসীনতার বর্ণনা এবং প্রায়শ্চিত্তের দৃশ্যগুলি বঙ্কিমের ভাষার চরম গৌরবস্থল।

চরিত্রাঙ্কনের দিক্ দিয়া এক শৈবলিনীর চরিত্রেই অনেকটা জটিলতা আছে; তাহারই অন্তরের গভীর তলদেশ পর্যন্ত বঙ্কিম আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাইয়াছেন। অন্যান্য সমস্ত চরিত্রই অপেক্ষাকৃত সরল; তাহারা সম্পূর্ণ বাস্তব ও জীবন্ত হইলেও, তাহাদের মধ্যে অধিক গভীরতা নাই, দুই একটি প্রাথমিক প্রবৃত্তি বা গুণেরই প্রাধান্য আছে। বঙ্কিম অতি সুকৌশলে শৈবলিনীর অধঃপতনের ক্রমবিকাশটি চিত্রিত করিয়াছেন। প্রথম যৌবনে প্রতাপ-শৈবলিনীর মধ্যে যে ব্যর্থ প্রণয়জ্বালা নিবারণের জন্য ডুবিয়া মরিবার পরামর্শ হয়, তাহাতেই শৈবলিনীর স্বার্থপরতা ও চরিত্র-দৌর্বল্যের প্রথম অঙ্কুর দেখা যায়। প্রতাপ নিজ প্রতিজ্ঞানুসারে ডুবিয়াছিল, কিন্তু শৈবলিনী শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকিতে পারিল না, প্রাণের মায়া তাহার প্রণয়াবেগকে হঠাইয়া দিল। এই অন্তর্নিহিত দুর্বলতার বীজটিই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে ক্রম-বর্ধিত হইয়া তাহাকে এক গুরুতর পদস্খলনের দিকে লইয়া গিয়াছে। তাহার পরই চন্দ্রশেখরের সহিত বিবাহ। বিবাহের আট বৎসর পরে ভীমা পুষ্করিণীর জলমধ্যে এই অমঙ্গলের বীজে আবার বারি-সিঞ্চন হইল, অন্তরস্থ পাপ প্রবল ও সতেজ হইয়া উঠিল। শৈবলিনীর বিবাহিত জীবনের এই আট বৎসরের ইতিহাস

আমরা প্রত্যক্ষভাবে পাই না—তবে চন্দ্রশেখরের আক্ষেপোক্তিতে তাহার একটি সহানুভূতিপূর্ণ চিত্রের আভাস পাই। চন্দ্রশেখরের বিষয়-বিমুখ, পাঠনিরত চিত্তবৃত্তিতে শৈবলিনী তাহার প্রণয়-তৃষ্ণা-নিবারণের বিশেষ সুযোগ পায় নাই। তারপর শৈবলিনীর মানস-পাপ বাহিরে প্রকাশ পাইল—ফস্টর ডাকাইতি করিয়া তাহাকে সমাজ-বক্ষ ও গার্হস্থ্য জীবন হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল। এইখানে বঙ্কিম একটি অভিনব প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন—তিনি শৈবলিনীর গোপন অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমাদের নিকট কোন স্পষ্ট উক্তি করেন নাই, তাহার পাপের কাহিনীটি ধীরে ধীরে যবনিকার অন্তরাল হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছেন। যেমন বাস্তব জীবনে ধীরে ধীরে পাপের আবিষ্কার হয়, অনুমান, সন্দেহ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আভাস শেষে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে পরিণত হয়, শৈবলিনীর ক্ষেত্রে ঠিক তাহাই হইয়াছে। সুন্দরীর সহিত বাড়ি ফিরিতে অস্বীকার-করণে তাহার পাপের প্রথম সন্দেহ পাঠকের মনে উদিত হয়; পরে প্রতাপের নিকটে শৈবলিনীর স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে আমাদের সন্দেহ দৃঢ় প্রতীতিতে পরিণত হয়। কিন্তু শৈবলিনীর যুক্তিধারাটি ঠিক আমাদের মনে লাগে না—ফস্টরের সহিত কুলত্যাগ করিয়া গেলে প্রতাপের প্রণয়লাভ যে কি প্রকারে সুলভ হইবে, তাহা দুর্বোধ্য বলিয়াই মনে হয়। পুরন্দরপুরের কুঠির বাতায়নে জাল পাতিয়া প্রতাপ-পক্ষীকে ধরার বিশেষ কি সুবিধা ছিল জানি না, কিন্তু এখানে শৈবলিনী প্রতাপের চরিত্র সম্বন্ধে যে একটা প্রকাণ্ড হিসাব-ভুল করিয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত। বোধ হয় সেই প্রণয়মূঢ়া ভাবিয়াছিল যে, সামাজিক ব্যবধানই তাহার প্রতাপ-লাভের পথে প্রধান অন্তরায়। প্রতাপের ইংরেজ-হস্তে বন্দী হইবার পরও এই ভ্রমের নেশা তাহাকে ছাড়ে নাই—সে নবাবের নিকটে দরবার করিয়া রূপসীর বিরুদ্ধে প্রতাপ-লাভের ডিক্রি পাইবার অসম্ভব আশাও মনে মনে পোষণ করিতেছিল। মজ্জমান ব্যক্তির তৃণখণ্ড ধরিয়া ভাসিবার চেষ্টার মত শৈবলিনীর প্রতাপ-লাভের এই অসম্ভব আশার মধ্যে একটা pathos—করুণ দিক্—আছে। প্রতাপের উদ্ধারের জন্য তাহার যে সমস্ত দুঃসাহসিক চেষ্টা, তাহাও তাহার প্রণয়াকর্ষণের তীব্রতার পরিচয় দেয়। তারপর সব শেষ—দীর্ঘকালসঞ্চিত সুখস্বপ্ন এক মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া গেল, নিদারুণ বজ্রাঘাতে আশারচিত প্রণয়সৌধ ধূলিসাৎ হইয়া গেল। এই পর্যন্ত শৈবলিনী-চরিত্রের বিশ্লেষণ চলে। তাহার পর সে মর্তলোকের অনেক ঊর্ধ্বে, এক অভিনব অনুভূতির রাজ্যে, বিশ্লেষণের সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। (এই সমস্ত প্রচণ্ড অনুভূতির ফলে ও ক্ষণস্থায়ী উন্মত্ততার অন্তরালে শৈবলিনীর মনের রাজ্যে একটা যুগান্তর সংঘটিত হইয়া গেল—তাহার মর্মস্থান হইতে প্রতাপের প্রতি অনুরাগের মূল পর্যন্ত উৎপাটিত হইল এবং শৈবলিনী প্রকৃতপক্ষে নবজীবন লাভ করিল। কিন্তু এই শেষের দিকের শৈবলিনী আর সমালোচকের বিশ্লেষণের বস্তু নহে, খুব উচ্চাঙ্গের কবিকল্পনার অনুভূতির বিষয়।

'চন্দ্রশেখর'-এ বঙ্কিম যে নূতন কৃতিত্ব ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গার্হস্থ্য জীবনের উপর রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাব এখানে সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। লেখক শৈবলিনীতে একটি জটিল স্ত্রীচরিত্রের সৃষ্টি ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব পূর্ব উপন্যাসের মধ্যে এক 'মৃণালিনী'তে মনোরমার চরিত্র অনেকটা জটিল ও রহস্যময়, কিন্তু মনোরমা মুখ্যতঃ কল্পনা-রাজ্যের জীব; শৈবলিনী একেবারে আমাদের বাস্তব জগতের প্রতিবেশিনী। সকলের শেষে বঙ্কিম রোমান্সের বর্ণোচ্ছ্বাস গাঢ়তর করিয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত বিরলবর্ণ জগৎকে একেবারে

লুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। কবি আসিয়া ঔপন্যাসিকের হস্ত হইতে লেখনী কাড়িয়া লইয়াছে। 'চন্দ্রশেখর'-এর কল্পনাশক্তির সমৃদ্ধি ও সুসংগতি আমরা উপভোগ করি, ইহার কলা-সৌন্দর্য আমাদিগকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু উপন্যাসক্ষেত্রে কবিত্বের এই অনধিকারপ্রবেশে যে ভবিষ্যৎ বিপদের বীজ নিহিত আছে ইহাও অনুভব করি। 'চন্দ্রশেখর', 'আনন্দমঠ'-এর বাস্তব-সম্পর্কহীন আদর্শবাদের ও 'দেবী চৌধুরাণী'র অনুশীলন-তত্ত্ব-প্রিয়তার অগ্রদূত

'চন্দ্রশেখর'-এর পরের উপন্যাসগুলির সম্বন্ধে কালানুক্রমিক পারম্পর্য লইয়া কতকটা সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। শচীশবাবুর তালিকায় 'চন্দ্রশেখর'-এর অব্যবহিত পরেই 'রাজসিংহ' (১৮৮২) ও তাহার পর ক্রমান্বয়ে 'আনন্দমঠ' (ডিসেম্বর ১৮৮২), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪), ও 'সীতারাম' (১৮৮৭) প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমাদের আলোচনায় এই অন্বয় ঠিক অনুসরণ করার পক্ষে কিছু বাধা আছে। প্রথমতঃ 'রাজসিংহ'-এর প্রথম সংস্করণের সহিত বর্তমান সংস্করণের (১৮৯৩) একেবারে মৌলিক ও গুরুতর প্রভেদ আছে। দ্বিতীয়তঃ, ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধেও বর্তমান সংস্করণের 'রাজসিংহ' অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাস হইতে অনেকটা বিভিন্ন; 'রাজসিংহ' এর চতুর্থ সংস্করণেব প্রারম্ভে যে বিজ্ঞাপন আছে, তাহাতে এই পার্থক্যের প্রকৃতি বুঝা যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বরূপ সম্বন্ধে বঙ্কিমের নিজ অভিমত এই বিজ্ঞাপনে ব্যক্ত হইয়াছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের সহিত কাল্পনিকের সংমিশ্রণ সম্বন্ধে লেখকের মতামত বিশেষভাবেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখন বঙ্কিমের নিজের মতে 'রাজসিংহ'ই তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস, তিনি লিখিয়াছেন, "পরিশেষে বক্তব্য যে আমি পূর্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। 'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'চন্দ্রশেখর' বা 'সীতারাম'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম। এ পর্যন্ত ঐতিহাসিক (?) উপন্যাস-প্রণয়নে কোন লেখকই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। আমি যে পারি নাই, তাহা বলা বাহুল্য।" সুতরাং 'রাজসিংহ'কে বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসের চরমোৎকর্ষের উদাহরণ বলিয়া মনে করিলে, ইহাকে 'আনন্দমঠ' ও 'সীতারাম'-এব পর আলোচনা করাই যুক্তিসংগত। সেইজন্য আপাততঃ 'রাজসিংহ'কে বাদ দিয়া 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'-এর আলোচনা আরম্ভ করাই সমীচীন হইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 'চন্দ্রশেখর'-এ যে, কল্পনাতিশয্যেব সূত্রপাত, তাহা 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'তে প্রকটতর হইয়াছে এবং বঙ্কিমকে অল্পবিস্তর ঔপন্যাসিক আদর্শ হইতে স্খলিত করিয়াছে। বিশেষতঃ, 'আনন্দমঠ'-এ এই কল্পনা-বিলাস বাস্তবতাকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'র বিস্তারিত পৃথক্ আলোচনার পূর্বে তাহাদের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিলে ভাল হয়। উভয়েরই ঘটনা-কাল প্রায় এক—ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম পত্তনের সময়; 'দেবী চৌধুরাণী'র আখ্যায়িকা 'আনন্দমঠ'-এর কয়েক বৎসর পরে মাত্র। বঙ্কিমের অধিকাংশ রোমান্সের কাল এই ইংরাজ রাজত্বের প্রথম সূচনার সময়। বঙ্কিমের এই কালনির্বাচনের প্রধান হেতু এই যে, এই যুগে ইতিহাসের সহিত সাধারণ জীবনের সংযোগ ফুটাইয়া তোলা তাঁহার পক্ষে অধিক কষ্টসাধ্য ছিল না। 'দুর্গেশ-নন্দিনী' বা 'মৃণালিনী'তে যে সুদূর অতীতের চিত্র তাঁহাকে আঁকিতে হইয়াছে, তাহাতে তথ্যের অতি ক্ষীণসন্নিবেশ কল্পনাসমৃদ্ধির দ্বারা পুরাইয়া লইতে হইয়াছে। কিন্তু 'চন্দ্রশেখর',

'আনন্দমঠ' বা 'দেবী চৌধুরাণী'তে তিনি যে সমাজচিত্র দিয়াছেন, তাহা প্রায় আধুনিক যুগের; সুতরাং তাহাদের মধ্যে তথ্যের অপেক্ষাকৃত ঘনসন্নিবেশ হইয়াছে ও সাধারণ জীবনের উপর ঐতিহাসিক প্রতিবেশের প্রভাব অনেকটা স্পষ্টভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই দুইখানি উপন্যাসেই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার রন্ধ্রপথ দিয়াই আমাদের সাধারণ জীবনের উপর রোমান্সের অলৌকিকত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। তৃতীয়তঃ, উভয় ক্ষেত্রেই বঙ্কিম-এমন দুইটি ঐতিহাসিক আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা সেই যুগের পক্ষে অভাবনীয় ছিল; 'আনন্দমঠ'-এর সত্যানন্দ ও 'দেবী চৌধুরাণী'র ভবানী পাঠক উভয়েই এমন একই বিরাট্ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, যাহা সে যুগের সামগ্রী বলিয়া আমরা কোন মতেই স্বীকার করিতে পারি না। যে দেশভক্তি ও রাজনৈতিক আদর্শ ইংরেজ রাজত্বে শতবর্ষব্যাপী সাধনার ফল, তাহা বঙ্কিম অনায়াসে মুসলমান শাসনের শেষ যুগের বিকাশ বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; ইহার ফলে দুইখানি উপন্যাসই অল্পবিস্তর অবাস্তবতা-দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে ঐতিহাসিক বিক্ষোভের, যে রাজনৈতিক আদর্শের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার সহিত আমাদের প্রকৃত সমাজ-জীবনের কোনও যোগসূত্র দেখিতে পাই না। এই অবাস্তবতার ছায়া প্রায় সকল সমালোচকের চোখেই পড়িয়াছে; এই দোষের প্রতি প্রায় সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই অপরাধের গুরুত্বের পরিমাণ কত, ইহার দ্বারা উপন্যাসোচিত সৌন্দর্যের কতটা হানি হইয়াছে, এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সুতরাং এই বিষয়েরই বিচার করিলে 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'র উপন্যাস-হিসাবে উৎকর্ষ স্থির করার সুবিধা হয়।

এই উপন্যাসদ্বয়ের পাঠকের মনে যে সন্দেহ সর্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া দেখা দেয়, তাহা এই—সত্যানন্দ ও ভবানী পাঠক যেরূপ জলন্ত দেশভক্তি, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠান-গঠন-কুশলতা দেখাইয়াছেন, তাহা সে যুগের কোন বাঙ্গালীর পক্ষে সম্ভব ছিল কি না এবং কোন ব্যক্তিবিশেষের এরূপ আশ্চর্য কল্পনা-প্রসার থাকিলেও তাহাকে একটা বাস্তব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার শক্তি রাজনীতি-শিক্ষাহীন, দেশাত্মবোধবর্জিত বাঙ্গালীজাতির ছিল কি না। বর্তমান অভিজ্ঞতার আলোকে এই সন্দেহ আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে; এই শত-ব্যবধান-খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন জাতিকে একতাবন্ধনে বাঁধা, একই আদর্শে অনুপ্রাণিত করা কত সুকঠিন, তাহার সাক্ষ্য আমাদের আজিকার রাজনৈতিক প্রচেষ্টার প্রতি পৃষ্ঠায় লিখিত হইতেছে। বঙ্কিমের যুগে এই দুরূহতা উপলব্ধ হইয়াছিল কি না সন্দেহ। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিকূল সাক্ষ্য তখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই; আদর্শ ও বাস্তব, কল্পনা ও কার্যের মধ্যে যে প্রকাণ্ড ব্যবধান তাহার পরিমাপ লওয়া হয় নাই। তখন কল্পনার একটা প্রথম সতেজ স্ফূর্তি, একটা অবাধ সাহস ছিল। সেই অবাধ কল্পনার বলে বঙ্কিম মুসলমান রাজত্বের ধ্বংসের সময়ে যে একটা বিরাট্ রাজনৈতিক আদর্শের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার দুঃসাহস আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলে। কিন্তু মনে হয় যে, বঙ্কিমের বিরুদ্ধে এই অবাস্তবতার অভিযোগ অন্ততঃ কতক পরিমাণে অতিরঞ্জিত হইয়াছে। তাঁহার স্বপক্ষেও কতকগুলি কথা বলিবার আছে; অন্ততঃ এই অবাস্তবতার মধ্যে কতকগুলি প্রকৃতভাবের

প্রেরণা ও বাস্তবসূত্রে আছে। সম্পূর্ণ বিচার করিবার পূর্বে এই বাস্তবসূত্রগুলির পরিচয় লওয়া আমাদের উচিত।

অরাজকতা বলিলে কি বুঝায়, আমাদের সাধারণ, প্রাত্যহিক জীবনের উপরে ইহার কিরূপ প্রভাব, উহা আমাদের মনের কোন্ গোপন, অপরীক্ষিত গুণগুলিকে টানিয়া বাহির করিবে, আমাদের যে চিন্তাধারা এখন শান্ত জীবন-যাত্রা-নির্বাহের চেষ্টাতেই ব্যাপৃত আছে তাহাকে কোন্ নূতন, অপরিচিত প্রণালীতে প্রবাহিত করিবে, তাহার কোন স্পষ্ট ধারণা না করিতে পারিলে বঙ্কিমেব বিরুদ্ধে অবাস্তবতার অভিযোগ আনা অসংগত। মুসলমান রাজত্ব-ধ্বংসের সময় কেবল অরাজকতা নহে, একটা বিরাট শূন্যতার যুগ। একটা পুরাতন সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, মুসলমান বাজকর্মচারিবৃন্দ কেন্দ্রশক্তির অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদের হাতে যে রাজশক্তি ন্যস্ত ছিল তাহা স্বার্থসিদ্ধি ও দুর্বলের প্রতি অত্যাচারের কাজে অপব্যবহার করিতেছে। দেশের আকাশ-বাতাস একটা অবিশ্রান্ত কোলাহল ও কাতব আর্তনাদে মুখবিত হইয়া উঠিয়াছে, অথচ এই ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে কোথাও কোন নূতন শক্তি গড়িয়া উঠার চিহ্নমাত্র দেখা যাইতেছে না। আবার ইহার উপর, এই ধ্বংসস্তূপেব মধ্য দিযা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রলয়ঝটিকা বহিযা গিয়াছে, বাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা যেটুকু বাকি বাখিয়াছিল, ইহা তাহাকে একেবারে নিঃশেষ করিয়াছে। অরাজকতার যুগেও মানুষের কতকগুলি প্রতিষ্ঠান অক্ষুণ্ণ থাকে, সামাজিক বন্ধন, পারিবারিক আকর্ষণ তাহাকে একতা-সূত্রে গাঁথিযা রাখিতে চেষ্টা করে, তাহাকে সমস্ত বৃহত্তর সত্তা হইতে বাহিব করিয়া একেবারে আত্মসর্বস্ব হইতে দেয় না। কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাঙ্গালা দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে চূর্ণ কবিয়া, মানুষকে সমাজ ও পরিবারের আশ্রয় হইতে টানিযা বাহির করিয়া, তাহার সমস্ত বৃহত্তর ঐক্যের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, তাহার বিচ্ছিন্ন অনু-পরমাণুগুলিকে ধূলিব সহিত মিশাইয়াছে, চারিদিকের বাতাসে উড়াইয়া দিয়াছে।

এই সর্বব্যাপী ধ্বংসের সময়ে জীবনেব যে সমস্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বিকাশ সম্ভব, তাহাদিগকে আমাদেব প্রাত্যহিক জীবনের আদর্শে বিচার করিলে ঠিক হইবে না। যখন পুরাতন সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, যখন দুর্ভিক্ষদানবের তাড়নায় মানুষ চিরকালের সামাজিক ও পাবিবাবিক গণ্ডি হইতে বাহিব হইয়া পড়িয়াছে, তখন যে তাহাদের মনে অভিনব ভাবের শিখা জলিয়া উঠিবে, তাহারা যে নানাপ্রকার অভাবনীয় মিলনে সংঘবদ্ধ হইবে, ভাবিয়া দেখিলে তাহাতে খুব বেশি বিস্ময়ের কাবণ নাই। যাঁহারা সমাজের সহজ নেতা, যাঁহাদের হাতে সমাজের বিচ্ছিন্ন শক্তির কিয়দংশ এখনও রহিয়া গিয়াছে, সেইরূপ ক্ষুদ্র জমিদার বা প্রভাবশালী ব্যক্তি যে এই সময়ে সর্বব্যাপী অত্যাচার ও অরাজকতার স্রোত প্রতিরুদ্ধ করিতে উদ্‌যোগী হইবেন, তাহাও স্বাভাবিক। প্রথমতঃ, হয়ত তাঁহাদের চেষ্টা কেবল আত্মরক্ষাপ্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত হইবে, পরে ধীরে ধীরে যেমন তাঁহাদের শক্তি-সঞ্চয় হইবে, যেমন তাঁহারা বিরুদ্ধ-শক্তির প্রকৃত বলনির্ণয়ে সমর্থ হইবেন, তেমনি তাঁহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছিবে। তাঁহারা দেশের উপরে নিজ আধিপত্য-বিস্তারে মনোযোগী হইবেন; বিশৃঙ্খল উপাদানগুলিকে আবার নিয়ন্ত্রিত করিয়া

একটি নূতন রাজ্যস্থাপনের কল্পনা রহিয়া রহিয়া তাঁহাদের মনের মধ্যে বিদ্যুৎশিখার মত খেলিয়া যাইবে। এই প্রণালীতেই প্রত্যেক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার যুগে নূতন রাজ্য গড়িয়া উঠে; শিবাজী হইতে প্রতাপাদিত্য, সীতারামের রাজ্যস্থাপনের এই একই প্রক্রিয়া। সুতরাং এই সর্বদেশ-সাধারণ প্রণালীর দ্বারা, আনন্দমঠের সন্তান-সম্প্রদায় কি ভাবে গড়িয়া উঠিল, তাহার একরূপ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার পরেই যে বাধা মাথা তুলিয়া উঠে, তাহা দুরতিক্রমণীয়। সন্তান-সম্প্রদায়গঠনের মূলে যে আশ্চর্য দেশপ্রীতি, উন্নত আদর্শবাদ, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রলোভনজয়ী নিঃস্বার্থতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সেকাল কেন, একালের আদর্শকেও অনেক দূর ছাড়াইয়া গিয়াছে। এইখানে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসোচিত বাস্তবতাকে অতিক্রম করিয়া আদর্শলোকের রাজ্যে উঠিয়াছে। তারপর সন্তান-সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ, উদ্‌যোগ-আয়োজন, প্রভৃতি বর্ণনা করিতে গিয়াও বঙ্কিম বাস্তবতার মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। সন্তানদের আনন্দ-কাননের ভৌগোলিক-অবস্থান সম্বন্ধে লেখক কোন কথাই বলেন নাই; তাহার অনতিদূরে মুসলমান শক্তির আশ্রয়স্থলস্বরূপ যে 'নগরের' কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও একটা নামধামহীন ছায়ার মত অশরীরী হইয়াছে। নগরের এত নিকটে একটা এত বড় বিরাট প্রতিষ্ঠান কি করিয়া গড়িয়া উঠিল, রাজ-শক্তির অগোচরে কিরূপে পুষ্টিলাভ ও শক্তি-সঞ্চয় করিল, ইতিহাসের দিক্ হইতে স্বাভাবিক এই সমস্ত প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাই না। একটা অসাধারণ আদর্শের জ্যোতিতে আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া যায়; খুব নিকট হইতে সূক্ষ্মভাবে ইহাকে দেখিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না।

বঙ্কিম কিন্তু এই সন্তান-সম্প্রদায়ের সহিত আরও কতকগুলি বাস্তবসূত্র জড়াইয়া ত্রুটি কতকটা সারিয়া লইয়াছেন। কেন্দ্রস্থ সন্তান-সম্প্রদায় কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার কোনও ব্যাখ্যা দেন নাই বটে, কিন্তু তাহাদের সহিত দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণের কিরূপে সম্মিলন হইল, কিরূপ সহজে এই বুভুক্ষুদের দ্বারা তাহাদের দলপুষ্টি হইল, তাহা বেশ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। যদি দীক্ষিত সন্তান-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে অদীক্ষিত জনসাধারণ কি করিয়া আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিল তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। এই সমস্ত সাধারণ সৈনিকের যুদ্ধ-বিগ্রহ যে লুঠতরাজেরই নামান্তর, তাহারা যে নায়কদের আদর্শবাদের বা গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই, কেবল লুঠের লোভে বা একটা স্থূলভ আস্ফালন-প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যই সন্তানদের সহিত মিশিয়াছিল, ইহা বঙ্কিমের বিবরণ হইতে আমরা বুঝিতে পারি। বঙ্কিম এতটুকু পর্যন্ত বাস্তবতার মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। যখন কাপ্তেন টমাসের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধজয়ের পর বিজয়ী সেনাপতিরা সত্যানন্দকে রাজধানী অধিকার ও বিজিত প্রদেশের শাসনের সুব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিলেন, তখন ধীরানন্দ দেখাইলেন যে, রাজ্যজয়ের জন্য কোন সৈনিক পাওয়া যাইবে না, সকলেই লুঠের জন্য বাহির হইয়া গিয়াছে, এবং এই লুঠই তাহাদের সন্তান-সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উপলক্ষে বঙ্কিম সন্তানদের প্রকৃত দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, কি অসার ভিত্তির উপরে সন্তান-ধর্মের আদর্শবাদের সৌধ নির্মিত হইয়াছে তাহার উপর একটা চকিতের জন্য

আলোকপাত করিয়াছেন। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং প্রায়ই অলক্ষিত ইঙ্গিতের দ্বারা লেখক বাস্তবতার দাবী রক্ষা করিতে ও প্রকৃত অবস্থার ধারণা দিতে একটা ক্ষণস্থায়ী চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

এই কল্পনাপ্রসূত সৌন্দর্যলোকের পশ্চাতে, একস্থানে নগ্ন বাস্তবতার কঙ্কাল তাহার গাঢ়-কৃষ্ণ, করাল ছায়াপাত করিয়াছে। উপন্যাসের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট মানবের যে দানবোচিত বিকাশ দেখিতে পাই, তাহাই সে যুগের আসল স্বরূপটি প্রকাশ করিতেছে। তাহার উপর কোন কল্পনার বর্ণোচ্ছ্বাস, কোন মহান্ আদর্শের জ্যোতি পড়িয়া তাহার সহজ বীভৎসতাটিকে আবৃত করিতে চেষ্টা করে নাই। বাস্তবতার দিক্ দিয়া এই কয়েকটি অধ্যায় উপন্যাসের অন্যান্য সমস্ত অংশ হইতে বিভিন্ন; এখানে বঙ্কিমের আখ্যায়িকা আশ্চর্য দ্রুত গতিতে ছুটিয়া চলিয়া গিয়াছে; ভাষার মধ্যে একটা অসাধারণ শুষ্ক, কঠোর ব্যঞ্জনা-শক্তি, একটা অব্যক্ত ভীতি-সঞ্চারের ক্ষমতা আসিয়া পড়িয়াছে। সন্তান-ধর্মের জ্যোতির্ময় আদর্শবাদের পশ্চাতে এই ভীষণ বাস্তব-জগতের ঈষৎ-প্রকাশ বঙ্কিমের শক্তির অন্য দিকেরও পরিচয় দান করে।

সন্তান-ধর্মের প্রতিষ্ঠা ছাড়াও সন্তানদের কার্যকলাপ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যেও সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কারণ আছে। শিক্ষাহীন, উপকরণহীন, সৈনাপত্য-বর্জিত কতকগুলি বাঙ্গালী চাষার দল যে ইংরেজ-সেনাপতিচালিত দুইদল সিপাহীকে পরাজিত করিল, ইহা অনেকেই অশ্রদ্ধেয় মনে করেন। তাঁহাদের মতে ইহা কেবল একটা যুক্তিহীন স্বজাতিপ্রীতির উচ্ছ্বাস মাত্র; বাস্তব জগতে আমাদের হীনতা—পরাজয়ের একটা সুলভ কলঙ্ক-ক্ষালন মাত্র। সময়ে সময়ে বঙ্কিমের ঘটনাবিন্যাস এরূপ সন্দেহ হইতে মুক্ত নয়। শান্তিকে দিয়া তিনি দুইবার দুইজন ইংরেজ সৈনিকের পরাজয় ঘটাইয়াছেন; একবার শান্তি গুলি করিতে উদ্যত কাপ্তেন টমাসের নিকট হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইয়াছে, আর একবার লিণ্ডলেকে অশ্ব হইতে ফেলিয়া দিয়া ইংরাজদের গোপন অভিসন্ধি সত্যানন্দকে যথাসময়ে জানাইয়া তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়াছে। এই দুইটি উদাহরণই কেবল একটা অযথা জাত্যভিমানপ্রসূত বলিয়া মনে হয়; ইহারা ইংরাজদিগকে বোকা বানাইয়া সন্তানদের বুদ্ধি ও কৌশলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের একটা নিতান্ত সুলভ উপায়স্বরূপই ব্যবহৃত হইয়াছে। তারপর আধুনিক যুদ্ধপ্রথায় শিক্ষিত ও আধুনিক যুদ্ধোপকরণসমন্বিত ইংরাজের বিরুদ্ধে শিক্ষা-দীক্ষাহীন সন্তান-সৈন্যকে জয়ী দেখাইয়া যে তিনি একটা প্রবল অবিশ্বাসের অবসর দিয়াছেন, তাহা স্থানে স্থানে তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। সময়ে সময়ে সত্যের অনুরোধে তাঁহাকে কামান-বন্দুকের কাছে লাঠি-বল্লমধারী সন্তান-সৈন্যের পরাজয়ের কথা লিখিতে হইয়াছে। তবে এখানেও বঙ্কিমের অপরাধ যত গুরুতর বলিয়া মনে হয়, বোধ হয় ঠিক তত নয়। তাঁহার প্রতি সন্দেহের মধ্যে আমাদের দাসসুলভ মনোবৃত্তি যেন অল্প উঁকি মারিতেছে। মনে করুন, সন্তানদের এই বিজয় যদি ইংরাজের বিরুদ্ধে না হইয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে হইত, তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের অবিশ্বাসের মাত্রা এতদূর হইত না। বঙ্কিমের পক্ষে বলিবার প্রধান কথা এই যে, ঐ দুইটি জয়ই ঐতিহাসিক; ইংরাজ ঐতিহাসিকেরাই এই সন্ন্যাসীদের এই দুইটি জয়ের কথা এবং দুইজন ইংরাজ সেনাপতির প্রাণনাশের কথা স্বীকার করিয়াছেন। তবে অবশ্য যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনাগুলি—আগ্নেয়াস্ত্রের

বিরুদ্ধে সন্তান-সৈন্যের অবিচলিতভাবে দাঁড়ান, ভবানন্দ-জীবানন্দের প্রশংসনীয় সৈনাপত্য-কৌশল প্রভৃতি—সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু তাহা হইলেও এই বিষয়ের সম্ভাবনীয়তার বিচার করিতে হইলে আমাদের তৎকালীন ইংরাজদের সম্বন্ধে দুই একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। আজকাল ইংরাজ শাসনাধীনে প্রায় দুই শতাব্দী বাস করার পর ইংরাজের বিরুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রামে দাঁড়ান যেমন কল্পনাশক্তিরও অগোচর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইংরাজের সহিত প্রথম পরিচয়ের সময়ে অবশ্য তাহা হয় নাই। তখন ইংরাজ আধিপত্যের জন্য যুদ্ধ করিতেছিল, সাম্রাজ্যস্থাপনের কল্পনা বোধ হয় তখনও তাহার মনে উদিত হয় নাই। তখনও দেশবাসী ইংরাজের সহিত খণ্ডযুদ্ধ করিতে একেবারে সংকুচিত ছিল না; আর ইতিহাসেই লিখিতেছে যে, একটা তুচ্ছ সন্ন্যাসীর দলও ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে দ্বিধা করে নাই। সে সময়ে ইংরাজ জাতির অসাধারণ শৌর্য ও গৌরবময় ইতিহাস বাঙ্গালীর প্রায় সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত ছিল। তখনও সে নেপোলিয়ন বা জার্মান-বিজয়ীর যশোমুকুট পরিয়া আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয় নাই; তখনও তাহার নামের মহিমা আমাদের শারীরিক ও মানসিক তেজকে একেবারে অসাড় করিয়া দেয় নাই। মোট কথা এখন যাহা আমাদের কল্পনা করিতেও ভয় হয়, তখন তাহা কার্যে পরিণত করার দুঃসাহসেরও অভাব ছিল না। সুতরাং এ বিষয়ে বঙ্কিমের অপরাধের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম বলিয়াই মনে হয়; এবং যদি এ সম্বন্ধে আমাদের অবিশ্বাস উপন্যাসের রসোপভোগে বাধা দেয়, তাহা হইলে তাহার সম্পূর্ণ দোষ লেখকের নহে।

'আনন্দমঠ'-এর বিরুদ্ধে যে প্রধান অভিযোগ—ইহার আখ্যান-বস্তুর সহিত বঙ্গের প্রকৃত জীবনের কোন বাস্তব যোগ নাই—তাহার যৌক্তিকতা-সম্বন্ধেই এতক্ষণ আলোচনা হইল। এই অভিযোগের সাধারণ সত্যতা স্বীকার করিয়া, কোথায় কোথায় বাঙ্গালার বাস্তব জীবনের সহিত উপন্যাসের যোগসূত্র আছে, তাহার আলোচনা করিতে চেষ্টা করা গিয়াছে। 'দেবী চৌধুরাণী'তেও এই অভিযোগের কারণ কতকটা বর্তমান আছে, কিন্তু 'আনন্দমঠ'-এর সহিত তুলনায় আমাদের অবিশ্বাসের হেতু অনেক কম। প্রথমতঃ ভবানী পাঠকের মধ্যে সত্যানন্দের ন্যায় একেবারে অবিমিশ্র আদর্শবাদ নাই; একটা বিশাল রাজ্যস্থাপনের কল্পনা তাঁহার মনে সেরূপ বদ্ধমূল হয় নাই। তাঁহার মধ্যে দস্যু-দলপতির চিহ্ন অনেকটা স্ফুটতর; সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন বা সংস্কারকের আদর্শের জ্যোতি সেই চিহ্নকে একেবারে ঢাকিতে পারে নাই। সত্যানন্দের সহিত তুলনায় ভবানী পাঠকের উচ্চাভিলাষ অনেকটা সীমাবদ্ধ। সত্যানন্দের উদ্দেশ্য একটা নূতন ধর্মপ্রবর্তন, ও এই নবধর্মের ভিত্তির উপরে একটা নূতন রাজ্য-গঠন; ভবানীর উদ্দেশ্য একটি স্ত্রীলোকের চরিত্রগঠনদ্বারা তাহাকে দস্যুদলের নেত্রীপদের উপযুক্ত করিয়া তোলা। জনসাধারণের ভক্তি উদ্রেক ও কল্পনাকে মুগ্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক সংঘেরই এরূপ একটি রাজা বা রাণীর প্রয়োজন হয়; দেবী চৌধুরাণীর সৃষ্টি যেন একপ্রকার নূতন রকমের পৌত্তলিকতার প্রবর্তন। সত্যানন্দ-ভবানী পাঠকের মধ্যে আর একটা মৌলিক প্রভেদ আছে; সত্যানন্দ তাঁহার সমস্ত ধর্মাবরণের মধ্যে প্রধানতঃ একজন রাজনীতিজ্ঞ—politician. ভবানী তাঁহার সমস্ত দস্যুতা ও পরহিতব্রতের মধ্যে বাস্তবিক একজন শিক্ষক, গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্মকে বাস্তব জীবনে ফুটাইয়া তোলার উদ্যোগী। 'আনন্দমঠ'-এ দেশপ্রীতিই মুখ্য বস্তু, ধর্ম অপ্রধান; 'দেবী চৌধুরাণী'তে ধর্মই প্রধান, দেশসেবা বা অত্যাচারের প্রতিরোধ একটা নামমাত্র উদ্দেশ্য।

সুতরাং 'দেবী চৌধুরাণী'তে বাস্তবতার অংশ 'আনন্দমঠ' অপেক্ষা অনেক বেশি; বাঙ্গালার বাস্তব জীবনের আবেষ্টনের মধ্যে উপন্যাসের অসাধারণ ঘটনাগুলির প্রবেশ করাইতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় না। 'আনন্দমঠ'-এ সত্যানন্দের গরীয়ান্ আদর্শটি বাদ দিলে আর কিছুই থাকে না; 'দেবী চৌধুরাণী'তে প্রফুল্লের নিষ্কামধর্মে দীক্ষায় অংশ একেবারে বাদ দিলেও উপন্যাসের বিশেষ অঙ্গহানি হয় না।

এইবার 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'র অন্যান্য দিক্ আলোচনা করা যাইতে পারে। 'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে সহজেই অনুমান হইবে যে, ইহা উপন্যাস অপেক্ষা বরং মহাকাব্যের লক্ষণান্বিত। বঙ্কিম এখানে কেবল উপন্যাসের বাহ্য আকৃতির ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র; উপন্যাসের ছাঁচে তাঁহার উচ্ছ্বসিত দেশভক্তি, তাঁহার বিরাট রাজনৈতিক কল্পনাকে ঢালিয়াছেন। বাস্তবিক 'আনন্দমঠ'-এর উপন্যাসোচিত গুণ যে খুব বেশি আছে তাহা বলা যায় না। অতীতের চিত্র আঁকিবার ছলে বঙ্কিম ভবিষ্যতের দিকে অর্থপূর্ণ অঙ্গুলি-সংকেত করিয়াছেন। 'আনন্দমঠ'-এর চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ বাস্তব নহে, তাহাদের এক পদ বাস্তবলোকে ও অপর পদ আদর্শলোকে স্থাপিত রহিয়াছে। বাস্তব ও রোমান্স—এই উভয়রূপ উপাদানের সংমিশ্রণে তাহারা গঠিত। ডিকেন্সের কতকগুলি চরিত্রের মত ইহারা একটা মধ্যলোকের অধিবাসী, আদর্শলোকের কল্পনা বাঙ্গালীর নাম ধরিয়া, বাঙ্গালীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিলে যতটুকু বাস্তবতার দাবী করিতে পারে, ইহারা ততটুকু বাস্তব। সত্যানন্দ, ভবানন্দ, জীবানন্দ—সকলেরই ব্যক্তিত্ব একটা কুহেলিকা-মণ্ডিত। ভবানন্দ ও জীবানন্দের প্রলোভন, ব্রতভঙ্গ ও প্রায়শ্চিত্ত বাস্তব জীবনের সংঘাতের মত আমাদের মনের গভীর দেশে আঘাত করে না। বরং ভবানন্দের প্রলোভন ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কতকটা অন্তর্দৃষ্টি ও ক্ষমতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে, কেননা এখানে অন্ততঃ একপক্ষ—কল্যাণী—বাস্তব জগতের জীব। বাহিরের জগৎ হইতে যে তিনটি প্রাণী—মহেন্দ্র, কল্যাণী ও শান্তি—সন্তান-ধর্মের অপার্থিব রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার মধ্যে মহেন্দ্র-কল্যাণী এই দুই জনই তাহাদের বাস্তবতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। ইহাদের সহিত সন্তানজগতের সম্পর্ক ও পরিচয় খুব অল্প দিনের; ইহারা বাহির হইতে যে প্রকৃতি লইয়া এই জগতে পদার্পণ করিয়াছিল, সে প্রকৃতি বিশেষ রূপান্তরিত হয় নাই। চারিবৎসরব্যাপী একটা উজ্জ্বল স্বপ্ন ও অলৌকিক অনুভূতি হইতে জাগিয়া তাহারা আবার সেই পুরাতন, চিরপরিচিত বাস্তব জগতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। শান্তিকে সন্তান-রাজ্যের আকাশ-বাতাসের সহিত একাত্ম করিবার জন্য তাহার সমস্ত পূর্ব জীবনকে বিকৃত ও একটা অপ্রকৃত বর্ণে রঞ্জিত করিতে হইয়াছে। তবে বঙ্কিমের কৃতিত্ব এই যে, কোন চরিত্রই একেবারে অস্বাভাবিক বা অবিশ্বাস্য হয় নাই; তাহাদের বাক্যে ও ব্যবহারে ও পরস্পরের সহিত সম্পর্কে একটা সুন্দর ঐক্য ও সুসংগতি রক্ষিত হইয়াছে। লেখক যে আকাশ-বাতাস সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ বাস্তব না হউক, কোনরূপ আভ্যন্তরীণ অসংগতিদুষ্ট হয় নাই, ইহা নিশ্চিত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 'আনন্দমঠ'-এর মধ্যে দুই-একটি বাস্তব স্তরও আছে; উপন্যাসের সাধারণ অবাস্তবতা হইতে এই দৃশ্যগুলিকে সহজেই পৃথক্ করা যায়। প্রথম চারিটি অধ্যায় একটি ভীষণ বাস্তব চিত্র; আর নিমির চরিত্রেও এই খাঁটি বাস্তবতার সুরটি পাওয়া যায়। কিন্তু

'আনন্দমঠ'-এর প্রকৃত গৌরব বাস্তব উপন্যাস হিসাবে নহে। বাঙ্গালার পাঠক-সমাজের উপর ইহা যে বদ্ধমূল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহা এক ধর্মগ্রন্থ ছাড়া অন্য কোন প্রকার সাহিত্যের ভাগ্যে ঘটে নাই। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, 'আনন্দমঠ' আধুনিক বাঙ্গালার জন্মদান করিয়াছে, আধুনিক বাঙ্গালীর হৃদয় ও মনোবৃত্তি গঠিত করিয়াছে। যে দেশাত্মবোধ আজ প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর সাধারণ মানসসম্পত্তি, বঙ্কিমই তাহার প্রথম অঙ্কুর রোপণ করিয়াছেন, ইউরোপের দেশপ্রীতি, বাঙ্গালীর বিশেষ অবস্থার মধ্যে, বাঙ্গালীর বিশেষ পূজো-পকরণের সাহায্যে, বাঙ্গালী-হৃদয়ের ভক্তি-চন্দন-চর্চিত করিয়া বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বর্তমান যুগের এমন কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নাই, যাহার প্রথম প্রেরণা এই 'আনন্দমঠ' হইতে আসে নাই; বাঙ্গালীর রাজনীতিচর্চার বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক বক্তৃতার ভাষা পর্যন্ত বঙ্কিমের কল্পনার বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। বঙ্কিম পৌত্তলিক বাঙ্গালীর মানসস্বর্গে এক নূতন দেবী-প্রতিমা সৃষ্টি করিয়া স্থাপিত করিয়াছেন, বাঙ্গালীর হৃদয়ের ভক্তিকে এক নূতন পথে চালিত করিয়াছেন। পৃথিবীর যে কয়েকখানি যুগান্তরকারী গ্রন্থ আছে, 'আনন্দমঠ' তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে। "বন্দেমাতরম্" আধুনিক বাঙ্গালীর বেদমন্ত্র। সেই জন্যই 'আনন্দমঠ'কে কেবল সাহিত্য হিসাবে বিচার করিলে ইহার সম্পূর্ণ মহিমা ও প্রভাব বুঝা যাইবে না। ইহার স্থান সাধারণ সাহিত্য-লোকের অনেক ঊর্ধ্বে।

'দেবী চৌধুরাণী' 'আনন্দমঠ'-এর দুই বৎসর পরে (১৮৮৪) প্রকাশিত হয়, এবং 'আনন্দমঠ'-এর ন্যায় ইহাতেও একদল doctrinaire বা উচ্চ-আদর্শ-অনুপ্রাণিত দস্যুর অবতারণা হইয়াছে। কিন্তু 'দেবী চৌধুরাণী'র উপাখ্যানের মধ্যে অসাধারণত্বের ঈষৎ স্পর্শ থাকিলেও, ইহাতে বাস্তবতারই প্রাধান্য, ইহার মধ্যে অলৌকিক উপাদান যাহা আছে, তাহা আমাদের বাস্তব-জীবনের সহিত সহজেই মিলিতে পারে, আমাদের অভিজ্ঞতার বা দেশের বাস্তব অবস্থার বিরোধী নহে। ভবানী পাঠক সত্যানন্দের ন্যায় অতিমানব মহাপুরুষের স্তরে উন্নীত হন নাই, প্রফুল্লের নিষ্কামধর্ম-শিক্ষার মধ্যে যাহা কিছু অবাস্তবতা আছে, তাহা সমগ্র উপন্যাসটির উপরে ছায়াপাত করিতে পারে নাই, এবং ইহার বাস্তবতার সুরটি ঢাকিয়া ফেলে নাই। আমাদের সামাজিক জীবনের সহজপ্রীতিপূর্ণ, অথচ ক্ষুদ্র-বিরোধ-বিড়ম্বিত চিত্রটিই ইহার অধিকাংশ ব্যাপিয়া আছে। গ্রন্থশেষে কঠোর বৈরাগ্য ও দেশহিতব্রতের উপর গার্হস্থ্যধর্মেরই জয় বিঘোষিত হইয়াছে। দেবী চৌধুরাণী তাহার সমস্ত রাণীগিরির ঐশ্বর্য ও দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রীর উচ্চপদ ত্যাগ করিয়া আবার গৃহধর্মপালনের জন্য হরবল্লভের সংকীর্ণ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার নিষ্কাম-ধর্মের শিক্ষা দীক্ষা এই নূতন ক্ষেত্রে নিয়োজিত করিয়া তাহাকে পরমসার্থকতায় মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। বৈকুণ্ঠেশ্বর ও ব্রজেশ্বরের মধ্যে যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছিল, তাহাতে ব্রজেশ্বরই জয়লাভ করিল; বৈকুণ্ঠেশ্বর তাঁহার বিরাট সত্তা সংকুচিত করিয়া ব্রজেশ্বরের পশ্চাতে আত্মগোপন করিলেন, এবং ইহার পুরস্কারস্বরূপ রমণীহৃদয়ের যে দেবদুর্লভ প্রেম ও ভক্তি উপহার পাইলেন, তাহাতে বোধ করি তাঁহার ক্ষোভের কোন কারণ থাকিল না। 'দেবী চৌধুরাণী'র আরম্ভ একেবারে সম্পূর্ণ বাস্তব, সামাজিক কারণে নিরপরাধ স্ত্রীর পরিত্যাগ, আধুনিক বাস্তবতা-প্রধান লেখক-লেখিকাদের বিশেষ ও নিতান্ত সাধারণ বিষয়। কিন্তু ইহারা যেমন এই বিষয়ের মধ্য দিয়া সামাজিক অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া ধরেন, বঙ্কিম তাহা

করেন নাই; তিনি সমস্ত বিষয়টিকে একটি গোপন প্রেম ও নিগূঢ় সহানুভূতির ধারায় অভিষিক্ত করিয়াছেন। আমাদের হিন্দু-সমাজে একটি স্বাভাবিক সংযম, ভক্তিশীলতা ও নিয়মানুবর্তিতার জন্য বিদ্রোহের খুব তীব্র আত্মপ্রকাশ বড় একটা হইতে পায় না—তাহা একটা গোপন ক্ষোভের মতই বক্ষঃতলে নিরুদ্ধ থাকে। অবশ্য এই প্রতিরুদ্ধ ভাবের প্রভাব আমাদের জীবনের পক্ষে যে সর্বদা হিতকর বা প্রকৃত পৌরুষ-বিকাশের পক্ষে অনুকূল, তাহা বলা যায় না। অনেক সময়ে দুই পরস্পর-বিরোধী কর্তব্যের মধ্যে যেটি আমরা বাছিয়া লই, তাহা কাপুরুষোচিত নির্বাচনই হইয়া দাঁড়ায়; প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত সাহস ও মনের বল আমাদের থাকে না বলিয়াই আমরা সহজে বাঁধা রাস্তাটাই অবলম্বন করিয়া ফেলি। এই চরিত্রগুলি আর্টের দিক্ দিয়াও খুব সার্থক হইয়া উঠে না; সামাজিক ব্যবস্থার দাস-সুলভ অনুবর্তিতা তাহাদিগকে আর্টের দিক্ দিয়াও ব্যক্তিত্ব-বর্জিত ও বর্ণলেশশূন্য করিয়া ফেলে। বঙ্কিম ব্রজেশ্বরের চরিত্রে এই সমস্ত দুর্বলতা পরিহার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রেম ও পিতৃভক্তির একটি সুন্দর সামঞ্জস্য-সাধন করিয়াছেন; তাহাকে একদিকে উদ্ধত অবিনয় ও অপর দিকে নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। স্কটের উপন্যাসসমূহের প্রায় সমস্তগুলিতেই নায়কের চরিত্র নীরস ও বিশেষত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে; স্কট্ তাহাকে সর্বগুণোপেত করিয়া দেখাইবার চেষ্টায় তাহার মধ্যে প্রাণের ধারা মন্দীভূত করিয়া ফেলিয়াছেন। বঙ্কিমের কৃতিত্ব এই যে, তিনি ব্রজেশ্বরকে সর্বগুণসম্পন্ন করিয়াও তাহাকে ব্যক্তিত্বহীন করিয়া ফেলেন নাই। ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, আমাদের বাঙ্গালী সমাজের কতকগুলি বিশেষত্বই ব্রজেশ্বরের চরিত্রকে একটা বৈশিষ্ট্য দিয়াছে, ও তাহাকে স্কটের নায়ক হইতে পৃথক্ করিয়াছে। প্রথমতঃ তাহার বহুপত্নীকত্ব—সাগর বৌ, নয়ান বৌ ও প্রফুল্লের সহিত তাহার ব্যবহারের বিভিন্নতা, ও তাহার দাম্পত্য-ব্যাপার-সম্বন্ধে ব্রহ্মঠাকুরাণীর সহিত সরস কথোপকথন ও পরিহাসকুশলতা তাহাকে আদর্শ নায়কের রক্তমাংসহীন, অশরীরী অবস্থা হইতে রক্ষা করিয়াছে। যাহাকে একাধিক স্ত্রী লইয়া ঘর করিতে হয়, এবং সে বিষয় লইয়া ঠানদিদির সহিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-পূর্ণ আলোচনা চালাইতে হয়, তাহার চারিদিকে একটা লঘু-তরল হাস্যরসের আবেষ্টন সৃষ্ট হয়; এবং সেইজন্যই আদর্শ নায়কের অবাস্তবতার ছায়া তাহার গায়ে লাগিতে পায় না। প্রফুল্লের সহিত ব্যবহারের মধ্যেও তাহার একটা সংযত অথচ গভীর প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়, যাহা সর্বপ্রকারের নাটকীয় উচ্ছ্বাস ও আতিশয্য-বর্জিত। এই বিষয়ে তাহার সহজ, সরল কথাবার্তা স্কটের নায়কদের গুরুগম্ভীর, সাড়ম্বর বাক্যবিন্যাসের অপেক্ষা গভীর ভাবপ্রকাশের পক্ষে অধিক উপযোগী। আবার দশ বৎসর বিচ্ছেদের পর প্রফুল্লকে চিনিবার পরে তাহার দস্যুবৃত্তির প্রতি ঘৃণা ও তাহার প্রতি উদ্বেল প্রেমের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী দ্বন্দ্বটুকু তাহার বাস্তবতা বাড়াইয়া দিয়াছে। ব্রজেশ্বরের শ্বশুর-বাড়ী হইতে রাগ করিয়া চলিয়া আসা, ও সাগরের প্রতি দুর্জয় অভিমান; বজরাতে ডাকাতির সময়ে তাহার নির্ভীক, সপ্রতিভ ভাব, ও দেবী চৌধুরাণীর বজরাতে বন্দিভাবে নীত হইবার পর দেবীর সহচরীদের হাতে তাহার দুরবস্থা—এই সমস্তই তাহাকে আদর্শ-লোক হইতে নামাইয়া বাস্তব জগতের আসনে দৃঢ়তর করিয়া বসাইয়াছে, ও তাহার সহিত পাঠকের একটা মধুর-প্রীতিপূর্ণ সখ্যভাব স্থাপন করিয়াছে। আবার প্রবল, অপ্রতিরোধনীয় প্রেমের মধ্যে পিতৃভক্তির অক্ষুণ্ণ মর্যাদা রক্ষা, প্রফুল্লকে পাইবার লোভেও পিতার সহিত জুয়াচুরি করিতে

অস্বীকার করা, তাহার চরিত্রের উপরে একটা দৃপ্ত পৌরুষের উজ্জ্বল আলোকপাত করিয়াছে। মোটের উপর, ব্রজেশ্বর উপন্যাসজগতের চরিত্রদের মধ্যে একটি বিশেষ সজীব সৃষ্টি। ব্রজেশ্বর আমাদের বাস্তব জগতের প্রতিবেশী, দুই-একটি অসাধারণ ঘটনার সম্মুখীন হইয়াও তাহার বাস্তবতার কোন হানি হয় নাই।

অবশ্য গ্রন্থের কেন্দ্রস্থ দুর্বলতা ব্রজেশ্বরকে লইয়া নয়, প্রফুল্লকে লইয়া; এবং প্রফুল্লের প্রতি গ্রন্থকার যে অসাধারণত্বের আরোপ করিয়াছেন, তাহাই উপন্যাসটির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিচারবিতর্কের বিষয়। অধিকাংশ সমালোচকই গ্রন্থের এই অংশটুকু বিস্ময় মিশ্রিত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াছেন; যেন এইখানে ঔপন্যাসিক বঙ্কিম হিন্দুধর্মের উৎকর্ষপ্রচারক বঙ্কিমের নিকটে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এখানে ধর্মতত্ত্বের উপর আদিরসের প্রাদুর্ভাবের পরিচয় দেখিয়াছেন। গ্রন্থকার প্রফুল্লকে নিষ্কামধর্মে দীক্ষিত করিয়া দশ বৎসর বনে-জঙ্গলে দস্যুদলের সহিত ঘুরাইয়া, শেষে আবার তাহাকে হরবল্লভের অন্তঃপুরে আত্মগোপন করিতে পাঠাইয়াছেন। এই পরিণতির জন্য শিক্ষা দীক্ষার এত সুদীর্ঘ আড়ম্বরের বা পাঠকের নিকটে খুব উচ্চকণ্ঠে এই শিক্ষার মাহাত্ম্য-বিজ্ঞাপনের কোন প্রয়োজন ছিল না। এইসমস্ত সমালোচনার মধ্যে যে কতক পরিমাণে সত্য আছে তাহা স্বীকার্য। এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে উপন্যাসটির মধ্যে পর্বতের মূষিক-প্রসবের ন্যায় একটি হাস্যজনক অসংগতি আছে কিন্তু আর এক দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে বঙ্কিমের অপরাধ তত গুরুতর বলিয়া মনে হইবে না। প্রফুল্লের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারটি গ্রন্থের উপরে ধর্মতত্ত্বের একটা বাহ্য-প্রলেপ মাত্র, ইহার প্রভাব কেন্দ্র-স্তর পর্যন্ত ভেদ করিতে পারে নাই। এই নিষ্কামধর্ম প্রফুল্লের প্রকৃত চরিত্রকে অভিভূত করিতে পারে নাই, তাহার প্রেমোন্মুখ, সুকোমল নারীহৃদয়ের উপর কোন বদ্ধমূল আধিপত্য বিস্তার করে নাই। ইহার প্রবল আক্রমণের মধ্যেও তাহার রমণীসুলভ মাধুর্য ও উদ্বেল স্বামিভক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল—শিক্ষাকালের মধ্যে একাদশীতে মাছ খাওয়ার নিষেধের প্রতি অবাধ্যতার দ্বারা গ্রন্থকার এই অনিবার্য প্রেম প্রাবল্যের একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিয়াছেন। প্রফুল্লের প্রকৃতি কোথাও এই গুরুভার দীক্ষার চাপে বাঁকিয়া চুরিয়া যায় নাই, শারদাকাশে লঘু মেঘখণ্ডের ন্যায়ই ইহাকে অবলীলাক্রমে বহন করিয়াছে। তাহার চরিত্র কোথাও পৌরুষ-বা স্পর্ধা-যুক্ত হয় নাই; মধ্যে মধ্যে এক একটা দার্শনিক সূত্রের বিচার সত্ত্বেও কোথাও পাণ্ডিত্যবিড়ম্বিত হয় নাই। গ্রন্থকার গ্রন্থশেষে তাহাকে আদর্শবাদের সর্বোচ্চ স্তরে,ভগবানের অবতারপদে উন্নীত করিলেও,পাঠকের কল্পনা ও সহানুভূতি এইরূপ ভীতিজনক পরিণতিতে কখনও সায় দিতে চাহে না। প্রফুল্লকে আমরা বরাবরই স্বামি-প্রেম-বিহ্বলা,আদর্শ গৃহলক্ষ্মীর মতই দেখি, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কোন আদর্শের সহিত তাহার সম্বন্ধ আমাদের রসানুভূতিকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে না। সুতরাং যদিও প্রথম দৃষ্টিতে, ঔপন্যাসিক ধর্মতত্ত্ববিদের নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতে পারে, তথাপি প্রকৃতপক্ষে এই দ্বন্দ্বে ঔপন্যাসিকেরই জয় হইয়াছে; কলাকৌশলের দিক্ দিয়া ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি ধর্মতত্ত্বের দ্বারা অভিভূত হইতে পারে নাই।

প্রফুল্ল-চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, তাহার নিষ্কামধর্মে দীক্ষা তাহাকে কখনও সন্ন্যাসের দিকে, গার্হস্থ্যধর্মের বিরুদ্ধে প্রবর্তিত করে নাই। এই বিষয়ে 'সীতারাম'-এর শ্রী চরিত্রের সহিত তাহার প্রভেদ। স্বামীর সহিত বিচ্ছেদের পরে শ্রীর চরিত্র যেমন জয়ন্তীর প্রভাবে

রমণীসুলভ মাধুর্য হারাইয়া এক শুষ্ক, কঠোর আসক্তি-লেশশূন্য নিষ্কামধর্মের মরু-বালুকার মধ্যে নিজ স্নেহ প্রেমের শীতল ধারাকে প্রোথিত করিয়া দিয়াছিল, নিষ্কামধর্ম-দীক্ষিতা প্রফুল্লের চরিত্রে নিশির সাহচর্য-ফলেও তাহা হইতে পায় নাই। জয়ন্তীর মধ্যে যেমন একটা শিক্ষয়িত্রীর পরুষ-ভাব ও আত্ম-প্রাধান্য-মূলক গর্বের রেশ আছে, নিশি-চরিত্রে তাহার অনুরূপ কিছুই নাই; নিশির মধ্যে ধর্মপ্রচারকের সংকীর্ণতা কিছু দেখিতে পাই না। সখীর সমবেদনা তাহাকে প্রফুল্লের সুখ-দুঃখভাগিনী করিয়া তুলিয়াছে; সে প্রথম হইতেই প্রফুল্লের অক্ষুণ্ণ স্বামিপ্রেম দেখিয়া তাহার সহিত একটা সন্ধি স্থাপন করিয়া লইয়াছে, প্রেমের প্রাকার-মূলে বেদান্তের dynamite লাগাইবার কোন চেষ্টা করে নাই। বরঞ্চ নিজেকে বেদান্ত-ধর্মে আচ্ছাদিত করিয়া অনসূয়া-প্রিয়ংবদার মতই সর্বান্তঃকরণে সখীর প্রেমের দৌত্য-কার্যে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছে। এই জন্যই বোধ হয় নিশি জয়ন্তী অপেক্ষা গ্রন্থকারের অধিক স্নেহভাজন হইয়াছে। জয়ন্তীর গুরুগিরির জন্যই তিনি তাহার বিরুদ্ধে একটি গূঢ় প্রতিশোধ লইতে ছাড়েন নাই; সন্ন্যাসিনীর গৈরিক-বস্ত্রের নীচে একটি স্বভাবদুর্বল, লজ্জাসংকুচিত নারীহৃদয় প্রকাশ করিয়া তাহাকে বেশ যথেষ্ট রকমই অপ্রতিভ করিয়াছেন। আর নিশি-দিবার নিকটে যে চেলাকাঠের উপঢৌকন দিয়া বিদায় লইয়াছেন, তাহার অন্তরালে তাঁহার সহজ স্নেহ ও কৌতুকমণ্ডিত প্রীতিরই পরিচয় পাই।

গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্রগুলি বিশেষ আলোচনা-যোগ্য নহে। নিশি-চরিত্রের আংশিক অবাস্তবতা-সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মঠাকুরাণী, সাগর বৌ, ব্রজেশ্বরের মাতা সকলেই সজীব চরিত্র, দুই-একটি স্বল্প-রেখাতেই তাহাদের বৈশিষ্ট্য বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভবানী পাঠক, আদর্শবাদের বাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়াও, বাস্তবতা হারায় নাই। উপন্যাসটির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত চরিত্র হরবল্লভের। হরবল্লভের কঠোর বৈষয়িকতা ও নির্মম সমাজানুবর্তিতা, মিথ্যাপবাদকলঙ্কিতা পুত্রবধূর নির্দয় প্রত্যাখ্যান ও তাহার করুণ অনুরোধের হৃদয়হীন উত্তর—আমাদের বাঙ্গালী পরিবারের একটি সুপরিচিত শ্রেণীর (*type*) কথা মনে করাইয়া দেয়; কিন্তু দেবী চৌধুরাণীর প্রতি তাহার অমানুষিক বিশ্বাসঘাতকতা, ও দেবীর নিকট বন্দী হইবার পর তাহার নিতান্ত হেয় কাপুরুষতা তাহাকে সাধারণ সংকীর্ণমনা বাঙ্গালী গৃহকর্তার শ্রেণী হইতে বিভিন্ন করিয়া চরম দুর্বৃত্ততার গহ্বরে নামাইয়া দিয়াছে ও ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তিকে আরও কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষেপ করিয়াছে। অথচ এই হরবল্লভের উপরে গ্রন্থকারের যথেষ্ট অবজ্ঞার সহিত অনেকটা অনুকম্পার ভাবও মিশ্রিত হইয়াছে; তাহার আত্মাবমাননার গভীরতাই তাহাকে আমাদের ঘৃণা হইতে রক্ষা করিয়া শুধু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিষয় করিয়া তুলিয়াছে।

প্রকৃতি-বর্ণনাতেও বঙ্কিম নিজ কবিজনোচিত অনুভূতির পরিচয় দিয়াছেন। চন্দ্রালোকে বর্ষাস্ফীতা ত্রিস্রোতার চিত্র খুব উচ্চ অঙ্গের বর্ণনাশক্তির নিদর্শন। কিন্তু ইহা কেবল বর্ণনা-শক্তির পরিচয় দেয় না; ইহাতে মানব-মনের সহিত বহিঃপ্রকৃতির একটা গূঢ়, অন্তরঙ্গ সহানুভূতির ইঙ্গিতও দেওয়া হইয়াছে; দেবীর উদ্বেল, প্রেমোন্মুখ হৃদয়ের সহিত এই অন্ধকার-মিশ্র চন্দ্রালোকের তলে প্রবাহিতা বেগবতী নদীর একটি সুন্দর সুসংগতি ও নিগূঢ় ভাব-গত যোগ রহিয়াছে। বঙ্কিমের প্রকৃতিবর্ণনা কেবল বহিঃসৌন্দর্যের নিপুণ সমাবেশমাত্রে পর্যবসিত

হয় নাই; বহিঃসৌন্দর্যের পশ্চাতে যে ভাবের ব্যঞ্জনা রসগ্রাহী দর্শকের মনের সহিত একটা গূঢ় ঐক্যস্থাপন করিতে সর্বদা প্রস্তুত আছে, বঙ্কিম তাহাকে প্রকৃত কবির ন্যায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

অবশ্য গ্রন্থের অসাধারণ ঘটনাগুলি যে সম্ভাবনীয়তার দিক্ হইতে সর্বত্র প্রমাদশূন্য হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। প্রফুল্লের অতর্কিত অন্তর্ধান যে ভাবে তাহার মৃত্যুসংবাদে রূপান্তরিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, তাহা একটু অবিশ্বাস্য বলিয়াই মনে হয়; এবং রূপান্তরের প্রকৃতিও সাধারণ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত গতিরই অনুসরণ করিয়াছে। সাধারণতঃ প্রাকৃতিক ঘটনাই অতিপ্রাকৃতের স্পর্শে অলৌকিকে রূপান্তরিত হয়, ইহার বিপরীত রকমের পরিবর্তন বড় একটা হয় না। সাধারণ রোগে মৃত্যু অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের দ্বারা ভৌতিক ঘটনাতে রূপান্তরিত হইতে পারে; কিন্তু ভৌতিক ঘটনা যে লোকমুখে প্রচারিত হইতে হইতে তাহার অতি-প্রাকৃত অংশ বর্জন করিয়া স্বাভাবিক মৃত্যুতে রূপান্তরিত হইবে, তাহা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ যেখানে দুর্লভচন্দ্র ও ফুলমণির নিকটে প্রফুল্লের প্রকৃত অবস্থা অবিদিত নাই, সেইখানে যে তাহার অলীক মৃত্যুসংবাদ একেবারে নিঃসন্দিগ্ধভাবে তাহার স্বগ্রামে ও শ্বশুরালয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা আমাদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না অথচ এই অসন্দিগ্ধ বিশ্বাসের উপরেই উপন্যাসটি প্রতিষ্ঠিত; এই মৃত্যুসংবাদের উপরেই ব্রজেশ্বরের গভীর প্রেম স্থিতিলাভ করিয়াছে। প্রফুল্ল ডাকাইতের দ্বারা অপহৃত হইয়াছে, এই সংবাদ পাইলে ব্রজেশ্বরের হৃদয়ে এত গভীর দাগ পড়িত কি-না সন্দেহ। আর ইংরাজ পল্টনের হাত হইতে প্রফুল্লের অনুকূল দৈববশে উদ্ধারলাভেও আকস্মিকতার মাত্রা যেন একটু অধিক; বিশেষতঃ তাহার উদ্ধারের জন্য প্রাকৃতিক আনুকূল্যের উপরে একান্ত নির্ভর ও বিপৎকালে নিষ্কাম ধর্মশিক্ষার পরিচয়-দান একটু আতিশয্যদুষ্ট হইয়াছে। তবে এখানেও প্রফুল্লের সমস্ত তেজস্বিতা ও নিষ্কামধর্মাচরণের মধ্যে তাহার রমণীসুলভ কোমলতা ও চরিত্রের অবর্ণনীয় মাধুর্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। মোটের উপর 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসটি অসাধারণ ঘটনাভারাক্রান্ত ও ধর্মভাবগ্রস্ত হইলেও একটি বাস্তবজীবন-চিত্র বলিয়াই আমাদিগকে আকর্ষণ করে।

'সীতারাম' (১৮৮৭), 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'র সহিত একশ্রেণীভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে—তিনখানি উপন্যাসেই ধর্মতত্ত্বব্যাখ্যা ঔপন্যাসিক চরিত্র-চিত্রণের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 'আনন্দমঠ'-এ আদর্শবাদ উপন্যাসের বাস্তব স্তরকে প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, 'দেবী চৌধুরাণী'তে ধর্মতত্ত্ববিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রবল হইয়াও বাস্তব চরিত্র-চিত্রণকে অভিভূত করিতে পারে নাই। 'সীতারাম'-এও একটা ধর্মতত্ত্বের সমস্যাই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়, কিন্তু এখানেও ধর্মতত্ত্বের প্রাধান্য ঔপন্যাসিকের অন্তর্দৃষ্টিকে ক্ষীণ করিতে পারে নাই, পরন্তু চরিত্রের সূক্ষ্ম পরিবর্তন-সংঘটনে ও তাহার কারণ-বিশ্লেষণে গ্রন্থকার আশ্চর্য নিপুণতাই দেখাইয়াছেন।

এখানে বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্বালোচনার প্রকৃতি ও উপন্যাসের উপর ইহার প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিষ্কার করিয়া লওয়া প্রয়োজন। ইংরেজী উপন্যাসে ধর্মতত্ত্বালোচনার প্রভাব এতই কম, এমন কি উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসের বিরুদ্ধে এমন একটা বদ্ধমূল সংস্কার আছে যে, আমাদের ইংরেজী-সাহিত্যপুষ্ট রুচি সহজেই উপন্যাসের সহিত ধর্মতত্ত্বের সম্পর্ক অস্বাভাবিক ও কলা-নৈপুণ্যের দিক্ হইতে ক্ষতিকর, এইরূপ একটা ধারণা করিয়া বসে।

অবশ্য এইরূপ ধারণা করার জন্য যে যথেষ্ট হেতু নাই, তাহা বলিতেছি না ; অধিকাংশ স্থানেই দেখা যায় যে, লেখক তাঁহার প্রতিপাদ্য ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেই এত নিবিষ্টচিত্ত হইয়া পড়েন যে, তিনি তাঁহার সৃষ্টচরিত্রগুলিকে সজীব করিয়া তুলিতে ভুলিয়া যান, এবং তাহাদের স্বাভাবিক পরিবর্তন ও পরিণতি তাঁহার মৌলিক উদ্দেশ্যের দ্বারা অযথারূপ নিয়ন্ত্রিত করেন—তাঁহার চরিত্রগুলি অনেকটা নৈতিক গুণের মূর্ত বিকাশ হইয়া পড়িতে চাহে। সুতরাং এই শ্রেণীর উপন্যাসের বিরুদ্ধে আমাদের একটা সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্বাভাবিক সন্দেহ যদি অযৌক্তিক সংস্কারে পরিণত হইয়া প্রতিভাবান্ লেখকের রসাস্বাদনের পক্ষে বাধা উপস্থিত করে, তাহা হইলে সমালোচনার উদ্দেশ্য ও আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়। 'সীতারাম'-এর সেরূপ কোন বাধা উপস্থিত হইয়াছে কি-না, তাহাও আমাদিগকে ধীরভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

'সীতারাম' উপন্যাসে ধর্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যা যে বঙ্কিমের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাহা অবিসংবাদিত ; ইহার মুখবন্ধে গীতা হইতে উদ্ধৃত শ্লোক-সমষ্টিই তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ। গীতা-আলোচনার ফলে বঙ্কিমের মনে গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্মের মাহাত্ম্য খুব গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার শেষ জীবনের উপন্যাসগুলিতে ঔপন্যাসিক চরিত্রসৃষ্টি দ্বারা ও মানব-জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে তিনি এই ধর্মের বিশেষত্ব, ইহার আদর্শ ও সাধনপথে বিঘ্নসমূহ ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কথাটা আর্টের দিক হইতে শুনিতে ভাল লাগিবে না ; কিন্তু ধর্মতত্ত্বসম্বন্ধে একটা কথা মনে করিলে এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহের অনেকটা নিরসন হইবে। ধর্মশাস্ত্রকারেরা যে মানবমনস্তত্ত্ববিদ্ ছিলেন না, এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই—প্রত্যুত তাঁহাদের অনেক উপদেশ-অনুশাসন মানব-মনের গভীর জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বিশেষতঃ মনের উপর পাপের সূক্ষ্ম প্রভাব ও ইহার ক্রমবৃদ্ধিসম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রবিদ্‌দের কল্পনা বিলক্ষণ সচেতন ছিল। 'সীতারাম' উপন্যাসে একটি স্বভাব-মহান্ চরিত্রের উপরে এই পাপের সূক্ষ্ম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও চরম পরিণতির আলোচনা হইয়াছে। 'সীতারাম' পড়িতে পড়িতে যদি আমরা ইহার গীতোক্ত ধর্মতত্ত্ব ভুলিয়া যাই, তাহা হইলেও ইহার কলাসৌন্দর্যের ও মানবিকতার (human interest) কোন হানি হয় না। যাঁহারা উপন্যাসের সহিত ধর্মতত্ত্বের একটি চির-বিরোধের কল্পনা করেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই 'সীতারাম'কে ধর্মতত্ত্বের আবেষ্টন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, আধুনিক কালের ধর্মপ্রভাবমুক্ত মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের আবেষ্টনের মধ্যে অনায়াসেই ফেলিতে পারেন। সীতারামের মধ্যে যে দুর্বলতার বীজ নিহিত ছিল, তাহা মনুষ্যহৃদয়ের একটি সাধারণ, চিরন্তন মোহ, গীতাকার কেবল তাহাকে একটি বিশেষ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন, উহা হইতে উদ্ধার পাইবার সাধন-পথ নির্দেশ করিয়াছেন মাত্র। বঙ্কিম তাঁহার সমৃদ্ধ কল্পনাভাণ্ডার হইতে এই বাস্তব মোহের একটি উদাহরণ লইয়াছেন ; এবং যদিও সীতা-রামের জীবন-সমস্যার উপরে হিন্দু-সমাজ ও ধর্মতত্ত্বের প্রভাব আসিয়া ইহাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে—স্ত্রীর সহিত তাহার সমস্ত সম্পর্কই হিন্দুর সামাজিক ও ধর্মগত বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—তথাপি তাঁহার নৈতিক অধঃপতনের চিত্রাঙ্কন ও ইহার কারণ-বিশ্লেষণ সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে। নিতান্ত বাস্তবতা-প্রিয় পাঠকেরও এ বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই।

অবশ্য বঙ্কিম ধর্মতত্ত্ব ও অতিপ্রাকৃত দিক্‌টা মোটেই অবহেলা করেন নাই—শ্রী ও জয়ন্তীর

ভিতর দিয়া এই দিক্‌টা যথেষ্ট ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। স্ত্রীর সহিত সীতারামের সম্পর্কের বিশেষত্বটুকু হিন্দু-জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশ্বাসেরই ফল; আবার উপন্যাসের শেষের দিকে জয়ন্তী শিষ্যা শ্রীর সন্ন্যাসের প্রতি অবিমিশ্র নিষ্ঠাই সীতারামের চিত্ত-বিভ্রম জন্মাইয়া তাঁহার অধঃপতনের গতি দ্রুততর করিয়া দিয়াছে। কিন্তু সীতারামের নিজের জীবনের উপর ধর্ম-তত্ত্বের প্রভাব লক্ষিত হয় না। বঙ্কিমের কৃতিত্ব এই যে, তিনি ধর্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যাকে জীবনের মনস্তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণের সহিত নিশ্চিহ্নভাবে মিলাইয়া দিয়াছেন। সীতারামের অপরিমিত রূপমোহ কিরূপে ধীরে ধীরে তাঁহার মনের উপরে আধিপত্য বিস্তার করিল ও অনুকূল ঘটনা-যোগে দুর্দমনীয় হইয়া তাঁহার রাজত্ব ও মনুষ্যত্বের যুগপৎ ধ্বংস-সাধন করিল, তাহার কাহিনীর রসোপলব্ধির জন্য আমাদের ধর্মতত্ত্বের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই।

সীতারামের চরিত্রে অতৃপ্ত রূপ-মোহের দুর্বলতা যে প্রথম হইতেই সুপ্ত ছিল, তাহা বঙ্কিম বিপন্না সাহায্যপ্রার্থিনী শ্রীর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ-কালেই একটি সূক্ষ্ম অথচ অর্থ-পূর্ণ ইঙ্গিতের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।—"তুমি, শ্রী, এত সুন্দরী।" পিতৃ-আজ্ঞা অনুসারে নিরপরাধ শ্রীকে নিশ্চিন্তভাবে পরিত্যাগ, ও তাহার সম্বন্ধে কর্তব্যবোধের সম্পূর্ণ বিসর্জন—ইহাও চরিত্র-দৌর্বল্যেরই সূচক। তাহার পর এত দিনের বিস্মৃত কর্তব্যজ্ঞান যে এরূপ উচ্ছ্বসিতভাবে জাগিল, শান্ত হৃদয়ে যে গভীর তরঙ্গ-বিক্ষোভ জন্মিল, তাহার মূলে, সমবেদনা, আত্মগ্লানি, প্রভৃতি সমস্ত উচ্চ-ভাবকে ছাপাইয়া যে শক্তি ছিল তাহাও এই রূপতৃষ্ণা। গঙ্গারামের জন্য তাহার অভাবনীয় আত্মোৎসর্গের প্রস্তাবও এই মূল ভাব হইতে প্রসূত। অবশ্য রূপ-মোহ যতই প্রবল হউক না কেন, তাহা সাধারণ প্রকৃতির লোককে এরূপ আত্মোৎসর্গে প্রণোদিত করিতে পারে না। সীতারামের চরিত্রের অসাধারণ মহত্ত্ব না থাকিলে কোন শক্তিই তাঁহার মনকে এত উচ্চ-সুরে বাঁধিয়া দিতে পারিত না। সুতরাং এই দৃশ্য যেমন একদিকে সীতারামের স্বাভাবিক মহত্ত্বের পরিচয় দিতেছে, তেমনই অন্যদিকে তাহার উপর রূপ-মোহের প্রবল প্রভাবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে—এখানে তাঁহার মহত্ত্ব ও দুর্বলতা একই সূত্রে গ্রথিত হইয়া দেখা দিয়াছে। তার পর যুদ্ধের সময়ে শ্রীর সিংহবাহিনী মূর্তি সীতারামের অন্তরস্থ সুপ্ত উচ্চাভিলাষের দ্বারে আঘাত করিয়াছে, তাঁহার স্বাধীনতার কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া শ্রীর প্রতি আকর্ষণকে নিবিড়তর করিয়া তুলিয়াছে। রূপমুগ্ধ সীতারাম এই সিংহবাহিনী মূর্তি ধ্যান করিয়া তাঁহার নেশাকে আরও রঙ্গিন করিয়া তুলিয়াছেন, ও তাঁহার রূপ-মোহের উপরে আর একটা উন্নততর আকাঙ্ক্ষার প্রলেপ দিয়াছেন।

তারপর শ্রীর সহিত প্রথম বোঝা-পড়া; শ্রীকে পরিত্যাগ করিবার কারণ প্রকাশ করিতেই স্বামীর অমঙ্গলভয়-ভীতা শ্রীর অন্তর্ধান। এই অপ্রাপণীয়া শ্রী সীতারামের ধ্যানে আরও উজ্জ্বলতর মূর্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিল; শ্রী সীতারামের নিকটে অজ্ঞাত অনন্তের বিচিত্র-রহস্য-মণ্ডিত হইয়া উঠিল। রূপ-মোহ চরম পরিণতি প্রাপ্ত হইল; সমস্ত কল্পনা ও ধ্যান-ধারণার উপর জুড়িয়া বসিয়া জীবনের উপরে প্রবলতম প্রভাব হইয়া দাঁড়াইল।

এদিকে গঙ্গারামের ব্যাপার লইয়া যে সামান্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা, তাহা একটা ক্ষুদ্র স্বাধীনতা-সংগ্রামের গৌরব ও ব্যাপকতা লাভ করিয়া বসিল। সীতারাম অনেকটা অজ্ঞাতসারে, অনেকটা ঘটনার প্রবল স্রোতে বাধ্য হইয়া, আপনাকে একজন স্বাধীন-রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতার আসনে আসীন

দেখিতে পাইলেন। এই উত্তেজনা ও কোলাহলের সময়ে শ্রীর চিন্তার বাহ্যপ্রকাশ কতকটা মন্দীভূত হইয়া থাকিল; আত্মরক্ষা ও রাজ্যস্থাপনের প্রবল প্রয়োজন সীতারামকে শ্রীর চিন্তা হইতে কতকটা অপসৃত করিল। কিন্তু এ সময়েও তাহার অন্তরস্থ ইচ্ছা যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় কেবল অবসরেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল, গ্রন্থকার তাহার প্রচুর নিদর্শন দিয়াছেন।

তারপর আর এক দৃশ্যে সীতারামের শ্লাঘ্যতম গৌরব-শিখরে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অন্তরস্থ দুর্বলতার বীজে নববারি-নিষেক হইল। যে দিন ছদ্মবেশী সীতারাম সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী ও শ্রীর সাহায্যে একাকী দুর্গ রক্ষা করিয়া অমানুষিক বীরত্বের পরিচয় দিলেন, সেই দিনই তাঁহার চরম গৌরবের দিন, ও শ্রীর সহিত শুভতম সম্মিলনের লগ্ন। সেই শুভদিনের পর হইতেই তাঁহার সাংসারিক ও নৈতিক উভয়বিধ অধঃপতনের আরম্ভ হইল। রাজ্যরক্ষার পুরস্কার-স্বরূপ যে রত্ন তিনি পাইলেন, তাহা তাঁহার জীবনে দীর্ঘকালসঞ্চিত দাহপদার্থের নিকটে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতই আসিয়া পড়িল। আবার রমার গঙ্গারাম-ঘটিত কলঙ্ক-ব্যাপার ও তাহার প্রকাশ্য দরবারে বিচার, একদিকে সীতারামের মনে একটা গভীর বিক্ষোভ জাগাইয়া, অন্যদিকে রমার প্রতি একটা বদ্ধমূল বিরাগের সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকে উন্মত্ত, সর্বগ্রাসী প্রেমের আবর্তনের দিকে আরও অগ্রসর করিয়া দিল।

অতঃপর অভাবনীয়রূপে পরিবর্তিতা সন্ন্যাসিনী শ্রীর সহিত মিলনের পর সীতারামের চিরপোষিত রূপতৃষ্ণা অপ্রত্যাশিত বাধা পাইয়া সাংঘাতিক বিষের ন্যায় তাঁহার সমস্ত মনে ছড়াইয়া পড়িল, তাঁহার নৈতিক জীবনের ভিত্তি পর্যন্ত টলমল করিতে লাগিল। গ্রন্থকার অতি সুন্দরভাবে এই প্রতিরুদ্ধ প্রবৃত্তির ভীষণ ক্রিয়া সীতারামের কার্যকলাপের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 'বিষবৃক্ষ'-এ জমিদার নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর প্রেমে পড়িয়া ও আপনার সহিত যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া মদ খাইতে লাগিলেন, এবং দুই একটা নিরীহ ভৃত্যকে প্রহার করিয়া নিজ অন্তর্দাহের পরিচয় দিলেন। স্বাধীন রাজা সীতারাম, নিজ পরিণীতা ভার্যার উপর স্বামীর অধিকার প্রয়োগ করিতে না পারিয়া, উগ্রতর রক্তের নেশায় মাতাল হইয়া উঠিলেন, এবং নিজ উন্মত্তপ্রায় অস্থিরমতিত্বে একটা রাজত্বের উপর বিশৃঙ্খলার স্রোত বহাইয়া দিলেন। এখনও সংযমের শেষ বন্ধন ছিন্ন হয় নাই, শ্রীর প্রতি প্রকৃত প্রেম সীতারামকে পাশবিক অত্যাচারের পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। এখনও পর্যন্ত তাঁহার অপরাধ কর্তব্যচ্যুতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল, অত্যাচার ও পাপাচরণের চরম সীমা পর্যন্ত পৌঁছায় নাই। এই কর্তব্যচ্যুতির ফলে একদিকে রমা মরিল, অন্যদিকে চন্দ্রচূড় তিরস্কৃত হইলেন ও রাজকর্মচারীরা শূলে গেল। তবে এখন পর্যন্ত সীতারাম নিজেরই ক্ষতি করিয়াছেন, ইন্দ্রিয়-দাস পশুতে পরিণত হন নাই।

কিন্তু এই চরম দুর্গতি ও অধঃপতনও বাকী রহিল না। শ্রী, কতকটা নিজ সন্ন্যাস-পালন-ক্ষমতায় আস্থা হারাইয়া, কতকটা রাজার অধঃপতনের গতিরোধ করিবার জন্য, জয়ন্তীর পরামর্শে ও তাহারই ছদ্মবেশের সাহায্যে প্রমোদ-উদ্যান হইতে অন্তর্হিতা হইল। সীতারামের ক্ষিপ্ততা চরমে উঠিল; বিজাতীয় ক্রোধ আসিয়া তাঁহাকে হিংস্র পশুর ন্যায় জয়ন্তীর প্রতি দংষ্ট্রা-নখর-প্রয়োগে উত্তেজিত করিল। অন্তঃরুদ্ধ রূপতৃষ্ণা এইবার প্রচণ্ড সর্বগ্রাসী কামানলের শিখায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত হিন্দুরাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা মহিমময় সীতারাম একটা ঘৃণিত, কামার্ত পশুতে পরিণত হইলেন। সীতারাম-চরিত্রের এই ভীষণ পরিবর্তন

অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দ্বারা আমাদের সম্মুখে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক করিয়া ধরা হইয়াছে। সীতারামের এই অধঃপতনের চিত্র সর্বতোভাবে বীর ম্যাকবেথের রক্তপিপাসু পশুতে পরিণতির সহিত তুলনীয় এবং এই চরিত্র-বিশ্লেষণে বঙ্কিম সগৌরবে ধর্মতত্ত্বের ক্ষীণতম প্রভাব হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছেন।

গ্রন্থের শেষ দৃশ্যে আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে দুর্গ-প্রাচীর-ভেদ-কারী কামানের শব্দ ও তাহার প্রতিধ্বনির মধ্যে সীতারামের নৈতিক পুনরুদ্ধার সাধন করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার গভীর ধর্ম-বিশ্বাসেরই পরিচয় দিয়াছেন। এইখানে ইংরেজ কবির সহিত হিন্দু গ্রন্থকারের প্রভেদ। ইংরেজ জাতি এইরূপ আকস্মিক পরিবর্তনে তাদৃশ বিশ্বাস করে না। সেই জন্য শেক্স্‌পিয়ার, তৃতীয় রিচার্ড ও ম্যাক্‌বেথকে হিংস্র পশুবৎ রাখিয়াই শমনসদনে পাঠাইয়াছেন, তাহাদের নৈতিক পুনরুদ্ধারের কোন চেষ্টা করেন নাই। অবশ্য মৃত্যুর প্রাক্কালে এই সমস্ত অধঃপতিত বীরের মুখে কবি যে সমস্ত ভাব ও উদাস, খেদপূর্ণ বাণী দিয়াছেন, তাহাতে ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, তাহাদের মধ্যে নিষ্ফল ক্ষোভ ও অনুতাপের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্কিমের সীতারাম এক মুহূর্তে তাঁহার সমস্ত দৌর্বল্য ও চরিত্র-গ্লানি ধূলিজঞ্জালবৎ ঝাড়িয়া ফেলিয়াছেন; গ্রন্থের এইরূপ পরিসমাপ্তি করিয়া বঙ্কিম তাঁহার জাতিগত ও ধর্মবিশ্বাসগত বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে বাস্তবতার বিশেষ হানি হইয়াছে বলিয়া মনে করার কোন কারণ নাই। পূর্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, প্রত্যেক জাতির একটি বিশেষ-রকম রোমান্সের দিকে প্রবণতা আছে, এবং এই রোমান্সের প্রকৃতি তাহার বাস্তব জীবনের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে। ইউরোপীয় রোমান্স আমাদের বাঙ্গালী-জীবনের আবেষ্টনের মধ্যে ঠিক মিলিবে না, আমাদের জাতিগত ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপরই আমাদের রোমান্সের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই মানদণ্ডে বিচার করিতে গেলে সীতারামের শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনের রোমান্স আমাদের বাস্তব জীবনের অবস্থার সহিত বেশ সুসঙ্গতই হইয়াছে। সীতারামের পূর্বজীবনের স্বাভাবিক মহত্ত্বই এই পুনরুদ্ধারের কার্যে সহায়তা করিয়াছে। বিশেষতঃ বঙ্কিম যেরূপ গভীর আবেগ ও সংযত অথচ মর্মস্পর্শী সহৃদয়তার সহিত এই পরিবর্তনের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে যে তিনি কেবল একটা সুলভ ভাবাতিরেক (sentimentality) চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছেন, এরূপ সন্দেহের কোন অবসর থাকে না, তাঁহার অস্থিমজ্জাগত গভীর ধর্মভাবই এই দৃশ্যের প্রত্যেক ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সীতারাম-চরিত্র বঙ্কিমের অপূর্ব সৃষ্টি; সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ও বাস্তবের সহিত রোমান্সের সংমিশ্রণের সুসংগতিতে ইহা পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসের যে-কোন সমজাতীয় চরিত্রের সহিত সমকক্ষতার স্পর্ধা করিতে পারে।

রোমান্সের যাহা কিছু আতিশয্য ও অসংগতি, তাহা শ্রী ও জয়ন্তীর যুগ্ম-চরিত্রের উপর দিয়াই ব্যয়িত হইয়াছে। জয়ন্তীকে আমাদের খুব সূক্ষ্মভাবে দেখিবার প্রয়োজন নাই—সে রোমান্স-প্রাসাদের একটা আবশ্যকীয় গৃহসজ্জা মাত্র। শ্রীকে সন্ন্যাসে ব্রতী করিবার জন্য ও সীতারামের জীবনে একটা প্রলয়-ঝটিকা তুলিবার জন্য এরূপ একটা সংসার-বন্ধনশূন্যা, প্রলোভনা-তীতা সন্ন্যাসিনীর প্রয়োজন ছিল। গ্রন্থকার নিজ কল্পনার ইন্দ্রজালবলে এরূপ একটি সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণা সন্ন্যাসিনীকে পাঠকের সম্মুখে হাজির করিয়াছেন—তাহার অতীত জীবনের কোন আভাস দেন নাই। পাঠকের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা যে লেখক-নির্দিষ্ট গণ্ডি অতিক্রম করিয়া

অসুবিধাজনক প্রশ্ন উত্থাপন করিবে, বঙ্কিমের এরূপ অভিপ্রায় ছিল না; এবং রোমান্সের জগতে এরূপ তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসাপ্রবৃত্তি অনেকটা অনধিকার-প্রবেশকারী বলিয়াই বিবেচিত হইবার যোগ্য। যেমন আমাদের দ্বারপ্রান্তবাহিনী নদী কোন সুদূর পর্বতশিখর হইতে নামিয়া আসিয়া আমাদের প্রাত্যহিক জীবন-স্রোতের সহিত আপনাকে মিলাইয়া দেয়, ও উহার অতীত জীবন সম্বন্ধে আমরা কোন প্রশ্নই উত্থাপন করি না, সেইরূপ জয়ন্তীও অজ্ঞাতের রাজ্য হইতে আসিয়া উপন্যাসের কর্মস্রোতের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। সুতরাং জয়ন্তীতে বিশেষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দেখিবার আশা আমরা করিতে পারি না। কিন্তু বঙ্কিম এরূপ একটি গৌণ-রকমের চরিত্রেও যথেষ্ট মাধুর্য ও মানবিকতার সঞ্চার করিয়াছেন। অবশ্য শ্রীর সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা ও তাহার চরিত্রগত গভীর পরিবর্তন-সাধনের জন্য কৃতিত্ব, আর্টের দিক্ হইতে, জয়ন্তীর প্রাপ্য নহে; কেন-না এই পরিবর্তন পাঠকের চক্ষুর অগোচরে, যবনিকার অন্তরালে সম্পাদিত হইয়াছে। আবার শ্রীর সহিত জয়ন্তীর নিষ্কামধর্মসম্পর্কীয় যে-সমস্ত দার্শনিক আলোচনা হইয়াছে, তাহাতেও তাহার সজীবতার পরিমাণ বাড়ে নাই। কিন্তু বঙ্কিম সন্ন্যাসের এই অশরীরী আদর্শকে এমন অগ্নিপরীক্ষায় ফেলিযাছেন যে, তাহার মুখ হইতে মানুষের মর্মের কথা বাহির হইয়া আসিয়াছে। সেই মুহূর্ত হইতে জয়ন্তী আমাদের নিকট কেবল আদর্শ সন্ন্যাসিনী নহে, একটা সজীব ঘাত-প্রতিঘাতচঞ্চল মানুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জয়ন্তীর বিচারের দৃশ্য যেমন একদিকে বঙ্কিমের বর্ণনাশক্তি ও সৃজনীপ্রতিভার পরিচয়, তেমনি অপরদিকে তাঁহার সূক্ষ্ম নৈতিক অনুভূতিরও নিদর্শন। জয়ন্তীর মনে যে মুহূর্তে একটু সূক্ষ্ম অহংকারের ভাব প্রবেশ করিয়াছে, যে মুহূর্তে তাহার সন্ন্যাসের মধ্যে বাহ্যাড়ম্বরের একটু সামান্য স্পর্শ হইয়াছে, সেই মুহূর্তেই স্ত্রীজাতিসুলভ লজ্জা আসিয়া তাহার সমস্ত অহংকার চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। বঙ্কিমের প্রতিভা এখানে অতিসূক্ষ্ম তাপমান-যন্ত্রের ন্যায় অন্তরস্থ অহংকারের সামান্য তারতম্য, ঈষৎ মাত্রাভেদও অভ্রান্তভাবে ধরিয়া ফেলিয়াছে।

শ্রীর চরিত্রেই উপন্যাস মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক অবাস্তবতা দৃষ্ট হয়। শ্রীর চরিত্রের গুরুতর পরিবর্তনটি আমাদের দৃষ্টির বাহিরে সাধিত হওয়ায় তাহার গৌরব অনেকটা খর্ব হইয়াছে। শ্রীর স্বামিপ্রেমের যে গভীর, মর্মস্পর্শী বিবরণ পাই, তাহাতে তাহার পরিবর্তনের কাহিনীটি বিশ্বাসের উপর মানিয়া লইতে আমাদের আরও অনিচ্ছা হয়। বিশেষতঃ ইহার পরে শ্রী জয়ন্তীর প্রভাবে পড়িয়া একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে; জয়ন্তীর একান্ত অনুগতা শিষ্যার অপ্রধান অংশ অধিকার করিয়াছে। সীতারামের জীবন-ব্যাপী আকুল বাসনা, শ্রীর নিজ অন্তঃকরণে সন্ন্যাসের আদর্শ ও স্বামিপ্রেমের মধ্যে ক্ষীণ দ্বন্দ্ব ও বিলম্বিত (belated) অনুতাপ—কিছুতেই তাহার ধমনীতে প্রাণপ্রবাহের সঞ্চার করিতে পারে নাই। শ্রী-র সিংহবাহিনীমূর্তিই আমাদের কল্পনার চক্ষে গভীর রেখায় ফুটিয়া উঠে, তাহাই আমাদের তাহার সম্বন্ধে শেষ এবং সত্য ধারণা। সন্ন্যাসিনী শ্রী একটা আদর্শজ্যোতির্মণ্ডলমধ্যবর্তিনী মূর্তি মাত্র; সে সীতারামের অনির্বাণ কামনার আগুনে রাঙা হইয়াও প্রভাতের স্তিমিত-জ্যোতি তারকার ন্যায় আমাদের চক্ষুর সম্মুখ হইতে অবাস্তবতায় বিলীন হইয়া গিয়াছে।

বাস্তব-চরিত্রদের মধ্যে রমাই সর্বপ্রধান। রমাই আমাদিগকে উচ্চ আদর্শ ও বীরত্বের রাজ্য হইতে আমাদের প্রাত্যহিক পারিবারিক জীবনের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে। সীতারামের

উচ্চাভিলাষ ও স্বাধীনরাজ্য-স্থাপন তাহার দুই চক্ষের বিষ; মুসলমানের ভয় তাহার দিবসের শান্তি ও রাত্রির নিদ্রা হরণ করিয়াছে—উপন্যাসের যুদ্ধ-কোলাহল ও সন্ন্যাসধর্মের উচ্চ আদর্শের মধ্যে সে-ই খাঁটি বাঙ্গালী নারীর মূরতি তুলিয়াছে—একমাত্র রমাই সীতারামকে বাঙ্গালী বলিয়া নিঃসন্দেহে চিনাইয়া দিয়াছে। কিন্তু অসাধারণ প্রতিবেশের প্রভাব এ-হেন রোদন-প্রবণা, অতিমাত্র স্নেহ-দুর্বলা নারীকেও রোমান্সের দীপ্তি ও গৌরব আনিয়া দিয়াছে। প্রথমতঃ গঙ্গারামকে অন্তঃপুরে আমন্ত্রণের ব্যাপারে তাহার শঙ্কাতিশয্যই তাহাকে দুঃসাহসের চরম-সীমায় ঠেলিয়া দিয়াছে। আর প্রকাশ্য দরবারে বিচারের দিন পুত্রস্নেহ তাহার সমস্ত লজ্জা-সংকোচ-দুর্বলতাকে সরাইয়া দিয়া তাহার কণ্ঠ অতুলনীয় বাগ্মিতায় ভরিয়া দিয়াছে, এবং সেই ক্ষীণপ্রাণা রমণীর উপর মহামহিমময়ী সম্রাজ্ঞীর জয়মুকুট পরাইয়াছে। রোমান্সের অসাধারণত্ব ও আমাদের সাধারণ জীবনের উপরে তাহার অনন্যমেয় প্রভাব-সম্বন্ধে বঙ্কিমের দৃষ্টি কত তীক্ষ্ণ ছিল, রমার চরিত্র তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সীতারামের অবহেলাজনিত শোচনীয় মৃত্যু তাহার পাণ্ডুর মুখে একটা করুণ আভা আনিয়াছে, এবং মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দিক্ দিয়াও, সীতারামের অধো-গতির একটি সোপানস্বরূপেও, উপন্যাসে তাহার সার্থকতা আছে।

অন্যান্য চরিত্রের বিস্তারিত আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন নাই। গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতা একটা অতর্কিত বিকাশ বলিয়াই প্রথম দৃষ্টিতে অনুভূত হয়। কিন্তু লেখক উপন্যাসের প্রথম অংশে তাহার আত্মসর্বস্বতার একটি ক্ষুদ্র ইঙ্গিত দিয়া বোধ হয় তাহার শোচনীয় পরিণামের জন্য আমাদিগকে কতকাংশে প্রস্তুত করিতে চাহিয়াছেন। কাজীর নিকট গঙ্গারামের বিচারের দিন, সীতারাম তাহার উদ্ধারের জন্য কতখানি আয়োজন করিয়াছেন, মুসলমানের সহিত লড়াই করিবার জন্য কতখানি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন, তাহা গঙ্গারাম-এর জানিবার কোন উপায় ছিল না; তাহার সহিত কার্যপ্রণালী-সম্বন্ধে সীতারামের নিশ্চয়ই কোন পরামর্শ হইতে পায় নাই। অথচ গঙ্গারাম আত্মরক্ষা ব্যতীত অন্য কিছু না ভাবিয়া সীতারামকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া রাখিয়া সীতারামের অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া অনায়াসে পলায়ন করিল। অবশ্য কামারকে ঘুষ দিয়া গঙ্গারামের হাত-পা বেড়ি-মুক্ত করিয়া লওয়াতে গঙ্গারামের সহিত পূর্ব-পরামর্শের একটা ক্ষীণ আভাস পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু বোধ হয় ইহার উদ্দেশ্য এই যে, সুযোগ উপস্থিত হইলে যাহাতে গঙ্গারামের পলায়নের পক্ষে কোন বিঘ্ন না থাকে তাহার ব্যবস্থা করা। গঙ্গারাম যে এরূপ অতর্কিতভাবে ও অপরকে বিপদে ফেলিয়া নিজ পলায়নের উপায় নিজেই করিয়া লইবে, কোন উপদেশের অপেক্ষা রাখিবে না, ইহার জন্য বোধ হয় কেহই প্রস্তুত ছিল না। গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রারম্ভেই গঙ্গারামের মধ্যে স্বার্থপরতার বীজের অস্তিত্ব দেখাইয়াছেন; পরে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা অনুকূল ঘটনার আশ্রয়ে এই মৌলিক স্বার্থপরতার স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র।

'সীতারাম'-এ অসাধারণ ও রোমান্টিক দৃশ্য-বর্ণনায় বঙ্কিমের কল্পনার বিশাল প্রসার ও পরিধি প্রস্ফুট হইবার অবসর পাইয়াছে। বিশাল, উদ্বেল, জনসমুদ্র-বর্ণনে বঙ্কিম যেরূপ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী লেখকের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়। এইরূপ তিনটি দৃশ্য উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—গঙ্গারামের উদ্ধার লইয়া হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা, রমা ও গঙ্গারামের বিচার, ও জয়ন্তীর বেত্রদণ্ডাজ্ঞা। এই তিনটি দৃশ্যে বিক্ষুব্ধ জনতার

বাষ্প-নিষ্কাষণ বা দ্রবীকরণের ন্যায়। রোগশয্যায় পড়িয়া শর্মিলা এক দিকে অশ্রু মুছিয়াছে, অপর দিকে স্বামীকে ভগিনীর হাতে সমর্পণ করিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছে। ইতিমধ্যে পরীক্ষা-প্রণালীর পূর্ব-নির্দিষ্ট ক্রম-পর্যায়-অনুসারে সে হঠাৎ রোগশয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া স্বামীর সহিত ভগিনীর বিবাহে বরণ-ডালা সাজাইতে বসিয়া গিয়াছে। আত্মাহুতি মাতৃজাতীয়ত্বের চরম নিদর্শন বলিয়া সে তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ দিতে উদ্যত হইয়াছে। ইত্যবসরে ঊর্মিমালার মনে তাহার প্রকৃতি-গত প্রেয়সীত্বের আবেশ কাটিয়া যাওয়ার পর অকস্মাৎ মাতৃত্বের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে—সে প্রেমের খেলা ত্যাগ করিয়া বিলাত উধাও হইয়াছে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত মাতৃত্বই জয়ী হইয়াছে। শর্মিলার এই রাহুগ্রাসমুক্ত মাতৃত্বের চন্দ্রলেখা পরিণামে প্রেয়সীত্বের পূর্ণচন্দ্রে বিকশিত হইয়াছে কি না, তাহা ইতিহাসে লেখে না, তবে সে শেষ মুহূর্তে স্বামীর বুকের উপর পড়িয়া তাহার কর্ম-সাহচর্যের অধিকার ভিক্ষা করিয়া লইয়াছে। কর্ম-সাহচর্য নর্ম-সাহচর্যে পরিণত হইবে কি না, তাহার কোন আভাস নাই।

শর্মিলা যেমন মাতৃজাতীয়ত্বের প্রতীক, ঊর্মি তেমনি চিরন্তন প্রিয়া। কিন্তু তাহার নাম ঊর্মিমালা হইলেও কাজে তাহার তরঙ্গ-ভঙ্গে প্রেমের অতলস্পর্শ, অধীর উচ্ছলতা নাই। লাবণ্য বা কুমুদিনীর চারিদিকে যেমন একটা পুষ্প-সুরভি, কল-গুঞ্জন-মুখরিত মদিরতা ঘনাইয়া আছে, ইহার সেরূপ কিছুই নাই। প্রণয়ের মোহময় আবেশ ইহার চারিদিকে কোন জ্যোতির্মণ্ডল রচনা করে নাই। ইহার আকর্ষণ লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি, থিয়েটার, বায়োস্কোপ দেখা, প্রভৃতি ছেলেমানুষীতেই সীমাবদ্ধ। ঊর্মিকে কোন মতেই প্রণয়িনীর উপযুক্ত পরিকল্পনা বলিয়া মনে করা যায় না। নীরদের সঙ্গে তাহার পূর্ব-সম্বন্ধের মধ্যে এমন কোন ভাব-গভীরতা নাই, যাহাতে সম্বন্ধচ্ছেদের মধ্যে মুক্তির আনন্দ একফোঁটা বিষাদ-বাষ্পেও কলুষিত হইতে পারে। এই সম্বন্ধের বাঁধন কল্পিত হইয়াছে কেবল তাহার মুক্তির চাপল্য-উচ্ছ্বাসের গতিবেগ বাড়াইবার জন্য। তাহার বিদায়-পত্রগুলির মধ্যেও কোনরূপ ভাব-গভীরতার ছাপ নাই, দিদির প্রতি যে অবিচার করিয়াছে তাহার একটা সামান্য উল্লেখ-মাত্র আছে, কোন অনুতাপের গভীর আলোড়ন নাই। শিশু যেমন এক খেলা ছাড়িয়া অন্য খেলায় রত হয়, ঊর্মিও সেইরূপ চিন্তালেশহীন লঘু পাদক্ষেপের সহিত শশাঙ্ককে ছাড়াইয়া বিলাত রওনা হইয়াছে; এই ছাড়াছাড়িতে তাহার হৃদয়ে কোনখানে সত্যকার টান পড়ে নাই। তাহার বিদায়-মুহূর্ত 'শেষের কবিতা'র বিদায়ের মত কোন কবিতার ভার সহিবে না, ইহা নিশ্চিত। উপন্যাসটি পড়িয়া মনে হয় যে, গভীর আলোচনা কোথাও লেখকের উদ্দেশ্য ছিল না, শশাঙ্ক, শর্মিলা ও ঊর্মি—তিনজনের পরস্পর সম্পর্কে যে একটা সামান্যরূপ জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকে তিনি অবিমিশ্র ছেলেমানুষী মনে করিয়া তাহার দিকে একটু লঘুতরল, সকৌতুক ব্যঙ্গ-কটাক্ষ মাত্র করিয়াছেন। যে সমস্ত উপন্যাসে হৃদয়-বিশ্লেষণের গভীরতা আছে, 'দুই বোন' তাহাদের সমশ্রেণীভুক্ত নহে এবং প্রথমোক্তদের বিচারের মানদণ্ড উহার প্রতি প্রযোজ্য নহে।

লেখকের বর্ণনা-ভঙ্গী ও ভাষার বিশেষত্বও এই আলোচনাগত লঘুত্বেরই সমর্থন করে। উপন্যাসের মধ্যে বর্ণিত আখ্যানগুলির বিবৃতিভঙ্গী সার-সংকলনের ন্যায়ই শুষ্ক ও স্বাদহীন। ঘটনাগুলি যে চোখের সামনে ঘটিতেছে, এরূপ ধারণা আমাদের একেবারেই হয় না—সেগুলি যেন বহুপূর্বে ঘটিয়াছে, লেখক তাহাদিগকে বিশ্লেষণ করিয়া, তাহাদের সারাংশ তাঁহার পরীক্ষা-

গায়ের জন্য বোতলে পুরিয়াছেন ও প্রত্যেকটির উপর মন্তব্যের লেবেল মারিয়া পাঠকের সামনে ধরিয়াছেন। ইহার রস যেন পূর্ব হইতেই উপভুক্ত হইয়াছে ও আমরা পরের জিহ্বাতে যেন তাহার আস্বাদন করি। গাছের টাট্‌কা ফল হইতে রস নিঃসারণ করিয়া, তাহা হইতে সিরাপের বোতল পূর্ণ করার ন্যায় এই উপন্যাসে বর্তমানের তাজা সরসতা যেন অতীতের অর্ধ-শুষ্ক পশ্চাৎ-আলোচনায় (retrospect) মধ্যে তাহার স্বাদ হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই ঘটনা-বলীর মধ্যে যেখানে গভীর বা করুণ রসের সম্ভাবনা মাত্র আছে, লেখক epigram-এর তীক্ষ্ণাগ্রে তাহাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া লঘু পরিহাসের বাতাসে উড়াইয়া দিয়াছেন। শশাঙ্কের জন্ম-তিথি উৎসব, শর্মিলার কঠিন রোগ ও মুমূর্ষু অবস্থা, তাহার গভীর মনঃপীড়া—কিছুতেই এই পরিহাস-চাপল্যের নৃত্যশীল গতি প্রতিরুদ্ধ হয় নাই। ভাষা ভাব-গভীরতার চাপে একটুও মন্থরগতি হয় নাই। এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে, লেখক এই উপন্যাসে প্রকৃতপক্ষে উপন্যাস রচনা করিতে চাহেন নাই, দুই-এক শ্রেণীর মানুষের আংশিক, অসম্পূর্ণ চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে দুই-একটি গভীর চিন্তাশীলতাপূর্ণ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ও সর্বশুদ্ধ মিলাইয়া একটা লঘু পরিহাস-প্রধান খণ্ড-উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি তাঁহার পূর্ব উপন্যাসগুলির সহিত ইহার একটা ধারাবাহিক যোগসূত্র না থাকিত, তবে মনে করা অসংগত হইত না যে, তিনি এখানে একটা স্বেচ্ছাকৃত শিথিলতায় গা ঢালিয়া দিয়াছেন।

'ঘরে-বাইরে' হইতে আরম্ভ করিয়া লেখক যে উপন্যাসের সাধারণ পথ পরিত্যাগপূর্বক epigram-এর ঢালু তট বাহিয়া অবরোহণ শুরু করিয়াছেন, সেই অবতরণের সর্বনিম্ন ধাপ পৌঁছিয়াছে 'দুই বোন'-এ। ইহার পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলিতে অন্যান্য গুণের প্রাচুর্যে এই নিম্ন-গমন-প্রবণতা কতকটা ঢাকা ছিল। তাঁহার তীক্ষ্ণ, ধারাল, গভীর অর্থপূর্ণ, উজ্জ্বল-বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্যগুলি, তাঁহার অসাধারণ কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পাঠককে এত মুগ্ধ ও অভিভূত করে যে, সমগ্র উপন্যাস হিসাবে তাহারা কিরূপ দাঁড়াইল, খাঁটি উপন্যাসোচিত গুণে তাহারা কত-খানি সমৃদ্ধ, এই প্রশ্ন সহসা আমাদের মনে মাথা তুলিতে অবকাশ পায় না। আর উপন্যাসের গঠন-প্রণালী এত মিশ্র ও বিচিত্র ধরণের যে, অন্যান্য শ্রেণীর রচনা হইতে ইহাতে নূতন পরীক্ষার স্বাধীনতা বেশি ও অসাফল্যের লজ্জা কম। ভিতরে মণি থাকিলে মণি-মঞ্জুষার বাহ্য-গঠন ঠিক নিখুঁত হইল কি না, সে বিষয়ে আমাদের দাবী খুব উচ্চ নহে। এই হিসাবে রবীন্দ্র-নাথের অন্যান্য উপন্যাসগুলি গঠনহিসাবে নিখুঁত না হইলেও এবং উপন্যাসের চিরপ্রথাগত প্রণালীর ঠিক অনুসরণ না করিলেও প্রশংসনীয় উপাদানে পরিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসে তাঁহার অনুসৃত প্রণালীর রিক্ততা ও অনুপযোগিতা একবারে অনাবৃতভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে; তাঁহার বর্ণনাভঙ্গীর অভিনবত্বের মধ্যে যে বিপদের সম্ভাবনা ছিল, তাহা পূর্ণ মাত্রায় প্রকটিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উপন্যাস 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) 'ঘরে বাইরে'-এর মত রাজনৈতিক আন্দোলনের আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্গীভূত একটি বিশেষ প্রচেষ্টা—বিপ্লববাদ—আলোচিত হইয়াছে। ঘর ও বাহিরের যে চিরন্তন বিরোধ তাহারই এক অধ্যায় ইহার আলোচ্য সমস্যা। বাহিরের তীব্র মোহ ও সর্বনাশী প্রলয় যে ঘরের স্নিগ্ধ ও স্থিরজ্যোতি প্রেম-প্রদীপকে নিবাইয়া দিবার চেষ্টা করে, এই শোচনীয় সত্যই রবীন্দ্রনাথের

কবি-কল্পনাকে বার বার অভিভূত করিয়াছে। 'ঘরে বাইরে'-এর উপন্যাসে বাহিরের বিপ্লব-সুপ্রতিষ্ঠিত প্রেমকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছে; 'চার অধ্যায়'-এ ইহার বিরুদ্ধ শক্তি প্রেমকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহার সিংহাসনস্থাপনেই বাধা দিয়াছে।

বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে উপন্যাসের নায়ক অতীনের অভিযোগ ত্রিবিধ—তাহার সনাতন নীতিজ্ঞান, আত্ম-স্বাতন্ত্র্য ও প্রেম এই তিনেরই ন্যায্য অধিকার ইহার পীড়নে সংকুচিত হইয়াছে। বিপ্লববাদ তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে, তাহার প্রকৃতির স্বাধীন প্রসারকে রুদ্ধ ও প্রতিহত করিয়াছে, তাহার মধ্যে কবিপ্রতিভার যে অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল তাহাকে নির্বিচার নিয়মানুবর্তিতার চক্রপেষণে উন্মূলিত করিতে চাহিয়াছে। তাই অতীনের অনুযোগের মধ্যে আত্মহত্যাকারীর একটা নিষ্ফল ক্ষোভ ও তীব্র আত্মগ্লানির সুর বার বার ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে অনেক তরুণ কবি নিজ স্ফুটনোন্মুখ কবিপ্রতিভার অকালমৃত্যুর সম্ভাবনায় যুদ্ধের পাশবিক নৃশংসতার বিরুদ্ধে যে তীব্র আক্ষেপোক্তি উচ্চারণ করিয়াছে, অতীনের মুখে যেন তাহারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সৈনিকের খাকি পোশাকের তলে যে সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল, বৈচিত্র্য-পিয়াসী কবি-হৃদয়ের জীবন্ত-সমাধি হয় সেই অপমৃত্যুর কাহিনীই যুদ্ধের ক্ষতির হিসাবে সর্বাপেক্ষা মোটা অঙ্ক। দলের কথার প্রতিধ্বনি কখনই কবি-হৃদয়ের নিজস্ব বাণীর সহিত মিলিয়া যাইতে পারে না; এই বেনামী কথার পুনরাবৃত্তি শেষ পর্যন্ত কবির নিজ ভাষাকে মূক করিয়া দেয়। বিপ্লব-পন্থী অতীন নিজ নৈসর্গিক কবিপ্রতিভার অপমান করিয়া আত্মবিকাশের সর্বপ্রধান পথকে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে এবং এই ব্যর্থতার বেদনা তাহার অনুযোগকে এত অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছে।

তারপর নীতিজ্ঞানের দিক্ দিয়া বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আছে, তাহা সার্বভৌমিক। বিপ্লববাদের নৈতিক ভিত্তি হইতেছে মনুষ্যত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা; কিন্তু প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে যদি এই মনুষ্যত্ব ও বিবেক-বুদ্ধিরই বলিদান হয়, তবে ইহার নৈতিক আশ্রয় যে একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া যায় তাহা বলাই বাহুল্য। প্রকাশ্য যুদ্ধ-ঘোষণার মধ্যে একটা বীরত্বের গৌরব আছে; কিন্তু বিপ্লববাদের মুখোশ-পরা, গুপ্ত নৈশ অভিযানের মধ্যে যে অপরিসীম হীনতা ও নৃশংসতা আছে তাহা একেবারে পৌরুষ-সংস্পর্শ-বর্জিত। প্রবলের সঙ্গে যুদ্ধে যেখানে দুর্বলের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, সেখানে কেবলমাত্র অবিচলিত মনুষ্যত্বের উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়াই দুর্বল প্রবলের সহিত সমকক্ষতার স্পর্ধা করিতে পারে। এই উচ্চ মঞ্চ হইতে একবার অবতরণ করিলে রসাতলের পঙ্কনিমগ্ন হইয়া যাওয়া অনিবার্য। দেশপ্রীতির মোহে ধর্ম ভুলিলে একটা ক্ষণস্থায়ী প্রয়োজনের জন্য সনাতনকে বিসর্জন দেওয়া হয় ও দেশের স্থায়ী কল্যাণের ভিত্তি অপসারিত হয়। বিপ্লববাদের প্রতি এই তীব্র বিরাগ সত্ত্বেও অতীন যে তাহাদের সংস্পর্শ হইতে নিজকে বিচ্যুত করে নাই, তাহা কেবলমাত্র সঙ্গীদের প্রতি সহানুভূতির জন্য; যে বিপথে সে পা বাড়াইয়াছে, কেবল মনুষ্যত্বের খাতিরেই তাহাকে শেষ পর্যন্ত সেই পথের চরম দুর্দশার স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে—প্রত্যাবর্তনে বিপদ্ হইতে অব্যাহতির আশা আছে বলিয়াই প্রলোভনবৎ তাহাকে বর্জন করিতে হইবে।

বিপ্লববাদের নৈতিক সমর্থনের পক্ষে যাহা বলা যায় তাহা বিপ্লবপন্থীদের নেতা ইন্দ্রনাথের মুখে দেওয়া হইয়াছে। ইন্দ্রনাথের প্রধান অনুপ্রেরণা আসিয়াছে শক্তি-পরীক্ষার দিক্ হইতে।

তাঁহার ফললাভের মোহ নাই, কোন মিথ্যা আশা তাঁহার অকুণ্ঠিত সত্যদৃষ্টিকে মলিন করিয়া দেয় নাই। পরাজয় অনিবার্য জানিয়াও তিনি তাঁহার দলভুক্ত যোদ্ধাদের অসাধ্য-সাধনার দুঃসাহসে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন ও কেবলমাত্র বীর্যপরীক্ষার অবসর দিবার জন্যই নিশ্চিন্ত মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিয়াছেন। এ দিকে যেমন দেশের প্রতি তাঁহার কোন মোহ নাই, সেই-রূপ বৈদেশিক শাসনের প্রতি তাঁহার কোন তীব্র বিরাগ নাই; ডাক্তারের যেমন রোগের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই, সেইরূপ তিনি বৈজ্ঞানিকের অপ্রমত্ত চিত্ত লইয়া পরাধীনতার মূলোচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছেন। অর্থাৎ বিপ্লববাদকে তিনি সম্পূর্ণরূপে নীতিজ্ঞানের সীমা-বহির্ভূত করিয়া উহাকে গৌরীশঙ্কর-অভিযান বা সমুদ্র-সন্তরণের মত দুঃসাহসিক কাজের পর্যায়-ভুক্ত করিয়াছেন। ইহা আর যাহা হউক, বিপ্লববাদের নৈতিক বিচার-হিসাবে মোটেই পর্যাপ্ত নহে।

বৈপ্লবিক কর্ম-প্রচেষ্টা-নিয়ন্ত্রণে তিনি যে নীতির অনুসরণ করিয়াছেন তাহা নিতান্ত দুর্বোধ্য। এলা ও কানাই গুপ্তের কথোপকথনে তাঁহার উদ্দেশ্য ও অনুসৃত প্রণালীর যে ঈষৎ আভাস পাওয়া যায় তাহাতে বিষয়টি মোটেই পরিষ্কার হয় না। প্রথমতঃ, প্রেম ও বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত একটু অদ্ভুত ও পরস্পর-বিরোধী। উমা সুকুমারকে ভালবাসে; কিন্তু সুকুমার কাজের লোক বলিয়া প্রণয়ের আবেশ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ; আর উমার ব্যর্থপ্রেম যাহাতে চারিদিকের আবেষ্টনে একটা উৎপাতের সৃষ্টি না করে, সেইজন্য ভোগীলালের অভিমুখে তাহার জন্য কৃত্রিম প্রণালী কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, কেন না, "জঞ্জাল ফেলার সবচেয়ে ভাল ঝুড়ি বিবাহ।" পক্ষান্তরে ভালোবাসাতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই, যদি তাহা বিবাহ-পিঞ্জরে চিরবদ্ধ না হয়। যে পর্যন্ত ব্রতভঙ্গ না হয়, সে পর্যন্ত তিনি এলাকে ভালবাসিতে অবাধ ছাড়পত্র দিয়াছেন, অথচ আবার সেই মুহূর্তে আদেশ করিতেছেন যে, এলা তাহার প্রণয়াস্পদের প্রাণ লইবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। বিপ্লবপন্থীদের চণ্ডীমণ্ডপে এলা মোহাবেশের দেবী-প্রতিমা—তাহার হাতের রক্তচন্দনের ফোঁটা তাহাদের সমস্ত দেহ-মনকে রাঙ্গাইয়া মৃত্যুবিভীষিকার উপর প্রেমের দীপ্ত অরুণিমা ফলাইয়া তোলে; তাহারা মরণের ভ্রূকুটিকে প্রেমের ইঙ্গিত মনে করিয়া সর্বনাশের পথে ছুটিয়া চলে। যেখানে প্রেমের সহিত দেশহিতব্রতের সংঘর্ষ অনিবার্য, সেখানে তরুণ-তরুণীর সহযোগিতা কেন নিষিদ্ধ নহে, ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার অগ্নিপ্রলয়ের জন্য এমন লোক চাই যাহার ভিতরে আগুন আছে, অথচ নিজে সে আগুনে ভস্ম না হয় এমন আত্ম-সংযম ও দৃঢ়-সংকল্প আছে। মোট কথা, এই সমস্ত সূক্ষ্ম বিধি-নিষেধ ও সীমা-নির্দেশের বেড়াজালে যে আবেষ্টনটি রচিত হইয়াছে তাহাকে বুদ্ধি দিয়া অনুভব করা হয়ত যাইতে পারে, কিন্তু উপন্যাসের বাস্তব পটভূমি-হিসাবে গ্রহণ করা মোটেই সহজ নহে।

কিন্তু অতীনের সর্বাপেক্ষা গভীর বেদনা-বোধ তাহার ব্যর্থ-প্রেমবিষয়ক। তাহার বিপ্লব-বাদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ার প্রধান প্রেরণা আসিয়াছে প্রেমের দিক্ হইতে। মতানুবর্তিতা প্রেমের আনুগত্য প্রকাশের একটা খুব সাধারণ উপায়—এলার সহিত সহজ পথে মিলনে অলঙ্ঘনীয় বাধা আছে বলিয়াই, অতীন এলার নির্দিষ্ট কর্মধারায় প্রেমের সার্থকতার একটা জটিল, কৃত্রিম পথ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। এই গোপন সুরঙ্গপথে চলিতে গিয়া তাহার মনে

যে অনপনেয় কলঙ্কস্পর্শ হইয়াছে তাহাই তাহার প্রেমের যাত্রা-পথে একটা দুরতিক্রম্য অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। তাহার এই প্রতিহত প্রেমের ক্ষুব্ধ অভিযোগের মধ্যে একটা অসংবরণীয় আবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে। এলার সহিত প্রথম সাক্ষাতের দিনের যে ছবিটি তাহার মনে অবিস্মরণীয় উজ্জ্বল বর্ণে মুদ্রিত আছে তাহাই একদিকে তাহার ব্যর্থতার ব্যথাকে উদ্বেলিত করিতেছে ও অপরদিকে দেশপ্রীতির মধ্যে যে অন্তঃসারশূন্য ভাববিলাস আছে তাহার প্রতি তাহার দৃষ্টিকে অসামান্যরূপ তীক্ষ্ণ ও প্রতিবাদকে জ্বালাময় করিয়া তুলিতেছে। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি উপন্যাসেই দেখা যায় যে, তিনি বারবার দেশপ্রীতির সহিত তুলনায় প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। গোরা ও বিমলা উভয়েরই জীবনের অভিজ্ঞতা তাহাদিগকে প্রেমের স্নিগ্ধ, অনাবিল সম্পূর্ণতার দিকে প্রত্যাবর্তন করাইয়াছে, প্রেমকে অস্বীকার করিয়া দেশসেবার ভার-গ্রহণ যে একটা খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ আত্মবিকাশ এই সত্য তাহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। অতীন ও এলার প্রতিজ্ঞা-প্রত্যাহার সেই বহু-প্রতিপন্ন সত্যের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

অবশ্য এই তুলনা-মূলক বিচারে প্রেমের প্রতি পক্ষপাত-প্রদর্শনে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত হেতু আছে। পরাধীন দেশে দেশপ্রীতির পথ যে কণ্টকাকীর্ণ তাহাই শুধু নয়—ইহা সুস্থ ও সম্পূর্ণ আত্মবিকাশেরও পরিপন্থী। যে মনোভাবে ইহার জন্ম তাহার মধ্যে দ্বেষ, হিংসা ও বিরাগের প্রচুর উপাদান বর্তমান। ইহার মধ্যে কঠোর আত্মদমন, কৃচ্ছ্রসাধনের নির্দয় আত্মপীড়ন আছে—প্রেমের অপার আনন্দ ও স্বতোবিকশিত মাধুর্যের অবসর নাই। সুতরাং লেখক যে পরিমাণে কবি, যে পরিমাণে পরিপূর্ণ বিকাশের পক্ষপাতী, সেই পরিমাণে দেশানুরাগের নীরস, কঠোর সাধনা ও সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে আত্ম-সংকোচনের প্রতি সহানুভূতিহীন। বাস্তবিক দেশপ্রীতির প্রসন্ন, স্নিগ্ধহাস্যোজ্জ্বল মুখকান্তির সহিত আমাদের পরিচয় নাই—যে মুখ আমাদের চোখে পড়ে তাহা ভ্রূকুটি-কুটিল, হিংস্র-ভাবাপন্ন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় কুঞ্চিতাধর। সুতরাং তাহা প্রেমের সহিত প্রতিযোগিতার স্পর্ধা করিতে পারিবে কেন?

এইবার উপন্যাসটির কেন্দ্রগত দুর্বলতার বিষয়ে আলোচনা করা যাইতে পারে। উপন্যাসের আসল নায়ক-নায়িকা অতীন বা এলা নহে, বিপ্লববাদের যে প্রতিবেশ উপন্যাসের সমস্ত পাত্র-পাত্রীর মনোভাবকে বিশেষ আকার ও গতিবেগ দিয়াছে তাহাই প্রকৃতপক্ষে উক্ত সম্মানের দাবী করিতে পারে। অতীন ও এলা এই প্রতিবেশের দুরন্ত-বেগোৎক্ষিপ্ত দুইটি ধূলিকণা মাত্র। তাহাদের মনোভাবের যে কিছু বৈশিষ্ট্য, তাহাদের আবেগের যে কিছু তীব্রতা, সমস্তই প্রতিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফল। সুতরাং প্রতিবেশ-প্রভাব ভাল করিয়া বিশ্লেষণ না করিলে নায়ক-নায়িকার মনোরহস্য আমাদের কাছে অর্ধস্ফুট থাকিয়া যাইবে। লেখক আভাসে-ইঙ্গিতে প্রতিবেশের যে ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া ফুটাইয়াছেন তাহা মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের সহায়তাকল্পে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। লিখিত ক্ষুদ্র চারি অধ্যায়ের পিছনে যে বহুসংখ্যক অলিখিত অধ্যায় আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহাদের অভাবে উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাস যেন খণ্ডিত ও ভারকেন্দ্র-চ্যুত বলিয়া মনে হয়। গোরার দেশপ্রীতির উৎকট সর্বব্যাপিতা অনুভব না করিলে সুচরিতার প্রেমের নিকট তাহার আত্মসমর্পণের সম্পূর্ণ সার্থকতা উপলব্ধি করা যায় না। এখানেও তেমনি অতীনের আত্মঘাতী বিদ্রোহ ও এলার ব্যাকুল অনুশোচনা বুঝিতে, হইলে যে শক্তি

তাহাদিগকে নিজ দুশ্ছেদ্য নাগপাশে বাঁধিয়াছিল তাহার আনুমানিক নহে, প্রত্যক্ষ পরিচয় চাই। এই পরিচয়ের অভাবই উপন্যাসের প্রধান ত্রুটি।

তারপর আর একদিক্ দিয়াও এ প্রেম-চিত্রটি সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই—তাহা হইতেছে নায়িকার চরিত্র। এলার চরিত্রে রক্তমাংসের বাহুল্য নাই—তাহার চরিত্র সম্পূর্ণ অভাবাত্মক (negative)। সে অতীনের তীক্ষ্ণ আক্রমণ প্রায় বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তাহার ক্ষীণ প্রতিবাদ-চেষ্টা ওষ্ঠে আসিয়াই বিলীন হইয়াছে। অতীন ও এলার মধ্যে প্রেমের চিত্রটি যে নিবিড় বর্ণে ফুটে নাই, তাহার কারণ হইতেছে এলার এই অসহায় নিষ্ক্রিয়তা। যে স্বদেশপ্রীতির নেশা তাহাকে প্রেমের দিকে অচেতন করিয়াছিল তাহার প্রভাবের গভীরতা সম্বন্ধে আমরা কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করি না। যে প্রতিবেশ তাহার প্রেমকে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে তাহা এতই অস্পষ্ট ও অশরীরী যে, প্রেমের গতি-নিয়ন্ত্রণের পর্যাপ্ত কারণ তাহা হইতে মেলে না। অতীনের ক্ষুব্ধ অভিযোগের মধ্যে বিপ্লববাদের মাদকতার এক আধটু ইঙ্গিত-আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু সম্পূর্ণতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার দিক্ হইতে 'ঘরে-বাইরে'-এর চিত্রের সহিত ইহা মোটেই তুলনীয় নহে। এলার পূর্বজীবনের ইতিহাস তাহার পথ-নির্বাচনের উপর কোন আলোকপাত করে না—খেয়ালী ও পরমত-অসহিষ্ণু মা বা সহানুভূতিহীন খুড়ীমা বৈপ্লবিক পথে পদার্পণের যথেষ্ট কারণ যোগায় না। ইন্দ্রনাথের সহিত তাহার সহযোগিতার কাহিনী আরও অসংলগ্ন ও গ্রন্থিশূন্য—ইন্দ্রনাথের যে শক্তি অতীনের মত ব্যাকুল, সর্বত্যাগী প্রণয়কে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল, উপন্যাস-মধ্যে তাহার কোনই পরিচয় পাই না। ইন্দ্রনাথকে কোন মতেই অতীনের যোগ্য প্রতিযোদ্ধা বলিয়া মনে হয় না। যে আন্দোলনে ইন্দ্রনাথ নায়ক এবং বটু ও কানাই প্রধান কর্মী, তাহার জালে জড়াইয়া পড়ার প্রবণতা এলার চরিত্রে ছিল কি না তাহার ইতিহাস অলিখিত। বিমলার মোহ আমরা বুঝিতে পারি, এবং তাহার তীব্র আকর্ষণ লেখক উজ্জ্বলবর্ণে ফুটাইয়াছেন, কিন্তু এলার মোহ বুঝি না, ইহাকে মানিয়া লইতে হয়।

ইন্দ্রনাথ লোকটি যেমন ব্যবহারে দুর্বোধ্য, সেইরূপ পাঠকের পক্ষেও দুরধিগম্য—তীক্ষ্ণ মনীষা সম্পন্ন তার্কিকতার অন্তরালে তাঁহার ব্যক্তিত্ব-রহস্যটি চাপা পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার দলপতিত্ব তাঁহার ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; তিনি অপরকে নিয়ন্ত্রণ করিতে এতই ব্যস্ত যে, নিজের জীবনের মূলনীতি-সম্বন্ধে কোনরূপ ধরা-ছোঁয়া দেন নাই। ইন্দ্রনাথের চরিত্রটি উপন্যাসের পটভূমি-হিসাবেও ভাল ফুটিয়া উঠে নাই—অতীন-এলার প্রেমের পরিপন্থি-রূপেও তাঁহার ভূমিকা মোটেই স্পষ্ট নহে।

মানুষ-হিসাবে বটু ও কানাই বরং ইন্দ্রনাথ অপেক্ষা সুস্পষ্ট হইয়াছে। বটুর ঈর্ষা-কষায়িত স্থূল লালসা ও কানাই-এর অনাবৃত সুবিধা-বাদ ও সহানুভূতি-স্নিগ্ধ cynicism তাহাদিগকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে আনিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদিগকে আমরা চিনিতে ও বুঝিতে পারি, কিন্তু ইন্দ্রনাথের উচ্চ ভাবধারা ও নীচ কার্যপ্রণালীর মধ্যে কোন সামঞ্জস্য আমরা খুঁজিয়া পাই না।

উপন্যাসটির সম্বন্ধে একটি যে প্রধান অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহা বিপ্লববাদের চিত্রের ঐতিহাসিকতা ও সত্যানুবর্তিতা-বিষয়ক। অনেকেই অভিযোগ করিয়াছেন যে, লেখক বিপ্লব-বাদের যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা কাল্পনিক; বাস্তবানুগামী নহে। ইহার কৈফিয়ত হিসাবে লেখক 'প্রবাসী'তে যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার আত্মপক্ষসমর্থন ইহাই

যে, লেখক ইতিহাস অনুসরণ করিতে বাধ্য নহেন—যে প্রতিবেশ তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিক না হইলেও উপন্যাস-বর্ণিত প্রেমের বৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট কারণ কি না ইহাই সমালোচকের প্রধান বিচার্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথের এই যুক্তি মূলতঃ সত্য হইলেও বর্তমান ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য নহে। বিপ্লববাদের চিত্র সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও ক্ষতি নাই; কিন্তু যেখানে প্রেমের সহিত ইহার প্রতিযোগিতা, সেখানে অন্ততঃ ইহার চিত্রটি এমনই চিত্তাকর্ষক, এমনই উচ্চ-আদর্শ-অনুপ্রাণিত হওয়া চাই, যাহাতে অতীন ও এলার অনিশ্চয়তা ও দ্বিধাভাব স্বাভাবিকতার দাবী করিতে পারে। বর্তমান উপন্যাসে বিপ্লববাদের এমন একটা বীভৎস, কলঙ্ক-কালিমা-লিপ্ত চিত্র দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে প্রেমের সহিত ইহার প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা কল্পনা করা একবারেই অসম্ভব। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহিত ইন্দ্রনাথের কোন বাস্তবিক সাদৃশ্য আছে কি না তাহাতে সমালোচকের কিছু যায় আসে না, ব্রহ্মবান্ধবের অনুরাগী ভক্তেরা এই সাদৃশ্যের ইঙ্গিতে ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন, কিন্তু আর্টের দিক্ হইতে এই আলোচনার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। কিন্তু সমালোচকের প্রকৃত অভিযোগ এই যে, বিপ্লববাদের সাধারণ চিত্রটি উপন্যাস-বর্ণিত প্রেমের রূপ-নির্ধারণের যথেষ্ট কারণ নহে। রবীন্দ্রনাথের কৈফিয়তে এই অভি-যোগের কোন সদুত্তর মিলে না। এমন কি বিপ্লববাদীদের সাধারণ জীবন-যাত্রার যবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন বিপদের যে অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাও মনের মধ্যে যথেষ্ট শঙ্কিত উদ্বেগ জাগায় না। মাঝে মাঝে হুইস্‌লের শব্দ পাই বটে, কিন্তু ইহা রঙ্গালয়ের মেকি হুইস্‌ল, ইহা আসন্ন বিপদের তীক্ষ্ণ সূচনা, রহস্যপূর্ণ অগ্রদূত-হিসাবে মনকে স্পর্শ করে না। এলার জীবনে এমন কি শঙ্কাময় সম্ভাবনা আসন্ন যাহাতে ক্লোরোফর্মের সাহায্যে তাহাকে চেতনার দ্বার রুদ্ধ করিতে হইবে, সেই ভয়াবহ পরিণতির সুরটি উপন্যাস-মধ্যে বাজিয়া উঠে না। যে প্রতি-বেশের মধ্যে সে এতদিন নিঃশব্দ আত্মপ্রসাদের সহিত বিচরণ করিতেছিল তাহা কেন হঠাৎ এরূপ অসহনীয় ও শ্বাসরোধকারী হইয়া উঠিল তাহার পূর্বসূচনা উপন্যাসের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য। বটুর ক্লেদাক্ত স্পর্শ, ইন্দ্রনাথের অনিশ্চিত শাসন ও পুলিশের নিগ্রহ—এ সমস্ত বিপদইত তাহার পরিচিত। যাহাকে নূতন আবির্ভাব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে তাহা অতীনের বিপদ্; কিন্তু এই বিপদের আশঙ্কাতেই যে এলা কেন আত্মহত্যার জন্য উন্মুখ হইয়াছে তাহা সুস্পষ্ট নহে। মোট কথা, প্রতিবেশের চারিদিকের বেষ্টনী-রেখাটি ছেদহীন ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই—সমগ্র অবস্থাটি আমাদের মানস-নেত্রে অবিচ্ছিন্ন ঐক্যে প্রতিভাত হয় না।

হয়ত এরূপ বিস্তৃত সমালোচনা লেখকের স্বচ্ছন্দ-বিকশিত, অনায়াসস্ফূর্ত, বিরল-রেখার স্বল্পাভাসে গঠিত-দেহ ক্ষুদ্র চিত্রের পক্ষে ঠিক উপযুক্ত নহে। বিপ্লবপন্থার মোটামুটি চিত্রটি হয়ত তিনি আমাদের কল্পনা-সাহায্যে পুনর্গঠিত করিয়া লইতে বলিয়াছেন—পূর্ণকায় চিত্র দেওয়া হয়ত তাঁহার উদ্দেশ্য-বহির্ভূত। এই বর্ণ-বিরল বেষ্টনী-রেখার মধ্যে একটিমাত্র অংশে তিনি তাঁহার চিত্রতুলিকার সমস্ত উজ্জ্বল বর্ণ ঢালিয়া দিয়াছেন—তাহা অতীনের তীব্র, আত্মগ্লানিময় প্রণয়াবেগ। উপন্যাসের অন্যান্য অংশ অস্পষ্ট, ভাসা-ভাসা ধরনের, তাহাতে তর্ক আছে, epigram আছে, বিশ্লেষণ আছে, কিন্তু উপন্যাসের যে আসল প্রাণস্পন্দন সেই রসপূর্ণ অনুভূতি নাই। এমন কি এলার সাড়ার (response) মধ্যেও প্রাণবেগ নাই—ইহার নিজের কোন চাঞ্চল্য, কোন তরঙ্গভঙ্গ নাই, ইহা কেবল নিশ্চল তটভূমির ন্যায় অতীনের অপ্রতিরোধনীয় প্রণয়ধারাকে

আশ্রয় দিয়াছে মাত্র। ঔপন্যাসিক হিসাবে লেখককে কেবল এই একটিমাত্র (episode) খণ্ডাংশ দিয়া বিচার করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের প্রেম-চিত্রগুলি প্রায় সমস্তই উচ্চাঙ্গের; তাঁহার কবি-কল্পনার সহজ অনুভূতির বলেই তিনি প্রেমের নিগূঢ় মর্ম-স্পন্দন, ও ইহার অতীন্দ্রিয় আভাস ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। অতীনের প্রেম-নিবেদনের মধ্যেও প্রেমের এই স্বরূপ অভিব্যক্তির পরিচয় মেলে, ইহার নিজস্ব রাগিণীটি ধ্বনিত হয়। গ্রন্থমধ্যে বৈপ্লবিক প্রতিবেশ যদি আর কিছু নাও করিয়া থাকে, তথাপি ইহা অতীনের প্রেমের প্রকৃতি ও প্রকাশভঙ্গী নির্ধারণ করিয়াছে—প্রেমের স্রোতস্বতী বিপ্লববাদের চড়ায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়া এক ক্ষুব্ধ, আত্মগ্লানিময়, অথচ করুণ বিষণ্ণ সুরে বহিয়া চলিয়াছে। দৈবাহত প্রেমের ক্ষুব্ধ অভিযোগ ও বেদনাময় পূর্বস্মৃতি আশ্চর্য সুসংগতির সহিত অভিব্যক্তিলাভ করিয়াছে। ইহার দীপ্ত, জ্বালাময় বিকাশের সহিত তুলনায় গ্রন্থের অন্যান্য চিত্র—বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র, ইন্দ্রনাথের উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্ব, বটুর নীচ ঈর্ষা ও কানাই-এর গ্লানিকর সহানুভূতি, এলার নিষ্ক্রিয় প্রতি-নিবেদন—এই সমস্তই ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়াছে। চারিদিকের পিঙ্গল ভস্মাবরণমধ্যে একখণ্ড কাষ্ঠ যেমন অকস্মাৎ অগ্নিদীপ্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ উপন্যাসটির ধূসর ও অস্পষ্ট বেষ্টনী-রেখার মধ্যে একমাত্র অতীনের প্রেমই উজ্জ্বল ও প্রাণ-ধর্মী হইয়াছে—উপন্যাসের রত্ন-ভাণ্ডারে 'চার-অধ্যায়'-এর ইহাই মাত্র বিশিষ্ট দান।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্রকায় উপন্যাসগুলির মধ্যে 'মালঞ্চ' (১৯৩৪) একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। উপন্যাসটির ক্ষুদ্রাবয়বের সহিত সংগতি রাখিয়াই ইহাতে যে সমস্যাটি আলোচিত হইয়াছে তাহাও ক্ষুদ্র। মৃত্যুশয্যাশায়িনী নীরজার ঈর্ষা-বিকার, প্রতিদ্বন্দ্বিনীর বিরুদ্ধে স্বামিপ্রেম ও ফুলবাগানের উপর তাহার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচণ্ড চেষ্টাই উপন্যাসের বিষয়। নীরজার দশবৎসরের সার্থক প্রেম রোগজীর্ণ মনের ছোঁয়াচে হঠাৎ নীচ, সন্দেহাত্মক ঈর্ষায় রূপান্তরিত হইয়াছে। তাহার স্বামী আদিত্য এই ঈর্ষার অতর্কিত ধাক্কায় আবিষ্কার করিয়াছে যে, সে তাহার বাল্য-সঙ্গিনী ও কর্ম-সহযোগিনী সরলাকে ভালবাসে এবং এই ভালবাসা তাহার স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যকে ছাপাইয়া দুর্বার হইয়া উঠিয়াছে। সরলা নীরব কর্মনিষ্ঠা ও অক্ষুণ্ণ আত্মসংযমের অন্তরালে বহুদিন যাবৎ আদিত্যের প্রতি ভালবাসা অজ্ঞাতসারে পোষণ করিয়া আসিতেছে; তাহার বিবাহে অসম্মতিই এই ভালবাসার অস্বীকৃত লক্ষণ; নীরজার ঈর্ষাই তাহাকে এই অস্বীকৃত প্রেম-সম্বন্ধে প্রথম সচেতন করিয়াছে। সরলার আত্মসংযম কিন্তু বৈরাগ্য-প্রিয়তার চরম রিক্ততায় পৌঁছায় নাই; যখন সে বুঝিয়াছে যে, এ প্রেম উভয়ের জীবনের সার্থকতার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়, তখন সে ইহাকে প্রত্যাখ্যান করে নাই। তাহার কারাবরণ আত্মবলিদান বা সুলভ ভাবোচ্ছ্বাস নহে; ইহা একদিকে আত্মপরীক্ষার অবসর-সৃষ্টি, অন্যদিকে আদিত্যকে মরণোন্মুখ পত্নীর প্রতি অবিকৃত চিত্তে শেষ কর্তব্য পালন করিবার জন্য সুযোগপ্রদান। উপন্যাসের মধ্যে রমেন হইল সকলের friend, philosopher ও guide—সে এই ক্ষুদ্র সংঘাতে আলোড়িত জীবন-নাট্যের সহানুভূতিপূর্ণ দর্শক। তাহার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিবলে সে এই সংঘাতের পরস্পর-বিরোধী শক্তিগুলি-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিয়া লইয়াছে—প্রত্যেকের নিগূঢ় উদ্দেশ্য ও ক্রিয়া-প্রণালী সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়াছে ও বুঝিয়াছে। নীরজার ব্যর্থ, অভিমান-ক্ষুব্ধ প্রেমই যে তাহার সমস্ত অসহিষ্ণুতা, নির্মম আঘাত ও অনুদার কার্পণ্যের কারণ

সেই গোপন রহস্য তাহার নিকট জলবৎ স্বচ্ছ। সরলার প্রতি তাহার সংকুচিত প্রেম-নিবেদনে কোথাও যে একটা অজ্ঞাত অথচ দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আছে তাহা সে সহজসংস্কার-বলেই বুঝিয়াছে, সেইজন্যই তাহার প্রেম কখনও অশান্ত, উদ্‌বেল হইয়া উঠে নাই। কেবল আদিত্য সম্বন্ধে তাহার গভীর সূক্ষ্মদৃষ্টির সেরূপ কোন অবিসংবাদিত প্রমাণ আমরা পাই না—কেননা এই রহস্য সে পূর্ব হইতে জানিলে সরলার প্রতি তাহার অনুরাগকে ফুটিতে দিত না। এই চারিজনে মিলিয়া উপন্যাসটির ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চ ভরিয়া তুলিয়াছে।

এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা হইতে ধারণা হইবে যে, উপন্যাসটি অন্যান্য উপন্যাসের ন্যায়, একটি সাধারণ প্রেমের বিরোধ-কাহিনী; কিন্তু ইহার আসল বিশেষত্বের ইঙ্গিত ইহার নামকরণের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। মালঞ্চই ইহার প্রচ্ছদপট রচনা করিয়াছে; সমস্ত উপন্যাসটির আকাশ-বাতাস পুষ্পোদ্যানের গন্ধে সুরভিত হইয়াছে। আদিত্য ও নীরজার প্রেমের অনুপম সুষমার রহস্য এইখানেই যে, এই প্রেম পুষ্প-সাহচর্যে ঠিক ফুলের মতই বর্ণে গন্ধে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার গতি-বিধি, ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি সমস্তই ফুলের বক্ষঃ-স্পন্দনের সহিত সমতালে নিয়মিত হইয়াছে। পুষ্পের মদির আবেশে ইহার নিবিড়তা ঘনীভূত হইয়াছে; ইহার ক্ষণস্থায়ী জীবনের অবসাদ ও অবসরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরাগ-সৌরভ সঞ্চারিত হইয়া ইহার নবীন মাধুর্য ও সরসতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। নীরজার প্রেমের সহিত তাহার স্বহস্তরচিত পুষ্পোদ্যানটির এক আশ্চর্য একাত্মতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুষ্পোদ্যানটি যেন এই প্রেমের একটি জীবন্ত নিদর্শন ও প্রতীক। সেইজন্য নীরজার ঈর্ষ্যা প্রধানতঃ এই ফুলবাগানের উপর স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পথ ধরিয়াই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। সে বুঝিয়াছে যে, বাগানের ফুল ও তাহার স্বামীর হৃদয়ে প্রেম ঠিক একই নিয়মে বিকশিত হয়; এক বিষয়ের অধিকার-লোপ অপর বিষয়ে অধিকার-লোপের অভ্রান্ত পূর্ব-সূচনা। ফুলবাগানই তাহার প্রেম-বিষয়ক প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুদ্ধক্ষেত্র, এইখানেই তাহার প্রেমিক জীবনের জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত নির্ণয় হইবে। তাই সে এত ব্যাকুল, সর্বগ্রাসী আগ্রহের সহিত বাগানটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে; তাই সে সরলাকে স্বামীর হৃদয় হইতে পারুক বা না পারুক বাগান হইতে নির্বাসন করিবার জন্য এত প্রবল জেদ দেখাইয়াছে। আবার তাহার ঈর্ষ্যাক্ষত হৃদয়ের সহিত কীটদষ্ট ফুলের যে তুলনা ব্যঞ্জিত হয়, তাহা কেবল কাব্যালংকারের দিক্ দিয়া নহে। তাহার মনোবিকারের মধ্য দিয়া যাহা অনতিকাল পূর্বে ফুলের মত সুকুমার ও মনোজ্ঞ ছিল তাহারই বিকৃতি অনুভব করা যায়। শেলির The Sensitive Plant নামক বিখ্যাত কবিতাটি মানুষের সহিত ফুলের সাদৃশ্য-ব্যঞ্জনায় আশ্চর্যরকম ভরপুর; উদ্যানের অধিষ্ঠাত্রী মহিলাটির জীবন ফুলের মতই কোমল, ফুলের মতই ক্ষণস্থায়ী ও সূক্ষ্মানুভূতিময়; ফুলগুলিও রমণীর মত ব্রীড়াসংকুচিত ও স্পর্শাসহিষ্ণু। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে অনেকটা সেইরূপ ভাব-সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। এই সাদৃশ্যই উপন্যাসটিকে সাধারণ ঈর্ষ্যা-বিরোধের কাহিনী হইতে উচ্চতর কবিত্বের স্তরে উন্নীত করিয়াছে।

নীরজার শেষদৃশ্যের কার্য-কলাপ কিন্তু এই ভাবগত সুসংগতির বিরোধিতা করে। হয়ত মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দিক্ দিয়া তাহার শেষ মুহূর্তের তীব্র বিরাগ মানব-মনের যথাযথ চিত্র হইতে পারে। নিঃস্বত্ব হইয়া অন্যের হাতে স্বামি-সমর্পণের জন্য মনকে ত্যাগের উচ্চসুরে বাঁধা বাস্তব জীবনে খুব বেশি সম্ভবপর হয় না—বৈরাগ্যের প্রলেপ ভেদ করিয়া আদিম মনের তীব্র আসক্তি

ও ভোগ-লিপ্সা ফুটিয়া বাহির হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে নীরজার ব্যবহার খুবই সংগত ও স্বাভাবিক। কিন্তু উপন্যাসটির উৎকর্ষের প্রধান কারণ ইহার মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ নহে, ইহার ভাবগত সুষমা ও সামঞ্জস্য; এবং নীরজার অন্তিম মুহূর্তের ব্যবহারে এই ঐক্যের হানি হইয়াছে। উপন্যাসটির পটভূমি পুষ্পোদ্যান হইতে রুক্ষ-কর্কশ, পুষ্প-সৌরভহীন বাস্তব-জগতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। 'পারিব না, পারিব না, পারিব না'—নীরজার এই শেষ-উচ্চারিত বাক্যে ঈর্ষ্যার যে তীব্র, ঝাঁজালো সুর ফুটিয়াছে, তাহাতে ভাব-সংগতি ও বর্ণ-সুষমার মায়াজাল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে—মানবপ্রকৃতির এক অদম্য উচ্ছ্বাসের দমকা হাওয়া তাহাকে ইভের ন্যায় স্বর্গচ্যুত করিয়া পুষ্পোদ্যানের ক্ষীণ সুরভিটিকে নিঃশেষে উড়াইয়াছে। কলা-কৌশলের দিক্ দিয়া এই পরিচ্ছেদটিকে একটা ত্রুটি বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

ত্রুটি-সম্পর্কে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র উপন্যাসে সুরগত ঐক্যের এত বেশি প্রয়োজনীয়তা যে, অনাবশ্যক অংশ নির্মমভাবে বর্জন করিতে হইবে। বাস্তবতার প্রয়োজনেও তাহাদের স্থান দেওয়া উচিত হইবে না। এই বিচার-নীতি-অনুসারে হলধর মালী ও রোশনী আয়ার প্রবর্তনের যৌক্তিকতা বিচার-সাপেক্ষ। রোশনীর একটা বিশেষ কর্তব্য আছে—সে নীরজার স্বগতোক্তির বাহন; নীরজার মান-অভিমান, ঈর্ষ্যা-জ্বালা সমস্তই তাহাকে আশ্রয় করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, সুতরাং নীরজার চরিত্র-বিকাশের সহায়-হিসাবে তাহার একটা সার্থকতা আছে। তবে তাহার বাঙ্গালাভাষায় এতটা অধিকার জন্মিয়াছে যে, তাহার হিন্দুস্থানীত্বের শেষনিদর্শন-স্বরূপ 'খোখী' উচ্চারণটি অনেকটা anachronism বা কাল-বৈষম্যের লক্ষণের মতই ঠেকে। হলধরের উপন্যাস-মধ্যে সেরূপ কোন অপরিহার্য কর্তব্য নাই—সে কেবল নীরজার ঈর্ষ্যা-জর্জর মনের একটা দিকের উপর আলোকপাত করিয়াছে। সরলার বিরুদ্ধে তাহার ঈর্ষ্যা, এতই অশোভন-রূপে তীব্র হইয়াছে যে, বাগানের মালীদিগের মধ্যেও সে অবাধ্যতার প্রশ্রয় দিয়া সরলার কর্তব্যপালন কঠোরতর করিয়া তুলিয়াছে। হলার এইটুকু পরিচয় যথেষ্ট হইত; কিন্তু ইহার বেশি পরিচয় দিতে গিয়া তাহার যেটুকু স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ফুটিয়াছে, তাহাতে উপন্যাসের ভাব-সামঞ্জস্য বা সূক্ষ্ম সুরগত ঐক্যের হানি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যে ক্ষুদ্র উপন্যাসে স্থান-সংকীর্ণতা এত অধিক যে, রমেন, সরলা ও আদিত্যের মত প্রধান চরিত্রগুলিরও কেবল পার্শ্ব-ছবিতেই (profile) আমাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হয়, সেখানে হলার প্রতি মনোযোগের আধিক্য অনেকটা অপব্যয় বলিয়াই ঠেকে। আসল কথা, সময়বিশেষে বাস্তব-প্রিয়তাও একটা প্রলোভনের ফাঁদ হইয়া দাঁড়ায়, এবং এই প্রলোভন অতিক্রম করিতে খুব সূক্ষ্ম কলা-কৌশল ও সামঞ্জস্য বোধের প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথের মত শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও কলাবিদ্‌ও সম্পূর্ণরূপে এই বিপদ্ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। এই সমস্ত সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি বাদ দিলে 'মালঞ্চ' রবীন্দ্রনাথের শেষবয়সের ক্ষুদ্র উপন্যাসগুলির মধ্যে বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দাবী করিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উপন্যাসাবলী সমগ্রভাবে আলোচনা করিলে উপন্যাস-জগতে তাঁহার স্থান-সম্বন্ধে আমরা একটা ব্যাপক ধারণা করিতে পারি। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাঙ্গালা উপন্যাসের অগ্রগতি যখন রুদ্ধপ্রায় হইয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথই তাহার জন্য নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা যাহা স্পর্শ করিয়াছে তাহাই

দ্যুতিমান্ হইয়া উঠিয়াছে এবং উপন্যাসের উপর তাঁহার প্রভাবের যে ছাপ পড়িয়াছে তাহা মুছিবার নহে। আধুনিক বঙ্গ উপন্যাস তাঁহার প্রদর্শিত পথেই চলিয়াছে। কিন্তু তথাপি যেন মনে হয় উপন্যাস তাঁহার বিধি-নিয়োজিত কর্মক্ষেত্র নহে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ কবি-প্রতিভাই তাঁহাকে এই বিদেশ-পর্যটনে অবাধ ছাড়পত্র দিয়াছে। তাঁহার উপন্যাসাবলী জীবনের জনতাকীর্ণ, গ্রন্থিবহুল কেন্দ্রভাগের ভিতর দিয়া নিজেদের পথ করিয়া লয় নাই; তাহারা অধিকার করিয়াছে মানবজীবনের অপেক্ষাকৃত নির্জন সীমান্ত-প্রদেশ। আমাদের জন-বহুল পল্লীগ্রাম, দ্বন্দ্ববহুল সংসার ও পরিবার, দারিদ্র্য ও ঈর্ষ্যাবিদ্বেষের খরতাপক্লিষ্ট জীবন-যাত্রা—ইহাদের অন্তর্নিহিত প্রখর বাস্তবতা হইতে তাঁহার সৌন্দর্য-প্রিয় কবি-প্রকৃতি সংকুচিত হইয়াছে। শিলং-এর বর্ষাধৌত পার্বত্য প্রকৃতি, ইহার প্রেমের দীপ্ত অরুণিমার বহিঃপ্রকাশ-স্বরূপ সূর্যাস্তরাগ, কলিকাতার নক্ষত্রদীপ্ত, শান্তিস্নিগ্ধ নীরব অন্ধকার, নদীতীরের শ্যামল তরু-শ্রেণীর অন্তরালমুক্ত সূর্যোদয়—ইহারাই তাঁহার উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের কর্মক্ষেত্রের প্রতিবেশ রচনা করিয়াছে। অসাধারণত্বের প্রতি কবি-প্রতিভার যে স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, তাহা তাঁহার উপন্যাসকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছে। বিষয়-নির্বাচন, চরিত্র-পরিকল্পনা, অন্তর্নিহিত সমস্যার বিশেষত্ব—সর্বত্রই এই অসাধারণত্বের ছাপ আছে। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে ঠিক আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের সাধারণ জীবনের সমসুখদুঃখভাগী বলিয়া মনে করা যায় না—'চোখের বালি'র পর হইতেই তিনি এই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছেন—'চোখের বালি'ই তাঁহার শেষ সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস। গোরা, আনন্দময়ী, নিখিলেশ, সন্দীপ, অমিত, লাবণ্য, কুমুদিনী—ইহাদিগকে হঠাৎ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বহুপদ-চিহ্নাঙ্কিত রাস্তাঘাটে দেখিবার উপায় নাই। ইহাদের সমস্যা, ইহাদের জীবন-যাত্রা, ইহাদের আদর্শ—সমস্তের মধ্যেই একটা অসাধারণত্বের স্পর্শ আছে। ইহারা বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করে, অনেকে বাঙ্গালী পোশাক-পরিচ্ছদও পরিধান করে, বঙ্গসমাজ ও পরিবারের সঙ্গে ইহাদের একটা শিথিল সম্বন্ধ আছে, বাঙ্গালী জীবনের মধুর রসধারা ইহারা আকণ্ঠ পান করিয়াছে—কিন্তু ইহাদের নিগূঢ় ব্যক্তিত্বের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রকৃতপক্ষে সমাজ-ও-পরিবার-নিরপেক্ষ। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে ইহাদের তুলনা করিলেই ইহাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য সহজেই বুঝা যাইবে। তাই রবীন্দ্রনাথের গভীর প্রভাব সত্ত্বেও তাঁহার উপন্যাস-ক্ষেত্রে প্রকৃত শিষ্য কেহ নাই—তিনি কোন নূতন বংশের প্রতিষ্ঠাতা হন নাই। তাঁহার প্রণালীর গূঢ়তত্ত্ব অননুকরণীয়। তাই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসাবলী বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য স্থায়ী সম্পদ্ হইলেও উপন্যাসের অগ্রগতির প্রধান ধারার সহিত ইহারা যোগরহিত। ঔপন্যাসিক উপাদানের সহিত অসাধারণ কবি-প্রতিভার পুনরায় সমন্বয় না হইলে ভবিষ্যৎ যুগে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত অনুবর্তী মিলিবে না।

(৯)

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প

ছোট গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা কেবল আকারগত নহে, অনেকটা প্রকৃতিগত। ছোট গল্পের আয়তন ক্ষুদ্র, সেইজন্য ইহার আর্টও স্বতন্ত্র। উপন্যাসের ব্যাপকতা ও বৃহৎ পরিধি নাই বলিয়াই ইহার বিষয়-নির্বাচনে একটু বিশেষ নৈপুণ্যের প্রয়োজন। ইহাতে

জীবনের এমন একটি খণ্ডাংশ বাছিয়া লইতে হইবে, যাহা ইহার স্বল্প-পরিসরের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করিবে। ইহার আরম্ভ ও উপসংহার উভয়ের মধ্যেই বিশেষ রকম নাটকোচিত গুণের সন্নিবেশ থাকা চাই। উপন্যাসের মত ধীর-মন্থর গতিতে ইহার আরম্ভ হইবার অবসর নাই, পাত্রপাত্রীর দীর্ঘ পরিচয় বা বিশ্লেষণের জন্য ইহাতে স্থানাভাব। গল্পের পরিণতি বা চরিত্র-বিকাশের জন্য যে স্বল্পসংখ্যক ঘটনা ইহার পক্ষে প্রয়োজনীয়, সেগুলিকে সুনির্বাচিত হইতে হইবে। কোনরূপ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা ইহার পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ। গল্পের যে অংশে ইহার যবনিকাপাত হইবে, তাহার মধ্যে একটি স্বাভাবিক পরিণতি বা পরিসমাপ্তির লক্ষণ থাকা চাই, পাঠকের মন যেন তাহাকে সমস্যাসমাধানের একটি ছেদচিহ্ন বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত হয়। এই সমস্ত কারণের জন্য ছোট গল্পের আর্ট উপন্যাসের আর্ট অপেক্ষা দুরধিগম্য। উপন্যাসের ঐক্য অনেকটা আলগা ধরণের; ইহার তন্তুগুলির মধ্যে অনেক ফাঁক থাকিতে পারে; এই ফাঁকগুলি ঔপন্যাসিক অনেক সময়ে গল্পবহির্ভূত প্রসঙ্গ বা মন্তব্যের দ্বারা পূরণ করিতে পারেন। ছোট-গল্প-লেখকের ভাগ্যে এই সমস্ত সুযোগের কোন সম্ভাবনা নাই।

অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় বঙ্গসাহিত্যে ছোট গল্পের আপেক্ষিক মূল্য অনেক বেশি। আমাদের সাধারণ জীবন-যাত্রা যেরূপ সংকীর্ণপরিসর ও বৈচিত্র্যহীন, ইহার স্রোতোবেগ যেরূপ মন্দীভূত, তাহাতে ছোট গল্পের সহিতই ইহার একটি স্বাভাবিক সংগতি ও সামঞ্জস্য আছে। উপন্যাসের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইহাকে একটি বালুকাপ্রোথিত, শীর্ণকলেবর জলধারার মতই দেখায়। এই স্বাভাবিক রসদৈন্য ও বৈচিত্র্যহীনতার জন্যই আমাদের উপন্যাসের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা, একটা বিরাট্ ফাঁকের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। বক্তব্য বিষয়ের গুরুতর অভাব যেন লেখককে একটা শূন্যগর্ভ, অস্বাভাবিক স্ফীতির দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। এই বক্তব্যের অভাব মন্তব্যের প্রাচুর্য বা অনাবশ্যক দীর্ঘ বিশ্লেষণের দ্বারা পূর্ণ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও, ফল কিছুতেই সন্তোষজনক হইতেছে না। আমাদের জীবন যে সমস্ত ক্ষুদ্র বিক্ষোভের দ্বারা আন্দোলিত হয়, তাহা ছোট গল্পের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সহজেই সীমাবদ্ধ হইতে পারে; যতটুকু মাধুর্য ও ভাবগভীরতা আমাদের সাধারণ প্রাত্যহিক কার্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাহা ছোট গল্পের ক্ষুদ্র পেয়ালার মধ্যে অনায়াসেই ধরিয়া রাখা যায়। তাহার জন্য উপন্যাসের ব্যাপ্তি ও বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

সুতরাং আমাদের সামাজিক জীবন-যাত্রার সহিত ছোট গল্পের একটি বিশেষ উপযোগিতা আছে। এ বিষয়ে ইউরোপীয় ছোট গল্পের সহিত আমাদের একটা গুরুতর প্রভেদ লক্ষ্য করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য দেশে জীবন-ধারার এমন একটি সহজ ও প্রচুর প্রবাহ, এমন একটি দুর্দমনীয় গতিবেগ আছে, যে ইহা উপন্যাসের বৃহৎ পরিধিকেও ছাড়াইয়া যাইতে চাহে। পাশ্চাত্ত্য জীবনের বড় বড় সমস্যাগুলি এত সুদূরপ্রসারী, তাহাদের ঘাত-প্রতিঘাত এতই বিচিত্র ও জটিল, তাহাদের কার্যক্ষেত্র এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, ছোট গল্পের মধ্যে সেগুলির স্থানসংকুলান হওয়া অসম্ভব। সেইজন্য ইউরোপীয় সাহিত্যে জীবনের যে খণ্ডাংশ ছোট গল্পের মধ্যে স্থানলাভ করে তাহা প্রায়ই গৌণ ও অপ্রধান। জীবনের কেন্দ্রস্থ গভীর ভাব ও অনুভূতিগুলিকে ছাড়িয়া, তাহার লঘুতর বিকাশগুলি, তাহার সীমাপ্রদেশের গৌণ বৈচিত্র্যগুলিকে লইয়াই তাহার কারবার। চটুল সরসতা, জীবনের বিস্ময়কর, আশ্চর্য সংঘটনসমূহ

তাহার হাস্যরসপ্রধান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংগতিগুলিই সাধারণতঃ ইউরোপীয় ছোট গল্পের বিষয়। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলিতে ইহার বিপরীত ব্যাপার। তাঁহার দুই-একটি গল্পে হাস্যরসের প্রাচুর্য ও লঘুতর স্পর্শ থাকিলেও, অধিকাংশের মধ্যেই জীবনের গভীর কথা, সূক্ষ্ম পরিবর্তন ও রহস্যময় সূত্রগুলিরই আলোচনা হইয়াছে। (আমাদের এই বাহ্যতঃ তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর জীবনের তলদেশে যে একটি অশ্রুসজল, ভাবঘন গোপন প্রবাহ আছে, রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য স্বচ্ছ অনুভূতি ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সেগুলিকে আবিষ্কার করিয়া পাঠকের বিস্মিত মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছেন। যেখানে বাহ্যদৃষ্টিতে মরুভূমির বিশাল। ধূসর বালুকা-বিস্তার মাত্র দেখা যায়, তিনি সেখানেও সেই সর্বদেশসাধারণ ভাবমন্দাকিনীধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। আমাদের যে আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি বহির্জীবনে বাধা পাইয়া, বাহ্য-বিকাশের দিকে প্রতিহত হইয়া অন্তরের মধ্যে মুকুলিত হয় ও সেখানে গোপন মধুচক্র রচনা করে, রবীন্দ্রনাথ নিজ ছোট গল্পগুলির মধ্যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইবার অবসর দিয়াছেন। বাস্তব-জগতের রিক্ততার মধ্যে যে বিশাল ভাবসম্পদ্ কবিচক্ষুর প্রতীক্ষায় আত্মগোপন করিয়া আছে তিনি সেই ছদ্ম আবরণ ভেদ করিয়া তাহাদের স্বরূপ অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহার গল্পগুলি আমাদের কর্ণে এই আশার বাণী ধ্বনিত করে যে, আমাদের বিষয়দৈন্য ও বৈচিত্র্যহীনতার জন্য কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই, আমাদের রস-সম্পদের কোন অভাব নাই, অভাব কেবল সূক্ষ্মদৃষ্টির ও কবিত্বপূর্ণ অনুভূতির।)

আমাদের সামাজিক জীবনের বদ্ধ গলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে উপায়ে রোমান্সের মুক্ত বায়ু বহাইয়াছেন, তাহা যেমনি সহজ তেমনি ফলপ্রদ। তাঁহার গল্পগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায়েই তিনি আমাদের প্রাত্যহিক সাধারণ জীবনের উপর রোমান্সের অসাধারণতা ও দীপ্তি আনিয়া দিয়াছেন—(১) প্রেম, (২) সামাজিক জীবনে সম্পর্কবৈচিত্র্য; (৩) প্রকৃতির সহিত মানবমনের নিগূঢ় অন্তরঙ্গ যোগ; (৪) অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ। আমরা এই চারিটি উপায়ের বৈধতা ও কার্যকারিতা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি হইতে তাহাদের প্রভাবের দৃষ্টান্ত দেখাইতে চেষ্টা করিব।

(১) প্রেম। একজন ইংরাজ সমালোচক বলিয়াছেন, Love is the solar passion of the race—প্রেমই মানবজাতির প্রবলতম প্রবৃত্তি। এই প্রেমই সাধারণ জীবনে একটা বিপুল শক্তিবেগ, প্রবল, ধ্বংসকারী উন্মত্ততা ও দুশ্ছেদ্য জটিলতাজাল সঞ্চার করিয়া ইহাকে রোমান্সের পর্যায়ভুক্ত করিয়া তোলে, তুচ্ছতম জীবনের উপরে একটা বৃহৎ ব্যাপ্তি ও বিস্তার আনিয়া দেয়। প্রেমের উন্মাদনা জীবনকে তাহার সংকীর্ণ গণ্ডি হইতে টানিয়া আনিয়া বাহিরের বিশ্বজগতের সহিত একটি নিগূঢ় সম্পর্ক-বন্ধনে আবদ্ধ করে, হৃদয়ের সমস্ত ব্যাকুল আবেগকে, সুপ্ত কল্পনাবৃত্তিগুলিকে মুক্তি দিয়া, ও মানবমনে অতর্কিত, অলক্ষিত পরিবর্তন সংসাধন করিয়া এক অনির্বচনীয় রমণীয়তার সৃষ্টি করে। কবিরা প্রেমের এই দুর্বার শক্তিকে অভিনন্দিত করিয়া তাহার স্তবগান করিয়াছেন, ঔপন্যাসিকেরাও ইহার গূঢ় প্রভাব ও প্রক্রিয়া মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দিক্ হইতে লক্ষ্য করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি ও ঔপন্যাসিক উভয়ের দৃষ্টি লইয়া প্রেমের যে বিচিত্র ও রহস্যময় বিকাশ লীলায়িত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা সাহিত্য-

জগতে নিতান্ত দুর্লভ। আবার, ব্যর্থ, প্রতিহত প্রেম জীবনকে যে একটি বৃহৎ দুঃখে অভিষিক্ত করে ও মর্মস্পর্শী করুণ সুরে প্লাবিত করিয়া দেয়, তাহাকেও তিনি আশ্চর্য গভীর সহানুভূতির দ্বারা অভিব্যক্তি দিয়াছেন।

যে-সমস্ত গল্পে প্রেমের এই বিচিত্র লীলা অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান কতকগুলির বিশেষ উল্লেখ করা যাইতে পারে—'একরাত্রি', 'মহামায়া', 'সমাপ্তি', 'দৃষ্টিদান', 'মাল্যদান', 'মধ্যবর্তিনী', 'শাস্তি', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'মানভঞ্জন', 'দুরাশা', 'অধ্যাপক' ও 'শেষের রাত্রি'।

ইহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রধানতঃ কবিত্বময় গীতিকাব্যের উচ্ছ্বসিত সুরে বাঁধা। ঔপন্যাসিকের যে প্রধান কর্তব্য মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ, তাহা ইহাদের মধ্যে সেরূপ পরিস্ফুট নহে। 'একরাত্রি' গল্পে চরিত্রাঙ্কনের চেষ্টা নিতান্ত সামান্য, ইহা কেবল প্রলয়-দুর্যোগ-রাত্রির অন্ধকারে নীরব স্থির প্রেমের ধ্রুবতারাটি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। 'মানভঞ্জন' গল্পটিতেও প্রধান আকর্ষণ—গিরিবালার উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য ও তাহার অতৃপ্ত-যৌবন-চঞ্চল রক্তলহরীর উপর রঙ্গমঞ্চের যাদুময় প্রভাব বর্ণনাতে—উহার গল্পাংশে বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য নাই। 'দুরাশা' গল্পটিতেও সামান্য একটু মনস্তত্ত্বের স্পর্শ ও যথেষ্ট ঘটনা-বৈচিত্র্য থাকিলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে মহামহনীয় প্রেমের আত্মকাহিনী। কেশরলালের ব্রাহ্মণ্যধর্ম একটি সনাতন, অপরিবর্তনীয় মনোভাব বা কেবল একটা অভ্যাসের সংস্কার মাত্র, এই মনস্তত্ত্বমূলক প্রশ্নটি লেখক কেবল উত্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। 'অধ্যাপক' গল্পটির অনেকগুলি দিক্ আছে—একটি ব্যঙ্গবিদ্রূপের দিক্। বক্তার লাঞ্ছিত সাহিত্যিক খ্যাতি ও ব্যর্থ কবি-যশঃ-প্রার্থিতার মধ্যে যে বিদ্রূপ-রসটি আছে তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য। কিন্তু ইহার প্রধান বাণীটি প্রেমের—প্রকৃতির বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন শ্রীর সহিত সুন্দরী নারীর যে একটি নিগূঢ়, প্রাণময় ঐক্য দেখান হইয়াছে, তাহা কবি-প্রতিভার সৃষ্টি—ঔপন্যাসিকের বিশ্লেষণ এখান পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না।

কতকগুলি গল্পের মধ্যে কবির সৌন্দর্যসৃষ্টি ও ঔপন্যাসিকের বিশ্লেষণপটুতার আশ্চর্যরূপ মিলন সাধিত হইয়াছে। 'সমাপ্তি' গল্পটিতে দুরন্ত বন্য মৃন্ময়ীর অভাবনীয় আমূল পরিবর্তন, যে অদৃশ্য প্রভাবে তাহার বালসুলভ চপলতা নিমেষমধ্যে রমণী-প্রকৃতির স্নিগ্ধ-সজল গাম্ভীর্যে পরিণত হইয়াছে, তাহার চিত্রটি যেন কবিত্বপূর্ণ তেমনি মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া অনবদ্য। 'দৃষ্টিদান' গল্পটি আগাগোড়া মৃদু কুসুম-সৌরভের ন্যায় নারীহৃদয়ের অনুপম সংযত মাধুর্যে পরিপূর্ণ—রমণীসুলভ কোমলতা স্নিগ্ধশীতল প্রলেপের মত সমস্ত গল্পটিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কোথাও একটু পরুষ, বুদ্ধি-কঠোর স্পর্শ বা পুরুষোচিত উগ্র ঝাঁঝাল সমালোচনার লেশমাত্র চিহ্ন নাই। কি পল্লীপ্রকৃতি বর্ণনায়, কি জীবনের সমালোচনাতে—সর্বত্রই এই অনির্বচনীয় সুকুমার পবিত্রতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির ছাপ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ, অন্ধের স্বচ্ছ গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও শব্দ-স্পর্শ-গন্ধাত্মক প্রাকৃতিক-সৌন্দর্যবোধের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রশংসার অতীত। একটিমাত্র উদাহরণ দিব—"অথচ পত্রদ্বারা তিনি যে সর্বদাই তাহার খবর পাইতেছেন, তাহা আমি অনায়াসে অনুভব করিতে পারিতাম; যেমন পুকুরের মধ্যে বন্যার জল যেদিন একটু প্রবেশ করে সেইদিনই পদ্মের ডাঁটায় টান পড়ে, তেমনি তাঁহার ভিতরে একটুও যেদিন স্ফীতির সঞ্চার হয় সেদিন আমার হৃদয়ের মূলের মধ্য হইতে আমি আপনি অনুভব করিতে

পারি।" এই যে গভীর অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, বোধ হয় অন্ধ ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে ইহা সম্ভবপর নহে। গল্পটি পড়িলে মনে হয় যেন লেখক আপনার চক্ষুষ্মান্ প্রকৃতির সমস্ত সুবিধা বিসর্জন দিয়া, পুরুষের সমস্ত শিক্ষাভিমান ও বুদ্ধিবিস্তার সংকুচিত করিয়া এই পরম রমণীয়, সূক্ষ্ম-অনুভূতিময়, স্বচ্ছ অন্ধলোকে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন।

'মধ্যবর্তিনী' গল্পটিতে কবিত্ব অপেক্ষা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেরই প্রাধান্য। প্রেমের আবির্ভাব কি করিয়া তিনটি নিতান্ত সাধারণ, যন্ত্রবদ্ধ জীবন-যাত্রার মধ্যে গভীর বিপ্লব ও দুশ্ছেদ্য জটিলতা আনিয়া দিয়াছে, তাহারই কাহিনী ইহার বিষয়। জীবনের নিতান্ত বাঁধা-ধরা রাস্তার পথিক নিবারণ এই দুর্দান্ত প্রেমের অত্যাচারে একেবারে সর্বনাশের গভীর গহ্বরে ঝাঁপ দিয়াছে। হরসুন্দরী প্রৌঢ়বয়সে এই অকাল-জাগ্রত, বুভুক্ষু মনোবৃত্তির অতর্কিত পরিচয় লাভ করিয়া নিজের লৌকিক-কর্তব্যরত অতীত জীবনকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও প্রবঞ্চিত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। আর এই গল্পের তৃতীয় ব্যক্তি শৈলবালা প্রেমের অপরিমিত আদর ও অযাচিত সোহাগ অনায়াসে লাভ করিয়া জীবনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও পরিণতি হইতে বঞ্চিত হইয়া অকালমৃত্যুর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এই কাহিনীটি আমাদের বাঙ্গালী পরিবারের অতি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু লেখক এই অতি সাধারণ ঘটনার মধ্যেও কিরূপ অদ্ভুত ক্ষমতার সহিত গভীর রসধারা সঞ্চারিত করিয়াছেন ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়।

প্রেমমূলক অন্যান্য গল্পগুলির বিস্তৃত সমালোচনার সময় নাই। 'সমাপ্তি', 'দৃষ্টিদান' ও 'মধ্যবর্তিনীর' সর্বাঙ্গসুন্দর, নিখুঁত সম্পূর্ণতা তাহাদের নাই। কিন্তু এগুলিতেও, কোথাও বা একটু চরিত্র-সৃষ্টি, কোথাও বা একটু অপরূপ প্রকৃতি-বর্ণনা, কোথাও বা মানবজীবন সম্বন্ধে একটু গভীর মন্তব্য, তাহাদের উপর একটি অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা আনিয়া দিয়াছে। 'মহামায়া' গল্পে মহামায়ার দীপ্ত তেজঃপূর্ণ চরিত্রটি, অভেদ্য অবগুণ্ঠনের অন্তরালে, সুদূর রহস্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু এই চরিত্রটি কেবল সাধারণ বর্ণনার দ্বারাই অঙ্কিত হইয়াছে, কার্যে বা ব্যবহারে পরিস্ফুট করিয়া তোলা হয় নাই। ইহার মধ্যে দুইটি প্রকৃতি-বর্ণনা, মনের সহিত বহিঃপ্রকৃতির নিগূঢ় ভাবগত ঐক্যের দুইটি মুহূর্ত, সমস্ত গল্পটিকে কল্পনালোকের উচ্চ প্রদেশে লইয়া গিয়াছে। একটির উদাহরণ উদ্ধৃত করিব।

"একদিন বর্ষাকালে শুক্লপক্ষ দশমীর রাত্রে প্রথম মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিল। নিস্পন্দ জ্যোৎস্নারাত্রি সুপ্ত পৃথিবীর শিয়রে জাগিয়া বসিয়া রহিল। সে রাত্রে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রাজীবও আপনার জানালায় বসিয়া রহিল। গ্রীষ্মক্লিষ্ট বন হইতে একটা গন্ধ এবং ঝিল্লীর শ্রান্তরব তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল। রাজীব দেখিতেছিল, অন্ধকার তরুশ্রেণীর প্রান্তে শান্ত সরোবর একখানি মার্জিত রূপার পাতের মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। মানুষ এরকম সময় স্পষ্ট একটা কোনো কথা ভাবে কি না বলা শক্ত। কেবল তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ একটা কোনো দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে—বনের মতো একটা গন্ধোচ্ছ্বাস দেয়, রাত্রির মতো একটা ঝিল্লী-ধ্বনি করে। রাজীব কী ভাবিল জানি না, কিন্তু তাহার মনে হইল, আজ যেন সমস্ত পূর্ব নিয়ম ভাঙিয়া গিয়াছে। আজ বর্ষারাত্রি তাহার মেঘাবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছে এবং আজিকার এই নিশীথিনীকে সেকালের সেই মহামায়ার মতো নিস্তব্ধ সুন্দর এবং সুগম্ভীর দেখাইতেছে। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব সেই মহামায়ার দিকে একযোগে ধাবিত হইল।"

'মাল্যদান' গল্পটিতে হরিণ-শিশুর ন্যায় উদার, সরল, লৌকিক-বোধহীন বালিকার মনে প্রথম প্রেমের লজ্জা-কুণ্ঠিত অভ্যুদয়ের বর্ণনা-উপলক্ষ্যে লেখক বেদনা-রহস্য-মণ্ডিত মানব-হৃদয়ের সহিত স্বতঃ-উৎসারিত-আনন্দ-নির্ঝরস্নাত ইতরপ্রাণী ও বহিঃপ্রকৃতির কি সুন্দর, কবিত্বপূর্ণ তুলনা করিয়াছেন! "যাহার বুঝিবার সামর্থ্য অল্প তাহাকে হঠাৎ একদিন নিজ হৃদয়ের এই অতল বেদনার রহস্যগর্ভে কোনো প্রদীপ হাতে না দিয়া কে নামাইয়া দিল। জগতের এই সহজ-উচ্ছ্বসিত প্রাণের রাজ্যে, এই গাছপালা-মৃগপক্ষীর আত্মবিস্মৃত কলরবের মধ্যে কে তাহাকে আবার টানিয়া তুলিতে পারিবে।" 'শেষের রাত্রি' গল্পটিতে প্রেমের আর এক নূতন দিক্ দেখান হইয়াছে। মৃত্যুপথযাত্রীর ব্যাকুল আত্মপ্রতারণা, স্খলিতপ্রায়, অপসরণোন্মুখ প্রেমকে প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টা সমস্ত গল্পটিকে একটি ব্যথিত করুণ দীর্ঘনিঃশ্বাসে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, ও তাহার মধ্যে একটা রোগতপ্ত মনের বিকার আশ্চর্যভাবে সঞ্চারিত করিয়াছে।

(২) এইবার দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলির আলোচনা করিব। আমাদের এই অত্যন্ত যন্ত্রবদ্ধ সামাজিক জীবনে,—যেখানে সকলেরই একটা বিশেষ সুনির্দিষ্ট স্থান আছে, ও যেখানে ব্যক্তিত্বস্ফুরণের সম্ভাবনা ও সুযোগ নিতান্ত সীমাবদ্ধ,—সেখানে মাঝে মাঝে একটি বিচিত্র, অপ্রত্যাশিত রকমের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া রোমান্সের সূত্রপাত করে; পারিবারিক জীবনে সাধারণতঃ যে নির্দিষ্ট প্রণালীতে স্নেহধারা প্রবাহিত হয়, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই সেখানে একটা ক্ষুদ্র বিপর্যয়, একটা বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাত সৃষ্টি হইয়া থাকে। স্নেহ, প্রেম, প্রভৃতি মানুষের হৃদয়বৃত্তি, পারিবারিক ব্যবস্থা ও সমাজনির্দিষ্ট সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে চাহে বলিয়াই রোমান্সের উদ্ভব হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছোট গল্পে পূর্ণমাত্রায় এই সংকীর্ণ অবসরের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন; আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের অত্যন্ত পাকা প্রস্তর-দুর্গের মধ্যে যে দুই একটা গোপন, অলক্ষিত রন্ধ্রপথ আছে, তাহার ভিতর দিয়া বৈচিত্র্যের প্রবেশমার্গ রচনা করিয়াছেন। 'পোস্টমাস্টার' গল্পটিতে নির্জন পল্লীজীবনে অবিশ্রান্ত বর্ষাধারা-পাতের মধ্যে প্রবাসী পোস্টমাস্টারের সহিত অনাথা বালিকা রতনের যে একটি ব্যাকুল স্নেহ-সম্পর্কের সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে, পারিবারিক জীবনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই বলিয়াই তাহার এত করুণ, শঙ্কিত আবেদন। 'ব্যবধান' গল্পটিতে বনমালী-হিমাংশুমালীর মধ্যে ভালবাসাটি পারিবারিক বিরোধ ও প্রতিকূলতার প্রতিবেশে একটি শীর্ণ-কুণ্ঠিত বেদনার মধ্যে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। 'কাবুলিওয়ালা'তে এই স্নেহ-বন্ধন অনেক দুরতিক্রম্য বাধা লঙ্ঘন করিয়া এক রুক্ষদর্শন, পরুষমূর্তি বিদেশীর সহিত বাঙালী-ঘরের একটি ছোট মেয়ের একটি ক্ষণস্থায়ী প্রীতির সম্পর্ক রচনা করিয়াছে। 'দানপ্রতিদান'-এ শশিভূষণ রাধামুকুন্দের নিঃসম্পর্ক প্রীতিবন্ধনের মধ্যে একটা নীরব অনুযোগ ও রুদ্ধ অভিমানের স্পর্শ একটি ক্ষুদ্র ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা সহোদর ভ্রাতার সহজ সম্পর্ক-প্রবাহের মধ্যে পাওয়া যায় না। 'মাষ্টারমশায়'-এ মাস্টার হরলাল ও ছাত্র বেণুগোপালের মধ্যে এরূপ একটা নিবিড় কুণ্ঠা-বেদনাজড়িত, বাধাপ্রতিহত স্নেহপাশই হতভাগ্য হরলালের জীবনটিকে ট্র্যাজেডির দুশ্ছেদ্য, জটিল জালে জড়াইয়া ফেলিয়াছে।

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটিতে শশিভূষণের সহিত গিরিবালার সম্পর্কটিও এই মধুর অনিশ্চয়ের ম্লান-ছায়া-মণ্ডিত; গল্পের অন্তর্নিহিত করুণ রসটি শেষের গানটিতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে,

কিন্তু মোটের উপর গল্পটি শশিভূষণের জীবনকাহিনীর কতগুলি বিচ্ছিন্ন খণ্ডাংশের সমষ্টি বলিয়া আর্টের পরিণত ঐক্য লাভ করিতে পারে নাই।

সময় সময় একই পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যেও এই স্নেহসম্পর্ক ঠিক সহজ, স্বাভাবিক বিকাশের দিকে না গিয়া একটা বক্র, বঙ্কিম গতি ও অস্বাভাবিক তীব্রতা লাভ করিয়া থাকে। 'পণরক্ষা'য় বংশীবদন ও রসিকের মধ্যে যে সম্পর্ক তাহা ঠিক ভ্রাতৃপ্রেম নহে—তাহার মধ্যে মাতৃস্নেহের উচ্ছ্বাস ও প্রবল আবেগ সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে বিচিত্র, জটিল করিয়া তুলিয়াছে। সেইরূপ 'রাসমণির ছেলে'র মধ্যেও মাতৃস্নেহ ও পিতৃস্নেহ পরস্পর রূপান্তরিত হইয়া একটি অনন্যসাধারণ বৈচিত্র্যের হেতু হইয়াছে। পুত্রের প্রতি ভবানীচরণের স্নেহ মাতৃস্নেহের মতই অজস্র প্রচুর ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে; রাসমণির ভালবাসার মধ্যে পিতৃশাসনের দৃঢ়তা ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা প্রবেশলাভ করিয়াছে। 'কর্মফল' গল্পটিতে একদিকে পিতার কঠোর শাসন ও অন্যদিকে মাসীর অস্বাভাবিক ও অচিরস্থায়ী স্নেহাতিশয্য সতীশের জীবনের সমস্ত দুর্দৈব সৃষ্টি করিয়াছে। অবশ্য এই গল্পটি ঠিক বাস্তব অবস্থার অনুগামী বলিয়া ইহার মধ্যে রোমান্সের বৈচিত্র্য ততটা ফুটিয়া উঠে নাই; আর ইহার শেষ ফল ও চরম পরিণতিও ঠিক প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্তী।

এই শ্রেণীর গল্পের মধ্যে 'দিদি'ই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ছোট ভাইটিকে লইয়া শশিমুখীর স্বামীর সহিত যে 'নীরব দ্বন্দ্বের গোপন ঘাত-প্রতিঘাত' চলিয়াছে তাহা ঘটনাচক্রে একেবারে বিরোধের চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিয়া অত্যন্ত তীব্র ও সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছে। আবার এই বিরোধ তাহার নবজাগ্রত প্রেমের স্বপ্নের মধ্যে অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাসের মতই আসিয়া তাহার শান্ত, নীরব সহিষ্ণুতার মধ্যে একটি দারুণ দুর্বিষহতা লাভ করিয়াছে।

আমাদের সমাজ ও পরিবারের আর একটা দিক্ আছে যাহা ঔপন্যাসিকের বৈচিত্র্যসৃষ্টির কাজে বিশেষ সহায়তা করিতে পারে—তাহা সাধারণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যক্তিত্বের বিদ্রোহ। 'হালদারগোষ্ঠী' গল্পটিতে এই ব্যক্তিত্বের বিদ্রোহই প্রধান বর্ণনীয় বস্তু। বনোয়ারীলালের বৃহৎ ব্যক্তিত্ব তাহার পারিবারিক গণ্ডি ছাড়াইয়া অত্যন্ত অসংগতরূপ বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেইজন্য তাহার সহিত তাহার পরিবারের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে, এখানে প্রেমের নিগূঢ় দাবীই বনোয়ারীলালের বিদ্রোহাগ্নিতে ইন্ধন জোগাইয়াছে। সে জমিদার-বংশের বড় ছেলে বলিয়া নহে, তাহার পুরুষকারের স্বাধীন অধিকারের দ্বারাই নিজ স্ত্রী কিরণলেখার চিত্ত জয় করিয়া লইতে চাহে—তাহার বাড়ির অতি-নিয়মিত ব্যবস্থা তাহার প্রেমিক হৃদয়ের পক্ষে যথেষ্ট খোলা ও উদার নহে বলিয়াই বংশপরম্পরাগত প্রথার সহিত তাহার বিরোধের সূত্রপাত। আর তাহার সবচেয়ে বড় দুঃখ এই যে, কিরণও তাহার এই বিশাল প্রেমিক হৃদয়ের কোন সম্মান না রাখিয়া তাহার শত্রুদলে যোগ দিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধাচারী পরিবারবর্গের সহিত একাত্ম হইয়া মিশিয়া গিয়াছে—প্রেমের স্নিগ্ধরশ্মি-পরিবৃতা কিরণলেখা হালদারগোষ্ঠীর বড়বৌ-এর মধ্যে আত্মবিসর্জন দিয়াছে। এই গূঢ় বিরোধ ও অসংগতির কাহিনীটি যেমন সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সহিত বর্ণিত হইয়াছে, বনোয়ারীর চরিত্রবিশ্লেষণও সেইরূপ সুন্দর হইয়াছে।

এই বংশগৌরবের নির্দোষ, নিরীহ দিকের চিত্র 'ঠাকুরদা' গল্পে দেওয়া হইয়াছে। নয়নজোড়ের বাবু-বংশের শেষ প্রতিনিধি ঠাকুরদাদার বংশাভিমানে এমন একটি করুণ আত্মপ্রতারণা, মধুর সুষমা ও সহজ ভদ্রতা আছে যে, ইহা আমাদের বিরোধভাবকে মাথা তুলিতে দেয় না। 'ঠাকুরদা' গল্পটি কোন সত্যান্বেষী, বাস্তবতা-প্রবণ লেখকের হাতে পড়িলে Thackerayর "Book of Snobs"-এর একতম অধ্যায়ে পরিণত হইতে পারিত—রবীন্দ্রনাথের গভীর সহানুভূতি ইহাকে একটি করুণ হাস্যরসে অভিষিক্ত করিয়া সুন্দর ও রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

কতকগুলি গল্পে আমাদের সমাজের প্রধান কলঙ্ক—বিবাহের অত্যাচার—আলোচিত হইয়াছে, যথা, 'দেনাপাওনা', 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ', 'হৈমন্তী', ইত্যাদি। এই বিষয়ের আলোচনা বাংলা উপন্যাসের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং এই গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় উপন্যাস-সাহিত্যের খুব সাধারণ পথেরই অনুসরণ করিয়াছেন। এখানে লেখক কেবল অবিমিশ্র করুণ রসেরই উদ্রেক করিয়াছেন, কেবল 'হৈমন্তী' গল্পে হৈমন্তীর চরিত্রাঙ্কনে একটু বিশেষত্ব আছে। মোট কথা, এই শেষোক্ত শ্রেণীর গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা বিশেষ বিকশিত হইয়া উঠে নাই।

(৩) তৃতীয় পর্যায়ের গল্পগুলিতে লেখক রোমান্স-সৃষ্টির এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা ও কবিসুলভ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ঔপন্যাসিকের সহায়তাবিধানে অগ্রসর হইয়াছে। তিনি স্বভাবসিদ্ধ কবিত্ব-শক্তির বলে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির কার্যকলাপ ও চিন্তাধারার সহিত বিশাল বহিঃপ্রকৃতির একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অতি সাধারণ তুচ্ছ ঘটনাবলীরও আশ্চর্যরূপ রূপান্তর-সাধন করিয়াছেন। নিতান্ত অনায়াসে সামান্য দুই-একটি রেখাপাতের দ্বারা তিনি মানব-মনের সহিত বহিঃপ্রকৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সিংহদ্বারটি খুলিয়া দিয়াছেন—তাঁহার তুচ্ছ গ্রাম্য কাহিনীগুলিও প্রকৃতির সূর্যচন্দ্রনক্ষত্রখচিত চন্দ্রাতপের তলে, তাহার আভাস-ইঙ্গিত-আহ্বান-বিজড়িত রহস্যময় আকাশ-বাতাসের মধ্যে, এক অপরূপ গৌরবে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা পূর্বেই কতকগুলি গল্পের মধ্যে এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু কতকগুলি গল্প একেবারে আদ্যোপান্ত প্রকৃতির সহিত এই নিগূঢ় সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'সুভা' নামক গল্পটি মূক বালিকার সহিত মৌন বিরাট্ প্রকৃতির নিগূঢ় ঐক্যের পরিচয়ে আগাগোড়া পরিপূর্ণ। 'অতিথি' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের এই ক্ষমতার চূড়ান্ত উদাহরণ। 'তারাপদ' লেখকের এক অদ্ভুত সৃষ্টি। এই সঞ্চরণশীল, প্রবহমান, চিরচঞ্চল পৃথিবীর প্রাণের সহিত তাহার এক আশ্চর্য সহানুভূতি ও গভীর একাত্মতা আছে। মানুষের এই অবিশ্রান্ত গতিশীলতা নাই বলিয়াই তাহার ভালবাসার মধ্যে এমন একটা প্রবল মোহ ও সংকীর্ণ আসক্তি দেখা যায়। তারাপদর স্নেহবন্ধনের মধ্যে ধরিত্রীমাতার সেই উদার, অনাসক্ত ভাব, সেই শিথিলতা ও পক্ষপাতহীনতা আছে। মানুষ নিজের জন্য যে ছোট-ছোট ঘর রচনা করে, তাহার চারিদিকের স্নেহের বেষ্টনের মধ্যে এক গাঢ়তর মোহাবেশ আছে—প্রকৃতির স্নেহে কোন মোহাবেশ, কোন ব্যাকুল বাষ্প-সজলতা নাই। তারাপদ প্রকৃতির এই উদার অনাসক্তি, এই মোহমুক্ত চির-চঞ্চলতার মনুষ্য প্রতিরূপ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার লুসি, রুথ ও অন্যান্য গ্রাম্য নরনারীর চিত্রে

প্রকৃতির কল্যাণী মূর্তির একটা বিশেষ দিক্‌কে আকার দিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার এই মূর্তি-কল্পনা মূলতঃ তাঁহার প্রকৃতিবিষয়ক দার্শনিক মতবাদের কবিত্বময় রূপান্তর। যাহার সেই দার্শনিক মতবাদে বিশ্বাস নাই, সে এই চিত্রগুলির বৈধতায় ও নৈতিক উৎকর্ষবিষয়ে সন্দিহান হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার তারাপদর চরিত্রে প্রকৃতির সহিত যে সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহা কোন বিশেষ দার্শনিক মতবাদের উপর নির্ভর করে না, সর্বসাধারণের স্বাধীন অনুভূতিই তাহার রসোপলব্ধি করিতে পারে।

তারাপদর সহিত 'আপদ' গল্পের নীলকণ্ঠের কতকটা অবস্থাগত সাদৃশ্য আছে, এবং এই দুই চরিত্রের তুলনা করিলে তারাপদ-চরিত্রের গূঢ় মাধুর্য ও পবিত্রতা বিশেষরূপে বুঝা যাইবে। তারাপদ তাহার অবারিত সহজ প্রাণের বলেই মতিবাবুদের পরিবারের সহিত মিলিত হইয়াছে; নীলকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া দৈববশে কিরণদের বাগানবাড়িতে আসিয়া পড়িয়াছে। একের অবাধ, অসংকোচ আতিথ্যগ্রহণ, অপরের কুণ্ঠিত অনুগৃহীতের ভাব। তারপর পরস্পরের চরিত্রানুরূপ উভয়ের মনোরঞ্জনের উপায়ও বিভিন্ন—তারাপদ সাঁতার দিয়া, কাজকর্মে সাহায্য করিয়া, নিজ সহজ শক্তির অবলীলাক্রম বিকাশে ও দাশু রায়ের পাঁচালী গাহিয়া কর্তা গৃহিণী হইতে আরম্ভ করিয়া মাঝিমাল্লাদের পর্যন্ত মনোহরণ করিয়াছে। নীলকণ্ঠ যাত্রার দলের গানের দ্বারা, কতকটা অভিনয়ের কৃত্রিম উপায়ে কেবল কিরণবালার প্রিয়পাত্র হইয়াছে, তাহার প্রচণ্ড দৌরাত্ম্যের জন্য বাড়ির অপর সকলের বিরক্তিভাজন হইয়াছে। তারপর তারাপদর উদার হৃদয়ে ঈর্ষ্যা, অভিমান প্রভৃতির লেশমাত্র নাই; সে প্রকৃতিমাতার স্তন্যপানে লালিত, তাহার অন্তঃকরণে কোন সংকীর্ণতার ছায়া পড়ে নাই। নীলকণ্ঠ কিরণের স্নেহের ভাগ লইয়া সতীশের প্রতি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়াছে ও চৌর্যরূপ হেয় কর্মে পর্যন্ত নামিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি তাহাকেও কতকটা ঔদার্য ও স্নেহশীলতা হইতে বঞ্চিত করেন নাই; তাহার ঈর্ষ্যাপরায়ণতা তাহার বঞ্চিত, স্নেহবুভুক্ষু হৃদয়ের একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মাত্র, ইহাতে নীচতার কোন স্পর্শ নাই। আবার দুইজনের মধ্যে আবির্ভাবের যেমন, তিরোধানেরও তেমনই একটা বিভিন্নতা আছে—তারাপদ তাহার সমস্ত স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া, তাহাকে বশীকরণের সমস্ত আয়োজন পায়ে ঠেলিয়া দিয়া, উদাস অনাসক্ত প্রকৃতিমাতার বক্ষে লুকাইয়াছে; নীলকণ্ঠ সকলের বিরাগ লইয়া ও একের ক্ষুব্ধ স্নেহমাত্র সম্বল করিয়া নিতান্ত অনাদৃতভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তারাপদ যে প্রকৃতির সহিত একাত্ম, নীলকণ্ঠ তাহার প্রসাদের কণামাত্র পাইয়াছে।

নীলকণ্ঠের চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব স্নেহের মায়াদণ্ডস্পর্শে তাহার সুপ্ত পুরুষোচিত আত্মসম্মানবোধের উদ্‌বোধন। লেখক অতি নিপুণতার সহিত তাহার এই গূঢ় পরিবর্তনের ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। 'সমাপ্তি' গল্পে মৃন্ময়ীর ন্যায় নীলকণ্ঠও অতি অল্পকালের মধ্যে ভালবাসার স্পর্শে আত্মবিস্মৃত বাল্যকাল হইতে পরিণত যৌবনে অবতীর্ণ হইয়াছে। ভালবাসার প্রভাবে এই মানসিক গূঢ় পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথের মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণে মৌলিকতার পরিচয় দেয়, এবং ইহা আমাদের সামাজিক অবস্থার সহিত বেশ সহজভাবেই মিলিয়াছে।

(৪) এইবার চতুর্থ পর্যায়ের গল্পগুলি আলোচনা করিব। সাধারণ বাঙ্গালী জীবনের সহিত অতিপ্রাকৃতের সংযোগসাধন একদিক্ দিয়া বিশেষ সহজ, অপর দিকে বিশেষ আয়াসসাধ্য।

সহজ এইজন্য যে, আমাদের মধ্যে এখনও কতকগুলি বিশ্বাস ও সংস্কার সজীবভাবে বর্তমান আছে, যাহাদের অতিপ্রাকৃতের প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। আবার অন্য দিকে, আমাদের সাধারণ জীবন এতই বিশেষত্বহীন ও ঘটনা-বিরল, যে ইহার মধ্যে মনোবিজ্ঞান-সম্মত উপায়ের দ্বারা অতিপ্রাকৃতের অবতারণা নিতান্ত দুরূহ। 'সম্পত্তি-সমর্পণ', 'গুপ্তধন', প্রভৃতি কয়েকটি গল্প আমাদের সহজ ভৌতিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত—সেগুলিতে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কলা-কুশলতার পরিচয় নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্পের যে প্রতিবন্ধক তাহা তিনি আশ্চর্য কল্পনা-সমৃদ্ধির সহায়তায় অতিক্রম করিয়াছেন। 'নিশীথে', 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও 'মণিহারা' এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃত, বাস্তব জীবনের সহিত অতিপ্রাকৃতের সমন্বয়-সাধনের দুরূহতার বিষয়ে পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইংরেজ কবি কোল্‌রিজ এ বিষয়ে—অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী। কিন্তু তাঁহাকেও অতি-প্রাকৃতের উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করিতে অনেক আয়াস পাইতে হইয়াছে। তাঁহার Ancient Mariner ও Christabel উভয় কবিতাতেই তাঁহাকে নৈসর্গিকের সীমা লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে, শরীরী প্রেতের আবির্ভাব ঘটাইতে হইয়াছে। আবার যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে তাঁহাকে এই অনৈসর্গিকের অবতারণা করিতে হইয়াছে তাহাতেও অজ্ঞাত, অপরিচিত সুদূরের রহস্য মাখানো। 'Ancient Mariner'-এ মেরুপ্রদেশের নিঃসঙ্গ, ধবল তুষারস্তূপ, রৌদ্রদগ্ধ, নিবাতনিষ্কম্প অনন্ত মহাসাগরের নিবিড় নীরবতা, চঞ্চলশিখা, বিচিত্রাভ বাড়বানলের মধ্যে তাঁহাকে অতিপ্রাকৃতের আসন রচনা করিতে হইয়াছে। পরিচিত মণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া তাঁহাকে মায়াতরী ডুবাইতে হইয়াছে। 'Christabel'-এও নিশীথ-স্তব্ধ অরণ্যানী ও মধ্যযুগের রহস্যমণ্ডিত দুর্গাভ্যন্তরেই প্রেতলোককে আমন্ত্রণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য কুহকবলে আমাদের অতিপরিচিত গৃহাঙ্গনের মধ্যেই অতিপ্রাকৃতকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন এবং নৈসর্গিকের সীমা ছাড়াইয়া এক পদও অগ্রসর হন নাই। ভৌতিকের মনোবিজ্ঞানসম্মত যে ব্যাখ্যা—"the spot in the brain that will show itself out" মস্তিষ্কবিকারের বাহ্য অভিব্যক্তি—তাহা তিনি তাঁহার গল্পগুলির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার গল্পগুলির প্রত্যেকটিই আধুনিক বিজ্ঞানের কঠোরতম পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

'নিশীথে' গল্পটি দ্বিতীয়বার পরিণীত, প্রথম স্ত্রীর প্রতি অপরাধ হেতু গুরুভারগ্রস্ত স্বামীর সাময়িক মনোবিকার হইতে উদ্ভূত। মৃত্যুশয্যাশায়িনী প্রথমা স্ত্রীর ত্রস্ত, ব্যাকুল প্রশ্ন 'ওকে, ওকে, ওকে গো' অনুতপ্ত স্বামীর মস্তিষ্কে এমন গভীর, অনপনেয় রেখাতে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে যে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই কয়েকটি সামান্য আর্তবাণীর প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, সমস্ত আকাশ-বাতাস আপন গভীর, অতলস্পর্শ সুরে উহার শঙ্কিত শিহরণটুকু, উহার ব্যথিত রেশটুকু, ধরিয়া রাখিয়াছে। আর মনোবিকারটুকু ঘটাইতে লেখকের বিশেষ আয়োজন-বাহুল্য করিতে হয় নাই—একটা উপনগরস্থ বাগানবাড়ির ম্লান, জ্যোৎস্নালোকিত বকুলবেদী, বা পদ্মার তটে কাশবন-পরিপ্লুত, নির্জন বালুতটের মধ্যেই অতিপ্রাকৃতের শিহরণ জাগিয়া উঠিয়াছে। অথচ সমস্ত গল্পটির মধ্যে সম্ভবের সীমা অতিক্রম করিয়াছে এমন একটি রেখাও নাই। এই অতিপ্রাকৃতের অসীম সাংকেতিকতা আরব্য উপন্যাস-বর্ণিত বোতলের

মধ্যে আবদ্ধ দৈত্যদেহের ন্যায় সংকীর্ণপরিধি বাঙ্গালী জীবনের মধ্যে সহজেই স্থান লাভ করিয়াছে।

'মণিহারা'ও অনেকটা 'নিশীথে'র ন্যায় সদ্যঃ-পত্নীবিয়োগবিধুর স্বামীর মনোবিকারের কাহিনী। ইহার বিশেষত্ব এই যে, এই তুষারশীতল, মৃত্যুরহস্যগূঢ় স্বপ্নকাহিনীর চারিদিকে একটা ইস্পাতের মত শক্ত বাস্তবতার বন্ধন আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত যিনি বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার চক্ষে স্বপ্নজড়িমার লেশমাত্র নাই; বরঞ্চ একটা তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তি শানিত ছুরিকাগ্রভাগের ন্যায় চকচক করিতেছে। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে আদিম রহস্য ও বর্তমান যুগের সমাজে সেই সনাতন নীতির বৈপরীত্য—এই অতি গভীর চিন্তাশীলতাপূর্ণ আলোচনার মধ্যে বুদ্ধি-তর্কের অতীত অতীন্দ্রিয় জগতের ভয়াবহ ইঙ্গিতটি আশ্চর্য সুসংগতির সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই realistic setting বা বাস্তব প্রতিবেশের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের অপরূপতা আরও রহস্যঘন হইয়া উঠিয়াছে। গল্পের উপসংহারটিও আবার বাস্তব সত্যকে প্রাধান্য দিয়া একটা সংশয়াকুল, সন্দেহবিজড়িত অনিশ্চয়তাব মধ্যে গল্পটিকে হঠাৎ শেষ করিয়া দিয়াছে। এই সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান পাঠকের মন বলিতে থাকে, "Did I dream or wake?" 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর অতিপ্রাকৃতের মধ্যে বাদশাহী যুগের সমস্ত ঐশ্বর্য-দীপ্তি, রাজান্তঃপুরের সমস্ত অব্যক্ত ক্রন্দন, সমস্ত যুগযুগান্তরসঞ্চিত ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস তাহাদের ইন্দ্রজাল বর্ষণ করিয়াছে। বিজন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে অতীত যুগের বিলাস-বিভ্রম তাহার অতীন্দ্রিয় স্পর্শ ও রহস্যময় সংকেত ছড়াইয়া রাখিয়াছে। কবি যেন এই পঙ্কিল উচ্ছ্বসিত কামনাপ্রবাহের মধ্য হইতে তাহার সমস্ত "বস্তু-অংশ বর্জন করিয়া রস অংশ ছাঁকিয়া লইয়াছেন।" ভাষার ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা-সাংকেতিকতায় এক De Quinceyর Dream Visions ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণ-এর" অনুরূপ কিছু ইংরেজী সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। অবিচ্ছিন্ন সংগীতপ্রবাহে বোধ হয় De Quincey রবীন্দ্রনাথ হইতে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় ইংরেজ লেখকের যে প্রধান দোষ বস্তুহীনতা ও ভাবের কুহেলিকাময় অস্পষ্টতা—তাহার লেশমাত্র চিহ্ন পাওয়া যায় না। আবার এই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার বিবৃতি হইয়াছে স্টেশনের বিশ্রামাগারে ট্রেন-প্রতীক্ষার অবসরে। এখানেও 'realistic setting'টি লেখককে গল্পের আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটাইতে সুযোগ দিয়াছে—তাঁহাকে দীর্ঘ ব্যাখ্যা দিবার অসুবিধা ভোগ করিতে দেয় নাই। এই তিনটি অতিপ্রাকৃত গল্প রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য কল্পনাশক্তির পরিচয় দেয়—পৃথিবীর যে-কোন ঔপন্যাসিক এই শক্তিতে গৌরবান্বিত হইতে পারিতেন। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি গল্প আছে যাহাতে অতিপ্রাকৃতের ছদ্মবেশে বস্তুতঃ প্রকৃত বিষয়েরই বর্ণনা পাওয়া যায়। 'কঙ্কাল' গল্পটিতে কথাগুলি দেওয়া হইতেছে মৃতা রমণীর মুখে, কিন্তু মৃতের এই আত্মজীবন-কাহিনীতে অতিপ্রাকৃতের তুষারশীতল স্পর্শটি আনিবার কোন চেষ্টা নাই। যে প্রগল্‌ভা, রূপযৌবনমোহাবিষ্টা রমণী গল্পটি বলিতেছে, সে দুই চারিটি মর্ত্যলোকসুলভ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ছাড়া প্রেতলোকের বিশেষত্ব বিশেষ কিছু অর্জন করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 'জীবিত ও মৃত' গল্পটিতে একটি অসাধারণ মনোভাবের বিশ্লেষণ-চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে লেখক কৃত-কার্য হইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। জীবিতা শ্মশান-প্রত্যাগতা কাদম্বিনী নিজেকে সত্য সত্যই মৃত বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে, এবং লেখক তাহার চিন্তায় ও ব্যবহারে

একপ্রকার সুদূর নির্লিপ্ততার ভাব মাখাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে সেরূপ অনুভূতির গভীরতা নাই। সুতরাং গল্পের অন্তর্নিহিত ভাবটি কল্পনারসে ভরপূর হইয়া বিকশিত হইয়া উঠে নাই।

এইখানে রবীন্দ্রনাথের গল্প-রচনার প্রধান যুগটির পরিসমাপ্তি হইয়াছে, এবং নিতান্ত আধুনিক সময়ে তিনি যে গল্পসাহিত্যের নূতন অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার সহিত পুরাতন গল্পগুলির এইখানে ব্যবচ্ছেদ-রেখা টানা যাইতে পারে। আধুনিক গল্পগুলির আদর্শ ও রচনাপ্রণালী পূর্বতন গল্প হইতে অনেকটা বিভিন্ন। এই প্রভেদ প্রথমতঃ বিষয়-নির্বাচনেই দেখা যায়। পূর্ব গল্পগুলি আমাদের সনাতন জীবনযাত্রার গভীর মর্মস্থল হইতে উদ্ভূত; এক একটি গল্প যেন ইহার হৃদ্-পদ্মের এক একটি বিকশিত পাপড়ি। ইহাদের মধ্যে যে সমস্যাগুলি আলোচিত হইয়াছে, তাহা হৃদয়ের গভীররসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা কেবলমাত্র জীবনের উপরিভাগে একটা বিক্ষোভ ও আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই। নূতন গল্পগুলির মধ্যে এই বাহিরের চাঞ্চল্য ও আন্দোলনকে অবলম্বন করিয়া বৈচিত্র্য আহরণের চেষ্টা হইয়াছে। হয়ত লেখক অনুভব করিয়াছিলেন যে, পুরাতন রসধারা শুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, সেদিকে আর নূতন কিছু করিবার সম্ভাবনা অল্প। সুতরাং আমাদের পুরাতন সমাজের চারিদিকে যে নবীন উন্মাদনা ফেনিল হইয়া উঠিতেছে, যে অশান্ত তরঙ্গভঙ্গ পুরাতন উপকূলের আশে-পাশে মুখরিত হইতেছে, তাহারই বিদ্রোহ-বেগটি জীবনের ছন্দে তালে গাঁথিয়া তুলিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। এই নূতন যুগের সমস্যাগুলি পুরাতনদের ন্যায় এত গভীর ও ব্যাপক নহে, ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের মধ্যেই ইহাদের প্রভাব ও প্রতি-ক্রিয়া সীমাবদ্ধ। ইহারা প্রায়ই বুদ্ধিগ্রাহ্য, তীক্ষ্ণতর্ক-কণ্টকিত; বুদ্ধির স্তর অতিক্রম করিয়া এখনও হৃদয়ভাবের গভীরতর স্তরে অবতরণ করে নাই। ইহাদের প্রভাব হইতে বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, চোখা-চোখা বুলি, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ চারিদিকে ছুটিতে থাকে, অশ্রুর গভীর প্রবাহ উৎসারিত হয় না। তথাপি ইহাদের নূতনত্ব বিশেষ উপভোগ্য, আমাদের জীবনে যে তিল তিল করিয়া নবমেঘের সঞ্চার হইতেছে, তাহার বিদ্যুচ্ছটা ইহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। এই গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ অতি আধুনিক উপন্যাসের পথপ্রদর্শক ও পূর্বসূচনাকারী।

ইহাদের মধ্যে 'নষ্টনীড়' গল্পটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। যদিও রচনাকাল হিসাবে ইহা পূর্ববর্তী গল্পগুলির সমসাময়িক, কিন্তু বিষয়ের দিক্ হইতে ইহাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক গল্পগুলির সমশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। ইহার সমস্যাটি যে আধুনিক তাহা নহে, কিন্তু সাহিত্যে ইহার বিস্তৃত বিশ্লেষণ একটা নূতন ব্যাপার। প্রেম বস্তুটিকে আমরা এতদিন রোমান্সের বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত করিয়া দেখিতেই অভ্যস্ত ছিলাম, ইহার বিচ্ছেদব্যথা, ইহার গোপন মাধুর্য, ইহার উচ্ছ্বসিত আবেগ, ইহার মুক্তি ও বিস্তারের দিকেই আমাদের লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল। যাহাকে বাহিরের জগতে বড় করিয়া দেখিয়াছি, নিজ গৃহকোণে, পারিবারিক নিষিদ্ধ গণ্ডির মধ্যে, বিধিনিষেধের অনুশাসনের বিরুদ্ধে তাহার যে কুৎসিত, লজ্জাকর অভিব্যক্তি তাহাকে আমাদের সাহিত্যের প্রকাশ্যতার মধ্যে টানিয়া আনিতে আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। সুতরাং সাহিত্যে এই নূতন আবির্ভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অভাব হয় নাই। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই জাতীয় বিষয়ের বৈধতা লইয়াও বাদপ্রতিবাদের অন্ত নাই। মোটের উপর এই

বিষয়ে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, কলাসৌন্দর্য ও বিশ্লেষণকুশলতা থাকিলে প্রেমের এই সমস্ত সমাজবিগর্হিত বিকাশও সাহিত্যের বিষয় হইতে পারে—বিপদ্ সেইখানে, যেখানে ইহাকে কেবলমাত্র কুৎসিত আলোচনার সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করা হয়, যেখানে কল্পনার স্বচ্ছ-সলিলে ইহার কালিমাকে ধৌত করিবার কোন প্রয়াস দেখা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'নষ্টনীড়'-এ পূর্বলিখিত শর্তগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিয়াছেন। প্রথমতঃ, অমলের প্রতি চারুলতার প্রেম একটা দুর্দমনীয়, অপ্রতিরোধনীয় হৃদয়াবেগমাত্র, ইহা চিন্তার সীমা অতিক্রম করিয়া পাপের পিচ্ছিল পথে পদক্ষেপ করে নাই। তারপর লেখক কি সুকৌশলে, পুঞ্জীভূত বেদনার কারণ দেখাইয়া এই প্রেমের উদ্ভবটিকে সম্ভব করিয়াছেন—ভূপতির ঔদাসীন্য, অমল ও চারুর পরস্পর স্নেহসম্পর্কের মধ্যে তাহাদের হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তির স্ফুরণ, তাহাদের সাহিত্যচর্চার নিবিড় নেশা ও নিভৃত গোপনতা, মন্দার প্রতি ঈর্ষ্যাতে তাহার গূঢ় পরিণতি, সর্বোপরি অমলের বিবাহ-সংবাদে তাহার অনিবার্য, অনাবৃত প্রকাশ—এই সমস্ত ক্রমবিকাশের স্তরগুলিই লেখক যথাস্থানে সন্নিবেশ করিয়া কার্যকারণ-শৃঙ্খলাটি অতি নিপুণভাবে গাঁথিয়া তুলিয়াছেন; এই কাহিনীর অন্তরতলস্থ গভীর ভাবগুলি মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ-দ্বারা প্রকটিত করিয়াছেন। বর্তমান বাস্তবতাপ্রধান ঔপন্যাসিকেরা নিতান্ত অকারণে প্রেমের উদ্ভব ঘটাইয়া বাস্তবতার মূল ভিত্তির প্রতিই অবহেলা প্রদর্শন করেন। যেখানে সমাজনীতির বিরুদ্ধে প্রেমের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, সেখানে এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের যথেষ্ট ও সংগত কারণ না দেখাইলে, আমাদের বিচারবুদ্ধি তাহাতে সায় দিতে চাহে না।

'স্ত্রীর পত্র' বর্তমানের নারীর অধিকারঘটিত আন্দোলনের প্রথম উৎপত্তিস্থল। লাঞ্ছিত, অপমানিত নারীর যে বিদ্রোহবাণী আজ প্রতি মাসিক পত্রিকার পাতায় পাতায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, রবীন্দ্রনাথ এখানে সেই জ্বালাময়ী বাণীকে তীব্র বিদ্রূপাত্মক ভাষার ভিতর দিয়া ফুটাইয়াছেন। অবশ্য এখানে গল্পের উপযুক্ত ঘাত-প্রতিঘাত নাই, কেন না কথাগুলি সমস্তই একতরফা। এইরূপ তীব্রশ্লেষাত্মক একতরফা কথার Propagandism হিসাবে মূল্য আছে, কিন্তু আর্টের অপক্ষপাত ও সমদর্শিতা তাহাতে নাই। বিশেষতঃ, মৃণালের ক্রোধের ঝাঁজটা একটু অতিরিক্ত তীব্র বলিয়া মনে হয়, কেন না যে হতভাগ্য পুরুষ এই বিদ্রূপমিশ্রিত অবজ্ঞার পাত্র হইয়াছে, তাহার নিজের ততটা অপরাধ নাই, সে সমগ্র পুরুষজাতির প্রতিনিধি-স্বরূপেই এই অগ্নিবাণ হজম করিতে বাধ্য হইয়াছে।

'পাত্র ও পাত্রী' গল্পটিও স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষের নির্মম ব্যবহারের প্রতিবাদ, কিন্তু এই প্রতিবাদের ঝাঁজের মধ্যে সত্যের তিক্ততা অধিক পরিমাণে আছে। গল্পের যে অংশ আমাদের হৃদয়ে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়, তাহা স্ত্রীজাতির উপর পুরুষের কাপুরুষোচিত আস্ফালন, সমাজচ্যুতার বিবাহে বিঘ্ন নহে। এখানেও রবীন্দ্রনাথের গভীর মন্তব্যগুলি ভাব-গভীরতার অভাব পূরণ করে—যেখানে তিনি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করেন না, সেখানেও তাঁহার বুদ্ধির খরধার তীক্ষ্ণতায় চমৎকৃত করিয়া থাকেন।

'পয়লা নম্বর' প্রধানতঃ অদ্বৈতচরণের individuality বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অভিব্যক্তি—তাঁহার নিশ্চিন্ত ও একাগ্র জ্ঞানানুশীলনের পশ্চাতে যে একটি ক্ষুব্ধ নারী-হৃদয় নীরব বিদ্রোহে প্রধূমিত হইতেছিল, তিনি সে বিষয়ে একেবারেই অন্ধ ও উদাসীন। অনিলা বরাবরই

অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে—তাহার পক্ষের কথা ভাল করিয়া বোঝান হয় নাই। অদ্বৈতচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতি সিতাংশুমৌলির ; সে নিজ সহজ ক্ষমতা-বলে পরকে নিজের কাছে টানিতে পারে, ঐশ্বর্যপ্রাচুর্যই তাহার একমাত্র আকর্ষণ নহে। এই সহজ উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগের বলে সে অনিলারও চিত্ত জয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। অনিলার নিকট কোন সাড়া পায় নাই, কিন্তু তাহার নিশ্চল শান্তিকে বিচলিত করিয়া তাহাকে গৃহছাড়া করিয়াছে। এই গল্পটিতে দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণ-চেষ্টা থাকিলেও, মোটের উপর ইহা বিপরীতপ্রকৃতি ব্যক্তিদ্বয়ের চরিত্রচিত্রণ।

'নামঞ্জুর' গল্পে 'ঘরে বাইরে'র ন্যায় আমাদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও বিপ্লববাদের ফাঁকা দিক্‌টা দেখান হইয়াছে, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির পক্ষে দেশমাতৃকার সেবার মধ্যে যে খ্যাতির লোভ প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা তাহাদিগকে সাংসারিক ছোটখাট স্নেহযত্নমণ্ডিত কাজের প্রতি বিমনা করিয়া তাহাদের স্ত্রীজাতিসুলভ কমনীয়তা ও মাধুর্যের হানি করিয়া থাকে। মিটিং করিয়া ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান ও গৃহে রুগ্‌ণ ভ্রাতার সেবায় অবহেলা—এই দুইয়ের মধ্যে যে একটা বিরাট্ ফাঁকির ব্যবধান আছে তাহা আমাদের সাধারণ আন্দোলনগুলির অন্তঃসারশূন্যতাই প্রমাণ করে।

এই শেষের কয়েকটি গল্পের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ অতি আধুনিক লেখকদের মধ্যে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের জাতীয় জীবনে যে সমস্ত সমস্যার নবীন উদ্ভব হইতেছে, তাহারা এখন পর্যন্ত হৃদয়ের গভীর স্তরে কাটিয়া বসিবার সময় পায় নাই, এখনও অন্তরের মাধুর্য-রসে অভিষিক্ত হয় নাই। সুতরাং তাহাদের বর্তমান আলোচনায় হৃদয় অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তিরই প্রাধান্য। কালে ইহারাই আমাদের অন্তরতম প্রদেশে অধিষ্ঠিত হইবে। ইহাদিগকে ঘিরিয়াই আমাদের গভীরতম আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি বিকশিত হইয়া উঠিবে, ইহারাই মানুষের হৃদয়গত যোগসূত্র হইয়া নূতন সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিবেশ রচনা করিবে। সুতরাং ইহারাই যে নূতন যুগের সাহিত্যের ভিত্তিস্থাপন করিবে তাহা একরূপ নিশ্চিত।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্পগুলি পর্যালোচনা করিয়া আমরা তাঁহার প্রসার ও বৈচিত্র্যে চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারি না। আমাদের পুরাতন ব্যবস্থা ও অতীত জীবনযাত্রার সমস্ত রসধারা অগস্ত্যের মত তিনি এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া নিঃশেষ করিয়াছেন—বাংলার জীবন ও বহিঃপ্রকৃতি তাহাদের সৌন্দর্যের কণামাত্রও তাঁহার আশ্চর্য স্বচ্ছ অনুভূতির নিকট হইতে গোপন করিতে সমর্থ হয় নাই। অতীতের শেষ শস্যগুচ্ছ ঘরে তুলিয়া তিনি ভবিষ্যতের ক্রমসঞ্চীয়মান ভাবসম্পদের দিকে অঙ্গুলিসংকেত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলার সাহিত্য-ভাণ্ডারে যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার বীজ বপন করিয়াছেন তিনি নিজে, কিন্তু তিনি যে বীজ বপন করিয়া গেলেন, তাহার পরিণত ফল কোন্ ভাগ্যবান্ আহরণ করিবে তাহা এখন আমাদের কল্পনারও অতীত। তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় সমগ্র দেশ অনিমেষ-নয়নে ভবিষ্যৎ কালের দিকে চাহিয়া থাকিবে।

অষ্টম অধ্যায়

প্রভাতকুমারের উপন্যাস

(১)

বঙ্গসাহিত্যে ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বোধ হয় জনপ্রিয়তার দিক্ দিয়া তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক নহেন। তাঁহার কোন উপন্যাসে গভীর আবেগের চিত্র বা তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-কুশলতার পরিচয় নাই। তিনি হৃদয়ের গভীর স্তরে, তীব্র চিত্ত-বিক্ষোভের ঘূর্ণীর মধ্যে কদাচিৎ অবতরণ করেন। তাঁহার কারবার জীবনের উপরিভাগের ক্ষুদ্র চাঞ্চল্য, লঘু হাস্য-পরিহাস ও রঙ্গিন বৈচিত্র্য লইয়া। কিন্তু তাঁহার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য অবিসংবাদিত। আমাদের বাঙ্গালীর স্বল্প-পরিসর জীবনে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈষম্য ও অসংগতি, যে অলীক আশা ও কল্পনা, যে অতর্কিত দৈব-সংঘটন ও ভুলভ্রান্তি হাস্যরসের উপাদান সৃষ্টি করে, সেগুলির উপর তাঁহার অধিকার অকুণ্ঠিত। তাঁহার উপন্যাসে কোন তীক্ষ্ণ-কণ্টকিত সমস্যা মনকে বিদ্ধ করে না, কোন হৃদয়-গত প্রহেলিকা বিভীষিকাময় ছায়া বিস্তার করে না, শোক-মৃত্যুর অসহনীয় তীব্রতা চিত্তকে ভারাক্রান্ত করে না। তাঁহার উপন্যাসের পৃষ্ঠায় যে জীবন-যাত্রার আমরা সন্ধান পাই, তাহার লঘু, তরল প্রবাহ, সরল, নির্দোষ হাস্য-পরিহাস, সমস্যা-ভারমুক্ত স্বচ্ছন্দগতি আমাদিগকে মুগ্ধ করে ও জীবনের যে আর একটা দুর্ভেদ্য সমস্যা-সংকুল দিক্ আছে তাহা আমরা সাময়িকভাবে বিস্মৃত হই।

প্রভাতকুমার উপন্যাস ও ছোট গল্প এই দুই রকমই লিখিয়াছেন, কিন্তু মোটের উপর তাঁহার কৃতিত্ব উপন্যাস অপেক্ষা ছোট গল্পেই বেশি। ঔপন্যাসিক হিসাবে তিনি তাদৃশ সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই, কেন-না, একটা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে যতটা বিশ্লেষণ-কৌশল ও গভীর সমস্যা আলোচনার ক্ষমতা থাকা দরকার তাহা তাঁহার নাই। তাঁহার উপন্যাসগুলি অধিকাংশ স্থলেই চরিত্র-সৃষ্টি অপেক্ষা ঘটনা-বিন্যাসের উপরই বেশি ঝোঁক দিয়াছে। তাহাদের অন্তর্নিহিত রস প্রায়ই গভীরতা হারাইয়া ফিকে হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের মধ্যে উপন্যাসোচিত বিস্তার ও গভীরতার একান্ত অভাব। তাঁহার উপন্যাসগুলি পড়িলে মনে হয়, যেন ছোট গল্পের উপযুক্ত স্বল্প-পরিমাণ আখ্যানবস্তুকে কেবল ঘটনা-সমাবেশের দ্বারা অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত করা হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রগুলির প্রাণস্পন্দন নিতান্ত ক্ষীণ; সংকল্পের দৃঢ়তা, চরিত্রগৌরব, বাহ্য-ঘটনা-নিয়ন্ত্রণের শক্তি তাহাদের মধ্যে বিশেষ পাওয়া যায় না। তাহারা প্রায়ই ঘটনাপ্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়া কেবলমাত্র অনুকূল দৈববলেই সৌভাগ্যের তীরে ভিড়িয়া থাকে। তাঁহার প্রণয়-চিত্রের মধ্যে আবেগ-গভীরতা ও আবিলতা উভয়েরই অভাব। প্রেম তাঁহার নায়ক-নায়িকার মনে একটা ক্ষীণ ঔৎসুক্য, একটা অতি মৃদু রকমের অশান্তি জাগাইয়া থাকে। তাহার আত্মবিস্মৃত মত্ততা ও প্রলয়ংকর আবেগের কোন

চিত্রই তাঁহার উপন্যাসে পাওয়া যায় না। হৃদয়ের গভীর তলদেশ মন্থন করিয়া সুধা বা হলাহল কোনটাই তিনি আহরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার সূক্ষ্ম, সুকুমার পরিমিতি-বোধ, তাঁহার অতন্দ্র সুরুচি-জ্ঞান, সকল প্রকারের আতিশয্যের সম্ভাবনা হইতে সভয়ে পিছাইয়া গিয়াছে। এমন কি তাঁহার উপন্যাসের দুষ্ট লোকেরাও (Villain) তাঁহার স্নিগ্ধ ক্ষমাশীল সহানুভূতির দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছে—তিনি কাহাকেও সম্পূর্ণ মন্দরূপে চিত্রিত করিতে পারেন নাই। 'রত্নদীপ'-এ খগেন, 'নবীন সন্ন্যাসী'তে গদাধর—ইহারাও লেখকের স্নেহপূর্ণ সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয় নাই; ইহাদের দুরন্তপনাকে তিনি অনেকটা ক্ষমার চক্ষে, অনেকটা কৌতুকমিশ্রিত অসমর্থনের ভাবে দেখিয়াছেন। ইহাদের ভিতরে যে সুবিধাবাদ অপরের অজ্ঞতা বা অমনোযোগিতার সুযোগ লইয়া নিজের অবস্থা ফিরাইবার চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছে, তাহাকে তিনি নীতিবাদের কঠোর আদর্শে বিচার করেন নাই, তাহার লোকচরিত্রাভিজ্ঞতা ও উপায়-উদ্ভাবন-কৌশল তাঁহার প্রশংসাকেও জাগাইয়া তুলিয়াছে। এই সহানুভূতি, কঠোর নীতি-বিচারের অভাব, এই পাপ-পুণ্যের প্রতি অপক্ষপাত সমদর্শিতা ও পাপের প্রতি মৃদু, সস্নেহ তিরস্কার তাঁহার উপন্যাসের আকর্ষণের একটি প্রধান হেতু।

এই সমস্ত সাধারণ মন্তব্যের উদাহরণ-স্বরূপ তাঁহার উপন্যাসগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনাই যথেষ্ট হইবে। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'রমাসুন্দরী' বঙ্গাব্দ ১৩০৯ হইতে ১৩১০-এর মধ্যে মাসিক পত্রিকা 'ভারতী'তে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়; ১৩১৪ সালে উহা প্রথম গ্রন্থরূপে মুদ্রিত হয়। এই উপন্যাসে প্রথম প্রথম চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের কতকটা প্রাধান্য লক্ষিত হয়। নায়িকা রমাসুন্দরীর বাল্য-জীবনে তাহার দুর্দান্ত পৌরুষ ও নারী-সুলভ লজ্জা-সংকোচের অভাব তাহার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদিগকে কতকটা আশান্বিত করিয়া তোলে, কিন্তু দুঃখের বিষয় ভবিষ্যৎ পরিণতি এই আশা পূর্ণ করে না। বিবাহের পরই রমাসুন্দরী তাহার সমস্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া সাধারণ স্নেহশীলা পত্নীতে রূপান্তরিত হইয়াছে; ঘটনা-বৈচিত্র্য চরিত্র-স্বাতন্ত্র্যকে অভিভূত করিয়াছে। কুটিল চক্রান্ত-কুশল সীতানাথ ও তাহার মাতা তাহার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উপন্যাস হইতে চির-নির্বাসিত হইয়াছে। কান্তিচন্দ্রের কঠোরতাও উপন্যাসের মধ্যে বিশেষ কোন জটিলতার সৃষ্টি না করিয়াই পুত্র-স্নেহে দ্রবীভূত হইয়াছে—নবগোপালের দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ স্বাধীন-চিত্ততাও বিবাহের পর কোন নূতন কৃতিত্ব-প্রদর্শনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া নিষ্ক্রিয়ত্বের জন্য নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। মোট কথা, বিবাহের পর উপন্যাসটি নিজ অস্তিত্ব হারাইয়া ভ্রমণকাহিনীতে পর্যবসিত হইয়াছে—কাশ্মীর-ভ্রমণের সৌন্দর্যবর্ণনার মধ্যে উপন্যাসের নিজস্ব রস তলাইয়া গিয়াছে।

'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসে (১৩১৯) সর্বাপেক্ষা জীবন্ত চরিত্র গদাই পালের—অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর চরিত্রগুলি তাহার সহিত তুলনায় নির্জীব ও রক্তহীন বলিয়া মনে হয়। আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের জটিল ব্যবস্থার মধ্যে নায়েব-গোমস্তা জাতীয় একপ্রকার জীবের উদ্ভব হইয়াছে—ঔপন্যাসিক ইহাদের মধ্যে নিজ আর্টের যথেষ্ট মৌলিক উপাদান আবিষ্কার করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রায় কোন ঔপন্যাসিকই এই জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্ব ও মূল্য সম্বন্ধে সেরূপ সচেতন না হইয়া কেবল মামুলী নায়ক-নায়িকার চরিত্রের চর্বিত-চর্বণ

করিতেছেন। এক দীনেন্দ্রকুমার রায় নীলকুঠীর নায়েবের কার্যকলাপ ও নৈতিক বিশেষত্ব লিপিবদ্ধ করিয়া উপন্যাসের মধ্যে কতকটা নূতন রসের সঞ্চার করিয়াছেন। ইহাদের অদ্ভুত ষড়যন্ত্র-কৌশল, ক্ষুরধার বুদ্ধি, জালজুয়াচুরি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, প্রভৃতি সর্বপ্রকার পাপাচরণের প্রতি অতিশয় প্রবণতা, অথচ একপ্রকারের বিকৃত প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততা, মিথ্যাচারে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়াও ধর্মের বাহ্যানুষ্ঠানের প্রতি একান্ত ভক্তি,স্বাভাবিক নেতৃত্বশক্তি ও লোকবশীকরণের আশ্চর্য ক্ষমতা—এই সমস্ত ভাল-মন্দ মিশাইয়া ইহাদের চরিত্রে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ও জটিলতা আনিয়া দিয়াছে যাহা ঔপন্যাসিকের পক্ষে অত্যন্ত স্পৃহণীয়। আমাদের পল্লীজীবনে ইহাদেরই প্রভাব সর্বাপেক্ষা প্রবল—ইহারাই পল্লীজীবনের কাপুরুষতা, নৈতিক জড়তা, হেয় দাসত্বপ্রবণতা ও কপট মিথ্যাচারের জন্য সর্বাপেক্ষা দায়ী। পল্লীজীবনের বিষ-জর্জর ও লাঞ্ছনা-মূর্ছিত যে মূর্তি আমাদের অতি পরিচিত, ইহারাই তাহার শিল্পী ও স্রষ্টা। মোট কথা, আমাদের মৃতপ্রায় নিষ্ক্রিয় সমাজে এই জাতীয় লোকের মধ্যেই কিছু প্রাণস্পন্দন, কিছু বিপথগামী উদ্যমশীলতা ও কর্মশক্তি, কিয়ৎ-পরিমাণ বিকৃত রাজনীতি ও কূট-কৌশল, স্রোতোহীন শুষ্কপ্রায় জলাশয়ে দূষিত জলের মত সঞ্চিত ছিল।

গদাইপাল এই শ্রেণীর লোকের অতি চমৎকার প্রতিনিধি। তাহার চরিত্রটি উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি-কৌশলের নিদর্শন। সাধারণতঃ প্রভাতকুমারের চরিত্রসৃষ্টি অত্যন্ত অগভীর, কিন্তু গদাই-এর চরিত্রের সমস্ত অলিগলি, তাহার মনের সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অতি স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তাহার প্রতিভা বহুমুখী, তাহার দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী, তাহার কর্মশক্তি নব নব প্রণালীতে প্রবহমান। হরিদাসীর সহিত তাহার প্রেমাভিনয়, জমিদার গোপীকান্ত-বাবুর রহস্যোদ্ভেদ, রমণ ঘোষের প্রতি বৈর-নির্যাতনের জন্য তাহার কৌশল-জাল-বিস্তার—সমস্তই অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয়। গদাইপাল মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত সর্বাঙ্গে প্রাণের তড়িত-শক্তিতে পূর্ণ—তাহার প্রত্যেক ইঙ্গিত, প্রতি অঙ্গভঙ্গি হইতে প্রাণের উজ্জ্বল দীপ্তি বিস্ফুরিত হইতেছে। তাহার প্রখর ঔজ্জ্বল্যে অন্যান্য সমস্ত চরিত্র নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থের নায়ক মোহিত ও নায়িকা চিনির ক্ষীণ ব্যক্তিত্ব আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে পারে না। মোহিতের সন্ন্যাস-গ্রহণে আন্তরিকতার অভাব নাই, অভাব আছে আত্মজ্ঞানের, নিজ শক্তির সীমা-নির্ধারণের—লেখক তাহার এই কৃচ্ছ্রসাধনের উপর একপ্রকার স্নিগ্ধ, কৌতুকমণ্ডিত বিদ্রূপ-কটাক্ষপাত করিয়াছেন। গ্রন্থের মধ্যে মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদ উহার গঠন-গত ঐক্যের অভাব প্রচার করিতেছে। মোটের উপর 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসটি সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক—গদাইপালের চরিত্র ইহাকে উৎকর্ষের উচ্চতর স্তরে লইয়া গিয়াছে।

প্রভাতকুমারের বৃহৎ উপন্যাসের মধ্যে 'রত্নদীপ' ও 'সিন্দূরকৌটা' এই দুইটিকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া যাইতে পারে। 'রত্নদীপ' উপন্যাসটি যদিও ঘটনা-বৈচিত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তথাপি মোটের উপর চরিত্রমাধুর্য আমাদের মনে গভীরতর রেখাপাত করে। রাখালের অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যকে ছাড়াইয়া তাহার চরিত্র-সংযম ও আত্মবিসর্জনকারী প্রণয়সঞ্চারই আমাদিগকে অধিকতর অভিভূত করে। বৌরাণীর চরিত্রে কোমল, বিষাদমণ্ডিত মাধুর্যের সহিত অবিচলিত পাতিব্রত্যের সুন্দর সমন্বয় হইয়াছে। এই উপন্যাসে প্রভাতকুমার নিজ

স্বভাবসিদ্ধ বিশ্লেষণ-গভীরতার অভাবকে অতিক্রম করিয়াছেন—বৌরাণীর জীবনের করুণ ব্যর্থতার সূক্ষ্ম উপলব্ধি ও সুন্দর চিত্র আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। নিজ স্বামী-জ্ঞানে রাখালের প্রতি তাঁহার যে ভাবপ্রবাহ তরঙ্গিত হইয়াছিল, ভুল ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই সেই উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ সংহরণ করা মনস্তত্ত্ব-সম্ভব কি না, আলোচনার দিক্ দিয়া এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু যাহাদের অশান্ত প্রবৃত্তি চিরজীবনব্যাপী কঠোর আত্মদমন দ্বারা বশীকৃত হইয়াছে, এক মুহূর্তের মধ্যে চিরাভ্যস্ত সংযম-শাসন মানিয়া লওয়ার মধ্যে তাহাদের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই। প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতাও যেমন মৌলিক সত্য, সংযমের অনুল্লঙ্ঘনীয় অনুশাসনও সেইরূপ আর একটি অবিসংবাদিত সত্য। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে খগেন খুব জীবন্ত হইয়াছে—তাহার বুদ্ধি-কৌশল ও রহস্যভেদে অসীম নিপুণতা আমাদিগকে গদাইপালের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অথচ খগেনকে একেবারে অবিমিশ্র পাষণ্ডরূপে দেখান হয় নাই—তাহার চরিত্রের প্রতিও লেখকের সহানুভূতি অনুভব করা যায়; কনক ও সুরবালার চরিত্রও বেশ ফুটিয়াছে, ঘটনার চাপে প্রাণস্পন্দন মন্দীভূত হয় নাই। মোট কথা 'রত্নদীপ' প্রভাতকুমারের সৃষ্টিশক্তির মধ্যে যে একটা উচ্চতর সম্ভাবনা ছিল তাহার পরিচয় দেয়।

'সিন্দূরকৌটা' উপন্যাসটি প্রকৃতপক্ষে ভ্রমণ-কাহিনী। ইহার একমাত্র ঔপন্যাসিক অংশ সুশীর সহিত বিজয়ের প্রণয়সঞ্চার-কাহিনী। স্বামী-পরিত্যক্তা সুশীর প্রতি বিজয়ের মনোভাব, সহানুভূতি, আশ্রয়দান, প্রভৃতি পর্যায়ের ভিতর দিয়া কিরূপে প্রণয়ে পৌছিল তাহার বর্ণনাটি বেশ মনোজ্ঞ, মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দিক্ দিয়া খুব গভীর না হইলেও নিখুঁত। তবে এই দ্বিতীয় স্ত্রী পরিগ্রহের পূর্বে বিজয়ের মনে দ্বন্দ্বসংঘাতের মধ্যে সেরূপ কোন প্রবলতা নাই। প্রথম স্ত্রীর চিন্তায় সে অল্প একটু ইতস্ততঃ করিয়াছে মাত্র, কিন্তু মন স্থির করিতে তাহার বিশেষ বিলম্ব হয় নাই। বকুরাণীর শান্ত নির্বিকারত্ব ও স্বামীর সুখের জন্য আত্মবিসর্জন-তৎপরতা তাহাকে আদর্শ হিন্দু স্ত্রীর পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে সত্য, কিন্তু উপন্যাসটির প্রাণস্পন্দনকে অত্যন্ত ক্ষীণ ও মন্দীভূত করিয়া দিয়াছে। একমাত্র পল সাহেবের চরিত্র-বিশ্লেষণই উপন্যাসের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে—তাহার নির্লজ্জতা, আত্মসম্মানবোধের একান্ত অভাব, স্ত্রীকে পণ্যদ্রব্যের ন্যায় বেচা-কেনার সামগ্রী মনে করার প্রবৃত্তি, প্রভৃতি গুণের সমাবেশে তাহারই চরিত্রটি ফুটিয়াছে ভাল।

প্রভাতকুমারের অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যেও পূর্বোক্ত রকমের দোষগুণ বর্তমান আছে, তাহাদের বিস্তৃত সমালোচনা অনাবশ্যক। 'জীবনের মূল্য' (১৩২৩) উপন্যাসে তিনি একটি অবিমিশ্র ট্র্যাজিডি রচনা করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তদুপযুক্ত সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও আবেগ-গভীরতা না থাকাতে এই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারে উপর্যুপরি যে কয়েকটি দৈব-দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহারা একেবারে আকস্মিক—কোনরূপ মনস্তত্ত্বমূলক কার্য-কারণ-শৃঙ্খলায় গ্রথিত নয়। সুতরাং এই সম্পূর্ণ দৈবাধীন বিপদ্‌পরম্পরা আমাদের মনে কোন গভীর রেখাপাত করিতে পারে না; একপ্রকার বিস্ময়-বিমূঢ় হতবুদ্ধিভাব ছাড়া কোন গভীরতর চিন্তাধারা বা সহানুভূতির উদ্রেক করে না। বিয়ে-পাগলা বুড়ো গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের অভিশাপ মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া বৈধ বা পর্যাপ্ত কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না—কেন না এই অভিশাপ-বর্ণনায়, বা অভিশপ্ত ব্যক্তিদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার বিবরণে কোনও রূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের, মনোরাজ্যের গভীর তলদেশে অবতরণের নিদর্শন নাই। এই মুখোপাধ্যায়ও

অবিমিশ্র কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত হয় নাই—তাহার অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত-চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও আন্তরিক ; তাহার প্রতি আমাদের ঘৃণা অপেক্ষা সহানুভূতিরই প্রাধান্য অনুভূত হয়। উপন্যাস মধ্যে যে চরিত্রটি সর্বাপেক্ষা জীবন্ত, সে উপন্যাসের কার্যকলাপের সহিত একেবারে নিঃসম্পর্কিত, যে একেবারে অনাবশ্যক, বাহিরের লোক, সে সতীশ দত্ত—তাহার সংস্কৃত শ্লোকোদ্ধারে নিপুণতা, তাহার চাটুকারবৃত্তির সূক্ষ্ম কারুকার্য, মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ-বাসনায় ইন্ধন যোগাইবার কৌশল, অথচ তাহার প্রতি এক প্রকারের আন্তরিক আকর্ষণ ও সহানুভূতি তাহাকে আমাদের অন্তর-জগতের প্রতিবাসীরূপে অধিষ্ঠিত করিয়াছে।

'মনের মানুষ'-এ কুঞ্জের ছেলেমানুষী ও কুসংস্কার-প্রবণতা, জ্যোতিষশাস্ত্রে ও দৈব-ক্রিয়ায় তাহার অগাধ বিশ্বাস, ইন্দুবালার প্রতি তাহার প্রণয়াভিলাষের কৌতুককর অসংগতি ও অবশেষে কিরণের সহিত, আদর্শবাদের উচ্চ শিখর হইতে বহুনিম্নে সাংসারিকতার সমতল ভূমিতে, তাহার যোগ্য-মিলন—বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। সমস্ত চিত্রটির মধ্যে সস্নেহ কৌতুক-রসের অবিরত প্রবাহ ইহাকে যোগেন্দ্র-ইন্দুবালার নাটকোচিত মিলন-কাহিনী অপেক্ষা অধিকতর সরস ও চিত্তাকর্ষক করিয়াছে। 'আরতি', 'সত্যবালা', ও 'গরীব স্বামী' উপন্যাসগুলিতে চরিত্রাঙ্কনের বিশেষ চেষ্টা নাই, তাহারা সম্পূর্ণরূপে আখ্যান-বৈচিত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—তাহারা প্রভাতকুমারের ঔপন্যাসিক খ্যাতি-বর্ধনে আদৌ সহায়তা করে না।

(২)

ছোট গল্প রচনায় প্রভাতকুমারের সিদ্ধহস্ততা সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। আমাদের সংকীর্ণ বাঙ্গালীজীবনে বৃহৎ উপন্যাস অপেক্ষা ছোট গল্পের স্বাভাবিকতা ও উপযোগিতা সহজেই লক্ষিত হয়। সাধারণতঃ আমাদের জীবনে সমস্যা এত সুদূরপ্রসারী হয় না, যাহাতে তাহাদের বিস্তারিত আলোচনার জন্য পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের প্রয়োজন হয়। আমাদের জীবনে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের ঢেউ লাগে, যে ছোটখাট সমস্যার স্পর্শে ইহা হিল্লোলিত হয়, আশা ও কল্পনা, উচ্চাভিলায ও কর্মশক্তি যে ক্ষণস্থায়ী প্রেরণা জাগাইয়া তোলে, আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে যে বৈষম্য হাস্যরসের সৃষ্টি করে—তাহার সমস্ত বুদ্‌বুদ ও উত্তেজনা ছোট গল্পের ক্ষুদ্র পেয়ালায় বেশ স্বচ্ছন্দে ও সুশোভনভাবে ধরিয়া রাখা যায়। এই ছোট গল্পের আর্টে প্রভাত-কুমারের স্বাভাবিক নিপুণতা বিস্ময়কর। তাঁহার অগভীর আলোচনা-প্রবণতাও ছোট গল্পের উৎকর্ষলাভে সহায়তা করিয়াছে। জীবনের খণ্ডাংশনির্বাচনে, তাহার ছোটখাট বৈষম্য-অসংগতির উদ্‌ঘাটনের দ্বারা তাহার উপর মৃদু হাস্যকিরণ-সম্পাতে, আলোচনার লঘু-কোমল স্পর্শে, দ্রুত অথচ অকম্পিত রেখাঙ্কনে, সকল প্রকার গভীরতা ও আতিশয্যের সযত্ন পরিহারে, আকস্মিক অথচ অভ্রান্ত যবনিকাপাতের সমাপ্তি-কৌশলে—এই সমস্ত দিক্ দিয়াই তিনি উচ্চাঙ্গের নিপুণতার নিদর্শন দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যময় অনুভূতি, তাঁহার বিদ্যুৎ-শিখার ন্যায় তীব্র ও মর্মভেদী অন্তর্দৃষ্টি, তাঁহার অতিপ্রাকৃতের রোমাঞ্চ-উদ্‌বোধন, তাঁহার মানবচিত্তের অসীম রহস্যের মধ্যে বহিঃপ্রকৃতির আবাহন—ইত্যাদি উচ্চতর গুণের কিছুই প্রভাতকুমারের মধ্যে নাই। তথাপি তিনি তাঁহার ছোট গল্পের মধ্য দিয়া আমাদিগকে যে রাজ্যে লইয়া গিয়াছেন তাহাকে বয়স্কদের রূপকথার রাজ্য বলা যাইতে পারে। এখানে আমাদের চির-

পরিচিত সাধারণ জীবন আছে সত্য, কিন্তু তাহার দুর্বিষহ সমস্যাভার, তাহার দুর্ভেদ্য জটিলতা ও নিদারুণ অপ্রতিবিধেয়তা নাই। এখানে দুঃখ, দারিদ্র্য, জীবন-সংগ্রামের দুঃসহ কঠোরতার ইঙ্গিত আছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনুকূল দৈবের সুপ্রচুর প্রসাদও আছে। এখানে ট্রেনে লোকে লক্ষ টাকা কুড়াইয়া পায়, আবার বিশেষ গুরুতর অন্তর্দ্বন্দ্বের জ্বালা সহ্য না করিয়া প্রলোভন দমন করিয়া প্রকৃত মালিককে তাহা ফিরাইয়াও দেয়। এখানে গাড়িতে গহনার বাক্স হারাইয়া গেলে তাহা ভাবী পুত্রবধূর অঙ্কে গিয়া উঠে, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা লোভ জয় করিয়া সঙ্গে সঙ্গে সাধুতার পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এখানে অকালপক্ক বালক প্রেমে পড়িলে পিতার চপেটাঘাত ছাড়া আর কোনও দুষ্পাচ্যতর শাস্তি উপভোগ করে না এবং এই ঈষৎকষায় টনিকের সাহায্যে প্রণয়িনীর বিবাহে লুচি-সন্দেশ বেশ সহজেই হজম করিয়া থাকে। এখানে দারিদ্র্য বিশেষ মারাত্মক নহে, কেননা ইহা সঙ্গে সঙ্গে ইহার উদ্ধারকর্তাকেও আবাহন করিয়া আনে; এ রাজ্যে মুশকিল ও মুশকিল-আসান পরস্পর হাত-ধরাধরি করিয়া প্রীতি-নৃত্য করে। এখানে পৌরাণিক যুগের ন্যায় বিদেশ-ভ্রমণ-কালে প্রেয়সী-লাভও ঘটিয়া থাকে, এবং বর্তমান যুগের যে কঠোর সমাজ-ব্যবস্থার লৌহজাল প্রেমের পথে অন্তরায়, তাহারা মায়াবলে অপসারিত হয়। অথচ ইহারা আমাদের বাস্তবজীবনেরই নিখুঁত ছবি; দৈবানুকূল্য ও লেখকের স্নেহ-প্রীতিপূর্ণ ব্যবস্থার দক্ষিণা-বাতাসে এই উষর ভূমিখণ্ডই এরূপ শ্যামশ্রী-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রভাতকুমারের ছোট গল্পগুলির বিস্তৃত সমালোচনা অল্প পরিসরের মধ্যে অসম্ভব। তাঁহার অধিকাংশ গল্পই হাস্যরস-প্রধান। এই হাস্যরস কেবলমাত্র ঘটনামূলক অসংগতির সহিত নহে, চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সহিতও সম্পর্কান্বিত। সুপ্রসিদ্ধ 'বলবান্ জামাতা' গল্পটির আকর্ষণ কেবল যে শ্বশুরবাড়ি-বিষয়ক হাস্যকর ভ্রান্তির জন্য তাহা নহে, নলিনীর নিজ রমণীসুলভ কমনীয়তার কলঙ্ক-ক্ষালনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞাও তাহার অন্যতম কারণ। প্রায় সমস্ত গল্পেই অপ্রত্যাশিত ঘটনার সুনিপুণ বিন্যাস হাস্য-রসকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তোলে। 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে এক রণরঙ্গিণী স্ত্রীর মৃত্যুর পর পর্যন্ত স্বামী বেচারার উপর নিজ দাম্পত্য অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার কৌশল-উদ্ভাবন বড়ই কৌতুককর পরিণতির হেতু হইয়াছে। অভ্রান্ত পূর্ব-অনুমান বলে সে স্বামীর সম্ভাবিত দ্বিতীয় বিবাহের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের উপযোগী এক একখানি পত্র নিজ বর্ণাশুদ্ধিচিহ্নিত, সুপরিচিত হস্তাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া মৃত্যুর পরে তাহাদের স্বামীর নিকট পৌছাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। এই অদ্ভুত ভৌতিক পত্রাবলী লইয়া থিওজফিষ্ট মহলে যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা গল্পের উপভোগ্যতাকে আরও বাড়াইয়াছে। 'বায়ুপরিবর্তন' গল্পে সামান্য দু'-একটি রেখাপাতের দ্বারাই হরিদনের পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষ্যাপ্রবণতা ও নীচাশয়তার সুস্পষ্ট চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তথাপি তাহার দ্বারা প্রতারিত তাহার ভাবী শ্বশুর যে ঔদার্যে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাকে গাড়িভাড়া বাবদ পাঁচ টাকা দান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যেন ঔপন্যাসিকেরই শুভাভিষিক্ত ও প্রতিনিধির ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন।

এই জাতীয় কতকগুলি গল্পে parody বা বিদ্রূপাত্মক অনুকরণের দ্বারা হাস্য-রস উদ্রিক্ত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'-এর ঘনপত্রান্তরালে যে একটি হাস্যকর সম্ভাবনার ফুল আত্ম-গোপন করিয়াছিল, প্রভাতকুমারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে তাহা অতিক্রম করে নাই। যে বৈষ্ণবীর ছদ্মবেশ নগেন্দ্রনাথের সংসারে সর্বনাশের বীজ বপন করিয়াছিল, তাহা কয়েকটি নাটক-নভেল-

পড়া, উত্তেজিত-মস্তিষ্ক, তরলমতি যুবকের মনে একটা উদ্ভট খেয়ালের সৃষ্টি করিয়া নির্দোষ প্রাণ-খোলা হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়াছে। 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের ঐ নামের গল্পের ঠিক বিদ্রূপাত্মক অনুকরণ না হইলেও উভয়ের রীতি-পার্থক্যের সুন্দর উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাস্টার বর্ষাঘন নির্জন সন্ধ্যায় এক অনাথা বালিকার সহিত নিজের একটা অবিচ্ছেদ্য প্রীতি-সম্পর্ক রচনা করিয়াছিল; প্রভাতকুমারের পোস্টমাস্টার অপরের প্রেমপত্র চুরি করিয়া পড়িয়া বিকৃত রোমান্স-প্রবণতার চরিতার্থতা সম্পাদন করে। চোরাই পত্রের সংকেতানুযায়ী প্রেমাভিসার তাহার পক্ষে কতকটা হাস্যকর, কতকটা শোকাবহ পরিণতির সৃষ্টি করিয়াছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেখকের স্নিগ্ধ সহানুভূতি তাহার কৃতকর্মের পুরস্কাররূপে তাহার পদোন্নতি-বিধানই করিয়াছে; অপরের চিঠি ও সরকারী টাকা চুরি করিয়াও স্বদেশী ডাকাতির অজুহাতে সে ইন্‌স্পেক্টর পদে উন্নীত হইয়াছে।

কয়েকটি গল্পে মানুষের অসম্ভব প্রতিজ্ঞা ও উদ্ভট কল্পনা বাস্তবতার সংঘাতে ধূলিশায়ী হইয়া হাস্য-রসের সৃষ্টি করিয়াছে। 'প্রতিজ্ঞা-পূরণ' গল্পে কলেজের নব্য যুবক ভবতোষ হঠাৎ আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কুৎসিত স্ত্রী বিবাহ করিবে বলিয়া দুর্জয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, এবং কন্যা-নির্বাচন পর্যন্ত তাহার এই দারুণ সংকল্প অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। কিন্তু বিবাহের দিন যতই নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে, ততই তাহার সংকল্প শিথিল হইয়া পড়িয়াছে—শেষে যখন সে জানিতে পারিয়াছে যে, জুয়াচুরি করিয়া তাহাকে সুন্দরীর পরিবর্তে কুদর্শনা মেয়ে দেখান হইয়াছিল তখন সে কয়েক-দিবসব্যাপী দুশ্চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে। সেইরূপ 'নিষিদ্ধ ফল' গল্পে সমাজ-সংস্কারক পিতা ষোল বৎসরের পূর্বে পুত্রবধূর সহিত পুত্রের মিলন কিছুতেই ঘটিতে দিবেন না বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতির আকর্ষণ তাঁহার নিষেধাজ্ঞা অপেক্ষা শতগুণ বলবান্—শেষ পর্যন্ত ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে; এবং প্রকৃতির ছন্দে মিল রাখিয়া তাঁহাকে তাঁহার বই সংশোধন করিয়া 'ষোলোর' স্থানে 'চৌদ্দ' লিখিতে হইয়াছে। 'বউচুরি' গল্পেও এইরূপেই প্রকৃতির নিকট আত্মসমর্পণের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে—স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নিরোধ-চেষ্টা ব্যর্থ কৃচ্ছ্রসাধনের উপহাস্যতা লাভ করিয়াছে।

কতকগুলি গল্পে আমাদের অতিপ্রাকৃতে অন্ধবিশ্বাস হাস্যকর অবস্থা-সংকটের হেতু হইয়াছে। 'খোকার কাণ্ড'-এ গোঁড়া ব্রাহ্ম হরসুন্দরবাবুর হিন্দু কুসংস্কারাচ্ছন্ন পত্নী স্বামীর আরোগ্যার্থ শিবপূজা করিতে গিয়াছেন—ইতিমধ্যে স্বামীর সঙ্গে তাঁহার আকস্মিক সাক্ষাৎ। খোকার পিতৃসম্বোধন পত্নীর অবগুণ্ঠনের অন্তরালে আত্মগোপন-চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। 'যজ্ঞ-ভঙ্গ'-এ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের প্রাণনাশের জন্য এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর সাহায্যে মারণ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছে; কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোন আত্মীয়-প্রমুখাৎ এই ব্যাপারের সন্ধান পাইয়া দাদার তান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ায় অন্ধবিশ্বাস ভাঙ্গিবার জন্য নির্দোষ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। এখানে কৌতুকরসের অবতারণা খুব স্বাভাবিক হয় নাই, তবে কনিষ্ঠের সৌকুমার্য ও উদারতার চিত্রটি দুই-এক কথায় বেশ ফুটিয়াছে। 'সারদার কীর্ত্তি'তে পূর্বজন্মের মাতার পাদোদক-প্রার্থী পুত্রের তস্করবৃত্তি বেশ স্বাভাবিক হাস্য-রসের সঞ্চার করিয়াছে। 'খুড়া মহাশয়'-এ খুড়ার ভূতের ভয়ের সুযোগে একটা ঘোর সাংসারিক অবিচারের প্রতিকার হইয়াছে।

দুই-একটি গল্পে অবৈধ প্রণয়মূলক জটিলতার অবতারণা হইয়াছে, তবে প্রভাতকুমারের

স্বাভাবিক সংযম ও সুরুচি এই প্রণয়-বর্ণনাকে পঙ্কের মধ্যে অবতরণ করিতে দেয় নাই। 'লেডী ডাক্তার'-এ এক ইতর-প্রকৃতি স্ত্রীলোক একজন তরুণ-বয়স্ক ডেপুটীকে অবাধ মেলা-মেশায় প্রশ্রয় দিয়া জালে জড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে। ডেপুটীবাবু এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন যে, হিতৈষীদের সতর্কবাণীতেও তাঁহার চৈতন্য হয় নাই। ইতিমধ্যে খুব স্বাভাবিক উপায়েই স্ত্রীলোকটির স্বরূপ আবিষ্কৃত হইয়া যাওয়ায় ব্যাপারটির কল্যাণকর উপসংহার হইয়াছে। 'সচ্চরিত্র' গল্পে প্রভাতকুমারের সহিত আধুনিক বাস্তবতাবাদী ঔপন্যাসিকদের ব্যবধান সুপরিস্ফুট হইয়াছে। আধুনিক ঔপন্যাসিক যে অবস্থায় উচ্চাঙ্গের আর্টের ও সমাজনীতি-সমালোচনার অবসর পাইতেন, প্রভাতকুমার সেই অবস্থায় তাঁহার নায়ককে সমস্ত নায়কোচিত বীরত্ব ও স্বাধীনচিত্ততা বিসর্জন দিয়া আত্মরক্ষার্থ পলায়নতৎপর করিয়াছেন। পতিতার কন্যার সহিত প্রেমে পড়িয়া সুরেন মোটেই শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন সতীশের অনুকরণ করে নাই, কলিকাতার বার্ষিক বসন্ত-মহামারীর কল্যাণে সে নৈতিক আত্মরক্ষা করিয়া ঘরে ফিরিয়াছে। এই জাতীয় ছোট গল্প প্রভাতকুমারের সংগ্রহে খুব বেশি নাই—অবৈধ প্রণয়মূলক জটিলতাকে যতদূর সম্ভব তিনি পরিহার করিয়াছেন।

(৩)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রভাতকুমারের রচনায় ভাব-গভীরতার অভাব। কিন্তু কতকগুলি ছোট গল্পের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনা যায় না। 'বাল্য বন্ধু' গল্পে নলিনীর কঠোর জীবন-পরীক্ষা তাহার মনে বেশ একটু গভীর বিক্ষোভ ও আলোড়নই জাগাইয়াছে। 'কাশীবাসিনী' গল্পে বিপথ-গামিনী মাতার দুহিতৃস্নেহ গোপনতার অন্তরাল হইতে তীব্রবেগেই প্রবাহিত হইয়াছে। 'ভুল শিক্ষার বিপদ'-এ বক্তার শিশু-সুলভ সরলতা, যাহা বাহ্য শিষ্টাচারের মর্যাদা রক্ষা করে না, তাহার উৎকেন্দ্রিকতা (eccentricity) ও আপাত-রুক্ষ ব্যবহারই গল্পটির অন্তর্নিহিত করুণরসের আবেদনটিকে আরও মর্মস্পর্শী করিয়াছে। তাহার কমলালেবু-বর্জনের উদ্ভট খেয়াল হঠাৎ রূপান্তরিত হইয়া এক স্নেহ-কোমল, উদার হৃদয়ের করুণ শোকস্মৃতি-রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। 'আদরিণী' গল্পে মোক্তার জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের পৌরুষদৃপ্ত অথচ স্নেহ-বিগলিত চরিত্রটি উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি-প্রতিভার নিদর্শন। জয়রাম আমাদিগকে রবীন্দ্রনাথের নয়ন-জোড়ের বাবুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু কুসুমের ঠাকুরদাদার যে মনোবৃত্তি করুণ আত্ম-প্রতারণা ও অতীতের কল্পনা-বিলাসমাত্র, তাহা জয়রামের দৃপ্ত পুরুষকারের নিকট অর্জিত ঐশ্বর্যের বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। হাতিটি বিক্রয় করিবার সম্ভাবনায় যখন সে অশ্রু বিসর্জন করিয়াছে, তখন ইহা নিছক ভাবালুতা (sentimentality) মাত্র নহে, আত্মপৌরুষের পরাজয়-ক্ষোভ এই অশ্রু-প্রবাহকে লবণাক্ত করিয়াছে। ছোট জিনিসের সহিত বড়র তুলনা করিতে গেলে নেপোলিয়নের সিংহাসন-বর্জনের তীব্র গ্লানি ইহার মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে সঞ্চারিত হইয়াছে।

আর এক শ্রেণীর গল্পে ইংরাজ-সমাজের সম্পর্কে বঙ্গ তরুণদের মনে যে বিচিত্র সমস্যার উদ্ভব হয়, যে মদির উত্তেজনা সংক্রামিত হয় নানা দিক্ দিয়া তাহার আলোচনা হইয়াছে। দুই একটি গল্পে—যথা, 'মুক্তি' ও 'পুনর্মূষিক'-এ—বঙ্গযুবকের উচ্ছৃঙ্খলতা ও দায়িত্ববোধহীন আমোদপ্রিয়তার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। শেষোক্ত গল্পে মিস্ টেম্পলের হিন্দুধর্ম ও আচার-

অনুষ্ঠানের প্রতি মূঢ় অনুরাগ একজন হিন্দু-সন্তানের জীবনে কিরূপে ক্ষণস্থায়ী জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহারই কৌতুকপূর্ণ বর্ণনা আছে। 'বিলাত-ফেরতের বিপদ'-এ আমাদের বাঙ্গালী সমাজে বিলাতী আদব-কায়দার অজ্ঞতা এক বিবাহার্থী যুবকের পথ কিরূপে বিঘ্নসংকুল করিয়াছিল তাহাই চিত্রিত হইয়াছে।

আর কয়েকটি গল্পে বাহ্য বিক্ষোভ ছাড়িয়া অন্তর্দ্বন্দ্বের সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে। নিজ দেশ ও পরিচিত সমাজ-আবেষ্টনের মধ্যে যে ভাবধারা মৃদু মন্দ গতিতে প্রবাহিত হয়, তাহাই অপরিচয়ের বন্ধুর পথে গতিবেগ সংগ্রহ করিয়া ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায় তীব্র বেগে ছুটিয়াছে। প্রভাতকুমার ইংরেজ জীবনের যে দিক্ আঁকিয়াছেন তাহা আমাদেরই মত স্নেহ-প্রেমে কমনীয়, আশঙ্কা-দুর্বল, বিরহ-মিলন-ব্যাকুল। এখানে রাজনৈতিক হিংসা-দ্বেষের চিহ্ন নাই, বিজেতা-বিজিতের অহংকার-আত্মগ্লানি নাই—এখানে সমস্ত বৈষম্য, ভেদবুদ্ধি অতিক্রম করিয়া সর্বদেশ-সাধারণ মানব-হৃদয়ের মিলনক্ষেত্র রচিত হইয়াছে। 'কুকুর ছানা' গল্পে মানুষের সঙ্গে কুকুরের মধুর প্রীতি-সম্পর্ক বর্ণিত হইয়াছে। 'কুমুদের বন্ধু' গল্পটি এক হতভাগ্য বঙ্গযুবকের প্রতি অপেক্ষাকৃত নিম্ন-কুলোদ্ভবা দাসী-জাতীয়া স্ত্রীলোকের নিঃস্বার্থ প্রেমের অতর্কিত উচ্ছ্বাসে গৌরবান্বিত হইয়াছে। 'ফুলের মূল্য' গল্পে একটি শ্রমজীবী ইংরেজ পরিবারের পরিবারিক স্নেহ-প্রীতি ও বিয়োগ-ব্যথার কি মধুর চিত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে; শঙ্কা-কম্পিত, স্নেহ-দুর্বল মাতৃ-হৃদয়ের অতিপ্রাকৃতের প্রতি স্বভাব-প্রবণতার কি মনোহর ছবিই অঙ্কিত হইয়াছে! 'মাতৃহারা' গল্পে এক বর্ষীয়সী ইংরেজ রমণী এক ইংলণ্ড-প্রবাসী বঙ্গ যুবকের প্রতি ব্যর্থপ্রেম কিরূপে সারাজীবন ধরিয়া অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন তাহার অতি মর্মস্পর্শী বিবরণ, 'সতী' গল্পে এক বাগ্‌-দত্তা ইংরেজ-তরুণী তাহার প্রেমাস্পদ বসন্ত-রোগাক্রান্ত বাঙ্গালী যুবকের জন্য প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে। 'প্রবাসিনী' গল্পে বার্নস্-এর প্রেম-কবিতার মাধুর্যের ভিতর দিয়া এইরূপ একটি প্রণয়-কাহিনী বিবাহের সফলতায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। মোট কথা, ইংরেজ-বাঙ্গালীর মিলন-বিরহ-বিষয়ক গল্পগুলি প্রভাতকুমারের গভীর ও করুণরস সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ততার পরিচয় দেয়।

ইহার বিপরীত চিত্র পাই 'প্রত্যাবর্তন' নামক গল্পে। এখানে লেখক ধর্মগত কুসংস্কারের অনুদার সংকীর্ণতা হিন্দু ও খ্রীষ্টান এই উভয়বিধ প্রচলিত ধর্মের ভিতর দিয়াই দেখাইয়াছেন। রামনিধি নীচ-জাতীয় বলিয়া তাহার হিন্দু সহপাঠীদের দ্বারা নির্দয়ভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে—খ্রীষ্টধর্মের উদার বিশ্বজনীন সত্য বাইবেলে পাঠ করিয়া সে অনিবার্যভাবে তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রকৃত জীবনের কাছাকাছি অগ্রসর হইয়া সে আবিষ্কার করিয়াছে যে, সেখানে বর্ণ-বৈষম্যের উৎকটতা ও জাত্যভিমানের তীব্রতা আরও অসহনীয়। রামনিধির গভীর অন্তর্জ্বালা ও তীব্র মনোক্ষোভ তাহার বিসদৃশ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া বিস্ফুরিত হইয়াছে।

আর এক শ্রেণীর গল্পের কথা উল্লেখ করিয়াই এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। সে গল্পগুলি —স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা লইয়া লিখিত। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, যে আন্দোলন একদিকে 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', প্রভৃতি সাময়িক সংবাদপত্রে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্রোহ-প্রবণতার বিষ উদ্‌গীরণ করিয়াছে ও অপরদিকে নানাবিধ দমনমূলক আইনের প্রণয়নে প্রণোদিত করিয়াছে, যাহাতে শাসক-শাসিত উভয় সম্প্রদায়ের মনোবৃত্তি পরস্পরের প্রতি দীর্ঘকাল ধরিয়া

বিষজর্জরিত হইয়াছে, প্রভাতকুমার সেই হলাহল-সমুদ্রের মধ্য হইতে বিশুদ্ধ হাস্যরসের সুধা আহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যখন উভয় পক্ষই যুদ্ধের উত্তেজনায় ও কোলাহলে আত্ম-বিস্মৃত, তখন এই উগ্র রণোন্মাদনার মধ্যে প্রত্যেকের ব্যবহারে এমন বিসদৃশ অসংগতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, যাহা নিরপেক্ষ, স্থিরমস্তিষ্ক humorist-এর প্রচুর হাস্যরসের উপাদান যোগাইয়াছে। 'উকীলের বুদ্ধি' গল্পে লেখক দেখাইয়াছেন যে, দুই পক্ষের এই সাময়িক মত্ততার সুবিধা লইয়া একজন চতুর উকীল কিরূপে নিজের চাকরির সুবিধা করিয়া লইয়াছে—এক পক্ষের উৎপীড়ন অপর পক্ষের সহানুভূতি জাগাইয়াছে। 'হাতে হাতে ফল' গল্পে রাজনৈতিক ব্যাপারে পুলিসের অনুসন্ধান-প্রণালীর দক্ষতা ও ন্যায়পরতার উপর কটাক্ষপাত করা হইয়াছে—কিন্তু দারোগার পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে তাহার মূল হইতেছে তাহার সুরার প্রতি অত্যাসক্তি, ইহার জন্য পার্লিয়ামেণ্টে আন্দোলন চালাইতে হয় নাই। 'খালাস' গল্পে স্বদেশী মোকদ্দমায় বিচারকের অবস্থা-সংকটের কথা বর্ণিত হইয়াছে—একদিকে তাঁহার উপরিওয়ালা ম্যাজিস্ট্রেট, অন্যদিকে তাঁহার দেশবাসী, এমন কি গৃহিণীর প্রবল সহানুভূতি; এই উভয়বিধ টানের মধ্যে পড়িয়া বেচারা হাকিম হাবুডুবু খাইয়াছেন। শেষ পর্যন্ত গৃহিণীর টানই প্রবলতর হইয়া তাঁহাকে কর্মত্যাগে প্রণোদিত করিয়াছে। 'মাদুলি' গল্পে লেখক বিপরীত দিকের চিত্র আঁকিয়াছেন—স্বদেশী প্রচারকের কূটবুদ্ধি ও চাণক্যনীতি অপেক্ষা এক নিরক্ষর তাঁতির সরল ধর্মজ্ঞানই তাঁহার নিকট অধিকতর আদরণীয় হইয়াছে। মোটকথা, যে আন্দোলন দেশে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারই দুই-একটা ছোটখাট ঢেউকে তিনি সুকৌশলে নিজের ক্ষুদ্র প্রয়োজনে লাগাইয়াছেন।

উপরে উদ্ধৃত উদাহরণের দ্বারা প্রভাতকুমারের ছোট গল্পের প্রসার ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অনেকটা পর্যাপ্ত ধারণা করা যাইবে। ছোটগল্পের লেখকদের মধ্যে তাঁহার স্থান এক রবীন্দ্র-নাথের নিম্নে। তাঁহার গভীরতার অভাব হাস্যরসের স্বাভাবিক প্রাচুর্যে খণ্ডিত ও ক্ষালিত হইয়াছে। ছোট গল্পের আর্ট ও রচনা-কৌশল, ইহার পরিমাণবোধ ও সমাপ্তি-বিষয়ে তাঁহার দক্ষতা অসাধারণ। দুই-একজন নবীন লেখক কল্পনাপ্রসারে ও ভাব-গভীরতায় প্রভাতকুমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের রচনায় স্থায়িত্ব-গুণের (sustained power) অভাব, দুই-একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গল্পের সঙ্গে অনেক নিকৃষ্ট পর্যায়ের গল্প গ্রথিত আছে। এ বিষয়ে প্রভাতকুমারের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত; তিনি কল্পনার উচ্চ-গগনে বিহার করেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার রচনায় পক্ষ-ক্লান্তির নিদর্শনও বিশেষ মিলে না। গভীর আলো-চনায় ও আত্যন্তিক দুঃখবাদচর্চায় ক্লান্ত বঙ্গসাহিত্য তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল, কৌতুকসরস, ও ঘটনা-বৈচিত্র্যের জন্য কৌতূহলোদ্দীপক রচনাকে সাদরে নিজ স্থায়ী সম্পদরূপে বরণ করিয়া লইবে।

নবম অধ্যায়

শরৎচন্দ্র

(১)

শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের জন্য বাঙ্গালার উপন্যাস-সাহিত্য কতখানি প্রস্তুত ছিল, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যেমন স্বাভাবিক, তাহার উত্তর দেওয়া সেইরূপ দুরূহ। তিনি বাঙ্গালার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের যে সমস্ত উপাদানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন, বিশ্লেষণ ও মন্তব্যের যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ববর্তী উপন্যাস-সাহিত্যে তাঁহার এই বিশেষত্বগুলির কতটা পূর্ব সূচনা পাওয়া যায়? শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যে ধারণা আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছে তাহা তাঁহার অনন্যসুলভ মৌলিকতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। নিষিদ্ধ, সমাজ-বিগর্হিত প্রেমের বিশ্লেষণে, আমাদের সামাজিক রীতিনীতি ও চিরাগত সংস্কারগুলির তীক্ষ্ণ-তীব্র সমালোচনায়, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সম্পর্কের নির্ভীক পুনর্বিচারে তিনি যে সাহসিকতার, যে অকুণ্ঠিত সহানুভূতি ও উদার মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বাঙ্গালীর মনের সংকীর্ণ গণ্ডি বহুদূর ছাড়াইয়া অতি আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছেন। বাঙ্গালার উপন্যাস-সাহিত্য যে স্রোতোহীন, শুষ্কপ্রায় খাতের মধ্য দিয়া অলস-মন্থর গতিতে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলিতেছিল, তিনি সেখানে বহিঃসমুদ্রের স্রোত বহাইয়া তাহার গতিবেগ বাড়াইয়া দিয়াছেন, নূতন ভাবের উত্তেজনায় তাহার মধ্যে নব-জীবনের সঞ্চার করিয়াছেন। এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে পূর্ববর্তী উপন্যাস-সাহিত্যের সহিত তাঁহার যোগ অতি সামান্য। কিন্তু ইহাই তাঁহার উপন্যাসের একমাত্র বিষয় নহে। তাঁহার উপন্যাসের আর একটি দিক্ আছে যেখানে তিনি পুরাতন ধারা অব্যাহত রাখিয়াছেন, যেখানে পুরাতন সুরেরই প্রাধান্য। তাঁহার অনেক উপন্যাসে আধুনিক প্রেম-সমস্যার আদৌ ছায়াপাত হয় নাই, কেবলমাত্র আমাদের পারিবারিক জীবনের চিরন্তন ঘাত-প্রতিঘাতই আলোচিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসসমূহের ব্যাপক আলোচনা করিতে গেলে তাঁহার এই নূতন ও পুরাতন উভয় ধারাই লক্ষ্য করিতে হইবে। তাঁহার অসাধারণ মৌলিকতা সত্ত্বেও তিনি প্রকৃত পক্ষে বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিকাশ-ধারার বহির্ভূত নহেন।

'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত', ও 'গৃহদাহ' ছাড়া বাকি উপন্যাসগুলিতে শরৎচন্দ্র পুরাতন ধারারই অনুবর্তন করিয়াছেন। 'কাশীনাথ', 'দেবদাস', 'চন্দ্রনাথ', 'পরিণীতা', 'বড়দিদি', 'মেজদিদি', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'বিরাজ বৌ', 'স্বামী', 'নিষ্কৃতি', প্রভৃতি সমস্ত গল্পগুলিই বাঙ্গালী পরিবারের ক্ষুদ্র বিরোধ ও ঘাত-প্রতিঘাতেরই কাহিনী। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি একেবারে প্রেম-বর্জিত—একান্নবর্তী গৃহস্থ পরিবারের মধ্যে প্রেমের যে স্বল্প-অবসর ও অপ্রধান অংশ তাহাই ইহাদের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। আর কতকগুলিতে যে প্রেমের চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ সাধারণ ও সামাজিক বিধি-নিষেধের অনুবর্তী। প্রেমের যে দুর্দমনীয় প্রভাব, সমাজ-বিধ্বংসী শক্তির মূর্তি শরৎচন্দ্রের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, তাহার দর্শন ইহাদের মধ্যে মিলে না। এইগুলির জন্যই শরৎচন্দ্র উপন্যাস-সা[illegible]
সহিত সম্পর্কান্বিত হইয়াছেন।

এই সমস্ত গল্পগুলির কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে। প্রথমতঃ, তাহারা সকলেই ক্ষুদ্রাবয়ব, ছোট গল্পের অপেক্ষা আয়তন বেশি নয়, অথচ ইহারা ঠিক ছোট গল্পের লক্ষণাক্রান্তও নয়। ছোট গল্পের পরিসমাপ্তির মধ্যে যে একটা সাংকেতিকতা, একটা অতর্কিত ভাব থাকে, তাহা ইহাদের মধ্যে নাই। তাহাদের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে যে সমস্যার অবতারণা হইয়াছে, তাহাদের আলোচনা ও মীমাংসা সম্পূর্ণ ও নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, ইহাই আমরা উপলব্ধি করি। বাংলা-সাহিত্যের উপন্যাসের আয়তন সাধারণতঃ কিরূপ হওয়া উচিত তাহার কোন আদর্শ নির্ধারিত হয় নাই। তবে ইউরোপীয় তিন-ভলুমে-সম্পূর্ণ উপন্যাসের বিস্তার যে এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ অবসর নাই। আমাদের সাধারণ পারিবারিক জীবনে যে সমস্ত বিরোধ-সংঘাত জাগিয়া ওঠে তাহাদের গ্রন্থি বিশেষ জটিল ও দীর্ঘ নহে, সুতরাং তাহাদের আলোচনার ক্ষেত্রও অতি বিস্তৃত হইবার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্র তাঁহার অভ্যস্ত সংযম ও সহজ কলানৈপুণ্যের সহিত তাঁহার উপন্যাসগুলির যে সীমা-নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন তাহাই বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের স্বাভাবিক আয়তন বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

এই গল্পগুলিতে পারিবারিক বিরোধের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে মেলে। আমাদের পারিবারিক জীবনে স্নেহ, প্রেম, ঈর্ষ্যা, প্রভৃতি মনোবৃত্তিগুলি সাধারণতঃ যে খাতে প্রবাহিত হয়, তাহার ব্যতিক্রম দেখানতেই ইহাদের বৈচিত্র্য। যে বিভিন্ন উপাদান লইয়া আমাদের পারিবারিক ঐক্য গঠিত হয়, যে পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ-সংঘাত একান্নবর্তী পরিবারের ছায়াতলে একটা ক্ষণস্থায়ী মিলনে বাঁধা পড়ে, তাহাদের মধ্যে একটা চিরপ্রথাগত সন্ধিবিগ্রহের, ভেদ-মিলনের সূত্র ঠিক হইয়াই থাকে। দৈনিক জীবনযাত্রার মধ্যে যখনই সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে, যখনই ভাঙ্গন শুরু হয়, তখন এই পূর্ব-নির্দিষ্ট ভেদরেখা ধরিয়াই ফাটল দৃষ্টিগোচর হয়। যখনই এই পারিবারিক কলহ আত্মপ্রকাশ করে, তখনই আমরা বিচ্ছেদ-রেখার গতিটি পূর্ব হইতেই অনুমান করিতে পারি—বুঝিতে পারি যে, কে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবে। কিন্তু সময় সময় মানুষের স্বাধীন প্রকৃতি এই সমাজ-রচিত বাঁধা রাস্তায় চলিতে চাহে না; এই সনাতন শ্রেণীবিভাগের সরলরেখা অতিক্রম করিয়া একটা বক্র, তির্যক্ গতি অবলম্বন করে। তখনই পারিবারিক বিরোধটি নূতন রকমের জটিলতা ও বৈচিত্র্য লাভ করে।

আবার পারিবারিক জীবনে এমন লোকও থাকে, যাহারা এই দ্বিধাবিভক্ত পরিবারের প্রান্ত-সীমায় দাঁড়াইয়া একটা ব্যাকুল অনিশ্চয়ের সহিত উভয় দিকেই ব্যগ্র বাহু প্রসারিত করিতে থাকে, যাহারা রক্ত-সম্পর্ক ও স্নেহের দাবী এই উভয় বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে অক্ষম হইয়া একটা উৎকট, বিসদৃশ অসংগতির সৃষ্টি করে। পারিবারিক জীবনে স্নেহ-প্রেমের বক্রগতির চিত্র রবীন্দ্রনাথের 'পণরক্ষা', 'ব্যবধান', 'রাসমণির ছেলে', প্রভৃতি অনেকগুলি ছোট গল্পে পাওয়া যায়; সুতরাং এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্রের পথ-প্রদর্শক বলা যাইতে পারে।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রণালী রবীন্দ্রনাথ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ বিরোধের একটা সাধারণ প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়া তাহাকে কাব্য-সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়া তোলেন—তাঁহার গল্পগুলিতে তথ্য-সন্নিবেশ অপেক্ষাকৃত বিরল, এবং বিশ্লেষণ, মনস্তত্ত্ব ও কল্পনা-সমৃদ্ধি উভয় দিক্ দিয়াই মনোজ্ঞ ও রমণীয়। শরৎচন্দ্রের গল্পে বাস্তবতার সুরটি আরও তীক্ষ্ণ ও অসন্দিগ্ধভাবে আত্মপ্রকাশ করে; কবিত্বপূর্ণ বিশ্লেষণের অন্তরালে চাপা পড়ে না। ভাবপ্রকাশের গভীরতাতেও

তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব। তাঁহার গল্পগুলিতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র সংঘাতগুলি অন্তর্বিপ্লবের বিদ্যুৎ-চমকে দীপ্ত হইয়া উঠে। তিনি কোথায়ও কেবল ঘটনা-বৈচিত্র্য বা কাব্য-সৌন্দর্যের জন্য কোন দৃশ্যের অবতারণা করেন না—প্রত্যেক দৃশ্যই চরিত্রের উপর আলোক-পাত করে।

শরৎচন্দ্রের পারিবারিক বিরোধ-চিত্রগুলির মধ্যে আর একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। যে সমস্ত পূর্বতন ঔপন্যাসিক ভ্রাতৃবিরোধ বা সংসার-বিচ্ছেদের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাঁহারা প্রায়ই সমস্ত দোষ এক পক্ষের উপর চাপাইয়া নীতি এবং কলাকৌশল উভয় দিক্ হইতেই এক-দেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। যেখানে এক পক্ষ প্রবল অত্যাচারী ও অন্য পক্ষ নিরীহ ও অসহায়, বিনা প্রতিবাদে অপর পক্ষের অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকে, সেখানে এক প্রকার সুলভ করুণ রস উদ্বেলিত হইয়া উঠে বটে, কিন্তু বিরোধের তীব্রতা ও জটিলতা একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। 'স্বর্ণলতা'য় ভ্রাতৃবিরোধের চিত্রটি আলোচনা করিয়া পাঠকের সহানুভূতি এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধাগ্রস্ত বা অনিশ্চিত থাকে না—প্রমদা ও সরলার মধ্যে পক্ষাবলম্বন করিতে বিন্দুমাত্র সংশয় বা বিলম্ব করে না। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে বিশেষ কিছু গভীরতা থাকে না—কলাকৌশলের দিক্ দিয়া এ সমস্ত চিত্র প্রায়ই অক্ষম ও ব্যর্থ হইয়া থাকে। শরৎচন্দ্রের সমস্যাগুলি এত সহজ ও প্রাথমিক রকমের নহে—তাঁহার মনুষ্য-চরিত্রে অভিজ্ঞতা তাঁহাকে শিখাইয়াছে যে, এরূপ দায়িত্ব-বিভাগ ঠিক প্রকৃতির অনুগামী নহে। ন্যায় ও ধর্ম যে পক্ষে, যাহার হৃদয় সরল ও অবিকৃত, তাহার মধ্যে একটা বাহ্য কর্কশতা বা তীব্র অসহিষ্ণুতা আরোপ করিয়া তিনি বিরোধটিকে জটিলতর করিয়া তোলেন।)

(এই বিশেষত্বের উদাহরণ শরৎচন্দ্রের প্রায় সমস্ত গল্পেই মেলে। 'বিন্দুর ছেলে'তে অমূল্য-ধনের প্রতি বিন্দুর তীব্র উৎকট স্নেহ পারিবারিক জীবনের সাধারণ মাত্রাকে বহু দূর অতিক্রম করিয়া যায়। তাহার দারুণ অভিমান, পরমত-অসহিষ্ণুতা ও ধনগর্ব, তাহার অনুক্ষণ সন্দেহ-পরায়ণ, অতিসতর্ক, অপরিমিত স্নেহের সহিত এমন ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত, তাহার চরিত্রটিতে দোষে-গুণে এমন মাখামাখি হইয়াছে যে, তাহার সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশ খুব সহজ নহে। ঈর্ষ্যা বা বিদ্বেষ যে পারিবারিক শান্তিভঙ্গের একমাত্র কারণ তাহা নয়; অনেক সময় স্নেহের আতিশয্য বা বিভাগ বৈষম্য যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করে তাহা আরও মর্মান্তিক। এখানে বাহির হইতে যে বিরোধের কারণটি আসিয়াছে—এলোকেশী ও নরেনের আবির্ভাব—তাহার প্রভাব বিশেষ স্পষ্ট হয় নাই, এবং গল্পের সহিত তাহাদের যোগ বিশেষ ঘনিষ্ঠ নহে।)

'রামের সুমতি'তে একই সমস্যার একটা বিভিন্ন দিক্ দেখান হইয়াছে। এখানে বিরোধের মূল কারণ নারায়ণীর স্নেহাতিশয্য নহে; একদিকে রামের উৎকট দুরন্তপনা, অপরদিকে নারায়ণীর মাতার ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ জটিলতার সূত্রে পাক দিয়াছে। দুরন্ত রামের মধ্যে যে স্নেহশীল হৃদয় আছে তাহা কেবল নারায়ণীর স্নেহের স্পর্শে জাগিয়া উঠে—যাহার স্নেহ নাই সে এই গোপন মাধুর্যের সন্ধান পায় না। নারায়ণীর মাতা কেবল তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে এবং নিজ ঈর্ষ্যাদিগ্ধ স্পর্শের দ্বারা তাহার দুরন্তপনাকে আরও উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। তবে রামের চরিত্রের মধ্যে যেন একটু অসংগতি রহিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যে দুষ্টামিতে এতদূর অগ্রসর, যে লোকের ঘরে আগুন লাগাইতেও পশ্চাৎপদ নয় তাহার দুঃশীলতাকে একেবারে

শৈশব-চাপল্যের পর্যায়ে ফেলা যায় না। এই উপদ্রবে চরম সিদ্ধহস্ততা ও বাগ্‌দী সৈন্যের অধিনায়কত্বের সহিত নারায়ণীর নিকট তাহার নিতান্ত নিরীহ, অসহায় ভাবের ঠিক সংগতি করা যায় না। এখানে যেন লেখক রামের চরিত্রকে একটু অতিরঞ্জিত করিয়াছেন।

'মেজদিদি' গল্পে বড়বধূর ভ্রাতা পিতৃমাতৃহীন কেষ্টর প্রতি মেজবধূ হেমাঙ্গিনীর সহানুভূতি-মিশ্র ভালবাসাই মুখ্য বিষয়। নিজের দিদি অপেক্ষা এই নিঃসম্পর্কীয় দিদির বেশি ভালবাসাই তাহাদের সম্পর্কে জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। কেষ্টর প্রতি হেমাঙ্গিনীর এই অহেতুক ভালবাসা চারিদিক্ হইতে বাধাপ্রাপ্ত ও প্রতিহত হইয়া বেশ স্বাভাবিক, অক্ষুণ্ণ গতিতে প্রবাহিত হইতে পায় নাই। এই রুদ্ধমুখ স্নেহ কখনও বা কেষ্টর প্রতি তীব্র বিরক্তির আকারে, কখনও বা তাহার স্বামী বিপিনের বিরুদ্ধে একটা মর্মান্তিক অভিমানের রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যে পর্যন্ত না পরিবারের মধ্যে ইহা একটি স্বাভাবিক, চিরস্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে, সে পর্যন্ত ইহার অশান্ত বিক্ষোভ শান্তিলাভ করিতে পারে নাই।

'মামলার ফল' গল্পটিতেও স্নেহের এই তির্যক্ গতির একটি নূতন রকমেব উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। ভ্রাতৃবিরোধে দ্বিধাবিচ্ছিন্ন পরিবারের মধ্যে ছোট ভাই-এর ছেলে, কিন্তু বড় ভাই-এর স্ত্রীর দ্বারা লালিত-পালিত, গয়ারাম একটা অভগ্ন সংযোগ-সেতু রহিয়া গিয়াছে।

'একাদশী বৈরাগী'তে মানব-মনের একটি বিস্ময়কর অসংগতির চিত্র দেখান হইয়াছে। একাদশী একেবারে চক্ষুলজ্জাহীন সুদখোর, প্রসন্নমনে একটা পয়সা সুদ ছাড়াও তাহার পক্ষে অসম্ভব। চারি আনা চাঁদা দেওয়া তাহার পক্ষে দানশীলতার চরম সীমা। কিন্তু এই পাষাণের মধ্যেও দুইটি শীতল নির্ঝর প্রবাহিত হইতেছে—এক, তাহার পদস্খলিত ভগিনীর প্রতি একান্ত, অনুযোগহীন স্নেহ, আর একটি তাহার অর্থ-সম্বন্ধে অবিচলিত ন্যায়নিষ্ঠা ও ধর্ম-জ্ঞান। যাহার মন একদিকে এত নীচ, অন্যদিকে তাহা প্রায় মহত্ত্বের শিখর স্পর্শ করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টির বিশেষত্ব এই যে, নীচের মধ্যে মহত্ত্বের বীজ কখনও তাঁহার চক্ষু এড়ায় না।

'নিষ্কৃতি' গল্পে ভ্রাতৃবিরোধের চিত্রটি বেশ পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। এখানে যদিও হরিশ ও তাহার স্ত্রী নয়নতারার কুটিলতাই বিরোধের প্রধান কারণ, তথাপি সিদ্ধেশ্বরীর তোষামোদপ্রিয়তা ও অস্থিরমতিত্ব এবং শৈলর অনমনীয় তেজস্বিতা ও মতদার্ঢ্য সংঘর্ষের তীব্রতা বাড়াইয়া দিয়াছে। একান্নবর্তী পরিবারে পাঁচজনকে লইয়া চলিতে হইলে যতটা কোমলতা, সহিষ্ণুতা ও আত্মসংকোচের প্রয়োজন, শৈলর মধ্যে তাহার একান্ত অভাব। তাহার কঠোর নিয়মানু-বর্তিতা ও অকুণ্ঠিত স্পষ্টবাদিতা কোনরূপ দুর্বলতার প্রশ্রয় দিতে নারাজ; সুতরাং সংসারের রাখা-ঢাকা, ভাগ-বণ্টনের কাজে ইহা একেবারেই অনুপযুক্ত। আবার সিদ্ধেশ্বরীর স্নেহ-দুর্বল হৃদয়টাও সর্বদা দ্বিধা-সন্দেহে দোলায়িত; শৈলর প্রকৃত মনোভাব যে তিনি না বুঝেন তাহা নয়; তথাপি তাহার নিকট নীরব, অক্লান্ত সেবার অতিরিক্ত একটা মনরাখা কথা না পাইয়া তাঁহার মন মাঝে মাঝে বিরূপ হইয়া বসে, এবং নয়নতারার চক্রান্ত বুঝিয়াও অনিচ্ছায় তাহার পোষকতা করে। আবার অতুলচন্দ্রের বয়কটের কথা স্মরণ করিলে নয়নতারার সপক্ষেও যে কিছু বলিবার আছে তাহা আমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করি। সকলের সহযোগিতাই এই পারি-বারিক বিরোধের চিত্রটিকে বেশ জটিল ও মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে—দোষ কেবল এক পক্ষের হইলে সংঘর্ষের তীব্রতা এত ঘনীভূত হইতে পারিত না। কেবল বড় ভাই গিরিশের চরিত্রটিই

একটু অসঙ্গত হইয়াছে, তাহার উদাসীনতা ও আত্মবিস্মৃতি যেন একটু অস্বাভাবিক রকমের হইয়া উঠিয়াছে।

'বৈকুণ্ঠের উইল'-এ ভ্রাতৃবিরোধের একটা অনন্যসাধারণ দিক্ দেখান হইয়াছে। "বি. এ. অনার পাস" ভাই বিনোদের প্রতি গোকুলের মনোভাব ঠিক সাধারণ অগ্রজের মত নহে—তাহার স্নেহের সহিত একটা সশঙ্ক সশ্রদ্ধ কুণ্ঠার ভাব জড়াইয়া আছে। তাহার অশিক্ষিত, অসভ্যোচিত, বাহ্যতঃ কর্কশভাবের অন্তরালে যে মাধুর্য ও কোমল স্নেহশীলতা প্রবাহিত হইয়াছে তাহার মৌলিকতা উপভোগ্য। প্রায়ই দেখা যায় যে, যেখানে লেখক নীচজাতীয় ও অশিক্ষিত লোকের মধ্যে গভীর ও সূক্ষ্ম অনুভূতিময় ভাবের আরোপ করেন সেখানে শেষ পর্যন্ত তাহাদের সহজ ইতরতাটুকু বিস্মৃত হইয়া যান, অতিরিক্ত পালিশের ফলে তাহাদের বাস্তব সুরটি ঢাকা পড়িয়া যায়। এই দোষ শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিত মহাশয়' উপন্যাসে কুসুম ও বৃন্দাবন বৈরাগীর চরিত্রে প্রকটিত হইয়াছে। বৃন্দাবনের প্রবল শিক্ষানুরাগ ও চরিত্র-গৌরব, তাহার কঠোর আত্মসংযম ও সূক্ষ্ম বিচার-কৌশল তাহাকে এমন একটা আদর্শস্তরে উন্নীত করিয়া দিয়াছে, যেখানে তাহার সামাজিক পদবীর কোন স্থান নাই। কুসুম ও বৃন্দাবনের মাতা সম্বন্ধেও ঠিক এই মন্তব্য প্রযোজ্য। কুঞ্জনাথ ও তাহার শাশুড়ী তাহাদের স্বজাতীয় হইয়াও যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের জীব—তাহাদের আলাপ-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ যেন একবারে ভিন্ন জাতীয়। এই দুই জাতীয় লোকের মধ্যে ব্যবধান যেন দুস্তর। অবশ্য ইহা বলিতেছি না যে, বৈরাগী হইলে তাহার পক্ষে উচ্চ কর্তব্যবোধ, সূক্ষ্ম ধর্মজ্ঞান অসম্ভব। কিন্তু ইহার মধ্যে তাহার জাতির ও শিক্ষা-সংস্কারের প্রভাব না থাকিলে, চরিত্রটি অবাস্তবতা-দুষ্ট হইয়া পড়ে। বর্তমান ক্ষেত্রে পাঠকের ধারণা হয় যে, বৃন্দাবন ও কুসুমকে বৈরাগী বলিয়া দেখাইবার একমাত্র কারণ তাহাদের পুনর্বিবাহের একটা স্বাভাবিক অবসর গড়িয়া তোলা; তাহাদিগকে উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্ম বলিয়া দেখাইলেও এই উদ্দেশ্য সুসাধিত হইতে পারিত, সুতরাং তাহাদের বৈরাগী হওয়ার বিশেষ সার্থকতা নাই। 'বৈকুণ্ঠের উইল'-এ গোকুলের চরিত্রে লেখক পূর্বোল্লিখিত ভুল করেন নাই, তাহার সহজ ও বাহ্য ইতরতা কোন আদর্শবাদের দ্বারা রূপান্তরিত করেন নাই। তবে গোকুলের বাক্যে ও ব্যবহারে অসংযম ও অস্থির-মতিত্ব যেন চরম মাত্রায় উঠিয়াছে—এইরূপ প্রকৃতির লোকের পক্ষে ব্যবসায় বা পরিবারের কর্তৃত্ব এই দুই-ই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তাহার ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশী ও পিতার অগাধ বিশ্বাসের সঙ্গে তাহার পরবর্তী খামখেয়ালী ব্যবহারের যেন একটা অসংগতি থাকিয়াই যায়।

'পণ্ডিত মশাই' গল্পে বৃন্দাবন ও কুসুমের চরিত্রের অসংগতি সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই গোড়ার দোষ বাদ দিলে অন্যান্য দিক্ দিয়া উপন্যাসের প্রথমার্ধ অন্ততঃ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। বৃন্দাবন ও কুসুমের পরস্পর ব্যবহারের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত, তাহাদের পুনর্মিলনের পথে নূতন নূতন প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি লেখকের বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। কুসুমের পক্ষে প্রধান বাধা বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে তাহার ভদ্র উচ্চবর্ণোচিত প্রবল সংস্কার; বৃন্দাবনের পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, কুসুম কর্তৃক তাহার মাতার অপমান। বিবাহের পরে মস্ত বড় শ্বশুরবাড়ির প্রভাবে কুঞ্জনাথের অতর্কিত আমূল পরিবর্তন, অথচ এই পরিবর্তনের মধ্যে তাহার লুপ্তপ্রায় ভগিনীস্নেহের ধ্বংসাবশেষের গোপন সংরক্ষণ বেশ সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছে। শেষের

দৃশ্যগুলিতে বৃন্দাবনের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসটিও বাস্তবতাকে অতিক্রম করিয়া আদর্শের উর্ধ্ব-লোকে উঠিয়া গিয়াছে—যে নীতিপ্রাধান্য শরৎচন্দ্র বঙ্কিমের কোন কোন উপন্যাসের ত্রুটি বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার নিজের উপন্যাসকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

(২)

এই শ্রেণীর বাকি গল্পগুলির মধ্যে প্রেমের কাহিনী আলোচিত হইয়াছে। এই প্রেম ঠিক নিষিদ্ধ নহে, ও সামাজিক বিধি-নিষেধকে একেবারে তুচ্ছ করে নাই; এবং 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর উপন্যাসের ন্যায় এগুলিতে প্রেমের ঘাত-প্রতিঘাতের খুব দীর্ঘ ও নিপুণ বিশ্লেষণও নাই। তথাপি পরবর্তী উপন্যাসগুলির পূর্বসূচনা কতকটা ইহাদের মধ্যেও পাওয়া যায়। প্রেম-সম্বন্ধে স্বচ্ছ ও সহানুভূতিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি বরাবরই শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব। বিবাহের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না হইলেও, সামাজিক অনুমোদনের ছাপমারা না থাকিলেও, চিরাভ্যস্ত সংস্কারের খোলস-বর্জিত হইলেও প্রেমের যে একটা নৈসর্গিক মহত্ত্ব, একটা বিপুল আত্মলোপী আবেশ আছে, সে বিষয়ে শরৎচন্দ্র তাঁহার প্রথম বয়সের উপন্যাসেও বেশ সচেতন আছেন।

'শুভদা' (মৃত্যুর পর প্রথম প্রকাশিত, রচনাকাল ২০শে জুন—২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮) উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনাবলীর অন্যতম হইলেও ইহাতে তাঁহার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনারীতির পূর্বাভাস মিলে। এই পূর্বাভাস প্রথম রচনার সময় হইতেই বর্তমান ছিল, না পরবর্তী সংশোধনের ফল তাহা অনিশ্চিত। স্নেহ-প্রেম-ভালবাসার বক্র-তির্যক্ গতি, ঈর্ষ্যা-ক্রোধ-ঔদাসীন্যের ছদ্মবেশের মধ্য দিয়া তাহাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ও পতিতা স্ত্রীলোকের প্রতি তাঁহার শান্ত, ক্রোধ-ঘৃণাবর্জিত, নিরপেক্ষ মনোভাব তাঁহার এই প্রথম বয়সের উপন্যাসেও উদাহৃত হইয়াছে। নেশাখোর, দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাই এর প্রতি অভিশাপের ভিতর দিয়া রাসমনির উদ্বেলিত ভ্রাতৃস্নেহ ব্যথিত অনুশোচনারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। গণিকা কাত্যায়নীর চরিত্র এখনও আদর্শবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে নাই, তবে ইহার বিচারে লেখকের অনুচ্চারিত সমর্থন ও সহানুভূতিই অনুমান করা যায়। ইহা ছাড়া মাঝে মধ্যে বর্ণনা ও চিন্তাশীল মন্তব্যের মধ্যেও আমরা তাঁহার ভবিষ্যৎ রীতি-পদ্ধতির পূর্বাভাস দেখিতে পাই। তবে ইহা যে কাঁচা হাতের রচনা তাহার প্রমাণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। চরিত্র পরিকল্পনায় গভীরতা ও সুসংগতি এখনও লেখকের অনায়ত্ত। শুভদার অটল ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা তাহাকে পুরাণ-মহাকাব্য-বর্ণিতা সতী স্ত্রীর পর্যায়ভুক্ত করিয়াছে। হরেন মুখুজ্যের দুঃশীলতার মধ্যে স্ত্রীর প্রতি যে একটু দুর্বল সহানুভূতি ও কিছু নিষ্ফল আত্মগ্লানি দেখা যায়, তাহার সঙ্গে নেশাখোরের সুলভ আশাবাদ ও উদ্ভট আত্মপ্রত্যয় মিশিয়া তাহাকে কতকটা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-মণ্ডিত করিয়াছে। ললনার অনির্দেশ্য অতৃপ্তিবোধ তাহার বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন ছিল, কিন্তু বিবাহের পর ইতর ভোগবিলাসে ইহার নিবৃত্তি সেই বৈশিষ্ট্যটুকু লুপ্ত করিয়াছে। সমস্ত ঘটনা-সন্নিবেশ শিথিল ও আকস্মিক। মুখুজ্যে পরিবারের ইতিহাস-বিবৃতিতে কোন ভাব-সংহতি ফুটিয়া উঠে নাই। কেবল শুভদার মূক, শত অপমানে অভিযোগহীন পাতিব্রত্য জড়শক্তির ভয়াবহ অপরিবর্তনীয়তার মত আমাদিগকে অভিভূত করে। পরের অনুগ্রহের অনিয়মিত তৈলনিষেকে যে পরিবারের সংসার-রথ গড়াইয়া গড়াইয়া চলে, যেখানে একটানা

দারিদ্র্য ও পরমুখাপেক্ষিতা জীবনযাত্রাকে বর্ণে ম্লান ও পরিধিতে সংকীর্ণ করে, সেখানে এক ভাবার্দ্র করুণরস ছাড়া আর কোনও আকর্ষণীয় বিকাশের প্রত্যাশা করা যায় না।

'দেবদাস', 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ', 'পরিণীতা', প্রভৃতি গল্পে প্রেম-সম্বন্ধে এই স্বাধীন মতবাদ ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পূর্বসূচনা অল্পাধিক পরিমাণে মিলে। 'দেবদাস'-এ দেবদাস ও পার্বতীর বাল্যপ্রণয় বিশেষ সহানুভূতি ও সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। সামাজিক প্রতিবন্ধক ও দেবদাসের ভীরুতার জন্য এই প্রেম ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু দেবদাস ও পার্বতীর উপর ইহার প্রভাব চিরদিনের মত অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। পার্বতী ভুবন চৌধুরীর গৃহিণী হইয়াও এবং নিজ স্বামী ও পরিবারের প্রতি কর্তব্য নিখুঁতভাবে পালন করিয়াও তাহার বাল্যপ্রণয় বিসর্জন দেয় নাই, পরন্তু জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের ন্যায় ইহাকে সযত্নে রক্ষা করিয়াছে। দেবদাস নিরাশ প্রেমের তাড়নায় নির্লজ্জ উচ্ছৃঙ্খলতা-স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়াছে ও পরিণামে ঘৃণিত ও শোচনীয় মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে, কিন্তু সে লেখকের সহানুভূতি হারায় নাই। শরৎচন্দ্র এই গল্পে পাপ ও চরিত্রহীনতার কোনরূপ পোষকতা না করিয়াও পাঠকের মনে এই ধারণা জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, দেবদাসের পাপটাই তাহার সম্বন্ধে বড় কথা নয়; ইহা তাহার গভীর মনস্তাপের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মাত্র। পার্বতীর সতীধর্ম-পালনকে তিনি যথেষ্ট সমাদর করিয়াছেন, তবে দেবদাসের প্রতি অনুরাগকেও সাধারণ কর্তব্যপালন অপেক্ষা অনেক উচ্চে স্থান দিয়াছেন। এইরূপে তিনি সামাজিক ধর্মনীতির বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া প্রেমের মহত্ত্ব ও গৌরব সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। চন্দ্রমুখীর চরিত্রে রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী প্রভৃতির পূর্বসূচনা পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাতে প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিশেষ পরিচয় নাই, ইহা যেন একটা শূন্যগর্ভ আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে 'দেবদাস' তাঁহার প্রথম বয়সের ও অপরিপক্ক রচনা বলিয়া নায়কের চরিত্র ও তাহার পদস্খলনের চিত্রে গভীরতার অভাব অনুভূত হয়।

'বড়দিদি' গল্পেও অপরিপক্কতার চিহ্ন প্রস্ফুট। মাধবীর সঙ্গে সুরেনের যে সম্পর্ক তাহাকে ঠিক প্রেমের পর্যায়ে ফেলা যায় না—অসহায় শিশুর মাতার উপর যেরূপ একান্ত নির্ভর ভাব ইহা অনেকটা তাহারই অনুরূপ। এই সম্পর্ক লৌকিক ব্যবহারে প্রেমের মাধুর্য বা গৌরব লাভ করে নাই; কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে, সুরেনের মৃত্যুকালে মাধবী ইহার পবিত্রতা ও ব্যাকুল আহ্বান স্বীকার করিয়া লইয়াছে—তাহার আজন্ম বৈধব্যের সংস্কার অতিক্রম করিয়া এই সম্বন্ধ তাহার উপর নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। গল্পের মধ্যে কিন্তু এই সম্বন্ধটি ও সুরেনের উদাসীন, আত্মবিস্মৃত ভাবটি ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই।

'চন্দ্রনাথ'-এ যে ভালবাসার আলোচনা হইয়াছে তাহাতে আধুনিক বিদ্রোহের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। চন্দ্রনাথ সরযুকে সামাজিক কলঙ্ক ও অপবাদের জন্য ত্যাগ করিয়া খুড়া মণিশঙ্করের অনুরোধে ও নিজ দুর্নিবার প্রেমের আকর্ষণে তাহাকে পুনর্গ্রহণ করিয়াছে। এই গল্পের সারাংশ ঠিক আমাদের সনাতন আদর্শে সংকলিত। ইহার মধ্যে যেটুকু নূতন ও মৌলিক তাহা মণিশঙ্করের সহানুভূতি—পরিত্যক্তার প্রতি সমাজের দয়া ও সমবেদনা। সরযূর কুণ্ঠিত, অপরাধী প্রেমের চিত্রটি চমৎকার হইয়াছে। কিন্তু গল্পের প্রধান চরিত্র হইতেছে কৈলাস খুড়া—একদিকে তাহার সরল, অকুণ্ঠিত, দ্বিধাহীন পৌরুষ, অপর দিকে শিশু বিশ্বনাথের প্রতি তাহার করুণ,

মর্মান্তিক আসক্তি—তাহার চরিত্রের এই উভয় দিকই অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। কৈলাস খুড়া অতি সাধারণ গল্পের মধ্যে প্রতিভার দীপ্ত স্পর্শ।

'পরিণীতা' গল্পটিতে প্রেমের অকুণ্ঠিত মহিমা একটু নূতনভাবে ঘোষিত হইয়াছে। ললিতা শেখরকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া সেই সম্পর্ককে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অব্যাহত রাখিয়াছে। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শেখরের অন্যায় ঈর্ষ্যা ও কাপুরুষোচিত ঔদাসীন্যও গণনীয়। বস্তুতঃ, শেখরের মধ্যে এক অর্থসম্বন্ধে উদারতা ছাড়া আর কোনও বরণীয় গুণ দেখা যায় না। শেখর-ললিতার মধ্যে এই অব্যক্ত মধুর সম্পর্কটি ফুটাইয়া তুলিবার জন্য লেখককে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কল্পনা করিতে হইয়াছে তাহা আমাদের পারিবারিক জীবনের পক্ষে অনেকটা অসাধারণ। ললিতার উপর শেখরের প্রভাব ও শেখরের অর্থে ললিতার অবাধ অধিকার—কেবল প্রতিবেশসূত্র পরস্পরের মধ্যে এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পর্যাপ্ত কারণ কি না, এ বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে। অথচ এরূপ অবস্থা কল্পনা না করিয়া লইলেও প্রেমের উদ্ভব অসম্ভব হইয়া পড়ে। অবস্থার এই বিশেষত্বটুকু নির্বিচারে গ্রহণ করিয়া লইলে গল্পটির উৎকর্ষ স্বীকার করিতে আর কোন বাধা থাকে না।

'স্বামী' গল্পটি শেষের দিকের রচনা হইলেও ভাবের দিক্ দিয়া ইহার প্রথম বয়সের গল্পগুলির সহিত মিল আছে। ইহাতে অবৈধ প্রণয়ের উপর দাম্পত্য প্রেমের জয় ঘোষণা হইয়াছে। এখানে স্বামী নিজ ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা ও ভগবদ্ভক্তির দ্বারা অন্যাসক্ত স্ত্রীর চিত্ত জয় করিয়াছে। গল্পটি অনুতপ্ত স্ত্রীর মুখে দেওয়া হইয়াছে ও ইহার মধ্যে অনুতাপ ও আত্মগ্লানির সুরটি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে বিশ্লেষণ ও ভাবের দিক্ দিয়া ইহাতে বিশেষ গভীরতা নাই। রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমারের কোন কোন গল্পের ছায়াপাত ইহার উপর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মোটের উপর গল্পের বিষয়-নির্বাচন ঠিক শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট চিন্তাধারার সমধর্মী নহে।

এ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের যে সমস্ত গল্পের আলোচনা হইল, তাহাতে সামাজিক বিদ্রোহের সুর সেরূপ সুপরিস্ফুট নহে। সুতরাং তাঁহার যে বিশেষত্বের জন্য তিনি বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত, যে নূতন সমাজনীতি ও প্রেমের আদর্শ তিনি প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহার উদাহরণ ইহাদের মধ্যে ততটা মেলে না। তথাপি ইহাদের আর একটি বিশেষত্ব অতি সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—ইহাদের মধ্যে অঙ্কিত নারীচরিত্র। (প্রেমের বিশ্লেষণের ন্যায় নারী-চরিত্র-সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের সমাজে নারীজাতির যে একটা অখ্যাত, লজ্জা-সংকোচ-আত্মগোপনের অন্তরালস্থিত স্থান আছে, তাহাই উপন্যাস-ক্ষেত্রে তাহাদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে প্রতিকূল হইয়াছে। সমাজেও যেমন, উপন্যাসেও তেমনি, নারীর কর্মক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ; কয়েকটি অতি সুনির্দিষ্ট অল্প-পরিসর কর্তব্যের গণ্ডির মধ্যে তাহাদের গতিবিধি, কার্য-কলাপ, হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত আবদ্ধ হইয়াছে। সাধারণতঃ স্ত্রী-চরিত্রের সামান্য কয়েকটি দিক্ মাত্র আমাদের উপন্যাসে প্রতিফলিত হইয়াছে। অতি অভিমান বা প্রেমের অন্ধ আতিশয্যের জন্য স্বামীর সহিত বিচ্ছেদ বা নীচ স্বার্থপরতার জন্য গৃহ-বিরোধের সৃষ্টি—মুখ্যতঃ নারী বাঙ্গালা-উপন্যাসে এই দুইটি উদ্দেশ্য-সাধনের হেতুরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তারপর অবরোধ-প্রথার জন্য হিন্দুসমাজে স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ও পরিচয়ের পথ প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বন্ধ ছিল; সুতরাং স্ত্রী-চরিত্র-সম্বন্ধে ঔপন্যাসিকের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব বাঙ্গালা

উপন্যাসে একটা প্রকাণ্ড ত্রুটি। স্ত্রী-চরিত্রেও যে একটা জটিলতা বা পরস্পর-বিরোধী ভাবের একত্রাবস্থান সম্ভব ঔপন্যাসিক তাহা মুখে স্বীকার করিলেও কার্যতঃ ফুটাইতে পারেন নাই। সেইজন্য বঙ্গসাহিত্যে নারীচরিত্রগুলি সাধারণতঃ কতকগুলি সুপরিচিত শ্রেণীর মধ্যেই স্থান লাভ করিয়াছে। ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক গুণের অপেক্ষা শ্রেণীর বিশেষ গুণগুলিই তাহাদের মধ্যে স্ফুটতর হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী-চরিত্রগুলির নাম স্মরণ করিলেই এই মন্তব্যের যথার্থতার উপলব্ধি হইবে। তাঁহার ভ্রমর, সূর্যমুখী, প্রফুল্ল, প্রভৃতি মূলতঃ শ্রেণীবিশেষেরই প্রতিনিধি, অবস্থাভেদে স্বামীর প্রতি পতিব্রতা স্ত্রীর মনোভাবের যে অল্প-বিস্তর পরিবর্তন হইতে পারে তাহারই উদাহরণ। ইহাদের ব্যক্তিগত জীবনের যে সমস্যা তাহা শ্রেণীর সমস্যা হইতে অভিন্ন, কেন-না বাঙ্গালী পরিবারে নারীর ব্যক্তিগত জীবনের কোন অবসর নাই বা কিছুদিন পর্যন্ত ছিল না। সমাজ তাহাকে পারিবারিক জীবনে যে বিশিষ্ট আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহাই তাহার জীবননাট্যের রঙ্গমঞ্চ; সেই আসনচ্যুত হইলে তাহার আর কিছু বলিবার থাকে না। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের উপন্যাস 'নৌকাডুবি' ও 'চোখের-বালি'তে কমলা, এমন কি বিনোদিনীরও যে সমস্যা তাহা এই সমাজ-দত্ত আসনখানি আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা হইতেই প্রসূত। তাঁহার পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে সুচরিতা, ললিতা ও 'ঘরে বাইরে'র বিমলা-চরিত্রে নারীজীবনে ব্যক্তিত্ব-স্ফুরণের প্রথম চেষ্টা হইয়াছে; ইহারা এক নূতন জগতের অধিবাসী; সমাজের সনাতন আসনখানি অধিকার করাই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। ইহাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে নূতন রকমের আশা-আকাঙ্ক্ষা, নূতন উদ্দেশ্যের ও আদর্শের প্রেরণা ঝংকৃত হইয়া উঠিতেছে; ইহারা প্রথম আপনাদিগকে সামাজিক কর্তব্য হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতে শিখিতেছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে স্ত্রীচরিত্রে এই সমাজ-নিরপেক্ষ, স্বাধীন জীবনের আরও সুস্পষ্ট স্ফুরণ হইয়াছে। এমন কি, তাঁহার প্রথম যুগের উপন্যাসগুলিতেও, যেখানে সমাজ-বিদ্রোহের সুর সেরূপ তীব্র নয় ও পারিবারিক কর্তব্যপালনই স্ত্রীলোকের প্রধান কার্য, সেখানেও, তাহাদের দৈনিক সমাজনির্দিষ্ট কার্য-গণ্ডির অভ্যন্তরেও তাহাদের মধ্যে একটা নূতন সতেজ প্রকাশ-ভঙ্গী, একটা দৃপ্ত, মহিমান্বিত তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পারিবারিক জীবনে নারীর প্রভাব খুব active, এমন কি, aggressive ধরনের। ইহা অন্তরালবর্তিনীর নীরব কর্মনিষ্ঠা নহে—ইহা কেবল পিছনে থাকিয়া সনাতন আদর্শের পথে সংসার-রথকে ঠেলা দেয় না। ইহা নূতন আদর্শের প্রবর্তনের দ্বারা সংসার-যাত্রাকে অভিনব পথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করে; স্নেহ-প্রেম-ধারাকে নূতন প্রণালীতে প্রবাহিত করিয়া পারিবারিক জীবনের ভার-কেন্দ্রটি সরাইয়া দেয়। বিন্দু, নারায়ণী, বিরাজ-বৌ, শৈলজা, পার্বতী, ললিতা—ইহাদের মধ্যে নারী-সুলভ কোমলতা ও স্নেহশীলতার সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল বিদ্যুৎ-রেখার মত একটা তীব্র, তীক্ষ্ণ দীপ্তি আছে। ইহারা কেবল ঘর সাজাইবার উপকরণ বা মোমের পুতুল নহে, এমন কি নিশ্চেষ্ট নিয়মানুবর্তিতা বা নীরব সহিষ্ণুতাও ইহাদের চরম প্রশংসা নহে। ইহারা যেখানে সমাজের অনুবর্তন করে, সেখানে চোখ বুজিয়া নহে, সেখানেও স্বাধীনচিন্তা ইহাদিগকে অন্ধ গতানুগতিকতা হইতে রক্ষা করে। পার্বতী তাহার বাল্য-প্রেমকে অস্বীকার না করিয়া, ললিতা শেখরের সহিত তাহার সম্বন্ধটিকে অচ্ছেদ্য বলিয়া বরণ করিয়া এই স্বাধীন-চিত্ততার পরিচয় দিয়াছে; তাহাদের সামাজিক আদর্শের অনুবর্তনেও কতকটা স্বাধীনতা আছে। বিন্দু, শৈলজা, প্রভৃতি একান্নবর্তী গৃহস্থ পরিবারের বধূ; কিন্তু পারি-

যান্ত্রিক কর্তব্যের নিষ্পেষণে তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্বকে অবলুপ্ত হইতে দেয় নাই। নারী-চরিত্রের দৃপ্ত মহিমা তাহাদের প্রত্যেক বাক্য ও কার্য হইতে ক্ষরিয়া পড়িতেছে। তাহাদের বিদ্রোহ সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নহে, তাহাদের স্নেহ-প্রেমের কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে। এইরূপে শরৎসাহিত্যে আমাদের গৃহস্থ পরিবারের নারীর বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইয়াছে।

(৩)

'অরক্ষণীয়া', 'বামুনের মেয়ে' ও 'পল্লীসমাজ' এই তিনটি উপন্যাসে সামাজিক অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাদের মধ্যে যে সামান্য রকমের প্রণয়-চিত্র আছে, সমাজের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতাকে ফুটাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই তাহাদের অবতারণা হইয়াছে। সুতরাং এইগুলিকে প্রধানতঃ সমাজ-ব্যবস্থার সমালোচনা-হিসাবে বিচার করিতে হইবে। এই সমাজ-সমালোচনা বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসে নূতন নহে, বরং ইহার সহিত উপন্যাসের উৎপত্তির নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত উপন্যাসেই হিন্দু-সমাজের সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারপ্রবণতার বিরুদ্ধে শ্লেষ ও ইঙ্গিত বিদ্যমান। অন্যান্য অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের ঔপন্যাসিকদের ইহাই প্রধান উপজীব্য বিষয়। তাহা হইলে শরৎচন্দ্রের সমাজ-সমালোচনার বিশেষত্ব কি? রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনায় তাঁহার বিশেষত্ব এই যে, রবীন্দ্রনাথ সাধারণতঃ এই বিষয়ের খুব ব্যাপক ও গভীর বিশ্লেষণ করেন না, প্রসঙ্গক্রমে সামাজিক দুর্নীতিগুলির প্রতি কটাক্ষপাত বা অঙ্গুলিসংকেত করেন—ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যালোচনাই তাঁহার প্রধান বিষয়। 'গোরা'তে তিনি সমস্ত সমাজ-ক্ষেত্রের উপর দৃষ্টিপাত করিয়াছেন বটে, কিন্তু এখানেও তাঁহার সমালোচনা যুক্তি-তর্কের স্তর অতিক্রম করিয়া ভাব-গভীরতার দিকে অগ্রসর হয় নাই। বিশেষতঃ 'গোরা'তে যে সমস্ত সমাজ-ও-ধর্ম-সমস্যা আলোচিত হইয়াছে, যথা—সাকার-নিরাকার উপাসনা, বা জাতিভেদ, বা আচার-ব্যবহারে অত্যন্ত শুচিতা-সংরক্ষণ—সেগুলি বিচার-বিতর্কের কথা, ব্যবহারিক জীবনে তাহাদের প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া খুব মারাত্মক নয়। পক্ষান্তরে, শরৎচন্দ্র, যে সমস্ত দুষ্ট-ব্রণ প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজদেহে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাদের বিষ সমাজের অস্থিমজ্জায় ছড়াইয়া পড়িয়া তাহার স্বাস্থ্য ও শক্তির মূলোচ্ছেদ করিয়াছে, সেই সমস্ত দুরপনেয় কলঙ্ক-চিহ্নের প্রতি স্বীয় সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। সমাজ-বিধির এই নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য ও প্রতিকূলতা আমাদের আধি-ব্যাধিজর্জর, অভাবদৈন্যপীড়িত সংসারযাত্রাকে কত নিরর্থক দুর্বিষহ করিয়া তোলে, এই সমস্ত সমাজরচিত, শাস্ত্র-নির্দিষ্ট বাধার চারিদিকে কত অশ্রু-জল উদ্বেলিত হইয়া উঠে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও পারিবারিক সুখ-শান্তিকে যে ইহারা কিরূপ দুশ্ছেদ্য নাগপাশের বন্ধনে বাঁধিয়াছে—শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আমাদের সামাজিক জীবনের এই করুণ, গভীর ব্যথাভরা দিক্‌টার প্রতিই সর্বাপেক্ষা বেশি ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু-সমাজের বিবাহবিধিগুলি যৌক্তিক কি অযৌক্তিক, তাহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কি কি যুক্তিতর্ক তোলা যাইতে পারে তাহা লইয়া তিনি মাথা ঘামান নাই; কিন্তু এই বিবাহ-বিধিগুলি বর্তমান অবস্থার কত অনুপযোগী, আমাদের প্রতিদিনের পারিবারিক জীবনে যে ইহারা কত অস্বাচ্ছন্দ্য, নিষ্ঠুরতা ও নৈতিক হীনতার হেতু হয় ইহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়। 'পল্লীসমাজ'-এ আচারনিষ্ঠা ও সমাজ-রক্ষার অজুহাতে যে কতটা ক্রূরতা, নীচ স্বার্থপরতা ও হেয় কাপুরুষতা আমাদের

সমর্থন লাভ করিয়াছে, আমাদের জীবন যে কি পরিমাণ পঙ্গু ও অক্ষম হইয়া পড়িতেছে—ইহাই তিনি চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন ।

অন্যান্য লেখকের সহিত তুলনায় শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এই অত্যাচার-কাহিনী আরও করুণ-রসপ্রধান ও মর্মস্পর্শী হইয়াছে। তাঁহার বিশ্লেষণ যেমন তীক্ষ্ণ ও অভ্রান্তলক্ষ্য, তাঁহার করুণরস-সঞ্চার করিবার ক্ষমতাও সেই পরিমাণে অসাধারণ। সাধারণ ঔপন্যাসিক এই অত্যাচার কেবল একটা বহিঃশক্তির পীড়নরূপেই চিত্রিত করিয়া থাকেন—তাহাদের অত্যাচার-বর্ণনাতে প্রায়ই একটা আতিশয্য-দোষ, অতিরঞ্জন-প্রবর্তনা লক্ষ্য করা যায়। শরৎচন্দ্রের বর্ণনার মধ্যে সর্বত্রই একটা মিতভাষিতা ও কলাসংযম পরিস্ফুট। তিনি জানেন যে, সামাজিক উৎপীড়নের তীক্ষ্ণ-তম খোঁচা আসে বাহির হইতে নয়, নিজ পরিবারস্থ ব্যক্তি বা সাধারণতঃ স্নেহশীল অভি-ভাবকের নিকট হইতে। 'অরক্ষণীয়া'তে জ্ঞানদার অপমান অসহনীয়তার চরম সীমা পৌঁছায় তখনই, যখন তাহার স্নেহশীল মাতা পর্যন্ত ভ্রান্ত ধর্মসংস্কারের নিকট নিজ স্বাভাবিক অপত্যস্নেহ বিসর্জন দিয়া এই বিশ্বব্যাপী উৎপীড়নের কেন্দ্রস্থলে গিয়া দণ্ডায়মান হন। সমাজের ক্রূরতম নির্যাতন সেইখানে যেখানে তাহার বিষাক্ত প্রভাবে মাতৃস্নেহ পর্যন্ত নিষ্ঠুর জিঘাংসাতে রূপান্ত-রিত হয়। স্বর্ণমঞ্জরীর অবিশ্রান্ত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সে কোনও রকমে সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু নরকভয়-ভীত দুর্গামণির কঠিন অনুযোগ ও কঠিনতর পদাঘাত ধৈর্যের বন্ধনকে নিঃশেষে ছিন্ন করে। সর্বাপেক্ষা সহনাতীত অপমান আসিয়াছে জ্ঞানদার নিজের হাত হইতে—বিবাহের পণ্য-শালায় নিজেকে বিকাইবার জন্য তাহার স্বহস্ত-রচিত, ব্যর্থ সজ্জানুষ্ঠানই তাহার নারীত্বের হীনতম লাঞ্ছনা। এই চরম লজ্জার সহিত তুলনায় অতুলের প্রত্যাখ্যান ও কৃতঘ্নতা একটা অতি সাধারণ, উপেক্ষণীয় অপমান বলিয়াই মনে হয়। গ্রন্থকার শেষ পরিচ্ছেদে জ্ঞানদার মাতৃশ্মশানে তাহার সহিত অতুলের একটা পুনর্মিলন ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু এই নিতান্ত ব্যর্থ প্রয়াস অপমানেরই একটা প্রকারভেদ বলিয়া আমাদের বুকে গিয়া আঘাত করে। এই দুর্ভা-গিনী মেয়েটার এমনই অদৃষ্ট যে, তাহার সৃষ্টিকর্তাও সহানুভূতির ছদ্মবেশে তাহার বক্ষে আর একটা সুদুঃসহ অপমানের শেলাঘাত করিয়া বসিয়াছেন। 'বামুনের মেয়ে' গল্পে এই অসহনীয় তীব্রতা নাই। কৌলীন্য-প্রথার কুফল ও কৌলীন্য-গর্বের অসংগতি ও অন্তঃসারশূন্যতা ইহার আলোচ্য বিষয়। এই ব্যাধির জীবাণু আমাদের সমাজদেহে আর সেরূপ সজীব ও ক্রিয়াশীল নাই, ইহা এখন একটা অতীতের স্মৃতি মাত্র। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ-নিবারণ-বিষয়ক পুস্তিকা-সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র এই মুমূর্ষু রাক্ষসের বিরুদ্ধে ধৃতাস্ত্র লেখককে ডন্ কুইক্সোটের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। তখন যে মুমূর্ষু ছিল, এখন সে নিশ্চয়ই মৃত। সুতরাং কৌলীন্য-প্রথার উপর শরৎচন্দ্রের আক্রমণকে নিতান্তই মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। অতএব এই উপন্যাসে আলোচিত সমস্যা আমা-দিগকে সেরূপ গভীরভাবে স্পর্শ করে না। অরুণ ও সন্ধ্যার প্রেমও ম্লান ও বর্ণবিরল হইয়াছে। তবে উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্রগুলি—রাসু বামনী, গোলক চাটুয্যে, জগদ্ধাত্রী ও প্রিয় মুখুজ্যে—বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সমাজ-সমালোচনার উপন্যাসগুলির মধ্যে 'পল্লী-সমাজ'-এরই নিঃসন্দেহ প্রাধান্য। এই উপন্যাসে কোন একটি বিশেষ সামাজিক কুপ্রথার প্রতি কটাক্ষপাত হয় নাই, কিন্তু হিন্দু-

সমাজের প্রকৃত আদর্শ ও মনোভাবের, ইহার সমগ্র জীবনযাত্রার একটা নিখুঁত প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে। অঙ্কনের বাস্তবতায়, বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতায় ও সহানুভূতির গাঢ়তায় ইহা অনুরূপ বিষয়ের সমস্ত উপন্যাস হইতে বহু উচ্চে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। আমরা আমাদের সামাজিক বিধিব্যবস্থাগুলির সনাতনত্বের ও উৎকর্ষের বড়াই করি; শরৎচন্দ্র নির্মম বিশ্লেষণের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, আমাদের গর্বের এই প্রথাগুলি প্রকৃতপক্ষে আমাদিগকে কোন্ সর্বনাশের রসাতলে লইয়া গিয়াছে! শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বিদেশী সমালোচকের অবজ্ঞা-মিশ্রিত বিদ্রূপ বা সস্তা মুরুব্বিয়ানা নাই, আছে অভ্রান্ত বিশ্লেষণ ও গভীর আত্মগ্লানি। সামাজিক দলাদলির চিত্র-গুলিতে লেখক যে অপরিসীম নীচতা, কাপুরুষতা ও কৃতঘ্নতার দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন তাহাতে আমাদের সমাজ-জীবনের মূল নৈতিক আদর্শগুলি-সম্বন্ধেই গভীর সন্দেহ জাগিয়া উঠে। এই সমস্ত মূলগত আদর্শও নিন্দনীয় ছিল না—ইহারা পশ্চিমের ব্যক্তি-সর্বস্ব আত্মস্বাতন্ত্র্য অপেক্ষা উচ্চতর পর্যায়ভুক্ত। সমস্ত গ্রামের সুখ-দুঃখ, আচার-ব্যবহার, কর্ম-অবসরকে একটা সাধারণ আদর্শে নিয়ন্ত্রিত করা, সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার যথাযোগ্য আসন দেওয়া, কেবল অর্থমর্যাদার নিকট মস্তক অবনত না করিয়া মদোদ্ধত ধনগর্বের উপর সমাজ-শাসনের প্রভুত্ব জারি করা, ছোট-বড়, ইতর-ভদ্র, উচ্চ-নীচ সকলের মধ্যেই একটা স্নেহ-ভক্তি-আত্মীয়-তার স্বর্ণসূত্র রচনা করা,—বোধহয় ইহা অপেক্ষা উচ্চতর সামাজিক আদর্শ কল্পনা করা যায় না। কিন্তু এই অত্যন্ত সুচিন্তিত পাকা ব্যবস্থার মধ্যে একটা ছিদ্র রহিয়া গিয়াছিল—ব্যক্তি-স্বাধী-নতার অনুচিত সংকোচ ও উচ্চবর্ণের উপর নিম্নবর্ণের একান্ত দ্বিধালেশহীন নির্ভর। যখন কালক্রমে আমাদের সুস্থ, সতেজ কর্মজ্ঞান ও সামাজিক কর্তব্য-বুদ্ধি বিকৃত ও জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িল, তখন এই রন্ধ্র পথে শনি প্রবেশ করিয়া আমাদের সমস্ত সামাজিক জীবনকে ক্লিষ্ট ও ব্যাধিজর্জর করিয়া তুলিল। তখন সমাজ-নিয়ন্ত্রণের প্রত্যেক অনুষ্ঠানটিই অপ্রতিহত যথেচ্ছাচার, নির্লজ্জ স্বার্থসিদ্ধি ও হৃদয়হীন, পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার লীলাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল। সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে, এই গ্লানিকর পরাধীনতার বিষ আমাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া আমাদের বিচার-বুদ্ধি ও হিতাহিত-জ্ঞানকে পর্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহারই ফলে আমরা আমাদের উপচিকীর্ষার পর্যন্ত গুণগ্রহণ করিতে ভুলিয়া গেলাম, আমাদের শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি গিয়া পড়িল সেই সনাতন অত্যাচারীদের চরণপ্রান্তে, আর উপকারের প্রতিদান হইল চরম কৃতঘ্নতা। এই হেয়তম মনোবৃত্তির ফলে বেণী ও গোবিন্দ সমাজপতি আর রমেশ একঘরে। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'-এর কৃতিত্ব এই যে, তিনি কয়েকটিমাত্র সুনির্বাচিত দৃশ্যের সাহায্যে এই জঘন্য মনোবৃত্তির উচিত প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ একটা প্রবল ঘৃণা ও ধিক্কারবোধ জাগাইয়া দিয়াছেন। বিদেশী ও বিধর্মীর অবিশ্রান্ত আক্রমণ যে পুঞ্জীভূত ঔদাসীন্য ও জড়তার গণ্ডার-চর্ম স্পর্শ পর্যন্ত করিতে পারে নাই, এই প্রতিভাশালী স্বজাতীয় লেখকের হস্তনিক্ষিপ্ত একটিমাত্র তীর তাহার ঠিক মর্মস্থল ভেদ করিয়াছে।

'পল্লীসমাজ'-এ খাঁটি সমাজ-সমালোচনা ছাড়া আর যে বিষয় আছে তাহার কেন্দ্র বিশ্বেশ্বরী জ্যাঠাইমা ও রমা। নিছক বিশ্লেষণ ও সমালোচনার দ্বারা একটা তীব্রতা আসে বটে কিন্তু প্রকৃত ভাব-গভীরতা লাভ করা যায় না। 'পল্লীসমাজ'-এ যে সামাজিক আদর্শের বিকৃতি দেখান হইয়াছে তাহার সুস্থ সতেজ ভাবের প্রতীক বিশ্বেশ্বরী। তিনি একদিকে রমেশ ও অপরদিকে

এই পঙ্গু, নির্জীব ও ব্যাধিগ্রস্ত পল্লীসমাজের ঠিক মাঝখানে দাঁড়াইয়া উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করিতে, রমেশের উচ্চভাবপ্রধান আদর্শের সঙ্গে পল্লীজীবনের বাস্তব অবস্থার একটা সামঞ্জস্য সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সমাজের লোকদের দীন অসহায় ভাব ও আত্মঘাতী মূঢ়তার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া জ্যাঠাইমা রমেশের মনে তাহাদের বিরুদ্ধে ঘৃণার পরিবর্তে একটা অনুকম্পার ভাব জাগাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই এবং এই মধ্যস্থতার জন্য তাঁহার চরিত্রটি অনেকটা অবাস্তবতাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মুখ হইতে অনেক গভীর সহানুভূতিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিতে পাই, কিন্তু তাহাদের উৎস-মুখ যে কোথায় তাহার সন্ধান পাই না। পল্লীজীবনে তাঁহার উদারতা ও স্নেহশীল, ক্ষমাপরায়ণ হৃদয়ের কোন প্রভাবও লক্ষ্য হয় না। নিজের ছেলে বেণীকে ত তিনি একটুও প্রভাবান্বিত করিতে পারেন নাই, এমন কি যাহার সঙ্গে তাঁহার একটু সত্যকার স্নেহের সম্পর্ক ছিল ও যাহার শ্রদ্ধাভক্তির উপর তাঁহার একটু সত্যকার দাবী ছিল সেই রমাকে পর্যন্ত প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে তিনি একটু মাত্রও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন নাই। রমেশের গৃহে শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার অতর্কিত প্রকাশ্য আবির্ভাবের পরই তিনি আবার গৃহকোণের নীরবতার মধ্যে আত্মগোপন করিলেন; কেবল রমেশ ও রমার সহিত মাঝে মাঝে কথোপকথন ও সস্নেহ উপদেশদান ছাড়া আর তাঁহার কর্মজীবনের কোন নিদর্শন রহিল না। তাঁহার প্রগাঢ় সহানুভূতি ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সহিত এই নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্টতার ঠিক সামঞ্জস্য হয় না। তাঁহার চরিত্রের সঙ্গে 'গোরা'র আনন্দময়ীর সাদৃশ্য খুব সুস্পষ্ট। কিন্তু আনন্দময়ীর উদারতার ও লৌকিক আচারলঙ্ঘনের যেমন সুস্পষ্ট কারণ নির্দেশ হইয়াছে বিশ্বেশ্বরীর ক্ষেত্রে সেরূপ কিছু মিলে না।

কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে যাহা সর্বাপেক্ষা জটিল ও দুরধিগম্য তাহা রমেশ ও রমার পরস্পর সম্পর্ক লইয়া। তাহাদের মধ্যে যে প্রকাশ্য সামাজিক ও বৈষয়িক দ্বন্দ্ব, তাহাকে অতিক্রম করিয়া একটি অন্তর্গূঢ়, প্রাণপণ চেষ্টায় নিরুদ্ধগতি, প্রেমের আকর্ষণলীলা বিপরীত স্রোতে চলিয়া যাইতেছে। এই প্রেমের বহিঃপ্রকাশ খুব অভিনব। ইহা প্রেমাস্পদকে কঠিন আঘাত করিতে, এমন কি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া জেলে পাঠাইতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু প্রত্যেক আঘাতের পরই একটা প্রবলতর প্রতিঘাত, একটা তীব্র অনুশোচনা ইহার গোপন অস্তিত্বের পরিচয় দিয়াছে। যাহা হয়ত মূলতঃ বিবেকের দংশন বা চরিত্র-গৌরবের প্রাপ্য মুগ্ধ প্রশংসা, তাহারই ভিতর দিয়া প্রেম নিজ তীব্রতর গরল ও প্রবলতর জীবনীশক্তি ঢালিয়া দিয়াছে। রমেশের বিপক্ষতাচরণ করিতে রমার ইতস্ততঃ ভাব, তাহার প্রতি সস্নেহ অনুযোগ বা হিতকামনার সতর্কবাণী—ইহাদের পশ্চাতে ছদ্মবেশী প্রেমের ত্রস্ত, গোপন পদক্ষেপ শুনা যায়। কেবল একবার মাত্র তারকেশ্বরের বাসাবাড়িতে একটি রাত্রির সেবা-যত্নের মধ্য দিয়া অর্ধ-চেতন প্রেম নিজের সহজ নিক্রমণপথ রচনা করিয়া লইয়াছিল। এই অপ্রকাশিত প্রেমের ক্ষীণ আভাস স্থূল স্বার্থ-সংঘাতের মধ্যে সূক্ষ্ম রসানুভূতির সঞ্চার করিয়াছে, বহির্দ্বন্দ্বের কাহিনীর উপর অন্তর্বিক্ষোভের করুণ অর্থ-গৌরব আনিয়া দিয়াছে। বিষয়টির এই রূপান্তর-সাধনই শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়।

(৪)

'দেনা-পাওনা' উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থ হইতে অনেকটা ভিন্নজাতীয়। নিজ বিবাহিত পরিত্যক্তা স্ত্রী, অধুনা চণ্ডীগড়ের ভৈরবী ষোড়শীর সংস্পর্শে, অত্যাচারী, লম্পট, পাপ-

পুণ্যজ্ঞানহীন জমিদার জীবানন্দের অভূতপূর্ব পরিবর্তন এই উপন্যাসটির মূল বিষয়। দারুণ দুষ্ক্রিয়াসক্ত, পাপপঙ্কে আকণ্ঠ-নিমগ্ন জীবানন্দের অন্তরে যে প্রণয়-প্রবৃত্তি ও ভদ্র-জীবন-যাপনের স্পৃহা সুপ্ত ছিল তাহা ষোড়শী-সংসর্গের মায়াদণ্ডস্পর্শে অকস্মাৎ নবজীবন লাভ করিয়া ফুলে-ফলে মঞ্জরিত হইয়া উঠিল। ষোড়শীর চরিত্র-গৌরবের অসাধারণত্ব বুঝাইবার জন্য লেখক দেবী-মন্দিরের ভৈরবীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে বিশেষ ধর্মসংস্কার প্রচলিত আছে, তাহার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। এই ভৈরবীদের বাহ্য কৃচ্ছ্রসাধন ও আত্মনিগ্রহের অন্তরালে একটা কুৎসিত ভোগলালসার উচ্ছৃঙ্খলতা প্রায় প্রকাশ্যভাবেই অভিনীত, ইহা ভৈরবী-জীবনের একটা বিশেষত্ব। এই কদাচার শাস্ত্রবিধি-অনুসারে গর্হিত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে উপেক্ষিত হইয়া থাকে—ইহাদের চরিত্রভ্রংশ একটা অবশ্যম্ভাবী অপরাধের ন্যায় একটু বিদ্রূপ-মিশ্রিত উপেক্ষার চক্ষেই সকলে দেখিয়া থাকে। কিন্তু প্রয়োজন হইলে এই উপেক্ষিত অপরাধ হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত গুরুত্ব লাভ করে ও আমাদের সামাজিক দলাদলির আগুন জ্বালাইতে ইন্ধনের কাজ করে। এখানে ষোড়শী সম্বন্ধে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। তাহার কল্পিত অপরাধের দণ্ড প্রদান করিতে আমাদের সমাজপতিরা হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহার দেবীর সেবাইত-পদের জন্য অযোগ্যতার বিষয়ে তাঁহাদের সুপ্ত বিবেক-বুদ্ধি হঠাৎ অতিমাত্রায় জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে—বিশেষতঃ যখন এই ধর্মানুষ্ঠানের পুরস্কার, মন্দিরের সম্পত্তি ও দেবীর বহুকাল-সঞ্চিত অলংকারাদির সদ্যঃ লাভ। ধর্মজ্ঞানের পশ্চাতে যখন বিষয়-স্পৃহা ঠেলা দেয় তখন তাহার বেগ অনিবার্য হইয়া থাকে। সুতরাং এই ধর্মপ্রাণ সমাজের সমস্ত সম্মিলিত শক্তি যে অতি নির্মমভাবে একটি অসহায়া রমণীর উপর গিয়া পড়িবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। ষোড়শীর-চরিত্রের প্রকৃত গৌরব এই যে, পাপপথে পদার্পণের জন্য পূর্ব-বর্তিনীদের নজির ও সমাজের প্রায় অবাধ সনন্দ দেওয়া থাকিলেও তাহার সহজ ধর্মবুদ্ধি তাহাকে সেই সনাতন পথে পা বাড়াইতে দেয় নাই।

তাহার পর মন্দিরের সম্পত্তির অধিকারিণী বলিয়া ও পূজা-সংক্রান্ত কার্যে সর্বদা পুরুষের সহিত সংস্রবের প্রয়োজন থাকায় ষোড়শীর চরিত্রে অনেক পুরুষোচিত গুণের বিকাশ হইয়াছে —(বিপদে স্থিরবুদ্ধি, অচঞ্চল সাহস ও একান্ত আত্মনির্ভরশীল একটা দুর্ভেদ্য নিঃসঙ্গতার সহিত রমণী-সুলভ কোমলতা মিশিয়া তাহার চরিত্রকে অপূর্ব মাধুর্যে ও গাম্ভীর্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। এই অপূর্ব চরিত্রই জীবানন্দকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করিয়া তাহার পাষাণ প্রাণকে দ্রবীভূত করিয়াছে ও তাহাকে প্রথম প্রণয়ের স্বাদ দিয়াছে। জীবানন্দের অসংকোচ পাপানুষ্ঠানের মধ্যে অন্ততঃ লুকোচুরির হীন কাপুরুষতা ছিল না, এবং এই সভ্যভাষণের পৌরুষ ও কপটাচারের প্রতি অবজ্ঞাই তাহার চরিত্রে মহত্ত্বের বীজ; প্রেমের স্পর্শে ইহা একটা অকপট অনুতাপ ও সংশোধনের দৃঢ় সংকল্পরূপে আত্মপ্রকাশ করিল।) তাহার মনে প্রেমের অলক্ষিত সঞ্চার, তাহার পক্ষে একান্ত অভিনব দ্বিধা-সংকোচ-জড়িত অন্তর্দ্বন্দ্ব অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। গ্রাম্য সমাজপতিদের চরিত্রও অল্প কয়েকটি কথায় বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে নির্মল-হৈমবতীর আখ্যান মূল গল্পের সহিত নিবিড় ঐক্য লাভ করে নাই। (ফকির সাহেবেরও উপন্যাসে বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। তিনি বাস্তবতা-প্রধান যুগে আদর্শবাদপ্রিয়তার শেষ চিহ্নস্বরূপই প্রতীয়মান হন।) ভৈরবী-জীবনের লৌকিক আচার-ব্যবহারকে বিশেষভাবে এই

উপন্যাসের বৈচিত্র্যের হেতু হইয়াছে এবং এই ভিত্তির উপরই শরৎচন্দ্র ষোড়শী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

নির্মল ও হৈমর দাম্পত্য জীবনের দৃষ্টান্ত ষোড়শীর মনে সংসার বাঁধিবার বাসনাকে উদ্রিক্ত করিয়া তাহার জীবনের ভবিষ্যৎ পরিণতির হেতুস্বরূপ হইয়াছে এবং উপন্যাসমধ্যে এই খণ্ড-কাহিনীর প্রবর্তনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহাই—এইরূপ অভিমত অনেক সমালোচক কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। হয়ত ষোড়শী যখন নবোন্মেষিত স্বামি-প্রেমে কিছুটা উন্মনা ও চলচ্চিত্ত হইয়া পড়িয়াছে, যখন তাহার ভৈরবী জীবনের আদর্শ ও সংস্কার এই প্রণয়াকাংক্ষার প্রাবল্যে কতকটা শিথিল হইয়াছে মনের সেই দোদুল অবস্থায় হৈমর দাম্পত্য জীবনের নিরুদ্বেগ সুখ-শান্তি তাহাকে খানিকটা স্পর্শ করিয়া থাকিবে। বিশেষত সমাজের সম্মিলিত বিরুদ্ধতার মধ্যে একমাত্র হৈমর হিতৈষণা ও সমবেদনা তাহাকে হৈমর জীবনাদর্শের প্রতি কতকটা আকৃষ্ট করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সমস্ত বিষয়টি অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে এই অভিমতকে যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। প্রথমত ষোড়শীর চিত্তে স্বামি-প্রেম-সঞ্চার হৈমর সহিত পরিচয়ের পূর্বেই ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়ত ষোড়শীর স্বচ্ছদৃষ্টির ও তীক্ষ্ণ অনুভূতির নিকট হৈমর তথাকথিত দাম্পত্য-প্রেম-সৌভাগ্যের অন্তঃসারশূন্যতা গোপন থাকে নাই। যে নির্মল তাহার প্রণয়ের লোভে ঘন ঘন তাহার সঙ্গে সাক্ষাতের অবসর খোঁজে, দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রচুর আশ্বাসের বারিসেকে তাহার মনে প্রণয়ের বীজটি অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতে চাহে, হৈমকে ফাঁকি দিয়া যে এই রঙীন আবেশটিকে ঘনীভূত করার স্বপ্ন দেখে, সেই নির্মলকে অংশীদাররূপে লইয়া যে প্রেমের কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা বাহিরের বিজ্ঞাপনের চটক সত্ত্বেও অন্তরে যে তাহা দেউলিয়া এ সত্য ষোড়শীর নিকট নিশ্চয় দিবালোকের মত স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং হৈম-নির্মলের দাম্পত্য-জীবনে যে ষোড়শীর লোভ করিবার মত বিশেষ কিছু ছিল ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। তৃতীয়ত ষোড়শীর আত্মনির্ভরশীল, বলিষ্ঠ প্রকৃতির উপর অপরের জীবনের প্রভাব যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইবে ইহাও সম্ভব মনে হয় না। বহুকাল বিস্মৃত প্রথম কৈশোরের মুগ্ধ প্রণয়াবেশের স্মারক অলকা নামটি যে তাহার দীর্ঘদিন রুদ্ধ প্রেমের কপাটটিকে যেন মন্ত্রবলে উন্মুক্ত করিয়াছে ইহাও তাহার অনন্যনির্ভর স্বাধীন চিত্ততারই নিদর্শন। এই নাম মাধুর্যের অসাধ্যসাধনের কৃতিত্ব পরের নিকট ধারকরা প্রভাবের সাহায্য গ্রহণের দ্বারা নিশ্চয়ই খণ্ডিত ও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাছাড়া উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাস আলোচনা করিলেও ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হৈমর প্রতি এতটা গুরুত্ব আরোপ লেখকের অভিপ্রেত ছিল না—উহাকে উপন্যাসের একটি প্রধান নিয়ামক শক্তিরূপে লেখক কল্পনা করেন নাই। হৈমর দৃষ্টান্তে যদি ষোড়শীর সংসার পাতিবার ইচ্ছা জাগ্রত হইয়া থাকে, তবে ফকির সাহেবের প্রভাবে তাহার মনে বৈরাগ্যের প্রেরণা প্রবলতর হইয়াছে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাহার ভৈরবীত্বই তাহার বৈরাগ্য মন্ত্রে দীক্ষার মূল উৎস। আসল কথা, হৈমর দাম্পত্য-প্রেম ও ফকির সাহেবের সেবাধর্ম ও সংসার বন্ধনহীন নির্লিপ্ততা এই দুই একই পর্যায়ের প্রভাব; ইহা হয়ত বাহির হইতে ষোড়শীর অন্তর্দ্বন্দ্ব-মথিত জীবনের দুই বিপরীতমুখী আবেগকে কতকটা সমর্থন করিয়াছে, কিন্তু তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রেরণার মূল রহস্যের সহিত একীভূত হয় নাই। তাহার অন্তরে

ধ্রুবতারার অনির্বাণ জ্যোতি তাহাকে পথিপার্শ্বস্থ গৃহপ্রদীপ যাত্রাপথে খানিকটা আলোক বিকীরণ করিতে পারে, কিন্তু ইহা তাহার পথনির্দেশের গৌরব দাবী করিতে পারে না।)

'দত্তা' উপন্যাসখানি সহজ ও নির্দোষ প্রেমের সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র। ইহার মধ্যে খুব জটিল বিশ্লেষণ বা কোনরূপ কলুষ-আবিলতার স্পর্শ নাই অথচ নরেন-বিজয়ার ভালবাসাটি খুব স্বাভাবিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া, একদিকে সরল হাস্য-কৌতুক ও অন্যদিকে শিশুসুলভ ক্রোধ, অভিমান ও বিস্ময়বিমূঢ়তার অন্তরালে ধীরে ধীরে স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছে।। এই উপন্যাসে স্বতঃস্ফূর্ত, অপ্রতিরোধনীয় প্রেম ও অঙ্গীকার-বদ্ধ কর্তব্য-পালন বা প্রতিশ্রুতিরক্ষার পার্থক্য-প্রদর্শনই প্রধান বিষয়। বিলাস ও বিজয়ার মধ্যে যে বিশেষ বন্ধন তাহার মূলসূত্র অনুসন্ধান করিতে গেলে উপন্যাসের পূর্ববর্তী উপাখ্যান আলোচনা করিতে হইবে। জগদীশ, রাসবিহারী ও বনমালীর বাল্যপ্রণয়ই বিলাসের বিশেষ দাবী-দাওয়ার মূল কারণ। বনমালী রাসবিহারীর পুত্র বিলাসের সহিত তাঁহার কন্যা বিজয়ার বিবাহ অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছিলেন, এই বিশ্বাস রাসবিহারী বিজয়ার মনে বদ্ধমূল করিতে প্রাণপণ চেষ্টা পাইয়াছে, এবং বিজয়াও পিতার এই প্রতিজ্ঞার মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য স্বাধীন ইচ্ছাকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু পরে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ইহাই বনমালীর মনোগত অভিপ্রায় ছিল না। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জগদীশের পুত্র নরেনের জন্মদিনে তাহার সহিত নিজ অজাতা কন্যার বিবাহ-প্রস্তাব করেন, নরেনকে নিজ খরচে বিলাত পাঠান ও তাহাকেই যে শেষ পর্যন্ত জামাতৃপদে বরণ করিয়াছিলেন তাহার অকাট্য লিখিত প্রমাণ নরেন নিজ বিক্রীত বাড়ির কাগজপত্রের মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছে। রাসবিহারী তাহার স্বভাব-সিদ্ধ ধূর্ততাব সহিত সর্বপ্রথমে বিজয়া ও নরেনকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, ও নরেনের সম্বন্ধে তাহার বন্ধুর আন্তরিক ইচ্ছাকে বিজয়ার নিকট গোপন রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং বিজয়ার সম্পত্তির উপর একটা কড়া অভিভাবকত্বের অধিকার দখল করিয়া বসিয়াছে। নরেনের বিরুদ্ধে বিজয়ার মনে একটা অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের ভাব জাগাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও বিজয়া ধীরে ধীরে তাহার উদার, ক্ষমাশীল, শিশুর ন্যায় সরল ও অসহায় প্রকৃতির প্রতি অনিবার্য বেগে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। পিতাপুত্রের নরেনের প্রতি অন্যায় ও ক্ষমালেশহীন বিরুদ্ধাচরণের দ্বারাই বিজয়ার সমবেদনা নিবিড়তা লাভ করিয়া প্রণয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। এক অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের ঘোরফের লইয়া প্রেম অনেকটা পরিণতি লাভ করিয়াছে—ইহার দ্বারা অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক বা না হউক, তাহাতে প্রণয়ের বীজাণু আবিষ্কৃত হইয়াছে। নরেনের প্রতি ব্যবহারের জন্যই বিজয়া তাহার ভবিষ্যৎ শ্বশুর ও স্বামীর প্রকৃত চরিত্র-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, ও তাহাদের অত্যাচার ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে তাহার ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি কেবল লোকলজ্জার খাতিরে ও অনুক্ষণ সংঘাতে পরিশ্রান্ত হইয়াই সে মনের ইচ্ছার অপেক্ষা মুখের কথাটাকেই প্রাধান্য দিতে প্রস্তুত ছিল—শেষ মুহূর্তে নলিনীর আগ্রহাতিশয্যে সমস্ত ওলট-পালট হইয়া অস্বীকৃত প্রেমেরই জয় হইল।

এই গ্রন্থমধ্যে রাসবিহারী ও বিলাসবিহারীর চরিত্র-সৃষ্টি উচ্চাঙ্গের হইয়াছে। ভণ্ডামির চিত্রে রাসবিহারীর স্থান সহজেই শীর্ষস্থানীয়। ধর্মপরায়ণতার আবরণে প্রচণ্ড স্বার্থপরতা, শান্ত, স্নেহশীল কথাবার্তার অন্তরালে ক্ষুরধার বিষয়বুদ্ধি ও অবিচলিত সংকল্প তাহার চরিত্রে

অনন্যসাধারণ সজীবতা আনিয়াছে। বিলাসের ক্রোধোন্মত্ত অধৈর্য ও ইতর আস্ফালনকে সে বরাবরই প্রণয়ীসুলভ অভিমান বলিয়া লুকাইতে, পুত্রের সমস্ত অপরাধকে অনুকূল ব্যাখ্যা দ্বারা লঘু করিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাহার ধৈর্য, আত্মসংযম, কার্যসিদ্ধির জন্য নূতন নূতন উদ্ভাবন-কৌশল—বিজয়ার বিদ্রোহকে ব্যর্থ করিবার জন্য অব্যর্থ পাকা চাল—সমস্তই আমাদের ভূয়সী প্রশংসার উদ্রেক করে। বিলাসের ইতর অসহিষ্ণুতা, ক্রোধদমনে একান্ত অক্ষমতা—তাহার সমস্ত বাহ্য ভদ্রতা ও চাকচিক্যের আবরণ ছিন্ন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। বিজয়ার ইচ্ছার উপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করিতে গিয়া সে তাহার বাবার সুকল্পিত উদ্দেশ্য সমস্তই নষ্ট করিয়া দিল। হিতৈষী পিতার সতর্কবাণী ও নিজের ঠাণ্ডা মেজাজের উপদেশ কিছুই তাহার অসংযমকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। তথাপি পিতা অপেক্ষা পুত্রের নৈতিক আদর্শ অধিক-তর উচ্চ—বিজয়ার ধনের প্রতি তাহার লোভ থাকিতে পারে, কিন্তু নিঃস্বার্থ প্রণয়ের অঙ্কুরও তাহার মধ্যে ছিল। বিজয়ার প্রত্যাখ্যানের আসন্ন সম্ভাবনায় তাহার সমস্ত চরিত্র-গৌরব বাহির হইয়া আসিয়াছে, একটা স্তব্ধ-গম্ভীর, বিষণ্ণ পৌরুষ তাহার চরিত্রের ইতরতাকে আচ্ছাদন করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই জন্য শেষ পরাজয়ের দৃশ্যে তাহার জন্য আমাদের একটা সহানুভূতি-মিশ্রিত দীর্ঘশ্বাস পড়ে, পরাজয়ের গ্লানি পিতার মত তাহার সর্বশরীরে এত গাঢ় কলঙ্ককালিমা লেপন করিয়া দেয় নাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমাজ ও ধর্ম-ব্যবস্থার অনুমোদিত, আমাদের সহজ নীতিজ্ঞান-সমর্থিত প্রেমের চিত্র শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসেই পাওয়া যায়—ইহাদের মধ্যে 'দত্তা'র স্থান নিঃসন্দেহ সর্বশ্রেষ্ঠ।

(৫)

এইবার নিষিদ্ধ, সমাজ-বিগর্হিত প্রেমের চিত্র যে উপন্যাসগুলিতে বেশ বিস্তৃত ও ব্যাপক-ভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে, তাহাদের আলোচনা করিতে হইবে। শরৎচন্দ্রের রচনার সহিত যে তুমুল আন্দোলন ও বিক্ষোভ সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে, তাহার জন্য তাঁহার 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ' ও 'শ্রীকান্ত'ই মুখ্যতঃ দায়ী। এই তিনটি উপন্যাসে অবৈধ প্রেমের প্রতি লেখকের মনোভাব প্রায় একরূপই। সাধারণত এই শ্রেণীর ভালবাসার উপর যেরূপ নির্বিচারে নিন্দা-গঞ্জনা বর্ষিত হয় সেই কঠোর ধর্মনীতিমূলক মনোভাবের সহিত লেখকের কোন সহানুভূতি নাই। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের সহজ বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়ান্যায়বোধের আমরা কোন ব্যবহারই করি না—এই সমাজবিধি উল্লঙ্ঘনের মূলে কোন্ মনোবৃত্তি আছে তাহা গণনার মধ্যেই আনি না—কেবল চক্ষু মুদিয়া সনাতন, চিরপ্রথাগত দণ্ডবিধির ধারা প্রয়োগ করি মাত্র। শরৎচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে এই মূঢ় অন্ধতা ও জড়, অচেতন সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। আমাদের সংসারযাত্রার পথে অপ্রতিবিধেয় কারণে নরনারীর মধ্যে এমন বিচিত্র জটিল সম্পর্কের সৃষ্টি হয় যাহার বিচার করিতে আমাদের সমস্ত তীক্ষ্ণ, অকুণ্ঠিত ধর্মবোধ ও ন্যায়নিষ্ঠার প্রয়োজন হয়—যাহাকে সোজাসুজি ব্যভিচারের পর্যায়ে ফেলিয়া মনুসংহিতার বিধির মধ্যে বিধান খুঁজিলে চলে না। এই প্রকার যান্ত্রিক বিচারে ধর্মের প্রকৃত মর্যাদা ও আদর্শ ক্ষুণ্ন হয়। ধর্মরক্ষা ও অধর্মের প্রতিকারই শাস্ত্রনির্দিষ্ট দণ্ডের একমাত্র উদ্দেশ্য ও সার্থকতা, সুতরাং দণ্ডবিধানের দ্বারা যদি আমাদের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, সমাজ

নৈতিক উন্নতির পথে না গিয়া অধোগতির দিকেই যদি অগ্রসর হয়, সমাজনেতারা অপরাধীর প্রকৃত সংশোধনের উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত না হইয়া যদি নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি বা প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির চরিতার্থতার উপায় খোজেন, তবে দণ্ডবিধির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সংশয় জাগা স্বাভাবিক। যদি এই দণ্ড-বিধানের দ্বারা আমাদের উচ্চতর গুণগুলি—মনুষ্যত্ব, ন্যায়পরতা, দয়া, সমবেদনা প্রভৃতি নিষ্পেষিত হয় ও ঘৃণা, স্বার্থপরতা ও কাপুরুষতা প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তিগুলি মাথা তুলিয়া উঠে, তাহা হইলে সমস্ত দণ্ডবিধির ও বিচার-নীতির আমূল সংস্কারই অবশ্য কর্তব্য। শরৎচন্দ্র, কি বিশেষ অবস্থার মধ্যে তাঁহার পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে অবৈধ প্রণয়ের উদ্ভব হইয়াছে তাহা খুব নিপুণভাবে বিবৃত করিয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পাঠকের স্বাধীন বিচারের প্রার্থনা করেন। তাহাদের অপরাধটাই তাহাদের সম্বন্ধে একমাত্র আলোচ্য বিষয় মনে না করিয়া তাহাদের চরিত্রের অন্যান্য দিক্ দেখাইয়া মোটের উপর তাহারা নিন্দনীয় কি প্রশংসনীয়, এই বিষয়ে পাঠকের অভিমত স্থির করিতে বলেন। তাঁহার অচলা, সাবিত্রী, অভয়া, রাজলক্ষ্মী এবং বোধ হয় কিরণময়ীও জন্ম-অপরাধী নহে, পাপের প্রতি একটা প্রবল ও অনিবার্য প্রবণতা তাহাদের অস্থি-মজ্জায় মিশিয়া নাই। সাবিত্রী ও রাজলক্ষ্মী সতীত্ব-ধর্মের মূল্য-সম্বন্ধে এত সচেতন যে, তাহারা প্রথম বয়সের পদস্খলনের জন্য আজীবন প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে ও জীবনের সর্বোত্তম সার্থকতা হইতে নিজদিগকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত করিয়াছে। অচলা অবস্থার প্রতিকূলতা ও বাহ্য আত্মসম্ভ্রম-রক্ষার জন্য সুরেশের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে; কিন্তু সুরেশের প্রতি তাহার মন কোন দিনই অনুরাগরঞ্জিত হয় নাই। অভয়া নির্ভীকচিত্তে সতীত্বকে একটা আপেক্ষিক ধর্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে; ও অবস্থা-বিশেষে তাহা যে অত্যাজ্য নহে তাহা নিজ ব্যবহারে প্রমাণ করিয়াছে; কিন্তু তাহারও সতীত্বের প্রতি নিষ্ঠার অভাব ছিল না, এবং সে যতদিন সম্ভব সতীত্বকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে। একমাত্র কিরণময়ীরই সতীত্বের প্রতি একটা প্রকৃত, নৈসর্গিক আকর্ষণ ছিল না বলিয়া মনে হয়—প্রেম-বর্জিত নিষ্ঠাকে সে বিশেষ মূল্য দিতে কখনই রাজি হয় নাই।) সুতরাং প্রত্যেকটি দৃষ্টান্ত যে কেবল অসতীত্বের সমর্থনের সাধারণ উদ্দেশ্যে অবতারিত হইয়াছে তাহা নহে, প্রত্যেকটিরই একটা অবস্থাঘটিত বিশেষত্ব আছে এবং ইহারই উপর লেখক জোর দিয়া পাঠকের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও সহানুভূতির উদ্রেক করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসের নামকরণে শরৎচন্দ্র যেন আমাদের প্রচলিত সমাজনীতির আদর্শকে প্রকাশ্যভাবেই ব্যঙ্গ করিয়াছেন—সমাজ-বিচারের মানদণ্ডকে যেন স্পর্ধিত বিদ্রোহের সহিতই অতিক্রম করিয়াছেন। সতীশ-সাবিত্রীর অপরূপ প্রেমলীলাই গ্রন্থের প্রধান বিষয়—ইহারই চতুঃপার্শ্বে উপেন্দ্র-দিবাকর-কিরণময়ী আপন আপন দুশ্ছেদ্য জাল বয়ন করিয়া প্রেমের দুরূহময় জটিলতাকে আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। সতীশ ও সাবিত্রীর মধ্যে [illegible] সমস্ত সামাজিক বৈষম্য ও অবস্থার বিসদৃশতা অতিক্রম করিয়া লঘু তরল হাস্য-পরিহাস ও স্নেহ তত্ত্বাবধানের মধ্যে, যে কিরূপে একেবারে অনিবার্য, অসংবরণীয় প্রেমের পর্যায়ে গিয়া দাঁড়াইল, প্রণয়-ইতিহাসের সেই চিরপুরাতন অথচ চিররহস্যমণ্ডিত কাহিনীটি এখানে অদ্ভুত [illegible] সহিত বিবৃত হইয়াছে। প্রথম হইতেই এই সম্পর্কটি প্রভু-ভৃত্যের সাধারণ ব্যবহারের মাত্রা অনুসরণ করে নাই। সতীশের পরিহাস, উদ্দেশ্যে নির্দোষ হইলেও, [illegible]

সাবিত্রীও সতীশের কল্যাণ-কামনায় তীব্র শ্লেষ ও নির্ভীক স্পষ্টবাদিত্বের দ্বারা প্রণয়িনীরই মর্যাদা দাবী করিত। সতীশের প্রণয়জ্ঞাপক পরিহাসগুলি সে উপভোগই করিত; তাহাকে গোড়া হইতে সংযত করিবার কোনই চেষ্টা সে করে নাই। মোটের উপর ব্যাপারটা একটা সাধারণ ইতর, কলঙ্কিত রূপ-মোহের মতই দাঁড়াইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে সাবিত্রীর অদ্ভুত আত্মসংযম ও প্রণয়াস্পদের আন্তরিক হিতৈষণা তাহাকে খুব উচ্চস্তরে উন্নীত করিয়া দিল। যেমন অস্পষ্ট ও শ্বাসরোধকারী ধূম্র-যবনিকার অন্তরাল হইতে কাঞ্চনবর্ণ অগ্নি ধীরে ধীরে নিজ জ্যোতির্ময় রূপ প্রকাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সমস্ত হাস্য-পরিহাস, মান-অভিমান ও নিষ্ঠুর ঘাত প্রতিঘাতের আবরণ ভেদ করিয়া প্রেমের দীপ্ত সৌন্দর্য বাহির হইয়া পড়িল। এই প্রেমের সুস্পষ্ট আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সাবিত্রীর ব্যবহারের আশ্চর্য পরিবর্তন হইল। সে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সামলাইয়া লইল, ও সতীশের উদ্দাম, বাধাবন্ধহীন লালসাকে নিষ্ঠুর আঘাত দিয়া প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিল। আপনার সম্বন্ধে একটা হীন কলঙ্ক প্রচার করিয়া নিজেকে সর্বপ্রযত্নে সতীশের সান্নিধ্য হইতে অপসারিত করিল, এবং রিক্ততা ও অপমানের সমস্ত বোঝা স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইয়া সুদীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের মধ্যে আত্মগোপন করিল।

সাবিত্রীর লাঞ্ছিত, মিথ্যা-কলঙ্ক-দুর্বহ জীবনে চরম সার্থকতা আসিল, যখন তাহার কঠোরতম বিচারক উপেন্দ্র তাহার গুণমুগ্ধ ভক্ত হইয়া দাঁড়াইল, ও তাহাকে নিজ রোগজর্জর, শোক-দীর্ণ শেষ জীবনের সঙ্গী করিয়া লইল। উপেন্দ্রের এই স্নেহাকর্ষণই তাহার প্রতি সমাজের নির্মম অত্যাচারের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। সাবিত্রীর চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে, তাহার এই অমানুষিক আত্মসংযম ও চরিত্র-গৌরবের মধ্যে সর্বত্রই একটা বাস্তবতার সুর অসন্দিগ্ধভাবে বাজিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে কোন দিনই একজন পৌরাণিক শাপ-ভ্রষ্টা দেবী বলিয়া আমাদের ভ্রম হয় না। সতীশ-সাবিত্রীর সম্পর্কের মধ্যে কেবল এক স্থানেই একটু অবাস্তবতার স্পর্শ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কলিকাতার মেসে যখন তাহাদের প্রণয়-সম্পর্কটি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল, তখন লেখক এই ক্রমবর্ধমান প্রেমের যৌবন-পরিণতির জন্য যে অনুকূল, বাধাবন্ধহীন অবসর রচনা করিয়াছেন, তাহা বাস্তব জীবনে মেলে না। বেহারী ও বামুনঠাকুর উভয়েই এই নবীন আবির্ভাবটিকে সশ্রদ্ধ সম্ভ্রম ও সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়াছে, তাহার চারিদিকে ভক্তি-অর্ঘ্য রচনা করিয়া ও আরতি-দীপ জ্বালাইয়া ইহার দেবত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে। রাখালবাবুর ঈর্ষ্যার কথা মধ্যে মধ্যে শোনা যায় বটে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই ঈর্ষ্যা-কলুষিত বাষ্প প্রেমের নির্মলতার উপর কোন কলঙ্কের দাগ বসাইতে পারে নাই। সতীশ-সাবিত্রীর অনুপম প্রেম-কাহিনীর কথা পড়িতে পড়িতে আমাদের কেবলই মনে হয়, ইহার মাধুর্য ও বিশুদ্ধি কত সূক্ষ্ম সূত্রের উপরেই দাঁড়াইয়া আছে। একটি কুৎসিত ইঙ্গিত, একটি ইতর বিদ্রূপ ইহার সমস্ত মাধুর্যকে নিঃশেষে শুকাইয়া ইহার অন্তর্নিহিত কদর্যতাকে অনাবৃত করিয়া দিতে পারিত। সমস্ত মেস যেন তাহার সংকীর্ণ সন্দেহ ও বিদ্বেষ-কলুষিত মনোবৃত্তি সংহরণ করিয়া নীরব সম্ভ্রমে এই প্রেম-মাধুরীকে নিরীক্ষণ করিয়াছে, ও রুদ্ধ নিঃশ্বাসে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ অনুকূল অবসর আমাদের কাছে অস্বাভাবিক বলিয়াই ঠেকে—মনে হয় যেন বাস্তবতার ঠিক মর্মস্থলে অবাস্তবতার একটা সূক্ষ্মতর স্পর্শ দানা বাঁধিয়াছে।

কিন্তু উপন্যাসটিতে যে চরিত্রটি সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ, সে কিরণময়ী। কিরণময়ী শরৎচন্দ্রের

অত্যদ্ভুত সৃষ্টি। আমাদের বঙ্গদেশের সমাজ ও পরিবারে, বা উপন্যাসের পাতায় যত বিভিন্ন প্রকৃতির রমণীর দর্শন মিলে, তাহাদের সহিত কিরণময়ীর একেবারেই কোন মিল নাই। তাহার চরিত্রে অনন্যসাধারণ শক্তি, দৃপ্ত তেজস্বিতা, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তি ও বিচারবুদ্ধির সহিত একেবারে কুণ্ঠাহীন, সংস্কাব-প্রভাবমুক্ত, ধর্মজ্ঞান-বর্জিত সুবিধাবাদের এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ হইয়াছে।

কিরণময়ীব সহিত প্রথম পরিচয়ের দৃশ্যই আমাদের মনে গভীর দাগ কাটিয়া বসে। জীর্ণ, ধ্বংসোন্মুখ গৃহে মুমূর্ষু স্বামীর সান্নিধ্যে তাহার দীপ্ত, অশোভন, বিদ্যুৎরেখার ন্যায় রূপ, যত্ন-বচিত প্রসাধন ও সন্দেহের তীব্রজ্বালাময় বিষোদ্গার এক মুহূর্তেই একটা শ্বাসরোধকারী, অসহনীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। তারপর অনঙ্গ ডাক্তারের সহিত তাহার প্রায় প্রকাশ্য প্রেমাভিনয়, তাহার শাশুড়ীর এই বীভৎস আচরণে প্রশ্রয়-দান ও স্বামীর নির্বিকার ঔদাসীন্য—সকলে মিলিয়া আমাদের বিতৃষ্ণাকে বিজাতীয়ভাবে তীব্র কবিয়া তোলে। কিন্তু পবমুহূর্তেই দৃশ্যপটের অভাবনীয় পরিবর্তন। কিবণময়ী অত্যল্পকালের মধ্যেই উপেন্দ্রের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছে, স্বীয় নীচ সন্দেহেব জন্য অনুতপ্ত হইয়াছে ও নব-জাগ্রত নিষ্ঠার সহিত স্বামি-সেবা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিশেষতঃ সতীশের সহিত তাহার সম্বন্ধটি নিতান্ত সহজ মাধুর্যে ভরিয়া উঠিয়াছে, ও সতীশের মুখে উপেন্দ্রের অতুলনীয় পত্নী-প্রেমের কাহিনী শুনিয়াই তাহার নিজের পুনর্জন্ম হইয়াছে। এই নবীন প্রেমানুভূতিব প্রথম ফল অনঙ্গ ডাক্তারকে প্রত্যাখ্যান ও ঐকান্তিক,অক্লান্ত স্বামি-সেবা। তাবপর দিবাকরের সহিত শাস্ত্রালোচনাব সময়ে তাহার চবিত্রের আর একটা অপ্রত্যাশিত দিক্ উদ্ঘাটিত হইয়াছে—তাহার বিচারশক্তির আশ্চর্য স্বাধীনতা, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য ও শাস্ত্রানুশাসনের যুক্তিহীন জোরজবরদস্তিব বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ তাহার চরিত্র-ভিত্তির উপর বিস্ময়কর আলোকপাত কবে। এই অসামান্য শক্তির পরিচয় দিবার পরেই আবার একটা সাধারণ রমণীসুলভ ভাবোচ্ছ্বাস আসিয়া এই আশ্চর্য নারীর চরিত্র জটিলতার সাক্ষ্য দান করে। সুরবালার নিঃসংশয় বিশ্বাস-প্রবণতার ইতিহাসে তাহার মনে ঈর্ষ্যার এক অদম্য উচ্ছ্বাস ঠেলিয়া উঠিয়াছে, ও এই অতি-প্রশংসিতা রমণীকে যাচাই করিয়া লইবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে সুববালার সহিত পরিচিত হইবার দিকে অনিবার্যবগে আকর্ষণ করিয়াছে। এখানেও সুরবালার যুক্তিহীন বিশ্বাসের নিকট কিরণময়ীর সমস্ত তর্কশক্তি পরাজিত হইয়া নীরব হইয়াছে। সুরবালার নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া প্রত্যাবর্তনের পর উপেন্দ্রের সহিত তাহার যে বোঝাপড়া হইয়াছে, তাহার অসংকোচ, অনাবৃত প্রকাশ্যতার দুঃসাহস আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়। নারীর মুখে এরূপ স্বচ্ছ-সবল স্বীকারোক্তি, এরূপ অনবগুণ্ঠিত আত্মপরিচয়, এরূপ নির্ভীক, অকুণ্ঠিত প্রেম-নিবেদন বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাস-ক্ষেত্রে অশ্রুতপূর্ব। নারীর প্রেম-রহস্য উদ্ঘাটনের একটি নিখুঁত, অনবদ্য চিত্রহিসাবে এই দৃশ্যটি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সুরবালার প্রতি অদমনীয় ঈর্ষ্যার ঝাপ্টই যেন তাহার সম্ভ্রম-সংকোচের সমস্ত ব্যবধান উড়াইয়া দিয়া তাহার অন্তরের উষ্ণ গৈরিকস্রাবকে বাহিরের দিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছে। উপেন্দ্র তাহার স্ফটিক-স্বচ্ছ পবিত্রতা-সত্ত্বেও এই মহিমময় প্রেম-নিবেদনের অর্ঘ্য মাথায় উঠাইয়া লইয়াছে, ও তাহাদের অস্বীকৃত সম্বন্ধের প্রতিভূস্বরূপ দিবাকরকে কিরণময়ীর স্নেহ-হস্তে ন্যস্ত করিয়া আপাততঃ তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

তারপর দিবাকরের সঙ্গে [illegible] অভিভাবকত্বের ভার লইয়া কিরণময়ীর [illegible]

ক্ষণস্থায়ী অধ্যায় খুলিয়াছে। দিবাকরকে খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া, হাস্য-পরিহাস করিয়া, তাহার অনভিজ্ঞ সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে সরস বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করিয়া তাহার দিনগুলি কাটিতেছিল। দিবাকরের সহিত সাহিত্য-আলোচনার প্রসঙ্গে লেখক কিরণময়ীর মুখে রোমাণ্টিক উপন্যাসে বর্ণিত প্রণয়চিত্রের উপর নিজেরই মতামত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই প্রণয়ের মূলে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা নিবিড় উপলব্ধি নাই, কেবল অন্তঃসারশূন্য কথার কারুকার্য—বৃশ্চিক ও বজ্রমাত্র সম্বল করিয়া এই ব্যবসায়ে নামার কোন বাধা নাই। মন্তব্যগুলি অধিকাংশ স্থলেই সত্য এবং কঠোর সত্য—যদিও রোমাণ্টিক ঔপন্যাসিকদের পক্ষে বলা যায় যে, প্রেমকাহিনী তাঁহাদের মুখ্য বর্ণনীয় বস্তু নহে, বীরত্বপূর্ণ দুঃসাহসিক আখ্যায়িকাগুলিকে গ্রথিত করিবার ঐক্যসূত্র-হিসাবেই ইহার ব্যবহার বেশি। দিবাকরেব সহিত কিরণময়ীর কথোপকথনে লেখকের যে উচ্চ মননশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সত্যই অতুলনীয়—প্রেমের প্রকৃতি ও দুর্বার শক্তি, চিত্তজয়ের দুরূহতা ও পদস্খলনের বিচার-বিষয়ে যে সূক্ষ্ম-চিন্তাপূর্ণ গভীর আলোচনা কিরণময়ীর মুখে দেওয়া হইয়াছে, তাহা শুধু বঙ্গসাহিত্যে নয়, সর্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তার সহিত সমকক্ষতার স্পর্ধা করিতে পারে।

কিরণময়ীর চরিত্র-আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া আমরা দেখি যে, প্রেমতত্ত্বের এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে দিবাকরের সহিত তাহার এমন একটা লঘু-তরল হাস্য-পরিহাসের পালা চলিতেছে, যাহার মধ্যে গোপন আসক্তির বীজ নিহিত থাকার খুবই সম্ভাবনা। এই রসালাপের মধ্যে কিরণময়ীর নিজের চিত্তবিকার থাকুক বা নাই থাকুক, দিবাকরের মনে যথেষ্ট দাহ্য পদার্থ সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। ইতিমধ্যে একদিন উপেন হঠাৎ আসিয়া পড়িয়া দিবাকর ও কিরণময়ীর সম্পর্কের অনুচিত ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করিয়া ফেলিল এবং কিরণময়ীকে কঠোর তিরস্কার করিয়া দিবাকরকে সেখান হইতে স্থানান্তরিত করিবার কড়া হুকুম জারি করিয়া গেল। এই অন্যায় ও অসহনীয় আঘাতে কিরণময়ীর ভিতরের পিশাচী তাহার সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা, তাহার তীক্ষ্ণ ও মার্জিত বুদ্ধিকে ঠেলিয়া দিয়া মাথা তুলিয়া উঠিল, এবং সেই ক্রোধোন্মত্তা রমণী উপেনের উপর প্রতিহিংসা লইবার জন্য তাহার পরম স্নেহের পাত্র দিবাকরকে কুক্ষিগত করিয়া আরাকান-যাত্রার জন্য পা বাড়াইল।

সমুদ্রযাত্রায় মধ্যে দিবাকর ও কিরণময়ীর সম্পর্কটা অনেক ক্ষণস্থায়ী, সূক্ষ্ম পরিবর্তনের মধ্যে পাক খাইয়া আবার প্রায় পূর্ব স্থানটিতেই স্থির হইল। এই সূক্ষ্ম পরিবর্তনের তরঙ্গগুলি শরৎচন্দ্র আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টির সহিত লক্ষ্য ও প্রকাশ করিয়াছেন। উপেন্দ্রের অনমুমেয় প্রবল প্রভাবই এই দুইটি হৃদয়ের বেগবান্ বীচিবিক্ষেপগুলি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। কিরণময়ী উপেন্দ্রের মাথা হেঁট করিবার উদ্দেশ্যেই দিবাকরের অধঃপতনের জন্য সমস্ত মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে; উপেন্দ্রের স্মৃতিতে মুহ্যমান দিবাকর তাহার বেদনাতুর চিত্তের বিহ্বলতার জন্যই অজ্ঞাতসারে এই মায়াবন্ধন উপেক্ষা করিয়াছে। তারপর উপেন্দ্রের আলোচনায় উভয়েরই চিত্তমালিন্য কাটিয়া গিয়া মন আবার কতকটা প্রণয়-নির্মল হইয়া উঠিয়াছে। কিরণময়ী দিবাকরের সহিত তাহার ভবিষ্যৎ সম্পর্ক স্থির করিয়া লইয়া তাহার মায়াজাল সংবরণ করিয়াছে ও পুনরায় স্নেহশীলা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর আসনে অধিকার করিয়াছে। দিবাকর ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে ততটা নিঃসংশয় না হইয়াও কিরণময়ীর এই পরিবর্তনে একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে—কিন্তু রূপমোহ তাহার মনের একটা কোণে

বাসা লইয়া ভবিষ্যতের জন্য উষ্ণ, উগ্র কামনার নিঃশ্বাস-সঞ্চয় শুরু করিয়াছে। জাহাজের মধ্যে সমাজ ও ব্যক্তির অধিকার লইয়া উভয়ের মধ্যে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাও লেখকের গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়।

সর্বশেষে আরাকানে কামিনী বাড়িউলীর বাড়িতে কুৎসিত আবেষ্টনের মধ্যে দিবাকর-কিরণময়ীর সম্পর্ক তাহার সমস্ত মাধুর্য হারাইয়া চরম অধঃপতনের মধ্যে ধূলিশায়ী হইয়াছে। কিরণময়ীর মধ্যে এখনও কতকটা সংযম ও শালীনতা অবশিষ্ট আছে ; বিশেষতঃ দিবাকরের প্রতি তাহার প্রেম না থাকায় সে সেদিকে আপনাকে সম্পূর্ণ স্থির ও অবিচলিত রাখিয়াছিল। কিন্তু দিবাকর প্রচণ্ড লালসার সহিত যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হইয়া ইতরতা ও নির্লজ্জতার শেষ সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে। —এই অধঃপতনের কদর্য শ্রীহীন চিত্রটি নির্মম বাস্তবতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে—ইহা শরৎচন্দ্রের বাস্তবাঙ্কন-ক্ষমতার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন।

এই চরম দুর্দশার মাঝে পূর্বজীবনের গৌরবময় স্মৃতি ও মুক্তির আশ্বাস লইয়া আসিয়া পড়িল সতীশ। সতীশের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কিরণময়ীর মুখ হইতে জীর্ণ ও কদর্য মুখোশ খসিয়া পড়িল, আত্মসম্ভ্রম ও গৌরবের আলোক আবার তাহাকে বেষ্টন করিল। উপেন্দ্রের মৃতপ্রায় অবস্থার কথা শুনিয়া তাহার মূর্ছাই তাহার মনোভাবের প্রকৃত সংবাদ সকলের গোচর করিয়া দিল। সে ও দিবাকর সতীশের ক্ষমাশীল অভিভাবকত্বে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের জন্য জাহাজে চড়িয়া বসিল।

এইখানেই কিরণময়ীর বিচিত্র ও বুদ্ধিপ্রদীপ্ত চরিত্রটি একটা মূঢ় বিহ্বলতা ও মনোবিকারের মধ্যে আপনাকে নিঃশেষে তলাইয়া দিল। যে তীক্ষ্ণ মননশক্তি অসংকোচে বেদ-উপনিষদের সমালোচনা করিয়াছিল, প্রেম ও সমাজতত্ত্ব-সম্বন্ধে অদ্ভুত মৌলিকতাপূর্ণ বিশ্লেষণে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা প্রেমাস্পদের আসন্ন মৃত্যুর দুঃসহ আঘাতে একেবারে অসংলগ্ন পাগলামির দুই-একটা সূত্রহীন, ভাঙ্গা-চোরা উক্তিতে পর্যবসিত হইল। ধর্মবোধহীন, হৃদয়সম্পর্করহিত বুদ্ধির কি অভাবনীয় পরিণতি।

কিরণময়ীর চরিত্রটি আগাগোড়া পর্যালোচনা করিলে উহার স্বাভাবিকতা ও সংগতি-সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়া উঠে। উহার ব্যবহারের সর্বাপেক্ষা বিপরীতমুখী বিন্দুগুলির একই জীবনে সামঞ্জস্য করা যায় কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া দুরূহ। তাহার রুদ্ধ ও ইতর সংশয় ও গভীর সহানুভূতিপূর্ণ স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি, তাহার অনঙ্গ ডাক্তারের সহিত প্রেমাভিনয় ও অক্লান্ত স্বামি সেবা, উপেন্দ্রের প্রতি গভীর একনিষ্ঠ প্রেম ও দিবাকরের সহিত পলায়ন, তাহার বেদ-বেদান্তের আলোচনা ও অসংলগ্ন প্রলাপ—এ সমস্তের মধ্যে বিচ্ছেদ ও অসংগতি এতই গভীর যে, একই জীবনবৃন্তে এতগুলি বিচিত্র বিকাশের সম্ভাবনীয়তা-সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস পীড়িত হইতে থাকে। এই অবিশ্বাস সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে,এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী বিকাশ-গুলির মধ্যে গ্রন্থিবন্ধন যতটা দূর হওয়া সম্ভব, তাহা হইয়াছে—এই সমস্ত সূক্ষ্ম ও পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনের যতটা সংগত ও সন্তোষজনক কারণ দেওয়া যায়, তাহার অভাব হয় নাই। কিরণময়ীর জীবনের মুখবন্ধটা—তাহার প্রথম যৌবনের প্রেমহীন নীরস স্বামিসাহচর্য ও ধর্মসংস্কারের একান্ত অভাব—ধরিয়া লইলে পরবর্তী পরিণতিগুলি অচ্ছেদ্য কারণ-সূত্রে গ্রথিত হইয়া সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবেই আসিয়া পড়ে। এক একবার মনে হয় যে, যাহার বিচার-বুদ্ধি এত প্রখর ও

অন্তর্দৃষ্টির আলোকে উজ্জ্বল তাহার ব্যবহারিক জীবনে এরূপ কদর্য অভিব্যক্তি সম্ভব কি না,—স্বচ্ছ ও উদার বুদ্ধি উদগ্র কমনার ধূমে এমন সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন হইতে পারে কি না। কিন্তু বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির মধ্যে যে গভীর অনৈক্য—তাহাই মানব-জীবনের একটা অমীমাংসিত রহস্য; এবং এই জ্ঞানের আলোকে আমরা কিরণময়ী-চরিত্রের অসংগতিগুলিকে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। কেবল সর্বশেষে তাহার মস্তিষ্ক-বিকারের চিত্রটি অতি আকস্মিক হইয়াছে—উপেন্দ্রের আসন্ন মৃত্যুর সংবাদে যে মূর্ছা তাহার প্রেমের গোপন কথাটি সুবিদিত করিয়া দিল, তাহার ঘোর যে তাহার বুদ্ধিকে চিরকালের জন্য আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিবে তাহার ইঙ্গিত সেরূপ সুস্পষ্ট হয় নাই। মোটের উপর কিরণময়ী-চরিত্রের অসাধারণ জটিলতা ও দিগন্তব্যাপী প্রসার উপন্যাস-সাহিত্যে অতুলনীয় এবং ইহার আলোচনা আমাদের মনকে শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলে।

এই সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত-জটিল, প্রতিরুদ্ধ কামনার গোপন-ক্লেদ-পিচ্ছিল, উত্তাপক্লিষ্ট দৃশ্য হইতে সতীশ-সরোজিনীর প্রেম কাহিনীর মুক্ত ও শীতল বাতাসে পলায়ন করিয়া আমরা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি। সাবিত্রীতে প্রেমের যে দীন, চীরপরিহিত ভিক্ষুকমূর্তি ও কিরণময়ীতে তাহার যে ভ্রূকুটি-কুটিল, নরকাগ্নিবেষ্টিত, ঈর্ষ্যাবিকৃত ছদ্মবেশ আমাদিগকে ভিতরে ভিতরে পীড়িত করিতেছিল, সরোজিনী-চরিত্রে এই সমস্ত দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গিয়া সেই প্রেমের চিরপরিচিত, প্রসন্ন-নির্মল রাজবেশ আমাদের চক্ষুর উপর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এখানে তাহার কোন বিকৃতি নাই, কোন বহ্নিজ্বালাময় অস্বাভাবিক উত্তাপ নাই, অবিরাম সংঘর্ষের ও কণ্ঠরোধের উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস নাই। সতীশ-সরোজিনীর প্রেম অনেকটা স্বাভাবিক পথে, মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইয়াছে; তাহার প্রবাহমধ্যে দুই-একটি যে বাধা দেখা গিয়াছে, তাহারা যাত্রাপথে একটু করুণ উচ্ছ্বাস তুলিয়াছে মাত্র, আর কোন ভয়াবহ পরিণতির সৃষ্টি করে নাই। এই সরল ও স্বাভাবিক ভালবাসার অবতারণা শরৎচন্দ্রের প্রেম-কল্পনার বৈচিত্র্য ও প্রসারের নিদর্শন।

সুরবালা ও কিরণময়ী প্রেম-জগতের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু। আমাদের সনাতন পাতিব্রত্য, তাহার সমস্ত অখণ্ড বিশ্বাস ও অবিচলিত ধর্মসংস্কার লইয়া, যুগ-যুগব্যাপী সাধনা ও অনুশীলনের ফল লইয়া, সুরবালাতে মূর্তিমান্ হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে তাহার আবির্ভাব স্বল্পসংখ্যক স্থলে; কিন্তু তাহার প্রভাব একদিকে উপেন্দ্রের ও অপরদিকে কিরণময়ীর উপর স্থায়িভাবে বিস্তৃত হইয়াছে। সে উপেন্দ্রের হৃদয় এমন অবিসংবাদিতভাবে অধিকার করিয়াছে যে, কিরণময়ীর জন্য সেখানে সূচ্যগ্রপরিমিত স্থানও নাই—কোন ছলে, দয়া-সমবেদনার ছদ্মবেশেও পরস্ত্রী-প্রেম সেখানে উকিঝুঁকি মারিতে সাহস করে নাই। আবার সে-ই কিরণময়ীকে ভালবাসা শিক্ষা দিয়াছে—কিরণময়ীর হৃদয়ে যে দ্বারটা চিররুদ্ধ ছিল, তাহা তাহারই ইন্দ্রজালস্পর্শে মুক্ত হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির রমণী দুই উপগ্রহের মত এক উপেন্দ্রেরই কক্ষপথে আবর্তিত হইয়াছে। সুরবালা-চরিত্রের অধিক বিশ্লেষণ নাই; কিন্তু সে ও তাহার মনোরাজ্য আমাদের এত পরিচিত যে, তাহাকে চিনাইতে পরিচয়-পত্র অনাবশ্যক। 'চরিত্রহীন'-এ সুরবালা ও 'গৃহদাহ'-এ মৃণাল প্রভৃতি প্রমাণ করে যে, শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি বা সহানুভূতি কেবল নিষিদ্ধ প্রেমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে—পুরাতনের রসও তিনি নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন।

গ্রন্থমধ্যে পুরুষ-চরিত্রগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপেন্দ্র, সতীশ, দিবাকর সকলেই খুব সুন্দর ও জীবন্তভাবে চিত্রিত হইয়াছে। প্রত্যেকেরই কথাবার্তা, চিত্ত-বিশ্লেষণ ও প্রকৃতির তারতম্য নিপুণভাবে স্বতন্ত্র করা হইয়াছে। বিশেষতঃ, গ্রন্থের নায়ক সতীশের চরিত্র চমৎকার ফুটিয়াছে। তাহার সমস্ত ত্রুটি-দুর্বলতা সত্ত্বেও তাহার মধ্যে যে উদারতা ও মহত্ত্ব, যে স্নেহশীল, ক্ষমাপরায়ণ হৃদয় আছে তাহার মাধুর্য আমাদিগকে অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করে। সাবিত্রীর প্রতি তাহার দুর্জয় আকর্ষণ ও সরোজিনীর প্রতি ধীর, লজ্জা-কুণ্ঠিত ভালবাসা—এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। 'চরিত্রহীন' বঙ্গ-উপন্যাস-সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—ইহার পাতায় পাতায় জীবন-সমস্যার যে আলোচনা, যে গভীর অভিজ্ঞতা, যে স্নিগ্ধ, উদার সহানুভূতি ছড়ান রহিয়াছে, তাহা আমাদের নৈতিক ও সামাজিক বিচার-বুদ্ধির একটা চিরন্তন পরিবর্তন সাধন করে।

'গৃহদাহ' উপন্যাসটির নামকরণ বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'-এর ন্যায় মহিমের পারিবারিক সুখ-শান্তি-ধ্বংসেরই প্রতি ইঙ্গিত করে। নতুবা কেবল বাহ্য-ঘটনা-হিসাবে ইহাকে উপন্যাসের কেন্দ্রস্থ সংঘটন বলিয়া মনে করা যায় না। এই গৃহদাহের জন্য সুরেশের দায়িত্ব সত্যসত্যই আছে কি না তাহা লেখক স্পষ্টতঃ নির্দেশ করেন নাই। একবার মাত্র অচলা সুরেশকে এই অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করিয়াছে বটে, কিন্তু তখন সে সর্বনাশের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া, সুতরাং ইহাই যে তাহার আন্তরিক বিশ্বাস তাহা ঠিক বলা যায় না। সুরেশকে এই ব্যাপারে দোষী মনে করিতে গেলে তাহার চরিত্রে একটা অপরিসীম নীচতার আরোপ করা হয়। বোধ হয় লেখকের সেরূপ উদ্দেশ্য ছিল না—সুরেশকে এতটা হীনবর্ণে চিত্রিত করিতে গেলে তাহার সমস্ত অধঃপতনের মধ্যেও তাহার যে একটা চরিত্রগত উদারতা ও মহত্ত্ব অবশিষ্ট থাকে তাহার হানি করা হয়। গৃহদাহটা যে মহিমের গ্রামবাসীদের তীব্র সমাজ-সংরক্ষণ-প্রীতি ও ধর্মজ্ঞানের ফল, সেরূপ ইঙ্গিতও গ্রন্থমধ্যে দুর্লভ নহে—সুতরাং যে কেন্দ্রস্থ ব্যাপারটির জন্য উপন্যাসের নামকরণ তাহার সম্বন্ধে পাঠকের সংশয় দূর হয় না।

সে যাহাই হউক, মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দিক্ দিয়া গ্রন্থমধ্যে সর্বাপেক্ষা আলোচ্য বিষয় মহিম ও সুরেশের প্রতি অচলার দোলাচল চিত্তবৃত্তি। দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রের কাঁটার মত স্ত্রীর মন সর্বদা অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত স্বামীর দিকেই ফিরিয়া থাকে, ইহা আমরা পুরাণ-কাহিনী বা রোমান্সে পাইয়া থাকি। কিন্তু বাস্তব জীবনে যে এই নিষ্ঠার এতটুকু নড়-চড় হয় না, চিত্ত মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ-দোলায় দোলায়িত হয় না, ইহা জোর করিয়া বলা যায় না। দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর আকর্ষণে অচলার মনে এইরূপ একটা দ্বিধা-অনিশ্চয়ের ভাব যে জাগিয়াছে তাহা নিশ্চিত। এক দিকে মহিমের শান্ত, একান্ত ভাবাবেগহীন, প্রস্তর-কঠিন আবেদন—অপরদিকে সুরেশের ব্যগ্র-ব্যাকুল, উন্মত্ত আবেগ—এই দুই বিরুদ্ধশক্তির মাঝে অচলার হৃদয় দ্বিধা-বিভক্ত হইয়াছে। পিতার সুরেশের প্রতি প্রকাশ্য পক্ষপাত ও মহিমের প্রতি সুস্পষ্ট অবজ্ঞা বোধ হয় তাহার দৃঢ়-সংকল্পকে কতকটা নাড়া দিয়াছিল, কিন্তু এই অপমানকর দোটানার হাত হইতে সে পরিত্রাণ পাইল নিজের প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই। সে সুরেশের প্রেম-নিবেদনকে জোর করিয়া কাড়িয়া ফেলিয়া মহিমের হাতেই নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিল—তাহার প্রেম প্রলোভনকে জয় করিল। কিন্তু বিবাহের পর হইতেই তাহার প্রেমের প্রকৃত পরীক্ষা আরম্ভ হইল। পল্লীগ্রামের নির্বাসন

দুঃখ, পল্লীসমাজের নিরানন্দ প্রতিবেশ, মৃণাল ও তাহার স্বামীর সম্বন্ধে তাহার কদর্য সন্দেহ, সর্বোপরি মহিমের নিঃস্নেহ, কঠোর কর্তব্যপরায়ণতামূলক ব্যবহার তাহার মনে প্রবল প্রতিক্রিয়া জাগাইয়া তুলিল এবং সে মহিমকে ভালবাসে না, এইরূপ একটা ক্ষণস্থায়ী প্রতীতি তাহাকে অধিকার করিল। মহিমের পল্লীভবনে সুরেশের অনাহূত আগমনে স্বামি-স্ত্রীর এই বিরোধ সাংঘাতিক তীব্রতা লাভ করিল—তাহার অবস্থানের কয়েকদিন ধরিয়া তাহাদের অহোরাত্র ঘাত-প্রতিঘাতে সুরেশের ধারণা জন্মিল যে, অচলা বাস্তবিকই মহিমের প্রতি অনুরক্ত নহে। এই প্রতীতিই তাহার মনকে চরম বিশ্বাসঘাতকতার জন্য প্রস্তুত করিল—ইহারই বলে সে রুগ্ন, অসহায় মহিমের নিকট হইতে অচলাকে ছিনাইয়া লইবার দুঃসাহস সঞ্চয় করিল। কিন্তু ইহার পূর্বে মহিমের সাংঘাতিক পীড়ার সময় সে আর একবার কঠোর চিত্তদমনের পরিচয় দিয়াছিল—শেষ মুহূর্তে অচলার একটা সস্নেহ উদ্বেগ-প্রকাশ ও প্রবাসে তাহার সঙ্গী হইবার নিমন্ত্রণ তাহার সুপ্ত প্রবৃত্তিকে আবার দুর্জয় বেগে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। এ কাজ করিয়াই সুরেশ তাহার ভুল বুঝিতে পারিল। অচলাকে সে হাতের মুঠার মধ্যে পাইয়াছে, কিন্তু তাহার মন তাহার অধিকারসীমার শত যোজন বাহিরে। ডিহরী-প্রবাসের দিন কয়েকটির উপর, সমস্ত ভোগ-বিলাসের আয়োজন, সতৃষ্ণ প্রেমের সমস্ত উন্মুখতার উপর একটা গুরুভার অবসাদ, একটা সর্বরিক্ত বৈরাগ্যের বর্ণলেশহীন ধূসরতা চাপিয়া বসিয়াছে। মাঝে মাঝে এই জমাট তুষারের মত কঠিন, পক্ষাঘাত-গ্রস্ত জীবনের মধ্য দিয়া দুই-একটি অসতর্ক স্নেহের উচ্ছ্বাস, দুই-একটা অদম্য, অশ্রুজল-প্রতিরুদ্ধ নির্ঝরের বাণী এই গভীর নিঃসঙ্গতাকে, এই সুদূর নির্লিপ্ততাকে আরও অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। প্রেমের এই মূর্ছাহত, জীবন্মৃতের ন্যায় অবস্থার সহিত তুলনায় সুরেশের মৃত্যুও বোধ হয় তত ভয়াবহ নহে—এই চিত্রটিই সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে কলা-কৌশলের দিক্ দিয়া উচ্চতম স্থান অধিকার করে।

উপন্যাসের অন্তর্নিহিত প্রশ্নটি যথাসম্ভব সুস্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে ও তাহার উত্তরটিও খুব পরিষ্কার ও উচ্চাঙ্গের মননশক্তির পরিচায়ক। এই অবস্থা-সংকটে পতিত ও দৈহিক পবিত্রতাবিচ্যুত অচলা সতী কি না? তাহার সম্বন্ধে পাঠকের অভিমত কি রামবাবুর সহিত অভিন্ন? কুলটা বলিলেই কি তাহার সমস্ত পরিচয় নিঃশেষ হইয়া যায়? তাহার সতীত্ব-নির্ণয়-সম্বন্ধে অন্তরের অনির্বাণ জ্বালা ও শান্তিহীন বিক্ষোভ দৈহিক বিচ্যুতি অপেক্ষা কি অধিকতর মূল্যবান্ সাক্ষ্য নহে? সুরেশের যে প্রবল আকর্ষণে সে কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় নিজ সহজ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে তাহা একেবারে বহিঃশক্তির অভিভব নহে—সেই বিপুল শক্তির প্রচণ্ড গতিবেগ কতকটা তাহার নিজ গোপন অনুরাগের বৈদ্যুতী হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ইহাও তাহার সতীত্বের বিরোধী নহে। আমাদের মগ্ন-চৈতন্যের কতকটা অংশ আমাদের নিজের কাছেও অস্পষ্ট থাকিয়া যায়—সেই ছায়াময়, সুপ্তিগহন রাজ্যে সুরেশের ও মহিমের প্রতি তাহার গোপন অনুরাগ একশয্যায়ই শুইয়াছিল। কিন্তু যখনই এই প্রতিদ্বন্দ্বী ভালবাসার মধ্যে স্বেচ্ছাকৃত নির্বাচনের প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই তাহার সজ্ঞান ইচ্ছাশক্তির বিচারে মহিমই জয়ী হইয়াছে। সতীত্বের লৌকিক আদর্শ ইহা অপেক্ষা বেশি আর কি দাবী করিতে পারে? অবশ্য মৃণালের আদর্শ ইহা অপেক্ষা উচ্চতর—তাহার পাতিব্রত্য যুক্তিতর্কের অতীত একটা আধ্যাত্মিক সহজ-সংস্কারে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু উপন্যাসে আমরা মৃণালের যে চিত্র

পাই তাহা তাহার বিবাহিত জীবন-সম্বন্ধে নহে। তাহার শান্ত, আত্মসমাহিত, নিস্তরঙ্গ জীবন প্রেমের নহে, সেবাধর্মেরই প্রতীক। বাস্তবিক আমাদের সমাজ ও সাহিত্যে যে প্রেমের আদর্শ গৃহীত ও প্রশংসিত হইয়াছে তাহা একটা জীবনব্যাপী, নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতারই নামান্তর মাত্র। আকাশের বিদ্যুতের ন্যায় হৃদয়-বাহী বিদ্যুৎও তুলসী-প্রাঙ্গণের স্নিগ্ধ দীপালোকে রূপান্তরিত হইয়াছে। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মত মৃণালকেও আমরা চিকিৎসালয়েই দেখি, প্রমোদকুঞ্জে প্রণয়িনীরূপে কল্পনা করিতে পারি না। উপন্যাসে ঘোষাল মহাশয়ের সহিত মৃণালের জীবনের ছবির একটা সামান্য ইঙ্গিত মাত্র পাই, কিন্তু পূর্ণতর বিবরণ থাকিলে হয়ত দেখিতে পাইতাম যে, উহা কেদারবাবুর সম্পর্কের সহিত মূলতঃ অভিন্ন—চা এবং গরম মুড়ির সহিত একটা স্নেহশীতল প্রলেপের পরিবেশনই উহার শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ হইত। লেখক মৃণালের আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব একদিক্ দিয়া অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ করিয়াছেন—যে লৌকিক সম্ভ্রমের দুর্বল মোহ অচলাকে এক রাত্রির জন্য সুরেশের শয্যা-সঙ্গিনী করিয়াছিল তাহা মৃণালের সতীত্বকে এক মুহূর্তের জন্যও অভিভূত করিতে পারিত না, সে কখনই সম্ভ্রমের খোলসের জন্য তাহার শাঁসকে বিসর্জন দিত না। (কিন্তু মোটের উপর মৃণালের আদর্শ যুক্তিতর্কের সাহায্যে খাড়া করা হইয়াছে, তাহা অচলার মত প্রত্যক্ষ বর্ণনা ও বিশ্লেষণের বিষয় হয় নাই, সুতরাং উভয়ের মধ্যে তুলনা চলে না।)

উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রগুলি চমৎকার ফুটিয়াছে। (সুরেশের উত্তেজনা-প্রবণ, সহজেই উচ্ছ্বসিত প্রকৃতি ব্যবহারেব এক চরম সীমা হইতে অপর চরম সীমা পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। তাহার ব্যবহারের একদিকে যেমন উচ্ছ্বসিত ভালবাসা ও উদার আত্মোৎসর্গ-প্রবৃত্তি, তেমনি কোন বাধায় প্রতিহত হইলেই তাহা একটা হিংস্র তীব্রতা ও অসংযত ইতরতার নিম্নতম সোপানে নামিয়া যায়।)(কেদারবাবুর চরিত্রেও এইরূপ একটা বিপরীত-ভাবের সমন্বয় দেখা যায়। একদিকে প্রবল অর্থলোভ ও অর্থের লোভে বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিতে তাহার কোন দ্বিধা নাই—অপরদিকে অচলার বিবাহের পর অচলা ও সুরেশের পরস্পর সম্পর্কের প্রতি তাহার সন্দেহের অন্ত নাই, এবং সুরেশের ঋণ-মুক্তির প্রস্তাবে তাহার অন্তঃসঞ্চিত ক্রোধ একেবারে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের শেষ দিকে মৃণালের স্নেহশীতল স্পর্শে তাহার অন্তরের সমস্ত রুদ্ধ জ্বালা ও অনুদার সংকীর্ণতা আশ্চর্যরূপে প্রশমিত হইয়াছে, ও যে কাল্পনিক অপরাধের জন্য অচলার কোন মার্জনা ছিল না, তাহার সেই চরম দুষ্কৃতিও সে স্নেহমণ্ডিত ক্ষমার চক্ষে দেখিতে সমর্থ হইয়াছে।) (কেবল মহিমের চরিত্রসম্পর্কেই একটু সংশয় থাকিয়া যায়। তাহার অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও আত্মসংযমের দৃষ্টান্ত ত সমস্ত উপন্যাসজোড়া, কিন্তু অন্তরের সম্পদ্ হৃদয় জয় করিবার জন্য যেটুকু বহিঃপ্রকাশের অপেক্ষা রাখে তাহাও তাহার ক্ষেত্রে একান্ত দুর্লভ। সুরেশের বন্ধুত্ব ও অচলার প্রেম সে যে কি গুণে অর্জন করিল তাহার ভবিষ্যৎ ব্যবহারে আমরা তাহার কোন ইঙ্গিত পাই না। সুরেশের উচ্ছ্বসিত বন্ধুপ্রীতি বার বার তাহার মৌন, প্রতিদানহীন হৃদয়তট হইতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। অচলার চিত্ত জয় করিতে তাহার শান্ত, নির্বাক্ সহিষ্ণুতা ও অবিচলিত আত্মনির্ভরতা ছাড়া অন্য কোমলতর গুণেরও নিশ্চয় দরকার হইয়াছিল, কিন্তু উপন্যাসে তাহার চরিত্রের মাধুর্যের দিক্‌টা একেবারে অপ্রকাশিত—মহিম আমাদের নিকট কতকটা প্রহেলিকাই থাকিয়া যায়।) মোটের উপর 'গৃহদাহ'

শরৎচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম—মহৎ-চিত্তে অনিচ্ছাকৃত পাপের প্রতিক্রিয়া যে কি ভয়ানক তাহা ইহাতে সুনিপুণ বিশ্লেষণের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। আর লেখকের বিরুদ্ধে যে প্রধান অভিযোগ—যে তিনি পাপের চিত্র খুব চিত্তাকর্ষক করিয়া আঁকেন—তাহা এই উপন্যাসে কোন মতেই প্রযোজ্য নহে।

(৫)

একদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে 'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ইহাকে ঠিক উপন্যাস বলা চলে কি না, তাহা একটু বিবেচনার বিষয়। উপন্যাসের নিবিড়, অবিচ্ছিন্ন ঐক্য ইহার নাই; ইহা কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদের সমষ্টি। কিন্তু ইহার গ্রন্থন-সূত্রটা যতই শিথিল হউক না কেন, গ্রথিত পরিচ্ছেদগুলি এক-একটি মহামূল্য রত্ন। যাহাদের জীবন চিরদিন একটা অভ্যস্ত গণ্ডির মধ্যে কাটিয়াছে, যাহারা জীবিকার্জনের ও সংসার-প্রতিপালনের প্রচণ্ড নেশায় অনেকটা অর্ধচেতনভাবে জীবনটা অতিবাহিত করিয়াছে, তাহারা 'শ্রীকান্ত'-এর দৃশ্যগুলির অসাধারণ বৈচিত্র্যে ও অভিনবত্বে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িবে। আমাদের স্কুল-কলেজ-অফিসের লৌহ-নিগড-বদ্ধ, রোগ-শোক-জর্জরিত, দলাদলি-বিরোধ-কন্যাদায়-বিড়ম্বিত বাঙ্গালী জীবনের প্রান্তসীমায় যে বিচিত্র রসভোগের এত প্রচুর অবসর আছে, দুঃসাহসিকতার এত ব্যাকুল, প্রবল আকর্ষণ আছে, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও সমালোচনার এরূপ বিশাল, অব্যবহৃত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে, চক্ষুর ও হৃদয়ের এত অপর্যাপ্ত রসদ মজুত আছে তাহা আমাদের কল্পনাতেও আসে না। এই কল্পনাতীত বিচিত্র সৌন্দর্য 'শ্রীকান্ত' আমাদের মুগ্ধ নয়নের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছে ও মুক্তহস্তে আমাদের পাতে পরিবেষণ করিয়াছে। শ্রীকান্তের ভাগ্যে যে সমস্ত বিচিত্র, বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাহা শরৎচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসের মানসিক উদারতা ও সূক্ষ্ম নীতিজ্ঞানের মূল; যে আলোক তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসে ছড়াইয়া পড়িয়াছে 'শ্রীকান্ত'-এই তাহার আদি উৎস।

শ্রীকান্তের বাল্য-জীবনে যে পথ দিয়া তাহার জীবনে নূতন অভিজ্ঞতা ও দুঃসাহসিকতার উন্মত্ত স্রোতোবেগ প্রবেশ-লাভ করিয়াছে তাহা ইন্দ্রনাথের সাহচর্য। বর্ণ-পরিচয়ের রাখাল হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক দুষ্ট, লেখা-পড়ায় অমনোযোগী বালকের কাহিনী সাহিত্যে বা ইতিবৃত্তে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালা-সাহিত্য-ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও ইন্দ্রনাথের জোড়া মিলে না। তাহার নিশীথ অভিযান সমস্ত দিক্ দিয়া একেবারে অনন্যসাধারণ। আমাদের সাহিত্যে নৌযাত্রা-বর্ণনার অভাব নাই—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ও রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পে এই বিষয়ে অনেক কবিত্বপূর্ণ, সূক্ষ্ম অনুভূতিময় বিবরণ আছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের বর্ণনা সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়। ইহার মধ্যে কবিত্বের অভাব নাই, কিন্তু কবিত্ব ইহার সম্বন্ধে প্রধান কথা নহে। ইহার মধ্যে যে অকুণ্ঠিত বাস্তবতা, যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুর পাওয়া যায় তাহা কবিত্বকে অতিক্রম করিয়া অনেক ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। ইহার বর্ণনায় যে তীব্রতা আছে তাহা দুইটি দুঃসাহসিক বালকের উত্তেজিত কল্পনায় আবর্তিত হইয়া ঊর্ধ্বে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তারপর তাহার দ্বিতীয় সৌভাগ্য অন্নদাদিদির সহিত পরিচয়। ইংরাজী সাহিত্যিক একজন লিখিয়াছিলেন: "To know her was itself a liberal education" এই বাক্যটি সম্পূর্ণরূপেই অন্নদাদিদিসম্বন্ধে প্রযোজ্য। বাল্যকালে যখন সংস্কারের সংকীর্ণতা অভিজ্ঞতার সহিত মিশিয়া যায় নাই,

বিধি-নিষেধের ফাঁস নিঃশ্বাস-বায়ু রোধ করে নাই, সেই নব-আহরণের যুগে মুসলমান বেদে পরিবারের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র আবিষ্কার করার যে সৌভাগ্য তাহার মূল নির্ণয় কে করিবে? এই এক পরিচয়ে সমস্ত জীবনের গতি ফিরিয়া যায়। এক একজন লোক আছে যাহারা সর্বদা রাস্তায় জিনিস কুড়াইয়া পায়। শ্রীকান্ত তাহার জীবন-যাত্রার প্রারম্ভেই অতি অবজ্ঞাত আবেষ্টনের মধ্যে যে রত্ন কুড়াইয়া পাইয়াছে তাহা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হইয়াছে। বেদের জীবন ও সাপুড়ের ঘরকন্নার যে চিত্র গ্রন্থ মধ্যে পাওয়া যায় তাহা আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় যে, আমাদের বাঙ্গালী জীবনে রোমান্সের একান্ত অভাবসম্পর্কে যে সাধারণ অভিযোগ তাহা কতই নিরর্থক। 'রয়াল বেঙ্গল টাইগার' ও 'নতুন দা'র দুইটি দৃশ্য শরৎচন্দ্রের রচনার মধ্যে বিশুদ্ধ হাস্যরস-প্রাচুর্যের সুন্দর পরিচয়।

এই পর্যন্ত শ্রীকান্তের বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত। তারপর কয়েক বৎসর পরে পুনরায় যবনিকা তোলা হইয়াছে। এই সময়ে একটা কুমারের শিকার-পার্টিতে যোগ দেওয়ার মধ্যে অত্যন্ত অতর্কিতভাবে তাহার জীবনের সন্ধিক্ষণ উপনীত হইয়াছে। ইন্দ্রনাথের কাছে সে যে মন্ত্র শিক্ষা পাইয়াছিল, পিয়ারী বাইজীর ক্ষেত্রে সেই শিক্ষার পরীক্ষার সুযোগ মিলিয়াছে। বাইজীর ওড়না ও পেশোয়াজের অন্তরালে তাহার প্রণয়িনী বাল্যসখীর দর্শন মিলিয়াছে। এই নূতন সম্বন্ধের সহিত সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টায় তাহার বাকি জীবন কাটিয়াছে। এই সম্বন্ধের অশেষ রকম ঘোর-ফের, প্রবল অনুরাগের সহিত কঠোর কর্তব্য ও সমাজ-নিষ্ঠার অবিরাম সংগ্রামে শ্রীকান্তের ভাবী জীবন বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। 'শ্রীকান্ত'-এর এই অংশে নিশীথ শ্মশানের ভয়াবহ বর্ণনা ও ভাঙ্গা বাঁধাঘাটে বসিয়া মানবজীবন-সম্বন্ধে পর্যালোচনা শরৎচন্দ্রের বর্ণনাশক্তি ও মননশক্তির অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয়। রাজলক্ষ্মীর সহিত প্রথম পরিচয়ের পর সামাজিক সম্মানের বাধা উভয়ের মধ্যে একটা ব্যবধান রচনা করিল। শ্রীকান্ত তারপর হঠাৎ সন্ন্যাসীর চেলাগিরিতে ভর্তি হইয়া যাযাবর-জীবনের সুখ ও নিরক্ষর লোকের ভক্তি উপভোগ করিতে লাগিয়া গেল। কিন্তু সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ তাহার রত্ন-আবিষ্কারক চক্ষুকে প্রতারিত করিতে পারিল না। গৌরী তেওয়ারীর প্রবাসী কন্যার অসীম নিঃসঙ্গ ব্যথা এবং রামবাবু ও তৎপত্নীর কল্পনাতীত কৃতঘ্নতা যুগপৎ তাহার চোখের সম্মুখে পড়িয়া গেল। এই কৃতঘ্নতার ফলে শ্রীকান্তকে প্রথমবার রাজলক্ষ্মীর প্রণয়কে পরীক্ষা করিতে হইল। প্রণয়ের ত পরীক্ষা হইয়া গেল, কিন্তু তাহাদের মিলনের পথে তাহাদের নিজেরই মন সূক্ষ্মতন্তু-নির্মিত বাধা রচনা করিল। বাস্তবিক তাহাদের অনুভূতি এত তীক্ষ্ণ, আত্মসম্মানজ্ঞান এত সতর্ক, ব্যবহারের বিচারবোধ এত অভ্রান্ত, যে, সাধারণ লোক যেখানে পরিপূর্ণ মিলনের নিবিড় আনন্দ উপভোগ করিত, সেখানে তাহারা একটি দ্বিধা-সংকোচ-জড়িত সূক্ষ্ম অতৃপ্তির অন্তরাল সৃষ্টি করিয়াছে। এই প্রথম উপলক্ষে বাধা আসিয়াছে শ্রীকান্তের দিক্ হইতে—রাজলক্ষ্মীর মিলনোৎসুক হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের উপর সে নৈতিক সতর্কতা ও সাংসারিক বুদ্ধির শীতল জল প্রক্ষেপ করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর সূক্ষ্ম অনুভূতি এই সতর্কতার ইঙ্গিত তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিয়া নিজ উৎসুক মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছে, এবং বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় একটা স্তব্ধ-গম্ভীর বিষাদের মধ্যে তাহাদের এই প্রথম মিলন-চেষ্টা আপন ব্যর্থতা নীরবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

এইখানে 'শ্রীকান্ত'-এর দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ। বাড়ি আসিয়া কিছুদিন বাসের পর অপরের

কন্যাদায় ও নিজের বিবাহদায় হইতে মুক্তি পাইবার জন্য শ্রীকান্ত দ্বিতীয়বার রাজলক্ষীর নিকট যাইতে বাধ্য হইয়াছে। এই দ্বিতীয় দফায় ঔদাসীন্যের ছদ্মবেশে মান-অভিমান প্রণয়ের পালাকে ঘোরাল করিয়াছে। রাজলক্ষী আবার বাইজী-জীবনে অবতরণ করিয়াছে। এমন সময় হঠাৎ শ্রীকান্তের আবির্ভাব। ক্ষণস্থায়ী অভিমানের পর পূর্বের বাধাটা যেন মুহূর্তের জন্য সরিয়া গেল। প্রতিরোধপীড়িত প্রেম সহজ উচ্ছ্বাস ও স্বীকারোক্তিতে মুক্তি পাইল। রাজলক্ষী আবার শ্রীকান্তের সহিত বর্মায় যাইতে চাহিল; শ্রীকান্ত পূর্বের ন্যায় এবার সে প্রস্তাবে অস্বীকার জ্ঞাপন করিল। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধটি সহজ ও পরিষ্কার হইয়া গেল। এবার বিদায়ের পালা স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে নহে, অপ্রতিরোধনীয় অশ্রুজলের মধ্যে সারা হইল।

তারপর বর্মা যাত্রা। এই যাত্রা যেন শরৎচন্দ্রের কল্পনা ও বর্ণনাশক্তির নূতন বিজয়-অভিযান। সমুদ্রযাত্রার বর্ণনায় একাধারে কবিত্ব, জীবন-সমালোচনা, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি সর্বপ্রকার মানসিক শক্তিরই সার্থকতা হইয়াছে। জাহাজের উপরে নানাবিধ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে ও পরিচয়ের স্বল্প অবসরেও শরৎচন্দ্রের দিব্যদৃষ্টি আবার নূতন আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছে। সমাজের পাকা বাঁধনে যেখানেই একটু ছিন্নসূত্র পাকাইয়া থাকে লেখকের শ্যেনচক্ষু ঠিক তাহার উপরেই গিয়া পড়ে। নন্দ-টগরের বিংশবর্ষব্যাপী দাম্পত্যসম্বন্ধের মধ্যেও টগরের জাত্যভিমান হাস্যকর অসংগতির সহিত নিজ স্বাতন্ত্র্য-রক্ষায় একটা গৌরব অনুভব করিয়াছে—আচারের শাঁস বর্জন করিয়া তাহার খোলসটি সযত্নে অঙ্কলাগ্রে বাঁধিয়াছে। আবার পক্ষান্তরে এমন একটি স্ত্রীলোকের দর্শন মিলিয়াছে যে অন্ততঃ লজ্জা-সংকোচের জড়পিণ্ড নয়, ও যাহার সম্বন্ধে 'পথি নারী বিবর্জিতা' এই প্রবাদ-বাক্য কোনমতেই সুপ্রযুক্ত নহে। এই অভয়া নিতান্ত অসংকোচেই যেমন রোহিণীকে ঠিক তেমনি শ্রীকান্তকে নিজের কাজে ভিড়াইয়া লইল এবং উহাদিগকে মাঝে রাখিয়া প্রায় সম্পূর্ণ নিজ চেষ্টাতেই কোয়ারাণ্টাইনের নরককুণ্ড অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইল। রেঙ্গুনে পৌছিয়া শ্রীকান্ত আপাততঃ রোহিণী-অভয়ার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন দেশের অশেষ বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজ চিন্তাশীলতা ও পর্যবেক্ষণ-শক্তির অনুশীলন করিতে লাগিয়া গেল। ব্রহ্মদেশের স্ত্রী-স্বাধীনতা, দা-ঠাকুরের হোটেলে জাতিভেদ-সংস্কারের অনিত্যতা, অভয়ার স্বামীর পত্নী-বাৎসল্য ও সমগ্র বাঙ্গালী সমাজের কলঙ্ক, কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতক স্বামী কর্তৃক নিরপরাধা ব্রহ্মস্ত্রীর পরিত্যাগ—ইহার প্রত্যেকটি দৃশ্য তাহার পূর্ব-সংস্কারের বন্ধনের উপর তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতের ন্যায়ই পড়িল, এবং তাহার যে মন ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদির প্রভাবে ও রাজলক্ষীর প্রেমে অসাধারণ উদারতা ও প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহাকে চির-স্বাধীনতার সনদ দান করিল। কিন্তু যে বন্ধন এই সমস্ত অভিনব অভিজ্ঞতার বিন্দু বিন্দু এসিড-পাতে ধীরে ধীরে ক্ষয় হইতেছিল তাহা অভয়ার বিদ্রোহরূপ বিস্ফোরকে একেবারে জ্বলিয়া ছাই হইয়া গেল। অভয়ার পাতিব্রত্য-ব্যাখ্যা অকাট্য ন্যায়নিষ্ঠা ও অকুণ্ঠিত স্বাধীন-চিন্তার জয়পতাকা। ইহার নৈতিক আদর্শ সাধারণের জন্য নহে—মূঢ় বিদ্রোহ অপেক্ষা অন্ধ অনুবর্তিতা বোধ হয় সমাজের পক্ষে কম অনিষ্টকর। কিন্তু সামাজিক নিয়মের ব্যতিক্রম থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়—ব্যক্তিগত জীবনের স্বাভাবিক প্রয়োজনের সহিত সমাজ-ব্যবস্থার যত অধিক ব্যবধান, ততই তাহা অসুবিধা ও অত্যাচারের হেতু হইয়া থাকে। এই আদর্শে সামাজিক বিধি-নিষেধ ও ধর্মসংস্কারগুলির পুনর্বিচারের প্রয়োজন। অভয়ার বিচারের বিষয় এই যে, সতীত্বের মূল কথাটা পরস্পরের প্রতি

শ্রদ্ধাভক্তি-ভালবাসা, না কঠোর আত্মসংযম ও আত্মনিগ্রহ ? হিন্দুসমাজ সব সময়েই এই আত্মনিগ্রহকেই উচ্চতর নৈতিক জীবন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে—ইহার জন্ম গভীর লাঞ্ছনা, পরমুখাপেক্ষিতা, আত্মাবমাননা, জীবনের একান্ত রিক্ততা সমস্তই নিঃসংকোচে স্বীকার করিয়াছে। শরৎচন্দ্র দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, ক্ষেত্রবিশেষে এই আত্মবলিদান একটা প্রকাণ্ড জুয়াচুরি ও নিতান্ত ব্যর্থ অপব্যয়। অবশ্য ইহা নিশ্চিত যে, ধৈর্য ও সংযমের বাঁধ একবার ভাঙ্গিলে সংযমের ইচ্ছা পর্যন্ত লোপ পাইতে পারে, সুদীর্ঘ সাধনার ফলে দুরন্ত প্রবৃত্তির দমনে আমরা যতটুকু অগ্রসর হইয়াছি তাহা সমস্তই নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু জীবন্ত, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সমাজের কর্তব্য ব্যক্তিগত প্রয়োজন-অনুসারে ব্যবস্থা নিয়মিত করা। যে সমাজ কেবল সাধারণ অবস্থার জন্যই ব্যবস্থা প্রণয়ন করে, অসাধারণ ব্যতিক্রমের অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করে না, তাহা আত্মঘাতী ; সে তাহার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ উপাদানগুলিকেই পিষ্ট, দলিত করিয়া তাহার নৈতিক জীবনকে সংকুচিত, অবনত করিয়া আনে। যে সমাজে পীড়নের নিষ্ঠুর অধিকার আছে, কিন্তু রক্ষণের দায়িত্ব নাই, তাহার অভিভাবকত্বের দাবী অনিষ্টকর ও অপমানজনক। শরৎচন্দ্রের সমাজ-বিশ্লেষণ এইরূপ গভীর ও বহুমুখী চিন্তাধারার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থমধ্যে সমাজ ও ধর্মসংস্কারের হীন দাসত্বের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক বিদ্রোহ চলিয়াছে অভয়া তাহার নেতৃবৃন্দের মধ্যে পুরোবর্তিনী। যে মুক্তিকামনা, যে অসন্তোষ-অতৃপ্তি অনেকের মনে ধূমায়িত হইয়াছে তাহা অভয়ার নির্ভীক বিদ্রোহে, সুস্পষ্ট স্বাধীনতা-ঘোষণায় একেবারে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। যে কুণ্ঠিত লজ্জা, যে অপ্রসুপ্ত সংস্কার রাজলক্ষ্মী-সাবিত্রীর ভালবাসার ধারাকে পদে পদে প্রতিহত করিয়া তাহাদের মনে একটা ক্ষুব্ধ আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে, অভয়া সবলে, নিঃসংকোচে তাহার গ্লানিকে ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে। কিরণময়ীর তীক্ষ্ণাগ্র, ক্ষুরধার বুদ্ধিও যেখানে মালিন্যগ্রস্ত, সেখানেও অভয়ার প্রবল, অকুণ্ঠিত ন্যায়বোধ জয়ী হইয়াছে। অবশ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অবস্থাভেদে কর্তব্যনির্ধারণের তারতম্য ঘটিয়াছে। রাজলক্ষ্মী-কিরণময়ীর সমস্যা অভয়ার সহিত এক নহে। রাজলক্ষ্মী তাহার ভালবাসাকে সার্থক করিতে একাগ্রভাবে চাহে না—সে ইহাকে তাহার ঘৃণিত ভূতপূর্ব গণিকা-জীবন হইতে উদ্ধারের ও ধর্মজীবনে উন্নতির উপায়স্বরূপ ব্যবহার করিতে চাহে। অভয়া যে নির্মল জল আকণ্ঠ পান করিবার জন্য উন্মুখ, রাজলক্ষ্মী প্রধানতঃ তাহাকেই পূর্বজীবনের কালিমা ধুইবার কাজে লাগাইতে চাহে, সুতরাং অভয়ার ইচ্ছার একাগ্র প্রবলতা তাহার নাই। আর কিরণময়ী তাহা তাহার পক্ষে অপেয় জানিয়া তাহাতে প্রতিহিংসার এসিড ঢালিয়া তাহার প্রেমাস্পদকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে চাহে—সুতরাং ইহাদের মধ্যে প্রভেদ থাকিবেই। এক সাবিত্রীর সহিত তাহার অবস্থার কতকটা সাম্য আছে—কিন্তু সাবিত্রীর প্রবল ধর্মসংস্কার ও নিজ হীনতা-সম্বন্ধে কুণ্ঠিত ধারণা তাহার প্রেমকে সার্থক করিয়া তুলিবার পথে অন্তরায় হইয়াছে।

অভয়ার বিদ্রোহ যে ভোগাসক্তিমূলক নয় তাহা সে প্লেগ-মহামারীর মধ্যে শ্রীকান্তকে নিজ নূতন-পাতা সংসারে আশ্রয় দিয়া প্রমাণ করিয়াছে। প্লেগ হইতে উঠিয়া এই তৃতীয়বার শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মীকে প্রয়োজন হইয়াছে। অভয়ার দৃষ্টান্ত রাজলক্ষ্মীর মনে খুব গভীর আলোড়ন জাগাইয়াছে ; কিন্তু আর একটা নূতন উপসর্গ জুটিয়া তাহার ভালবাসার উপর বৈরাগ্যের রং ফলাইয়া দিয়াছে। তাহার সপত্নী-পুত্র বঙ্কুর উপস্থিতি তাহার মনে মাতৃত্বের

মর্যাদাবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছে ; তাহার উপর আবার ধর্মের নেশা নূতন করিয়া তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। তথাপি সে অভয়ার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া সমস্ত তর্কসংশয়-জাল ছিন্ন করিয়া শ্রীকান্তের সহিত অবাধ-মিলন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে ; কিন্তু আবার শ্রীকান্তের সম্ভ্রমবোধ পিছাইয়া আসিয়াছে। এবার যে ছাড়াছাড়ি হইয়াছে তাহার মধ্যে মোহভঙ্গের বিষাদ ও একটা শেষ সংকল্পের সুর বাজিয়াছে। কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতে পুনরায় শ্রীকান্তের পল্লীগৃহে তাহার রুগ্ন শয্যার পার্শ্বে রাজলক্ষ্মীর ডাক পড়িয়াছে। এবার যেন দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান হইয়াছে বলিয়া [illegible] অনেকটা ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া শ্রীকান্ত তাহার চিরন্তন সমাজ ও পরিবার-সমক্ষে রাজলক্ষ্মীর সহিত সম্পর্ক স্বীকার করিয়াছে, এবং আপাততঃ এই সুদীর্ঘ, সূক্ষ্ম আকর্ষণ-বিকর্ষণলীলার উপর যবনিকা-পাত হইয়াছে।

কিন্তু যে কুণ্ঠা বাহিরের সমাজের নিকট প্রকাশ্যভাবে বিসর্জিত হইয়াছে তাহাই রাজলক্ষ্মীর মনের ভিতর নবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া আবার তাহাদের মিলনকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। এবার সমস্ত বাধা আসিয়াছে রাজলক্ষ্মীর দিক্ হইতে। কিছুদিন হইতেই রাজলক্ষ্মীর যে একটা কঠোর আচার-নিষ্ঠা ও কৃচ্ছ্রসাধনের দিকে ঝোঁক পড়িয়াছিল তাহা গঙ্গামাটির নির্জনতায় ও সুনন্দার প্রভাবে অত্যন্ত প্রবল হইয়া ভালবাসাকে অতিক্রম করিয়া গেল। রাজলক্ষ্মীর প্রত্যেক কথাতে, প্রত্যেক ব্যবহারে একটা সুদূর ঔদাসীন্য ও নির্লিপ্ততার ভাব তাহার মনের সাবলীল বিচিত্র আন্দোলনকে একেবারে নিশ্চল করিয়া দিয়াছে। গঙ্গামাটির সমস্ত জীবনটার উপরেই একটা গুরুভার অবসাদ, একটা চির-বিচ্ছেদের বিষাদ-করুণ ছায়া সর্বব্যাপী হইয়া চাপিয়া আছে। এতদিন ধরিয়া রহস্যময় প্রেমের যে লুকোচুরি খেলা চলিতেছিল, যে শীর্ণ প্রবাহ লজ্জা-সংকোচ-আত্মসম্মানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধার মধ্যে কোন রকমে পথ করিয়া চলিতেছিল, সাময়িক উচ্ছ্বাসের আবেগে যাহা বর্ষাস্ফীত স্রোতস্বিনীর ন্যায় দুর্বার হইয়া উঠিতেছিল, সে আজ ধর্ম ও আচারের বালুকারাশির মধ্যে একেবারে শুকাইয়া গেল। এই পরিণামে রাজলক্ষ্মীর আধ্যাত্মিক উন্নতি ও শান্তি কতটা বাড়িল, তাহার কোন সন্ধান মিলিল না, কিন্তু শ্রীকান্তের পুরোবর্তী জীবন দিগন্তব্যাপী মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতে লাগিল। ধর্ম স্বহস্তে যে প্রেমের সমাধি দিয়াছে, তাহার পুনর্জীবনের আর কোনই আশা রহিল না, শুধু স্মৃতির শুকতারাটি তাহার উপর সমুজ্জ্বল হইয়া রহিল।

'শ্রীকান্ত'-এর তৃতীয় পর্বে চিন্তাশীলতা,জীবন-সমালোচনার শক্তি বাড়িয়াছে বই কমে নাই; কিন্তু খাঁটি সৃষ্টিশক্তির দীপ্তি যেন কতকটা ম্লান হইয়া আসিয়াছে। গঙ্গামাটির ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে যে কয়টি মানুষের সাক্ষাৎ মিলিয়াছে তাহাদের ব্যক্তিগত জীবন অপেক্ষা তাহাদের সমস্যাই বড়। সুনন্দার দৃপ্ত তেজস্বিতার কাহিনী শুনি বটে, কিন্তু রাজলক্ষ্মী বা অভয়ার মত তাহার প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাই না। ধীরে ধীরে সন্দেহ জাগিয়া উঠে যে, শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষ অনুভূতির ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া সমস্যার কণ্টকাকীর্ণ ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করিতেছেন। সন্ন্যাসী বজ্রানন্দ ততটা মানুষ নহেন, যতটা দেশপ্রীতির নিবিড় বেদনা-বোধের মূর্ত প্রকাশ। কেবল কুশারী-গৃহিণী ও অগ্রদানী ব্রাহ্মণ চক্রবর্তি-গৃহিণী এই দুইজনের মধ্যেই স্বল্প-পরিমাণ প্রাণের ঝলক দেখা যায় ; কিন্তু এই তৃতীয় পর্বে যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা লাভবান্ হইয়াছে সে রতন। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে সে মাত্র রাজলক্ষ্মীর বিশ্বস্ত, কর্মঠ ভৃত্য ছিল ;

কিন্তু এই গঙ্গামাটির জলহাওয়া, যাহা শ্রীকান্ত-রাজলক্ষীর সম্বন্ধের নিবিড় মাধুর্য শুকাইয়া তুলিয়াছে, রতনের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে খুব অনুকূল হইয়াছে। এই হাওয়ায় সে যেন অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। শ্রীকান্তের একান্ত অসহায়ত্বের ও কুণ্ঠিত অধীনতার ছবিটি তাহার চোখে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—শ্রীকান্তের প্রতি সে একটা সমবেদনার টান অনুভব করিয়াছে।

'শ্রীকান্ত'-এর চতুর্থ খণ্ডে বন্ধু-প্রীতি ও প্রেম—এই দুই পুরাতন সুরেরই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে—এবং পুরাতন পুনরাবৃত্তিতে নবীনতার যে অবশ্যম্ভাবী অপচয় হয়, এখানেও তাহাই ঘটিয়াছে। গহরের আত্ম-প্রতারণায় করুণ সাহিত্য-চর্চার সূত্র ধরিয়া শ্রীকান্তের সহিত তাহার বন্ধুত্বের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা মোহের নিবিড়তায় ও দুঃসাহসের উদ্দীপনায় ইন্দ্রনাথের সহিত প্রীতি-সম্পর্কের কাছাকাছিও যাইতে পারে নাই। ইহা প্রৌঢ়ত্বের বন্ধুত্ব, যাহাতে পূর্বস্মৃতি ও মোহ-ভঙ্গই সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছে। সমস্ত বিষয়টি আলোচনা করিলে গহরের সহিত শ্রীকান্তের কোন ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার পরিচয় মিলে না—গ্রামের যে রুক্ষ, বিশীর্ণ, ঝরা পাতার জঞ্জাল-আবর্জনায় হতশ্রী চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা যেন তাদের রিক্ত, মন্দবেগ বন্ধুত্বের যোগ্য পটভূমি ও প্রতীক। গহরের লাঞ্ছিত সাহিত্যিক দুরাকাঙ্ক্ষা তাহার প্রতি একটা করুণ সহানুভূতির উদ্রেক করে, কিন্তু শ্রীকান্তের জীবনের সহিত তাহার যোগ-সূত্র নিতান্ত ক্ষীণ, অলক্ষিত-প্রায়; এই নূতন সম্পর্ক তাহার জীবনের কোন অনাবিষ্কৃত রহস্যের উপর আলোকপাত করে না। এই সমস্ত মন্তব্য কমললতার সহিত প্রেমাভিনয়ের দৃশ্যগুলি-সম্বন্ধে আরও অধিকরূপে প্রযোজ্য। প্রেমের অকারণ আকস্মিকতা হয়ত ইহার একটা প্রধান উপাদান; কিন্তু জীবনে যাহা আকস্মিক, সাহিত্যে একটা কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার ভিতর দিয়া তাহার উদ্ভব ও পরিণতির ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা দেখিতে চাই। প্রেমের বনফুল যে পর্যন্ত আমাদের হৃদয়-রসে পুষ্ট ও পূর্ণবিকশিত না হয়, সে পর্যন্ত তাহার সহিত আমাদের রক্তের আত্মীয়তা আমরা সম্পূর্ণ স্বীকার করি না। রাজলক্ষীর ক্ষেত্রে যে প্রেম আমাদের চোখের উপর নিগূঢ় জীবনীরসে পূর্ণ ও শতদলের অম্লান সৌন্দর্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, কমললতার প্রেম সেরূপ কোন অখণ্ডনীয় প্রমাণ লইয়া নিজ জন্মস্বত্ব সাব্যস্ত করে না। এই সদ্যোজাত প্রেমের কোন গভীর তলদেশ পর্যন্ত প্রসারিত মূল নাই, ইহা জলজ উদ্ভিদের ন্যায় একপ্রকার অস্বাস্থ্য-কর প্রাচুর্যে হৃদয়ের উপরিভাগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে; ইহার প্রণয়-নিবেদনের অতিপল্লবিত বাহুল্য ইহার আন্তরিকতাকে অতিক্রম করিয়াছে। প্রৌঢ় বয়সের বন্ধুত্বের ন্যায় প্রৌঢ় বয়সের প্রেমেও একপ্রকারের মলিন, বিবর্ণ তেজোহীনতা আছে, এবং কমললতার প্রেমে এই পাণ্ডুর রক্তাল্পতাই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। যে কৈশোর ও প্রথম যৌবনের উদ্দাম আবেগের স্মৃতি এই প্রৌঢ় প্রেমের একমাত্র অবলম্বন, যাহার বিচ্ছুরিত আলোকে ইহার মুখমণ্ডলের উপর মধ্যে মধ্যে একটা ক্ষণস্থায়ী রক্তিম দীপ্তি খেলিয়া যায়, এখানে সেই জীবনী-উৎসেরও একান্ত অভাব। সুতরাং এই প্রণয়-কাহিনী সুলভ ভাব-বিলাস অপেক্ষা আন্তরিকতার কোন উচ্চতর দাবী করিতে পারে না। রাজলক্ষীকে যে শেষ পর্যন্ত কমললতার সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে, তাহার গ্রাস হইতে শ্রীকান্তকে উদ্ধার করিবার জন্য অনভ্যস্ত, অশোভন লোলুপতার অভিনয় করিতে হইয়াছে, ইহাতে তাহার ও শ্রীকান্তের উভয়েরই প্রেমের অবমাননা করা হইয়াছে। শ্রীকান্তের চরিত্রের যে অসাধারণত্ব তাহার প্রধান আকর্ষণের

হেতু ছিল, তাহা এই চতুর্থ ভাগে একটা ধূসর বর্ণহীনতার মধ্যে অবলুপ্ত হইয়াছে। তৃতীয় ভাগে যে দুর্বলতার সূচনা দেখা দিয়াছিল, চতুর্থ ভাগে তাহা নিঃসংশয়িতরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৬)

'শ্রীকান্ত'-এর তৃতীয় পর্বের সহিত শরৎচন্দ্রের প্রতিভার মধ্যাহ্ন-দীপ্তি শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়—উহার সৌন্দর্যের সহিত অপরাহ্লের ম্লান ছায়া মিশিয়াছে। ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। যে রস প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে পাক খাইয়া জমিয়া উঠে তাহার প্রবাহ অফুরন্ত হইতে পারে না। বরং আশ্চর্য ইহাই যে, এতদিন ধরিয়া এত বিচিত্র অবস্থার মধ্যে আমাদের বাঙ্গালী জীবনের মরুভূমে এই রসের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ সম্ভব হইল কি করিয়া? নিছক সমস্যা-প্রিয়তার যে ইঙ্গিত 'শ্রীকান্ত'-এর তৃতীয় পর্বে পাই তাহা তাঁহার পরবর্তী রচনায় আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে। তাঁহার 'শেষপ্রশ্ন'-এ তত্ত্বপ্রিয়তার দিক্ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়া কলা-কৌশলকে বহু-পশ্চাতে ফেলিয়াছে। বিদ্রোহের যে সুর অভয়া-রাজলক্ষ্মী-সাবিত্রীর মধ্যে জীবনের রসধারায় সিক্ত ও তাহার বিচিত্র জটিল অভিব্যক্তির সহিত জড়িত হইয়া আমাদের বাঙ্গালী সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের গূঢ় অপরিহার্য প্রতিকূলতার মধ্যে নিবিড়তা লাভ করিয়াছে, তাহা কমলের চরিত্রে একটা বাধাবন্ধহীন, হৃদয়-সম্পর্ক-রহিত তর্কের আতশবাজির মত জ্বলিয়া নিঃশেষ হইয়াছে। সে সাবিত্রী-অভয়া-রাজলক্ষ্মীর সহোদরা বা স্বজাতীয়া নহে—ইহারা বাঙ্গালী, ইহাদের বিদ্রোহ যাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বাহিরে আসিতেছে তাহা সমস্ত সমাজ ও যুগ-যুগান্তরব্যাপী ধর্মবিধির সম্মিলিত শক্তি। কমলের জন্ম যেন সোভিয়েট রুশদেশে—তাহার বিদ্রোহ কোন বিরুদ্ধ শক্তির প্রতিঘাত অনুভব না করিয়া, নিতান্ত অবলীলাক্রমে একটা অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার সহিত আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহার যেন কোথাও কোন নাড়ীর সম্পর্ক নাই, ছোট-বড় কোন টানই ইহাকে বেদনায় ব্যথিত করে না, কোন পূর্বসংস্কারই ইহার বাচালতার মুখ চাপিয়া ধরে না। কমল একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য মতবাদের সুস্পষ্ট ও জোরাল অভিব্যক্তি মাত্র, জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ নহে ; একটা ইঞ্জিনের বাঁশি, হৃদয়-স্পন্দন নহে

/'বিপ্রদাস' (মাঘ, ১৩৪১) উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের পূর্ব-গৌরবের অনেকটা পুনরুদ্ধার হইয়াছে। অতি কঠোর আচার-অনুষ্ঠাননিষ্ঠ মুখুজ্যে পরিবারের সঙ্গে স্বল্পকালস্থায়ী সংস্রবে আধুনিক শিক্ষা-প্রাপ্তা বন্দনার চিত্ত-জগতে যে গুরুতর বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল তাহারই ইতিহাস ইহার বিষয়বস্তু।/ বন্দনা এই আচার-বিচারের অতি-সতর্ক শুচিতার দ্বারা একই সময়ে আকৃষ্ট ও প্রত্যাহত হইয়াছে ; ইহাকে বুদ্ধির দ্বারা অনুমোদন করিতে পারে নাই, কিন্তু অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। এই আচারনিষ্ঠতার প্রভাবে তাহার সমস্ত পূর্বসংস্কার ও জীবন-যাত্রা-প্রণালী জীর্ণ পত্রের মত নিঃশব্দে, অথচ অনিবার্যভাবে খসিয়া পড়িয়াছে। নিজ সমাজের ঐশ্বর্যোপাসনা ও অসরলতা, বাহ্য চাকচিক্য ও ভদ্রতার অন্তরালে ইতর-মনোবৃত্তি, তাহার মনে প্রবল বিতৃষ্ণা জাগাইয়া তাহাকে এই নূতন জীবনাদর্শের দিকে আরও প্রবলভাবে ঠেলিয়া দিয়াছে। এই নূতন প্রভাবের ফলে তাহার প্রেমের ধারণা ও প্রেমাস্পদের ব্যক্তিত্ব বিস্ময়করভাবে ছায়াচিত্রের দৃশ্যাবলীর ন্যায় পরিবর্তিত হইয়াছে—সুধীর, অশোক, বিপ্রদাস এবং একবার মত-পরিবর্তনের পর দ্বিজদাস পর্যায়ক্রমে তাহার প্রণয়স্পৃহা জাগাইয়াছে। শেষ

পর্যন্ত দ্বিজদাসকে সে গ্রহণ করিয়াছে ঠিক প্রণয়ী হিসাবে নহে, মুখুজ্যে-পরিবারের চিরপ্রথা-গত কর্তব্যের কেন্দ্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায়স্বরূপ। দ্বিজদাসের পত্নীত্ব-স্বীকার শেষ পর্যন্ত তাহার সনাতন আদর্শের নিকট আত্ম-সমর্পণ। তাহার মনের কোণে দ্বিজদাসের প্রতি যে একটু মোহ ছিল, কর্তব্য-পালনের ব্যগ্রতাই তাহাকে বিবাহের চিরন্তন বন্ধনে স্থায়িত্ব দিয়াছে।

বিপ্রদাসের চরিত্রে তাহার নিঃসঙ্গ একাকীত্বই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। যে কেহ তাহার সহিত সংস্রবে আসিয়াছে সেই ইহার দ্বারা অভিভূত হইয়াছে। তাহার চরিত্র-বল বন্দনার প্রণয়জ্ঞাপনকে আমল না দেওয়ার ব্যাপারেই সুপরিস্ফুট হইয়াছে; ইহার মুখ্য পরিচয় পাই দ্বিজদাসের সসম্ভ্রম আজ্ঞানুবর্তিতায় ও উচ্ছ্বসিত স্তুতিতে। তাহার মাতৃভক্তির উপরও খুব জোর দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক ইহার ভিত্তি অতি দুর্বল ও ইহা অতি ক্ষণভঙ্গুর। তাহার স্ত্রীর প্রতি কোন ভালবাসা আছে কি না, এই সংশয়পূর্ণ অনুযোগ একাধিকবার ধ্বনিত হইয়াছে ও ইহার কোন সদুত্তর মেলে নাই। মোটকথা এই নিঃসঙ্গতার পরিমণ্ডল-বেষ্টিত মানুষটির নিগূঢ় পরিচয়টি আমাদের নিকট পৌঁছে কি না সন্দেহ—অন্যের স্তুতিভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি আরতির প্রজ্বলিত দীপ হাতে লইয়া তাহার রহস্যাবৃত মুখমণ্ডলের উপর আলোক-পাত করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছে। দেবচরিত্রের দুর্জ্ঞেয়তা তাহার মানব-পরিচয়ের পথ বন্ধ করিয়াছে।

নিজের ছেলের চেয়ে সপত্নী-পুত্রের প্রতি অধিক বাৎসল্য দেখাইয়া দয়াময়ী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু মনে হয় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ও আচারনিষ্ঠতার সংকীর্ণতাকারী প্রভাবে এই পরকে আপন করিবার শক্তি তাহার নিতান্ত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিজদাসের মত সেও স্ব-প্রকাশ নহে, পরের মনোভাবের আলোকে তাহার মুখের রেখাগুলি পড়িয়া লইতে হয়। বিপ্রদাসের ভক্তি তাহাকে যে উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহার নিজ কার্যাবলী সেই উন্নত আসন হইতে বারবার তাহাকে নামাইতে চাহিয়াছে। উপন্যাসমধ্যে তাহার এমন কোন পরিচয় পাই না, যাহাতে বিপ্রদাসের উচ্ছ্বসিত ভক্তির সমর্থন মিলিতে পারে। পুত্রের সহিত চিরবিচ্ছেদই তাহার চরিত্রের অন্তর্দৃষ্টিহীন, অন্ধ যান্ত্রিকতার অভ্রান্ত নিদর্শন।

দ্বিজদাসই উপন্যাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সজীব চরিত্র। সে সাধারণ স্তরের মানুষ বলিয়া পাঠকের অধিকতর সহানুভূতি অর্জন করে। বন্দনা তাহার প্রতি সুস্পষ্ট মনোভাব প্রকাশ করার পরেও তাহার ঔদাসীন্য প্রমাণ করে যে, তাহার ব্যক্তিগত জীবন পারিবারিক আবেষ্টনের চাপে নিজ স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। মুখুজ্যে পরিবারের আদর্শ ও জীবনধারা সর্বাপেক্ষা তাহাকেই পীড়ন করিয়াছে, কিন্তু প্রকাশ্য বিদ্রোহে উত্তেজিত করিতে পারে নাই। এই জড় নিয়মানুবর্তিতা কতটা তাহার স্বাধীন-চিত্ততার অভাবের জন্য, ও কতটাই বা দাদা ও বৌদিদির প্রতি ভক্তিমূলক, তাহাব সীমা নির্ধারণ করা কঠিন। এই অতি দৃঢ়সংকল্প পরিবারের মধ্যে তাহার আপেক্ষিক দুর্বলতাই তাহার বিশেষত্ব ও জনপ্রিয়তার হেতু। বন্দনার আহ্বানও আসিয়াছে তাহার কঠোর-দায়িত্বপালনে সহযোগি-নির্বাচনের তাগিদে, প্রেমের নিগূঢ় অনন্বী-কার্য প্রয়োজনে নহে।

চরিত্র-পরিকল্পনার দিক্ দিয়া উৎকর্ষ-অপকর্ষের কতকটা ধারণা এই আলোচনা হইতেই পাওয়া যাইবে। কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে আর কতকগুলি সমস্যা আছে যাহার বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ, দয়াময়ী ও বিপ্রদাস যে আদর্শের অনুসরণ তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য মনে করিয়াছে তাহার প্রকৃত মূল্য কতটুকু? দয়াময়ী এই ছোঁয়া-খাওয়ার ব্যাপার লইয়া একাধিকবার অতিথির প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিয়াছে ও আতিথেয়তার আদর্শচ্যুত হইয়াছে; কিন্তু আবার মনের প্রসন্ন অবস্থায় বন্দনাকে রান্নাঘরের সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিয়াছে। বিপ্রদাস নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই ও প্রায়শ্চিত্তের সংকল্প মনে মনে রাখিয়া বন্দনার হাতে খাইতে রাজি হইয়াছে, কিন্তু অসুখের সময়ে তাহার সেবা-পরিচর্যা গ্রহণ করিতে, এমন কি তাহার দ্বারা পূজা-আহ্নিকের আয়োজন করাইয়া লইতেও দ্বিধা করে নাই। এই পরস্পর-বিরোধী ব্যবহারের জন্য তাহারা যে কৈফিয়ত দিয়াছে তাহা আদৌ সন্তোষজনক নহে। দয়াময়ীর তরফে বিপ্রদাস যে ব্যাখ্যা দিয়াছে তাহার সারমর্ম এই যে, দয়াময়ী মাতা হিসাবে আদর্শস্থানীয়া ও বাহিরের লোকের পক্ষে তাহাকে বোঝা ও তাহার প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নহে। আদর্শ গৃহিণী ও স্নেহশীলা মাতা হইলে আতিথেয়তার কর্তব্যচ্যুতির কিরূপে ক্ষালন হয় তাহা বাস্তবিকই কিঞ্চিৎ দুর্বোধ্য। বিপ্রদাসের নিজের কৈফিয়ত আরও গাত্রজ্বালার সৃষ্টি করে, বন্দনা তাহার প্রতি অনুরাগিণী ও শ্রদ্ধা-সম্পন্না এই জ্ঞানই তাহার মতের উদারতা বিধান করিয়া তাহাকে বন্দনার সেবাগ্রহণেচ্ছু করিয়াছে। তাহা হইলে মোটের উপর এই আচার-নিষ্ঠা একটা মনের খেয়াল মাত্র, মনের প্রসন্নতা-অপ্রসন্নতা-অনুরাগ-বিরাগ, ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর নির্ভর করে, ইহা অপরিবর্তনীয় সনাতনত্বের দাবী করিতে পারে না। সুতরাং বন্দনার মত বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক ইহার ভিতরকার জুয়াচুরিটুকু ধরিতে না পারিয়া এই আদর্শ অনুসরণের মোহগ্রস্ত হইয়াছে ইহা বিস্ময়ের বিষয়। হয়ত যাহা তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল তাহা এই খেয়ালের উপর প্রতিষ্ঠিত গোঁড়ামি নহে, মুখুজ্যে-পরিবারেব বহুবিস্তৃত কর্তব্য-পরিধি ও রাজোচিত উদার আশ্রয়-বিস্তার। ইহাই তাহার বিবেক-বুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন ও প্রেমকে জাগ্রত করিয়াছিল বলিযা মনে হয়। লেখক কিন্তু এই প্রশ্নের আসল সমাধানের পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠে মুখুজ্যে-পরিবারের পারিবারিক আদর্শ লইয়া। এই আদর্শের অন্তর্ভুক্ত স্নেহ-প্রীতি-ভক্তি, পরের জন্য স্বেচ্ছায় নিজ স্বাধীনতা-সংকোচ, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, অবিচলিত ধর্ম-নিষ্ঠা, সুপ্রচুর দানশীলতা, ইত্যাদি নানাবিধ সদ্‌গুণের কথা আমরা বারবার শুনি। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহা অতি সামান্য মাত্রায়ও আঘাতসহ নহে। যদি এই পরিবারের কোন সত্যকার বন্ধন থাকিত, এই আদর্শের কোন প্রকৃত ধর্ম-মূলক অক্ষয়ত্ব থাকিত, তবে তুচ্ছ একটা ঘটনায় ইহা একেবারে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া যাইত না; মর্মান্তিক বিচ্ছেদ ইহার ঐক্য ও সংহতিকে বিধ্বস্ত করিতে পারিত না। শশধরের সহিত বিরোধে বিপ্রদাসের পক্ষে যে একটা সমর্থনযোগ্য হেতু আছে ইহা আবিষ্কার করা দয়াময়ীর কষ্টসাধ্য হইত না; পক্ষান্তরে বিপ্রদাসেরও, একটা ধর্মানুষ্ঠানের মাঝখানে ও নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের সম্মুখে, দীর্ঘকাল প্রধূমিত গৃহ-বিবাদে বারুদ-সংযোগ না করার উপযুক্ত ধৈর্য ও মাতৃভক্তি থাকা উচিত ছিল। যেখানে প্রকৃত সংযম ও সহানুভূতির এত শোচনীয় অভাব, সে পরিবারের আদর্শের খোলস

লইয়া বড়াই চলিতে পারে, কিন্তু শাঁস যে নাই তাহা নিশ্চিত। অনেক পারিবারিক বিচ্ছেদ আদর্শ-বৈষম্যের কঠোর প্রয়োজনে সংঘটিত হইয়াছে; উচ্চতর কর্তব্যের নিকট প্রীতি-স্নেহ-মমতা প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তিকে বিসর্জন দিতে হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে বিচ্ছেদের কারণ কোন আদর্শ-নিষ্ঠা নহে, ইহা নিছক একগুঁয়েমি। সুতরাং এই পরিবারের উচ্ছ্বসিত স্তব-স্তুতি-সম্বন্ধে আমরা স্বভাবতঃই একটু সন্দিহান হইয়া পড়ি।

ইহা ছাড়া তৃতীয় এক প্রশ্নেরও অবসর আছে—তাহা বন্দনার প্রেম-বিষয়ক। বন্দনা-সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা করি তাহার প্রধান উপাদান হইতেছে তাহার তেজস্বী স্বাধীনচিত্ততা ও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠা। ইহারই জন্য একদিকে সে মুখুজ্যে-পরিবারের সংকীর্ণতা ও বিপ্রদাসের অটল আত্মপ্রত্যয়ের বিরুদ্ধে অসংকোচে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াছে, অপরদিকে যাহাকে সে সত্য বলিয়া মনে করিয়াছে তাহার জন্য আপনার সমস্ত পূর্বতন সংস্কার ও অভ্যস্ত জীবন-যাত্রা পরিহার করিয়াছে। কিন্তু এই ধারণার সহিত তাহার ব্যবহার সব সময়ে খাপ খায় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মুখুজ্যে-পরিবারের আদর্শে যে ফাঁকিটুকু আছে তাহা তাহার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিকে এড়াইতে পারে নাই, তথাপি এই ত্রুটিসংকুল আদর্শকেই সে প্রাণপণ বলে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। ইহার একটা কারণ অবশ্য প্রেমের আকর্ষণ; দ্বিতীয় কারণ তাহার মাসিমার প্রতিবেশ-মণ্ডলের বিরুদ্ধে তাহার অতি তীব্র বিতৃষ্ণা ও বিদ্রোহ, যদিও এই বিদ্রোহের উদ্ভব একটু অতিরিক্ত রকম উগ্র ও আকস্মিক। কিন্তু তাহার প্রণয়-ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের পরিবর্তনগুলির মধ্যে এমন একটা অস্থিরমতিত্ব ও আত্মপ্রকৃতি-সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, যাহাকে আমরা চরিত্র-দৃঢ়তার সহিত একেবারেই মিলাইতে পারি না। তাহার বাগ্‌দত্ত স্বামী সুধীরের প্রতি তাহার ভালবাসা "দিগন্তের ইন্দ্রধনুপ্রায়" মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে—এই অতর্কিত পরিবর্তন বিপ্রদাসের ন্যায় আমাদেরও বিস্ময় উৎপাদন করে। অবশ্য জীবন-যাত্রার আদর্শের সঙ্গে প্রণযাস্পদের পরিবর্তন মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া একেবারে যে সমর্থনের অযোগ্য তাহা নহে, তবুও মনে হয় বন্দনা প্রেম ও পারিবারিক পরিস্থিতির মধ্যে কোন প্রভেদের ধারণা করিতেই পারে নাই। প্রেমের সঙ্গে একনিষ্ঠতার যে কোন অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নাই তাহা শরৎচন্দ্রই একাধিক উপন্যাসে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তথাপি সুধীরকে পাঁচমিনিটের মধ্যে প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারটা আমাদিগকে বিনা প্রতিবাদে গলাধঃকরণ করাইতে যেটুকু আয়োজন দরকার লেখক তাহাও করেন নাই। তারপর সবাপেক্ষা বিস্ময়কর হইতেছে বিপ্রদাসের প্রতি প্রেম-নিবেদন।—এই অভাবনীয় ব্যাপারের ধাক্কা বিপ্রদাসকেই বেশি করিয়া বাজিয়াছে। তাহার মেজদিদির সর্বনাশ, মুখুজ্যে-পরিবার-প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস—এ সব চিন্তাই প্রেমের অতর্কিত বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। বন্দনার দিক্ হইতে ইহার একমাত্র কৈফিয়ত যে, বিপ্রদাস তাহার দিদিকে ভালবাসে না। এই উন্মত্তপ্রায় ব্যবহারের যে ব্যাখ্যা বিপ্রদাস দিয়াছে তাহাই সর্বাপেক্ষা সমীচীন মনে হয়—যে বন্দনা ভালবাসার একরকম চেহারাই জানে, তাহা যে শ্রদ্ধা-ভক্তি-মিশ্রিত নিষ্কলুষ প্রীতির মূর্তি পরিগ্রহ করিতে পারে তাহা তাহার অজ্ঞাত। দ্বিজদাসের প্রতি তাহার প্রণয়-জ্ঞাপন সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক, এবং দ্বিজদাসের তৃতীয়-পক্ষোচিত নিষ্ক্রিয়ত্ব তাহার আত্মমর্যাদাবোধে যে আঘাত দিয়াছে তাহাও বেশ সুসংগত। তাহার চতুর্থ প্রণয়ী অশোকের প্রতি তাহার সত্যকার কোন আকর্ষণ ছিল না—তাহার

প্রণয়-স্বীকার হৃদয়-বৃত্তি অপেক্ষা গীতোক্ত নিষ্কামধর্মেরই অনুশীলন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন অভিযোগ প্রকৃতপক্ষে বন্দনাকে স্পর্শ করে না। মোটের উপর এই দ্রুত পবিবর্তন-পরম্পরা বন্দনাব চবিত্র-পবিকল্পনাব সহিত ঠিক সামঞ্জস্য রাখিতে পারিযাছে বলিয়া মনে হয় না।

বন্দনাব চরিত্রে সূক্ষ্ম সৌকুমার্য ও নিগূঢ় আকর্ষণ বুঝিবার পক্ষে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী মৈত্রেয়ী অনেকটা সহায়তা করে। মৈত্রেয়ীও বন্দনার মত সেবা-নিপুণা, কিন্তু তাহার সেবার মধ্যে কূট-বুদ্ধির ইঙ্গিত ও লোক-দেখান আডম্বরের ভাব পাওযা যায়। বন্দনার সেবা ব্যঙ্গ-কৌতুকে সরস ও উপভোগ্য এবং সরল আন্তরিকতায় স্নিগ্ধ, মৈত্রেয়ীব পরিচর্যায় মিষ্টরসপরিবেশন অত্যধিক। যে গৃহবিবাদের সাংঘাতিক পবিণতিতে বন্দনাব সুরুচিবোধ ও সংযমজ্ঞান অন্তরালে আত্মগোপন কবিযাছে, সেখানে মৈত্রেযী সমস্ত গোপনীয়তাব গণ্ডি লঙ্ঘন কবিয়া অসংকোচে তাহাব সেবাসম্ভাব পৌঁছাইয়া দিযাছে। বিরোধের মধ্যে যেখানে বন্দনা নিরপেক্ষ, সেখানে মৈত্রেযী বিনা দ্বিধায় পক্ষাবলম্বন কবিযাছে। মৈত্রেযীব আত্মীয়তা নিজ স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনীয় গণ্ডিব বাহিবে প্রসাব লাভ কবে নাই, পবেব ছেলেকে মানুষ কবাব দায় সে অস্বীকাব করিযাছে। এই সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ব্যাপারে উভযেব মধ্যে পার্থক্যের ইঙ্গিত দিযা লেখক বন্দনার চবিত্র ফুটাইয়া তুলিযাছেন। সমস্ত দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও 'বিপ্রদাস' উপন্যাসটি উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি-কৌশলের নিদর্শন, এবং ইহা শবৎচন্দ্রেব প্রতিভাব পূর্ব-গৌবব প্রায অক্ষুণ্ণ বাখিয়াছে।

'শেষেব পবিচয' শবৎচন্দ্রেব অন্তিম অসম্পূর্ণ রচনা—শবৎচন্দ্রের মৃত্যুব পব শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী ইহাকে সম্পূর্ণ করিযাছেন। শবৎচন্দ্রেব ভাষা, ভাব ও আখ্যাযিকাব পরিণতিব ইঙ্গিতগুলি বাধাবাণী দেবী এমন নিপুণতাব সহিত অনুসবণ কবিযাছেন যে, উভযের বচনার মধ্যে ভেদ-রেখা লক্ষ্যগোচব হয না। উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রেব প্রিয় ও বহুধা পুনবাবৃত্ত বিষযের আলোচনা—চবিত্রস্খলনের পর নারীর সহজ মহিমা ও অন্তবের সুকুমাব বৃত্তিসমূহ যে অক্ষুণ্ণ থাকে ও নিবিড বেদনার পুটপাকে আরও নিগূঢ করুণবস ও-মাধুর্যপূর্ণ হইয়া উঠে তাহাই তাঁহাব প্রতিপাদ্য বিষয়। ধনী গৃহের গৃহিণী, ও উদার, ধর্মপরায়ণ, স্নেহশীল স্বামীব পত্নী সবিতা কোন অনির্দেশ্য কাবণে কুলত্যাগিনী হইযাছেন। যে পরপুরুষের আকর্ষণে তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত কক্ষচ্যুতি ঘটিয়াছে, সেই রমণীবাবুব মধ্যে কোন আকর্ষণীয গুণের সন্ধান মিলে না। রুক্ষ, পরুষ-প্রকৃতি, স্থূল ভোগ-লালসায় ইতর এই লোকটি কি যাদুমন্ত্র-প্রভাবে সবিতাব মত মহীয়সী রমণীব প্রণয়-ভাজন হইল তাহা শেষ পর্যন্ত রহস্যাবৃতই থাকিয়া যায়। সবিতা অনেকবাব তাঁহার আদর্শ-চ্যুতির কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া শেষ পর্যন্ত অদৃষ্টেব উপবই দায়িত্ব আবোপ করিয়াছেন। গ্রন্থের ৩০০ পৃষ্ঠায লেখক ব্রজবাবুর সহিত তাঁহার যৌবন-কাঙ্ক্ষিত উচ্ছ্বসিত প্রণয-মিলনেব অপূর্তিাব কথা উল্লেখ কবিয়া একটা কাবণ দিবার চেষ্টা করিযাছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবিতার আচবণকে একটা আকস্মিক বিপ্লবের পর্যায়ভুক্ত করিযা নিজ বিশ্লেষণ-প্রয়াস অর্ধ-সম্পূর্ণ রাখিয়াছেন। পদস্খলনেব পর সবিতার চরিত্রে মহিমার আরোপ যেন সীতাবর্জনেব পর রামের চরিত্র-মাহাত্ম্যজ্ঞাপন। এ যেন নাটকীয় climax বা চবম সংঘাতের মুহূর্তের পর নাট্যারম্ভ। যে দুর্বার শক্তি সবিতাকে গৃহকর্ত্রীর সম্ভ্রম, স্বামী ও সন্তানের স্নেহবন্ধন ও যুগযুগান্তব্যাপী, অস্থি-মজ্জাগত ধর্ম-সংস্কারেব সুদৃঢ় বেষ্টনী হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছে তাহাই তাহার অন্তর-

লোকের প্রধান পরিচয়। তাহার মধ্যেই তাহার ব্যক্তিত্ব-রহস্য নিহিত আছে। ইহাকে একটা দুর্বোধ্য খেয়াল বলিয়া উড়াইয়া দিলে ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট চরিত্রদের সম্বন্ধে তাঁহার সর্বজ্ঞতার যে প্রত্যাশা আমরা করি তাহা ক্ষুণ্ণ হয়। লেখকের বিরুদ্ধে পাঠকের অনুযোগের একটা প্রধান কারণ এই যে, সবিতার চরিত্র-রহস্য-উন্মোচনে তিনি তাহাদের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করেন নাই।

এই প্রাথমিক ত্রুটি ছাড়িয়া দিলে ইহা স্বীকার করা যায় যে, লেখক সবিতার চরিত্রে যে মহনীয়তা ও অন্তঃরুদ্ধ বেদনার ও আত্মগ্লানির অবিরাম জ্বালা দেখাইতে চাহিয়াছেন তাহাতে তিনি উদ্দেশ্যানুরূপ সফলতা লাভ করিয়াছেন। সবিতার প্রণয়োন্মেষের যে কাহিনী আমাদের সম্মুখে অভিনীত হইয়াছে তাহার বিষয়, বিমলবাবুর সহিত তাঁহার নূতন অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ গড়িয়া ওঠা। ইহাই তাঁহার শেষের পরিচয় এবং ইহার অনুসারেই উপন্যাসের নামকরণ হইয়াছে। ব্রজবাবুর সংসারে সর্বময়ী কর্ত্রী, স্বামীর শুভানুধ্যায়িনী, যাঁহার দাম্পত্য-সম্পর্ক নিছক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কল্যাণ-কামনার উপর প্রতিষ্ঠিত ও সম্পূর্ণরূপে প্রেমের বৈদ্যুতী-আকর্ষণ-বর্জিত—ইহাই তাঁহার প্রথম পরিচয়। রমণীবাবুর ইতর, ভোগলিপ্সা-কলঙ্কিত সাহচর্যের মধ্যে নিজ কৃতকর্মের চরম তিক্ততা আস্বাদনের দৃঢ় সংকল্প এবং সমস্ত অনুশোচনা, সূক্ষ্ম মানস অতৃপ্তি ও প্রতিবাদের আত্মসংবৃতি সবিতার চরিত্রের বিশেষ অভিব্যক্তি। এই দ্বাদশবর্ষব্যাপী আত্ম-বিলোপের মধ্যেই তাঁহার দ্বিতীয় পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। প্রৌঢ় জীবনে বঞ্চিত হৃদয়াবেগ, কন্যা ও স্বামীর দ্বারা প্রতিহত হইয়া, বিমলবাবুর সহজ ভদ্রতা, সুরুচি-সংযম ও অকৃত্রিম হিতৈষণার চারিদিকে নূতন মধুচক্র রচনা করিয়াছে এবং ইহার মধ্যেই তাঁহার শেষ ও সত্য পরিচয়ের স্বাক্ষর মুদ্রিত হইয়াছে। এই দেহলালসাহীন, সূক্ষ্ম ভাববিনিময়ের তন্তুজালরচিত অভিনব সম্পর্কের মধ্যে অতিক্রান্ত-যৌবন, অপগত-মোহ, দুঃখ-বেদনার অভিঘাতে বিচিত্র-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, নর-নারীর এক নূতন মিলনের আদর্শ মূর্ত হইয়াছে। এই সম্বন্ধ অনেকটা দ্রুতগতিতে সহজ শিষ্টাচার হইতে নিঃস্বার্থ কল্যাণ-কামনার ভিতর দিয়া প্রেমের অন্তরঙ্গতার স্তরে পৌঁছিয়াছে! সবিতার দিক্ দিয়া ইহা যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত, নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ের অনুসন্ধান ; বিমলবাবুর দিক্ দিয়া তাঁহার রমণী-প্রভাবশূন্য শুষ্ক অন্তরে দুঃখ-মথিত নারী-হৃদয়ের স্নিগ্ধ অমৃত-নির্যাস-নিষেকের জন্য ব্যগ্রতা।

এই সম্বন্ধের অঙ্কুরোদ্গম হইতে পরিপক্কতা পর্যন্ত ক্রমবিকাশের সমস্ত স্তরগুলি আলোচনা করিলে মনের মধ্যে ইহার অনিবার্যতা সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ জাগে। এই উপলক্ষে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট ভাব-বিনিময়, প্রীতি-শ্রদ্ধার আদান-প্রদান ও আদর্শবাদ-মণ্ডিত হৃদয়াবেগের নিবেদন হইয়াছে ; কিন্তু এই সমস্তের মধ্য দিয়া প্রেমের বিদ্যুৎশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সাবিত্রী ও রাজলক্ষ্মীর ক্ষেত্রে আমরা নানা ঘাত-প্রতিঘাত, বহুবিধ আকর্ষণের-বিকর্ষণের মন্থনের ভিতর দিয়া, চাপিয়া-রাখা প্রেমের উত্তাপ ও দাহ, ইহার আনন্দ-বেদনা-মিশ্র, লাঞ্ছনা-গৌরব-জড়িত মনোভাবের প্রত্যক্ষ স্পর্শ অনুভব করি। কমললতা ও সবিতার ক্ষেত্রে কিন্তু প্রেমের আবির্ভাবকে অনেকটা সুলভ ভাবাতিশয্যের অতি-আর্দ্র জলাভূমি হইতে অনায়াস-ক্ষরিত বলিয়া ঠেকে। ইহারা যেন অতি সহজেই প্রেমের মাধ্যাকর্ষণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে—সাঁধনা ব্যতিরেকেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। আমাদের সামাজিক আবেষ্টন, ধর্মসংস্কার ও মানস বৈশিষ্ট্যের বিষয় বিবেচনা করিলে প্রেমের এই অতর্কিত পরিণতিকে ঠিক স্বাভাবিক মনে হয়

না। রাখাল ও সারদার সম্পর্কের মধ্যে প্রেমের নির্মম নিষ্পেষণ, মর্মগ্রন্থিচ্ছেদী তীক্ষ্ণতা অনুভূত হয়—যদিও পুনরাবৃত্তির জন্য এই প্রকার চিত্রণের অভিনবত্ব অনেকটা ম্লান হইয়াছে। ইহার সহিত সবিতা-বিমলবাবুর শান্ত, উচ্ছ্বাসহীন, নিরুত্তাপ সম্বন্ধের যথেষ্ট পার্থক্য। হয়ত বা এই শেষোক্ত সম্পর্ক প্রেমই নহে, ইহা প্রেমের ছদ্মবেশী সহৃদয় বন্ধুতা মাত্র। প্রৌঢ় জীবনের প্রেমে রক্তিমাভা অনেকটা ধূসরায়িত হইয়াই থাকে। এই সম্বন্ধের পরিণতি হইয়াছে মিলনে নহে, সম্ভাবিত মিলনের প্রতীক্ষায়। সে যাহা হউক, সবিতার এই নূতন প্রেমিক-বরণের ব্যাপারে আমরা রাখালের মতো কতকটা অনাস্থাশীলই থাকিয়া যাই। প্রণয়িনী অপেক্ষা জননীরূপেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

রাখাল ও তারকের বন্ধুত্বের ঈর্ষাপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্যবসান লেখকের প্রথম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল কি না ঠিক বলা যায় না। অন্ততঃ গ্রন্থারম্ভে, যখন দুই বন্ধুর সৌহার্দ ও সমপ্রাণতার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তখন এরূপ পরিণতির কোন ইঙ্গিতের—তারকের চরিত্রে স্বার্থের জন্য বড়মানুষের আনুগত্য ও আত্মসম্মানজ্ঞানহীন উচ্চাভিলাষের কোন গোপন বীজের চিহ্ন চোখে পড়ে না। মনে হয় যেন শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী বন্ধুত্বের সরল-প্রবাহিত ধারাটির এই নূতন দিকে মোড় ফিরাইয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে এই পরিবর্তনটি কলাকৌশল ও মনস্তত্ত্বজ্ঞানের দিক্ দিয়া বেশ সমীচীনই হইয়াছে। ঈর্ষার বেগবান্ জীবনীশক্তিতে রাখাল ও তারক উভয়েই প্রাণধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ, ইহাতে রাখালের চরিত্রগৌরব বাড়িয়াছে ও সারদার প্রতি তাহার মনোভাব কল্পিত বাধার প্রেরণায়, মান-অভিমানের লীলায় স্ফুটতর ও গভীরতর হইয়াছে।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে ব্রজবাবু, রেণু ও সারদা উল্লেখযোগ্য। সারদার বিশেষ বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই—সে কেমন করিয়া জানি না সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, প্রভৃতির মত কলঙ্কিত ইতিহাসের বহিরাবরণের মধ্যে প্রেমের অম্লান সুরভি ও দীপ্ত মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। নারী চরিত্রের যে রহস্য শরৎচন্দ্রের দ্বারা বার বার উদাহৃত হইয়াছে, সারদা তাহারই শেষ অনুবৃত্তি। ব্রজবাবু আত্মভোলা ধর্মবিহ্বলতার পরিমণ্ডল হইতে নিজ ব্যক্তিত্বকে ঠিক উদ্ধার করিতে পারেন নাই—অপরাধিনী স্ত্রীর প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও অনুযোগহীন ক্ষমার সহিত তাহার পুনর্গ্রহণ বিষয়ে অনমনীয় মনোভাবের সামঞ্জস্যের উৎসটি অনাবিষ্কৃতই থাকিয়া যায়। মনে হয় যেন স্ত্রীর সহিত চিরবিচ্ছেদের সংকল্প তাঁহার নিজের নয়, তাঁহার কন্যার বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি হইতে সংক্রামিত। রেণুর মৃত্যুর পর ব্রজবাবু পত্নীকে সেবা-শুশ্রূষার অধিকার সম্পর্কে কোন বাধা দেন নাই। কাজেই তাঁহার অনিচ্ছাকে কোন অলঙ্ঘনীয় আদর্শের অনুশাসনরূপে গ্রহণ করা যায় না। রেণুর শান্ত, নিরুচ্ছ্বাস মিতভাষিতার পিছনে যে প্রত্যাখ্যান ও প্রতিরোধশক্তি পুঞ্জীভূত হইয়াছে তাহা চেতনাহীন জড়শক্তির বিরোধিতার ন্যায়ই অক্ষয় ও পরিবর্তনহীন। তাহার অভিমান-পুষ্ট, অবিচারের বেদনায় মোহগ্রস্ত বিবেক ও নীতিবোধ তাহার অন্তরে যে পাষাণ-প্রাচীর তুলিয়াছে, তাহার ক্ষুদ্রতম ফাটল দিয়াও মাতৃস্নেহের একবিন্দু শীকরকণা, পূর্বস্মৃতির এক ঝলক উড়ো হাওয়াও প্রবেশাধিকার পায় নাই। মোটের উপর শরৎচন্দ্রের এই শেষ উপন্যাসটিতে তাঁহার পূর্বতন শক্তির আংশিক পুনরুদ্ধার লক্ষিত হয়, এবং যদিও সম্পূর্ণ উপন্যাসটির কৃতিত্ব তাঁহার একা প্রাপ্য নহে, তথাপি ইহার পরিকল্পনা ও আলোচনাভঙ্গীর

চমৎকারিত্ব, ঘটনা-বিন্যাস ও হৃদয়বিশ্লেষণের উৎকর্ষ ইহাকে শরৎচন্দ্রের অন্তিম রচনার উপযুক্ত গৌরব ও মর্যাদা অর্পণ করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের শেষ অবদান যে তাঁহার প্রতিভার মধ্যাহ্ন-দীপ্তির রশ্মিজালমণ্ডিত—এই সিদ্ধান্ত শরৎ-সাহিত্যের নিকট বিদায় গ্রহণের প্রাক্কালে আমাদের মনে পুলকিত বিস্ময়ের সঞ্চার করে।

বঙ্গ-উপন্যাস-ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র যে কতটা স্থান অধিকার করিয়া আছেন, কিরূপ বিরাট্ শূন্যতা পূর্ণ করিয়াছেন তাহার সম্যক্ পরিচয় দেওয়া সহজ নহে। বঙ্কিম উপন্যাসের জন্য যে নূতন পথ প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সেই পথ অবরুদ্ধপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। ঐতিহাসিক উপন্যাস ত একেবারেই লোপ পাইয়াছিল, সামাজিক উপন্যাসও তাহার গৌরব ও অর্থ-গভীরতা হারাইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এই অবরুদ্ধ পথ কতকটা মুক্ত করিলেন বটে, কিন্তু এই বাধা অতিক্রম করিতে তিনি যে নূতন প্রণালী অবলম্বন করিলেন তাহা যেমনই বিস্ময়কর তেমনই অননুকরণীয়। তাঁহার কবি-কল্পনার মুক্ত পক্ষ আশ্রয় করিয়াই তিনি উপন্যাসের পথের এই পাষাণ-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলেন। যে কবিত্বশক্তি সামান্যের মধ্যে অসামান্যের সন্ধান পায়, প্রকৃতির মধ্যে মানবমনের উপর নিগূঢ় প্রভাবের রহস্য খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহার দ্বারাই তিনি উপন্যাসের বিষয়গত অকিঞ্চিৎকরত্ব অতিক্রম ও রূপান্তরিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রবর্তিত পথে তাঁহার পরবর্তীদের পদচিহ্ন নিতান্তই বিরল; তাঁহার কবি-প্রতিভা না থাকিলে তাঁহার অনুসরণ অসম্ভব। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের উপর তাঁহার প্রতিভার ছাপ মারিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার পরিধি ও প্রসার বিশেষ বৃদ্ধি করেন নাই। এই অবসরে শরৎচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া বাঙ্গালা উপন্যাসের সমৃদ্ধির নূতন পথ নির্দেশ করিয়াছেন।। তিনি কবিত্বশক্তির অধিকারী না হইয়াও কেবলমাত্র সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি, চিন্তাশীলতা ও করুণরসসৃজনে সিদ্ধহস্ততার গুণে বঙ্গ-সমাজের কঠিন, অনুর্বর মৃত্তিকা হইতে নূতন রসের উৎস বাহির করিয়াছেন ও উপন্যাসের ভবিষ্যৎ গতির পথরেখা বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করিয়াছেন।। তিনি আমাদের পারিবারিক জীবনে অকিঞ্চিৎকর বাহ্য ঘটনার মধ্যে গূঢ় ভাবের লীলা দেখাইয়াছেন; আমাদের নারী-চরিত্রের জড়তা ও নির্জীবতা ঘুচাইয়া তাহার দৃপ্ত তেজস্বিতা ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি আমাদের সমাজব্যবস্থার বৈষম্য ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়া একসঙ্গে স্বাধীন চিন্তা ও করুণ রসের উৎস খুলিয়া দিয়াছেন, এই আত্মপীড়ননিরত জাতির ভগবদ্দত্ত দুঃখ যে নিজ মূঢ়তায় কত বাড়িয়াছে তাহা দেখাইয়াছেন। সর্বশেষে তিনি প্রেম-বিশ্লেষণের দ্বারা প্রেমের রহস্যময় গতি ও প্রকৃতির উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। সৃষ্টিশক্তির এই অদ্ভুত পরিচয়-দানের পর তাঁহার প্রতিভাতে ক্লান্তির লক্ষণ দেখা দিয়াছে; এবং উপন্যাস-সাহিত্যের আকাশে আবার অনিশ্চয়তার আঁধার ঘনাইয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, এ অনিশ্চয়তার কুহেলিকা যখন কাটিয়া যাইবে ও অগ্রগতির প্রেরণা যখন আবার গতিবেগ আহরণ করিবে তখন ইহা শরৎচন্দ্রের নির্দিষ্ট পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইয়া যাইবে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে,শরৎচন্দ্রই আমাদের ভবিষ্যৎ উপন্যাসের গতিনিয়ামক হইবেন।

দশম অধ্যায়

স্ত্রী-ঔপন্যাসিক

(১)

বাঙ্গালা উপন্যাস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা মহিলা-ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব। উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য বিষয়—প্রেম, নর-নারীর পরস্পরের প্রতি নিগূঢ় আকর্ষণ-রহস্য, ইহারই অফুরন্ত বিচিত্রতা উপন্যাসের পৃষ্ঠায় পল্লবিত হইয়াছে। এই প্রেম-চিত্রণের ভার যদি সম্পূর্ণরূপে পুরুষেরই একচেটিয়া হয়, তাহা হইলে ইহা যে খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ ও একদেশদর্শী হইবে ইহা অনুমান করা কঠিন নয়। সাধারণতঃ পুরুষ-ঔপন্যাসিকের চিত্রে আমরা প্রেমের যে বিবৃতি পাই, তাহাতে পুরুষেরই অবিসংবাদিত প্রাধান্য, স্ত্রী-চরিত্র গৌণ অংশ অধিকার করিয়া থাকে। এই হৃদয়াভিযানের কাহিনীতে প্রথম পাদক্ষেপ পুরুষের দিক্ হইতেই আসিয়া থাকে; নারী নিজ স্থানে নিশ্চল হইয়া রুদ্ধনিঃশ্বাসে এই যাত্রার ফল প্রতীক্ষা কবে। পুরুষেব মনোভাব-বিশ্লেষণেই লেখকেব প্রধান প্রচেষ্টা, নারীচিত্ত-বিশ্লেষণের চেষ্টা যেখানে হইয়া থাকে, সেখানেও মূলতঃ পুরুষের আকর্ষণের প্রতিক্রিয়ারূপেই ইহার আলোচনা।

অবশ্য মনস্তত্ত্ব ও সমাজ-প্রথার দিক্ দিয়াও বঙ্গ-সাহিত্যে এই পুরুষ-প্রাধান্যই স্বাভাবিক ও অতি অল্পদিন পূর্বেও অপরিহায ছিল। একেত আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে প্রণয়ের অবসর খুব সংকীর্ণ, তার উপর যে সব স্থলে কোন অলক্ষিত রন্ধ্রপথ দিয়া প্রেম জীবনের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সেখানেও নাবীব কোন বিশেষ দাবী বা অধিকারেব মর্যাদা স্বীকৃত হয় নাই। সে পুরুষেব প্রেমনিবেদন হয় গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহার মধ্যে কোন সুরের বৈশিষ্ট্য, কোন প্রকাব-ভেদ আনে নাই। প্রেমে যে পুরুষ ও নারী উভয়েরই পূর্ণ সহযোগিতাব প্রয়োজন, এই তথ্য আমাদের ঔপন্যাসিকেরা সত্য-হিসাবে স্বীকার করিলেও কার্যক্ষেত্রে অবলম্বন করেন নাই।

আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যেব কথা দূরে থাকুক, ইউরোপীয় উপন্যাস-সাহিত্যেও প্রথম যুগে নারীর বাণী মূক ও নীরব ছিল—পুরুষের ইচ্ছার অনুবতন বা প্রতিরোধই তাহার একমাত্র কাযছিল। Jane Austen ও Bronte ভগিনীরাই প্রথম উপন্যাসের মধ্যে নারীত্বের সুরের প্রবর্তন করেন। সমস্ত জগৎ-ব্যাপারটা নারীর চক্ষে কিরূপ ঠেকে, নারীত্বের রঙিন চশমার মধ্য দিয়া কিরূপ বিচিত্র বর্ণে অনুরঞ্জিত হয়, পুরুষের সগর্ব প্রাধান্যাধিকার নারীর বিদ্রূপমণ্ডিত সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়া কিরূপ বিসদৃশ ও হাস্যজনক দেখায়, Jane Austenএর উপন্যাসে ইংরেজ পাঠক তাহার প্রথম পরিচয় পান। আবার অন্য দিক্ দিয়া নারীর চরিত্র স্ত্রী-ঔপন্যাসিকের হাতে বিশেষভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে। পুরুষের আবেশময় দৃষ্টির মধ্য দিয়া নারীর দৈহিক সৌন্দর্য ও অন্তর-সুষমা প্রায় আদর্শ-লোকের মহিমামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে; নারীর স্বজাতি-সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও কঠোর সত্যপ্রিয়তা এই আদর্শ জ্যোতিকে

অনেকটা ম্লান করিয়া উপন্যাসের নায়িকাকে বাস্তবতার মৃত্তিকা স্পর্শ করাইয়াছে। স্ত্রী-ঔপন্যাসিকের বর্ণিত নারী-চরিত্রে দেহ-সৌন্দর্যের আধিক্য বা স্তব-স্তুতির অতিরঞ্জনের সুর নাই; আছে গভীর বিশ্লেষণ ও আত্মজিজ্ঞাসা ও নিজ অধিকার সম্বন্ধে একটা ক্ষুব্ধ, ধূমায়িত বিদ্রোহোন্মুখতা। এই বিদ্রোহের সুর, সমাজ-ব্যবস্থায় স্ত্রী-পুরুষের অধিকার-বৈষম্যের বিরুদ্ধে অনুযোগের তীব্রতা ইংরেজী উপন্যাসে সর্বপ্রথম Bronte ভগিনীদের উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁহাদের নায়িকারা প্রায়ই সৌন্দর্যহীন, সাধারণ অবস্থার স্ত্রীলোক, শিক্ষয়িত্রী বা সহচরী ইত্যাদিরূপ বৃত্তির দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে। ব্যবহারে তাহারা সংকুচিতা, লজ্জাশীলা, ও স্বল্পভাষিণী; কিন্তু এই বাহ্য শান্ত-সংযত ভাবের অন্তরালে তীব্র অন্তর্বিদ্রোহের অগ্নি সর্বদাই প্রধূমিত। একটা গূঢ় অভিমান ও প্রচ্ছন্ন আত্মমর্যাদাবোধ সর্বদাই তাহাদের অনুভূতিকে, তাহাদের কথাবার্তা ও ব্যবহারকে অসাধারণরূপে তীক্ষ্ণ ও বিদ্রোহ-কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছে। ভালবাসা পাইবার যে সনাতন, রাজকীয় অধিকার নারী-জাতির আছে, সেই অধিকার-বোধ তাহাদের হৃদয়ে অনুক্ষণ প্রবলভাবে জাগ্রত। এই দুর্দমনীয় ইচ্ছা তাহাদের প্রতিমুহূর্তের রক্ত-সঞ্চরণের, তাহাদের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার গতিবেগ বর্ধিত করিতেছে, এই প্রেমাকাঙ্ক্ষার অকুণ্ঠিত, লজ্জা-সংকোচহীন অভিব্যক্তিই তাহাদের ভাষাতে তীব্র আবেগ ও উদ্দীপনা আনিয়া দিয়াছে। নারী-চরিত্রের এই একটা অপ্রকাশিত দিক্ Bronte ভগিনীদের উপন্যাসে উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

জর্জ এলিয়টের উপন্যাসে রমণীসুলভ আর একটা বিশেষ সুর ধ্বনিত হইয়াছে। তাহার শেষ বয়সের উপন্যাসগুলি পুরুষোচিত পাণ্ডিত্যাভিমান ও বিশ্লেষণাধিক্যের দ্বারা ভারগ্রস্ত ও অভিভূত হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রথম দিকের উপন্যাসগুলিতে আমরা নারী-হস্তের লঘু কোমল স্পর্শ, শিশুর চিত্রাঙ্কনে মাতৃ-হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত স্নেহ সুস্পষ্টভাবে অনুভব করি। তাহার প্রথম-প্রকাশিত উপন্যাসগুলিতে লেখকের নাম-পরিচয় ছিল না, সুতরাং তাহাদের আবির্ভাব-কালে সমালোচক-মহলে অনুমান-শক্তির বেশ একটা পরীক্ষা চলিযাছিল। অনেকেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের বাহ্যাডম্বরে ভুলিয়া তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছিল, কেবল ডিকেন্স প্রভৃতি দুই-একজন সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক তাহার আসল স্বরূপটিকে ধরিতে পারিয়াছিলেন। জর্জ এলিয়টের ব্যক্তিত্ব লইয়া জল্পনা কল্পনা এবং দুই একজন পাঠকের অনুমানের সত্যতা অন্ততঃ ইহাই প্রমাণ করে যে, নারীর রচনায় একটা বিশিষ্ট সুর আছে, ও উপন্যাসে নারীর অবদান কেবল পুরুষের প্রতিধ্বনিমাত্র নহে।

অবশ্য ইহাও সত্য যে, সাহিত্যিক উৎকর্ষের মানদণ্ড স্ত্রী-পুরুষ-নিরপেক্ষ-ভাবে নির্ধারিত হইয়াছে—পুরুষ ও নারীর রচিত সাহিত্য-বিচারের কোন বিভিন্ন আদর্শ নাই। চরিত্র-বিশ্লেষণ ও জীবন-সমস্যার গভীরতা-প্রতিপাদন সমস্ত উৎকৃষ্ট উপন্যাসেরই সাধারণ ধর্ম। আধুনিক ইউ-রোপীয় সাহিত্যে যে উপন্যাস রচিত হইতেছে তাহাতে স্ত্রী-পুরুষের সুর-বৈশিষ্ট্য প্রায় লুপ্ত হইয়াছে বলিলেও চলে। ইহার মুখ্য কারণ সম্ভবতঃ ইহাই যে, সাধারণ প্রতিযোগিতা ও সহকর্মিতার ফলে উভয়ের প্রকৃতি ও চরিত্র-গত স্বাতন্ত্র্য অনেকটা তিরোহিত হইয়াছে—নারীর মনে উপেক্ষা ও অবহেলার জন্য যে গূঢ় অভিমান ও অনুযোগ ছিল, তাহার তীব্রতা এখন অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। ইউরোপীয় সমাজে নারী প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের সহিত তুল্যা-ধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে—পুরুষের একাধিপত্যের দুর্গে সে তাহার বিজয়-নিশান উড়াইয়াছে।

হীনতা ও অপকর্ষের গ্লানি আর তাহার দেহ-মনে লাগিয়া নাই ; সুতরাং পূর্বে তাহার রচনায় ও ব্যবহারে যে একটা বিদ্রোহোন্মুখ অভিযোগের সুর লাগিয়া থাকিত, এখন তাহা ঘুচিয়া গিয়া তাহার পরিবর্তে সমকক্ষতার প্রসন্ন গাম্ভীর্য অধিষ্ঠিত হইয়াছে। নারীর এখন আর জাতিগত বিশেষ সমস্যা, বিশেষ দাবী-অভিযোগও নাই—এখন পুরুষের যে সমস্যা, নারীরও প্রায় তাহাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন ব্যবহারে, ভাব-প্রকাশে, প্রণয়নিবেদনে, এক কথায় হৃদয়ঘটিত সমস্ত ব্যাপারেই তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। দ্বার-মোচনের সঙ্গে সঙ্গেই রুদ্ধ-দ্বারে করাঘাতের যে প্রবল প্রচেষ্টা তাহার সাহিত্যে একটা অশান্ত প্রতিধ্বনি জাগাইয়াছিল, তাহা নীরবতায় বিলীন হইয়াছে। সুতরাং এই অবস্থা ও প্রতিবেশ-পরিবর্তনের সঙ্গে নারী-সাহিত্যে একটা গভীর ভাব-গত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে ও নারীত্বের বিশেষ সুর ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।

বঙ্গ-সাহিত্যে মহিলা-রচিত উপন্যাসের বিচার করিতে এই দুইটি মূলসূত্র প্রয়োগ করিতে হইবে।—প্রথমতঃ, তাহাদের সাহিত্যিক উৎকর্ষ কতখানি ও দ্বিতীয়তঃ, তাহাদের মধ্যে নারীর সুর-বৈশিষ্ট্যের কতখানি পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য বাঙ্গালা উপন্যাসে নারী-বৈশিষ্ট্য ঠিক ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত অভিন্ন নহে। সামাজিক রীতিনীতি ও অবস্থা-বৈষম্যের জন্য উভয়ক্ষেত্রে সুরেরও পার্থক্য হইবে। যে তীব্র, ক্ষুব্ধ বিদ্রোহ ইউরোপীয় সাহিত্যে একটা তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত মৃদু অভিযোগের আকারে বঙ্গ-উপন্যাসে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। বাঙ্গালার নারী এ পর্যন্ত পুরুষের সহিত সমকক্ষতার ও তুল্য প্রতি-যোগিতার কোন ব্যাপক দাবী উপস্থিত করে নাই, কেবল কতকগুলি অন্যায় অত্যাচার ও বৈষম্যের হাত হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা পাইয়াছে। আমাদের বিবাহ-প্রথার অন্তর্নিহিত নির্লজ্জ বণিকবৃত্তি, জীবন-সংগ্রামে অভিভাবকহীন নারীর শোচনীয় অসহায় অবস্থা, পুরুষের হৃদয়হীন স্বেচ্ছাচারিতার নির্মম অবিচার নারীর আত্মমর্যাদায় প্রবলভাবে ধাক্কা দিয়া তাহাকে যুগযুগান্তরের নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্য ও নিশ্চল জড়তা হইতে জাগাইয়াছে ; তবে তাহার অভি-যোগের মধ্যে বিদ্রোহ অপেক্ষা করুণ রসেরই প্রাধান্য। অবশ্য সত্যের খাতিরে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই আন্দোলনে পুরুষই অগ্রণী ও পথ-প্রদর্শক হইয়া নারীর গূঢ় অনুযোগকে সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে আকর্ষণ করিয়াছে, এবং শুধু করুণরসের দিক্ দিয়াও কোন স্ত্রী-লেখক শরৎচন্দ্রের মর্মস্পর্শী চিত্রণের সমকক্ষতা করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। এই সমস্ত ব্যাপারে পুরুষ নারীর জন্য যতটা সমবেদনা অনুভব করে ও যেরূপ তীব্র আবেগের সহিত তাহার পক্ষসমর্থন করে, নারীও বোধ হয় ততটা পারে না। সুতরাং এই বিষয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনও লক্ষণীয় প্রভেদ আবিষ্কার করা দুরূহ।

এই প্রসঙ্গে আর একটা বিষয়ও অনুধাবন করা উচিত। স্ত্রী-জাতির নিজস্ব বাণী ও জীবন-বিশ্লেষণের দাবী করিবার পূর্বে আমাদের ভাবা উচিত যে, আমাদের বাঙ্গালাদেশের বিশিষ্ট জীবন-যাত্রার মধ্যে নারীর কোন নূতন আলোকপাত করিবার সুযোগ ও সুবিধা আছে কি না। পুরুষের বিরুদ্ধে নারীর অভিযোগ অনেকটা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের, ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের, প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের অসহায় আক্ষেপ ; কিন্তু ইহার মধ্যে কোন নূতন মত-গঠনের ইঙ্গিত, কোন নূতন সামঞ্জস্যের অঙ্কুর পাওয়া যায় না। সুতরাং এই অভিযোগই নারীর

বিশিষ্ট বাণী, ইহা বলিলে বিশেষত্বের কোন মূল্য থাকে না। সাধারণতঃ পুরুষের দৃষ্টি হইতে জীবনযাত্রার যে অংশ অপসারিত থাকে, স্ত্রীলোক যদি সেই অপ্রকাশিত অংশের উপর আলোকপাত করিতে পারিত, তাহাকে নূতন অর্থ-গৌরব ও রস-সমৃদ্ধিতে ভরিয়া তুলিতে পারিত, সমাজ-জীবনের বর্তমান শ্রেণীবিভাগ ও দায়িত্ব বণ্টনকে নব-বিন্যস্ত সামঞ্জস্যের মধ্যে বিধি-বদ্ধ করিতে পারিত, তবে নারীর সমালোচনা-বৈশিষ্ট্যের একটা অর্থ পাওয়া যাইত। কিন্তু এখন আমরা যাহাকে নারীর বাণী বলি, তাহা মুখ্যতঃ বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই তাহার ন্যায়-সঙ্গত অধিকারের দাবী, এই সমাজ-ব্যবস্থার কোন মূলগত পরিবর্তন নহে। বিশেষতঃ, আমাদের সমাজে নারী এত দীর্ঘকাল ধরিয়া পুরুষের কর্তৃত্বাধীনে বাস করিতেছে, তাহার হৃদয়ের যে গভীর-গোপন স্তরে নব নব আশা-আকাঙ্ক্ষা মুকুলিত হইবার কথা তাহা পুরুষ-রচিত কৃত্রিম বিধি-ব্যবস্থার চাপে এরূপ পিষ্ট, দলিত হইয়াছে যে, তাহার নব-অঙ্কুরোদ্গমের সম্ভাবনা মাত্র তিরোহিত হইয়াছে। সে নিজেকে সমাজ যন্ত্রের একটা অঙ্গমাত্র বিবেচনা করিয়াছে; তাহার পৃথক্ সত্তা পুরুষের ব্যবস্থাপিত আদর্শ ও কর্তব্য-পালনে বিলীন হইয়াছে। অতি আধুনিক যুগে পাশ্চাত্ত্য সমাজের অনুকরণে ভারতীয় নারী সাহিত্যের দরবারে যে নূতন দাবী পেশ করিতেছে, তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা ও অতিরঞ্জনের সুর অত্যন্ত সুস্পষ্ট; তাহা তাহার সনাতন জীবন-ধারার স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া ভ্রম করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। পরের ধার করা কথায় নিজ হৃদয়-ভাব কতটুকু প্রকাশিত হইতেছে এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর আছে। অবশ্য কিছুদিন হইতে আমাদের সামাজিক গঠন-রহস্য ও আদর্শ লইয়া নানারূপ পরীক্ষা চলিতেছে, সমাজচ্ছন্দটিকে নূতন তালে, নব গতি-ভঙ্গীতে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে; সমাজ-স্থিতির ভার-কেন্দ্রকে স্থানান্তরিত করিবার আয়োজন হইতেছে। একান্নবর্তী পরিবারের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে নারী বিস্তৃততর মুক্তির আস্বাদন, তাহার সংকুচিত ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণের নূতন অবসর পাইযাছে। আবার পুরুষের অর্থ নৈতিক দাসত্ব হইতে অব্যাহতি-লাভের বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে সফলতা লাভ করিলে যে অবস্থান্তর সংঘটিত হইবে, তাহাতে সাহিত্যক্ষেত্রে নারীর আত্ম-প্রকাশের সুর গভীরভাবে রূপান্তরিত হইবে তাহা অনুমান করা চলে। যে পযন্ত এই প্রত্যাশিত পরিবর্তন সংঘটিত না হয়, সেই পযন্ত নারীর সুর হয় বিদ্রোহাত্মক না হয় পুরুষের প্রতিধ্বনি-মূলক হইবে।

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে আমরা আর একদিক্ দিয়া নারীর অবদানে বৈশিষ্ট্য আশা করিতে পারি। সাধারণতঃ পুরুষ-ঔপন্যাসিকের পক্ষে নিঃসম্পর্কীয় নারীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ নিতান্ত অল্প, আমাদের সমাজ-প্রথা শুধু যে নারীর মুখের উপরই অবগুণ্ঠন টানিয়া দেয় তাহা নহে, তাহার মনের উপরও ঘনতর অবগুণ্ঠনের অন্তরাল রচনা করে। আমাদের নিজ পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদেরও ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান কতই সামান্য। সুতরাং পুরুষ-ঔপন্যাসিক নারী-চিত্র-অঙ্কনের সময় একটা সাধারণ অভিজ্ঞতা ও প্রতিভা-দত্ত সহজজ্ঞানের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া থাকেন। এই ক্ষেত্রে মহিলা-ঔপন্যাসিকের সুযোগ ও অবসর অনেক অধিক। তাঁহার নিকট নারীর অপরিচয়ের অবগুণ্ঠন স্বতঃই খসিয়া পড়ে; সুতরাং পরিবার-যন্ত্রের নিগূঢ় প্রাণ-স্পন্দন যে তাঁহার নিকট আরও সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়িবে তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। প্রতিভার দিক্ দিয়া

সমান হইলে, সুযোগের দিক্‌ দিয়া নারীর চিত্রাঙ্কনই সাহিত্যিক উৎকর্ষের দাবী করিতে পারিবে। আবার স্নেহ-প্রেম-ভালবাসার চিত্রগুলিও নারী-হৃদয়ের বিশেষ মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া আরও কোমল ও মর্মস্পর্শী হইবে—এরূপ আশা করা অন্যায নহে। নারীর যে বিশেষত্ব তাহার কণ্ঠস্বরে, তাহার বলার ভঙ্গীতে, তাহার আবেগ-কম্পিত ভাব-প্রকাশে, তাহার স্নেহ-ব্যাকুল, অশ্রু-সজল আশীর্বাদ-ধারায় ফুটিযা উঠে, তাহার রচিত সাহিত্যে তাহাই লালিত্য ও কমনীয়তা সঞ্চার করিতে পারে। তাহার জীবন-সমস্যা-বিশ্লেষণে, তাহার মন্তব্য ও চিন্তা-ধারার মধ্যেও এই ললিতগুণের আধিক্য ও তীক্ষ্ণ পরুষতার অভাব সমালোচকের চক্ষে ধরা পড়িতে পারে। মোট কথা, জর্জ এলিয়টের প্রথম বয়সের উপন্যাসে যে সমস্ত লক্ষণ নারীর কল্যাণ-হস্তের সুকোমল স্পর্শরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, বঙ্গ-সাহিত্যের উপন্যাসেও সেই সমস্ত গুণের বিকাশ নারীর বিশিষ্ট অবদানরূপে প্রত্যাশিত হইতে পারে।

(২)

এইবার কয়েকটি বিশিষ্ট নারী-ঔপন্যাসিকের রচনা আলোচনা করা যাইতে পারে। মহিলা-ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রথম পথ-নির্দেশের কৃতিত্ব কাহার তাহার সন্তোষ-জনক প্রমাণ পাওয়া কঠিন। তবে রচনার উৎকর্ষ ও পরিমাণের দিক দিযা এ বিষযে স্বর্ণকুমারী দেবীর নামই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার উপন্যাসগুলিকে প্রধানতঃ ঐতিহাসিক ও সামাজিক এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রধান :—(১) (১) দীপনির্বাণ, (২) ফুলের মালা, (৩) মিবার-রাজ, (৪) বিদ্রোহ। অবশ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের উৎকর্ষ লেখকের ইতিহাস জ্ঞান ও কল্পনামূলক পুনর্গঠন-শক্তির উপর নির্ভর করে —এখানে নারীর বিশেষত্ব ফুটিযা উঠার বিশেষ অবসর নাই। মোটের উপর স্বর্ণকুমারী দেবী ঐতিহাসিক উপন্যাসে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন নাই—এই ক্ষেত্রে তাঁহার মৌলিকতার দাবীও খুব বেশি নহে। বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা রমেশচন্দ্রের দৃষ্টান্তেই যেন তিনি বেশি অনুপ্রাণিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয। বঙ্কিমের ন্যায কল্পনার প্রসার ও তীব্র উচ্ছ্বাস তাঁহার নাই—সত্যনিষ্ঠা ও তথ্যানুবর্তনে তিনি রমেশচন্দ্রের সহিতই অধিক তুলনীয়। তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাসে ভাষা, মন্তব্যের সারবত্তা ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের দিক্‌ দিযা বরং সময় সময় রমেশচন্দ্র অপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বেরই পরিচয পাওয়া যায়।

'দীপনির্বাণ' স্বর্ণকুমারী দেবীর অতি অল্প বযসের রচনা, এবং ইহার সর্বত্রই কাঁচা হাতের নিদর্শন প্রচুরভাবে বিদ্যমান। চিতোর-রাজের পারিবারিক ইতিহাস ও মহম্মদ ঘোরীর দিল্লী আক্রমণ—এই দুই ঐতিহাসিক ধারা উপন্যাসের মধ্যে মিলিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক চিত্রটি বাস্তব-রস-সমৃদ্ধ নহে—মুসলমান বিজয়ের পূর্বে হিন্দুরাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কোন পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ইহাতে পাওয়া যায় না। একজন সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতা ও হিন্দুরাজ পৃথ্বীরাজের রাজনীতি-বিরুদ্ধ উদারতা—এই দুইটি হিন্দু-পরাজয়ের মুখ্য কারণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। রাজনৈতিক সংঘটনের ফাঁকে প্রাত্যহিক জীবনের গতিবিধির কোন ক্ষীণ পরিচয়ও পাওয়া যায় না। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যুদ্ধ-বিষয়ে অপক্ষপাত সুবিচার করিবারও কোন চেষ্টা নাই

—মুসলমানেরা যেন সম্পূর্ণভাবে ভাগ্য, বিশ্বাসঘাতকতা, ও হিন্দুদের সরল বিশ্বাস-প্রবণতার জন্যই যুদ্ধ জয় করিয়াছে। ইতিহাস কিন্তু এই পক্ষপাত-মূলক সাক্ষ্যে সায় দিতে পারে না।

উপন্যাসের অধিকাংশই দুইটি মামুলি ও বৈচিত্র্যহীন প্রেমকাহিনী-বর্ণনাতে পূর্ণ হইয়াছে। প্রভাবতী ও শৈলবালার সখিত্বই সর্বাপেক্ষা মনোজ্ঞরূপে চিত্রিত হইয়াছে। ঘটনা-বিন্যাসও প্রশংসনীয় নহে—ইহার মধ্যে আকস্মিকতার প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। চরিত্রগুলিও সাধারণতঃ নির্জীব ও রসহীন। কেবল এক থানেশ্বরের যুদ্ধবর্ণনাতেই লেখিকার বর্ণনাকৌশল কতকটা জীবনী-শক্তির পরিচয় দিয়াছে। ঐতিহাসিক প্রতিবেশ-রচনায় তথ্যজ্ঞানের অভাব ও প্রণয়চিত্রাঙ্কনে নারীর বিশেষ অন্তর্দৃষ্টিহীনতাই উপন্যাসটির উৎকর্ষের পথে প্রধান অন্তরায়।

'ফুলের মালা' উপন্যাসে ঐতিহাসিকতার দাবী ও মর্যাদা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে। ইহার প্রতিবেশ-কাল বাঙ্গালাদেশে পাঠান রাজত্বের সময়, যখন সেকেন্দার সাহ্ দিল্লীর অধীনতা কার্যতঃ ত্যাগ করিয়া বঙ্গে স্বাধীন-রাজ্য-প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। একদিকে দিনাজপুরের রাজ-বংশের সহিত বঙ্গেশ্বরের, অন্যদিকে বঙ্গরাজ-পরিবারের মধ্যে পিতা-পুত্রের বিরোধ উপন্যাসটির প্রধান বিষয়-বস্তু। এই যুদ্ধবিগ্রহবর্ণনা একেবারে শূন্যগর্ভ নহে, ইহার মধ্যে কতকটা তথ্য-সন্নিবেশের চেষ্টা হইয়াছে। বিশেষতঃ, যুদ্ধের প্রতি সাধারণ লোকের মনোভাব, তাহাদের মনে স্বাচ্ছন্দ্যপ্রিয়তা ও দেশ-প্রীতির সংঘর্ষের কতকটা ইঙ্গিত উপন্যাসমধ্যে পাওয়া যায়। চরিত্রগুলি প্রায়ই মামুলি ও বিশেষত্ব-বর্জিত। শক্তির দৃপ্ত অভিমান ও তেজস্বিতা, কতকটা অতিনাটকীয় হইলেও, অস্বাভাবিক হয় নাই। গণেশদেব, কতকটা রোমান্সের নায়কের লক্ষণাক্রান্ত হইলেও, একেবারে অবাস্তব নহে; তবে তাঁহার রাণী নিরুপমা নিতান্ত অস্ফুট ও প্রাণহীন। সেইরূপ যোগিনী অতিমানব-রাজ্য হইতে আমদানি হইয়াছে। গিয়াসুদ্দিনের পার্শ্বচর ও বিশ্বস্ত সচিব কুতব সাধারণ stage villain অপেক্ষা একটু উন্নততর পর্যায়ভুক্ত। লেখিকার মন্তব্যগুলির মধ্যে অর্থগৌরব ও উপ-যোগিতার লক্ষণ পাওয়া যায়। মোটের উপর ঐতিহাসিক উপন্যাস-হিসাবে 'ফুলের মালা' 'দীপনির্বাণ' অপেক্ষা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

'মিবার-রাজ' ও 'বিদ্রোহ'—রাজপুত ইতিহাসের কাহিনী—ভীল ও রাজপুতের জাতিগত বিরোধের বিবরণ। 'মিবার-রাজ' উপন্যাসে পার্বত্য ভীলজাতির একদিকে রাজভক্তি ও সরল বিশ্বাস-প্রবণতা, অপরদিকে চিরাচরিত প্রথার প্রতি অবিচল আনুগত্য ও বংশগত বৈর-নির্যাতন-প্রবণতার চমৎকার চিত্র পাওয়া যায়। উপন্যাসটি আয়তনে ক্ষুদ্র ও উহার বর্ণিত ঘটনা-বিন্যাসও স্বল্পাবয়ব। 'বিদ্রোহ' উপন্যাসটি দুইশত বৎসরের পরবর্তী ঘটনার বিবৃতি। ইহাতে ভীল ও রাজপুতের পরস্পর-সম্পর্কের সমস্ত জটিলতা খুব সূক্ষ্ম ও ব্যাপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই দুইশত বৎসরের মধ্যে ভীলের জন্মভূমি রাজপুতের অধিকারে আসিয়াছে। ভীল রাজপুতের বশ্যতা স্বীকার করিয়া কৃষিকর্ম, মেষপালন, প্রভৃতি নীচজনোচিত কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সে প্রায়ই নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট ও বিজেতা রাজপুতের প্রতি অনুরক্ত, তবে কোথাও কোথাও বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অসন্তোষের ভস্মমধ্যে সুপ্ত আছে। রাজপুত ভীলের প্রতি মনে মনে একটা ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব পোষণ করে, তবে সে পূর্ব উপকারের কথা একেবারে বিস্মৃত হয় নাই। এই জাতিবিরোধের ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবটি উপন্যাসের মূল

প্রতিবেশ। সভাসদ্‌গণের হাস্য-পরিহাস-মুখর রাজসভার চিত্রটি বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। অস্থিরমতি, উদ্ধতপ্রকৃতি রাজার চরিত্রের মধ্যেই যে বিপদের বীজ নিহিত আছে, অনুকূল প্রতিবেশ-প্রভাবে ও দৈবপ্রতিকূলতায় তাহাই পল্লবিত হইয়া উঠিয়া সমগ্র জাতির ইতিহাসকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। রাজা ও রাণীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান মনোমালিন্যের চিত্রটি খুব সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। ভীল যুবক জুমিয়ার প্রতি রাজার সৌহার্দ্য ও জুমিয়ার পালিত কন্যা সুহারের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ তাঁহার রাজ্য ও পারিবারিক জীবনে অসন্তোষের সঞ্চার করিয়াছে।

সুহারের প্রতি আকর্ষণে প্রথম প্রথম দূষণীয় কিছু ছিল না; কিন্তু জনাপবাদের পঙ্কিল স্রোত ইহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহাকে ক্লেদাক্ত করিয়া দিল। চারিদিকের বিরুদ্ধতায় এই নির্দোষ আকর্ষণে ক্রমশঃ প্রেমের আবেশময় রাগ সঞ্চারিত হইল। অন্যদিকে এই দৈবাহত সম্বন্ধের ফলে আরও গুরুতর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। সুহারের পাণিপ্রার্থী ভীল যুবক ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় ও প্রতিহিংসার তাড়নায় একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিল এবং ভীলদের মধ্যে যে রাজবিদ্রোহমূলক একটা প্রচ্ছন্ন আন্দোলন অর্ধসুপ্ত ছিল তাহা এই উত্তেজনায় প্রবল হইয়া উঠিল। রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রবিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিল—ভীলেরা রাজপুতরাজ্য ধ্বংস করিল। জুমিয়া এই অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া তাহা নিবাইবার বৃথা চেষ্টায় আত্মবলিদান দিল। রাজপুত ও রাজপুতবংশের ভবিষ্যৎ আশা শিশু বাপ্পারাও সুহারের মাতৃস্নেহশীতল বক্ষে আশ্রয়লাভ করিয়া পিতৃরাজ্য-উদ্ধারের শুভদিন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। উপন্যাসের ট্রাজেডি এইরূপ অনিবার্য ক্রমবিকাশের পথে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে।

'বিদ্রোহ' স্বর্ণকুমারী দেবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। রাজসভা, ভীল ও রাজপুতের পরস্পর সম্বন্ধ, ভীলদের সবল গ্রাম্য জীবন, কুসংস্কারপরায়ণতা ও অজ্ঞাত বিপদের ভয়ে সন্ত্রস্ত অবস্থার চিত্র বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। রাজা ও রাণীর মধ্যে সূক্ষ্ম ভাব-পরিবর্তনের ধারাটি ও ট্রাজেডির অনিবার্য, অবিসর্পিত গতিটি বিশেষ নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের মধ্যে খুব মৌলিকতা না থাকিলেও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় মিলে। দশম অধ্যায়ে বনভূমির বর্ণনার মধ্যে যথেষ্ট কবিত্বময় সূক্ষ্ম অনুভূতির নিদর্শন পাওয়া যায়—বন্যপ্রকৃতির অযত্ন-বর্ধিত অজস্রতা লেখিকার কল্পনা-সমৃদ্ধিকে জাগাইয়াছে। মোটকথা 'বিদ্রোহ' উপন্যাসটি রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের সহিত সর্বথা তুলনীয়, এমন কি কোন কোন বিষয়ে—ভাষা, কবিত্ব-শক্তি, বিশ্লেষণ ও মন্তব্যের দিক্ দিয়া—রমেশচন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বেরও দাবী করিতে পারে।

(৩)

স্বর্ণকুমারী দেবীর সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসের মধ্যে 'ছিন্ন মুকুল', 'হুগলীর ইমামবাড়ী', 'স্নেহলতা' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) ও 'কাহাকে' এই চারিখানির নাম করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত উপন্যাস ছাড়া বাকীগুলি উচ্চাঙ্গের উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের প্রবল উত্তেজনা তখন উপন্যাসের পৃষ্ঠায় তুফান তুলিয়া তাহার

গঠন-সৌষ্ঠব নষ্ট করিতেছিল। সামাজিক বিচার-বিতর্ক ও প্রশ্ন-সংকুলতা লেখকের মনে এমন একটা অশান্ত ধূমকুণ্ডলী পাকাইত যে, উপন্যাসের বস্তুতন্ত্রতা এই ধূমাবরণের মধ্যে ধূসর অস্পষ্টতায় হারাইয়া যাইত। উপন্যাসের প্রকৃত গঠন ও উপযোগিতা-সম্বন্ধে লেখকদের খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না; চমৎকার পারিবারিক চিত্র আঁকিতে আঁকিতে হঠাৎ তার্কিকতার ঘূর্ণী-পাকে পড়িয়া গল্পের প্রবাহ একেবারে বন্ধ হইয়া যাইত। অধিকাংশ পারিবারিক উপন্যাসই এই সমাজ ও ধর্মবিপ্লব-গত বিক্ষোভ হইতে মূল প্রেরণা পাইত; সুতরাং জন্মস্থানগত এই তত্ত্বমূলক বিচার-বিতর্কের প্রলোভন হইতে অব্যাহতিলাভ ইহাদের পক্ষে সহজ ছিল না। ব্যক্তি বা পরিবারবিশেষের বাস্তব-জীবনে এই তত্ত্বান্বেষণ প্রবৃত্তি ফুটাইয়া তোলার মত বাস্তব-রস-সমৃদ্ধি ও নিরপেক্ষতা (detachment) খুব অল্প ঔপন্যাসিকেরই ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ঔপন্যাসিকেরা যুগান্তরের ঢেউয়ে এইরূপ হাবুডুবু খাইয়া উপন্যাসের পৃষ্ঠাগুলি তত্ত্বালোচনার বাষ্পে ফাঁপাইয়া তুলিতেছিলেন। গর্ভস্থ ভ্রূণদেহের ন্যায় উপন্যাসের দেহও এই যুগে অস্ফুট ও অপরিণত ছিল। এক বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া সে যুগের প্রায় সমস্ত ঔপন্যাসিকই এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে অর্ধনিষ্ফল প্রয়াস করিতেছিলেন। বঙ্কিমের প্রতিভাই এই যুগান্তরের বিশৃঙ্খলার মধ্য হইতে ব্যক্তিগত জীবনের সৌন্দর্য-পরিপূর্ণতা ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল; বিধবা-বিবাহ-সম্বন্ধীয় আন্দোলনের বিচ্ছিন্ন পরমাণু হইতে তিনি কুন্দনন্দিনী ও রোহিণীর মূর্তি গঠন করিয়াছিলেন।

স্বর্ণকুমারীর সামাজিক উপন্যাসের অধিকাংশের মধ্যে এই দোষ প্রচুরভাবে বিদ্যমান। তাঁহার 'হুগলীর ইমামবাড়ী' উপন্যাসে, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া ধর্মতত্ত্বালোচনা গল্পের সরস বাস্তবতাকে গ্রাস করিয়াছে। সন্ন্যাসী তাঁহাব অতিমানবীয় শক্তি লইয়া বারবার উপন্যাসে আবির্ভূত হইয়াছেন ও গল্পের স্রোতকে আকস্মিক পরিবর্তনের খাতে ফিরাইয়া দিয়াছেন। দার্শনিক আলোচনার অতি-প্রাদুর্ভাব ও অতিমানবীয় শক্তির একাধিকবার প্রবর্তন—এই দুই-টিই উপন্যাসের প্রধান ত্রুটি। মহম্মদ ও মুন্না—ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে অতি মধুর স্নেহ-সম্পর্কের চিত্রই উপন্যাসের প্রধান স্থান অধিকার করে। স্বামি-পরিত্যক্তা মুন্নার শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে করুণ রসের প্রাধান্য অনুভব করা যায়। নবাব খাঁজাহান খাঁর অস্থিরমতিত্ব, যথেচ্ছাচারপ্রিয়তা ও পাপের প্রলোভনে অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রও কতকটা শক্তিমত্তার পরিচয় দেয়, কিন্তু খাঁজাহান-কাহিনীর সহিত মূল গল্পের যোগ-সূত্র খুব সামান্য; কেবল বাহ্য অভিভবের সম্পর্ক মাত্র। মোটের উপর উপন্যাসটির গ্রন্থন-প্রণালী অত্যন্ত শিথিল,—ইহার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে বন্ধন খুব আল্‌গা রকমের। এক মহম্মদ মহসীনের উন্নত, উদার চরিত্রই উপন্যাসের খণ্ডাংশগুলির মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ ঐক্যবন্ধনের হেতু হইয়াছে।

'স্নেহলতা' উপন্যাসটিও এইরূপ সমাজ-ও-ধর্মসংস্কারমূলক তর্কবিতর্কের মধ্যে নিজ প্রধান উদ্দেশ্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। জগৎবাবুর পারিবারিক জীবনের যে চমৎকার চিত্র গ্রন্থারম্ভে আমাদের আশার উদ্রেক করে, দুই-এক অধ্যায় পরেই তার্কিকতার একটা ঢেউ আসিয়া তাহার উজ্জ্বলতাকে মুছিয়া দিয়া গিয়াছে। জগৎবাবুর রুক্ষভাষিণী, প্রভুত্বপ্রিয়া, ধন-গর্বিতা গৃহিণী, তাঁহার আদরের মেয়ে অভিমানিনী টগর, উদার কিন্তু দুর্বলচেতা গৃহস্বামী ও শান্তস্বভাবা, সেবাকুশলা স্নেহলতা—সকলে মিলিয়া এক চমৎকার পারিবারিক চিত্র রচনা করিয়াছে। ইহার

অব্যবহিত পরেই সমাজ-সমালোচনা ও মতবাদপ্রচারের তীব্র চীৎকার উপন্যাসের সুরটি ডুবাইয়া দিয়াছে। হেম, কিশোরী, জীবন, নবীন, মোহন, প্রভৃতি প্রকাণ্ড একদল যুবকের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই, যাহারা কেবল তর্কের বল-লোফালুফির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহারা দেশোন্নতি ও সমাজ-সংস্কারের জন্য সভাসমিতি স্থাপন করিয়াছে; শিল্পোন্নতির প্রয়োজনীয়তাও ইহাদের দৃষ্টি এড়ায় নাই; বিপ্লবপন্থীর গোপন ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা ইহারা নিতান্ত নিরীহ কর্ম-প্রচেষ্টায় প্রয়োগ করিয়াছে। যাহা হউক, এই ব্যক্তিত্ববিহীন যুবকদের মধ্যে মোহন স্নেহলতাকে ও জীবন টগরকে বিবাহ করিয়া উপন্যাসমধ্যে একটু আইনসঙ্গত স্থান অর্জন করিয়াছে। কিশোরী ও জগৎবাবুর পুত্র চারু পরস্পর প্রশংসা ও পানাসক্তির দ্বারা সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া উপন্যাসমধ্যে একটি বিরুদ্ধ স্রোতের সৃষ্টি করিয়াছে। স্নেহলতার প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদস্বরূপ মোহন পিতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া বিদেশে গিয়াছে ও সেখানে প্রাণ হারাইয়া স্নেহলতাকে বৈধব্যযন্ত্রণা ও অসহায়তার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। এইখানে প্রথম খণ্ডের উপসংহার হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ড ও প্রথম খণ্ডের মধ্যে দশ বৎসরের ব্যবধান। এখানে চারুই উপন্যাসের নায়কের অংশ অধিকার করিয়াছে। চারুর স্ত্রীবিয়োগের পর তাহার দুঃখ খুব বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার চরিত্রেরও বিস্তৃত বিশ্লেষণ হইয়াছে। চারুর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, কিন্তু চঞ্চল; তাহার নিজের ব্যক্তিত্ব প্রবল নহে বলিয়া অন্যের প্রভাবে সে সহজেই নিয়ন্ত্রিত হয়; তাহার কবিত্বশক্তির ধারা উচ্ছ্বসিত কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। চারু ও বিধবা স্নেহলতার পরস্পরের প্রতি প্রেমসঞ্চারই উপন্যাসের প্রধান বিষয়। কিন্তু তাহাদের প্রণয়-বর্ণনা অপেক্ষা বিধবা-বিবাহের ঔচিত্যসম্বন্ধে যুক্তিমূলক আলোচনাই উপন্যাসমধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। চারুর মাতার ও টগরের প্রতিকূলতায় এই প্রণয় অগ্রসর হইতে পায় নাই। চারুও তাহার ক্ষণস্থায়ী প্রণয় বিস্মৃত হইয়া আবার নূতন বিবাহ করিয়া তাহার চরিত্রের অসারত্ব প্রমাণ করিয়াছে। এইরূপ চারিদিকের অত্যাচারে জর্জরিত-হৃদয় হইয়া স্নেহলতা আত্মহত্যার দ্বারা সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়াছে। উপন্যাসমধ্যে কেবল জগৎবাবু ও জীবনই তাহার প্রতি স্নেহশীল ও সহানুভূতিসম্পন্ন, কিন্তু সমাজের সমবেত বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে তাহাদের ক্ষীণ সহযোগিতা নিতান্ত অক্ষম ও দুর্বল প্রতিপন্ন হইয়াছে। মোটের উপর উপন্যাসে ঘটনা-পারম্পর্যের সহিত কোন চরিত্র-পরিণতির সংযোগ হয় নাই—উপন্যাসের প্রকৃত রস কোথাও জমাট বাঁধে নাই।

'কাহাকে' লেখিকার সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস। এক আধুনিক শিক্ষিতা মহিলা ইহাতে তাহার প্রণয়ের ভাগ্যবিপর্যয়-কাহিনী বিবৃত করিয়াছে। শৈশবকালে তাহার ভালবাসার পাত্র ছিলেন তাহার পিতা—তাহার সমস্ত ব্যাকুল ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠুর নিষ্ঠা ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী একাধিপত্য পিতাকেই আশ্রয় করিয়াছিল। আরও কিছুদিন পরে এক সহপাঠী আসিয়া পিতার অংশীদার হইয়া বসিল—তাহার ভালবাসা উভয়ের মধ্যে নির্বাচনে অসমর্থ হইয়া চঞ্চল ও দোলায়িত হইয়া উঠিল। সহপাঠীর একটা অসম্পূর্ণ গানের কয়েকটা চরণ তাহার স্মৃতিতে একটা অজ্ঞাত প্রেমের রাগিণীর ন্যায় বাজিতে লাগিল। তারপর অনেক বৎসর পরে সুশিক্ষিতা ও পূর্ণযুবতী নায়িকা তাহার ব্যারিস্টার ভগিনীপতি ও দিদির গৃহে আবার নূতন করিয়া প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছে। এক নবীন ব্যারিস্টার রমানাথ—সেই পূর্ব-পরিচিত গান গাহিয়া তাহার প্রেমের পূর্বস্মৃতি

জাগাইয়াছে, এবং তাহার হৃদয়ে প্রথম গভীর অনুরাগের উদ্রেক করিয়াছে। কিন্তু কিছু দিন পরেই তাহার সন্দেহ জাগিয়াছে যে, রমানাথের প্রতি তাহার মনোভাব প্রকৃত প্রেম কি না। সংগীতের সুরের সহিত এই ভাবের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, ইহা এরূপ একপ্রকার বিবশ আত্ম-বিস্মৃতিতে ভরপূর, যে ইহা সম্মোহন-শক্তির সহিত তুলনীয়। রমানাথের ব্যবহারেও খট্‌কা লাগিবার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। আশা-ভঙ্গের দারুণ আঘাতে নায়িকার মূর্চ্ছা হইয়াছে, ও এই অসুখের সময় তাহার ভগিনীপতির বন্ধু এক ডাক্তারের আন্তরিক সমবেদনা ও আত্মীয়বৎ ব্যবহার তাহার প্রতি এমন একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগাইয়াছে, যাহা প্রেমের অগ্রদূত। ইহার পর রমানাথের ব্যবহারে আত্মপক্ষসমর্থনের একটা ব্যাকুল, আন্তরিক চেষ্টা থাকিলেও, ইহার মধ্যে নায়িকার সূক্ষ্ম অনুভূতি স্বার্থপরতার গন্ধ পাইয়াছে। অজ্ঞাতসারে নায়িকার মন ডাক্তারের দিকে ঝুঁকিয়াছে, ডাক্তারের চিত্র তাহার হৃদয়পট হইতে রমানাথের চিত্রকে অপসারিত করিয়াছে। এই সময় নায়িকার পিতা আসিয়া তাহাকে কলিকাতা হইতে লইয়া গিয়াছেন ও স্ত্রীলোকের স্বাধীন নির্বাচনের প্রতি আর আস্থা না দেখাইয়া তাহার বাল্য-সহচর ছোট্টুর সহিত তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। ইহাতে নায়িকা বিষম অবস্থা-সংকটে পড়িয়াছে—কিন্তু অবশেষে তাহার সমস্ত সন্দেহ নিরসন হইয়াছে ডাক্তার ও ছোট্টুর অভিন্নতার আবিষ্কারে। এইরূপ নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই শেষ পর্যন্ত নায়িকা প্রকৃত প্রেমের পরিচয় লাভ করিয়াছে।

এই ক্ষুদ্র উপন্যাসটির বিশেষত্ব এই যে, ইহার মধ্যে আগাগোড়া স্ত্রীলোকের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে যথেষ্ট তর্ক-বিতর্ক আছে, যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের আস্ফালন আছে, ইংরেজী সাহিত্য ও সমাজের তুলনা-মূলক সমালোচনা আছে, কিন্তু সকলের উপর দিয়া একটি স্ত্রী-হস্তের লঘু-কোমল স্পর্শ অনুভব করা যায়। এই বিশিষ্ট সুরটি কি তাহা বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণ করা কঠিন, তবে ইহা অনুভব করা সহজ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' ও 'রজনী'তে ও রবীন্দ্রনাথের অনেক উপন্যাসে নারীর উক্তি ও মন্তব্য প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, নারীর মুখ দিয়া উপন্যাসের বিশেষ সমস্যা আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু সেখানে কথাবার্তার ভঙ্গি ও মন্তব্যের সুর যেন পুরুষের সহানুভূতিমূলক কল্পনার দ্বারা নারীর উপর আরোপিত হইয়াছে; ইহার খাঁটি সুরের সঙ্গে যেন একটু কবিত্বপূর্ণ উচ্চগ্রাম, একটু অতিরঞ্জনের খাদ মিশানো রহিয়াছে। ইন্দিরা ও রজনীর মধ্যে যে সপ্রতিভতা, যে পরিহাস-নিপুণতা ও বিদ্রূপ-প্রবণতা পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে যেন একটু পুরুষ-কল্পনার আতিশয্য আছে। পুরুষের চোখে স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য যেমন, সেইরূপ তাহার মনোভাবও একটু আদর্শবাদদ্বারা রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এখানে নায়িকার প্রত্যেক বাক্যে, প্রত্যেক মন্তব্যে একটা মৃদু সুগন্ধ পুষ্পসারের মত নারীর অবর্ণনীয় মাধুর্য ও কোমলতা অনুভব করি। প্রারম্ভেই নারীর ঐতিহাসিক জ্ঞানের অভাব, তাহার সন-তারিখ মনে করিয়া রাখার অক্ষমতার বর্ণনাতে একটা বিশিষ্ট নারীর সুর বাজিয়া উঠে। পিতার প্রতি আদরিণী কন্যার মনোভাব-বর্ণনে ও এই মনোভাবে প্রেমের সমস্ত লক্ষণ আবিষ্কার করার মধ্যে, রমানাথের প্রতি নবজাগ্রত প্রেমবিকাশের বিশ্লেষণে, প্রেম-ভঙ্গের দুঃসহ বেদনা ও ক্লিষ্ট নৈরাশ্যে, ও তাহার প্রকৃত প্রণয়ীর সহিত শঙ্কা-ব্যাকুল অনিশ্চয়তার ভিতর দিয়া মিলনের গভীর তৃপ্তিতে—মোটকথা উপন্যাসের সমস্ত ব্যাপারেই নারীসুলভ সূক্ষ্মদর্শিতা ও

ভাবপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ পুরুষ-ঔপন্যাসিক আধুনিক শিক্ষিত নারীর মধ্যে যে প্রগল্‌ভতা ও পুরুষবুদ্ধি-প্রাধান্যের আরোপ করিয়া থাকেন, এখানে তাহার চিহ্নমাত্র নাই—শিক্ষা তাহাকে বাক্‌-সংযম দিয়াছে, তাহার রুচি মার্জিত করিয়া তাহার চরিত্র-সৌকুমার্যকে বাড়াইয়াছে। এই স্ত্রী-মনোভাবের নিখুঁত প্রতিবিম্ব-হিসাবে উপন্যাসটির একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর দুই একটি ছোট গল্পের—বিশেষতঃ, 'পেনে প্রীতি' নামক গল্পের মধ্যেও এই গুণ-সমৃদ্ধি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বর্ণকুমারীর ঐতিহাসিক ও অন্যান্য সামাজিক উপন্যাসে চিরস্থায়িত্বের কোন লক্ষণ নাই; কিন্তু 'কাহাকে' তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান ও অন্যান্য মহিলা-ঔপন্যাসিক হইতে তাহার প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়।

(৪)

স্বর্ণকুমারী দেবীর পরবর্তী মহিলা-ঔপন্যাসিকদের হাতে উপন্যাস সাধারণতঃ দুইটি বিপরীতমুখী ধারার অনুবর্তন করিয়াছে। এক শ্রেণীর লেখিকা হিন্দু-সমাজের উপর আক্রমণ ও সমালোচনার প্রতিক্রিয়ারূপে ইহার সনাতন বিধি-নিষেধ ও মূলীভূত আদর্শের পক্ষ-সমর্থনের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর প্রধান প্রতিনিধি নিরুপমা দেবী ও শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী। ইঁহাদের, বিশেষতঃ অনুরূপা দেবীর প্রায় সমস্ত উপন্যাসে যে স্বার্থত্যাগ, ভগবৎ-প্রেম ও লোক-হিতৈষণা হিন্দু-সমাজের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা, তাহাই গভীর অনুরাগ ও সহানুভূতির সহিত চিত্রিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য ভাবের পঙ্কিল প্রবাহে সেই আদর্শের বিশুদ্ধি মলিন হইতেছে, শান্তি ও আত্মবিসর্জন-মূলক সন্তোষের উপর প্রতিষ্ঠিত আমাদের পারিবারিক জীবন কেন্দ্রভ্রষ্ট হইতেছে, ইহাই তাঁহাদের নবীন শিক্ষা-সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ। অনুরূপা দেবীর একাধিক উপন্যাসেই একজন আদর্শ সমাজনেতা ও ধর্ম-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের চিত্র আছে, যিনি সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট, অত্যাচার-উৎপীড়নের ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে অটল গিরিশৃঙ্গের ন্যায় অক্ষুণ্ণ মহিমায় দণ্ডায়মান থাকেন। এই জাতীয় চরিত্রেরা প্রায়ই শ্রেণী-বিশেষের প্রতিনিধি, ব্যক্তিত্ব-সূচক গুণ তাঁহাদের মধ্যে সাধারণতঃ অস্পষ্ট থাকে; কেবল প্রতিবেশের বিভিন্নতার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন উপন্যাসে তাঁহাদের কতকটা চরিত্র-পার্থক্য লক্ষিত হয়। আর এক প্রকারের চিত্র এই উপন্যাসগুলিতে প্রায়ই পুনরাবৃত্ত হইতে থাকে—স্বধর্মনিষ্ঠ, কন্যাস্নেহ-পরায়ণ জমিদার। ধর্মানুষ্ঠান প্রাচীনপ্রথানুরক্ত বাঙ্গালী পরিবারে যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে এই সমস্ত উপন্যাসে আমরা তাহার পরিচয় পাই। শঙ্খ-ঘণ্টার আরতি-রোল, ধূপ-ধূনার সুরভি, মন্ত্রোচ্চারণের মধুর-গম্ভীর শব্দ যেন ইহাদের পাতাগুলির সঙ্গে মিশিয়া আছে। এই ধর্মানুষ্ঠান কেবল যে একটা দৃশ্য-সৌন্দর্য বা বাহ্যাড়ম্বরের দিক্‌ হইতে বর্ণিত হয় তাহা নহে, অন্তরের উপর গভীর প্রভাবই ইহার বিশেষত্ব। সংসারসুখহীনা রমণী তাহার হৃদয়ের অভাব পূরণ করিবার জন্য দেবমন্দির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, দেবতার সহিত একটা মধুর স্নেহ-ভক্তির সম্পর্ক স্থাপন করিয়া সাংসারিকতার অতৃপ্ত বাসনাগুলি পুরাইবার একটা উপায় আবিষ্কার করে। নিরুপমা দেবীর 'দিদি' ও অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি' এই বিষয়ের সুন্দর উদাহরণস্থল। দাম্পত্য মনোমালিন্য ও পিতা-পুত্রীর মধুর স্নেহ-সম্পর্ক এই উপন্যাসগুলির আলোচনার প্রধান বিষয়। স্বামি-স্ত্রীর গূঢ় অভিমানমূলক বিচ্ছেদ বা

প্রকৃতি-বৈষম্যের জন্য মনোমালিন্যের নানারূপ সূক্ষ্ম পরিবর্তন এই উপন্যাসগুলিতে প্রতিফলিত হইয়াছে। আবার স্বামিপ্রেম-বঞ্চিতা কেমন ব্যাকুল আগ্রহের সহিত পিতৃস্নেহের শীতল অঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করে, পিতা কতটা গভীর ও ব্যথিত করুণার সহিত অভাগিনী দুহিতার উপর নিজ স্নেহাঞ্চল বিস্তার করেন ও উভয়ের পরস্পর-সম্পর্ক কতটা সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, অক্লান্ত সেবা ও নীরব আত্মবিসর্জনের দ্বারা মাধুর্য-মণ্ডিত হইয়া উঠে, উপন্যাসের পর উপন্যাসে সেই নিবিড় একাত্মতার ছবি উজ্জ্বলবর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্গপরিবারের দুইটি প্রধান ভাব-ধারা এই উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রবাহিত হইয়া তাহাদিগকে এক শ্যামল-সরস সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধির মধ্যে সীতা ও শান্তা দেবীর নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের উপন্যাসে বিশেষ করিয়া নারী-সমাজে আধুনিক মনোবৃত্তির প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সংস্কারের নানামুখী আলোড়ন নারী-হৃদয়ে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে, নারীর ভাব-গভীরতার মধ্যে এই পরিবর্তনের তরঙ্গ-চাঞ্চল্য কতখানি স্থির-সংহত হইয়াছে—এই কাহিনীর ইতিহাসই ইঁহাদের উপন্যাসের প্রধান বিষয়। নারী-মনের উপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের কতকগুলি বিভিন্ন স্তর পৃথক্ করা যায়। সর্বপ্রথমে আধুনিকতার ঢেউ বৈঠকখানা ভাসাইয়া লইয়া গেলেও ইহা অন্দরমহলের প্রাচীর-বেষ্টনী হইতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়াছে। পুরুষ যখন আধুনিকতার উগ্র সুরা পান করিয়া মাতাল হইয়াছে, তখন নারী নিজ অন্তঃপুরের অর্গল দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া এই দুর্ভেদ্য অন্তরালের আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করিয়াছে। কিন্তু অন্তঃপুর-দ্বার এই প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে বেশি দিন রুদ্ধ থাকে নাই; স্বামি-পুত্রের যুগ্ম আকর্ষণে নারীর যুগযুগান্তরের ভার-কেন্দ্র স্থানচ্যুত হইয়াছে। নারী এই নূতন আবির্ভাবকে প্রথম ঘরে, ও পরে মনের কোণে ঠাঁই দিতে বাধ্য হইয়াছে—কিন্তু এই বাধ্যতা-মূলক আত্মসমর্পণ আন্তরিক আবাহন নহে। ভিতরের নীরব প্রতিবাদ তাহার ক্ষুব্ধ গুঞ্জরণ সংবরণ করে নাই। তারপর আসিয়াছে নারীর নিজের আকর্ষণের পালা। পরিচয়ের দ্বারা প্রথম সংকোচ কাটিয়া গেলে নারীর বিচারবুদ্ধি ও সৌন্দর্যবোধ ধীরে ধীরে এই নবীন আবির্ভাবের আকর্ষণে উন্মেষিত হইয়াছে। অবশ্য সর্বপ্রথম যাহা নারীর চোখে নেশা লাগাইয়াছে তাহা আধুনিকতার বাহ্য-সৌন্দর্য ও বহির্মুখী স্বাধীনতা—জুতা-সেমিজ-গাউনের রঙ্গিন, লীলা-চঞ্চল ঢেউ ও অবাধ সঞ্চরণের উন্মাদনা। এখনও অনেক নারী এই বাহ্য আকর্ষণের স্তর অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তারপর পাশ্চাত্ত্য হাব-ভাব-বিলাসের সীমা ছাড়াইয়া পশ্চিমের মনোরাজ্যে প্রথম পদক্ষেপ, তাহার সাহিত্য ও চিন্তা-ধারার সহিত প্রথম পরিচয়। এই পরিচয়ের ফল পুরুষের মধ্যে যেমন, নারীর মধ্যে তেমন ব্যাপক হয় নাই—অনেকে ইংরেজী সাহিত্য ও সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছেন; কেহ কেহ বা স্বর্গীয় তরুদত্ত বা সরোজিনী নাইডুর মত উচ্চাঙ্গের ইংরেজী কবিতাও রচনা করিয়াছেন। কিন্তু মোটের উপর এই শিক্ষার ফলে নারী-সমাজে কোন ব্যাপক বা ভাবগত গভীর পরিবর্তন হয় নাই; যাহা হইয়াছে তাহাকে মুষ্টিমেয়ের ভাব-বিলাস বলা যাইতে পারে। সর্বশেষে চতুর্থ স্তরে ব্যাপক পরিচয়ের ও গভীর সমন্বয়-সমাধানের যুগ আসিয়াছে। স্কুল-কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলার সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে; কিন্তু ইহাদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ভাব-বিলাসের উপাদানভূত না হইয়া কার্যকরী বিদ্যার পর্যায়ভুক্ত হইতেছে। জীবন-সংগ্রামের তীব্রতায় নারী

আজ কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সহচর ও প্রতিদ্বন্দ্বী ; অভাবের প্রবল তাড়না আজ তাহার সুকুমার লালিত্যের অপচয় করিয়া তাহার কার্যকরী শক্তিবিকাশের সহায়তা করিতেছে। তাহার মনোরাজ্যে আজ প্রণয়ের আবেশ ও মদির বিলাস-স্বপ্নকে টুটাইয়া সাংসারিকতার কঠোর কর্তব্যচিন্তা বর্ণলেশহীন ধূসরতায় ফুটিয়া উঠিতেছে। কতকগুলি আধুনিক রীতিনীতি ও প্রথা তাহার প্রাত্যহিক জীবনে স্থায়িভাবে স্থান পাইয়াছে। শেমিজ-ব্লাউজ তাহার বিজাতীয় বিলাস হারাইয়া সুরুচিসম্মত অঙ্গাবরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ; চায়ের টেবিলে নারীর আসন এখন অনেকটা রান্নাঘরের পিঁড়ির পর্যায়ে নামিয়াছে। এখন ইংরেজী শিক্ষাকে সে আবেশহীন সমালোচনার চক্ষে দেখিয়া তাহাকে দৈনন্দিন প্রয়োজনের একাঙ্গীভূত করিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছে।

এই কঠোর জীবন-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত-হৃদয়, পুরুষের সাহচর্যে অভ্যস্ত, মনের নূতন অভাব ও নূতন দাবী-সম্বন্ধে সচেতন নারী নবরূপে প্রণয়কে আহ্বান করিতেছে। প্রণয় তাহার নিকট মদির-আবেশ নহে, সংসার-যুদ্ধে ক্ষত হৃদয়ের শীতল প্রলেপ, প্রাত্যহিক কর্তব্যের চাপে গুরুভারগ্রস্ত, অবনমিত মনকে খাড়া, সজীব রাখিবার একটা অবলম্বন মাত্র। এই প্রেমের কোন বাহ্য ঐশ্বর্যসম্ভার, কোন সমারোহ-প্রাচুর্য নাই, আছে কুণ্ঠিত, সংকুচিত আবির্ভাব, বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবার একটা অন্তর্গূঢ় আবেগ। এই রিক্ত, দীন, জীবন-সংগ্রামে ধূলিধূসর প্রণয়ের চিত্রই সীতা ও শান্তা দেবীর উপন্যাসসমূহের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ইহাদের নায়িকারা প্রায়ই গরিবের মেয়ে, স্কুলের ছাত্রী বা বড়-লোকের গৃহে শিক্ষয়িত্রী ; অভাবের আঁচ ইহাদের শরীর-মনের সরসতাকে অনেকখানি ঝলসাইয়া দিয়াছে ; তাহাদের দেহ-সৌন্দর্যের কোন অহংকার নাই, স্বভাব-মাধুর্য ও ব্যবহারের সুরুচি-পূর্ণ ভদ্রতাই তাহাদের এক মাত্র আকর্ষণ। তাহারা পুরুষের প্রণয়াভিব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করে না ; প্রণয়-লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পুরুষের দিক্ হইতে কোন সাড়া না পাইয়া, ব্যর্থ ক্ষোভে হৃদয় মধ্যে গুমরিয়া মরে। শেষ পর্যন্ত যখন তাহাদের প্রেমস্বপ্ন সফলতা লাভ করে, তখন তাহাদের আত্ম-সমর্পণে কোন উচ্ছ্বাস থাকে না, একটা শান্ত-সংযত আনন্দের পূর্ণতা তাহাদিগকে নিশ্চল, আত্ম-সমাহিত রাখে। রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, প্রভৃতি ব্যাপারের আলোচনায় তাহারা পুরুষের সহিত সমকক্ষ-হিসাবে সমান আসন দাবী করে ; তাহাদের আলোচনার বিশেষ ভঙ্গী, তাহাদের মনোভাবের বৈশিষ্ট্য এই তর্কযুদ্ধে প্রতিফলিত হয়, ও ইহাকে নূতন খাতে সঞ্চালিত করে। মোট কথা ইহাদের উপন্যাসে স্ত্রী-পুরুষের জন্য আমাদের সামাজিক জীবনে যে একটা নূতন সমন্বয়-ক্ষেত্র রচিত হইতেছে তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় ; তাহাদের কথোপকথন, তাহাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে একটা নূতন ভদ্রতা, সুরুচি, হাস্য-পরিহাস ও শ্রদ্ধার আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছে তাহা অনুভব করা যায়। এই সামাজিক ইতিহাস-পরিবর্তনের বিবৃতি বলিয়া ইঁহাদের উপন্যাসগুলির একটা বিশেষ মূল্য আছে।

(৫)

এইবার নিরুপমা দেবী ও অনুরূপা দেবীর কতকগুলি উপন্যাসের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতে পারে। ইঁহারা একই পর্যায়ভুক্ত, ইঁহাদের আদর্শ, মনোভাব, জীবন-সমালোচনার ধারা ও বিশ্লেষণ-প্রণালী অনেকটা এক রকমের। ইঁহাদের মধ্যে তুলনায়

আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করা কঠিন। অনুরূপা দেবীর অধিকার-ক্ষেত্র বিস্তৃততর; তাঁহার উপন্যাসের সংখ্যা ও বিষয়-বৈচিত্র্য নিরুপমা দেবী অপেক্ষা অনেক বেশি; নিরুপমা দেবীর কলাকৌশল অধিকতর সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত। অনুরূপার মন্তব্য অনেক সময় পাণ্ডিত্য-ভারাক্রান্ত ও গুরুপাক; নিরুপমার মন্তব্যের মধ্যে এই দোষের প্রায় সম্পূর্ণ অভাব; অত্যুক্তিপ্রবণতা ও অসংযত উচ্ছ্বাস তিনি প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বর্জন করিয়াছেন। সৃষ্টিশক্তির দিক্ দিয়া অনুরূপার শ্রেষ্ঠত্ব; কলাকুশলতা ও চিত্ত-বিশ্লেষণে নিরুপমাই বোধ হয় প্রাধান্যের দাবী করিতে পারেন। নিরুপমার সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস 'দিদি' বোধ হয় অনুরূপার সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস 'মন্ত্রশক্তি' হইতে উচ্চতর সৃষ্টি। উচ্ছ্বসিত, আবেগময় দৃশ্য-চিত্রণে নিরুপমা অনুরূপার সমকক্ষ নহেন; 'মন্ত্রশক্তি', 'পথ-হারা', 'বাগ্‌দত্তা' ও 'মহানিশা' হইতে এইরূপ তীব্র, অগ্নিজ্বালাময়, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আলোড়নের অনেক দৃষ্টান্ত সংকলিত হইতে পারে। নিরুপমার চিত্ত-বিশ্লেষণ অপেক্ষাকৃত ধীর, সংযত ও বাহ্য-বিক্ষোভ অপেক্ষা অন্তর-গভীরতার লক্ষণাক্রান্ত।

নিরুপমা দেবীর উপন্যাস ও ছোট গল্প সংখ্যায় অল্প; তাহাদের মধ্যে বিষয়-বৈচিত্র্যেরও অভাব আছে; কিন্তু সব কয়টিই কলাকৌশলে বিশেষ সমৃদ্ধ। প্রেমের বিরোধ ও দাম্পত্য-জীবনের সংঘর্ষ প্রায় সমস্ত উপন্যাসেরই বিষয়; এবং ইহা লেখিকার বিশেষ কৃতিত্বের নিদর্শন যে, এই সংঘর্ষের উপাদান আমাদের সাধারণ, বৈচিত্র্যহীন গার্হস্থ্য জীবন হইতেই আহরিত হইয়াছে। কচিৎ কখনও তাঁহাকে রোমান্সের অসাধারণত্বের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে, কিন্তু এই সমস্ত স্থলেও রোমান্সের বৈচিত্র্য খুব স্বাভাবিকভাবেই অবতারিত হইয়াছে, কোন উদ্ভট অস্বাভাবিকত্ব ইহার উপর ছায়াপাত করে নাই। বিরোধের উদ্ভব, বৃদ্ধি ও উপশমের চিত্রটি খুব নিপুণভাবে ও সূক্ষ্ম অনুভূতির সহিত বিশ্লেষিত হইয়াছে। ভাষা-সংযম ও উচ্ছ্বাস-বর্জন লেখিকার চরিত্রাঙ্কন ও বিশ্লেষণের বিশেষত্ব; এই মিতভাষিতার গুণে যেখানে সত্যসত্যই তিনি উচ্ছ্বসিত আবেগ, ভাব-গভীরতার মুহূর্তগুলি বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে বর্ণনা উচ্চাঙ্গের উৎকর্ষ-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-শক্তি, সুকুমার চিন্তাশীলতা ও জীবন-সমালোচনার অন্তর্নিহিত একটা কোমল-করুণভাব তাঁহার নারী-হস্তের লঘু স্পর্শটি চিনাইয়া দেয়। তিনি মোটের উপর আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্না; কোথায়ও তিনি বিদ্রোহের নিশান ওড়ান নাই, তীব্র উচ্চকণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বহুশতাব্দীর নির্মম কণ্ঠরোধের প্রতিশোধ লন নাই; অথচ এই স্বাভাবিক মৃদু ও কোমল কণ্ঠ, এই সূক্ষ্ম অথচ মর্মভেদী সমালোচনা যে নারীর সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

নিরুপমার সর্বপ্রথম উপন্যাস 'উচ্ছৃঙ্খল' অপরিণত বয়সের রচনা। উপন্যাসের অন্তর্নিহিত রসটি ইহাতে জমিয়া উঠে নাই—ঘটনাগুলি যেন বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত, ভাবগত ঐক্যে গ্রথিত হয় নাই। উপন্যাসটির মধ্যে এক ভাষায় ও বিশ্লেষণে সংযম ছাড়া লেখিকার ভবিষ্যৎ পরিণতির বিশেষ কোন পূর্ব-সূচনা মিলে না।

'অন্নপূর্ণার মন্দির'-এ লেখিকার প্রকৃত শক্তির প্রথম পরিচয় লাভ করা যায়। উপন্যাসখানি একটি দরিদ্র পরিবারের করুণ ইতিহাস; ইহার মধ্যে দারিদ্র্যের দুঃসহ ব্যথা ও অপমানের একটা তীব্র, জ্বালাময় অভিব্যক্তি হইয়াছে। সতীর চরিত্রটি দৃপ্ত তেজস্বিতা, নীরব সহিষ্ণুতা ও

অনমনীয় আত্মসম্মানজ্ঞানের সমন্বয়ে অপূর্ব হইয়াছে। অথচ এই প্রস্তর-কঠিন দৃঢ়তার অন্তরালে একটা কোমল আর্দ্র প্রণয়োন্মুখতার আভাস ইহাকে আরও রমণীয় ও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। বিশ্বেশ্বরকে লিখিত তাহার বিদায়-লিপির মধ্যে বজ্রকঠোর প্রত্যাখানের পশ্চাতে এই দ্রবীভূত প্রেম-প্রবাহের গোপন অস্তিত্বের পরিচয় মিলে—যেন আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে স্বচ্ছ শীতল নির্ঝর। সতীর পত্রখানি তাহার হৃদয়-রক্ত দিয়া লেখা—ভাবের এরূপ উচ্ছ্বসিত জ্বালাময় প্রকাশ বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ। মৃত্যুশয্যাশায়িত রামশঙ্করের সতীর প্রতি অন্তিম আশীর্বাদের মধ্যেও এই দুঃসহ অগ্নিজ্বালা বিচ্ছুরিত হইয়াছে।

গ্রন্থমধ্যে অন্যান্য চরিত্রের সেরূপ লক্ষণীয় কোন বিশেষত্ব নাই। বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা ও জাহ্নবী অনেকটা typical, শ্রেণীবিশেষের প্রতিনিধি মাত্র, ব্যক্তিত্বসূচক গুণ তাহাদের মধ্যে সেরূপ প্রকটিত হয় নাই। গৌণ চরিত্রের মধ্যে এক সাবিত্রীই অকুণ্ঠিত ব্যক্তিত্বের দাবী করিতে পারে। তাহার বিবাহে প্রেম-সার্থকতার আনন্দ অনেকটা শঙ্কা-কুণ্ঠিত ও সংকোচ-শীর্ণ হইয়াছে। তাহার প্রেমের মধ্যে অনেকখানি কৃতজ্ঞতার ভাব জড়িত হইয়াছে—কুণ্ঠার তুষার-স্পর্শ প্রেমের শতদলপদ্মকে পূর্ণবিকশিত হইতে দেয় নাই। আত্মবিসর্জনকারিণী সতীর ম্লান, বিষাদময় স্মৃতি যেন মধ্যবর্তিনী হইয়া তাহাদের দাম্পত্যমিলনের নিবিড় একাত্মতায় বাধা দিয়াছে। স্বামীর প্রতি এই কুণ্ঠা-জড়িত ভাবটি সাবিত্রীর মনে প্রশংসনীয় অন্তর্দৃষ্টি ও সুসংগতির সহিত স্থায়ী করা হইয়াছে। সতীর প্রভাব জীবনে-মরণে উপন্যাস-মধ্যে অক্ষুণ্ণ হইয়া রহিয়াছে।

'বিধিলিপি' লেখিকার আর একখানি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অত্যধিক বিশ্বাস জীবনে কিরূপে tragedyর সৃষ্টি করে, বিপদের প্রতিষেধক উপায়গুলিই কিরূপে বিপদ্‌কে আবাহন করিয়া আনিয়া জ্যোতিষ-গণনার সার্থকতা সম্পাদন করে, উপন্যাসটি সেই বিষয়ে রচিত।

চরিত্র-সৃষ্টি-হিসাবে মহেন্দ্র ও কাত্যায়নীর স্থানই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাদের মধ্যে সম্পর্কের জটিল বিরোধের চিত্র আশ্চর্য সুসংগতি ও সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিত ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। কাত্যায়নী-সম্বন্ধে অপ্রত্যাশিত বাধা পাইয়া মহেন্দ্রের মন নিদারুণ অভিমানে ভরিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তখন পর্যন্ত সে আশা একেবারে ত্যাগ করে নাই। কাত্যায়নীর পিতৃভক্তি কিন্তু তাহার প্রেমকে সম্পূর্ণরূপেই জয় করিয়াছে। কোন দুর্বলতা, কোন মানসিক বিক্ষোভ তাহার অবিচলিত দৃঢ়সংকল্পকে আন্দোলিত করে নাই। মহেন্দ্রের প্রতি অনুরাগ হয়ত তাহার মগ্ন-চৈতন্যে সুপ্ত ছিল, কিন্তু তাহার অণুমাত্র আভাসও সে চেতনার ঊর্ধ্বতন স্তর পর্যন্ত পৌঁছিতে দেয় নাই। মহেন্দ্রের সহিত তাহার প্রতি কথাবার্তায়, প্রত্যেকটি ব্যবহারে লেশমাত্র স্নেহ, করুণ সমবেদনার আভাস পর্যন্ত সযত্নে বর্জিত হইয়াছে, পাছে তাহাদের মধ্যে কোথাও প্রেমের ক্ষুদ্রতম বীজ লুক্কায়িত থাকে, পাছে মহেন্দ্র কোমলতাকে ছদ্মবেশী প্রেম বলিয়া ভুল করিয়া কোনরূপ মোহ হৃদয়ে পোষণ করে। তাহার এই স্নেহাভাসশূন্য নির্মমতাই মহেন্দ্রকে জগতের প্রতি একটা সন্দেহপূর্ণ বিদ্বেষে জর্জর করিয়া তুলিয়া তাহার অধঃপতনের সোপান নির্মাণ করিয়াছে।

কাত্যায়নীর উপেক্ষা মহেন্দ্র কোনও মতে সহ্য করিয়া কর্মস্রোতে আপনাকে ডুবাইতে চেষ্টা

করিতেছিল। কিন্তু জমিদারের সঙ্গে তাহার বিবাহ-প্রসঙ্গে তাহার বিদ্বেষ বিজাতীয় তীব্রতা লাভ করিয়া তাহাকে অধঃপতনের পথে আরও নামাইয়া দিল। এখন হইতে কাত্যায়নীর প্রতি তাহার ব্যবহার একটা তীব্রজ্বালাময় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ঝাঁঝে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল; এবং কামাখ্যানাথের সমস্ত উদার মহানুভবতা তাহার অসংগত বিদ্বেষের মাত্রাধিক্যই ঘটাইতে লাগিল। মহেন্দ্র একটা রীতিমত Byronic hero হইয়া উঠিল। এই সময় কমলার ব্যাপারের উপলক্ষ্য লইয়া জমিদারের প্রতি তাহার বিদ্বেষ মনোরাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া ব্যবহারিক জগতে আত্মপ্রকাশ করিল; জমিদারের ক্ষমাতে তাহার বিকৃতবুদ্ধি কামাখ্যানাথের চক্ষে নিজ অকিঞ্চিৎকরত্বেরই প্রমাণ আবিষ্কার করিয়া তাহার বিদ্বেষের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিল। শেষে কমলার উদ্ধারের ব্যাপারে নিরঞ্জনের হস্তক্ষেপে তাহার অসহিষ্ণুতা চরম সীমায় পৌঁছিয়া tragedyর সৃষ্টি করিল। দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে কাত্যায়নী ও মহেন্দ্রের বিদায়দৃশ্য উপন্যাস-সাহিত্যে হতাশ-প্রেমিকের অগ্নিজ্বালাময় ভাবোদ্গারণের চমৎকার দৃষ্টান্ত। সাধারণতঃ এইরূপ দৃশ্য ভাবাতিরেক-প্রবণতার (sentimentality) জন্য অতি-নাটকীয় (melodramatic) ও অলংকারবহুল ভাষা প্রয়োগে গুরুভার হইয়া থাকে। কিন্তু মহেন্দ্রের সরল, বাহুল্য-বর্জিত কথার মধ্যে আগ্নেয়গিরির জলন্ত নিঃস্রাবের মত একটা অন্তররুদ্ধ, গভীর জ্বালার উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করা যায়। ব্যর্থ প্রেমের রুদ্ধ আক্রোশ প্রতি শব্দে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়াও ইহা মহেন্দ্রের ব্যবহার ও কার্যকলাপের খুব সংগত ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা জোগায়।

কাত্যায়নীর চরিত্রের বহুমুখী জটিলতা আরও উচ্চাঙ্গের কলাকৌশলের পরিচয় দেয়। মহেন্দ্রের সহিত তাহার সম্বন্ধের কথা মহেন্দ্রের চরিত্র-বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। কামাখ্যানাথের সহিত তাহার সম্বন্ধের রেখাগুলি যেমন অসাধারণ জটিল, তেমনই আশ্চর্যরূপ সুস্পষ্ট—প্রত্যেকটি রেখা সুচিন্তিত ও দৃঢ়হস্তে অঙ্কনের সাক্ষ্য প্রদান করে—কোথাও অস্পষ্টতা ও অসম্পূর্ণ ধারণার চিহ্ন নাই। মহেন্দ্রের প্রত্যাখানের মধ্যে তাহার কোথাও অনুশোচনা বা অন্তর্দ্বন্দ্বের আভাস মাত্র নাই; পিতার আদেশ তাহার ইচ্ছাকে সম্পূর্ণভাবে লোপ করিয়াছে। কামাখ্যানাথের সহিত সম্বন্ধ-স্বীকারেও সেই অলঙ্ঘনীয় পিত্রাদেশের প্রভাব সুপরিস্ফুট। সপ্তম পরিচ্ছেদে কামাখ্যানাথ ও কাত্যায়নীর পরস্পর কথোপকথনের মধ্যে একদিকে যেমন কাত্যায়নীর অনমনীয় দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় পাওয়া যায়, অপরদিকে সেইরূপ তাহার সূক্ষ্ম পরিমাণবোধ ও অভ্রান্ত সংগতি-বিচারের নিদর্শন মিলে। কামাখ্যানাথের প্রতি তাহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা-নিবেদনের মধ্যে ভালবাসার কোন গন্ধ নাই—স্থির, অচঞ্চল আত্ম-সমর্পণ আছে, কোন দাবী-দাওয়া নাই; বিবাহের বন্ধন-স্বীকার আছে, কিন্তু মানস-স্বামীর প্রতি কোন দায়িত্ব-অর্পণ নাই। লেখিকার বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, তাহাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার যে সূক্ষ্ম রেখার অনুবর্তন করিয়াছে তাহা হইতে তিলমাত্র বিচ্যুতি ঘটিতে তিনি দেন নাই; শ্রদ্ধাকৃতজ্ঞতার বর্ণবিরল ধূসরতার উপর কোথাও প্রেমের গাঢ় রক্তিমা সঞ্চারিত হইতে দেন নাই। শেষ পরিচ্ছেদে মহেন্দ্রের প্রতি চির-অস্বীকৃত অনুরাগের অনিবার্য স্ফুরণের দৃশ্যে কাত্যায়নীর প্রস্তর-কঠিন হৃদয় প্রথম ও শেষ বার দ্রবীভূত হইয়াছে; এই অপ্রত্যাশিত অভিভবে শ্রদ্ধাকে ভালবাসায় রূপান্তরিত করিবার একটা ব্যাকুলতা সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু আসিয়া তাহার এই নব-জাগ্রত সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছে। রমার সহিত তুলনায়

তাহার চরিত্রের এই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও ভগবদ্ভক্তি ও ভালবাসার অভাবের দিক্‌টা খুব সুন্দর-ভাবে ফুটিয়াছে—রমার চক্ষে তাহার চরিত্রে দুর্বলতার আসল কেন্দ্রস্থলটি ধরা পড়িয়াছে। কাত্যায়নী-চরিত্রের পরিকল্পনা ও পরিণতি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে কামাখ্যানাথ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কামাখ্যানাথ-জাতীয় চরিত্রেরা অতিরিক্ত আদর্শমূলক হওয়ার জন্য বাস্তবতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলে—পৌরাণিক যুগের আদর্শ, প্রজারঞ্জক, কর্তব্যপরায়ণ রাজার স্মৃতি আসিয়া উহাদের সীমারেখাগুলিকে ম্লান ও অস্পষ্ট করিয়া দেয়। কিন্তু কামাখ্যানাথ-সম্বন্ধে এ সমালোচনা প্রযোজ্য নহে। তাঁহার সমস্যা ও সমস্যা-সমাধানের চেষ্টার মধ্যে এমন একটা বিশেষত্ব আছে, যাহাতে তাঁহার বাস্তবতার তীক্ষ্ণতা অণুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। আদর্শবাদের মধ্যে এই বস্তু-তন্ত্রতার সংরক্ষণ লেখিকার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়।

ঘটনা-বিন্যাসে, চরিত্র-চিত্রণে, ও ভাব-গভীরতায় উপন্যাসটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। ইহার প্রকৃতি-বর্ণনার মধ্যেও খুব সূক্ষ্ম কলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়—ইহার প্রাকৃতিক দুর্যোগের চিত্রগুলির মধ্যে উচ্চাঙ্গের বর্ণনা-নৈপুণ্য ছাড়া গ্রন্থবর্ণিত ঘটনার সহিত একটা গভীর ভাবগত সংগতি আছে। নক্ষত্র-খচিত নভোমণ্ডল ও ঝঞ্ঝা-বিদ্যুৎ-বজ্রাঘাতে আলোড়িত মেঘান্ধকার নৈশ আকাশ ইহার পট-ভূমিকা (background)—ইহার অন্তর-বাহির উভয়ই একইরূপ রহস্যের বিদ্যুচ্ছটায় উদ্ভাসিত। এই ব্যঞ্জনা-শক্তি উপন্যাসটির বিচিত্র আকর্ষণ বাড়াইবার হেতু হইয়াছে। উপন্যাসের আরও একটি উৎকর্ষ লক্ষিতব্য। বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসে স্বাভাবিক উপায়ে রোমান্সের অবতারণা যে কত দুঃসাধ্য ইহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। বর্তমান উপন্যাসে কিন্তু জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশ্বাসের ভিতর দিয়া এই রোমান্স নিতান্ত সহজ উপায়েই পারিবারিক জীবনের মধ্যে প্রবর্তিত হইয়াছে।

'বিধিলিপি'তে রোমান্স ও বাস্তবতার মধ্যে যে একটি সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে, 'শ্যামলী'তে তাহা ক্ষুন্ন হওয়ার লক্ষণ পাওয়া যায়। ইহার আদর্শবাদ অতিরঞ্জিত হইয়া বস্তুতন্ত্রতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। অনিলের বিরাট্ আত্মোৎসর্গ ও রেবার নীরব, অবিচলিত ধৈর্য—এই দুই-এর মধ্যেই অতিরেকের অস্বাভাবিকতা আছে। বিশেষতঃ, রেবা উপন্যাসের মধ্যে একটি অতর্কিত আবির্ভাব—রাস্তার কুড়ান মেয়ে না অনিলদের সংসারে না উপন্যাস মধ্যে—কোথাও নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। অনিলের প্রতি তাহার ভালবাসা কিরূপে এত দৃঢ়মূল হইল তাহার কোন ব্যাখ্যা উপন্যাস-মধ্যে মিলে না। রেবার চরিত্রও ভাল করিয়া ফুটে নাই, তাহার ব্যক্তিত্ব, তাহার নীরব সহিষ্ণুতা ও জীবনব্যাপী আত্মোৎসর্গের অন্তরালে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। আসল কথা অনিল ও রেবা আদর্শ-জগতের জীব; আমাদের সাধারণ পারিবারিক আবেষ্টনের মধ্যে তাহারা ঠিক জীবন্ত হইয়া উঠে নাই। উপন্যাস-মধ্যে যাহা ফুটিয়াছে তাহা প্রেমের প্রভাবে অর্ধজড় শ্যামলীর মধ্যে মায়ামমতা-ও-সূক্ষ্ম-অনুভূতিপূর্ণ নারী-হৃদয়ের অপ্রত্যাশিত স্ফুরণ। মূক হৃদয়ের অব্যক্ত হাহাকার, প্রকাশের পথ খুঁজিবার একটা ব্যাকুল প্রয়াস, শব্দময় জগৎকে চক্ষু দিয়া অনুভব করিবার একটা প্রচণ্ড, ক্লান্তিকর চেষ্টা, তাহার অতি সামান্য কারণে উত্তেজিত, দুর্দমনীয় মনো-বিপ্লব—অসম্পূর্ণ, প্রকৃতি-বিড়ম্বিত জীবনের সমস্ত ক্ষুন্ন অভাব-বোধের একটি চমৎকার কবিত্বপূর্ণ, অথচ মনস্তত্ত্ব-

বিশ্লেষণের দিক্ দিয়া নিখুঁত চিত্র উপন্যাসটির গৌরব-বর্ধন করিয়াছে। প্রকৃতির অসংখ্য বাণী, মানব-হৃদয়ের অগণ্য ভাব-প্রবাহ, সমাজ-জীবনের সমস্ত জটিল ব্যবস্থা ও কঠোর অনুশাসন কিরূপ বক্রপথে, কিরূপ খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ অর্ধোক্তির আকারে ভাষাহীনতার অতলস্পর্শ গহ্বরে প্রতিধ্বনিত হয়, এই অন্ধকারময়, আঁকা-বাঁকা সুরঙ্গপথের মধ্য দিয়া কিরূপে প্রেমের সর্বজয়ী আলোক বিচ্ছুরিত হয়, প্রেমের মায়া-স্পর্শে কিরূপে সমস্ত সুপ্ত, জড়িমা-গ্রস্ত প্রবৃত্তি ও অনুভূতিগুলি দুঃস্বপ্নাভিভূত নিদ্রা হইতে জাগিয়া ধীরে ধীরে মুকুলিত হইয়া উঠে—এই চিত্ত-বিকাশের একটা পরিপূর্ণ, সমৃদ্ধ বিবরণ আমাদের বিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। উপন্যাস-মধ্যে এক শ্যামলী-চরিত্রই বাস্তবতার মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে, অথচ তাহার অবস্থা-বৈশিষ্ট্যই তাহাকে কতকটা রোমান্সের অসাধারণত্ব আনিয়া দিয়াছে।

'দিদি' নিরুপমা দেবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ইহার বিষয় গার্হস্থ্য উপন্যাসের খুব সাধারণ, চির-পরিচিত ব্যাপার—দাম্পত্য মনোমালিন্য। কিন্তু এই সাধারণ বিরোধের চিত্রটি এরূপ ব্যাপকভাবে, এরূপ সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের সহিত অঙ্কিত হইয়াছে যে, উপন্যাস-সাহিত্যে ইহা একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য অমরের সহিত চারুর বিবাহ-ব্যাপারটা কতকটা আকস্মিকভাবে ও অবিশ্বাস্যভাবে সংঘটিত হইয়াছে। দেবেনের নিকট বিবাহ-ব্যাপার অপ্রকাশ, সুরমার সহিত অপরিচয়, চারুকে একাকিনী কলিকাতার বাসায় রাখিয়া তাহার মনে প্রণয়-সঞ্চারের অবসর-প্রদান, চারু-সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপার বাড়ি হইতে গোপন রাখা—এই সমস্ত ঘটনা-বিন্যাসের মধ্যে যে একটু কষ্ট-কল্পনা, একটু সম্ভাবনীয়তার অভাব আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এইটুকু ত্রুটি মানিয়া না লইলে উপন্যাসটির ভিত্তি-ভূমিই রচিত হয় না। এই সূচনার পর হইতে অমর, সুরমা ও চারু এই তিন জনের পরস্পর-সম্পর্কের মধ্যে যে জটিল ঘাত-প্রতিঘাতের জোয়ার-ভাটা চলিয়াছে তাহার বিশ্লেষণ একেবারে অতুলনীয়, সকল দিক্ দিয়াই অনবদ্য। এই বিরোধের পরিবর্তন-স্তরগুলি যেমন সূক্ষ্ম অনুভূতির সহিত লক্ষিত হইয়াছে, তেমন দৃঢ়, অকম্পিত রেখা-বিন্যাসের দ্বারা পৃথকীকৃত হইয়াছে।

অমরের সহিত সুরমার প্রথম পরিচয়ের উপরই কেমন একটা বক্র শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। সুরমার মধ্যে অন্য সদ্‌গুণ যাহাই থাকুক, নব-বধূ সুলভ লজ্জা-সংকোচের একান্ত অভাব ছিল। প্রথম হইতেই তাহার ব্যবহারে একটা কর্তৃত্বাভিমানের সুর, একটা অসংকোচ বৈষয়িক আলোচনার ভাব মাথা উঁচু করিয়া প্রেমের মধুর রঙ্গিন স্বপ্নাবেশকে টুটাইয়া দিয়াছে। অমরও নিজ ব্যবহারের মধ্যে অপরাধীর লজ্জিত অনুতপ্ত ভাব ফুটাইতে পারে নাই; একটা স্পর্ধিত উপেক্ষার সুর তাহাদের কথাবার্তার মধ্যে প্রকট হইয়া স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান বিস্তৃততর করিয়াছে।

তারপর পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে আমন্ত্রিত হইয়া অমর ও চারু দীর্ঘ-নির্বাসনের পর পিতৃগৃহে পুনঃপ্রবেশ করিয়াছে। অমর পিতার প্রতি ব্যবহারের জন্য অনুতাপ ও আত্ম-গ্লানিতে পূর্ণ; কিন্তু পত্নীর সম্বন্ধে সে যে দারুণ অবিচার করিয়াছে সে বিষয়ে সে একেবারেই উদাসীন। হরনাথবাবু চারুকে সুরমার হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন, কিন্তু পুত্র-পুত্রবধূর মধ্যে কোন একটা আপোষ-নিষ্পত্তি করিবার আশু প্রয়াস করেন নাই। তিনি ভবিষ্যৎ কালের উপর এই নিদারুণ হৃদয়ক্ষত উপশমের ভার দিয়াই চলিয়া গেলেন; তিনি তাঁহার মানব-চরিত্রাভিজ্ঞতা

হইতে বুঝিয়াছিলেন যে, এই গভীর মালিন্যরেখা মৃত্যু-পথ-যাত্রীর একটা ইচ্ছা-প্রকাশে মাত্র মুছিবার নহে। সেইজন্য অপরাধী পুত্র-সম্বন্ধে তিনি বধূকে কোন অনুরোধ করেন নাই। সুরমা চারুকে নিজ স্নেহময় ক্রোড়ে টানিয়া লইল, কিন্তু অমরের সহিত তাহার আলাপ কেবল পিতার চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ রহিল।

হরনাথবাবুর মৃত্যুর পরে সুরমার ব্যবহার আবার পরিবর্তিত হইল। সে অমর ও চারুর সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল ও সংসারের কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিল। সাংসারিক বিশৃঙ্খলা-নিবারণের জন্য অমর তাহাকে অনুরোধ করিতে গিয়া উপেক্ষা ও অবহেলা লাভ করিল। কেবল চারু তাহার স্বভাবসিদ্ধ সরলতা ও নির্ভরশীলতার গুণে সুরমার ঔদাসীন্যের বর্ম ভেদ করিয়া তাহার হৃদয়মধ্যে চিরস্থায়ী আসন করিয়া লইল, সুরমা তাহার স্নেহময়ী দিদিতে রূপান্তরিত হইল। ইতিমধ্যে অমরের সাংসারিক অব্যবস্থার প্রতিষেধজন্য সুরমা আবার কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিল এবং অমর ও চারুর হিতৈষী বন্ধু হিসাবে তাহাদের সাহচর্য করিতে লাগিল। এইবার সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল যে, সে অমরের সহিত ব্যবহারে কোন সংকোচ দেখাইয়া তাহাদের পূর্বসম্বন্ধের বেদনাময় স্মৃতি আর জাগাইয়া রাখিবে না।

এইবার অমরের পরিবর্তনের পালা শুরু হইল। সে সুরমার স্বার্থলেশশূন্য ব্যবহারে তাহার প্রতি একটা বিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা অনুভব করিতে লাগিল, এবং এই শ্রদ্ধার ভিতর দিয়া অনুতাপব্যথার বিদ্যুৎ-চমক প্রেমের গোপন সঞ্চারের সাক্ষ্য দিল। অতুলের গুরুতর অসুখে সুরমার অক্লান্ত সেবা অমরকে তাহার দিকে আরও প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিল। অমরের অন্যমনা চিন্তিত ভাব তাহার প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় দিতে লাগিল। শেষে সে আত্মদমন-শক্তি হারাইয়া পলায়নে বিপদের হাত হইতে অব্যাহতি খুঁজিল। মুঙ্গেরে রোগ-শয্যায় অপ্রকৃতিস্থ মস্তিষ্কের বিকারের মধ্য দিয়া তাহার এই অস্থিমজ্জাগত, দৃঢ়মূল অনুরাগ অস্বাভাবিক তীব্রতার সহিত ফুটিয়া বাহির হইল। শেষে একদিন তাহার ব্যাকুল প্রেমনিবেদনের উত্তরে সুরমা তাহাকে কঠোর আঘাত দিতে বাধ্য হইল—সে অমরের সহিত ক্ষীণতম সম্পর্কও অস্বী-কার করিয়া কেবলমাত্র চারুর সহিত সম্পর্কের জন্যই তাহার সহিত মেলামেশা করে ইহা স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিল। আরও কয়েকদিন পরে সুরমা অমরের নিকট চিরবিদায় লইল।

ইহার পর উপন্যাসের দ্বিতীয়-ভাগে গল্পের ঘটনাস্থল ও পাত্র-পাত্রীর পরিবর্তন হইল। সুরমার পিত্রালয়ে, নূতন আবেষ্টন ও লোকজনের মধ্যে সুরমার সমস্যা-সংকুল জীবনের ধারা শীর্ণ গতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে চারুর পত্রে, তাহার স্নেহপূর্ণ, দুঃখিত অনুযোগে, অতুলের অপরিবর্তিত ভালবাসায় ও একবার চারুর অপ্রত্যাশিত আগমনে পুরাতন জীবনের সহিত যোগসূত্র কোনও রকমে বজায় রহিল বটে, কিন্তু মোটের উপর দ্বিতীয় খণ্ডে একটা নূতন জীবন-ধারার প্রবর্তন হইল। প্রকাশ ও উমা এখন সুরমার প্রধান স্নেহপাত্র ও ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু ইহারাও তাহার চিরন্তন সমস্যার জালে জড়িত হইয়া পড়িল। বাল-বিধবা, সরলতার প্রতিমূর্তি উমার প্রতি প্রকাশের স্ফুটনোন্মুখ অনুরাগ সুরমা নির্মমভাবে দলিয়া পিষিয়া নষ্ট করিয়া দিল বটে, কিন্তু এই নিষ্ঠুর উন্মূলন তাহার মনকে বেদনাসিক্ত ও অশ্রুসিঞ্চিত করিয়া প্রেমের বিকাশের জন্য প্রস্তুত করিয়াছে। প্রকাশও বাল্য-বন্ধুর অধিকারে সুরমার কার্যের অপক্ষপাত সমালোচনার দ্বারা তাহার কোমলতাহীন,

শুষ্ক বিচার করিবার প্রবৃত্তি, প্রবল আত্মাভিমান, ইত্যাদি দোষ-ত্রুটির প্রতি তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। মন্দাকিনীর একান্ত কুণ্ঠিত, আত্মসুখ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, প্রতিদান-অনপেক্ষী স্বামিসেবাও সুরমার মোহভঙ্গে সহায়তা করিয়াছে। তথাপি সুরমা প্রাণপণ শক্তিতে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে। এই অবিশ্রান্ত ঘাত-প্রতিঘাতে সে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে,বিরাট্ বিশ্বজোড়া শ্রান্তি তাহার বুকে চাপিয়া বসিয়াছে; উদ্দেশ্যবিহীন জীবনের বোঝা তাহার পক্ষে দুর্বহ হইয়াছে, তাহার সবল, আত্মনির্ভরশীল প্রকৃতি একটা আভ্যন্তরীণ দুর্বলতায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অবশেষে নদীস্রোতে খাতমূল তীরতরুর ন্যায় তাহার প্রবল আত্মাভিমানের উচ্চমন্দির ধূলিসাৎ হইয়াছে। কাশীতে চারুর সহিত বার কয়েক দেখা-সাক্ষাৎ হইয়া সে নিজ দুর্বলতা বুঝিয়া অমরের সান্নিধ্য হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু শেষবারে প্রকাশ ও মন্দার সহিত শ্বশুরবাড়ি গিয়া বিদায়মুহূর্তে সে তাহার পূর্বকৃত অস্বীকার প্রত্যাহার করিয়া অভিমানে জলাঞ্জলি দিল। অভিমান যে স্বীকারোক্তির কণ্ঠরোধ করিয়া সত্যসম্বন্ধকে মানিতে চাহে নাই, নবাঙ্কুরিত প্রেম ও নব-জাগ্রত কর্তব্যবুদ্ধি সেই মিথ্যাদম্ভ-প্রসূত বাধা ঘুচাইয়া আজ স্বামি-স্ত্রীর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া লইল। প্রথম বিদায় দিনের অসমাপ্ত ও অপ্রকৃত উত্তর আজ সংশোধিত হইয়া সমাপ্ত হইল। অশ্রুজলসিক্ত পুনর্মিলনের মধ্যে দীর্ঘবিচ্ছেদের অবসান হইল।

এই উপন্যাসটির বিশ্লেষণ-কুশলতা সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। অমর ও সুরমার ভাব-বিপর্যয়ের স্তরগুলি অতি চমৎকারভাবে দেখান হইয়াছে। তাহাদের কথাবার্তা ও ব্যবহার অতি নিপুণভাবে তাহাদের পরিবর্তনশীল সূক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাতগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। চরিত্রগুলি সমস্তই বেশ সজীব হইয়াছে—অমর, চারু, উমা, মন্দা, প্রভৃতি সকলেই যেন আমাদের চিরপরিচিত প্রতিবেশীর মত। সুরমার মত এমন সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে পরিকল্পিত, প্রতি অঙ্গভঙ্গীতে জীবন্ত, প্রাণের নিগূঢ় স্পন্দনে লীলায়িত চরিত্র বোধ হয় বঙ্গ-উপন্যাসে নারী-জগতে দুর্লভ। তাহার মনের প্রত্যেক অলি-গলি, তাহার ব্যক্তিত্বের সূক্ষ্মতম স্ফুরণ পর্যন্ত আমাদের অনুভূতির নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট ও ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সহিত তুলনায় বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের যে কোন নায়িকা যেন বাহির হইতে দেখা স্বল্প-পরিচিত জীব বা কবি-কল্পনার কল্পলোকের অধিবাসী বলিয়া মনে হয়। শরৎচন্দ্রের নায়িকারা অবশ্য খুব গভীর উপলব্ধির ও পরিকল্পনার সাক্ষ্য দেয়; কিন্তু অবস্থার অসাধারণত্বই প্রধানতঃ তাহাদের সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের হেতু বলিয়াই যেন তাহারা যে বায়ুমণ্ডলে নিঃশ্বাস গ্রহণ করে তাহাতে oxygen-এর একটু মাত্রাধিক্য মনে হয়। ব্যায়াম বা দৈহিক কসরতের সময় অবশ্য পেশীগুলি ফুলিয়া উঠিয়া স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু সাধারণ জীবনযাত্রার ধীর, স্বল্পোত্তেজিত গতিবিধিতে যে অঙ্গ-সৌষ্ঠব ফুটিয়া উঠে তাহা সহজ বলিয়াই আরও মনোহর। সুরমা-চরিত্র এই সহজ, সাবলীল অঙ্গ-সৌষ্ঠবে মনোজ্ঞ, জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত স্বচ্ছন্দগতিতে প্রাণময়।

(৬)

অনুরূপা দেবীর উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্ততঃ তিনখানি—'মন্ত্রশক্তি', 'মহানিশা' ও 'পথহারা'

প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষের দাবী করিতে পারে। 'গরীবের মেয়ে'-র স্থান ইহাদের কিছু নিম্নে। অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে 'মা' ও 'বাগ্‌দত্তা' মন্তব্যের অতি-প্রাচুর্যে কতকটা অযথা ভারাক্রান্ত হইলেও মোটের উপর উচ্চশ্রেণীর। 'চক্র' ও 'হারাণো খাতা'তে ঘটনা-বিন্যাসের জটিলতা চরিত্র-বিশ্লেষণকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। 'পোষ্যপুত্র' ও 'জ্যোতিঃহারা' উপন্যাসোচিত বিশিষ্ট গুণে সমৃদ্ধ বলিয়া মনে হয় না—ঘটনার চাপে চরিত্র-বিকাশের সতেজ স্ফূর্তি প্রতিহত হইয়াছে। 'রামগড়' ও 'ত্রিবেণী'—অনুরূপা দেবীর ঐতিহাসিক উপন্যাসদ্বয়—সম্পূর্ণ পৃথক্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এইবার উপন্যাসগুলির উল্লেখের বিপরীত-ক্রমে উহাদের বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রতি লেখিকার ঠিক স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল, তাহা বলা যায় না —সামাজিক উপন্যাসই তাঁহার শক্তির প্রকৃত ক্ষেত্র। সুতরাং 'রামগড়' উপন্যাসে তিনি অনেকটা জোর করিয়াই অপরিচিত রাজ্যে পদক্ষেপ করিয়াছেন। ভারতের ইতিহাসকে কল্পনা-সাহায্যে পুনর্গঠন করা ও তাহার বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন রন্ধ্র পূরণ করিয়া তাহাতে প্রাণসঞ্চার করা যে নিতান্ত কঠিন কার্য তাহা সমালোচক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। প্রাচীন যুগের সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ পরিচয় থাকিলে তাহার সাধারণ জীবনযাত্রার মৃদু স্পন্দন ও অসাধারণ উচ্ছ্বাসের চঞ্চল গতিবেগ অনুভব করা যায়, বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও সেরূপ পরিচয়ের একান্ত অভাব। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বৌদ্ধযুগ অবলম্বনে উপন্যাস লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে ইতিহাসের শুষ্কপঞ্জরে প্রাণ-সংযোগ হয় নাই, অনিপুণ-বিন্যস্ত তথ্যের পাষাণ-স্তূপ ভেদ করিয়া উপন্যাসোচিত রসধারা প্রবাহিত হয় নাই। এরূপ অবস্থায় অনুরূপা দেবীও যে সম্পূর্ণরূপে সাফল্যলাভ করেন নাই তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। তথাপি এই উপন্যাসে প্রাচীন যুগের অসাধারণ উত্তেজনা ও সংঘর্ষের তরঙ্গভঙ্গ অনেকটা পাঠকের অনুভব-গম্য হয়।

'রামগড়' উপন্যাসটি বৌদ্ধযুগে প্রবল সার্বভৌম সম্রাট্ কোশল-পতির সহিত ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র-মূলক রাজ্যের নায়ক লিচ্ছবি ও শাক্য-রাজবংশীয়দের বিরোধের ইতিহাস। এই বিরোধ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, অপাত্র-ন্যস্ত ও ব্যর্থকাম প্রণয়জ্বালা হইতেই ধূমায়িত হইয়াছে। ইন্দ্রজিৎ, পুষ্পমিত্র, বসন্ত-শ্রী, শুক্লা, অমিতা, সুদক্ষিণা—সকলেই এই ব্যর্থ প্রণয়ের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হইয়াছে ও রাজনৈতিক বিপ্লব প্রজ্বলিত করিতে নিজ জ্বালাময় হৃদয়ের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রেরণ করিয়াছে। অবশ্য প্রাচীন ও মধ্যযুগে, প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্ত্যে এই উভয় মহাদেশেই, বিবাহ ও বংশাভিমান রাজনৈতিক সমস্যাকে ঘনাইয়া তুলিবার একটা মুখ্য কারণ ছিল। কিন্তু তথাপি মনে হয় যে, বর্তমান উপন্যাসে প্রণয়ের রাজনৈতিক মর্যাদা একটু অযথা-রকম বাড়াইয়া তোলা হইয়াছে। মোট কথা ট্র্যাজেডির সমস্ত উপাদান এই অল্প্যংক্ষেপে যথাযথ বিন্যস্ত হইয়াছে। অত্যাচারী ও অত্যাচারিত উভয়ের সহযোগিতায় ইহা প্রজ্বলিত হইয়াছে। সুরজিতের শুক্লা সম্বন্ধে স্বার্থান্ধ ঔদাসীন্য, ইন্দ্রজিতের দানবোচিত জিঘাংসাবৃত্তি, পুষ্পমিত্রের রূপোন্মাদনা, বিরূঢ়কের মদোদ্ধত সাম্রাজ্য-গর্ব, বসন্ত-শ্রীর ঈর্ষাকলুষিত দৃষ্টিহীনতা—এই সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিই মহাকালের রুদ্রনৃত্যে নিজ নিজ গতিবেগ সঞ্চারিত করিয়াছে।

চরিত্র-চিত্রণ ও ঘটনা-বিন্যাসের দিক্ দিয়া উপন্যাসটির মধ্যে অনেক ত্রুটি, অপূর্ণতা আবিষ্কার করা যায়। ইন্দ্রজিতের চরিত্রে দানবোচিত নৃশংসতা ছাড়া আর কোনও উচ্চতর

মনোবৃত্তির পরিচয় মিলে না। শুক্লার চরিত্রও মোটেই ফোটে নাই—পুষ্পমিত্রেরও অতর্কিত পরিবর্তন ঠিক বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। মোট কথা, এ সমস্ত চরিত্রই রোমান্স রাজ্যের অধিবাসী, কতকগুলি চির-প্রথাগত নির্দিষ্ট ধারার অনুবর্তনকারী; তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব-দ্যোতক কোন গুণের বিশ্লেষণ-চেষ্টা নাই। বরং বসন্ত-শ্রীর ঈর্ষাবিকৃত চিত্তদাহ ও অমিতার কোমল, আত্মসমর্থনে অপটু সলজ্জতার মধ্যে কতকটা বাস্তবতার পরিচয় মিলে। সুদক্ষিণার তিতিক্ষা ও আত্মনিগ্রহও অমানুষিক, বিশ্লেষণের মানদণ্ড দিয়া তাহার বিচার চলে না। উপন্যাসের প্রকৃতি-বর্ণনাগুলিও অত্যন্ত উচ্ছ্বাসময় ও কাব্যগন্ধী; বাস্তব প্রতিবেশ হিসাবে তাহাদের কোন মূল্য নাই; উপন্যাস-মধ্যে একমাত্র বাস্তব চিত্র কোশল-রাজের রাজসভার বর্ণনা—সেখানে সভাসদদের মধ্যে স্তাবকতার নির্লজ্জ প্রতিযোগিতার চিত্রটি বাস্তবরসে সমৃদ্ধ হইয়াছে। ইন্দ্রজিতের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও নব নব উদ্ভাবন-শক্তিই তাহাকে মামুলি চাটুকারদের সহিত তুলনায় রাজপ্রসাদের পথে অগ্রবর্তী করিয়াছে। যথেচ্ছাচারী ক্ষমতাদৃপ্ত রাজার সংসর্গ যে কিরূপ ভয়াবহ, তাহার অনুগ্রহ-নিগ্রহ যে কতই পরিবর্তনশীল, সভাসদদের প্রাণ ও মান কত সূক্ষ্ম সূত্রের উপর ঝুলিয়া থাকে, এই দৃশ্যগুলিতে তাহার চমৎকার বিবরণ মিলে।

এই উপন্যাসের আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে বৌদ্ধ জগতের কেন্দ্রস্থল ও মধ্য-মণি গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু উপন্যাস-মধ্যে তাঁহার প্রভাব সেরূপ লক্ষণীয় নহে। তাঁহার নিষ্ক্রিয়তা ও সংসার-বৈরাগ্য তাঁহাকে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে উদাসীন দর্শকশ্রেণীভুক্ত করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম বীরত্বের ও আত্মনির্ভরশীল পৌরুষের পরিপন্থী বলিয়া ইহা রাজনৈতিক জগতে একটা অবজ্ঞা-মিশ্রিত অনুকম্পার পাত্র হইয়াছে—তবে মোটের উপর সামাজিক জীবনে ইহা একটা সংকুচিত আশ্রয় লাভ করিয়াছে। রাজরোষানলের নির্মম নির্যাতন ইহাকে সহ্য করিতে হয় নাই। রাজসভাসদ্ ও সৈন্যাধ্যক্ষের মধ্যে অনেকেই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন—ইহা লইয়া রাজা মাঝে মাঝে তাঁহাদের উপর বিদ্রূপ-কটাক্ষ করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাজশক্তির ও প্রজাসাধারণের এই বিশেষ মনোভাব ঠিক ইতিহাসসম্মত কি না তাহা ঐতিহাসিকের বিচারের বিষয়।

'ত্রিবেণী' (১৯২৮) উপন্যাসে বাঙ্গালার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধ্যায় লেখিকার আলোচনার বিষয় হইয়াছে। পালবংশীয় মহীপাল দেবের অত্যাচার ও কুশাসনের বিরুদ্ধে বাঙ্গালার প্রজাশক্তির অভ্যুত্থান ও তাহাদেরই প্রতিনিধি দিব্যোক ও ভীম কৈবর্তরাজের সিংহাসনাধিরোহণ—বাঙ্গালার ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা। ইতিহাসের পিছনে প্রজাসাধারণের যে মনোভাব প্রচ্ছন্ন থাকিয়া রাজনৈতিক পরিবেশের আসল প্রেরণা যোগায়, একবার মাত্র তাহা যবনিকার অন্তরাল হইতে বাহিরে আসিয়া সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং জনসাধারণের এই বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি ফুটাইয়া তোলাই এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্মকথা। লেখিকা এই দুরূহ কার্যে বিশেষ সফল হইয়াছেন বলা যায় না। দাম্পত্য প্রেমের গোলাপ জল দিয়া বিপ্লবের বিস্ফোরক উপাদান গঠিত হয় না। উপন্যাসে ভীমের পারিবারিক জীবনের উপরই অত্যধিক জোর দেওয়া হইয়াছে—প্রজাশক্তির সংঘবদ্ধতা ও তাহাদের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রবল ইচ্ছার স্ফুরণের কোন বিশ্বাসযোগ্য বিবৃতি দেওয়া হয় নাই। দশম-একাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী জাতিহিসাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নবজন্ম লাভ

করিয়াছে—সেই আমাদের অতি প্রাচীন পূর্বপুরুষগণ কেমন ছিলেন তাহা অনুমান করিবার কল্পনাশক্তিও আমাদের নাই। অন্ততঃ তাঁহারা যে আমাদের মত কর্মবিমুখ, বাক্‌সর্বস্ব ও গার্হস্থ্য জীবনের সংকীর্ণ-সীমাবদ্ধ ছিলেন না ইহা স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরিয়া লওয়া যায়। যে দিব্যোক ও ভীম রাষ্ট্রবিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া প্রবল রাজশক্তির উচ্ছেদসাধন করিয়াছিলেন ও অবলীলাক্রমে নূতন শাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবন যে শুধু জাল বাহিয়া ও পারিবারিক ক্ষুদ্র সংঘর্ষের মৃদু উত্তেজনার মধ্যেই অতিবাহিত হয় নাই তাহা জোর করিয়া বলা চলে। কৈবর্ত রাজদ্বয়ের সাংসারিক ও রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে যে প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ অনুভূত হয়, লেখিকা তাহা পূরণ করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। বাঙালী জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার মধ্যে যে সতেজ রাষ্ট্রচেতনা না থাকিলে তাহাদের পক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ গণ-আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়া সম্ভবপর হইত না, উপন্যাসে তাহারও কোন আভাস মিলে না। প্রতিবেশ-রচনায় অসাফল্যই উপন্যাসের প্রধান ত্রুটি।

অবশ্য লেখিকা যে সেই সুদূর অতীতের যুগোচিত বৈশিষ্ট্য ফুটাইতে চেষ্টা করেন নাই তাহা নয়। বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের পাশাপাশি অবস্থান, সমাজ-জীবনে বিলাসের আধিক্য ও নটীর প্রাধান্য, রাজ-প্রাসাদে ভ্রাতৃ-বিরোধ ও মূলতঃ রাজনৈতিক প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত বিবাহে দাম্পত্য সহৃদয়তার অভাব, রাজশক্তির অপ্রতিহত যথেচ্ছাচার, এমন কি রাজনর্তকীর মুখে প্রাকৃত-ভাষায় রচিত গানের আরোপ—এই সমস্তই অতীত যুগের প্রতিচ্ছবি পাঠকের মনে মুদ্রিত করার প্রয়াস। তথাপি বোধ হয় যেন ইহারা অতীতের ইতিহাস-সৌধের গৃহসজ্জার উপকরণ মাত্র—ইহাদের মধ্যে চিত্র-সৌন্দর্য আছে, জীবন-স্পন্দন নাই। সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে প্রাণশক্তির মূল যে গভীর স্তরে প্রোথিত থাকে, লেখিকা ততদূর পর্যন্ত পৌছাইতে পারেন নাই। রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি উভয়কেই তুল্যরূপে শূন্যগর্ভ বলিয়া মনে হয়—একটি যেন বিলাসস্ফীত বুদ্‌বুদ্‌ মাত্র, অপরটি যেন ইন্দ্রজাল-সৃষ্ট অমূল তরু। একের পতন ও অপরের প্রতিষ্ঠা উভয়েই যেন ভোজবাজির আকস্মিকতার লক্ষণাক্রান্ত। যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনায় প্রাণ-হীন গতানুগতিকতাও আদর্শগত কোন স্পষ্ট-ধারণা না থাকার স্বাভাবিক ফল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী', 'যবন-বিপ্লব' শীর্ষক অধ্যায়ের অগ্নি-জ্বালাময় অনুভূতির অনুরূপ কিছু এ-উপন্যাসে নাই।

এই প্রতিবেশগত অস্পষ্টতা বাদ দিলে কতকগুলি দৃশ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের উপযুক্ত উন্মাদনার, বীরত্বপূর্ণ, উচ্চ-আদর্শ-প্রভাবের পরিচয় দেয়। উজ্জ্বলার আত্মহত্যায় মহীপালের উন্মনা, অনুতাপ-ক্লিষ্ট মনোভাব, দিব্যোকের সনাতন রাজভক্তির প্রত্যাখ্যান-মুহূর্তে অগ্নি-জ্বালাময় অন্তর্বেদনা, পট্টমহাদেবীর দুষ্কৃতকারী স্বামীর প্রতি অবিচলিত ভক্তিনিষ্ঠা, ভীমের বৈরাগ্যধূসর চিত্তের অনমনীয় দৃঢ়তা ও রামপালদেবের প্রগাঢ়, অতুলনীয় মহানুভবতার দৃশ্য-গুলি স্মৃতির উপর স্থায়ী রেখায় অঙ্কিত হয়। চরিত্র-পরিকল্পনাও মোটের উপর সুষ্ঠু হইয়াছে। রাজপরিবারের চরিত্র-চিত্রণ সনাতন আদর্শেরই অনুবর্তন করিয়াছে—তবে রামপালের অন্তর্দ্বন্দ্ব তাহার গোষ্ঠীপরিচয়কে অতিক্রম করিয়া তাহার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে স্ফুটতর করিয়াছে। দিব্যোক ও ভীমের চরিত্র-বিকাশ ও পরিণতি অনেকটা অস্পষ্টই রহিয়া গিয়াছে—মৎস্য-জীবীর সাম্রাজ্য-স্রষ্টায় পরিবর্তনের ঘটনা-মূলক বিবৃতি ছাড়া অন্তর্লোকের রহস্য-উদ্‌ঘাটনের

কোন চেষ্টা হয় নাই। প্রকৃতি-বর্ণনা ও ভাব-গভীর অন্তর্বিক্ষোভের আলোচনা বাগাড়ম্বর ও পরিমিতিহীন মন্তব্য—বিশ্লেষণের গুরুভারে ক্ষুণ্ণ ও ব্যাহত হইয়াছে।

(৬)

অনুরূপা দেবীর সামাজিক উপন্যাস-সমূহের মধ্যে 'পোষ্যপুত্র' কাঁচা হাতের রচনা। জমিদার পুত্র বিনোদকুমারের স্নেহবুভুক্ষু অভিমানপ্রবণতা উপন্যাসটির সমস্ত ক্রিয়ার মৌলিক শক্তি (motive force). সে পিতার উপর তুচ্ছ কারণে অভিমান করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়াছে ; কৃতজ্ঞতাকে ভালবাসা বলিয়া ভ্রম করিয়া শিবানীকে বিবাহ করিয়াছে। তারপর সে যাহা করিয়াছে তাহা ভদ্রসন্তানের সম্পূর্ণ অযোগ্য—একটা অমানুষিক হৃদয়হীনতার নিদর্শন। সে পত্রদ্বারা নিজ আসন্ন মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিয়াছে, আরোগ্যলাভের পর একটা আশ্বাস-সূচক সংবাদ পর্যন্ত দেয় নাই। তাহার খামখেয়ালী চরিত্র প্রত্যেক ধাক্কায় এক একটা অতর্কিত পরিবর্তনের মোড় ফিরিয়াছে। দারুণ অভিমানপ্রবণতা ও দুর্ভেদ্য আত্মগোপনশীলতা তাহার চরিত্রের প্রধান উপাদান ; মোটের উপর তাহার চরিত্রে কোন বিশ্লেষণ-গভীরতা নাই ও উহা আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে না।

অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যেও এই বিশ্লেষণ-গভীরতার অভাব দেখা যায়। স্নেহদুর্বল শ্যামাকান্ত, দৃঢ়চেতা রজনীনাথ, ব্রীড়াসংকুচিতা শান্তি, উদ্ধতপ্রকৃতি পোষ্যপুত্র হেমেন্দ্র—সকলের সম্বন্ধেই এই মন্তব্য খাটে। কেবল শিবানীর প্রস্তর-কঠিন, প্রকাশ-বিমুখ চরিত্রটির মধ্যে অপেক্ষাকৃত গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। গৌণ চরিত্রদের মধ্যে সিদ্ধেশ্বরী অত্যন্ত সজীব হইয়াছে, তাহার কর্কশ কলহ-প্রিয়তা তাহার মেয়েজামাই-এর প্রতি স্বাভাবিক স্নেহকেও একটা বক্র, বিরুদ্ধ গতি দিয়াছে।

উপন্যাসের নামকরণের যৌক্তিকতা সম্বন্ধেও একটা সংশয় জাগে। উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক বিনোদ—হেমেন্দ্র নহে।

'জ্যোতিঃহারা' উপন্যাসটির পরিণাম লেখিকার কোন এক শ্রদ্ধাস্পদ আত্মীয়ের অনুরোধে, বিয়োগান্ত হইতে মিলনান্তে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, উপন্যাসের বর্ণিত ঘটনাগুলির কোন অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নাই, লেখিকার ইচ্ছানুসারে তাহাদের মোড় ফিরান যাইতে পারে। এই যদৃচ্ছা-প্রবর্তিত পরিবর্তন উপন্যাস বা নাটকের পক্ষে একটা অপকর্ষের নিদর্শন বলিয়া গণ্য হয়। বাস্তবিকই, ইহার বিশুদ্ধ ঔপন্যাসিক গুণ খুব উচ্চাঙ্গের বলিয়া মনে হয় না। যামিনী ও অণিমার মিলনে যে কোন স্বাভাবিক অলঙ্ঘনীয় বাধা আছে তাহা লেখিকা সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই।

অণিমা যামিনীকে প্রত্যাখ্যান করার পর হঠাৎ তাহার জীবনের সমস্ত প্রয়োজন, সমস্ত রুচি ও স্বাদ হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার গ্রন্থ-পাঠ, নাস্তিক্যবাদের আলোচনা, তাহার পরহিতব্রত কিছুই যেন তাহার অবলম্বনহীন জীবনকে খাড়া রাখিতে পারে না। সে তাহার অত্যন্ত পরিচিত জীবনযাত্রার গণ্ডি হইতে ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিয়াছে। এই সময় যখন তাহার জীবন এক দুশ্ছেদ্য জটিলতাজালে জড়াইয়া পড়িয়াছে, তখন গ্রন্থিচ্ছেদন করিবার জন্য এক দীর্ঘকাল অনুপস্থিত, ভক্তিপ্রবণ দাদামহাশয়ের প্রয়োজন হইয়াছে। তিনি নিজ স্বাভাবিক সহানুভূতি ও সূক্ষ্মদৃষ্টির বলে সহজেই অণিমার হৃদয়-সমস্যা বুঝিয়া লইয়াছেন ও তাহার

সমাধানও করিয়া দিয়াছেন। দাদামহাশয় যখন ভ্রান্তি-নিরসন করিয়া দিলেন, তখন অণিমার মনে আর কোন বিরোধের গ্লানি রহিল না—নিষ্ফল আত্মপীড়নের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া সে তাহার নিজের ও তাহার ধৈর্যশীল, চিরসহিষ্ণু প্রণয়াস্পদের বিড়ম্বিত জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে।

'জ্যোতিঃহারা' উপন্যাসটির প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহার বিরোধ ও মিলন উভয়ই তর্কমূলক, ধর্মবিষয়ক মতভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যামিনী ও অণিমার মধ্যে যেমন কোন সত্যকার হৃদয়-গত অনৈক্য ছিল না, সেইরূপ তাহাদের আকর্ষণও অনেকটা আদর্শ-সাম্য ও চরিত্র-সংগতি হইতে উদ্ভূত; প্রেমের দুর্নিবার শক্তি তাহাদের মনের উপর ক্রিয়া করিয়াছিল কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। তাহাদের মিলনও একটা বহিঃশক্তির মধ্যস্থতায় সম্পাদিত হইয়াছে—কৃত্রিম বাধা একটা অনুরূপ কৃত্রিম উপায়ের দ্বারাই অপসারিত হইয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত ব্যাপারে হৃদয়-বৃত্তির খুব যথেষ্ট স্ফূরণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যামিনী, অণিমা উভয়েরই জীবনের উপর একটা রিক্ত ধূসরতার ছায়া সঞ্চারিত হইয়াছে। বঞ্চিত প্রেমের ফাঁক পূরণের জন্য তাহারা যে শিক্ষা-বিস্তার, পরোপকার-ব্রতের ভার গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের জীবনী-শক্তি যেন মন্দীভূত হইয়া শীর্ণধারায় সুনির্দিষ্ট কর্তব্যের বাঁধা খাতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছে। আদর্শ-বিষয়ক তর্ক ও সৎকর্মের পরিকল্পনা তাহাদের জীবনের উচ্ছ্বাস-চাপল্যের উপর পাষাণ-ভারের ন্যায় চাপিয়া বসিয়াছে। বরং দুইটি অপ্রধান চরিত্রের হৃদয়ে—বরেন্দ্রকৃষ্ণ ও জ্যোৎস্নার অন্তঃকরণে—প্রেমের তীব্র বিদ্যুৎ-শিখা জ্বলিয়া উঠিয়া তাহাদিগকে প্রেমিকের প্রাপ্য অসামান্যতা আনিয়া দিয়াছে। তবে বরেন্দ্রকৃষ্ণের চিত্ত-বিশুদ্ধি ও জ্যোৎস্নার আত্ম-বিসর্জন —এ উভয়ই অনেকটা melodramatic, অতিনাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত। যামিনীর প্রতি আক্রমণও কতকটা অস্বাভাবিক—আমাদের পারিবারিক জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে যে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রের ক্ষেপ-প্রতিক্ষেপ হইয়া থাকে, বন্দুকের গুলিকে তাহাদের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত করা চলে না। মোট কথা, উপন্যাসটিতে যে সমস্যা আলোচিত হইয়াছে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে উপন্যাসোচিত গুণে সমৃদ্ধ নয়। ইহার মধ্যে এমন কোন দৃশ্য নাই যাহা উচ্চাঙ্গের ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের সাক্ষ্য দিতে পারে।

(৭)

'চক্র' উপন্যাসটি প্রেমের ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র-কাহিনীর সংমিশ্রণ। সিভিলিয়ান তরুণ লাহা তাহার প্রণয়িনী কৃষ্ণা মল্লিকের চিত্তজয়ে ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী বিনয় শীলকে রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া নিজ প্রণয়-সাধনার পথ হইতে সরাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চক্রান্ত ভেদ হইয়া আসল উদ্দেশ্যটি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তরুণের প্রণয়-সাধনায় একনিষ্ঠতা, প্রেমিক হৃদয়ের চরম ক্ষমাশীলতা ও প্রেমের আত্মলোপী আতিশয্যই বিনয়ের বিরুদ্ধে তাহার ষড়যন্ত্রের হেয়তাকে অনেকটা ক্ষালিত ও ক্ষমার্হ করিয়া তুলিয়াছে।

কৃষ্ণার পিতা ডাঃ মল্লিকের আভিজাত্য-গর্বের একটা করুণ দিক্ আছে, ইহাকে নিছক স্বার্থপ্রিয়তা ও বিলাসাসক্তি বলিয়া মনে করিতে আমাদের অন্তঃকরণ সায় দেয় না। দারিদ্র্য ও

অসহায় অন্ধত্বের মধ্যেও তিনি তাঁহার পূর্বজীবনের ঐশ্বর্য-গরিমার স্মৃতি ও ব্যবহারিক আদর্শকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন ও তাঁহার এই চিরাভ্যস্ত জীবনযাত্রা-প্রণালীর দোহাই দিয়া তিনি কন্যার সহসা পরিবর্তিত জীবনাদর্শের বিরুদ্ধে লড়িয়াছেন। কৃষ্ণার জীবনে যাহা কিছু সংশয়-জড়িমা, তাহা আসিয়াছে তাহার পিতার প্রবল প্রতিকূলতার দিক্ দিয়া; তরুণের প্রতি কর্তব্যবোধ সে সম্পূর্ণরূপেই অস্বীকার করিয়াছে। মৃতপ্রেমের সিংহাসনে কৃতজ্ঞতার প্রেতমূর্তিকে বসাইয়াও নিজ ঋণভার লঘু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই। কৃষ্ণার এই অকুণ্ঠিত নির্মমতাই পাঠকের মনে তরুণের প্রতি একটু করুণার উদ্রেক করে ও উভয়ের মধ্যে সহানুভূতির সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

গ্রন্থমধ্যে বিনয়-উর্মিলার শৈশব-চাপল্য-প্রখর, দুরন্তপনার অন্তরাল-প্রচ্ছন্ন প্রণয়লীলার চিত্রটি সর্বাপেক্ষা মধুর ও উপভোগ্য হইয়াছে। দাম্পত্যপ্রণয়ের চিরপ্রথাগত সনাতন চিত্রের সহিত ইহার কোন মিল নাই, অথচ ইহার সমস্ত দুর্ধর্ষতা ও তীব্র বিরোধের মধ্যেও আকর্ষণের গোপন গতিবিধি লক্ষ্যগোচর হয়। নিদারুণ অভিজ্ঞতার চাপে উর্মিলার চপলমতি বালিকা হইতে বিষণ্ণ-গম্ভীর যৌবনে পরিণতির চিত্রটি বেশ সুন্দর ও সুসংগত হইয়াছে।

বিনয় ও কৃষ্ণার সহকর্মিতা হইতে প্রণয়-আকর্ষণের পরিণতি বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে বিনয়ের চরিত্রটি কতকটা খর্ব করা হইয়াছে। কৃষ্ণার দিকে আকৃষ্ট হইবার সময় উর্মিলার স্মৃতি যে তাহাকে পিছন দিকে টানে নাই বা তাহার মনে কোন অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে নাই, ইহা তাহার লঘুচিত্ততার পরিচয়। মোট কথা, ইহারা উভয়েই রাজনৈতিক ঘূর্ণীপাকে আবর্তিত হইয়া তাহাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কতকটা হারাইয়াছে। সমগ্র উপন্যাসটিও অনেকটা এই দোষযুক্ত হইয়াছে—ইহাতে চরিত্রস্ফুরণ অপেক্ষা ঘটনা-বিন্যাস সমধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সেইজন্য ইহা খুব উচ্চাঙ্গের উৎকর্ষের দাবী করিতে পারে না।

'হারানো খাতা'কে অনেকটা পূর্বোক্ত পর্যায়ে ফেলা যায়। এখানেও সমস্ত কৌতূহল কেন্দ্রীভূত হইয়াছে নিরঞ্জনের আত্মগোপনের রহস্যভেদে। নিরঞ্জনের ডায়েরী হইতে তাহার মস্তিষ্কবিকার ও বিপর্যস্ত স্মৃতিশক্তির বিশ্লেষণের কতকটা চেষ্টা থাকিলেও ইহার প্রধান প্রয়োজনীয়তা হইতেছে তাহার পূর্ব জীবনের ইতিহাস সংকলনে; অর্থাৎ ইহার প্রকৃত কার্য মনস্তত্ত্বমূলক নহে, ঘটনা-স্মৃতিমূলক। নরেশচন্দ্রের সহিত পরিমলের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে যে ঘাত-প্রতিঘাত ও অসম্পূর্ণ সহানুভূতির চিত্র পাওয়া যায়, তাহা মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া গভীর না হইলেও নিখুঁত। এই দাম্পত্য বিরোধের বর্ণনা ও রাজবাড়ির পরিজনবর্গের কুৎসা ও পরনিন্দা-পূর্ণ, মুখরোচক আলাপের বিবরণটি বাস্তবতার দিক্ দিয়া বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। নরেশচন্দ্র ও সুষমা উভয়েরই ব্যক্তিত্বস্ফুরণ আদর্শবাদ ও সমাজনীতি-প্রভাবের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। সুষমা ও 'চরিত্রহীন'-এর সাবিত্রী—উভয়ের সমস্যা ও মনোভাব প্রায় একই প্রকারের; কিন্তু সাবিত্রীর ব্যক্তিত্বটি আমাদের নিকট যেরূপ স্বচ্ছ ও ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে, সুষমার ছায়াময় অস্পষ্টতার সহিত তাহার কোনই তুলনা চলে না। আদর্শ চরিত্রমাত্রই যে অবাস্তব হইবে তাহা নহে; তবে তাহার বিশ্লেষণেও বাস্তবরীতির প্রাধান্য থাকা চাই। সুষমার চরিত্র-বিশ্লেষণে এরূপ কোন প্রত্যক্ষ অনুভূতির মুদ্রাঙ্কিত বাস্তবতার পরিচয় মিলে না।

(৮)

বোধ হয় 'মা'ই অনুরূপা দেবীর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উপন্যাস। এক দিক্ দিয়া ইহার জনপ্রিয়তা খুবই যুক্তিসংগত। পৌরাণিক যুগ হইতে আমাদের মনে যে ভাবের ঝংকার বাজিতেছে, লেখিকা এই উপন্যাসে আমাদের সেই চিরপরিচিত সুরটিই জাগাইয়াছেন, যুগ-যুগান্তের প্রবণতাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। কঠোর কর্তব্যপালনের জন্য নিরপরাধা সাধ্বী স্ত্রী-পরিত্যাগের কাহিনী আমাদের সমবেদনাকে যেরূপ প্রবলভাবে আকর্ষণ করে, সেই প্রবল আকর্ষণের মূলে আছে বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের করুণা-সিক্ত, অপরূপ কবি-কল্পনা। কাজে কাজেই যে কেহ বিষয়-নির্বাচনে এই কবি-গুরুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তিনিই উত্তরাধিকারসূত্রে অতি সহজে আমাদের হৃদয়-জয় করিবার শক্তি লাভ করিয়া থাকেন। আমাদের মত ভাবাতিরেকপ্রবণ জাতিকে অতীতের উত্তুঙ্গ শিখর হইতে প্রবহমান ভাবধারা সহজেই ভাসাইয়া লইয়া যায়। বিশেষতঃ, 'মা' নামে এমন একটা মন্ত্র-শক্তি নিহিত আছে, যাহার প্রভাব কেবলমাত্র আমাদের সাহিত্যরস-বোধের রাজ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। মা যে কেবল আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের কেন্দ্র, কেবল যে তাহার সমস্ত স্নেহ-মমতা-ভক্তিধারার উৎস ও প্রতীক তাহা নহে, আমাদের ধর্মসাধনা ও ঈশ্বরারাধনার সমস্ত অতীন্দ্রিয় মহিমা তাহাকে নিজ জ্যোতির্মণ্ডলবেষ্টিত করিয়াছে। এই নামের ডাকে আমাদের সমস্ত সুকুমার অনুভব-শক্তি, সমস্ত অন্তর্নিহিত করুণা—সাড়া দিবার জন্য উন্মুখ হইয়াই থাকে।

অবশ্য জনপ্রিয়তা ও সাহিত্যিক উৎকর্ষ ঠিক এক বস্তু নহে। বিষয়-বস্তুর অনাদি প্রাচীনত্বই ইহার ঔপন্যাসিক মৌলিকতার প্রতিবন্ধকস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে। যাহাকে আমরা কাব্যের অমৃত-নিষ্যন্দ-নিষিক্তরূপে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, উপন্যাসের তীক্ষ্ণ, মোহাবেশহীন বিশ্লেষণ যেন তাহার পক্ষে ঠিক উপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। কাব্যের অনুকরণ-প্রবৃত্তি ঔপন্যাসিকের উচ্ছ্বাসকে সর্বদাই উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত রাখিতে চেষ্টা করে। Sentimentalityর অজস্র অবিরল ধারা উপন্যাসের প্রান্তর-ভূমিকে সিক্ত, কর্দমাক্ত করিয়া তোলে। এই উপন্যাসে লেখিকার মন্তব্য ও জীবন-সমালোচনা এই ভাবাতিরেক-দোষে দুষ্ট হইয়াছে। অজিতের পিতার জন্য ব্যাকুল, মোহান্ধ প্রতীক্ষায় এই আতিশয্যপ্রিয়তা লক্ষিত হয়। পিতার প্রতি আকর্ষণ, মত্ততার মত তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা, তাহার আত্মহিতজ্ঞানকে অভিভূত করিয়াছে, তাহাকে ধ্বংসের পথে টানিয়া বাহির করিয়াছে। অরবিন্দের পিতৃ-আজ্ঞা-পালনের উৎকট, নির্মম আতিশয্যেও ইহার দ্বিতীয় উদাহরণ মিলে। সে যেন একটা সুকঠোর ব্রতের মত পিতার নৃশংস আদেশ অক্ষরে অক্ষরে, কায়মনোবাক্যে পালন করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। মনোরমার স্মৃতিকে পর্যন্ত তাহার মনের গভীর তলদেশ হইতে উৎপাটিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। মনোরমাও গভীর প্রেমের সহজ অন্তর্দৃষ্টিবলে স্বামীর অবস্থাসংকটের বিষয় অবগত হইয়াছে—নিজেকে স্বামি-প্রেমের পূর্ণাধিকারিণী জানিয়া এই অনিচ্ছাকৃত প্রত্যাখ্যান স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অজিত যখনই পিতার অবিচার ও নিঃস্নেহতার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ অভিযোগ আনিয়াছে, মনোরমা তখনই তাহাকে পিতার অমানুষিক আত্মোৎসর্গের কথা বুঝাইয়া পিতার প্রতি তাহার ভক্তি-শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। অভিমানী, পিতৃস্নেহের কাঙ্গাল বালক মাতার

উচ্চ মনোভাবের সহিত একসুরে মন বাঁধিতে পারে নাই; তাহার মন বিদ্রোহ করিয়াছে, ব্যর্থ অভিমানে গুমরাইয়া মরিয়াছে, নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বে সে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। এদিকে আবার পিতৃস্নেহের নিগূঢ় আকর্ষণও সে রোধ করিতে পারে নাই; অশরীরী প্রেতাত্মার মত অন্ধকারে মুখ ঢাকিয়া পিতার অনুসরণ করিয়াছে, নিজ সুনাম ও ভবিষ্যতের আশা সমস্তই রক্তশোষণকারী আকাঙ্ক্ষার নিকট বলি দিয়াছে। শেষে মাতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে বিমাতা ব্রজরাণীকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া তাহার সকল বিদ্রোহ-বিক্ষোভ শান্তিতে বিলীন হইয়াছে।

উপন্যাস মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য অংশ অরবিন্দ ও ব্রজরাণীর দাম্পত্য সম্পর্কের বর্ণনায়। অরবিন্দের ব্যবহারে নিখুঁত, নিশ্ছিদ্র লৌকিক কর্তব্যপালনের সঙ্গে অবিচলিত উদাসীনতার সমন্বয় হইয়াছে। মনোরমার প্রতি বাক্যে বা ব্যবহারে সে কিছুমাত্র স্নেহ প্রকাশ করে নাই —যৌবনের সেই প্রথম প্রেমরাগরঞ্জিত অধ্যায় সে একবারে জীবন হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে। অথচ তাহার ক্ষুদ্রতম কার্যে, তাহার সূক্ষ্মতম ইঙ্গিতে ব্রজরাণী নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছে যে, তাহার সবটুকু প্রেম, সবটুকু উৎসাহ তাহার সপত্নী নিঃশেষে শুষিয়া লইয়াছে; প্রেমের পাত্রে তাহার জন্য এতটুকু উদ্বৃত্ত পড়িয়া নাই। সমস্ত লৌকিক কর্তব্য-পালনের মধ্যে অরবিন্দের নিঃসঙ্গ, অনাসক্ত মনের চিত্রটি খুব চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবনের সহজ সমৃদ্ধি, প্রাণরসের নিগূঢ় সঞ্চরণ তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে—প্রতিজ্ঞা-পালনের শুষ্কবৃন্তে সে কোনরূপে নিজেকে ধরিয়া রাখিয়াছে মাত্র। স্নেহ-প্রবৃত্তির এই নির্মম নিপীড়নে, এই কঠোর আত্মনিগ্রহে তাহার জীবনী-শক্তি তিল তিল করিয়া ক্ষয় হইতে চলিয়াছে। অবশেষে যে পক্ষাঘাত আসিয়া তাহাকে শয্যাশায়ী করিয়াছে তাহা এই জীবনব্যাপী আত্মনিরোধের চরম, অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মাত্র। আবার অজিতের কাঙ্গাল স্নেহবুভুক্ষা, তাহার ছায়ার ন্যায় নিঃশব্দ, অবিরাম পিতৃ-অনুবর্তন, এই পরিণতির গতিবেগ বর্ধিত করিয়াছে। অরবিন্দের এই অমানুষিক আত্মবলিদানের প্রত্যেক স্তরটি আমাদের নিকট জীবন্ত, উজ্জ্বলবর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ব্রজরাণীর চরিত্রটিও খুব সুন্দররূপে ফুটিয়াছে। তাহার বঞ্চিত অশান্ত চিত্ত তাহার চারিদিকে সর্বদাই একটা ক্ষুদ্র ঘূর্ণীবায়ুর সৃষ্টি করিয়াছে। অরবিন্দের পরিবারে তাহার অনধিকার-প্রবেশ যেন তাহার সমস্ত জীবনকে একটা সন্দিগ্ধ অনিশ্চিয়তার বিষ-বায়ুতে দূষিত করিয়াছে— কোথাও যেন সে তাহার সহজ,স্বাভাবিক স্থানটি পায় নাই। সে তাহার নিজের গৃহে আপনাকে শত্রুদুর্গে বন্দিনী বলিয়া অনুভব করিয়াছে। তাহার অভিমান-প্রবণ মন সর্বত্রই একটা গোপন ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়াছে, একটা কষ্টনিরুদ্ধ অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের ক্রূর হাস্য যেন তাহার চতুষ্পার্শে বিচ্ছুরিত হইয়াছে। ইহার উপর তাহার সন্তানহীনতা তাহার জীবন-সমস্যাকে আরও ঘনীভূত করিয়াছে। যে স্বর্ণ-সেতু বাহিয়া সে বিচ্ছেদের লবণ-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া সংসারের কেন্দ্রস্থলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিত, তাহা তাহার ভাগ্যদোষে অরচিতই রহিয়া গিয়াছে। শাশুড়ীর ঔদাসীন্য ও ননদ শরৎশশীর প্রকাশ্য প্রতিকূলতা তাহাকে নিজ দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন রাখিয়াছে। সুতরাং ফল দাঁড়াইয়াছে যে, ব্রজরাণী পরিবার-মধ্যে একটি সজীব আগ্নেয়গিরির ন্যায় তাহার চতুষ্পার্শে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ

ছড়াইয়াছে। এই অগ্নিবৃষ্টি সর্বাপেক্ষা অধিক বর্ষিত হইয়াছে বেচারা অরবিন্দের উপরে। স্বামীর প্রতি অসংগত অভিমান ও ক্রোধের দ্বারা সে তাহার দুঃখের পাত্র পূর্ণ করিয়াছে ও শেষ পর্যন্ত স্বামী হারাইতে বসিয়াছে। কিন্তু তাহার সমস্ত অগ্ন্যুৎপাতের কেন্দ্রস্থলে এক স্নেহ-শীতল, সন্তান-বৎসল মাতৃহৃদয় লুক্কায়িত ছিল—সেই মাতৃহৃদয় অবশেষে তাহার ঈর্ষা-দ্বেষ-সংকীর্ণতার উপর জয়ী হইয়াছে। অজিতের মাতৃসম্বোধন তাহার জীবনে এক নূতন অধ্যায় উন্মীলিত করিয়াছে—সে অবশেষে নিজ চির-ঈপ্সিত মাতৃত্বের গৌরবময় সিংহাসনে নিরাপদ-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অন্যান্য গৌণ চরিত্রের মধ্যে শরৎশশী খুব জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। পারিবারিক তুলা-দণ্ডের সাম্য-রক্ষার জন্য ছোট ননদ উষাকে ব্রজরাণীর পক্ষপাতিনীরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে—কিন্তু তাহার জীবন তাহার সংক্ষিপ্ত প্রয়োজনীয়তাকে ছাড়াইয়া যায় নাই। মৃত্যুঞ্জয়বাবুর অতলস্পর্শী নীচতার প্রতিরূপ আমাদের বাস্তব সমাজে বিরল নহে—তথাপি উহার চরিত্রের মধ্যেও একটু আতিশয্যপ্রিয়তা আবিষ্কার করা যাইতে পারে। মনোরমার সহিত রাবেয়ার সখিত্বের চিত্র মনোরমার সর্বরিক্ত জীবনে সন্তান-বাৎসল্য ছাড়া আরও একটা দিকের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দিয়াছে, কিন্তু তাহাতে মনোরমা-চরিত্রের শোক-স্তব্ধ নিঃসঙ্গতার মধ্যে কোন বৈচিত্র্যের ক্ষীণতম আভাসও সঞ্চারিত হয় নাই। মোটের উপর, মন্তব্যের অসংযত বিস্তার ও অতিরঞ্জন-প্রবৃত্তি সত্ত্বেও 'মা' উপন্যাসটির স্থান উপন্যাস-জগতে বেশ উচ্চে।

'বাগ্‌দত্তা' উপন্যাসে ঘটনা-বিন্যাসের অত্যধিক জটিলতা কৃত্রিমতার হেতু হইয়াছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেও অপ্রত্যাশিত দৈব-সংঘটনের অবশ্য অবসর আছে ; কিন্তু কমলা ও গৌরীকে লইয়া দৈবের যে নিত্য পরিবর্তনশীল খেলা চলিয়াছে, তাহাকে বাস্তব জীবনের আবেষ্টনে স্থান দেওয়া কঠিন। এই অপ্রত্যাশিতের বারংবার আবির্ভাবে উপন্যাসটির স্বাভাবিক অগ্রগতি পুনঃপুনঃ প্রতিহত হইয়াছে। বিশেষতঃ গৌরীর জন্মরহস্য ও পিতৃনিরূপণ লইয়া যে বিস্ময়কর পরিবর্তনের সূচনা হইয়াছে তাহাকে ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। দৈব যেন মানুষের যত্নরচিত ব্যবস্থা ও প্রত্যাশিত পরিণতিকে লণ্ডভণ্ড, বিপর্যস্ত করিয়া একপ্রকার হিংস্র, ক্রূর আনন্দ লাভ করিয়াছে। দৈবপ্রভাব যেখানে এরূপ তীক্ষ্ণভাবে প্রবল, সেখানে মানুষের স্বাধীন ঘাত-প্রতিঘাতের রসধারা জমাট বাঁধিবার অবসর পায় না। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইয়াছে।

উপন্যাসের চরিত্রগুলিও দৈবের ক্রীড়নকস্বরূপ হওয়ায় তাহাদের ব্যক্তিত্ব-স্ফুরণের সুযোগ পায় নাই। উমাকান্ত ভট্টাচার্য ও মণীশ একেবারে আদর্শ লোকের অধিবাসী, মর্ত্য-জীবনের সহিত তাঁহাদের সংযোগ নিতান্ত আলগা ধরনের। পৃথিবীর সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক কেবলমাত্র স্থান-গত, হৃদয়-গত নহে। যাঁহারা মরজগতের সংঘর্ষ-বিরোধের মধ্যে ঊর্ধ্ব-নিহিত-দৃষ্টি হইয়া ধ্যানমগ্নভাবে বিচরণ করেন, যাঁহারা নিষ্কাম ধর্মের বর্ম-পরিহিত হইয়া সংসার-রণক্ষেত্রের অস্ত্র-শস্ত্রের দ্বারা অক্ষত-শরীর থাকেন, তাঁহাদের স্থান আর যেখানেই হউক, মানুষের অসংখ্য-বিচিত্র আশা-তৃষা-হর্ষ-বিষাদ-উদ্‌বেল জীবন-কাহিনী যে উপন্যাস সেখানে তাঁহাদের স্থান নাই। কাব্যে আমরা অতি-মানবের দর্শন আকাঙ্ক্ষা করি ; উপন্যাসে আমাদের সমশ্রেণীস্থ,—কোথাও

গৌরবোজ্জ্বল, কোথাও পরাভব-ম্লান, কিন্তু সর্বত্র যুদ্ধচিহ্নিত—মিশ্র জীব দেখিতে চাই। উমাকান্তের মনে কখন কোন বাহ্য ঘটনা ছায়াপাত করে বলিয়া মনে হয় না; তাঁহার নির্বিকার চিত্ত কোন আঘাতেই বিক্ষুব্ধ হয় না। মণীশ অবশ্য ঔদাসীন্যের এতটা চরমোৎকর্ষে এখনও পৌঁছিতে পারে নাই—কিন্তু তথাপি তাহার অন্তরে কোন বিক্ষোভের চাঞ্চল্য দৃষ্টিগোচর হয় না; সমস্ত ব্যথা-বেদনা, সমস্ত আশাভঙ্গ সে নীরবে সহ্য করে। কমলার শোকে পিষ্ট জীবনে উচ্ছ্বাসের বাহ্য-চাঞ্চল্য সমস্তই অন্তর্লীন হইয়াছে; মণীশের সহিত বিবাহের সম্ভাবনায় তাহার মন হর্ষোচ্ছ্বাসে ফুলিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার চিরাভ্যস্ত আত্মসংযম এই পরিপূর্ণ আনন্দ-স্ফীতির দুই-একটি মাত্র তরঙ্গকে বাহিরে আসিতে দিয়াছে। শচীকান্তের সহিত অবাঞ্ছিত বিবাহের পরই তাহার চরিত্রের প্রস্তরকঠিন দৃঢ়তা পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। সে শচীকান্তের অগ্নিস্রাবের ন্যায় জ্বালাময় প্রেমে দারুণ উপেক্ষা ও অবজ্ঞার শীতল বারি ঢালিয়াছে; এক মুহূর্তের আত্মবিস্মৃতি তাহার অটল সংকল্পের তীব্র দ্যুতিকে ঝাপ্সা করিয়া দেয় নাই। তথাপি যেন মনে হয় যে, তাহার অজ্ঞাতসারে শচীকান্তের সর্বত্যাগী প্রণয় তাহার মনের অবচেতন প্রদেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শচীকান্তকে যে সে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িবার প্রেরণা দিয়াছিল, তাহা দয়া অপেক্ষা আরও কোন গূঢ়তর, গভীরতর মূল হইতে সমুদ্ভূত। যে স্বত্বে সে শচীকান্তকে নিশ্চিত মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিবার অধিকার অর্জন করিয়াছিল তাহা কেবল প্রেমই দিতে পারে। কমলার চরিত্রটি খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তিরই নিদর্শন।

গ্রন্থমধ্যে সর্বাপেক্ষা সজীব ও প্রাণবেগ-চঞ্চল চরিত্র শচীকান্তের। তাহার স্বভাবতঃ উচ্ছৃঙ্খল, আত্মসুখপরায়ণ প্রকৃতি পিতার আদর্শকে সম্পূর্ণরূপেই অস্বীকার করিয়াছে। তাহার প্রেম হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য, ন্যায়-অন্যায়-বিচারবোধ-রহিত। এই প্রেমের জন্য সে বন্ধুত্ব, সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, মান-সম্ভ্রম, পারিবারিক শান্তি, শেষ জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়াছে। নৈহাটি স্টেশনের প্লাটফর্মে সেই বিনিদ্র রজনীতে তাহার মনের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব, দেবাসুর-সংগ্রামের চিত্রটি জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত কমলা যখন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তখন যেরূপ দৃঢ়তা ও অবিচলিত ধৈর্যের সহিত সে তাহার দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে তাহার চরিত্র-গৌরবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যে হতাশ প্রেমিক প্রণয়লেশহীনা প্রেমপাত্রীর অঙ্গুলি-সংকেতে নিশ্চিত মৃত্যুবরণ করিয়া লইতে পারে, তাহার ভাবোন্মাদের মধ্যে যে কতকটা স্বর্গীয় উপাদান আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বিপথ-চালিত হইলেও তাহার মহত্ত্ব অবিসংবাদিত; সে উমাকান্ত বাচস্পতির প্রকৃত বংশধর; তবে আস্তিক্য-বুদ্ধির পরিবর্তে প্রেমই তাহার জীবনের মূলমন্ত্র। পিতার মতই তাহার তন্ময়তা ও একনিষ্ঠ সাধনা; লক্ষ্যের প্রভেদই তাহার জীবনকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চালনা করিয়াছে।

'বাগ্‌দত্তা' উপন্যাসে কতকগুলি প্রবল অনুভূতিময় দৃশ্য পাওয়া যায়। নৈহাটি স্টেশনে শচীকান্তের দারুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা-বিকারের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শচীকান্ত ও কমলার মধ্যে তাহাদের বিবাহের পরবর্তী সম্পর্কের চিত্রটিও খুব চমৎকার হইয়াছে। অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য, শচীকান্তের উন্মত্ত আবেগ ও কমলার অর্ধচেতন বিমূঢ়ভাবের বর্ণনার মধ্যেও উচ্চাঙ্গের ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের পরিচয় মিলে।

(৯)

অনুরূপা দেবীর প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসগুলি আলোচনা করিবার পূর্বে তাঁহার পরবর্তী কয়েকখানি রচনার সংক্ষিপ্ত বিচার করাই সুবিধাজনক। 'জোয়ার-ভাঁটা', 'উত্তরায়ণ' ও 'পথের সাথী' তাঁহার বসুমতী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত সংগৃহীত গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত নহে। এই তিনখানি উপন্যাসেই তাঁহার শক্তি যে অপরাহ্নের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কোনখানিতেই গভীর জীবন-সমস্যার গভীর আলোচনার চিহ্ন নাই; চরিত্র-সৃষ্টিরও কোন বিশেষ ক্ষমতা লক্ষিত হয় না। 'জোয়ার-ভাঁটা' উপন্যাস, নব্যতন্ত্রের সিভিলিয়ান স্বামীর সহিত খাঁটি হিন্দু মতাবলম্বিনী স্ত্রীর মনোমালিন্যের কাহিনী। কিন্তু এই উপাখ্যানের বিবৃতিতে লেখিকার পক্ষপাত এতই প্রকট হইয়াছে যে, ইহা নিরপেক্ষ আর্ট সৃষ্টি হইতে অসংবৃত মতবাদ-প্রচারের পর্যায়ে অবনমিত হইয়াছে। পঙ্কজিনীর চরিত্র আমাদিগকে মোটেই গভীরভাবে স্পর্শ করে না; তাহার কার্যের মধ্যে একটা প্রখর পরমত-অসহিষ্ণুতা লক্ষিত হয়; ইহা একগুঁয়েমিরই নামান্তর। অবশ্য লেখিকার পক্ষ সমর্থনে বলা যাইতে পারে যে, পঙ্কজিনীকে এই প্রকার সংকীর্ণ-মতবাদ-চালিত ও পরমত-অসহিষ্ণুরূপে চিত্রিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু তাহা হইলে হঠাৎ তাহাকে আদর্শ ক্ষমাশীল হিন্দু রমণীতে রূপান্তরিত করারও কোন সার্থকতা পাওয়া যায় না। বরঞ্চ সুধীন্দ্র ও পঙ্কজিনীর মধ্যে সুধীন্দ্রই আমাদের অধিকতর সহানুভূতি আকর্ষণ করে। সে স্ত্রীর জন্য যতটা সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতার পরিচয় দিয়াছে, তাহার স্ত্রী তাহার শতাংশের একাংশও দেয় নাই। অন্ধ স্বামীর সেবা অপেক্ষা আচারভ্রষ্ট স্বামীর সংশোধন-চেষ্টা অধিকতর সহজসাধ্য ছিল; এবং যাহার মধ্যে দ্বিতীয় কার্যের উপযোগী ধৈর্য ও সহানুভূতির একান্ত অভাব সে যে প্রথম কার্যে সাফল্যলাভ করিবে ইহাতে আমাদের বিশ্বাস হয় না।

'উত্তরায়ণ' উপন্যাসটি সলিল ও আরতির প্রেমের পথে প্রতিবন্ধকের কাহিনী। এই প্রতিবন্ধক আসিয়াছে দুইটি মূল হইতে—প্রথমতঃ, সলিলের মাতা মহামায়ার অটল, অনমনীয় প্রতিজ্ঞা-পালন; দ্বিতীয়তঃ,আরতির অত্যধিক তীব্র আত্মসম্মানবোধ। আরতির পিতার শোচনীয় আত্মহত্যার পর তাহাদের নিঃসহায় দুরবস্থা করুণার শাখাপথ বাহিয়া সলিলের প্রেমের নদীকে কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল—সে উচ্ছ্বসিত প্রেমের বেগে মাতার অসম্মতি-রূপ প্রথম বাধা ভাসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই অসম্মতির বীজ আরতির অতি তীব্র আত্ম-সম্মানবোধের ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়া দ্বিতীয় বাধাকে অলঙ্ঘ্য করিয়া তুলিল। সে বারংবার সলিলের অক্লান্ত সেবা ও ব্যাকুলপ্রেম-নিবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়া সলিলের জীবন-পথ হইতে সড়িয়া দাঁড়াইল। লেখিকা দেখাইয়াছেন যে, সলিলকে প্রত্যাখ্যান করিবার কারণ সম্পূর্ণরূপে আদর্শবাদমূলক নহে। আরতি অনেকটা রোগ-বিকৃত মস্তিষ্কের জন্যই সলিলের বিরুদ্ধে কুৎসিত সন্দেহের দ্বারা বিচলিত হইয়াছে। এই সন্দেহ-প্রবণতা ও অবিচার আরতির ব্যবহারকে নিছক আদর্শবাদ হইতে উদ্ধার করিয়া কতকটা বাস্তবগুণান্বিত করিয়াছে, কিন্তু লেখিকা আরতির চরিত্রের এই দিকটার উপর তত ঝোঁক দেন নাই; পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে তিনি তাহার আদর্শ আত্মবিসর্জনের ছবিটিই উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিতে চাহিয়াছেন। এই উভয়

দিকের চাপে সলিলের সংকল্পের দৃঢ়তা অভিভূত হইয়াছে—সে শেষ পর্যন্ত মাতার অনুবর্তী হইয়া মাতৃ-নির্বাচিত কন্যাকেই বিবাহ করিয়াছে।

সলিলের অনিচ্ছাকৃত বিবাহের ফল বড় সুখময় হইল না। স্বর্ণলতার স্বামিপ্রেমলাভের ব্যগ্রতার চিত্রটি বেশ চমৎকার আঁকা হইয়াছে; তাহার অপরিণত মনের প্রণয়-বিষয়ক অকাল-পক্কতার বিবৃতিটি বেশ বাস্তবানুগামী। লেখিকা স্বর্ণলতাকে গৌণ চরিত্রের পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। কিন্তু কার্যতঃ সেই সর্বাপেক্ষা জীবন্ত ও সূক্ষ্মোপলব্ধিমূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রোগশয্যায় তাহার অসহিষ্ণুতা ও অভিমানপ্রবণতা, তাহার রুক্ষ মেজাজ ও অসংগত আবদার, শাশুড়ী ও স্বামীর প্রতি অবহেলার অনুযোগ—এ সমস্তই তাহার চরিত্রের সজীবতার উপাদান। প্রণয়-বিষয়ে তাহার একটি স্বাভাবিক অশিক্ষিত-পটুত্ব আছে; যে কৌশলে সে আরতির প্রতি তাহার স্বামীর আকর্ষণের রহস্যভেদ করিয়াছে তাহাতে প্রমাণ করে যে, স্বামিবিষয়ক ঈর্ষা তাহার বুদ্ধিকে অসামান্যরূপ তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

এই স্বর্ণলতা-চরিত্র ছাড়া উপন্যাসের অন্যান্য অংশ খুব উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। আরতি ও সলিলের প্রথম প্রণয়-সঞ্চারের মধ্যে কোন তীব্রতা বা গভীর উপলব্ধি নাই—একটা picnic বা বন-ভোজনের লঘু-তরল মনোবৃত্তিই ইহার মূল। আরতির চরিত্রে অসাধারণ দার্ঢ্য অনেকটা অপ্রত্যাশিত—সুখের দিনে এই গভীর সুরের কোনও আভাস পাওয়া যায় নাই।

'পথের সাথী' উপন্যাসটির গঠন ও ঘটনা-বিন্যাস নির্দোষ বলিয়া মনে হয় না। রুবি ও মলয়ার পরস্পর সখিত্ব ও চরিত্র-পার্থক্যের বর্ণনা লইয়া ইহার আরম্ভ; সুতরাং স্বভাবতঃই মনে হয়, ইহাই ইহার কেন্দ্রস্থ বিষয়। কিন্তু উপন্যাসটির অগ্রগতির সময় দেখা গেল যে, ইহার ভারকেন্দ্র হঠাৎ স্থানচ্যুত হইয়া বসন্তবাবুর পারিবারিক জটিলতার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

চরিত্র-সৃজন ও জীবন-সমস্যার আলোচনার মধ্যে উপন্যাসটিতে গভীরতার একান্ত অভাব। উপন্যাসের দিক্ হইতে একা শশাঙ্ক ও শোভার সম্পর্কটাই কতকটা উচ্চ পর্যায়ে উঠিয়াছে, যদিও ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে হাস্য-পরিহাসের আধিক্য একটু মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিন্দুবাসিনীর চরিত্রে দৃঢ়তা ও গৌরব শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণের ম্লান পরাভবে পর্যবসিত হইয়াছে। রুবির চরিত্রও শেষ পর্যন্ত তাহার বিশেষত্ব ও ঝাঁঝালো বিদ্রোহের সুর বজায় রাখিতে পারে নাই। তাহার বাক্যের তীব্র স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও স্বাধীনতা-ঘোষণার সহিত তাহার ব্যবহারের বিশেষ সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। কার্যক্ষেত্রে তাহার ঝাঁজ কমিয়া গিয়া সে অনেকটা শিষ্ট-শান্তভাবে সনাতন পথেরই অনুবর্তী হইয়াছে—তাহার Bohemianism কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছে। যে বাক্যে পর্যায়ক্রমে তিনজন স্বামীর অঙ্কশায়িনী হইয়া জীবনে ত্রিবিধ রসাস্বাদনের কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছিল, কার্যক্ষেত্রে সে মাত্র দুইটি প্রেমিকের আকর্ষণেই তাহার চিত্তসাম্য হারাইয়াছে—সনাতন নীতির আদর্শেই তাহার নির্বাচনকে একনিষ্ঠ করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। বর্ষণ গর্জনের অনুরূপ হয় নাই। গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্র নিতান্ত মামুলী ও উপন্যাসের প্রয়োজনের দিক্ দিয়া তাহাদের বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। মোট কথা অনুরূপা দেবীর শেষ উপন্যাসগুলি তাঁহার শক্তির ক্রমিক হ্রাসেরই সাক্ষ্য দান করে।

(১০)

এইবার অনুরূপা দেবীর চারিখানি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। এই উপন্যাস-চতুষ্টয়ে তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। 'গরীবের মেয়ে' উপন্যাসটি 'মন্ত্রশক্তি', 'মহানিশা' ও 'পথহারা'র সহিত তুলনায় একটু নিম্নশ্রেণীর। ইহার মধ্যে ভুবনবাবুর পরিবার-সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণ—সুশীল, ভুবনবাবু নিজে, সুলেখা, বিনতা, প্রভৃতি—অনেকটা মামুলি ধরণের, তাহাদের ব্যক্তিত্ব খুব প্রোজ্জ্বল নহে। সুশীলের সহিত সুলেখার প্রথম পরিচয়-কাহিনী ও তাহাদের মধ্যে প্রথম প্রণয়-সঞ্চারের বিবৃতি অনেকটা melodramatic বা অতিনাটকীয়। ইহা আমাদের সহানুভূতিকে সেরূপ নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে না। সুশীলের প্রতি ভুবনবাবুর অযথা সন্দেহ ও সুলেখার প্রত্যাখ্যান অনেকটা অস্বাভাবিক বলিয়া ঠেকে। উহা কেবল সুশীলের সমস্যাটিকে জটিলতর করিবার জন্য লেখিকার একটা চেষ্টাকৃত উপায়-অবলম্বন মাত্র। সুলেখার হঠাৎ ভীষ্মের মত কঠোর প্রতিজ্ঞা-পরায়ণতা আমাদের একটা অতর্কিত চমক উৎপাদন করে—তাহার সুশীতল করুণা-প্রবাহের মধ্যে একটা বজ্রকঠোর অনমনীয়তা লুকান ছিল, তাহার কোন পূর্বাভাস আমরা পাই নাই। ভুবনবাবুর পিতৃত্ব-গৌরব খুব উঁচুস্বরে বাঁধা। কিন্তু কার্যতঃ তিনি সন্তানদের উপর কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই; সুতরাং পুত্র-কন্যার আদর্শচ্যুতিতে তাঁহার এতটা অবসন্ন হইবার কোন সংগত কারণ নাই। উপন্যাসটির প্রথমার্ধ বিশেষ উৎকর্ষের দাবী করিতে পারে না।

কিন্তু উপন্যাসের দ্বিতীয়ার্ধে লেখিকা ইহার যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ করিয়াছেন। নীলিমার সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার যে ছবিটি তিনি দিয়াছেন, তাহার মর্মস্পর্শিতা অতুলনীয়; তাহার প্রত্যেক ছত্র যেন এই চির-নিপীড়িতার বক্ষঃশোণিতক্ষরণে সিক্ত হইয়াছে। তাহার সর্বাপেক্ষা অসহনীয় উৎপীড়ন আসিয়াছে তাহার নিজ পরিবারের মধ্য হইতে তাহার পিতার ব্যবহারে। সংসারে দারিদ্র্য-অপমান-পীড়িত হতভাগ্যদের জন্য যেখানে কোমল স্নেহ-নীড় রচিত থাকে, সেই শান্তিময় আশ্রয়ই তাহার অদৃষ্টক্রমে দুঃসহ কণ্টকশয্যায় পরিণত হইয়াছে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে হিন্দু পরিবারে অনুকূল চক্রবর্তীর মত গৃহস্বামী খুব বেশি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—কিন্তু এরূপ উদাহরণ যে একেবারে অপ্রাপ্য তাহাও জোর-গলায় বলা যায় না। বাস্তবিক অনুকূল চক্রবর্তীর চরিত্র উপন্যাসের একটি উজ্জ্বল রত্নবিশেষ। অনেক সময়ে ঔপন্যাসিকেরা মানুষকে পিশাচ করিতে গিয়া তাহাকে অস্বাভাবিক করিয়া তোলেন। কিন্তু অনুকূল কার্যে বা ব্যবহারে পৈশাচিক প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, বিশ্বাস্যতার সীমা একপদও অতিক্রম করিয়া যায় নাই।

এ হেন পরিবারে লালিতা-পালিতা অথবা তর্জিতা-ভর্ৎসিতা নীলিমা যখন সুশীলের সাক্ষাৎ লাভ করিল, তখন সুশীলের সস্নেহ, প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার আজীবন-অভ্যস্ত বৈপরীত্যের জন্য তাহার চক্ষে অপরূপ-মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া দেখা দিল—সহজ-সরল আত্মীয়তা প্রণয়ের বেশে তাহার নিকট প্রতিভাত হইল। সুশীলের প্রতি তাহার সহজ আকর্ষণ ও সেবার ইচ্ছা কিরূপে নিতান্ত স্বাভাবিক কারণে প্রণয়ে রূপান্তরিত হইল তাহার চিত্রটি অতীব মনোজ্ঞ ও সুন্দর হইয়াছে। তারপর একমুহূর্তে তাহার পিতার কদর্য-ইতর ষড়যন্ত্র তাহার অম্লান তরুণ-হৃদয়ের প্রণয়-সুধাকে তীব্র হলাহলে পরিবর্তিত করিয়া দিল।

অভাগিনী অতি অল্পক্ষণের জন্য যে অসম্ভব সুখের আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল, পিতার লজ্জাজনক ব্যবহার ও সুশীলের বিরক্তি-কুঞ্চিত মুখ সে আশাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিল। অনিচ্ছার বন্ধনে সে প্রেমের অপমান করিতে স্বীকৃত হইল না; সুশীলকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিল।

তারপর তাহার মাতার মৃত্যু তাহার পিতৃগৃহের শেষ বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে ও ঘৃণায়, আত্মধিক্কারে অভিভূত হইয়া সে তাহার চিরন্তন আশ্রয়ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। নীলিমার জীবনে খ্রীষ্টধর্মের অত্যাচার একটা বাহ্যশক্তির অভিভব। সুতরাং পিতৃকৃত লাঞ্ছনার মত ইহা এত মর্মভেদকারী নহে। বিশেষতঃ, আখ্যায়িকার এই অংশে কতকটা অতিরঞ্জন-প্রবণতা লক্ষিত হয়, কতকটা পক্ষপাতিত্বের পরিচয় মিলে। লেখিকা অবশ্য আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, এই বিবরণ সত্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু যে সর্বজনীন সত্য আর্টের প্রাণ, কেবল লৌকিক সত্যের অনুবর্তন তাহা দিতে পারে না। খ্রীষ্টানদের হাতে নীলিমার দুর্দশা তাহার অনেকটা আত্মকৃত ব্যাধি, সুতরাং এ ব্যাপারে সে আমাদের সহানুভূতি পূর্বের ন্যায় প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতে পারে না। পরিশেষে যে দৃশ্যে সে সুশীলের সহিত অসম্পূর্ণ বিবাহ সম্পূর্ণ করিয়া তাহার নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়াছে তাহা ভাব ও ভাষার দিক্ দিয়া এতই উচ্চশ্রেণীর যে, ইহা আমাদের স্মৃতিতে অম্লান উজ্জ্বলতার সহিত জাগরূক থাকে। নীলিমা-চরিত্রের পরিকল্পনা ও পরিণতি উচ্চাঙ্গের সৃজনী-শক্তির পরিচয় দেয়; উপন্যাসের যে কয়েকটি নর-নারী বিস্মৃতির কুহেলিকা অতিক্রম করিয়া আপনাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখে, নীলিমা তাহাদের মধ্যে অন্যতম—সমধর্মীদের ভিড়ের মধ্যে তাহাকে হারাইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা নাই।

সুশীলের চরিত্রও উল্লেখযোগ্য। তাহার দুর্বল চরিত্র ও কৃত্রিম বিধি-নিষেধের গণ্ডির মধ্যে বর্ধিত, নিরীহ শিষ্টতাই তাহার স্বাতন্ত্র্যের হেতু হইয়াছে। সে সহজেই পরমুখাপেক্ষী ও পরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার শান্ত-শিষ্ট, বাল-চাপল্য-বর্জিত শৈশবের মূলে ছিল তাহার পিতার সস্নেহ অনুশাসন, নিজ স্বাধীন উপলব্ধি নহে। তাই সে শুভেন্দুর বিদ্রূপে বিচলিত হইয়া তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ দুঃসাহসিকতার পথে প্রথম পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই বিপদ্‌জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে। সুলেখার সহিত তাহার বাগ্‌দত্ত সম্বন্ধ প্রকৃত প্রেম নহে, পিতার আজ্ঞানুবর্তিতা মাত্র। এই তরুণ-তরুণী স্টীমারেও বেড়াইতে গিয়াছে, পরস্পরের প্রতি প্রণয়ের ভাষাও প্রয়োগ করিয়াছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে আসল প্রেমের তেজোগর্ভ বিদ্যুৎ-শিখাটি জ্বলিয়া উঠে নাই। সুতরাং যখন সে নীলিমার সংস্পর্শে, অভিভাবকের অনুমোদনে পোষমানান নয় এইরূপ বন্য, দুর্দান্ত প্রেমের প্রথম পরিচয় লাভ করিয়াছে, তখন সে ইহাকে চিনিতে না পারিয়া সভয়ে পিছাইয়া আসিয়াছে। নীলিমার ব্যাপারেই তাহার শিষ্ট-শান্ত ভাব যে হেয় কাপুরুষতারই নামান্তর মাত্র তাহা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। লেখিকা নীলিমার ক্ষণোত্তেজিত বিরক্তির মুহূর্ত-স্থায়ী অগ্নিশিখায় তাহার এই হীনতার চিত্রটির উপর অবিস্মরণীয় আলোকপাত করিয়াছেন। সুশীলের পরবর্তী ব্যবহারও ঠিক এই মেরুদণ্ড-হীন দুর্বলতার সহিত সংগতিবিশিষ্ট। চিরজীবন ধরিয়া অপরের উপগ্রহত্ব করাই তাহার বিধি-নির্দিষ্ট ভাগ্য-লিপি। মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দিক্ দিয়া সুশীলের চরিত্রও খুব সুন্দর হইয়াছে।

জীবন-সমালোচনার গভীরতা ও ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতের তীব্রতার জন্য 'গরীবের মেয়ে' উপন্যাস-জগতে উচ্চ স্থান দাবী করিতে পারে।

'মহানিশা' উপন্যাসটি দুইটি পরিবারের ইতিহাসের মধ্যে আবর্তিত হইয়াছে। ইহার একদিকে রেঙ্গুনের বিখ্যাত লক্ষপতি ব্যবসায়ী মুরলীধর ও অন্যদিকে এক দারিদ্র্যপীড়িত, ভাগ্যহত ব্রাহ্মণ বিধবার সুখ-দুঃখের কাহিনী একই সূত্রে গাঁথা হইয়াছে। নির্মলই এই অবস্থা-বৈষম্যের দ্বারা অপসারিত, অথচ দৈবের দ্বারা একত্রীকৃত উভয় পরিবারের মধ্যে সংযোগ-সেতু রচনা করিয়াছে।

উপন্যাস মধ্যে দুইটি সম্পর্কের জটিলতাই বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধীরার সহিত নির্মলের ও অপর্ণার সহিত বিহারীর সম্পর্ক। ধীরার সহিত নির্মলের সম্পর্কে খুব সূক্ষ্ম অনুভূতিময় স্তর-বিভাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ধীরার অন্ধত্ব, মাতৃহীনতা ও অবিরত পিতৃ-সাহচর্য তাহার চারিদিকে এমন একটা দুর্ভেদ্য অন্তরালের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার ভিতর দিয়া সাংসারিক প্রণয়-বিষয়ক জ্ঞান প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই; সুতরাং বিবাহের পর নির্মলের সহিত তাহার কিরূপ সম্পর্ক হওয়া উচিত সে বিষয়ে সে একেবারেই অজ্ঞ ছিল। কিন্তু তাহার দাসীর নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ দাম্পত্য-প্রণয়ের দুই একটি আখ্যায়িকা ও নারীসুলভ সহজ সংস্কার তাহাকে অতি অল্পদিনেই প্রেমের স্বরূপটি চিনাইয়া দিয়াছে। নির্মলের অত্যধিক আদর-যত্ন ও সেবা-পরিচর্যার নিখুঁত ব্যবস্থা যে ঠিক প্রেম নহে, ইহাদের মধ্যে যে প্রেমের নিবিড় একাত্মতা নাই, তাহা সে সহজেই অনুভব করিয়াছে। এই প্রণয়হীন, সেবা-যত্ন তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই, তাহার মধ্যে একটা অতৃপ্ত বুভুক্ষার হাহাকার জাগাইয়াছে। তারপর তাহার সংশয়োত্তেজিত তীক্ষ্ণ অনুভূতি নির্মলের অন্তরতম প্রদেশে প্রেরণ করিয়া সে নির্মলের ঔদাসীন্যের রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে। ঠিক এই অবস্থায় তাহাদের পরস্পর মনোবৃত্তির একটা ঠিক বিপরীত পরিবর্তন হইয়াছে। নির্মলের সুপ্তপ্রেম এতদিনে জাগ্রত হইয়া ধীরার প্রতি তাহার স্নেহের মধ্যে সেই চির-প্রতীক্ষিত উত্তাপ ও আবেগ সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু ধীরার আর সে তীব্র অভাব-বোধ, সে ব্যাকুল ঈপ্সা নাই। নির্মলের হৃদয় অন্যাসক্ত বুঝিয়া সে প্রেমের উদ্যত আলিঙ্গন হইতে সংকুচিতভাবে সরিয়া গিয়াছে—তাহার অকাল-রুদ্ধ প্রেমনির্ঝর হৃদয়ের সূর্যালোকহীন গহন কন্দরে মাথা লুকাইয়াছে। নির্মল যে অসুখী, এই বোধ তাহার সমস্ত অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে প্রেমের স্পর্শে অসাড় করিয়াছে। প্রেম তাহার অন্ধত্বের কৃষ্ণযবনিকা ভেদ করিয়া আলোকের যে একটি মাত্র সংকীর্ণ রন্ধ্র-পথ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা আবার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অন্ধত্বের যে অর্ধ-তরল আবরণ, সূক্ষ্ম অনুভূতি ও অশান্ত হৃদয়-স্পন্দনকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই—তাহাকে মৃত্যুর সর্বগ্রাসী অন্ধকারে ডুবাইয়া দিয়া ধীরা চরম শান্তি লাভ করিয়াছে।

বিহারী ও অপর্ণার সম্বন্ধের মধ্যে একটা হাস্যজনক অসংগতি প্রায় *tragedy*র অস্বাভাবিক তীব্রতার পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। যতদিন বিহারী অপর্ণা ও তাহার মাতার বিশ্বস্ত কর্মচারী ও নির্ভরযোগ্য অভিভাবক মাত্র ছিল, ততদিন তাহাদের সম্পর্ক বেশ সরল সহজ রেখা ধরিয়াই চলিয়াছিল। কিন্তু যেদিন মৃত্যুশয্যায় সৌদামিনী বিহারীকে কন্যার স্বামিত্বের অধিকার দিয়া গেলেন, সেই দিনই উহাদের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর, নিঃশ্বাসরোধকারী

জটিলতার উদ্ভব হইল। ইহাদের জীবনস্রোতের মধ্যে ক্রমশঃ একটা প্রতিরোধকারী বালুচর গড়িয়া উঠিল। অপর্ণার রুক্ষ, তীব্র মেজাজ, তাহার অবিশ্রান্ত খোঁচা অহর্নিশ বিহারীকে বিঁধিয়া তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। তাহাদের সেই পূর্বের সহৃদয় হাস্য-পরিহাসের মধ্যে একটা ভয়ংকর নীরবতা পাষাণ-ভারের মত চাপিয়া বসিল। ভাগ্যক্রমে নির্মল আসিয়া পড়িয়া এই অস্বাভাবিক অবস্থা-সংকটের অবসান করিয়া দিল। নির্মলের সহিত বিবাহে অপর্ণার অসম্ভব-প্রায় কৈশোর-স্বপ্ন সফলতা লাভ করিল বটে, কিন্তু পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে যে, তাহার অব্যবহিত পূর্ব-জীবনের তিক্ত, বিস্বাদ অভিজ্ঞতার পরে তাহার কতটুকু যৌবন-সরসতা, কতটুকু সহজ হৃদয়মাধুর্য অবশিষ্ট ছিল। আমাদের ভয় হয় যে, যে হৃদয় সে নির্মলকে উপহার দিয়াছে তাহা তাহার ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষার আঁচে ঝল্‌সাইয়া গিয়াছে। কিশোরীর মুগ্ধ, সলজ্জ প্রেম, নিদারুণ অভিজ্ঞতার কঠোর পেষণে, অনাবৃত আলোচনার রূঢ় আন্দোলনে, তাহার কোমল, মধুর সৌরভটুকু হারাইয়া ফেলিয়াছে।

পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে যে, অপর্ণা মোটেই রোমান্সের নায়িকার মত নহে। তাহার তীক্ষ্ণ, ঝাঁঝালো ব্যক্তিত্ব, তাহার তীব্র আত্মসম্মান-বোধ তাহার বৈশিষ্ট্যের হেতু। রাধিকাপ্রসন্নের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও গালাগালির সে সমান ওজনে প্রত্যুত্তর দিয়াছে, অপমানকে কোথাও সে দীনভাবে স্বীকার করে নাই। এক বিহারীর প্রতি সে কতকটা উপদ্রব-অত্যাচার করিয়াছে; কিন্তু এই ব্যবহারের ব্যাখ্যা তাহাদের সম্পর্কের জটিলতার মধ্যেই পাওয়া যায়। তাহার সৌন্দর্য অপেক্ষা তাহার ঝাঁঝালো ব্যক্তিত্বই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে রাধিকাপ্রসন্নের বাহ্য কর্কশতা ও অন্তরের যত্ন-প্রতিরুদ্ধ স্নেহশীলতার চিত্রটি চমৎকার হইয়াছে। বিহারীর ভর্ৎসনা-অপমানে অবিচলিত কর্তব্যপরায়ণতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে—অপর্ণাকে বিবাহ করিবার সম্ভাবনায় যে নিদারুণ বিপন্ন ভাব ও বিমূঢ়তা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে তাহাই তাহার চরিত্রকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। রাধিকাপ্রসন্নের দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি ও উত্তরাধিকারীর পারিবারিক চিত্রটিও ইহার ব্যঙ্গকুশলতায় Jane Austen-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইরাবতীবক্ষে নৌকাযাত্রা লেখিকার বর্ণনা-শক্তি ও ধীরার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তনের স্তর-বিন্যাস তাঁহার বিশ্লেষণ-চাতুর্যের পরিচয় দেয়। উপন্যাস-সাহিত্যে 'মহানিশা'র উচ্চস্থান অবিসংবাদিত।

(১১)

'মন্ত্রশক্তি' এক দিক্ দিয়া লেখিকার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়া গণ্য হইতে পারে। 'মহানিশা' ও 'গরীবের মেয়ে'র ভাব-গভীরতা ইহার নাই, কিন্তু ইহার আর কতকগুলি অনন্যসাধারণ গুণ এই অভাবের ক্ষতিপূরণ করিয়াছে। অনুরূপা দেবীর মন্তব্য ও বিশ্লেষণে আতিশয্য-প্রিয়তার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু 'মন্ত্রশক্তি'তে এই আতিশয্যের একান্ত অভাব। মন্তব্যের সংযম ও পরিমিতি কোথাও ঘটনার অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ করে না—উপন্যাসের গতিবেগ সর্বত্র সরল, স্বচ্ছন্দ ও সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত। আরও একটি বিশেষত্ব ইহার উৎকর্ষের হেতু হইয়াছে।

অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস আমাদের অস্থিমজ্জাগত ; ইহা বায়ুমণ্ডলের মত অদৃশ্য, অথচ সর্বব্যাপী-রূপে আমাদের বাস্তব প্রাত্যহিক জীবনকে ঘিরিয়া আছে। এই ধর্মবিশ্বাসই আমাদের জীবনে রোমান্সের সঞ্চরণের রন্ধ্রপথ হইয়াছে—ইউরোপের মত কোন বহির্মুখী দুঃসাহসিকতার অবসর আমাদের বিশেষ নাই। বর্তমান উপন্যাসে লেখিকা জীবনের উপর বেদমন্ত্রের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বাস্তবজীবনের সহিত রোমান্সের এক অভিনব সমন্বয় ঘটাইয়াছেন। ইহাই 'মন্ত্রশক্তি'তে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব।

এই উপন্যাসে ঘটনা-বিষয়ক কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। যেমন মধ্যযুগের সামন্ত রাজগণের পরিবারে কতকগুলি বিশেষ প্রথার প্রচলন ছিল, সেইরূপ এই জমিদার পরিবারের মধ্যেও এমন কতকগুলি অলঙ্ঘনীয় ব্যবস্থা ছিল যাহা তাহাদের সাধারণ জীবন-যাত্রাপথে অনেক জটিলতার প্রবর্তন করিয়াছে। প্রথম পুরোহিত-নিয়োগ-বিষয়ক ব্যবস্থা, যাহার ফলে জমিদারের ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে অম্বরনাথের মন্দির-প্রবেশ ও বাণীর সহিত তাহার সংঘর্ষ। দ্বিতীয়—বিবাহ সম্বন্ধীয় অনুশাসন, যাহা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া বাণী সেই উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত অম্বরনাথকে পতিত্বে বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই বিশেষত্বগুলিই উপন্যাসের আখ্যায়িকাতে কতকটা অসাধারণত্বের সঞ্চার করিয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছুই নাই।

চরিত্র-সৃষ্টির দিক্ দিয়া এক বাণীই পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিতভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তাহার কঠোর, ক্ষমাহীন দেব-নিষ্ঠা, অম্বরনাথের প্রতি তাহার নিষ্ঠুর অবজ্ঞা, পিতামাতার প্রতি তাহার অভিমানের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-বর্ষণ—খুব স্বাভাবিক অথচ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বিবাহ-কালে অম্বরের ধীর, সংযত ব্যবহার ও অক্ষুণ্ণ আত্মসম্মানবোধ তাহার বদ্ধমূল অবজ্ঞাকে ঈষৎ বিচলিত করিয়াছে, কিন্তু এই সমস্ত গুণও সে অম্বরের অবস্থা-দৈন্যের স্বাভাবিক সংকোচ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। তারপর অম্বরের দীর্ঘ প্রবাস ও একান্ত নির্লিপ্ত উদাসীনবৎ ব্যবহার তাহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে, নিজ অনিবার্য শ্রদ্ধা ও ভক্তিকে আর সে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। এই সময় তাহার মাতার অকস্মাৎ মৃত্যুতে তাহার মনের গভীর-শোকাচ্ছন্ন, নিঃসঙ্গ অন্ধকারে প্রধূমিত শ্রদ্ধা প্রেমের দীপ্তশিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই ক্রমশঃ প্রোজ্জ্বল অনুরাগ-শিখায় মন্ত্রশক্তি ঘৃতাহুতি দিয়াছে। এই ক্রমবর্ধমান অনুরাগের সহিত জ্বালাময় অনুতাপ যোগ দিয়া তাহার সর্ব দেহমনকে কিরূপে অগ্নিময় বেষ্টনে জড়াইয়া ধরিয়াছে, কিরূপে তাহার অভিমান ও অহংকারকে গলাইয়া তাহাকে দীনহীনা কাঙ্গালিনীতে পরিণত করিয়াছে, তাহার বর্ণনায় তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তি ও কাব্যের মনোজ্ঞতা সম্মিলিত হইয়াছে। বাণীর চরিত্রের বিশেষত্ব, তাহার গভীর ধর্মভাব ও ভক্তিপ্রবণতা স্মরণ করিলে মন্ত্রশক্তির প্রভাব তাহার মনোভাব পরিবর্তনের পক্ষে একমাত্র উপায় বলিয়া মনে হয়, কেননা কেবল মাত্র অম্বরনাথের চরিত্রগৌরব তাহার অনম্য দৃঢ়তাকে গলাইতে পারিত কি না সন্দেহ। এই উদাত্ত, যুগ-যুগান্তরের স্মৃতিবিজড়িত মহামন্ত্র অনুক্ষণ তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইয়া তাহাকে তাহার অপরাধ সম্বন্ধে তীব্র অনুশোচনাপূর্ণ করিয়া তুলিল ও তাহার সমস্ত অহংকার চূর্ণ করিয়া তাহাকে স্বামীর উদ্দেশ্যে ছুটাইল। এই মন্ত্রশক্তির উপর অবিচলিত বিশ্বাসে সে মৃতকল্প স্বামীর দেহ লইয়া বসিয়াছে এবং তাহার একাগ্র সাধনা যে পতিকে পুনর্জীবন দানে কৃতকার্য হইয়াছে, উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে।

শেষ পরিচ্ছেদটির জ্বলন্ত আবেগময় ভাষা বাণীর বাহ্যজ্ঞানরহিত ধ্যানাবিষ্ট একাগ্রতার সহিত সুন্দর সংগতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে। এই পরম তন্ময়তার মুহূর্তে সে সাধারণ রমণীর সমতলভূমি হইতে এক অতি-মানব আদর্শলোকে উন্নীত হইয়া পৌরাণিক সতীদের সঙ্গে সমান আসন গ্রহণ করিয়াছে।

গ্রন্থের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ অল্প কথায়, অথচ খুব জীবন্তভাবে চিত্রিত হইয়াছে। সমস্ত আখ্যানটির পরিকল্পনায় তাহারা খুব স্বাভাবিক ভাবেই আপন স্থান গ্রহণ করিয়াছে। রমাবল্লভ ও কৃষ্ণপ্রিয়া—বাণীর পিতামাতা, উভয়েই কন্যাগত-প্রাণ এবং এই অপত্যস্নেহই তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রধান কথা; কিন্তু তথাপি এই সাম্যের মধ্য দিয়াও তাঁহাদের মনোভাবের পার্থক্য খুব সূক্ষ্মভাবে সূচিত হইয়াছে। পুরোহিত আশুনাথের দৃপ্ত, অভ্রভেদী অহংকার ও পাণ্ডিত্যাভিমান, অম্বরের প্রতি তাহার বিজাতীয় বিদ্বেষ তাহাকে বাণীর পুরুষ-সহযোগীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। উপন্যাসের আর একটি খণ্ডচিত্র আশ্চর্য কলাকৌশলের সহিত বৃহত্তর চিত্রের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মৃগাঙ্ক ও অজ্ঞার বিচ্ছেদমিলনের চিত্রটির ক্ষীণতর গতিবেগ ও ম্লানতর বর্ণবিন্যাস বৈপরীত্যমূলক তুলনার দ্বারা বাণী-অম্বরের গভীরতর, প্রবলতর সমস্যাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। মৃগাঙ্কের পত্নীর প্রতি ঔদাসীন্য একটা নিষ্কারণ খেয়াল মাত্র; এবং এই খেয়ালের অবসান ঘটিল অপেক্ষাকৃত সামান্য কারণে, অজ্ঞার নীরব সহিষ্ণুতা ও সেবা-কুশলতায়। বাণীব স্বামিবিদ্বেষ তাহার জীবনব্যাপী আদর্শ ও সাধনার অনিবার্য ফল, এই মনোভাবের গতি-বেগ অতি তীব্র, ইহার স্থায়িত্বও অতি দীর্ঘ; এবং ইহার পরিবর্তন ঘটিল সুদীর্ঘ অনুশোচনায়, মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন রহস্যান্ধকারের মধ্যে দৈবশক্তির চিরদীপ্ত অনির্বাণ আলোকে। মৃগাঙ্ক-অজ্ঞার ক্ষুদ্র চিত্র মাপকাঠির ন্যায় বাণী-অম্বরের কাহিনীর সুদূর-প্রসারী গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার পক্ষে আমাদের সহায়তা করে।

উপন্যাসের অন্যান্য মনুষ্য-চরিত্রের মধ্যে দেব-বিগ্রহ গোপীনাথজিউকে একটি চরিত্র বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। বাস্তবিক সকলের অপেক্ষা ইনিই অধিক ক্রিয়াশীল, উপন্যাসোক্ত ঘটনার ঠিক কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত। দেব-মন্দিরের ধূপ, দীপ, শঙ্খ, ঘণ্টা, ষোড়শোপচারে পূজার আয়োজন-সম্ভার—ইহারই বর্ণনা উপন্যাসের অধিকাংশ স্থল অধিকার করিয়া আছে। দেব-বিগ্রহই বাণীর প্রথম প্রীতিভাজন—তাহার কুমারী-হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি-অর্ঘ্য ইনি প্রথম হইতেই আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। ইঁহারই প্রসাদ-লাভে অসমর্থ বলিয়া বেচারা অম্বর বাণীর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। উপন্যাসের ঘটনা-বিন্যাসের সমস্ত জটিল সূত্র ইঁহার করতলধৃত—যেমন সূর্যমণ্ডল হইতে কিরণরাশি ছড়াইয়া পড়ে, তেমনই ইঁহারই মন্দিরতল হইতে উপন্যাসের সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতমূলক শক্তি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছে। মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-মূলক উপন্যাসে দেব-চরিত্রের এই প্রাধান্য হিন্দু ধর্মজীবনে মোটেই অস্বাভাবিক নহে। আমাদের ধর্মজীবনের এই বিশেষত্ব—বাস্তব জীবনের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান উপন্যাসে প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়াই ইহার অনন্যসাধারণ গৌরব ও কৃতিত্ব।

'পথ-হারা' উপন্যাসটি ভিন্ন দিকে লেখিকার উপন্যাসসমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করে। ইহা বঙ্গদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে অত্যন্ত সুপরিচিত বিপ্লববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণতঃ রাজ-নৈতিক বা সমাজনৈতিক আন্দোলনমূলক উপন্যাস আর্টের দিক্ দিয়া খুব উৎকর্ষ লাভ করে না;

কেননা ইহার চরিত্রসমূহের ব্যক্তিত্ব সমগ্র আন্দোলনটির বিশালতার ছায়ায় জীবনী-শক্তিহীন ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। লেখকের প্রধান লক্ষ্য থাকে ব্যাপক আন্দোলনটিকে ফুটাইয়া তোলাতে, আন্দোলনের সহানুভূতিমূলক বা অসমর্থনসূচক বিশ্লেষণে, ইহার পিছনে যে বিপুল ভাবাবেগ বা যুক্তিযুক্ত, বিচারসহ জাতীয় দাবী থাকে তাহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যায়। কাজেকাজেই লেখক প্রতিবেশ-রচনায় এতই নিবিষ্টচিত্ত থাকেন যে, মনুষ্য-চরিত্রগুলি নিতান্ত গৌণ বা অপ্রধান হইয়া পড়ে—তাহাদের ভাব ও ভাষা রাজনৈতিক চিন্তাধারারই প্রতিধ্বনি মাত্র হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়'-এর পাত্র-পাত্রীদের বিরুদ্ধে এই সুরের সমালোচনা কম-বেশি প্রযোজ্য। 'চার অধ্যায়'-এর অন্তু বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে স্বাধীন ব্যক্তিত্বের নিষ্ফল, ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার প্রতীক মাত্র—তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যে এই নির্মম আন্দোলনের রথচক্রে পিষ্ট ও দলিত হইয়াছে ইহাই তাহার চিরন্তন অভিযোগ। দল বা জাতির সম্মিলিত দাবী ব্যক্তিত্বের ক্ষীণ, অথচ বিচিত্র-লীলায়িত সুরকে ছাপাইয়া ধ্বনিত হয়—ব্যক্তিত্ব সংকুচিত হইয়া দশের ভিড়ের মধ্যে নিজ স্থান গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। আন্দোলন-মূলক উপন্যাসের এই একটা প্রধান বিপদ্; এবং আন্দোলনটি যত আধুনিক হইবে, বিপদের মাত্রা ততই বাড়িবে।

অনুরূপা দেবী তাঁহার 'পথ-হারা' উপন্যাসে এই বিপদ্ সম্পূর্ণরূপেই কাটাইয়া উঠিয়াছেন—তাঁহার চরিত্রগুলির স্বাধীন স্ফুরণ তিনি কোন বিরুদ্ধ-শক্তির দ্বারা ব্যাহত হইতে দেন নাই। উপন্যাসের মধ্যে বিপ্লববাদের কোন সাধারণ চিত্র দেওয়া হয় নাই, কেবলমাত্র কয়েকটি তরুণ-জীবন ক্রীড়াচ্ছলে কেমন করিয়া ইহার সাংঘাতিক জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। বিমলেন্দু, অসমঞ্জ, উৎপলা—ইহাদেরই ভাগ্য-বিবর্তনে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে—বিপ্লববাদের প্রতিবেশ সম্বন্ধে আমাদের কোনই কৌতূহল নাই। ছেলেরা খেলা করিতে করিতে হঠাৎ গভীর জলে পড়িলে তাহাদের মুখে-চোখে যেরূপ কাতরভাব ফুটিয়া উঠে, যেরূপ করুণ, নিষ্ফল প্রচেষ্টার সহিত তাহারা হাত-পা ছুঁড়িতে থাকে, তাহাদের কিশোরকণ্ঠে যেরূপ ব্যাকুল, অসহায় কান্নার সুর ফুকারিয়া উঠে, হঠাৎ এই বিপ্লববাদরূপ রাক্ষসের কুক্ষিগত হইয়া উপন্যাসের এই কয়েকটি দুরন্ত ছেলের বাস্তবের সহিত অপরিচিত তরুণ জীবনে তেমনই একটা মর্মস্পর্শী বিলাপের কোলাহল মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা যখন হাস্যকর গাম্ভীর্যের সহিত বিপ্লববাদের অভিনয় করিতে বসিয়াছে, রক্তলিপিতে প্রতিজ্ঞা-পত্র স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছে, আজীবন শপথ-পালন ও শপথ-ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্তের বিষয়ে বড় বড় কথা বলিয়াছে, তখন বিধাতা-পুরুষ নিশ্চয়ই অলক্ষ্যে হাসিয়াছেন। মৌখিক প্রতিজ্ঞা ও তাহার অক্ষরে অক্ষরে পালন—এই দুই-এর মধ্যে যে মারাত্মক ব্যবধান তাহা কি এই ভ্রান্ত, অন্ধ তরুণের দল উপলব্ধি করিয়াছিল? যে খড়্গ তাহারা অপরকে বলি দিবার জন্য শান দিতেছিল তাহাতে তাহাদের প্রিয়তম সহকর্মীই প্রথম উৎসর্গীকৃত হইবে, যে জাল পরের জন্য বিস্তার করিতেছিল তাহাতে তাহাদের নিজেরই গলায় ফাঁস পড়িতে পারে—এই ভয়াবহ চিত্র নিশ্চয়ই তাহাদের কল্পনানেত্রে যথেষ্ট উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। তাই যখন সেই সম্ভাবিত বিপদ্ সত্য সত্যই ঘটিয়া গেল, যখন উৎপলা দলপতি হিসাবে নিজ প্রিয়তম ভ্রাতার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞায় স্বাক্ষর করিয়া বসিল, যখন বিমলেন্দু তাহার অন্তরতম বন্ধুর বিরুদ্ধে সেই নৃশংস আদেশ কার্যে পরিণত করার ভার প্রাপ্ত হইল, তখন তাহারা যে স্বাভাবিক সুকুমার বৃত্তিগুলির কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহাদেরই

একটা প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া তাহাদের যত্নরচিত কৃত্রিম ব্যবস্থাকে ভাগীরথী-প্রবাহে ঐরাবতের ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া গেল। সেই প্রচণ্ড প্লাবনের আঘাতে উৎপলা তাহার পৌরুষের ছদ্মবেশের ভিতর দিয়া তাহার চিরসুপ্ত, অন্তর্নিরুদ্ধ নারীপ্রকৃতির পরিচয় পাইয়া গেল—তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ বৈপ্লবিকতার প্রস্তরতট ভেদ করিয়া ভ্রাতৃস্নেহ ও প্রণয়াকাঙ্ক্ষার যুগ্মস্রোত ভোগবতী-ধারার ন্যায় নির্ঝরবেগে প্রবাহিত হইল। উৎপলার এই অতর্কিত পরিবর্তন ও তাহার মর্মভেদী যন্ত্রণার চিত্র মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও তীব্র ভাবাবেগ-বর্ণনার দিক্ দিয়া ঔপন্যাসিক আর্টের খুব উচ্চস্তরে পৌঁছিয়াছে। বিমলেন্দুর আবিষ্কার ততোধিক চমকপ্রদ ও তাহার পক্ষে সত্যসত্যই সাংঘাতিক হইয়াছে। অন্তরঙ্গ সুহৃদ্‌কে বলি দিবার জন্য সে প্রস্তুত হইয়াই গিয়াছিল। কিন্তু যখন দেখিল যে, সে ইতিমধ্যে তাহার উপর আরও একটা প্রবলতর দাবীর সৃষ্টি করিয়াছে, সে কেবলমাত্র বন্ধু নহে, তাহার সংসারের একমাত্র স্নেহপাত্রী ভগিনী তারার স্বামী, তখন তাহার প্রাণপণ শক্তিতে ধরিয়া রাখা স্থিরসংকল্প ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু উদ্যত রক্তলোলুপ অস্ত্র তখন আর বলি না লইয়া ফিরিবে না—সুতরাং হতভাগ্য আত্মপ্রাণ বলি দিয়াই নিজ জীবনব্যাপী ভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে।

বিমলেন্দুর পূর্বজীবন বিপ্লববাদের এই ঘূর্ণাবর্তের দিকে তাহার প্রবণতাকে খুব স্বাভাবিক করিয়াছে। অবশ্য তাহার বিপ্লববাদের সহিত জড়িত হইয়া পড়া অনেকটা আকস্মিক ঘটনার ফল—কিন্তু তাহার সমস্ত প্রকৃতিটি এমনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল যে, চুম্বক যেমন লৌহখণ্ডকে টানে, এই বিপদ্‌সংকুল দুঃসাহসিকতার আহ্বান তাহাকে তেমনি অনিবার্য বেগে আকর্ষণ করিয়া লইল। অমৃত সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও স্বার্থপরবশতাহেতু, বিমলেন্দুকে সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতের মুঠায় রাখিবার জন্য, তাহার এই দুর্নিবার পতন-বেগকে বিন্দুমাত্র বাধা দেয় নাই। যে স্পর্ধিত ঔদ্ধত্যের সহিত সে অমৃতকে ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে, তাহাই তাহার পতন-বেগকে বাড়াইয়া তাহাকে একেবারে বৈপ্লবিকতার ঘূর্ণাবর্তের ঠিক কেন্দ্রস্থলে নিক্ষেপ করিয়াছে। তাহার আত্মঘাতী মত্ততার যেটুকু বাকী ছিল, তাহা প্রণয়ের মোহাবেশ সম্পূর্ণ করিয়াছে—উৎপলার অঙ্গুলি-সঞ্চালন তাহাকে ইন্দ্রজালের সম্মোহন-শক্তিতে অভিভূত করিয়া বৈপ্লবিকতার চোরাবালিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়াছে। এইরূপে তাহার জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা নিয়তির অদৃশ্যশক্তি-চালিত হইয়াই যেন তাহার সর্বনাশ-সাধনের কার্যে সহযোগিতা করিয়াছে।

উপন্যাসটির সমস্ত চরিত্র অতি সুনিপুণ হস্তে চিত্রিত হইয়াছে। অসমঞ্জের নীতি-পরিবর্তনের কারণ দেওয়া হইয়াছে রামদয়ালের প্রভাব—কিন্তু তাহার বিপ্লববাদ-পরিহারের প্রধান কৃতিত্ব রামদয়ালের তর্ককুশলতা অথবা তারার মোহকর সৌন্দর্যের প্রাপ্য তাহা সন্দেহের বিষয়। যাহাই হউক এই মত-পরিবর্তনের ব্যাপার লইয়া লুকোচুরি খেলা অসমঞ্জ-চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা ও দলপতি হিসাবে ইহা তাহার অনপনেয় কলঙ্ক। এতগুলি তরুণ জীবনকে মরণের পথে টানিয়া আনিয়া তাহাদের নিকট প্রকাশ্য ঘোষণা না করিয়া গোপনে সরিয়া পড়া—এই নিতান্ত হেয়, কাপুরুষোচিত ব্যবহার বিমলেন্দুর মনে যে তিক্ত, ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের ঝলক জাগাইয়া তুলিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অসমঞ্জের সকলের চেয়ে ভয় ছিল উৎপলার তীক্ষ্ণ-বিদ্রূপাত্মক, অবজ্ঞাসূচক উচ্চহাস্য এবং প্রধানতঃ ইহা এড়াইবার জন্যই তাহার গোপনতা-আশ্রয়। যুক্তিতর্কে সহচরদিগকে ফেরান অসম্ভব বলিয়াই হয়ত সে ভাবিয়া-

ছিল যে, দলপতির পৃষ্ঠভঙ্গে দল যদি আপনি ভাঙিয়া পড়ে পড়ুক। নিছক আত্মপ্রাণরক্ষা ও সুখ-লালসা তাহার উদ্দেশ্য ভাবিলে তাহার চরিত্রকে অত্যন্ত নীচ করিয়া দেওয়া হয়।

রামদয়াল ও ইন্দ্রাণীর চরিত্র আদর্শবাদমূলক হইলেও কোনরূপ অবাস্তবতাগ্রস্ত হয় নাই। ইন্দ্রাণীর প্রশান্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, যাহার জন্য সে নিজ দাম্পত্য জীবনকেও পূর্ণবিকশিত হইবার অবসর দেয় নাই, তাহার চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব। অমৃতের চবিত্রটিও তাহার কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে বেশ ফুটিরা উঠিয়াছে। তাহার চরিত্রে একটা অদম্য দৃঢ়সংকল্প বা একগুঁয়েমির ধারা ছিল যাহা তাহাকে বিমলেন্দুর অভিভাবকত্বের যোগ্যতা দিয়াছিল। হিংস্র-প্রকৃতিকে কিরূপে বশে রাখিতে হয় সে রহস্য অমৃতের ভালই জানা ছিল, এবং হিংস্রজন্তুর পালক যেমন শেষ পর্যন্ত তাহার পালিত পশুর হাতেই প্রাণ দেয়, অমৃতেরও শেষ পরিণাম ঠিক তদ্রূপই হইয়াছিল।

মঙ্গলার চরিত্র-সৃষ্টি বিশেষভাবে নারী-হস্তের রচনার সাক্ষ্য প্রদান করে। উপন্যাস-সাহিত্যে মুখরা, কলহবিদ্যায় বিশেষ নিপুণা বৃদ্ধার চিত্র মোটেই অপরিচিত নহে—ইহা আমাদের হাস্যরস উদ্রেক করিবার একটা খুব সুলভ, চিরপ্রথাগত উপায়। কিন্তু মঙ্গলার চরিত্রে কতকটা বিশেষত্ব আছে—সে ঠিক সাধারণ শ্রেণীব প্রতিনিধি নহে। প্রথমতঃ, উপন্যাসের মধ্যে সে অন্যতম প্রধান চরিত্র—বিমলেন্দুব ভবিষ্যৎ পরিণামের জন্য এক দৈবের পরেই সে সর্বাপেক্ষা বেশি দায়ী। তাহারই অনুচিত প্রশ্রয়ে, তাহাবই বিদ্বেষ-উদ্‌গিবণেব জন্য বিমলের শিক্ষা-দীক্ষা প্রকৃত পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। সুতরাং অন্যান্য উপন্যাসে এই জাতীয় চরিত্র যেমন কেবল হাস্যরসের উপাদান যোগাইয়া থাকে, মঙ্গলার কর্তব্য তদপেক্ষা গুরুতর। দ্বিতীয়তঃ বিমলের প্রতি তাহার একটা প্রকৃত, হউক না তাহা স্বার্থবুদ্ধি-জড়িত, ভালবাসা ছিল। ইন্দ্রাণীর বিষয়ের কর্তৃত্ব ও বিমলের অভিভাবকত্ব গ্রহণে সে যেরূপ বাধা দিয়াছে তাহাতে তাহার দৃঢ়সংকল্প ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়—এমন কি তাহার জামাতাও তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিমলের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হয় নাই। পুরাণ-বর্ণিত রাক্ষস যেরূপ অতন্দ্র সতর্কতার সহিত স্বর্গোদ্যানের ফল জোগাইত, সে বিমলের উপর তাহার একাধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য সেইরূপ সচেষ্ট থাকিত। কিন্তু তাহার এই ঈর্ষাপরবশ অতি-সতর্কতাই তাহার অধিকারস্খলনের হেতু হইয়াছে। অমৃতকে সেই আমদানি করিয়া খাল কাটিয়া কুমীর আনিয়াছে। শেষ পর্যন্ত বিমল তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে, এমন কি তাহার খাওয়া-পরারও একটা ব্যবস্থা করিতে ভুলিয়াছে। মঙ্গলার যতই দোষ থাকুক, তাহার অন্তিম দৃশ্য তাহার প্রতি আমাদের সহানুভূতির উদ্রেক করে।

উপন্যাস-ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ মহিলা-ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অনুরূপা দেবীর স্থান সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার কয়েকখানি উপন্যাস সাহিত্য চিরস্মরণীয়তা লাভের উপযুক্ত। তাঁহার রচনার মধ্যে নারী-হস্তের স্পর্শ নির্ভুলভাবে নির্দেশ করা কঠিন—সাধারণতঃ তাঁহার মন্তব্যের প্রাচুর্য ও বিশ্লেষণের গুরুত্ব পুরুষের পাণ্ডিত্য-পরুষ আলোচনার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। তথাপি তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে কতকগুলি দৃশ্য রচয়িত্রীর নারীসুলভ কমনীয়তার নিদর্শন। 'মা' উপন্যাসে ব্রজরাণীর নিদারুণ অভিমান ও ঈর্ষা; 'গরীবের মেয়ে'তে নীলিমার বঞ্চিত হৃদয়ের প্রেম-বুভুক্ষা; 'মন্ত্রশক্তি'তে বাণীর নিগূঢ় মর্মোদ্‌ঘাটন; 'পথ-হারা'তে

উৎপলার অতর্কিত নারীত্ব-বিকাশ—এই সমস্ত দৃশ্যগুলিকে নারীর স্বজাতিসম্বন্ধে সূক্ষ্মদর্শিতা ও সহজ ও সংস্কারলব্ধ অভিজ্ঞতার প্রমাণস্বরূপ দাখিল করা যাইতে পারে।

নিরুপমা ও অনুরূপা দেবী উপন্যাস-ক্ষেত্রে যে বিশেষ দিকের পথপ্রদর্শন করিয়াছেন, সেই পথে অন্যান্য মহিলা ঔপন্যাসিকও তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের রচনার বিস্তৃত আলোচনার স্থানাভাব; বিশেষতঃ তাঁহাদের মধ্যে এমন কোন নূতনত্ব বা মৌলিকতা নাই, যাহা বিশেষ করিয়া বিশ্লেষণ-যোগ্য। এই সমস্ত লেখিকার মধ্যে ৺ইন্দিরা দেবীর 'স্পর্শমণি' দাম্পত্য মনোমালিন্যের পুরাতন বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইনি মোটের উপর নিরুপমা-অনুরূপারই ধারার অনুবর্তন করিয়াছেন। এই শ্রেণীর অন্যান্য লেখিকার মধ্যে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ও শৈলবালা ঘোষ জায়া অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে নূতন ধারা প্রবর্তনের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মোটের উপর ইঁহারা সকলেই কম-বেশি পুরাতন আদর্শ ও সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্না ও এই আদর্শ-সংঘর্ষের যুগে পুরাতনেরই পোষকতা করেন। এ পর্যন্ত উপন্যাস-ক্ষেত্রে স্ত্রীজাতির অবদান, বিশেষত্বের দিক্ দিয়া, আশানুরূপ পর্যাপ্ত হয় নাই। পুরাতন জীবনযাত্রায় নারীর স্থান ও সমস্যা ইঁহাদের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই সমস্যার আলোচনা অনেকটা সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়াছে; ইঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য ও ভাবগভীরতা সঞ্চারিত হয় নাই। ইহা হয়ত বিষয়-বস্তুর দৈন্য ও সংকীর্ণতার অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু বঙ্গ-উপন্যাসে Jane Austen ও George Eliot-এর আবির্ভাব এখনও প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত।

(১২)

সীতা ও শান্তা দেবীর উপন্যাসাবলীর সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। মহিলা-রচিত উপন্যাস-সাহিত্যের একটি নূতন স্তর ইঁহাদিগের মধ্যে সূচিত হইয়াছে। ইঁহাদের বিষয়-বস্তু, ভাষা ও জীবন সম্বন্ধে আলোচনা ও মন্তব্য এতই অভিন্ন যে, ইঁহাদের পরস্পরের সহিত তুলনায় বিশেষত্ব নির্ধারণ করা অত্যন্ত দুরূহ। ইঁহারা যেন সাহিত্যাকাশের যুগ্ম-তারা, যাহাদের রশ্মির পার্থক্য অনুভব-গম্য নহে।

সীতা দেবীর রচনার মধ্যে অনেকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি ও কতকগুলি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস আছে। 'বজ্রমণি', 'ছায়াবীথি' ও 'আলোর আড়াল'—এইগুলি ছোট গল্প; 'পথিক-বন্ধু' (১৩২৭), 'রজনীগন্ধা' (১৩২৮), 'পরভৃতিকা' (১৩৩৭), 'বন্যা' এই কয়টি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। ছোট গল্পগুলির মধ্যে অধিকাংশই সামাজিক বৈষম্য ও অসংগতিমূলক—আলোচনা বিশেষত্ব-বর্জিত। কতকগুলির বিষয় রোমান্টিক ও ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'আলোর আড়াল' ও 'ভ্রষ্টতারা' নামক দুইটি গল্প এই সমষ্টির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পূর্বোল্লিখিত গল্পে অন্ধ স্বামীর সহিত বিবাহিত অতি কুৎসিত-দর্শনা স্ত্রীর খেদোচ্ছ্বাসের মধ্যে যথেষ্ট সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও ভাষা-গৌরব আছে।

পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের মধ্যে 'পরভৃতিকা' উৎকর্ষের দিক্ দিয়া সর্বনিম্ন স্থান অধিকার করে। ইহার গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার মধ্যে চমকপ্রদ ঘটনার সন্নিবেশ হইয়াছে। মেয়ে স্কুল ও বোর্ডিং-এর

স্নেহহীন আবেষ্টনের রুক্ষ-কঠোর প্রতিবেশ কৃষ্ণার চরিত্রের স্বাভাবিক মাধুর্যটিকে আরও বিকশিত করিয়াছে। তাহার সহপাঠিনীগণ ও যে পরিবারে সে শিক্ষয়িত্রীর কার্য গ্রহণ করিয়াছে সেই পরিবারের সহিত তাহার বিচিত্র সম্পর্কের বিষয় সুচিত্রিত হইয়াছে, তবে এই বর্ণনাতে চরিত্রোন্মেষ অপেক্ষা ঘটনা-বৈচিত্র্যের উপরই অধিক ঝোঁক পড়িয়াছে। তাহার বর্মাপ্রবাসের বিবরণের আকর্ষণ উপন্যাস হিসাবে নয়, ভ্রমণ-কাহিনী হিসাবে। সুধীরের সহিত কৃষ্ণার পরিচয় ও ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে ক্রমশঃ প্রণয়োন্মেষ-বর্ণনার মধ্যে অপটু হস্তের নিদর্শন মিলে। তারপর উহাদের জন্ম-রহস্যভেদের ফলে উহাদের আপেক্ষিক অবস্থার পরিবর্তন,—সুধীরের অভিমানদৃপ্ত আত্মমর্যাদাবোধের স্ফুরণ ও কৃষ্ণার অতর্কিত সৌভাগ্যে বিস্ময়-বিমূঢ় ভাবের চিত্র আশানুরূপ উৎকর্ষ লাভ করে নাই। বিশেষতঃ যে দৃশ্যে সুধীর মাতার নিকট কৃষ্ণার প্রতি নিজ অনুরাগের রহস্য ব্যক্ত করিয়াছে তাহাতে একটা অশোভন ব্যস্ততা ও অভব্যতা প্রকটিত হইয়াছে। মোট কথা, চরিত্র-সৃষ্টি ও উপন্যাসোচিত ঘাত-প্রতিঘাতের দিক্ দিয়া উপন্যাসটির স্থান তাদৃশ উচ্চ নহে।

'পথিক-বন্ধু' উপন্যাসটি রচনা-কালের দিক্ দিয়া অগ্রবর্তী হইলেও উৎকর্ষের দিক্ দিয়া 'পরভৃতিকা' অপেক্ষা প্রশংসনীয়। 'পরভৃতিকা'তে ঘটনা-বৈচিত্র্যের আধিক্য উপন্যাসোচিত রস-বিকাশের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'পথিক-বন্ধু'তেও ভ্রমণ-কাহিনীর উপভোগ্য রসের অভাব নাই, কিন্তু এই ভ্রমণবৃত্তান্ত ও প্রকৃতিবর্ণনার মধ্য দিয়া চরিত্রগুলির ভাব-পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে। ঠাকুরপাড়ার ঘনশ্যাম, বর্ষাস্নিগ্ধ, বন্য প্রকৃতি, সাঁওতাল পরগণার ঊষর প্রতিবেশের মধ্যে শিমুলফুলের দীপ্ত রক্তরাগ ও বসন্তের বর্ণ-সমারোহ, পুরীর সমুদ্রতরঙ্গের অশান্ত, চিরমুখর রোদনোচ্ছ্বাস ও সৃষ্টিলোপকারী মহাঝটিকা—এ সমস্তই কেবল যে উচ্চাঙ্গের বর্ণনাশক্তির পরিচয় তাহা নহে, দেবপ্রিয় ও অনিন্দিতার সম্পর্কটি মাধুর্যরসে ও ব্যাকুল হৃদয়াবেগে পরিপূর্ণ করিয়া তোলার সহায়-স্বরূপ ইহাদের একটা বিশেষ মনস্তত্ত্বমূলক প্রয়োজনীয়তা আছে।

উপন্যাসটির আখ্যান-বস্তুর মধ্যেও কতকটা নূতনত্ব আছে। দেবপ্রিয় তাহার শিক্ষা-সমাপ্তির পর দেশের বালকবালিকার মধ্যে আনন্দপ্রচারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছে—বায়োস্কোপের ছবি, গ্রামোফোনের গান, নানারূপ ক্রীড়াকৌতুক দেখাইয়া শীর্ণদেহ, শুষ্কমন শিশুদের মুখে হাসি ফুটাইয়া তোলাই তাহার জীবনের কাজ। এই প্রচারকার্যের মধ্যে সে প্রণয়ব্যাপারে প্রত্যাখ্যাতা ও বিষাদমগ্না অনিন্দিতার সহিত পরিচিত হইয়াছে। ঠাকুরপাড়ার স্নিগ্ধ-শ্যাম প্রকৃতির প্রতিবেশের মধ্যে তাহাদের প্রথম পরিচয়ে তাহারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, ও তাহাদের প্রথম আলাপ সৌজন্য, সরস, অথচ নির্দোষ আনন্দ-বিনিময় ও শিষ্ট, বিনীত প্রশংসাবাদের জন্য উপভোগ্য হইয়াছে। কিন্তু অনিন্দিতার সদ্যতিক্ত অভিজ্ঞতা তাহার চিত্ত-প্রবাহের মুখে পাষাণভারের ন্যায় চাপিয়া বসিয়াছে—সে তাহার মনের রশ্মিকে টানিয়া ধরিয়া সবলে তাহার মুখ ফিরাইয়াছে। তাহাদের দ্বিতীয় আলাপে অপরিচয়ের বাধা-সংকোচ অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে—অনিন্দিতা দেবপ্রিয়কে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের বন্ধুত্বকে যে সে কোন ক্রমেই প্রণয়ের পর্যায়ে উন্নীত হইতে দিবে না তাহাও স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছে। অনিন্দিতার সমস্ত ব্যবহারের উপর একটা ম্লান বিষাদ ও শোকস্তব্ধ গাম্ভীর্যের ছায়াপাত সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। তাহার প্রত্যাখ্যানকারী প্রথম প্রণয়ীর

সহিত অতর্কিত সাক্ষাতে তাহার হৃদয়ে যে জ্বালাময় নৈরাশ্যের পুনরাবির্ভাব হইয়াছে, তাহার প্রভাবে সে দেবপ্রিয়ের প্রথম প্রণয়-নিবেদনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কিন্তু এই প্রত্যাখ্যানের পরেই তাহার বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের মানদণ্ড আবার সমতা-প্রাপ্ত হইয়াছে—প্রেম তাহার স্বাভাবিক ক্ষুধা ও ব্যাকুলতা লইয়া তাহার হৃদয়ে নব-জাগ্রত হইয়াছে ও সে অনুতপ্তহৃদয়ে দেবপ্রিয়ের সন্ধান করিতে চলিয়াছে। কলিকাতায় তাহার অশান্ত মন পারিবারিক সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে একটা বিক্ষোভ জাগাইয়া, আঘাত করিয়া ও কঠোরতর প্রতিঘাত সহ্য করিয়া অতিরিক্ত অভিমান-প্রবণতা ও অশ্রু-পাতের দ্বারা আপন দুঃসহ বেদনাকে মুক্তি দিতে চাহিয়াছে। ঠাকুরপাড়াতে দেবপ্রিয়ের মাতার তিরস্কার-বাক্যে সে দেবপ্রিয়ের যে কতটা ক্ষতি করিয়াছে তাহা অনুভব করিয়াছে। এই অনুভব তাহার অনুতাপ ও হৃদয়াবেগের মাত্রা অসংবরণীয়-রূপে বাড়াইয়াছে। শেষে সে তীর্থযাত্রার অছিলায় নিজ প্রণয়াস্পদের মানস-অভিসারে বাহির হইয়াছে। এই নিরুদ্দেশ যাত্রা শেষ হইয়াছে পুরীতে সমুদ্রতীরে—সেখানে তাহার অভিসার সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, সে তাহার প্রণয়াস্পদের সাক্ষাৎলাভ করিয়া ও তাহার নিকট সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়া প্রেমের প্রতি অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। শেষ পরিচ্ছদে তাহাদের বিবাহিত জীবনের চিত্র কিন্তু অনিন্দিতার ধ্যানাবিষ্ট, আত্মসমাহিত প্রণয়াভিসারের উপযুক্ত হয় নাই—আনন্দ-পরিবেশনে স্বামীর সহযোগিতায় প্রণয়ের নিজস্ব আনন্দ-নিবিড়তা ফিকে হইয়া গিয়াছে। দেবপ্রিয়ের চরিত্রের এতটা গভীর আলোচনা নাই, তথাপি তাহার আনন্দপ্রচার-ব্রত তাহার ব্যক্তিত্বকে কতকটা বৈশিষ্ট্য দিয়াছে। গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্র, অনিন্দিতার পারিবারিক আবেষ্টনের চিত্র প্রভৃতি লঘুবিরল রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে।

'বন্যা' উপন্যাসটি একটি সামাজিক অসংগতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুপর্ণা বা সুবর্ণার মাতা তাহার পিতা প্রতুলচন্দ্রের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ও তাঁহার সুস্পষ্ট ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক ক্রূর-প্রকৃতি পরিবারে তাহার বিবাহ দিয়াছিল। এই বিবাহের ফল মোটেই শুভ হয় নাই—শেষ পর্যন্ত মৃত্যু-শয্যাশায়িনী মাতাকে দেখিতে আসার অপরাধে শ্বশুরবাড়ির দ্বার তাহার নিকট চিররুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

সুপর্ণার লজ্জা-কুণ্ঠিত, অশিক্ষিত গ্রাম্যবধূ হইতে স্বাধীন, আত্মনির্ভরশীল মহিলাতে পরিবর্তনই উপন্যাসটির প্রধান বিষয়। এই পরিবর্তনের চিত্র খুব সাধারণ, ইহার মধ্যে কোনও গভীর মনস্তত্ত্বমূলক আলোচনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুদর্শনের প্রণয়-নিবেদনে সুপর্ণার তুমুল অন্তর্দ্বন্দ্বের ছাপ তাহার মন অপেক্ষা দেহকেই অধিক চিহ্নিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সাধারণ hysteria-গ্রস্ত, স্নায়বিক উত্তেজনা-প্রবণ স্ত্রীলোক এরূপ অবস্থায় যাহা করে, সে ঠিক তাহাই করিয়াছে; তাহার শিক্ষা-দীক্ষা, তাহার স্বাধীনতালাভের প্রয়াস যে তাহার বিশেষ কোন সাহায্য করিয়াছে তাহা বোঝা যায় না। শ্রীবিলাসের চরিত্রও বেশ সুচিত্রিত হইয়াছে, তবে তাহার মধ্যে কোনও redeeming feature-এর আভাস মাত্র নাই। তাহার কথাবার্তার মধ্যে কোথাও এতটুকু আবেগের কম্পন বা আত্মগ্লানির আন্তরিকতা নাই—যখন সে সুপর্ণাকে প্রসন্ন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে,তখনও তাহার সমস্ত অনুরোধ-উপরোধের মধ্য দিয়া শুষ্ক-নীরস স্নেহহীনতার কর্কশ কণ্ঠ আত্মগোপন করিতে পারে নাই। সুপর্ণা তাহার মুঠার মধ্যে আসা মাত্রই সে তৎক্ষণাৎ সমস্ত ভদ্রতা-সুরুচির বাহ্যাবরণ বিসর্জন দিয়াছে—তীব্র শ্লেষ ও

ইতর প্রভুত্বপ্রিয়তা তাহার কথায় ও ব্যবহারে অসংকোচে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। শ্রীবিলাসকে কতকটা হীন বর্ণে চিত্রিত করিয়া লেখিকা তত্ত্বালোচনার নিকট human interest-এর বলি দিয়াছেন। শ্রীবিলাসের ইতর ও পাশবিক ব্যবহারের জন্য তাহার দিকে সুপর্ণার মন অণুমাত্রও আকৃষ্ট হইতে পারে নাই—তাহার ও সুদর্শনের মধ্যে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভব হয় নাই। যদি সে যথার্থ অনুতপ্ত হইত, পূর্ব অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সত্য সত্যই ব্যাকুল হইত, তাহা হইলে সুপর্ণার জীবন-সমস্যা ঘনীভূত হইত ও উপন্যাসের রস জমাট বাঁধিত। কিন্তু লেখিকা সেই কঠোরতর পরীক্ষার সম্মুখীন হন নাই। শ্রীবিলাস, সুদর্শন ও সুপর্ণার প্রণয়ের পথে কেবল একটা বহির্জগতের আকস্মিক বাধা মাত্র—যখন বন্যার জলে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, তখন সকলেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে, কাহারও স্মৃতির উপর সে ক্ষীণমাত্র ছায়াও ফেলে নাই, প্রেমিক-মনের অন্ধকারতম কোণেও তাহার অশরীরী ছায়ামূর্তি উঁকি-ঝুঁকি মারে নাই। শ্রীবিলাসের মত স্বামী রূপকথার রাক্ষস-দৈত্যেরই আধুনিক সংস্করণ মাত্র।

(১৩)

'রজনীগন্ধা' (ফাল্গুন, ১৩২৮) লেখিকার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। স্ত্রী-জাতির পক্ষ হইতে, তাহাদের অন্তর্দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত করিবার জন্য, উপন্যাস লিখিলে কিরূপ নূতন আর্টের সৃষ্টি হইতে পারে, 'রজনীগন্ধা' তাহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। ক্ষণিকাদের পরিবার ও গৃহস্থালীর ব্যবস্থার যে চিত্র দেওয়া হইযাছে তাহা অতি সুন্দর ও স্ত্রীজাতিসুলভ সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় প্রদান করে। ক্ষণিকা, মেনকা, লালু তিনটি ভাই-ভগিনীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অতি চমৎকারভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। পরিবারের পুরুষ কর্তৃত্ব নিতান্ত ক্ষীণ ও অস্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত হইয়াছে—ক্ষণিকার বাবা চিররুগ্ন ও অকর্মণ্য, তাহার দাদা প্রবোধ স্বার্থপর ও কর্তব্যজ্ঞানহীন। নারীর হাতে চিত্রতুলিকা থাকিলে পুরুষের ভাগ্যে এইরূপ বিরল বর্ণবিন্যাস খুব স্বাভাবিক। ক্ষণিকার ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবন কৈশোর হইতেই সংসারের গুরুভারে অভিভূত—বোর্ডিং-এ সঙ্গিনীদের আমোদ-প্রমোদ ও চটুল হাস্য-পরিহাস তাহার মনে কোন তারুণ্যের হিল্লোল জাগাইতে পারে নাই। একজন তরুণী শিক্ষয়িত্রী মনোজার অর্থ-সাহায্যে তাহার শিক্ষা চলিতেছে—তাহার অভিমান-প্রবণতা ও সংকুচিত ভাব যেন ভাগ্যদেবীর কৃপণতার বিরুদ্ধে তাহার ক্ষুব্ধ অভিযোগ। ইতিমধ্যে পিতার গুরুতর অসুখে শিক্ষার উচ্চাভিলাষ বিসর্জন দিয়া তাহাকে চাকরি খুঁজিতে হইয়াছে ও স্বভাবভোলা, উদাসীনচিত্ত অধ্যাপক অনাদিনাথের গৃহে তাহার গৃহস্থালীর অভিভাবকরূপে চাকরি মিলিয়াছে। এই চাকরিই তাহার চিরবঞ্চিত জীবনে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রণয়-দেবতার মুগ্ধ আবির্ভাব ঘটাইয়াছে। প্রথম দর্শনেই সে অনাদিনাথের প্রতি অনিবার্যভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। অনাদিনাথের একান্ত ঔদাসীন্য ও আত্মসমাহিত অনাসক্তি তাহার প্রণয়ের মাধুর্যের মধ্যে দুঃসহ বেদনার সঞ্চার করিয়াছে। তাহার এই ব্যর্থ প্রণয়-বেদনার গভীর আত্মজিজ্ঞাসা, ক্ষুব্ধ-করুণ দীর্ঘশ্বাস, ভাগ্যের বিরুদ্ধে ধূমায়িত বিদ্রোহ, এ সমস্তেরই যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে অতুলনীয়। ক্ষণিকার এই অন্তস্তাপ-দুঃসহ প্রেম, শান্ত মৌনতার অন্তরালে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-বিক্ষেপী দাহ আমাদিগকে Charlotte Bronte-এর উপন্যাসে Rochester-এর প্রতি

Jane Eyre-এর জ্বালাময় প্রণয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। Jane Eyre-এর মত ক্ষণিকার বহিঃসৌন্দর্যের কোন আভাস নাই—তাহারই মত তাহার অতৃপ্ত বুভুক্ষা ও অসংকোচ অধিকার-প্রার্থনা। সাধারণতঃ স্ত্রী-জাতির যে লজ্জা-সংকোচ-শালীনতা তাহার প্রণয়-নিবেদনের কণ্ঠরোধ করে, ক্ষণিকা বা Jane Eyre-এর নিভৃত চিন্তায় তাহারা কোনরূপ ছায়া-পাত করে নাই; তাহাদের কামনার উলঙ্গ সত্য সূর্যালোকে শাণিত তরবারির ন্যায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ব্যর্থতার সম্ভাবনা তাহার চিত্তকে শান্ত না করিয়া আরও অসংবরণীয়রূপে উতলা করিয়া তুলিয়াছে। অনাদিনাথের সাধারণ সৌজন্য ও শিষ্টাচার, তাহার অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য উদ্বেগ-প্রকাশ ও ক্ষমা-প্রার্থনা, তাহার বঞ্চিত জীবনে প্রেমের অভাব সম্বন্ধে বেদনা-বোধকে আরও তীব্রতর করিয়াছে। অনাদিনাথের ঔদাসীন্য বরং সহনীয়, কিন্তু তাঁহার মৌখিক ভদ্রতা, মনিব হিসাবে তাঁহার অনিন্দনীয় ব্যবহার অশ্রুপ্লাবনে তাহার ধৈর্যের বাঁধ ছুটাইতে চাহিয়াছে। গিরিডি-প্রবাসকালে শীতের এক নির্জন, নক্ষত্রালোকিত সন্ধ্যায় একত্র ভ্রমণ তাহার প্রণয়ের পাত্রকে কানায় কানায় পূর্ণ করিয়াছে; রহস্য-লোকের অদৃশ্য প্রভাব যেন এই সান্ধ্যভ্রমণের অখণ্ডিত অবসর, নিগূঢ় আত্মোপলব্ধি ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির নবজন্মস্পন্দনের ভিতর দিয়া, তাহার প্রেমকে বিশ্বজগতের নিঃশব্দ সুরপ্রবাহের সহিত মিলাইয়া দিয়াছে।

কলিকাতায় ফিরিবার পর তাহার এই অশ্রান্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব এত সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছে যে, মাতার অসুখের সুযোগ লইয়া সে রণক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। ইতিমধ্যে অনাদিনাথের সহিত মনোজার বিবাহ-সংবাদ তাহাকে বজ্রাঘাতের মত অভিভূত করিয়াছে। ব্যর্থ প্রেমের জ্বালাময় অনুভূতি তাহার পূর্বকৃতজ্ঞতাকে এমন কি চিরসংস্কারলব্ধ ধর্মজ্ঞানকেও হঠাইয়াছে—মনোজার পূর্বহিতৈষিতা ও সতীত্ব-ধর্মের সনাতন ধারণা তাহার ঈর্ষাবিকৃত মনোবিকারের প্রবলতার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। তাহার মানসিক অবস্থার এই স্তরের বিশ্লেষণ বাস্তবতার দিক্‌ দিয়া খুব চমৎকার হইয়াছে। বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও সে মনোজার প্রতি তাহার মনোভাব সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখিতে পারে নাই—মনোজার অনায়াস-লব্ধ, অবহেলায় উপভুক্ত বিজয়-গৌরব নিজ লজ্জাকর পরাভবকে ধিক্কার দিয়াছে। শেষে মনোজা অসাধ্য-রোগাক্রান্ত হইলে তাহার অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা সে পূর্বোপকারের ঋণ-পরিশোধের ছদ্মবেশে নিজ ব্যর্থ, অন্তর্দাহকারী প্রণয়াকাঙ্ক্ষাকে বহিঃনিষ্ক্রমণের পথ দিয়াছে। তাহার এই চাতুরী মনোজার অন্তর্দৃষ্টির নিকট ধরা পড়িয়াছে—একই প্রণয়াস্পদের প্রতি অনুরাগ দুইটি নারীর গোপন কথাটি পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে। মনোজার মৃত্যুর পর অনাদিনাথ দুঃসহ শোকের কুহেলিকাবৃত হইয়া ক্ষণিকার নিকট আরও দুরধিগম্য হইয়াছেন—স্বর্গগতা পত্নীর স্মৃতির মধ্যে তিনি এমন নিশ্চিহ্নভাবে মগ্ন হইয়াছেন যে, সমস্ত বাহ্যজগতের সহিত ক্ষণিকাও তাঁহার ধ্যানসমাহিত চক্ষুর সম্মুখে ছায়াবাজির ন্যায় বিলীন হইয়াছে। ভগ্নহৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া ক্ষণিকা রোগের উত্তপ্ত বিকারের মধ্য দিয়া নিজ চির-নিরুদ্ধ বিদ্রোহের তপ্ত বাষ্প নিঃসরণ করিয়া দিয়াছে—চিরসহিষ্ণু তাহার মুখে অনভ্যস্ত বিদ্রোহ-বাণী তাহার মাতা ও পরিবারস্থ অন্যান্য সকলকে আশ্চর্যান্বিত করিয়াছে। শেষে একবার প্রত্যাখ্যানের পর সে তাহার আবাল্য

সুহৃৎ ও চির-উপকারক চিন্ময়ের প্রেমনিবেদন স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তাহার অন্তরের রহস্য মনোজা ও চিন্ময়ের নিকট অজ্ঞাত ছিল না—উভয়েই প্রেমের স্বচ্ছ অনাবিল দৃষ্টিশক্তির বলে এই গোপন রহস্যের সন্ধান পাইয়াছিল। চিন্ময়ের নিকট ক্ষণিকা যাহা নিবেদন করিয়া দিল, তাহার মধ্যে প্রথম প্রেমের দুর্দমনীয় আবেগ ছিল না, আশাভঙ্গের তিক্ত স্বাদ তাহার মাধুর্যকে কতকটা নীরস করিয়াছিল; কিন্তু ইহার শান্ত, শীতল স্বচ্ছপ্রবাহ যে তাহাদের জীবনকে চির-সরস ও শ্যামল রাখিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের কোন অবসর নাই। নারীর দিক্ হইতে প্রেমের তীব্র, অপ্রতিরোধনীয় প্রভাবের এরূপ বিবরণ বাংলা উপন্যাসে বিরল এবং ইহাই উপন্যাসটির গৌরবময় বিশেষত্ব।

(১৪)

'উদ্যানলতা' উপন্যাসটি সীতা ও শান্তা দেবীর যুগ্ম রচনা—ইহাদের লিখনভঙ্গীর অভিন্নতার চমৎকার সাক্ষ্য দেয়। ইহার মধ্যে কোন্ অংশ কাহার রচনা তাহা নিতান্ত সূক্ষ্ম আলোচনার দৃষ্টিতেও ধরা পড়ে না। ইহাদের বর্ণনাভঙ্গী, জীবন-সমালোচনার ধারা, চরিত্র-সৃষ্টির বিশেষত্ব আশ্চর্যভাবে মিশিয়া গিয়াছে। উপন্যাসটির মধ্যে কিন্তু গভীরতার একান্ত অভাব। মুক্তির জীবনের যে বিস্তৃত, দিনলিপিমূলক কাহিনী দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তাহার উপরিভাগের ঔজ্জ্বল্য—লঘু, চটুল-হাস্যপরিহাস-চঞ্চল প্রবাহ, ঠাকুরমার সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘর্ষ ও পিতার অপরিমিত স্নেহাদরে অবাধ স্বাধীনতার আস্বাদ—এই সমস্ত দিক্ই চমৎকার ফুটিয়াছে। জ্যোতি ও ধীরেনের সহিত সংস্পর্শ মুক্তির জীবনে যে অতি ক্ষীণ জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে ইহার সাধারণ লঘুপ্রবাহ ক্ষুন্ন হয় নাই। এই উভয় প্রণয়ীর বিরুদ্ধ আকর্ষণে তাহার চিত্ত যে সামান্য দোল খাইয়াছে তাহার মধ্যে কোন আবেগ-গভীরতা নাই। মোট কথা, মুক্তির জীবনের লঘুচপল আবর্তন তাহার মনে কোন গভীর পরিণতি মুদ্রিত করিয়া দেয় নাই—সে তাহার বোর্ডিং-জীবনের ক্ষুদ্র মান-অভিমান, ঈর্ষা-কলহ, সখিত্ব, প্রভৃতির সীমারেখা ছাড়াইয়া কখনই জীবনের সমস্যাসংকুল পথে পদক্ষেপ করে নাই। সে চির-কিশোরী রহিয়া গিয়াছে। শিবেশ্বরের সংস্কারকত্ব অনাবশ্যকরূপে উৎকট আতিশয্যের পর্দায় উঠিয়াছে। মোক্ষদার চরিত্রে সহজ স্নেহ-প্রবণতার সহিত অন্ধ গোঁড়ামির সংমিশ্রণ খুব ভাল ফোটে নাই; শিবেশ্বর ও মুক্তির সঙ্গে তাহার কোথাও একটা সহজ মিলনের ক্ষেত্র গড়িয়া উঠে নাই। মোট কথা, উপন্যাসটি সুখপাঠ্য হইলেও গভীরতার দিক্ দিয়া মোটেই সমৃদ্ধ নহে।

(১৫)

শান্তা দেবীর ছোট-গল্প সমষ্টির মধ্যে 'উষসী', 'সিঁথির সিঁদুর' ও 'বধূবরণ' উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি গল্প ভাব ও ভাষার দিক্ দিয়া উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। 'সুনন্দা', 'সিঁথির সিঁদুর' ও 'আঁধারের যাত্রী'—এই তিনটি গল্পে কবিত্বপূর্ণ উচ্ছ্বাসেরই প্রাধান্য। 'সুনন্দা' একটি পতিতার গর্ভজাতা কুমারীর নিষ্ফল প্রণয়ের উচ্ছ্বসিত খেদোক্তি; 'সিঁথির সিঁদুর' এক নবোঢ়া

পত্নীর দাম্পত্যসমস্তামূলক। স্বামীর সহিত পরিপূর্ণ মিলনে বাধা পাইয়া সে জানিতে পারিল যে, স্বামী তাহার রূপসী উপপত্নীকে সংসারের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এ ক্ষেত্রে মনে হয় যে, স্বামী সম্বন্ধে তাহার গভীর খেদোক্তি বা সুদীর্ঘ চিত্ত-বিশ্লেষণ একেবারেই অপ্রযুক্ত, কেননা এরূপ স্বামীর সম্বন্ধে যে স্ত্রী খেদ প্রকাশ করিতে পারে সে একেবারেই আত্মসম্মানবর্জিত ও পাঠকের সহানুভূতির অযোগ্য। 'আঁধারের যাত্রী', প্রেমাস্পদের দ্বারা প্রতারিত এক অন্ধ কিশোরীর সংসারের প্রতি তীব্র অভিমান-প্রকাশ। কতকগুলি গল্পের প্রেরণা আসিয়াছে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার উৎকট বৈষম্য ও অসামঞ্জস্যের দিক্ হইতে। 'পৌষ-পার্বণ'-এ এক যুবতী বিধবার তাহার শিশু দেবরের প্রতি পুত্র-বাৎসল্য ও ভালবাসার অন্ধ আতিশয্যের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে—এই গল্পটি স্পষ্টতঃ শরৎচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের করুণ-রস-সৃজনে সিদ্ধহস্ততা ইহার মধ্যে নাই। 'পিতৃদায়' গল্পে অপরিমিত অর্থলোভ আমাদের সামাজিক জীবনের সর্বপ্রধান মাঙ্গল্য-কর্ম বিবাহে যে দারুণ জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই আলোচনা আছে; কিন্তু এই অতি পুরাতন বিষয়ের আলোচনায় লেখিকা পুত্রবধূ অলকার চরিত্রের মধ্য দিয়া একটু নূতনত্বের অবতারণা করিয়াছেন। অলকার অতি কঠোর আত্ম-সম্মানবোধ ও অনমনীয় স্বাধীনতাস্পৃহা, তাহার প্রস্তরকঠিন দৃঢ়সংকল্প তাহার বাক্যে ও ব্যবহারে সুন্দররূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। 'ময়ুর-পুচ্ছ' পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত আবেষ্টনের মধ্যে শিক্ষিতা বধূর দুরবস্থার কাহিনী। ইহার বিষয়-বস্তু মামুলি ও আলোচনা বিশেষত্ববর্জিত। 'শিক্ষার পরীক্ষা'য় একটু হাস্য-রসের প্রবর্তন হইয়াছে তবে ইহা কেবলমাত্র ঘটনামূলক, আলোচনা-মূলক নহে। 'বধূবরণ' সমষ্টিতে 'মানের দায়' ও 'রাজলক্ষ্মী' এই দুইটি গল্পে বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে বংশগৌরব ও অর্থপ্রাচুর্যের তারতম্য লইয়া যে নিষ্ঠুর-করুণ অসামঞ্জস্য ও ঘাত-প্রতি-ঘাতের সৃষ্টি হয় তাহারই আলোচনা হইয়াছে। দ্বিতীয় গল্পে রাজলক্ষ্মীর পিতামহ ধরণীমোহনের চরিত্রে তাহার ঐশ্বর্যের জাঁকজমকের জুয়াখেলা গল্পটিকে আর্টের উচ্চস্তরে উন্নীত করিয়াছে। এই চরিত্র-গৌরবই সমস্ত বাহিরের বিপদ্‌জালকে আবাহন করিয়া আনিয়াছে, ও চারিদিকের দুঃখ-কুহেলিকার মধ্যে উন্নত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। দুইটি গল্পেরই পরিশেষ অনেকটা আকস্মিক ও অসমঞ্জস হইয়াছে। 'ফুট্‌কী', 'ভুট্‌কি' ও 'সৃষ্টিছাড়া' এই তিনটি গল্পে স্নেহ-প্রেম-ভালবাসার তির্যক গতি, আঁকা-বাঁকা গলিপথে সঞ্চরণ-প্রবণতার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। 'ফুট্‌কী' গল্পে মাণিক ও ফুট্‌কীর সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা' গল্পে শেখর ও ললিতার সম্পর্কের পুনরাবৃত্তি—তবে শরৎচন্দ্রের গল্পের করুণ, উচ্চস্বরে বাঁধা মূর্ছনার পরিবর্তে এখানে একটা ছেলেমানুষী হাসির সরল ঝংকার শোনা যায়। 'ভুট্‌কি' একটি সাঁওতাল মেয়ের নানারূপ বিচিত্র মনোভাবের মধ্যে মনিবের শিশুপুত্রের প্রতি ভালবাসার প্রাধান্যের কাহিনী—গল্পটির রস কিন্তু মোটেই জমাট বাঁধে নাই, ঐক্যহীন বৈচিত্র্যের নানা প্রণালীর মধ্যে বহুধা বিভক্ত হইয়া অতি শীর্ণধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। 'সৃষ্টিছাড়া' গল্পে কৃত্রিম জীবনযাত্রায় চিরাভ্যস্ত একটি তরুণী ও পাশের বাড়ির এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অতি সংকীর্ণ, যন্ত্রবদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যে বর্ধিত এক খেয়ালী, চঞ্চলপ্রকৃতি যুবক পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। এই দুইজন যেন দুই বিভিন্ন কৃত্রিম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া এই বিদ্রোহের উতলা বায়ুতে পরস্পরের নিকট আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ

তাহা সম্পূর্ণ অভাবাত্মক (negative) ও বিদ্রোহমূলক ; তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত পরিচয়ের একান্ত অভাব। 'মধুমালতী' গল্পে ভগিনী-স্নেহের একটি মৌলিক চিত্র পাওয়া যায়—এই স্নেহের আতিশয্যই কিন্তু ভগিনীদের মনোমালিন্য ও বিচ্ছেদের হেতু হইয়াছে। 'পথহারা' গল্পটিতে করুণরস উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িয়াছে—তীর্থপথযাত্রিণী, আত্মীয়-সঙ্গচ্যুতা, চিরস্নেহ-বুভুক্ষিতা মন্দার জীবনে মৃত্যুশয্যায় প্রণয়-দেবতার অতর্কিত আবির্ভাবের কাহিনীর করুণ-বেদনা পাঠককে অভিভূত করে। কুম্ভমেলায় স্নানার্থী পুণ্যালোভোন্মত্ত জন-সমুদ্র, পথহারা আশ্রয়প্রার্থী নারীর প্রতি গার্হস্থ্যজীবনের নিরাপদ বেষ্টনে সুরক্ষিতা সমজাতীয়াদের নির্মম ঔদাসীন্য ও কুৎসিত সন্দেহ, মন্দার প্রতি সোমনাথের করুণ সমবেদনার প্রণয়ে পরিণতি, সোমনাথের প্রণয়প্রস্তাবে মন্দার প্রথম বিরক্তিবোধ ও আত্মহত্যা-সংকল্প, তারপর এই প্রণয়-নিবেদনের মাধুর্য ও পবিত্রতার নিকট ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণ, হাসপাতালের মৃত্যু-শয্যায় তাহাদের বিবাহবাসর-রচনা, ইহলোকের পাথেয় ফুরাইবার মুহূর্তে পরজন্ম সম্বন্ধে ব্যাকুল আলোচনা—এই সমস্তই অতি চমৎকারভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 'রুদ্ধ গৃহ' গল্পটি রোমান্সের রহস্যময়, নিবিড় অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। ভাষা ও ভাবের মন্থর ঐশ্বর্যে ইহা রবীন্দ্রনাথের দার্জিলিংএ ক্যালকাটা রোডের ধারে আসীনা বদ্রাওন-নবাবপুত্রীর অপরূপ কাহিনীটি স্মরণ করাইয়া দেয়। বঞ্চিত প্রেমের করুণ প্রতারণার মায়াজাল সমস্ত গল্পটির আকাশ-বাতাসকে নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। দীর্ঘদিনের ব্যর্থ প্রতীক্ষায় অতিক্রান্তযৌবনা প্রণয়িনীকে মানস মূর্তির ধ্যানে তন্ময়, উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত প্রেমিক কাছে পাইয়া চিনিতে পারিল না। তাই অন্ধ-কারের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া যামিনী অভিলাষের নিকট অভিসারিণী হইয়াছে, আলোকেব প্রথম অরুণ-রেখার সঙ্গে সঙ্গেই সে বিদ্যুৎশিখার ন্যায় অন্তর্হিত হইয়াছে। যে প্রণয়-দেবতার মন্দিরে অভিলাষ পূজার সযত্ন-সংগৃহীত ঐশ্বর্যসম্ভার পুঞ্জীভূত করিয়াছে, তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সেই শূন্য-সিংহাসনে একদিনের জন্যও অধিষ্ঠিত হন নাই, যাহাকে বাঁধিবার জন্য সে প্রাচীর অভ্রভেদী এবং কক্ষের প্রতি দ্বাব ও গবাক্ষ অর্গলবদ্ধ করিয়াছে, সে তাহার সমস্ত ব্যাকুল চেষ্টাকে উপহাস করিয়া দিবালোকেব সঙ্গে সঙ্গে শূন্যতায় মিলাইয়া গিয়াছে। অন্ধকারের মানস-সুন্দরী দিবালোকে লোল-চর্মা, স্খলিত-দশনা বৃদ্ধা দাসীতে পরিণত হইয়াছে। অথচ অভিলাষ প্রতিদিনই আশা করে যে, তাহার আবেশময় নিশি-স্বপ্ন দিবালোকের মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে—এই অশ্রান্ত আকুলতা তিল তিল করিয়া তাহার জীবনশক্তিকে ক্ষয় করিয়া তাহাকে মৃত্যুর দ্বারে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে। এই গল্পটি বাস্তব আবেষ্টনের মধ্যে রোমান্স-সৃষ্টির কুশলতায় অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়াছে। সমস্ত ছোট গল্পের মধ্যে চিত্ত-বিশ্লেষণ ও মনোবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতেব দিক্ দিয়া 'পরাজয়' গল্পটি সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে মহালক্ষ্মী ও রজনী—এই দুই বাল্যসখীর মধ্যে একপ্রকার বিশেষ ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংঘর্ষ বর্ণিত হইয়াছে। রূপসী মহালক্ষ্মীর মনে আশ্রিতা দরিদ্র-কন্যা রজনী সম্বন্ধে ঈর্ষা ও দর্পের মধ্যবর্তী একপ্রকার মিশ্র মনোবৃত্তি বিরাজ করিত। এই সদর্প আত্মগৌরব চরম সীমায় উঠিল যখন তাহার প্রত্যাখ্যাত প্রার্থী শিবসুন্দরের সহিত রজনীর বিবাহ হইল। রজনী তাহার পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট পাইয়া পরম কৃতার্থ হইয়াছে এইরূপ একটা মনোভাব মহালক্ষ্মীকে আত্মপ্রসাদে স্ফীত করিয়া তুলিল। কিন্তু এইবার দর্পচূর্ণ হইয়া ঈর্ষানুভবের পালা আসিল। মহালক্ষ্মী

বিবাহের অল্পদিন পরে বিধবা হইল; পক্ষান্তরে রজনীর স্বামি-সৌভাগ্য আদর্শস্থানীয় হইয়া উঠিল ও মহালক্ষ্মীকে চক্ষুঃশূলের ন্যায় বিঁধিতে লাগিল। শেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া সে রজনীকে অচির-বৈধব্যের অভিশাপ দিয়াছে; কিন্তু এই অভিশাপ ফলিয়া যাইবার পর সে আতঙ্কিতচিত্তে আবিষ্কার করিয়াছে যে, যে আঘাত সে তাহার বাল্য-সহচরীর বুকে হানিয়াছে তাহা সহস্রগুণ হইয়া ফিরিয়া তাহার বুকে বাজিয়াছে—প্রতিদ্বন্দ্বিনীর স্বামী তাহার নিজেরই অবিস্মৃত দয়িত ছিল। মোটের উপর ভাষা ও ভাবের উৎকর্ষে সীতা দেবীর সহিত তুলনায় শান্তা দেবীর ছোট গল্পগুলিকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া যাইতে পারে।

(১৬)

'জীবন-দোলা'—শৈশব হইতেই বিধবা এক নারীর, বিচিত্র ভাব-তরঙ্গের মধ্য দিয়া পূর্ণতা-প্রাপ্তির ইতিহাস। সমস্যামূলক উপন্যাসে সমস্যার প্রাধান্য যেমন ব্যক্তিগত জীবনকে অভিভূত করে, এখানেও সেইরূপ গৌরীর সমস্যা তাহার ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া মাথা তুলিয়াছে। গৌরীর জীবন স্বাধীন, সাবলীল-ভাবে স্ফূর্তি পায় নাই, ইহা তাহার কেন্দ্রগত সমস্যার চারিদিকে দানা বাঁধিয়াছে। আজকাল অধিকাংশ ইউরোপীয় উপন্যাস-সাহিত্য সমস্যামূলক; সেখানে সমস্যালোচনার প্রয়োজনের নিকট অবাধ, স্বাধীন ব্যক্তিত্ব-স্ফুরণ, চিরন্তন মানব-প্রকৃতির অকুণ্ঠিত উন্মেষকে খর্ব করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ভাব অপেক্ষা বুদ্ধিগত আলোচনারই প্রাধান্য; তৎসত্ত্বেও ইহারা সাহিত্যিক উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। 'জীবন-দোলা'ও এই শ্রেণীর উপন্যাস, এবং এই আদর্শ অনুসারে বিচার করিলে ইহা মধ্যম রকমের উৎকর্ষের দাবী করিতে পারে। এই উপন্যাসের প্রধান দোষ হইতেছে যে, এক গৌরী ছাড়া অন্যান্য চরিত্রের কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নাই; ইহারা কেবল গৌরীর চরিত্র-বিকাশের উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে; গৌরীকে প্রভাবান্বিত করা, বিচিত্র সংস্পর্শের ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার সুপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে উদ্বোধিত করা ব্যতিরেকে তাহাদের জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। তাহার পিতা হরিকেশব, মাতা তরঙ্গিণী, ভাই শঙ্কর তাহার সহকর্মী ও সম্ভাবিত প্রেমিকদ্বয়—সঞ্জয় ও অপূর্ব—সকলেরই জীবন যেন একটা উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত যান্ত্রিকতার প্রতিচ্ছবি মাত্র। এমন কি তাহার প্রেমোন্মেষও একটা স্বতঃস্ফূর্ত, বেগবান্ মনোবৃত্তি নয়, ইহা সমাজসেবার যন্ত্রবদ্ধ কর্তব্যের নীরস-ক্লান্তি অপনোদনের জন্য একটা রসায়ন মাত্র। প্রেমের অফুরন্ত উৎস হইতে সমাজকর্তব্যপালনের জন্য গতিবেগ ও শক্তি সঞ্চয় করাই যেন জীবনে প্রেমের আবাহনের উদ্দেশ্য। এই পরাধীন প্রেম জনহিতৈষণার সংকীর্ণ খাতে অতি শীর্ণ, সংকুচিতভাবে প্রবাহিত হইয়াছে, ঐরাবতকে ভাসাইবার দুর্জয়, কূলপ্লাবী শক্তি ইহার নাই। যে সঞ্জয় তাহার কর্তব্যভার-ক্লিষ্ট মনে প্রেমের বর্ণ-সমারোহ সঞ্চারিত করিয়াছে তাহার মধ্যেও ব্যক্তিত্বের কোন স্পন্দন অনুভব করা যায় না। নিছক সমস্যার দিক্ দিয়াও আলোচনা যে খুব গভীর ও সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহাও বলা যায় না। বিবাহের পরেই তাহাদের জীবন-নাট্যে যবনিকা-পাত হইয়াছে, যেন বিবাহই তাহার জীবন-সমস্যার চরম সমাধান। বিবাহিত জীবনে তাহাদের সমাজ-সেবার আদর্শ কতদূর অক্ষুণ্ণ থাকিল, তাহাদের কর্মনিষ্ঠা কিরূপ নূতন শক্তি ও প্রেরণা লাভ করিল তাহার কোনই আলোচনা নাই। প্রেম যেখানে স্বাধীনভাবে কাম্য,

সেখানে বিবাহে পরিসমাপ্তি স্বাভাবিক হইতে পারে ; কিন্তু সে যেখানে কর্তব্যের অনুচর মাত্র, সেখানে তাহার জয়গানকেই সমাপ্তি-সংগীতে পরিণত করা সমীচীন নহে।

মোটের উপর গৌরীর জীবনেতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়গুলি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। গৌরীর স্বপ্নময় কৈশোর-জীবনের চিত্র মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের দিক্ দিয়া অতি চমৎকার হইয়াছে। অন্যান্য বালিকারা এই কৈশোরের সহিত প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকে—তাহাদের বাল্য ও যৌবনের মধ্যে কোন কল্পনাজড়িত, স্বপ্ন-বিহ্বল মধ্যবর্তী অবস্থা প্রসারিত থাকে না। তাহাদের জীবনে প্রেমের ফুল ফুটিবার আগেই বিবাহের বন্ধন ও মাতৃত্বের দায়িত্ব তাহার সুকোমল বৃন্তকে ভারাক্রান্ত করে। বস্তুতন্ত্রতার প্রচণ্ড অভিঘাত তাহাদের মদির স্বপ্ন-জড়িমাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া টুটাইয়া দেয়। গৌরী এই নবার্জিত কল্পনা-বিলাস লইয়া আর তাহার পুরাতন সংসারের সংকীর্ণ খাঁচাতে নিজেকে কুলাইতে পারে নাই, বৃহত্তর আশ্রয়ের জন্য চারিদিকে ব্যাকুল দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছে। বোর্ডিং হাউসের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও জনসেবাব্রতের মধ্যে সে নবজন্ম লাভ করিয়াছে ও জীবনের উদ্দেশ্য ও প্রেমের পরম সার্থকতার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিয়াছে। প্রেম তাহার জীবনে আবির্ভূত হইয়াছে নবোন্মেষিত চিন্তাশক্তির স্বল্পালোকিত, সংকীর্ণ পথ দিয়া, কোন প্রবল, অনিবার্য অনুভূতির রাজপথ দিয়া নহে। তাহার কর্মজীবনের সহচরদের মধ্যে একজন, কেবলমাত্র কর্ম-প্রেরণার উত্তেজনার মধ্য দিয়াই, তাহার মধ্যে প্রেমের উদ্বোধন করিয়াছে। কিন্তু এই প্রেম নিতান্ত ক্ষীণ ও রক্তহীন বলিয়াই মনে হয়।

(১৭)

শান্তা দেবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'চিরন্তনী' সীতা দেবীর 'রজনীগন্ধা'র সহিত আশ্চর্যরূপ সাদৃশ্য-বিশিষ্ট। উভয়েরই নায়িকা, তাহাদের জীবনের সমস্যা ও অভিজ্ঞতা, ও তাহাদের পরিবার-প্রতিবেশ প্রায় অভিন্ন। করুণা ও ক্ষণিকার জীবন প্রায় পরস্পরের প্রতিচ্ছবি বলিলেও চলে। ক্ষণিকার ন্যায় করুণার পরিবারও কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভগিনী ও একজন উদাসীন অভিভাবক-স্থানীয় ব্যক্তি লইয়া গঠিত। মেনকা ও লালু অরুণা ও রেণুতে যেন তাহাদের দ্বিতীয় সত্তার সন্ধান পাইয়াছে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনীর দায়িত্বজ্ঞানহীন কৈশোর-চাপল্য ও আমোদপ্রিয়তার সহিত তুলনায় ক্ষণিকা ও করুণার অকাল-গাম্ভীর্য ও অবসরহীন, অনলস কর্মপরায়ণতা আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। তবে মোটের উপর করুণার জীবনে ভাগ্যদেবীর বিরূপতার মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম। তাহার জীবনসমস্যার তীব্রতা তুলনায় মৃদুতর। ক্ষণিকার জীবন-সংগ্রামের অসহনীয়তা অপ্রাপণীয় প্রেম বহুগুণে বাড়াইয়া দিয়াছে। করুণার জীবন অকামনীয় প্রেমের অভিভব হইতে আত্মরক্ষার একটা সুচিরব্যাপী চেষ্টা, ক্ষণিকার জীবন অলভ্য প্রেমের দিকে ক্ষুব্ধ-ব্যাকুল, নিষ্ফল কর-প্রসারণ। ক্ষণিকার হৃদয়ে অতৃপ্ত কামনার হাহাকার যে বিদ্রোহের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়াছে, করুণার জীবনে তাহা গলিয়া অশ্রুর আকারে ঝরিয়াছে, অন্তর্গূঢ় নীরব বেদনায় রূপান্তরিত হইয়াছে। ক্ষণিকার প্রেম উগ্র বহ্নিশিখার ন্যায় সমস্ত বাধা-সংকোচ ভস্মসাৎ করিতে ছুটিয়াছে—কৃতজ্ঞতাবোধ, ধর্মের অনুশাসন তাহার মনকে সংযমের বন্ধনে বাঁধিতে পারে নাই। করুণা প্রথমতঃ অবিনাশের অনুল্লঙ্ঘনীয় আদেশের ন্যায় প্রচণ্ড প্রেম-

নিবেদনের স্পর্শ হইতে সংকুচিত হইয়া আপনাকে সরাইয়া লইয়াছে। কিন্তু শান্তির আশা ও ঋণশোধের পবিত্র কর্তব্য উভয়েই একযোগে তাহাকে অবিনাশের নির্ভরযোগ্য, নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের দিকে আকর্ষণ করিয়াছে। প্রেম অবশ্য সাংসারিকতার দিক্ হইতে অনিন্দনীয় এই ব্যবস্থায় রাজি হয় নাই, কিন্তু প্রেমের এই ভীরু অসম্মতিকে প্রাধান্য দেওয়ার মত অবস্থা করুণার ছিল না। তাই অবিনাশের প্রস্তাবকে প্রকাশ্যভাবে প্রত্যাখ্যান না করিয়া সে নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার জন্য অবিনাশের উগ্র, অসহিষ্ণু সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া আসিয়া পল্লীজীবনের নিভৃত অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে।

এই পল্লীজীবনের সহিত পরিচয় তাহার প্রত্যক্ষভাবে না থাকিলেও শতদলের মুগ্ধ বর্ণনার মধ্য দিয়া তাহার কল্পনাশক্তির সহিত ইহার একটা নিবিড়, ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। আবার এই পল্লীশ্রীর কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইহার শান্ত জীবনযাত্রায় যে প্রাণস্পন্দনের সংযোগ করিয়াছিল সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে তাহার মনের একটা স্বাভাবিক উন্মুখতা ছিল। করুণার হৃদয়ের উপর সুপ্রকাশ যে এত সহজে নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল তাহার কারণ এই যে, সে করুণার কল্পনানেত্রের সম্মুখে পল্লী-সৌন্দর্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি, প্রতীকরূপে বহুদিন ধরিয়া জাজ্বল্যমান ছিল—সুতরাং যখন নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে পল্লীপ্রবাসের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার দর্শন মিলিল, তখন করুণা তাহার চিত্তের সমস্ত ব্যাকুল আবেগ দিয়া উভয়কেই হৃদয়ে বরণ করিয়া লইল। তারপর সহজ আলাপ ও সৌজন্যের মধ্য দিয়া তাহাদের পরিচয় অগ্রসর হইতে হইতে একেবারে নিবিড় প্রেমের পর্যায়ে পৌঁছিল। করুণা ও সুপ্রকাশের প্রণয়-কাহিনীটি কবিত্বময় অনুভূতি, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তরঙ্গ যোগ ও একপ্রকার মুগ্ধ, আত্মবিস্মৃত তন্ময়তার জন্য উপন্যাস-সাহিত্যের একটা স্থায়ী সম্পদ্‌রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য।

করুণার মন যদিও অধিকাংশ সময় আকাশ-কুসুমের গন্ধে সুরভিত ও কল্পলোকের বাতাসে হিল্লোলিত হইয়াছে, তথাপি তাহার চরিত্রে বাস্তব উপাদানের অভাব নাই। তাহার মনোবীণা রোমান্সের নায়িকার মত একটা অস্বাভাবিক আদর্শের উঁচু সুরে বাঁধা নাই। তাই অবিনাশের প্রেমকে সে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই। অবিনাশের পরুষ, প্রভুত্ব-সূচক প্রেম-নিবেদন তাহাকে প্রচণ্ড দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলিয়াছে—এই দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য সে শতদলের উপদেশপ্রার্থী হইয়াছে। শতদলের সংস্পর্শে তাহার জীবনে এক নূতন প্রভাব প্রবেশলাভ করিয়াছে। শতদলের নিজের অতীতসুখস্মৃতিবিভোর শান্ত, করুণ সহিষ্ণুতা তাহার জ্বালাময় বিদ্রোহোন্মুখতাকে অনেকটা প্রশমিত করিয়াছে। উপরন্তু পল্লীশ্রীর স্নিগ্ধ শ্যামলতা তাহার হৃদয়ক্ষতের উপর শীতলপ্রলেপ বিছাইয়া দিয়াছে। এই কল্পনায় উদ্ভাসিত, বিচিত্রসুখদুঃখমণ্ডিত পল্লীজীবনের কুসুমাস্তীর্ণ পথ দিয়াই তাহার হৃদয়ে প্রকৃত প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছে। রাজগঞ্জের প'ড়োবাড়ির মধ্যে তাহার পূর্ব বন্ধন তাহার অজ্ঞাতসারে জীর্ণ, শিথিল হইয়া খসিয়া গিয়াছে। এই নূতন আবেষ্টনের মধ্যে তাহার হৃদয়-মন্দিরে নূতন দেবতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুপ্রকাশের সঙ্গে তাহার যে প্রণয়লীলা তাহাতে বক্তব্য অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু আত্মবিহ্বল ভাবসম্পদের প্রসার অপরিমিত। তাহাদের অতি সাধারণ কথাবার্তার রন্ধ্রপথগুলি, বসন্তের আকাশ-বাতাস যেমন পুষ্পপরাগের দ্বারা সুরভিত হয়, সেইরূপ সূক্ষ্ম, নিবিড়, মাধুর্যপূর্ণ অনুভূতির দ্বারা একান্তভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। তারপর তাহাদের বিচ্ছেদের কাহিনী, সুপ্রকাশের পক্ষে অশান্ত

ভ্রাম্যমাণতা ও করুণার পক্ষে নীরব, ধ্যান-মগ্ন নিশ্চলতা—এই উভয়বিধ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পর্যবসিত হইয়াছে। শেষে তাহাদের দীর্ঘপ্রতীক্ষার অবসান হইয়াছে—প্রণয়ীর যে ডাকে করুণা সাড়া দিয়াছে, তাহা যেন স্বপ্নের কুহেলিকাজাল ভেদ করিয়া তাহার অন্তরের চির-নিরুদ্ধ কামনার অতর্কিত বহিঃপ্রকাশ।

করুণার পরেই উল্লেখযোগ্য চরিত্র শতদল। শতদল নিজে খুব ক্রিয়াশীল নহে, কিন্তু অপরের উপর তাহার প্রভাব যথেষ্ট। তাহারই সাহচর্যে ও প্রভাবে করুণার জীবনধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। জীবনকে সমস্ত চঞ্চল, অশান্ত বিক্ষেপ হইতে সংযত করিয়া কিরূপে গভীর-ভাবে উপলব্ধি করিতে হয়, একনিষ্ঠ অতন্দ্র সাধনায় কি করিয়া মগ্ন করিতে হয়, সে শিক্ষা সে শতদলের নিকট লাভ করিয়াছে। তার পর অবিনাশের চরিত্রটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহার রুক্ষ পরুষ আচরণ, তাহার স্পর্ধিত প্রণয়ভিক্ষা, তাহার উগ্র, অসহিষ্ণু প্রকৃতির অন্তরালে সুপ্রকাশের প্রতি স্নেহ-কোমল, ক্ষমা-স্নিগ্ধ ব্যবহার মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের দিক্ দিয়া খুব চমৎকার হইয়াছে। অরুণা 'রজনীগন্ধা'র মেনকা অপেক্ষা অধিকতর মনোজ্ঞভাবে চিত্রিত হইয়াছে। মেনকার মধ্যে একটা যে স্থূল লোলুপতা ও ঈর্ষার সুর আছে, তাহা অরুণার মধ্যে নাই। সে দিদির প্রতি অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন, ও দিদির প্রণয়ের ভাগ্যবিপর্যয় সে করুণ সমবেদনার সহিত লক্ষ্য করিয়াছে। পক্ষান্তরে রণু অপেক্ষা লালু অধিকতর জীবন্ত হইয়াছে। এক সুপ্র-কাশের চরিত্রই আশানুরূপ খোলে নাই। শতদলের সস্নেহ বর্ণনার মধ্য দিয়া সে প্রথম আমাদের কল্পনার নিকট উদ্ভাসিত হইয়াছে; কিন্তু তাহার সহিত চাক্ষুষ পরিচয় আমাদের পূর্বোদ্রিক্ত আশা পূর্ণ করিতে পারে নাই। শতদলের সহিত তাহার যে স্নেহ-মধুর সম্পর্কটি আমাদের মানস-নেত্রের সম্মুখে গড়িয়া উঠিয়াছিল, বাস্তব ব্যবহারে সে মাধুর্য প্রতিফলিত হয় নাই। প্রণয়-ব্যাপারেও করুণার সহিত তুলনায় তাহার অন্তর্বিক্ষোভ সেরূপ তীব্র ও মর্মস্পর্শী হয় নাই, সে অনেকটা ম্লান ও বর্ণহীন রহিয়া গিয়াছে। পুরুষের হাতে নায়িকার চিত্র যেমন অস্পষ্ট ও অগভীর হয়, বোধ হয় নারীর হাতে নায়কচরিত্রও ঠিক সেইরূপ দোষে দুষ্ট হইয়াছে। এই মন্তব্য 'রজনীগন্ধা'য় অনাদিনাথ ও 'চিরন্তনী'তে সুপ্রকাশ—উভয়সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। উভয়েই কতকটা কুহেলিকাবৃত রহিয়া গিয়াছে, তাহাদের জীবনের মর্মকথাটি যেন অপ্রকাশিত আছে। এই সামান্য ত্রুটি বাদ দিলে, 'চিরন্তনী' উপন্যাস জগতে খুব উচ্চ অঙ্গের উৎকর্ষ লাভে সমর্থ হইয়াছে—নারীর অবদানের বিশেষত্ব ইহার মধ্যে খুব চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।

সীতা দেবী ও শান্তা দেবীর উপন্যাস-রচনা এখনও পূর্ণবেগে চলিতেছে। সীতাদেবীর 'মাতৃঋণ' ও 'জন্মস্বত্ব' এই দুইখানি উপন্যাস অল্পদিন মাত্র শেষ হইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর পূর্বে যে সমস্ত উপন্যাস আলোচিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যেই তাঁহাদের রচনাবৈশিষ্ট্য সম্যকরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। পরবর্তী উপন্যাসে বিবাহ ও দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতা লইয়া অনেক সূক্ষ্ম আলোচনা আছে, কিন্তু তথাপি 'রজনীগন্ধা' ও 'চিরন্তনী'র মধ্যে প্রেম-বিহ্বল নারীচিত্তের বর্ণনা যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহার অনুরূপ কিছু দেখিতে পাই না। সুতরাং উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাস-রচনার দিক্ দিয়া পূর্ব আলোচনাই যথেষ্ট।

(১৮)

আশালতা সিংহের উপন্যাস 'সমর্পণ' ও ছোট গল্পের সমষ্টি 'অন্তর্য্যামী'র মধ্যে সাহিত্যিক স্থায়িত্বের উপাদান আছে। তাঁহার উপন্যাসের প্রধান গুণ—একটা সূক্ষ্ম, সুকুমার অনুভূতি-প্রাধান্য। প্রকৃতির শান্ত, প্রাণ-হিল্লোলে ঈষৎ কম্পমান সৌন্দর্য তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রদিগকে নিগূঢ়ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। আধুনিক যুগের অতি-বাস্তবতার নগ্ন বীভৎসতা তাঁহার সৌন্দর্য ও পরিমিতিবোধকে পীড়িত করিয়াছে, এবং এই সংযম ও সুরুচির দিক্ দিয়া তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের এই নব পরিণতির বিরুদ্ধে নিজ প্রতিবাদ ঘোষণা করিয়াছেন। 'সমর্পণ' উপন্যাসে তাঁহার নায়িকা সুরমা এই প্রতিক্রিয়ার মুখপাত্র। তাহার স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্যবোধ ও সুরুচিজ্ঞান সনাতন ও আধুনিক এই উভয়বিধ জীবনাদর্শের আতিশয্যের বিরুদ্ধে নীরব দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াইয়াছে। "একান্নবর্ত্তী পরিবারের একান্ন খোঁপে" যে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা পারাবতকূজনের ন্যায় অহর্নিশি মুখরিত হইয়া উঠে তাহা, আর অতি-আধুনিকার অশান্ত চিত্ত-বিক্ষেপ-স্বাধীনতার নামে স্বৈরাচার ও প্রেমের নামে ঐশ্বর্যতৃষ্ণা, এই উভয়ই তাহাকে তুল্যরূপে পীড়িত করিয়াছে। তাহার বাল্যজীবনের সংকুচিত, সর্ববিধ ইতরতার সংস্পর্শ-বিমুখ সৌকুমার্য, তাহার কৈশোরের আত্ম-সমাহিত, শুদ্ধ তন্ময়তা অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব জীবনের রূঢ় কল-কোলাহল ও বিক্ষোভের মধ্যে তাহার চরিত্রের সূক্ষ্ম, সুকুমার সৌন্দর্য যেন অনেকটা ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রথম প্রণয়ী হরলালকেও আধুনিক বাস্তবতার খুব চিত্তাকর্ষক প্রতীক বলিয়া মনে করার কোন কারণ নাই। সুরমার মত মেয়ের চিত্ত জয় করিতে তাহার বিশেষ কোন যোগ্যতা নাই। তাহার সহিত সুরমার কথোপকথন নিছক তার্কিকতায় পরিণত হইয়াছে—তাহাদের মধ্যে সম্পর্ক দুই বিরুদ্ধ মতের সংঘর্ষ মাত্র। হরলালের প্রত্যাখ্যানের পর সে যাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে, প্রেমিক হিসাবে তাহারও যে খুব একটা উচ্চ অঙ্গের উপযোগিতা আছে তাহা মনে হয় না। হরলালের অতিরিক্ত আগ্রহও যেমন, সুপ্রকাশের ঔদাসীন্য ও অনাগ্রহও তেমনি, ঠিক প্রেমিকের আদর্শের সঙ্গে মিলে না। সুপ্রকাশের সহিত বিবাহের মধ্যে এমন কোন গভীর মিলন ও নিগূঢ় ভাব-বিনিময়ের পরিচয় নাই, যাহা সুরমার মত এরূপ সূক্ষ্ম-সৌন্দর্যবোধবিশিষ্ট, সুকুমার-অনুভূতিশীল নারীর উপযুক্ত। মোট কথা, গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ইহার পরিকল্পনার উপযোগী হয় নাই।

'অন্তর্য্যামী' গল্পসমষ্টির মধ্যে 'রমা' গল্পটি বিষয়-বস্তুর দিক্ দিয়া মৌলিকতার দাবী করিতে পারে। ইহাতে সস্নেহ অনুযোগের দ্বারা একটি কিশোরীর মনের উপর হইতে জড়বুদ্ধি ও কুশ্রীতার স্থূল যবনিকা সরিয়া গিয়া উহার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ ও আত্মপ্রত্যয় কিরূপে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার চমৎকার বর্ণনা। অন্যান্য গল্পগুলির মধ্যে পরিকল্পনার মৌলিকতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় থাকিলেও মোটের উপর তাহাদের অন্তর্নিহিত আখ্যায়িকা-রসটি বেশ ভাল জমাট বাঁধে নাই।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'ছায়াপথ' উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য। ইহার বিষয়ে অসাধারণত্ব কিছু নাই—প্রথম প্রণয়ীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত নারীর পুরুষজাতির প্রতি বিমুখতা ও স্বাধীনতা-সংকল্পই ইহার আলোচ্য বিষয়। এই প্রত্যাখ্যানকারী প্রণয়ী অজিতের প্রেম সম্বন্ধে মৌলিক

মতবাদ একেবারে শূন্যগর্ভ ভাববিলাস—বাস্তবজীবনের প্রথম অভিঘাতেই ইহার অসারতা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। উপন্যাসের আসল সমস্যা হইল স্থপ্রিয়ার বিবাহ-বিমুখ চিত্তে ধীরে ধীরে প্রণয়ের মোহসঞ্চার—বিভাসের প্রতি তাহার আকর্ষণের কাহিনী। পুরুষের প্রতি স্থপ্রিয়ার নিগূঢ় অভিমানে কোন উদ্ধত বিদ্রোহ, জ্বালাময় চিত্তদাহ বা উচ্চকণ্ঠে স্বাতন্ত্র্য-ঘোষণা নাই, আছে একদিকে নীরব দৃঢ়সংকল্প ও কুণ্ঠিত অনাগ্রহ, অন্যদিকে—নারীর অর্ধজড়, পুরুষের তীক্ষ্ণপ্রভাবে অভিভূত, রাহুগ্রস্ত জীবনের স্বাধীন স্ফুরণের সাধনা। তাহার ধূসর মনে প্রেমের শান্ত রশ্মিচ্ছটার বিকীরণ, ও ইহার অপরূপত্বের আবিষ্কার সুন্দরভাবে ও সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। এই উপন্যাসের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত সমস্যার অবসান হয় নাই—স্থপ্রিয়ার স্বাতন্ত্র্যবাদ বিবাহোত্তর জীবনেও সংক্রামিত হইয়া দাম্পত্য-জীবনে একটা বিপরীতগামী আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে। অবশ্য এই জটিলতা বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। রজতোজ্জ্বল চন্দ্রকিরণ যেমন তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী লঘু-শুভ্র মেঘখণ্ডগুলিকে ধীরে ধীরে গলাইয়া আপনার মধ্যে সংহরণ করিয়া লয়, তেমনি প্রেমের ক্রমবর্ধমান মোহ এক গন্ধ-বিধুর শ্রাবণ-রজনীর ছায়াঘন, পরিপূর্ণ মিলনের আভাস-সংকেতে রহস্যময় অঞ্চলতলে, তাহাদের সমস্ত ছোটখাট অতৃপ্তি, ক্ষোভ ও আদর্শ-বিরোধকে আবরণ করিয়া তাহাদিগকে নিবিড়, রন্ধ্রহীন একাত্মতায় যুক্ত করিয়া দিয়াছে। আরাবল্লি পার্বত্য প্রকৃতির রুক্ষ ধূসরতার মধ্যে বর্ষা-স্নিগ্ধ শ্যামশ্রীর অবরুদ্ধ বিস্তার এই রিক্ত, উষর জীবনে প্রেমরাগসঞ্চারের সর্বথা উপযোগী, সুসংগত পটভূমিকা রচনা করিয়াছে। স্ত্রী-পুরুষের সত্য সম্বন্ধ-নির্ণয়, পুত্রের প্রতি মাতার স্নেহাভিমানমিশ্র মনোভাব, অধিকার-লোপের ক্ষোভের সহিত মুক্তিদানের উদার আনন্দের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ, বর্তমান দাম্পত্য-জীবনের মধ্যে নারীর হীন অগৌরব ও তাহার ভবিষ্যৎ আদর্শের অর্ধস্ফুট অনুভূতি, অনাগত কালে তাহার জয়-যাত্রার "ছায়াপথের" চকিত উপলব্ধি—এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনায় লেখিকার চিন্তাশীলতা ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। লেখিকার উক্তিও বিচার-পদ্ধতির মধ্যে মৃদু শ্লেষের ব্যঞ্জনা রচনার উপভোগ্যতা বাড়াইয়াছে। এখানে চরিত্র-পরিকল্পনা গৌণ, সমস্যা-বিশ্লেষণই মুখ্য—স্থপ্রিয়ার ব্যক্তিত্ব-স্ফুরণ তাহার সমস্যা-পরিবেষ্টনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তথাপি উপন্যাসটি নারী চিত্তের সূক্ষ্ম মনন-শক্তি ও সুকুমার অনুভূতির একটি সুন্দর উদাহরণ।

'সুধার প্রেম' (১৯৪০) ও 'সরোজিনী' (১৯৪২) উপন্যাসদ্বয় অমলা দেবীর লিখিত বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এই পরিচয় সত্য হইলে উপন্যাস-ক্ষেত্রে আর একজন শক্তিশালিনী লেখিকার আবির্ভাব হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই পরিচয়ের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। উপন্যাস দুইটির মধ্যে স্ত্রীসুলভ স্পর্শ বিশেষভাবে অনুভূত হয় না। ইহাদের শান্ত, আবেগ-হীন জীবন-সমালোচনা, মন্তব্যের হ্রস্ব, সংযত পরিমিতি, ঈষৎ ব্যঙ্গপ্রধান, সরস মনোভাব, ভাবার্দ্রতার একান্ত অভাব ও পর্যবেক্ষণের পরিধি-বিস্তার—সমস্তই পুরুষোচিত বলিয়া মনে হয়। অবশ্য স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষের মনোবৃত্তি অর্জন করা অসম্ভব নয়; সম্ভবতঃ বর্তমান শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অধিকার-সাম্যের যুগে স্ত্রীপুরুষের মানস প্রবণতার প্রভেদ বিলুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে। তথাপি মনে হয় 'সুধার প্রেম'-এ সুধার করুণ, ভয়াবহ সমস্যা ও

'সরোজিনী'তে নায়িকার ক্রিয়া-কলাপ যেন পুরুষের দৃষ্টি-কোণ হইতে আলোচিত হইয়াছে। সুধার মর্মান্তিক বেদনা নারীর সমবেদনার বৈদ্যুতী-স্পৃষ্ট হইলে আরও অসহনীয় তীব্রতা লাভ করিত। সরোজিনীর চরিত্রে অভিনয়কুশলতার সহিত আন্তরিকতার অদ্ভুত সংমিশ্রণ, হাব-ভাব-লীলার হাস্যকর অসংগতির সহিত সত্যিকার ঔদার্য ও মহানুভবতার একত্র অবস্থিতি পুরুষের বিস্ময়-বিমূঢ়, দ্বিধাগ্রস্ত উপলব্ধির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। এখানে বক্তা পুরুষ স্কুলমাস্টার বলিয়া লেখিকার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে তাহারই দৃষ্টি-ভঙ্গীর অনুকরণ কলা-কৌশলের চরম উৎকর্ষ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু এই আত্মবিলোপের সম্পূর্ণতা, কোন অসতর্ক মুহূর্তেও নিজ সত্য পরিচয়ের আভাস-ইঙ্গিতের একান্ত অভাব সন্দেহের উদ্রেক্ করে। সে যাহা হউক, এই অনুমানের যাথার্থ্য বা ভ্রান্তি উপন্যাস দুইটির উৎকর্ষের কোন তারতম্যের হেতু নয়। লেখক পুরুষ বা স্ত্রী যাহাই হউন না কেন, তাঁহার কৃতিত্বের প্রশংসা উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য।

'সুধার প্রেম'-এ ব্যঙ্গ ও করুণ রসের সম্পূর্ণ সমন্বয় হয় নাই। মনোজের প্রেম-চর্চা নিতান্তই অসার ভাব-বিলাস মাত্র। সুধার প্রতি তাহার আকর্ষণ সম্পূর্ণরূপে আকস্মিক ও তরুণ-সুলভ রূপমোহ মাত্র। সুধার দিক্ হইতেও যে সাড়া আসিয়াছে তাহাতেও কোন গভীর আবেগের লক্ষণ নাই। অভিভাবকশূন্য গৃহে অনুকূল অবসরের সুযোগেই এই প্রেমের অভিনয় চূড়ান্ত পরিণতি পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। তারপর পারিবারিক শাসনে ও প্রতিদ্বন্দ্বী আকর্ষণের প্রভাবে মনোজের পক্ষে বিস্মৃতি সহজ হইয়াছে। দেহতত্ত্বঘটিত অনিবার্য কারণেই সুধার পক্ষে মনোজের ন্যায় এই অসুবিধাজনক অভিজ্ঞতাকে ঝাড়িয়া ফেলা সম্ভব হয় নাই। সুধার আত্মহত্যা উপন্যাসের কৌতুক-সরসতার মধ্যে অতর্কিত বজ্রপাতের ন্যায় ইহার সুষমা-সংগতিকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছে। এই আত্মহত্যাকেও আমরা প্রেমের গভীরতম অখণ্ডনীয় প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিতে পারি না—ইহার পিছনে আছে কতকটা আশাভঙ্গের অভিমান ও কতকটা উপায়হীনের মর্মান্তিক দুঃসাহসিকতা।

সুতরাং এই ট্র্যাজেডি উপন্যাসের মধ্যে অনেকটা অবান্তর ও অবাঞ্ছিত আবির্ভাব। ইহার আসল আকর্ষণ সরস, ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জন। মনোজের প্রেমের আবিষ্কারে তাহার পিতামাতার ভাব-বিপর্যয় ও উপায়-উদ্ভাবন-কৌশল; বিশুর নির্লজ্জ, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন কার্যকলাপ; বিপত্নীক ভূষণবাবুর তৃতীয় পত্নী লাভে লোলুপতা; মনোজের মামা শৈলজার প্রশংসনীয় ঘটনা-নিয়ন্ত্রণ—সমস্তই এই পরিহাস-সিগ্ধ অতিরঞ্জনের প্রতিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই উপন্যাসে যাহা সর্বাপেক্ষা মৌলিক তাহা মাধুরীর প্রতি মনোজের কোর্ট-শিপের অভিনবত্ব। শৈলজার সুদক্ষ পরিচালনায় মনোজ নানা হাস্যকর অবস্থায় পড়িয়া হতাশ-প্রেমিকোচিত কৃত্রিম গৌরব হারাইয়াছে। ইহারই প্রতিষেধক প্রভাবে তাহার অনুতাপ ও আত্মগ্লানি দূর হইয়া সে আবার নূতন প্রেমের স্বাদ উপভোগ করিবার শক্তি পাইয়াছে। মাধুরীর স্বভাবের নম্র কমনীয়তাও এই পরিবর্তনে সহায়তা করিয়াছে। মনোজের আদর্শ প্রেমিকের উচ্চ আসন হইতে সাধারণ দুর্বল, সুবিধাবাদী মানুষের সমতলক্ষেত্রে অবতরণ—ইহাই উপন্যাসের প্রধান বিষয়; এবং ইহারই হাস্যকর অসংগতির প্রতি স্নিগ্ধ বিদ্রূপ-কটাক্ষপাত

ইহার অংশান্তরের নিদারুণ বিষাদময় পরিণতিকে আড়াল করিয়া পাঠকের মনে প্রাধান্ত বিস্তার করিয়াছে।

'সরোজিনী' (১৯৪২) পাকা হাতের পরিচয় দেয়। ইহাতে হাস্ত ও করুণ রসের কোন বিসদৃশ সম্মিলন হয় নাই—কৌতুকপূর্ণ, সরস বাস্তবচিত্রেরই একাধিপত্য। উপন্যাসে গ্রাম্যসমাজের চিত্রটি শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'-এরই পুনরাবৃত্তি, কিন্তু শরৎচন্দ্রের বেদনা-বিদ্ধ আদর্শবাদের পবিবর্তে আছে মৃদুবিদ্রূপমণ্ডিত, উচ্ছ্বাসহীন জীবন-সমালোচনা। বিধবা, ধনশালিনী, রূপসী সরোজিনীর অতর্কিত আবির্ভাব গ্রাম্যসমাজে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে। একদিকে পুরুষ নেতৃবৃন্দেব মধ্যে তাহাব অভিভাবকত্ব লইয়া এক মহা প্রতিযোগিতা, অপরদিকে মেয়েমহলে ঈর্ষা-সন্দেহের আরও তীব্রতব উত্তেজনা—এই উভয়ে মিলিয়া নিস্তরঙ্গ গ্রাম্যজীবনে এক জটিল আবত রচনা করিয়াছে। ইহার উপব এই সামাজিক আলোড়নেব মাঝে একদিকে দারোগা-হাকিম প্রভৃতি রাজকর্মচারিবর্গেব হস্তক্ষেপ ও অপব-দিকে হিন্দুর সমস্যায় আজিজ, সত্তব প্রমুখ ভিন্নধর্মীদেব মধ্যবর্তিতা সমস্যাব জটিলতা বাড়াইযাছে। অবশ্য পল্লীসমাজের সপক্ষে এইটুকু বলা যায় যে, সবোজিনী ইহাকে যে প্রচণ্ড আঘাত হানিযাছে, ইহার আদর্শেব বিরুদ্ধে যে স্পর্ধিত বিদ্রোহ-ঘোষণা করিয়াছে তাহাতে ইহাব বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সমাজের উদাব সহনশীলতা নাই, কিন্তু আঘাতেব বিরুদ্ধে আত্মবক্ষাব প্রচেষ্টা যে সর্বথা নিন্দার্হ তাহাও বলা যায না। কাজেই এই ব্যাপারে আমাদেব সহানুভূতি যুধ্যমান উভয় পক্ষেব মধ্যেই সমভাবে বিভক্ত হইযাছে।

সবোজিনীকে লইয়া গ্রাম্যসমাজে যে মুখবতাব উদ্ভব তাহাতে হাস্যবসেব প্রচুব উপাদান বিদ্যমান। বিশেষতঃ এই নবোদ্ভূত পবিস্থিতিতে স্ত্রীজাতিই অধিকতর সক্রিযতার পরিচয় দিয়াছে। অন্তবালবর্তিনী অবগুণ্ঠিতাদেব প্রভাব যে পল্লীসমাজে কত প্রখব, তাহাদের ক্ষুবধাব রসনা ও স্বামীশাসনেব প্রশ্রয়লেশহীন কঠোবতা ও অতন্দ্র সতর্কতাই তাহাব প্রমাণ। হারাণের উৎকট প্রায়শ্চিত্ত, গাঙ্গুলী মহাশয় ও বাধানাথের বাধ্যতামূলক ম্লেচ্ছসাহচর্যে ভোজন, যুদ্ধের জন্য চাঁদা আদাযের সভায় গ্রাম্য নেতাদের মারীচের মত উভয়সংকট, সবোজিনীর ছলাকলাকৌশলের অফুবন্ত বৈচিত্র্য ও উদ্ভাবনশীলতা, ফুণ্টিব ও মিণ্টার প্রেম সম্বন্ধে অকালপক্কতা ও অশিক্ষিত-পটুত্ব, তিনকড়ির স্বদেশ-উদ্ধারেব সংকল্প-প্রত্যাহার—এই সমস্তই বিশুদ্ধ হাস্যবসেব সৃষ্টি করে। মনীন্দ্রেব হঠাৎ বড়মানুষির জন্য গরম মেজাজ, প্রভুত্বগর্ব ও আত্মাভিমান-স্ফীতিব সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সরলতাব সংমিশ্রণ বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। সমস্ত মিলিয়া গ্রাম্য-জীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ ও প্রাণবেগ-চঞ্চল চিত্র পাওয়া যায।

সরোজিনীর চরিত্রটি শেষ পর্যন্ত প্রহেলিকা রহিয়া গিয়াছে। আমবা সরোজিনীকে পরেব চোখে দেখি—বিভিন্ন গ্রামবাসীর ঈর্ষা, সন্দেহ, কৌতূহল ও সহানুভূতির ভিতর দিয়া তাহার চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন দিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। লেখক নিজ মন্তব্য ও সরোজিনীর আত্ম-বিশ্লেষণের দ্বারা এই সমস্ত খণ্ড চিত্রগুলির মধ্যে ঐক্য আনিতে কোন চেষ্টা করেন নাই। কাজেই শেষ পর্যন্ত তাহার অন্তর-রহস্য অর্ধাবৃতই থাকে। তাহার অতর্কিত ভাবে গ্রাম্যসমাজে আবির্ভাবের উদ্দেশ্য অস্পষ্ট রহিয়াছে। গ্রামে আসিবাব পূর্বেই তাহার বিবাহ যদি হইয়া থাকে, তবে তাহার বৈধব্যের অভিনয় গ্রাম্য সমাজের উপর একটা প্রকাণ্ড ধাপ্পা ছাড়া আর কোন

নামে অভিহিত হইতে পারে না। সমাজের কেন্দ্রস্থলে বসিয়া সে যে সমস্ত সমাজ-বিদ্রোহী হৃদয়াবেগের প্রশ্রয় ও অবসর দিয়াছে, তাহাতে সমাজের চিরপ্রথাগত নৈতিক আদর্শকে উপহাস ও আঘাত করাই যে তাহার আসল উদ্দেশ্য তাহা নিঃসংশয়। দারোগা, হাকিম, আজিজ, প্রভৃতি গ্রাম্য-সমাজ-বহির্ভূত ব্যক্তিদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সংশ্রব তাহার চরিত্রের স্পর্ধিত দুঃসাহসিকতার প্রমাণ। তাহার ব্যবহারে সুরুচি ও শিষ্টাচার উল্লঙ্ঘনেরও নিদর্শন সুপ্রকট। পক্ষান্তরে মিণ্টা ও প্রকাশের প্রণয়-ব্যাপারে সে যেরূপ দৃঢ়সংকল্প ও অকৃত্রিম সহানুভূতি দেখাইয়াছে তাহা তাহার চরিত্র-গৌরবের পরিচয় দেয়। তাহার সম্বন্ধে আমাদের শেষ অভিমত মাস্টারের দ্বিধাগ্রস্ত, সংশয়-জড়িত মতবাদেরই প্রতিধ্বনি। লেখক (?) সরোজিনী-চরিত্রের হাস্যাস্পদ দিক্‌টাই ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ ও পরস্পর-বিরোধী বিকাশগুলিই পৃথগ্‌ভাবে আমাদের নিকট ধরিয়াছেন—তাহার মর্মরহস্য, ব্যক্তিত্বের স্বরূপটি অনাবিষ্কৃতই রহিয়াছে। হাস্যরস-উদ্রেকের নিকট চরিত্রসৃষ্টি গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি উপন্যাসটির সরস মৌলিকতা বিশেষভাবে উপভোগ্য।

একাদশ অধ্যায়

হাস্যরস-প্রধান উপন্যাস

(১)

ইংরেজি সাহিত্যে রসিকতার প্রকার-ভেদ লইয়া বিতর্কের অন্ত নাই। বিশেষতঃ humour ও wit—এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্যবিচারে সমালোচকেরা যথেষ্ট সূক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বিচার-বিতর্কের ফলে যাহা সাব্যস্ত হইযাছে তাহা মোটামুটি এই—Wit হইতেছে বুদ্ধির তরবারি-খেলা, নিঃসম্পর্কিত বস্তু বা চিন্তার মধ্যে বিদ্যুৎ-ঝলকের ন্যায় অতর্কিত সাদৃশ্য-আবিষ্কার। Humour-এ বুদ্ধির তীব্র দীপ্তির সহিত সহানুভূতির করুণ-শীতল স্পর্শের একপ্রকার অপরূপ সম্মিলন—মুখের হাসি ও চোখের জল মিশিয়া একপ্রকার অপূর্ব ইন্দ্রধনুর বর্ণবৈচিত্র্য-সৃষ্টি। Wit-এ বুদ্ধির স্বচ্ছন্দ লীলা আমাদের চোখ ধাঁধাইয়া দেয় ও সপ্রশংস বিস্ময়ের উদ্রেক্ করে। কিন্তু ইহার কথা লোফালুফির ও অদ্ভুত ব্যায়াম-কৌশলের মধ্যে কোন হৃদয়-গত গভীর আলোড়নের স্পন্দন অনুভূত হয় না। ইহার ঘাত-প্রতিঘাতে কতকটা দ্বৈরথ-যুদ্ধের নির্মম শক্তিবিকাশের পরিচয় মিলে—ইহার আক্রমণে একপ্রকারের নিষ্ঠুরতা, মানুষের সুকুমার ভাবপ্রবণতার প্রতি একটা উদ্ধত ঔদাসীন্যের সুর ধ্বনিত হয়। Humour-এর গভীর সহানুভূতি বুদ্ধির তীক্ষ্ণ, চোখ-ঝলসান চাকচিক্যের উপর একটা স্নিগ্ধ-শ্যাম আবরণ পরাইয়া দেয়। ইহার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, ইহার সমালোচনা হৃদয়ের গোপন অশ্রু-প্রবাহের শীকর-সিক্ত হইয়া তাহাদের সমস্ত উগ্র ঝাঁঝ হারাইয়া ফেলে ও একপ্রকার স্নেহমণ্ডিত অনুযোগে রূপান্তরিত হয়। Wit-এর প্রধান দৃষ্টান্ত Shakespeare-এর প্রথম যুগের নাটক ও সপ্তদশ শতাব্দীর (Restoration যুগের) নাটকাবলী। Humour-এর সুপরিচিত দৃষ্টান্ত Shakespeare-এর শেষ বয়সের রচিত নাটক ও উনবিংশ শতাব্দীতে Lamb-এর রচনা।

Wit ও Humour-এর মধ্যে আর একপ্রকারের প্রভেদ অনুভূত হয়, যাহা পাশ্চাত্ত্য সমালোচকেরা লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। Wit একটা মুহূর্ত-স্থায়ী আতস-বাজির সহিত তুলনীয়—ইহাতে লেখকের জীবনের প্রতি একটা সমগ্র ব্যাপক দৃষ্টির কোন পরিচয় মিলে না। ইহা কোনরূপ চরিত্রগত অভিব্যক্তি নহে—ইহার ক্ষণিক বিদ্যুৎ-আলোকে লেখকের চরিত্র ও সাধারণ মনোভাব উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। Humour-এর গভীর আবেদনের (appeal) একটা কারণ এই যে, ইহার পশ্চাতে একটা বিশিষ্ট মনোবৃত্তি, জীবন-সমালোচনার একটা মৌলিক, গতানুগতিকতা-বর্জনকারী ভঙ্গীর পরিচয় মিলে। দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে জীবনের যে সমস্ত বৈষম্য ও অসংগতির সম্বন্ধে আমাদের মন অসাড়, অচেতন হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের চিরাচরিত জীবনযাত্রার মধ্যে যে সমস্ত বিচার-বিভ্রম ও ভ্রান্ত মতবাদ অখণ্ডনীয় সত্যের মত দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, humorist-এর হাসির খোঁচা এক ঝলক

অতর্কিত আলোকের মত সেই সমস্ত ভ্রান্তি ও অসংগতিকে এক মুহূর্তে সুস্পষ্ট, উজ্জ্বল করিয়া তোলে, আমাদের জীবনের বিচার-ধারাকে, শোভন-অশোভন-নির্ধারণের মানদণ্ডকে আমূল পরিবর্তিত করিয়া দেয়। তাহার হাসির মধ্যে এই স্বচ্ছ, ভ্রান্তি-নিরসনকারী আলোক-প্রাচুর্য আছে বলিয়াই ইহা আমাদিগকে এত গভীরভাবে স্পর্শ করে। Humorist তাঁহার হাসির সাহায্যে আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, যেখানে আমরা গম্ভীর সেখানে আমরা হাস্যাস্পদ, যাহা আমাদের নিকট উপহাস্য তাহা প্রকৃতপক্ষে সহানুভূতির অধিকারী। তিনি জীবনের প্রতি একটা বক্র, বঙ্কিম দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রচলিত, ব্যাবহারিক সত্যের অভ্যন্তরে অলক্ষিত, বিস্মৃত সত্যের আবিষ্কার করেন, এবং এই আবিষ্কারের অতর্কিতত্ব ও আবিষ্কার-প্রণালীর মৌলিকতা আমাদের চমক ভাঙাইয়া আমাদিগকে অসংবরণীয় হাস্যোচ্ছ্বাসে স্ফীত করিয়া তোলে। এই হিসাবে humorist দার্শনিকের নিকট আত্মীয় ও সহকর্মী—বৈদান্তিক যেমন এই স্থূল, বাস্তব জগৎকে মায়া ও তৎপ্রতি আমাদের আসক্তিকে আত্মপ্রবঞ্চনা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, হাস্যরসিকও সেইরূপ আমাদের সহজ গতিবিধির মধ্যে বিকৃত অঙ্গভঙ্গী, আমাদের সাধারণ বিচার-প্রণালীর মধ্যে উপলব্ধির অতীত ভ্রমসংকুলতা দেখাইয়া জীবনকে সুস্থ, স্বাভাবিক অবস্থার দিকে ফিরাইতে চাহেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রভেদ যাহা কিছু তাহা প্রণালীর। বৈদান্তিক গম্ভীরভাবে, যুক্তি-তর্কের সাহায্যে তাঁহার তত্ত্বপ্রচার করিতে চাহেন, হাস্যরসিক একটিমাত্র বক্রোক্তি, একটিমাত্র অনায়াসোচ্চারিত, হাস্য-তরল মন্তব্যের দ্বারা আমাদের মনের উপর হইতে বদ্ধমূল সংস্কারের ঘন যবনিকা অপসারিত করেন।

অবশ্য রসিকতার এই উচ্চ আদর্শ ও সূক্ষ্ম সংস্করণ উপন্যাস অপেক্ষা সন্দর্ভ বা প্রবন্ধ (essay) জাতীয় রচনাতেই অধিকতর প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ইংরেজি সাহিত্যে Lamb-এর প্রবন্ধাবলী ও Shakespeare-এর পরিণত বয়সের নাটকের কোন কোন চরিত্র-চিত্রণ ইহার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। ঔপন্যাসিকেরা সাধারণতঃ এরূপ ব্যাপক জীবন-সমালোচনার ভিতর দিয়া নিজ রসিকতার পরিচয় দিবার সুযোগ পান না। তাঁহাদের অন্যান্য কর্তব্যের চাপ তাঁহা-দিগকে এইদিকে মনোযোগ দিবার অবসর দেয় না। ইংরেজি উপন্যাসে এইরূপ humorist-এর নাম অঙ্গুলিতে গণনা করা যাইতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে Fielding ও Sterne, ও উনবিংশ শতাব্দীতে Dickens—এই কয়েকটি ঔপন্যাসিক মাত্র উপন্যাস ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে humour প্রবর্তনের গৌরব দাবী করিতে পারেন। আবার ইঁহাদের মধ্যেও একমাত্র Sterne প্রকৃত humorist পর্যায়ভুক্ত হইবার অধিকারী—তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র Uncle Toby এই উচ্চাঙ্গের সূক্ষ্ম রসিকতার একজন পূর্ণ-পরিণত, নিখুঁত প্রতীক। তাহার ব্যবহারের উৎকেন্দ্রি-কতা (eccentricity) ও মন্তব্যের বাহ্যতঃ অযৌক্তিক একদেশ-দর্শিতার মধ্যে একটা স্বচ্ছ, গভীর সত্যদৃষ্টি প্রচ্ছন্ন আছে। তাহার হাসি অপরিমেয় করুণায় ভরা, তাহার পিছনে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার অবিচারে বঞ্চিত হতভাগ্যদের প্রতি অকৃত্রিম কারুণ্য ও সমবেদনা, পতনোন্মুখ অশ্রুবিন্দুর ন্যায় টল্‌টল করিতেছে। ইহার সহিত তুলনায় Fielding ও Dickens-এর রসিকতা অনেকটা স্থূল, অগভীর ও আতিশয্যদুষ্ট। Fielding তাঁহার চরিত্রদিগকে সর্বদাই মারামারি, ছুটাছুটি, প্রভৃতি উত্তেজনাপূর্ণ অথচ হাস্যোদ্দীপক অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া এক

প্রকারের লঘু হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। Dickens-এর রসিকতা অপেক্ষাকৃত মিশ্র ও জটিল প্রকৃতির। তাঁহার সৃষ্ট নর-নারীর মধ্যে সমবেদনা-গভীর, অশ্রুসজল হাস্যরসের অভাব নাই—তথাপি তিনি মোটের উপর চেহারার বিকৃতি, কথোপকথনের বিশিষ্ট ভঙ্গীর অশ্রান্ত পুনরাবৃত্তি প্রভৃতি সুলভ উপায়ে—অর্থাৎ এক কথায় ব্যঙ্গমূলক অতিরঞ্জন-প্রবণতার দ্বারা হাস্য উদ্দীপন করেন। তাঁহার অমর সৃষ্টি পিকুউইক চরিত্রে এই উভয় প্রকারের রসিকতার সমন্বয় হইয়াছে। পিকুউইক একদিকে জীবনের সাধারণ ব্যবহার ও কর্মক্ষেত্রে নিজ বুদ্ধিহীনতা, সাংসারিক জ্ঞানের অভাবের পরিচয় দিয়া নিজেকে হাস্যাস্পদ করিয়াছেন—অন্যদিকে তাঁহার শিশু-সুলভ সরলতা এবং আন্তরিক, অথচ কার্যতঃ নিষ্ফল হিতৈষণা, তাঁহার চরিত্রে গাম্ভীর্যের সহিত কৌতুকপ্রিয়তার সম্মিলন, তাঁহাকে সমস্ত ঔপন্যাসিক চরিত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় করিয়াছে। অন্যান্য ইংরেজ ঔপন্যাসিকের humour দুই একটি বিচ্ছিন্ন মন্তব্য, বা দুই একটি অপ্রধান চরিত্র-সৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ—তাঁহারা ব্যাপক ও সমগ্রভাবে সমস্ত জীবনের মধ্য দিয়া কৌতুকরসের প্লাবন বহাইতে চেষ্টা করেন নাই।

বাংলা সাহিত্যে ঔপন্যাসিক প্যারীচাঁদ মিত্র ও নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র এই প্রকার রসিকতা প্রবর্তনে অগ্রণী হইয়াছেন। প্যারীচাঁদের প্রায় সমস্ত মুখ্য চরিত্রই—বাঞ্ছারাম,বক্রেশ্বর, ঠকচাচা, প্রভৃতি—এই কৌতুককর হাস্যরসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। লেখকের চরিত্র-সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য ও প্রেরণা আসিয়াছে এই হাস্যরস-প্রবর্তনের চেষ্টা হইতে। দীনবন্ধুর রচনায় verbal wit বা কথা-কাটাকাটির যথেষ্ট উদাহরণ আছে। কিন্তু তথাপি তাঁহার নিমচাঁদ-চরিত্র উচ্চাঙ্গের humour-এর অভিব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। নিমচাঁদের রসিকতাপূর্ণ উক্তিগুলি কেবল তাহার বুদ্ধিবৃত্তিপ্রসূত নহে, কেবল উত্তর-প্রত্যুত্তরের মল্লযুদ্ধ নহে—ইহা তাহার গভীরতর প্রদেশের সহিত সম্পর্কান্বিত, তাহার সমগ্র চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তি। তাহার মদ্যাসক্তি কেবল এক প্রকারের বাহ্য উচ্ছৃঙ্খলতা বা নীচ ভোগ-ব্যসন মাত্র নহে, ইহা তাহার অন্তঃপ্রবাহিত ইংরেজি শিক্ষার উগ্র উন্মাদনা ও ভাব-ঘন নেশার বহিঃপ্রকাশ। নিমচাঁদ একজন সাধারণ শৌণ্ডিকালয়-বিহারী, নর্দমাশায়ী মাতাল নহে; তাহা হইলে তাহার চরিত্রে কোন প্রকার মহত্ত্ব বা গৌরব থাকিত না। তাহার বাহিরের নেশা তাহার মানস মত্ততার ফেনিল বিস্ফুরণ হিসাবে উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত ও গৌরবান্বিত হইয়াছে। তাহার রসিকতা ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যবিলাসের গন্ধসারের উগ্র সৌরভে পরিব্যাপ্ত, বাঙালীর মানসক্ষেত্রে নবোদ্ভিন্ন ইংরেজি-অনুশীলন-বৃক্ষের মুকুল-গন্ধ-ভারাক্রান্ত। এই হিসাবে নিমচাঁদ Shakespeare-এর Falstaff-এর সহিত তুলনীয়—উভয়েরই রসিকতা তাহাদের সমগ্র ব্যক্তিত্বের সহিত নিগূঢ় সম্পর্কান্বিত, তাহাদের অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য ও সুপরিণতির (ripeness) বহির্বিকাশ।

(২)

বাঙলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকগণ—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—তাঁহাদের উপন্যাসে humour-এর প্রতি বিশেষ প্রবণতা দেখান নাই। অবশ্য তাঁহাদের সৃষ্ট দুই একটি চরিত্রে,

তাহাদের কথোপকথনে ও লেখকদের বিশ্লেষণ ও মন্তব্যের মধ্যে মাঝে মাঝে উপভোগ্য রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণতঃ ব্যাপকভাবে humorist-রূপে পরিগণিত হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ্‌ প্রভৃতি চরিত্র অবিমিশ্র ভাঁড়ামির উদাহরণ। তাঁহার আসমানি, দিগ্‌বিজয়, গিরিজায়া, প্রভৃতি পরিচারক-শ্রেণীর পাত্রপাত্রীর মধ্যে চালাকি ও বোকামিতে মেশামেশি একপ্রকারের রসিকতা আছে। তাঁহার মাণিকলালের (রাজসিংহ) সরস বাক্‌চাতুর্য, উদ্ভাবন-কৌশল ও অফুরন্ত স্ফূর্তি তাহাকে humorous চরিত্রের অপেক্ষাকৃত উন্নত পর্যায়ে স্থান দিয়াছে। উপন্যাসগুলির মধ্যে দৃশ্য-বিশেষে রসিকতার প্রাচুর্য ছাড়াও 'ইন্দিরা' গল্পটি আগাগোড়া humorous strain বা রসিকতার সুরে বাঁধা। কিন্তু এ সমস্তের জন্য humorist মহলে বঙ্কিমচন্দ্র স্থানের দাবী করিতে পারেন না। যে গ্রন্থের উপর তাঁহার এই দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহা মোটেই উপন্যাস নহে, তাহা তাঁহার রস-সন্দর্ভ 'কমলাকান্তের দপ্তর'।

'কমলাকান্তের দপ্তর' ১২৮০ হইতে ১২৮২ বঙ্গাব্দের মধ্যে 'বঙ্গদর্শন'-এর জন্য রচিত কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি। ইহাদের মধ্যে পূর্বে humour-এর যে সমস্ত স্বভাব-সিদ্ধ গুণ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তাহা পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত। এই প্রবন্ধগুলিতে জীবনের তীক্ষ্ণ, মৌলিক বিশ্লেষণ, সমালোচনার বিশিষ্ট ভঙ্গী কল্পনাসমৃদ্ধিযোগে অপরূপ ও বিশুদ্ধ হাস্য-কিরণ-সম্পাতে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে; গভীর চিন্তাশীলতা, জীবনের করুণ রিক্ততা ও বঞ্চনার আবেগ-কম্পিত উপলব্ধির সহিত হাস্যোদ্দীপক, লীলায়িত অথচ সূক্ষ্ম সংযমবোধনিয়ন্ত্রিত কল্পনা-বিলাসের অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। আবার এই কল্পনা-বিলাস ও হাস্যরসেরও নানাপ্রকারের সূক্ষ্ম স্বর-বিভেদ অনুভব করা যায়। কল্পনা কোথাও শান্ত, মৃদু, গভীর চিন্তার ভারে আত্ম-সংবৃত ও মন্থরগতি; কোথায়ও বা তীব্র-আবেগ-কম্পিত; কোথায়ও বা বাধাবন্ধহীন, পূর্ণোচ্ছ্বাসিত। তেমনি হাস্যরসও কোথায়ও অতি সংযত, অলক্ষিত-প্রায়, একটু বক্র কটাক্ষ, ও ওষ্ঠাধরের ঈষৎ বঙ্কিম আন্দোলনে মাত্র প্রকাশিত; কোথাযও farce-এর মত উতরোল, উচ্চকণ্ঠ; কোথায়ও বা comedy-র উদার প্রাণখোলা উচ্ছ্বাস, কোথায়ও বা tragedy-র গম্ভীর-বিষণ্ণ আভাসে স্নিগ্ধ-সজল। ভাব-রাজ্যের স্বর-গ্রামের সমস্ত উচ্চ-নীচ পর্দা ও তাহাদের মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম মীড়-মূর্ছনার উপর লেখকের সমান অধিকার—'কমলাকান্তের দপ্তর' একটি তান-লয়-শুদ্ধ সংগীতের মত আমাদের রসবোধকে পরিপূর্ণ তৃপ্তিদান করে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, humour-এর লক্ষণ হইতেছে—একটি অসাধারণ দৃষ্টিকেন্দ্র হইতে জীবনের পর্যবেক্ষণ ও তাহার প্রচলিত গতির মধ্যে নানা বক্ররেখা ও সূক্ষ্ম অসংগতির কৌতুককর আবিষ্কার। অনেকগুলি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র জীবনকে একটা প্রবল সর্বব্যাপী হাস্যকর অথচ গভীর অর্থপূর্ণ কল্পনার ভিতর দিয়া দেখিয়াছেন; সেই কল্পনার দ্বারা বিকৃত ও রূপান্তরিত হইয়া জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও উদ্দেশ্য এক ব্যর্থ উদ্ভট খেয়ালের সূত্রে গ্রথিত বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। 'মনুষ্য-ফল', 'পতঙ্গ', 'বড়-বাজার', 'বিড়াল', 'ঢেঁকি', 'পলিটিক্‌স', 'বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধগুলি এই প্রণালীর উদাহরণ। এই সমস্ত প্রবন্ধেই জীবনক্ষেত্রে কল্পনার প্রয়োগ খুব স্বাভাবিক হইয়াছে ও উপমাগুলির নির্বাচন সাদৃশ্য-আবিষ্কারের আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দেয়। হয়ত স্থানে স্থানে তুলনার মধ্যে একটু কষ্ট-কল্পনার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়;

হয়ত কোথাও কোথাও লেখকের জীবন-সমালোচনা যেন একটু অতিরিক্ত মাত্রায় কল্পনাবিলাসী (far-fetched) বলিয়া আমাদের মৃদু প্রতিবাদস্পৃহা জাগায়। কিন্তু লেখকের অনুভূতির প্রখরতায়, কল্পনা-স্রোতের প্রবল প্রবাহে এ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্দেহ কোথায় ভাসিয়া যায়। এই সমস্ত প্রবন্ধে ভাবের নৌকা, কল্পনার প্রবাহ-বিস্তারে এরূপ অবলীলাক্রমে স্বচ্ছন্দগতিতে ভাসিয়া যায় যে, কোথায়ও বাস্তবের অর্ধমগ্ন চড়ায় ঠেকিয়া বা বিবক্তিকর পৌনঃপুনিক আবর্তনের ঘূর্ণীচক্রে পাক খাইয়া ইহার অগ্রগতি প্রতিহত হয় না। আকাশে মেঘের স্তরবিন্যাসের মধ্যে যেমন একটি সূক্ষ্ম,অথচ সুস্পষ্ট পর্যায়-রেখা অনুভব করা যায়,এক বর্ণ যেমন প্রায় অলক্ষিতভাবে, অথচ সুষমার সহিত বর্ণান্তরে মিলাইয়া যায়, 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর সন্দর্ভগুলিতেও প্রসঙ্গ-পরিবর্তন-রীতির মধ্যে (methods of transition) সেইরূপ একটি স্বচ্ছন্দ, ক্ষিপ্র লঘুগতির পরিচয় পাওয়া যায়। চিন্তাধারা নদীর বাঁকের মত অত্যন্ত অনায়াসগতিতে, সাবলীল ভঙ্গীতে অথচ অনিবার্য-নিয়মাধীন হইয়া মোড় ফিরিয়াছে—যেখানে লেখক তরল রঙ্গরস ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ হইতে হঠাৎ উচ্চ নীতিবাদের অচপল গাম্ভীর্যে আসীন হইয়াছেন, সেখানেও প্রায়ই সুরের ঐকতান ছিন্ন বা খণ্ডিত হয় নাই, অশোভন ব্যস্ততা বা আয়াস-সাধ্য লম্ফ-প্রদানের কোন চিহ্ন নাই—এই অবিচ্ছিন্ন সুর সন্দর্ভগুলিকে গীতিকাব্যের ঐক্য দান করিয়াছে।

কতকগুলি প্রবন্ধে প্রৌঢ়ত্বের মোহভঙ্গ, যৌবনের রঙ্গীন নেশার অবসানের তীব্র অনুভূতিময় বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে। ভাষার ঐশ্বর্য, উপমার অজস্র প্রাচুর্য ও অপরূপ সুসংগতি, ও গভীর ভাবের সুর-ঝংকারের সমন্বয়ে ইহারা পূর্বস্মৃতির আলোচনামূলক সাহিত্যের (retrospective literature) শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে। 'একা', 'আমার মন', ও 'বুড়া বয়সের কথা' এই জাতীয় সন্দর্ভ। প্রৌঢ় বয়সের শেষ সীমায় পা দিবার পর যে রহস্যময় পরিবর্তন মানুষকে জীবনের পরপারে ঠেলিয়া দিবে তাহার প্রথম অনুভূতি তাহার মনের আকাশকে এক বিষাদময় কুহেলিকার ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিতে থাকে। এই কুহেলিকা তাহাকে জীবনের আনন্দোৎসব হইতে বিচ্ছিন্ন করে, সে আপনার নিঃসঙ্গত্ব অনুভব করিয়া ম্রিয়মান হয়। জীবনের রসমাধুর্য বিস্বাদ হয়, তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় বিলীন হয়, হৃদয় একটা নামহীন, অকারণ অনুশোচনা ও আত্মধিক্কারে পূর্ণ হয়, জীবনের সমস্ত সফলতা, কৃতিত্ব ও সঞ্চয় এক গৌরবহীন ধূলিশয্যায় অবলুণ্ঠিত হইয়া থাকে। জীবনের এই খেদময়, অবসাদগ্রস্ত খণ্ডাংশের যে চিত্র আমরা বঙ্কিমচন্দ্রে পাই তাহা অতুলনীয়। Byron, Shelley, Keats, প্রভৃতি রোমান্টিক যুগের তরুণ কবিদের মুখে যে খেদের বাণী ধ্বনিত হয়, তাহার মধ্যে আদর্শবাদের আতিশয্য ও বিদ্রোহের উদ্ধত উচ্চ সুর অসাধারণত্বের সাক্ষ্য দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণ, চিন্তাশীল মনুষ্যের অভিজ্ঞতাকেই কাব্য-প্রকাশের সৌন্দর্যলোকে উন্নীত করিয়াছেন। এই অরুচির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যে ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন—মানব-প্রীতি, পরহিতসাধন, ভগবদভক্তি—তাহা সমস্তই নীতি-বিদের সনাতন ব্যবস্থা-পত্র হইতে সংগৃহীত। কিন্তু এই নৈতিক অনুশাসনের মধ্যে কোনরূপ আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মশ্রেষ্ঠত্বাভিমানের ছায়া নাই। কমলাকান্ত যেখানে নীতি-প্রচারকের উচ্চ-মঞ্চে আরোহণ করিয়াছে, সেখানেও সে তাহার স্বাভাবিক বিনয় ও সরস বচন-ভঙ্গী হারায় নাই। নীতির তিক্ত বটিকা রসিকতার শর্করাবৃত হইয়া সুখসেব্য হইয়াছে।

বাকী প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'ইউটিলিটি বা উদর-দর্শন' বেন্থামের দার্শনিক তত্ত্ব ও সংস্কৃত সূত্র

ও ভাষ্যের রচনা-প্রণালীর ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণ। 'বসন্তের কোকিল' ও 'ফুলের বিবাহ' কল্পনার ক্রীড়াশীল উচ্ছ্বাস—ইংরাজিতে যাহাকে fantasy বলে সেই জাতীয় রচনা। ইহাদের মধ্যে প্রথম প্রবন্ধে কোকিলের প্রতিকূল সমালোচনা হঠাৎ সহানুভূতির ও সম-ব্যবসায়ীর প্রীতি-বন্ধনে রূপান্তরিত হইয়াছে।

'আমার দুর্গোৎসব' ও 'একটি গীত'-এ সমস্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও হাস্যরস-চর্চার মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি, দীর্ঘকালরুদ্ধ আবেগের আকস্মিক নিষ্ক্রমণের ন্যায়, তীব্র হাহাকারে, বুক-ফাটা কান্নার স্বরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'একটি গীত'-এ সুপরিচিত বৈষ্ণব কবিতার ব্যথা-প্রসঙ্গ সেই চির-রুদ্ধ, হৃদয়ের গোপনগুহাশায়ী আশার পথ খুলিয়া দিয়াছে—বৈষ্ণব কবির ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে লেখকের স্বদেশঘটিত বেদনাকে উদ্বেল করিয়াছে। মুসলমান কর্তৃক নবদ্বীপ-জয়ের চিত্র একটি prose lyric, বা গদ্যরচিত গীতিকাব্যের উন্মাদনা ও ঝংকার লাভ করিয়াছে। 'আনন্দমঠ'-এ বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে আধুনিক স্বদেশ-প্রেমের বীজ উপ্ত হইয়াছিল, এই প্রবন্ধগুলিতে তাহা পুষ্ট ও পত্র-পুষ্প-শোভিত হইয়াছে। আমাদের দেশপ্রীতির বিশেষ সুর, ইহার বিশিষ্ট আকার ও ধারা, ইহার উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ ও বাস্তব-বিমুখতা, ইহার বর্তমানের প্রতি উপেক্ষা ও ভবিষ্যতের প্রতি স্বপ্নময়, আবেশ-বিভোর দৃষ্টিক্ষেপ, ইহার পূজোপচার-রীতি ও মন্ত্র-রচনা—এ সমস্তেরই উৎস বঙ্কিমচন্দ্র।

'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর মধ্যে দুইটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যাহা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজ রচনা নহে। 'চন্দ্রালোক'-এর রচয়িতা অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও 'স্ত্রীলোকের রূপ'-এর লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। এই দুইটি প্রবন্ধের রচনা-ভঙ্গী ও ভাব-গত সুর একবারে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত অভিন্ন—একেবারে নিশ্চিহ্নভাবে তাঁহার রচনাধারার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। বঙ্কিম তাঁহার চতুর্দিকে এমন এক প্রতিবেশ-মণ্ডলী রচনা করিয়াছিলেন, এমন একটি লেখক-সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন, যাঁহারা তাঁহার প্রতিভার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার ভাবোচ্ছ্বাস ও রচনা-রীতি সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। অথচ এই অনুকরণের মধ্যে কোন অক্ষমতার চিহ্ন নাই, ইহা মৌলিক গুণে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। খুব সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে এইটুকু মাত্র প্রভেদ ধরা পড়ে যে, বঙ্কিমের শিষ্যদের উচ্ছ্বাসের মধ্যে একটু অসংযম ও আতিশয্যের লক্ষণ আবিষ্কার করা যায়; বঙ্কিমের ন্যায় নিখুঁত ভাব-সংযম ও সূক্ষ্ম পরিমিতি-বোধ হয়ত ইহারা আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। 'চন্দ্রালোক'-এ কমলাকান্তের বিবাহবাতিকের যেন একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছে—ফুটনোটে সন্নিবিষ্ট ভীষ্মদেব খোসনবীশের মন্তব্যে এই সূক্ষ্মদর্শিতাটুকু আছে। হয়ত বঙ্কিম নিজে কমলাকান্তের বৈবাহিক স্পৃহাকে এতটা প্রাধান্য দিতেন না, সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ও ক্ষণস্থায়ী উচ্ছ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতেন। তার পরে মন্তব্যগুলির মধ্যে তীক্ষ্ণাগ্র চিন্তাশীলতার ছাপ থাকিলেও মোটের উপর চন্দ্রের প্রতি উপদেশ-দানের মধ্যে কতকটা স্থূলতর হস্তাবলেপের চিহ্ন মিলে। 'স্ত্রীলোকের রূপ' প্রবন্ধে অসাধারণ ভাষা-নৈপুণ্য ও শব্দ-সমৃদ্ধি থাকিলেও মোটের উপর বিদ্রূপাত্মক কৌতুকরস হইতে নারীর গুণ-মাহাত্ম্য-কীর্তনের সুর-পরি-বর্তনের মধ্যে যেন একটু ওস্তাদির অভাব—এই উভয় সুরের মধ্যে বিচ্ছেদ-রেখা বেমালুম ঢাকা পড়িয়া যায় নাই।

এই বিষয়ে ও অন্যান্য দিক্ দিয়াও 'কমলাকান্তের দপ্তর' Addison ও Steele-এর

Spectator-এর সহিত সাদৃশ্য স্মরণ করাইয়া দেয়। Addison-এর রচনার বিশিষ্ট সুর ও ভঙ্গীটিও তাঁহার সহযোগীরা এরূপ চমৎকার ভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, আভ্যন্তরীণ প্রমাণে কাহার কোন্‌টি রচনা নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য। মোটের উপর সমালোচকেরা স্থির করিয়াছেন, যে, Addison-এর রচনার সূক্ষ্ম রসিকতা, মৃদু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও ঈষৎ নীতিপ্রচারচেষ্টা প্রধান লক্ষণ। Steele এর রচনায় আবেগ ও ভাবোচ্ছ্বাসেরই প্রাধান্য। Addison বুদ্ধিপ্রধান ও Steele ভাবপ্রধান লোক ছিলেন, এবং তাঁহাদের মনোবৃত্তির এই বৈশিষ্ট্য স্ব স্ব রচনায় প্রতিফলিত হইয়াছে। সেইরূপ বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার সহযোগীদের মধ্যেও অনুরূপ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমের প্রতিভার এমন একটি বিকীরণ-শক্তি ছিল, যাহাতে ইহা নিজে ভাস্বর হইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, নিজের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রতিবেশভূমিকেও জ্যোতির্ময় করিয়া তুলিয়াছিল।

এ পর্যন্ত 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা ইহার প্রবন্ধ হিসাবে উৎকর্ষবিষয়ক—উপন্যাসের সহিত ইহার যোগসূত্রের কথা মোটেই আলোচিত হয় নাই। কিন্তু উপন্যাসের ইতিহাসে ইহাই 'দপ্তর'-এর প্রধান পরিচয়। 'কমলাকান্তের দপ্তর' যে কেবলমাত্র উচ্চাঙ্গের রসিকতার নিদর্শন, বা তীক্ষ্ণ চিন্তাশীলতাপূর্ণ দার্শনিক প্রবন্ধের সমষ্টি শুধু তাহা নহে। ইহার সন্দর্ভগুলির মধ্যে কেবল যে একটা ভাবগত ঐক্য আছে তাহাও নহে, বক্তার চরিত্রগত ঐক্যও সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে। রচনাগুলির মধ্য দিয়া কমলাকান্তের একটা অতি উজ্জ্বল ছবি বর্ণ ও রেখায় মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—কমলাকান্ত Dickens-এর Pickwick এর ন্যায় আমাদের হৃদয়ে চিরপরিচিত, প্রিয় বন্ধুর আসন অধিকার করিয়াছে। তাহার মন্তব্যগুলিকে আমরা লেখকের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারি না। প্রবন্ধগুলির মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আত্মপরিচয়ের ইঙ্গিতগুলি লেখকের কলা কৌশলে যথাযথ বিন্যস্ত হইয়া একটা পূর্ণাঙ্গ, জীবন্ত সৃষ্টির রূপ ধরিয়াছে। তাহার অহিফেনাসক্তি ও ঔদরিকতা, সাংসারিক নির্লিপ্ততা, নসীবাবুর পরিবারে প্রতিপাল্যের ন্যায় আশ্রয় গ্রহণ, তাহার কল্পনাপ্রবণতা, তাহার লৌকিক ব্যবহারে ও বৈষয়িক চিন্তা-ধারায় হাস্যকর অসংগতি, প্রসন্ন গোয়ালিনীর প্রতি তাহার গব্যরস ও কাব্যরসে মিশ্রিত অর্ধ-প্রণয়ীর সরস মনোভাব, তাহার গ্রাম্যজীবনের প্রতিবেশ হইতে দার্শনিক চিন্তার খোরাকসংগ্রহ, সর্বোপরি আদালতের বিসদৃশ ক্ষেত্রে তাহার দার্শনিক ও তাত্ত্বিক প্রতিভার বিস্ময়কর বিকাশ—এই সমস্তই কমলাকান্তকে জীবনের বৈদ্যুতিক শক্তিতে পূর্ণ রক্ত-মাংসের মানুষরূপে আমাদের সম্মুখে দাঁড় করাইয়াছে। শুধু সে নহে, তাহার সংসর্গে যে সমস্ত ব্যক্তি আসিয়াছে—যথা নসীরামবাবু ও প্রসন্ন গোয়ালিনী—তাহারাও কমলাকান্তের পূর্ণ জীবন-শক্তির কতকটা অংশ গ্রহণ করিয়াছে। দার্শনিকতার মধ্যে সমসাময়িক রাজনীতি-তত্ত্বের ইঙ্গিত তাহার ব্যক্তিত্বকে আরও বিশিষ্ট রূপ দিয়াছে, আরও পূর্ণ বিকশিত করিয়াছে। এই জীবন্ত চরিত্র-সৃষ্টির জন্য, একটা গতিশীল জীবন-নাট্যের ক্ষুদ্র ঘাত-প্রতিঘাতের আভাস-ব্যঞ্জনার জন্য, 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর উপন্যাসের ইতিহাসে একটা প্রকৃত স্থান আছে—বঙ্কিমের সৃষ্ট চরিত্রমালার মধ্যে কমলাকান্ত-কুসুমও গ্রথিত হইবার যোগ্য।

(৩)

বঙ্কিমচন্দ্রের পর হাস্যরসমূলক উপন্যাসের প্রধান স্রষ্টা ‘বঙ্গবাসী’র প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও এই সংবাদপত্রের নিয়মিত লেখক ‘পঞ্চানন্দ’—ছদ্মনামধারী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বোধ হয় ইন্দ্রনাথের রচনারীতি-বৈশিষ্ট্যের প্রভাবই যোগেন্দ্রচন্দ্রকে হাস্যরসপ্রধান উপন্যাস রচনায় প্রণোদিত করিয়াছিল। ইন্দ্রনাথ ঠিক ঔপন্যাসিক ছিলেন না, মজলিসী রসিকতা ও হাস্যরস-উদ্রেককারী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ও টিপ্পনীর দিকেই তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। ‘ভারত-উদ্ধার’ প্রভৃতি প্রহসনাত্মক ব্যঙ্গ-কাব্যে তাঁহার হাস্যরস-সৃজনের প্রতিভার নিদর্শন মিলে। এই কাব্যে তিনি মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণে (parody) ও বাঙ্গালী রাজনীতির হাস্যকর অসংগতি ও অন্তঃসারশূন্যতা উদ্‌ঘাটন করিয়া মার্জিত ও সুরুচিপূর্ণ কৌতুকরসের প্রবাহ ছুটাইয়াছেন। তাঁহার হাস্যরস-প্রধান উপন্যাসের মধ্যে দুইটি—‘কল্পতরু’ (১৮৭৪) ও ‘ক্ষুদিরাম’ উল্লেখযোগ্য। ‘কল্পতরু’ বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শন’-এ সুবিস্তৃত ও সপ্রশংস সমালোচনার গৌরব অর্জন করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র টেকচাঁদের ‘আলাল’-এর সহিত তুলনায় ইহার রসিকতার ও চরিত্রসৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক পাঠক ঠিক এই তুলনামূলক সমালোচনায় সায় দিতে পারে না। ‘আলাল’ উহার সমস্ত রুচিবিকার ও অন্যান্য ত্রুটি সত্ত্বেও একখানি সত্যকার উপন্যাস। ‘কল্পতরু’র যে রসিকতা তাহা ঔপন্যাসিক উৎস হইতে প্রবাহিত নহে, তাহা উপন্যাসের সহিত নিঃসম্পর্ক, উপন্যাসের অগ্রগতি-রোধকারী, অবান্তর মন্তব্যের সন্নিবেশ। আমরা যখন লেখকের রসিকতায় হাসি, তখন উপন্যাসের কথা আমাদের মনে থাকে না। লেখক উপন্যাসের কেন্দ্রিকতা অস্বীকার করিয়া তাঁহার রসিকতাকে প্রতি মুহূর্তে বৃত্তোৎক্ষিপ্ত স্বতন্ত্র সরলরেখার (tangentiality) অনুবর্তন করাইয়াছেন। রসিকতাপূর্ণ মন্তব্যের সহিত আখ্যায়িকার সংযোগস্থাপনে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ইন্দ্রনাথ অপেক্ষা অনেক বেশি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। চরিত্রাঙ্কন সম্বন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। নরেন্দ্রনাথ, নরেশচন্দ্র, রামদাস, প্রভৃতি কোন চরিত্রই ঠকচাচা, মতিলাল ও ‘আলাল’-এর অন্যান্য চরিত্রের পূর্ণাঙ্গতা ও জীবনীশক্তি লাভ করিতে পারে নাই। ‘কল্পতরু’র রসিকতার অসংলগ্নতা ও আখ্যায়িকার ধারাবাহিকতার অভাব অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ ঔপন্যাসিক Sterneএর রচনার সহিত একজাতীয়।

‘ক্ষুদিরাম’ উপন্যাসটির রচনাভঙ্গীতে পরিণত মানসশক্তির পরিচয় মিলে। ইহার মন্তব্য-সমূহ চিন্তাশীলতায়, মার্জিত রসিকতায় ও উপন্যাসের আখ্যানের সহিত নিবিড়তর সংযোগে ‘কল্পতরু’ অপেক্ষা অনেকটা অগ্রসর। তথাপি খাটি ঔপন্যাসিক গুণের দিক্ দিয়া ইহাতে বেশি উন্নতির চিহ্ন লক্ষ্য করা যায় না। ব্রাহ্মধর্মের নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে শ্লেষোদ্গার, গল্পের শ্রোত্রী হিসাবে আধুনিক-রুচিসম্পন্না ও প্রাচীন-সংস্কার-বিরোধী কমলিনীর নামোল্লেখ, ও ক্ষুদিরাম ও ভুসীভোজনের ব্যঙ্গাত্মক চরিত্রাঙ্কন—এই সমস্ত উপাদানই যোগেন্দ্রচন্দ্রের ‘মডেল-ভগিনী’ ও ‘চিনিবাস-চরিতামৃত’ গ্রন্থে অধিকতর কলাকৌশল ও গঠন-সংহতির সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে। ঘটনা সন্নিবেশের আকস্মিকতা ও তরল রসিকতার অতি-প্রাধান্যের

জন্য গভীর, একনিষ্ঠ উদ্দেশ্যের অভাব গ্রন্থখানির ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের পরিপন্থী হইয়াছে। লেখক ইহাকে 'গাল-গল্প' নামে অভিহিত করিয়া ইহা যে উপন্যাসের মর্যাদার অধিকারী নহে তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর রচিত উপন্যাসগুলিতে ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জনের সাহায্যে হাস্যরস ও বীভৎসরস (grotesque) সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার 'মডেল ভগিনী', 'কালাচাঁদ', 'চিনিবাস চরিতামৃত', 'নেড়া হরিদাস' ও 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' প্রভৃতি উপন্যাসের বঙ্গসাহিত্যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। ইহারা ঠিক উপন্যাসের গঠন বা আকৃতির অনুবর্তন করে না—মন্তব্য, ধর্মব্যাখ্যা, নীতিপ্রচার, অতিপ্রাকৃতের অবতারণা প্রভৃতি নানা উপাদানের মধ্যে উপন্যাসের বাস্তবচিত্রণ ও চরিত্রবিশ্লেষণ সসংকোচে একটু স্থান অধিকার করিয়াছে। এই মিশ্র ধরণের গঠন-প্রণালীর জন্য ইহারা Fieldingএর 'Tom Jones' ও Sterneএর 'The Sentimental Journey' ও 'Tristram Shandy'র সহিত তুলনীয়। ইংলণ্ডে পরবর্তী যুগে উপন্যাস এই সমস্ত অবান্তর প্রসঙ্গ সযত্নে বর্জন করিয়া গঠন-সামঞ্জস্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিল, তথাপি Thackeray বা George Eliotএর উপন্যাসে মন্তব্যের আতিশয্য ও অতিরিক্ত বাগাড়ম্বর উপন্যাসের আসল অংশটুকুকে গুরুভার-প্রপীড়িত করিয়াছে। আবার নিতান্ত আধুনিক যুগে Aldous Huxley ও James Joyce প্রভৃতির রচনায় এই কেন্দ্রোৎক্ষিপ্ত প্রবৃত্তি (centrifugal tendency) অত্যন্ত প্রবল হইয়া উপন্যাসের ঐক্যকে বহুধা বিভক্ত ও খণ্ডিত করিয়াছে—সুতরাং উপন্যাস-সাহিত্য এক হিসাবে প্রাথমিক যুগের বিশৃঙ্খলা ও আকারহীনতার দিকে প্রত্যাবর্তনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই হিসাবে যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনাকে উপন্যাসের সংজ্ঞা অস্বীকার করা যায় না। তাহার সমস্ত বিশৃঙ্খল, সুদূর-বিক্ষিপ্ত মন্তব্য-আলোচনার কেন্দ্রস্থলে ঔপন্যাসিক বীজ সুস্পষ্ট ভাবেই নিহিত আছে। মোট কথা, আমরা উপন্যাসের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সমালোচনার আদর্শের খাতিরে যতই বিধি-নিষেধের গণ্ডি রচনা করি না কেন, উপন্যাস কিন্তু এই সমস্ত সমালোচক নির্দিষ্ট ব্যবস্থা-পত্র অবজ্ঞার সহিত লঙ্ঘন করিয়া নিজ বিস্ময়কর, অফুরন্ত রূপ-বৈচিত্র্যের পরিচয় দিতেছে।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের দুইখানি উপন্যাসের আলোচনা করিলেই তাহার সাধারণ রচনা রীতির বৈশিষ্ট্য স্পষ্টীকৃত হইবে। তাঁহার 'মডেল ভগিনী' উপন্যাসটি (১৮৮৫) প্রথম প্রকাশকালে একটি তুমুল বিক্ষোভ ও আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল। অনেকেই ইহাকে ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও বিশেষ কোন ব্রাহ্মপরিবারের নৈতিক জীবনের প্রতি সুরুচি-বিগর্হিত কটাক্ষপাত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন ও ইহার চারিদিকে একটা সাম্প্রদায়িক কল-কোলাহল মুখরিত হইয়া ইহার সাহিত্যিক বিচার ও রসগ্রহণকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। এখন সে উত্তেজনা শান্ত হইয়াছে, ব্যক্তিগত ইঙ্গিতগুলি কালের যবনিকা অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন খাঁটি সাহিত্যিক আদর্শের দিক্ দিয়া ইহার বিচার চলিতে পারে।

এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে 'মডেল ভগিনী'র উৎকর্ষ অস্বীকার করা যায় না। লেখকের বিদ্রূপাত্মক অতিরঞ্জনের সাহায্যে হাস্যরস-সৃজনে সিদ্ধহস্ততার পরিচয় সর্বত্রই বিদ্যমান। অবশ্য এই প্রণালীতে হাস্যরস-সৃষ্টি অপেক্ষাকৃত স্থূল ও সম্পূর্ণ ইতরতা বর্জিত নহে। স্থানে স্থানে অতিরঞ্জনের মাত্রা অতিরিক্ত চড়িয়া সুরুচি ও সূক্ষ্ম সৌকুমার্যের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে। এই

সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি mock-heroic প্রণালী অনুসরণের অবশ্যম্ভাবী ফল। Byron-এর Don Juan বা Beppoর রসিকতা এমন কি Dickens এর হাস্যরসসৃষ্টি Lamb এর মত এত সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় হইতে পারে না—ইহাদের মধ্যে কতকটা ভাঁড়ামি, কতকটা সভ্যরুচিবিগর্হিত উচ্চহাস্যধ্বনির, অশোভন তীব্রতা ও অসংযমের প্রাধান্য থাকিবেই। শুচিবায়ুগ্রস্ত, রুচি-বাগীশ পাঠকের পক্ষে এরূপ গ্রন্থের রসাস্বাদন অসম্ভব। রসিকতার শ্রেণী-পর্যায়-বিভাগে ইহাদের স্থান খুব উচ্চ হইতে না পারে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে ইহাদের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত।

কমলিনীর সমস্ত প্রেমাভিনয় ব্যাপারটি আগাগোড়া এই বিদ্রূপ-মণ্ডিত আতিশয্যের সুরে বাঁধা—ইহার উপহাসের দিক্‌টা প্রায় বরাবর প্রাধান্য লাভ করিয়া ইহার উৎকট বীভৎসতা ও পাপাচরণকে চাপা দিয়াছে। কমলিনীর coquetry বা ছলনা-কৌশল, রঙ্গ-ভঙ্গ, বিলাস-ব্যসনই তাহার অসতীত্বকে অতিক্রম করিয়া আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়াছে। সে আমাদের নৈতিক ক্রোধ অপেক্ষা সংগতি-বোধকেই তীব্রতর আঘাত করে—সে আমাদের ঘৃণা অপেক্ষা উপহাসেরই অধিক উদ্রেক করে। লেখকের বিদ্রূপ প্রায় কোথায়ও মেজাজ চড়াইয়া ঘৃণা ও ক্রোধের পর্যায়ে উন্নীত হয় না। কিন্তু একেবারে গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদগুলিতে এই ব্যঙ্গের রঙ্গীন আবরণ ছিন্ন হইয়া পাপের নগ্ন বীভৎসতা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে ও উপন্যাসের রসভঙ্গ করিয়াছে। কমলিনীর যে পূতিগন্ধময় শেষ-প্রায়শ্চিত্ত-দৃশ্য দেখান হইয়াছে তাহাতে লেখক নিজ ঔপন্যাসিক কর্তব্য ও তাঁহার রসিকতার বিশেষ মনোভাব বিস্মৃত হইয়াছেন; ব্যঙ্গ-রসিকের তীক্ষ্ণ 'মিছরির ছুরী' নীতি-প্রাধান্যের ভোঁতা কাটারিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। স্বামীর প্রতি উৎপীড়নের বীভৎস দৃশ্য ব্যঙ্গ-চিত্রের সুকুমার বেষ্টনীকে অতিক্রম করিয়া আমাদের বিদ্রূপ-উপহাসের কৌতুক-রসপুষ্ট মনোবৃত্তিকে একেবারে বিপর্যস্ত করিয়াছে। ড্রইংরুমের পুষ্পসার-ভারাক্রান্ত, পাপের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের অদৃশ্য বীজানুপূর্ণ আবহাওয়া হইতে একেবারে নরকের গভীরতম অন্ধস্তরে অবতরণ আর্টের ভাবগত ঐক্য হইতে বিচ্যুতির নিদর্শন।

গ্রন্থের অন্যান্য দৃশ্যে কৌতুকরস এরূপ বিকৃত হয় নাই। ডেপুটী রামচন্দ্রের ছাত্রজীবন ও ধর্ম-পরিবর্তন, কৈলাসচন্দ্রের হেডমাস্টার কর্তৃক বিচার, হাওড়া স্টেশনে ইংরেজি পোষাকের ময়ূরপুচ্ছধারী কৈলাসের বীরত্বাভিনয়,—পুলিসের আসামী গ্রেপ্তার, ম্যাজিস্টেটের বিচার-প্রহসন—এই সমস্ত দৃশ্যগুলিতে নির্দোষ কৌতুকরস অতিরঞ্জনের মৃদুমন্দ বায়ুতে স্ফীত হইয়া প্রায় কূল ছাপাইবার উপক্রম করিয়াছে। এই সমস্তই দৃশ্যই mock-heroic রচনাভঙ্গীর অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইহাদের মধ্যে অতিরঞ্জন সত্যের রেখা অনুবর্তন করিয়াছে, কেবল তাহার উপর উজ্জ্বলতর বর্ণ আরোপ করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত স্বরূপটিকে আরও স্ফুটতর করিয়াছে মাত্র। অতিরঞ্জন সকল সময় সত্যের বিরোধী নহে, সময় সময় ইহা সত্যের বিনয়াবনত মস্তকের উপর পদমর্যাদা-জ্ঞাপক ভাস্বর মুকুট।

এই হাস্যরসপ্রধান উপন্যাসটির আর একটি স্তর আছে, যাহা মোটেই হাস্যরসের সমপর্যায়-ভুক্ত নহে ও হাস্যের সহিত যাহার সম্প্রীতির কোন কালেই খ্যাতি নাই। ইহা হইতেছে উচ্চ-ভাবপূর্ণ হিন্দু-ধর্ম ব্যাখ্যা ও হিন্দু-আদর্শের মাহাত্ম্য প্রচার। অধ্যায়ের পর অধ্যায় ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা চলিতেছে—পাতার পর পাতা ভরিয়া সুললিত সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে—অবশেষে

পাঠকের মনে ধারণা হইতেছে যে, দুইখানি সম্পূর্ণ বিভিন্ন গ্রন্থের পত্রাবলী মুদ্রাকরের অনুগ্রহে পরস্পরের মধ্যে-অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ এই উভয় অংশের মধ্যে অসংগতি তাদৃশ মারাত্মক নহে। হাসির সাগরের মধ্য হইতেই এই ধর্মতত্ত্বদ্বীপ অনিবার্য না হউক, অনেকটা স্বাভাবিক কারণে উত্থিত হইয়াছে। কমলিনীর প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক কৈলাসচন্দ্রই এই উভয় অংশের মধ্যে সংযোগ-সেতু। তাহার হতবুদ্ধি, বিস্ময়-বিমূঢ় মনোভাবই চুম্বকের মত এই ধর্ম-ব্যাখ্যাকে ব্রাহ্মণের মন হইতে আকর্ষণ করিয়া বাহির করিয়াছে; কৈলাসের বোধের জন্যই, তাহার শক্তি ও প্রবৃত্তির উপযোগী করিয়াই ইহা নিতান্ত সরল, সহজ ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং মূল উপাখ্যানের সহিত ইহার খুব বেশী অসামঞ্জস্য নাই। আর কৈলাসের মনে যে মহত্ত্বের বীজ সুপ্ত ছিল—যাহার প্রমাণ স্কুলের বিচার-দৃশ্যে ও কমলিনীর মায়াজালচ্ছেদে পাওয়া গিয়াছে—তাহাই এই ধর্মোপদেশের ফলে তাহার চরিত্রকে স্বাভাবিকভাবে আমূল পরিবর্তন করিয়াছে। এই সময় কিন্তু বেহাবী রাজা অনাবশ্যকভাবে প্রবর্তিত হইয়া ধর্মব্যাখ্যার স্রোত বৃদ্ধি করিয়াছে—উপন্যাসের বিশেষ উদ্দেশ্য ছাপাইয়া ইহা নিজ স্বাধীন প্রয়োজনে প্রবাহিত হইয়াছে। ধর্মতত্ত্বের এই অযথা প্রসার উপন্যাসের দিক্ হইতে নিন্দনীয় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার ধর্মতত্ত্বের যিনি কেন্দ্রস্থল সেই কমলিনীর স্বামী রাধাশ্যাম ভাগবতভূষণ আদর্শ পুরুষরূপে চিত্রিত হইলেও মোটেই অতিমানবের ন্যায় আমাদের অনধিগম্য হন নাই,—তাঁহার শিশুসুলভ সারল্য, সদানন্দময়তা, ঘোরতর উৎপীড়নের মধ্যে তাঁহার সহায়হীন, বিহ্বল ভাব—এই সমস্তই তাঁহাকে আমাদের স্নেহ ও সহানুভূতির অধিকারী করিয়াছে।

ধর্মের আর একটা দিক্ আছে, যাহা সহজেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিষয়ীভূত হইতে পারে—ইহা তাহাব ভণ্ডামি ও অন্ধবিশ্বাসের দিক্। যোগেন্দ্রচন্দ্রেব উপন্যাসে ধর্মের উচ্চতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে এই উপহাস্য দিক্‌ও যথেষ্টরূপে আলোচিত হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথের সন্ন্যাসিবেশ ও কমলিনীর অনুরোধে ব্রত-বিসর্জন কৌতুকরসের উপাদান যোগাইয়াছে। পরবর্তী 'রাজলক্ষ্মী' উপন্যাসে ধর্ম-প্রহসনের ব্যাপারটা আরও ঘোরাল করিয়া, বিদ্রূপের স্বর আরও উচ্চগ্রামে বাঁধিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মোটের উপর 'মডেল ভগিনী' জাতীয় পুস্তক বাঙ্গালা সাহিত্যে খুব কম—স্থানে স্থানে মার্জিত রুচির অভাব ও স্থূল আতিশয্য-প্রয়োগ থাকিলেও বঙ্গসাহিত্যের একটা বিশেষ প্রয়োজন ইহা পূর্ণ করিয়াছে।

'শ্রীশ্রীবাজলক্ষ্মী' (১৯০২) উপন্যাসে খাঁটি প্রহসন বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অংশের তীব্রতা, অন্যান্য উপাদানের সমাবেশ ও সংমিশ্রণের জন্য অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। ইহার আখ্যায়িকাভাগ অতি বিস্তৃত এবং ঘটনা-বৈচিত্র্য এবং নানাবিধ রস-সঞ্চারের জন্য চিত্তাকর্ষক। ইহার মধ্যে, Victor Hugoর Les Miserablesএর মত একটা মহাকাব্যোচিত বিশালতা আছে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে দ্রুত বিলীয়মান হিন্দুধর্মভাব ও আদর্শের ইহা একটা মহাকাব্য বিশেষ। হিন্দুধর্মের যাহা সার অংশ, হিন্দু জীবন-যাত্রার যাহা শ্রেষ্ঠ সুষমা তাহাই লেখক সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও তীব্র আবেগ এই উভয়বিধ অনুভূতির সাহায্যে, এক বিস্তৃত পটভূমিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহাতে হয়ত ইহার খাঁটি উপন্যাসোচিত গুণের কতকটা লাঘব হইয়াছে। অতিপ্রাকৃতের ঘন-সন্নিবেশ ও অতর্কিত ভাগ্যপরিবর্তনের উদাহরণ-বাহুল্য ইহাকে কতকটা অতি-নাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত (melodramatic) করিয়াছে।

ইহার চরিত্রদের মধ্যে অধিকাংশই খুনী আসামী বলিয়া অভিযুক্ত, অথচ প্রকৃতপক্ষে নিষ্পাপ, শুদ্ধাত্মা মহাপুরুষ; অধিকাংশই নিজ বুদ্ধিবলে বা সৌভাগ্যবলে ভিক্ষুক হইতে লক্ষপতিতে রূপান্তরিত; নিতান্ত অপরিচিত ব্যক্তিরাও পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ উপকার বা আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ; সকলেই ভাগ্যের ক্রীড়নক। সকলের ক্ষেত্রেই ভাগ্যচক্র তাহার ভ্রমণপথের চরম সীমা পর্যন্ত আবর্তিত। এই অনৈসর্গিক দ্রুত আবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু হইতেছে রঘুদয়াল—তাহার প্রভাব সর্বব্যাপী, ভারতের সুদূর প্রান্তদেশ পর্যন্ত প্রসারিত। কোটিপতি দীনদয়াল, দস্যু-প্রবঞ্চক সনাতনদাস শিয়ালমারা, এমন কি ইংরেজ বিচারক রাইট সাহেব পর্যন্ত তাহার চরাচরব্যাপী প্রভাবের অধীন। এই দৈবলীলার অতি-প্রাদুর্ভাব ঠিক উপন্যাসোচিত গুণ-বিকাশের পক্ষে অন্তরায়-স্বরূপ হইয়াছে।

চরিত্র-চিত্রণের দিক্ দিয়াও এই আদর্শবাদের আতিশয্য আমাদের সামঞ্জস্য-বোধকে পীড়িত করিবার উপক্রম করে। এ সম্বন্ধেও রঘুদয়ালই প্রধান অপরাধী। সে একজন অশিক্ষিত লাঠিয়াল ও অদ্বিতীয় শক্তিশালী পুরুষ—তাহার মধ্যে আমরা স্বভাবতঃ কর্তব্যনিষ্ঠা, প্রভুভক্তি, এমন কি প্রভুর মঙ্গলার্থ প্রাণবিসর্জনে উন্মুখতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের প্রত্যাশা করিতে পারি। কিন্তু সে ধর্মসাধনা ও দার্শনিক আদর্শবাদের যে অতি তুঙ্গশিখরে আরোহণ করিয়াছে, তাহার জন্য আমরা ঠিক প্রস্তুত নহি। তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক বলের নিকট তাহার শারীরিক শক্তি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অথচ সে আদর্শ পুরুষ বলিয়া যে তাহার চরিত্র-পরিকল্পনা অবাস্তব হইয়াছে তাহাও ঠিক নয়। যে ভাববাদের উচ্চ আকাশে সে স্বভাবতঃই বিচরণ করে, তাহা অস্পষ্টতার কুহেলিকায় ম্লান হয় নাই, দীপ্ত সূর্যকিরণে উজ্জ্বল। তাহার চরিত্রের বাস্তবতা উপন্যাস-অবলম্বিত বিশ্লেষণ-প্রণালীর দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই, কিন্তু রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ যে আদর্শলোককে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অতিসন্নিহিত করিয়াছে ও আমাদের সহজ সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে, তাহার কল্যাণে রঘুদয়ালকে আমাদের একবারে অপরিচিত বলিয়া মনে হয় না। ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্র-পরিকল্পনার দিক্ দিয়া ঠিক অনুরূপ অভিযোগ Les Miserables-এর বিরুদ্ধেও আনা যায়; Jean Valjeanএর চরিত্র রঘুদয়ালের মত আদর্শবাদের চরম সীমায় নীত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও Les Miserables পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসসমূহের অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং এই অভিযোগের বলে 'রাজলক্ষ্মী'কে ঔপন্যাসিক মর্যাদাচ্যুত করা যায় না—ইহার বিচার করিবার সময় অন্যান্য গুণে ইহা কিরূপ সমৃদ্ধ তাহাও নির্ধারণ করিতে হইবে।

চরিত্র-চিত্রণের দিক্ দিয়া কয়েকটি চরিত্র উচ্চাঙ্গের উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কাশীবাসীর নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইহার চরিত্র-বিশ্লেষণ ও ব্যবহারে চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন—উভয়ই খুব চমৎকার হইয়াছে। তাহার বাক্য, ব্যবহার, অঙ্গ-ভঙ্গী সমস্তই এত বাস্তবানুগামী হইয়াছে যে, তাহাকে আমাদের চির-পরিচিত প্রতিবেশী বলিয়া মনে হয়। তাহার বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের সহিত নির্লজ্জ আত্ম-প্রচার, ভক্তিগদ্‌গদ ভাবুকতার সহিত ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, সংসার-বৈরাগ্যাভিনয়ের সহিত মিথ্যা-সাক্ষ্য-প্রদানে নিপুণতার অতি সুন্দর সমন্বয় হইয়াছে। অথচ তাহার মধ্যে সদ্‌গুণের অভাব নাই, তাহাকে নিতান্ত ঘৃণ্যরূপে

দেখান হয় নাই। লেখক তাহার প্রতি জলন্ত ক্রোধের অগ্নিময় কটাক্ষপাত করেন নাই, তাহাকে তীব্র বিদ্রূপের তীক্ষ্ণাস্ত্রে বিদ্ধ করিয়াছেন। ব্যঙ্গ (satire) humour-এর স্নিগ্ধরসে অভিষিক্ত হইলে কিরূপে তাহার হিংস্রতা পরিহার করে, অথচ তাহার বেধ-শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, কাশীবাসীর চরিত্র-পরিকল্পনা তাহার সুন্দর উদাহরণ। সনাতন দাস ও শিয়ালমারার চরিত্রও খুব চমৎকার খুলিয়াছে ও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য খুব সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রয়াগী পাণ্ডা কেশবরামের চরিত্রে ক্ষুদ্রাশয়তার সহিত উপকারকের সূক্ষ্ম অভিমানবোধ চমৎকার মিশিয়াছে—ইহাতে ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জনের ঈষৎ স্পর্শ থাকিলেও মোটের উপর বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। দীনদয়ালের চরিত্রে উচ্চ আদর্শবাদ ও ধর্মভাবের সহিত ক্ষুরধার বিষয়-বুদ্ধির সম্মিলন ঘটিয়াছে—অমরসিংহের প্রতি তাঁহার উপদেশগুলিতে এই উভয় উপাদানের সমপরিমাণ মিশ্রণের সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়। তিনি আদর্শ বিষয়ী হইলেও আমাদের প্রতিবেশী, কল্পলোকবিহারী নহেন। সেইরূপ কাত্যায়নী, যশোদা ও লক্ষ্মী এই নারীত্রয়ের চরিত্রের সাধারণ আকৃতি এক জাতীয় হইলেও বয়স ও অভিজ্ঞতার তারতম্য-ভেদে এই ঐক্যের মধ্যে সূক্ষ্মতর বিশেষত্বগুলি আশ্চর্যরূপ স্পষ্টভাবে ফুটিয়াছে। রাজা অমরসিংহ ও রমাপ্রসাদের চরিত্র খুব সূক্ষ্মভাবে আলোচিত না হইলেও জীবন্ত ও সহজ-বোধ্য হইয়াছে। মোট কথা, গ্রন্থের চরিত্রগুলি সমস্তই সজীব ও অতিরঞ্জনজনিত বিকৃতি তাহাদের মধ্যে সেরূপ লক্ষ্যগোচর নহে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বর্তমান উপন্যাসে হাস্যরস অনেকটা মৃদু ও সংযত হইয়াছে। কাশীবাসী, সনাতন দাস, শিয়ালমারা, প্রভৃতির চরিত্র-বিশ্লেষণে, মোহর ভাঙাইবার পূর্বে রমাপ্রসাদের উপযুক্ত সজ্জাবিধানের প্রয়াসে, লক্ষ্মীর অনুরাগ-সঞ্চারের চিত্রে, হিন্দুসমাজের ধর্ম-বিষয়ে অন্ধবিশ্বাসপ্রবণতার বর্ণনায়—এইরূপ কতকগুলি বিষয়ে লেখকের হাস্যরস-অবতারণার নিদর্শন মিলে কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে 'মডেল ভগিনী'র প্রহসনমূলক আতিশয্য নাই। ইহার আর একটি কারণ করুণরসের প্রাধান্য। উচ্চাঙ্গের রসিকতায় হাসি ও অশ্রু যেমন নিগূঢ় ঐক্যে আবদ্ধ হইয়া আমাদের মনকে গভীরভাবে অভিভূত করে, এখানে সেরূপ কিছু নাই বটে—তবে করুণরসের সান্নিধ্য হাসির উচ্ছ্বাসকে যে অধিকতর সংযত ও সুরুচি-সম্মত করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। গ্রন্থের প্রথম অংশে কাত্যায়নী-পরিবারের শোচনীয় দারিদ্র্যের ও তাহাদের পরবর্তী জীবনের সমস্ত ভাগ্যবিপর্যয়ের চিত্রে, রাজা অমরসিংহের নিরুদ্ধপ্রকাশ, নিগূঢ় মর্মব্যথার ইঙ্গিতে, রঘুদয়ালের বিচারালয়ে আত্মসমর্পণের দৃশ্যে এই করুণরস উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। অবশ্য মন্তব্য-বাহুল্য এই রসের ঘনীভূত হওয়ার পক্ষে বাধাস্বরূপ অনুভূত হয়, তথাপি লেখকের সহানুভূতির প্রগাঢ় আবেগ, মিতভাষিতার স্বল্পপরিসরে আবদ্ধ না হইলেও, আমাদিগকে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

লেখকের ভাষা, বর্ণনা ও বিশ্লেষণের, ব্যঙ্গাত্মক বক্রোক্তি ও কটাক্ষের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইলেও, কথোপকথনের পক্ষে একটু অনুপযোগী হইয়াছে। ইহার কারণ সাধুভাষার আপেক্ষিক আড়ম্বর। স্ত্রীলোক ও অশিক্ষিত ব্যক্তির ভাষার মধ্যেও সুমার্জিত সংস্কৃত-প্রভাবান্বিত ভাষার আধিক্য দেখা যায়। ইংরেজী সভ্যতা ও আদর্শের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া ও স্বদেশপ্রীতির পুনঃ-প্রতিষ্ঠামূলক যে সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া

গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার পরিধির মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্রের একটা শ্রেষ্ঠ আসন আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা তাঁহার ছিল না; তাঁহার অস্ত্রশস্ত্রও ভিন্নজাতীয়, খুব সুমার্জিত ও সুরুচি-সংগত নহে, কিন্তু তথাপি এই মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সহকর্মিতার গৌরব লাভে অধিকারী।

(৪)

'বঙ্গবাসী'-প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর পর হাস্যরসপ্রধান উপন্যাসের এক দীর্ঘ ব্যবচ্ছেদ—তাহার পর প্রমথ চৌধুরী পরিত্যক্ত সূত্র আবার কুড়াইয়া লইয়াছেন। প্রমথবাবুর হাস্যরসসৃষ্টির প্রণালী সম্পূর্ণ অভিনব। তাঁহার প্রধান ভঙ্গী হইতেছে সৃজনীশক্তির আবেশময়তার সহিত সমালোচনাশক্তির অতন্দ্রিত বিচারবুদ্ধির এক প্রকারের অদ্ভুত হাস্যকর সমাবেশ। লেখক যখন কাব্যই হউক বা উপন্যাসই হউক সৃষ্টি করেন, তখন তিনি সুষমা ও সংগতিরক্ষার জন্য নগ্ন বাস্তবতার সহিত জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একটা আপোষ করেন। সেই আপোষের মোটামুটি শর্ত এই যে, সৃষ্টিপ্রতিভা বাস্তবজীবনের যে খণ্ডাংশ লইয়া আলোচনা করে, তাহার উপর নিজ উচ্চতর বা সুন্দরতর সত্যের এক জ্যোতির্ময় আবরণ রচনা করে; সাধারণ বাস্তবতার প্রতিনিধি পাঠককে কাব্যরস-উপভোগের জন্য এই ভাস্বর-ভাবমূলক আবরণটিকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তথ্যমূলক ব্যাবহারিক সত্যের তীক্ষ্ণ খোঁচায় ইহাকে ছিন্নভিন্ন করিলে চলিবে না। বাস্তবতার অসংগত ও নিষ্প্রয়োজন তাগিদ হইতে মনকে রক্ষা করিতে না পারিলে কাব্য-সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় না—কাব্য-লক্ষ্মীর সৌন্দর্য-স্তবগানের সময় তাঁহার বাহনটিকে মানসদৃষ্টির অন্তরালে রাখিতে হইবে। চিত্রকর রং-এর যথাযথ বিন্যাসে যে সুন্দর প্রতিমাটি গড়িয়া তুলিয়াছেন, কেহ যদি তথ্যানুসন্ধানের অতিরিক্ত উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহার পিছনে যে খড় ও মাটির সমষ্টি আছে, তাহাকে অন্তরাল হইতে অনাবৃত প্রকাশ্যতার মধ্যে টানিয়া আনেন, তবে প্রতিমার সৌন্দর্যোপভোগের অকালমৃত্যু ঘটে। উপন্যাসের রথ যখন পূর্ণবেগে চলিতেছে, তখন কেহ যদি তাহার চক্রের কল-কব্জা পরীক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হন, তবে রথের অগ্রগতি তৎক্ষণাৎ প্রতিরুদ্ধ হয়। মোট কথা, সমস্ত কার্যেরই একটা convention বা সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য-স্বীকৃতি আছে। ইহাকে উপেক্ষা না করিয়া, ইহার নির্ধারিত সীমা ও মনোভাবের মধ্যে সৃষ্টির নূতন বিকাশ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

গল্পের এই সুপরিচিত আকৃতি-প্রকৃতির বিরুদ্ধে চৌধুরী মহাশয় তাঁহার নিজ গল্প-উপন্যাসে একটা ব্যাপক অভিযান চালাইয়াছেন। গল্পলেখকের বিশিষ্ট ভঙ্গী ও মনোবৃত্তিকে তিনি পদে পদে ব্যঙ্গ-উপহাস করিয়া হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। 'ফরমায়েসী গল্প'-এ (চৈত্র, ১৩২৪) অতিমাত্রায় বাস্তব-মনোভাব-সম্পন্ন এবং সমাজ ও ধর্মজ্ঞানের দিক্ দিয়া সংকীর্ণ-সংস্কারাবিষ্ট পাঠকের হাতে দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় রোমান্টিক প্রণয়-কাহিনীর রচয়িতার কিরূপ দুর্দশা হইত তাহারই একটা সম্ভাব্য চিত্রে তিনি আমাদিগকে কৌতুক-রস অনুভব করাইয়াছেন। রুচিঘটিত, সমাজ-নীতিঘটিত ও ধর্মনীতিঘটিত আপত্তির বাধা ঠেলিতে ঠেলিতে গল্পের অধিকদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়—ইহার উপর আবার বক্তা ও শ্রোতৃবর্গের পরস্পর ঈর্ষা-বিদ্বেষ-জনিত ক্ষুদ্র সংঘর্ষ মূল

গল্পের অগ্রগতিকে আরও সংকুচিত করিয়াছে। যেমন চসারের Canterbury Tales-এ মূল গল্প অপেক্ষা শ্রোতৃবর্গের মধ্যে পরস্পর বাদানুবাদ অধিকতর চিত্তাকর্ষক, সেইরূপ এখানেও শ্রোতৃমণ্ডলীর সংঘর্ষজনিত ঘাত-প্রতিঘাত মূল প্রণয়কাহিনীকে গৌণ পর্যায়ে ফেলিয়া নিজ প্রাধান্য ঘোষণা করিয়াছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও মূল গল্প অপেক্ষা মুখবন্ধ বা প্রস্তাবনার উপরই তাঁহার ঝোঁক বেশি—গল্পের সর্বাঙ্গসুন্দর বৃত্তাকারের পিছনে তিনি ধূমকেতুর ন্যায় এক দীর্ঘ-ভূমিকার পুচ্ছ জুড়িয়া দিয়া তাহাকে একটা বক্র-কুটিল রূপ দিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত গল্পেরই তর্কমূলক, বাগ্‌বিতণ্ডা-জড়িত উৎপত্তি ক্ষেত্র আছে—এই উষর ক্ষেত্রেই তাহারা কণ্টক-কুসুমের ন্যায় ফুটিয়াছে। বিশেষতঃ যে ভাবাবেশমূলক প্রতিবেশের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর গল্প-উপন্যাসের উদ্ভব, তাহাকে তিনি নানা অবান্তর আলোচনা, কূটতর্ক, অতর্কিত ও হাস্যকর পরিণতি এবং সর্বোপরি একটা শুষ্ক, ভাব-বিমুখ, ব্যঙ্গ-প্রধান মনোভাবের দ্বারা খণ্ডিত ও প্রতিহত করিয়া তাহার ভাবগত ঐক্যকে রেণু পরমাণুর আকারে উড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার লেখায় epigram বা বিদ্রূপাত্মক তীক্ষ্ণাগ্র সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের ছড়াছড়ি—ইহারা কোথায়ও বা সুপ্রযুক্ত, কোথায়ও বা নিতান্ত অনধিকারপ্রবিষ্ট কষ্ট-কল্পনা। এই epigram রচনাই তাঁহার আসল সাধনা—গল্পাংশ কেবল এই epigram-পরম্পরাকে একটা যেমন-তেমন যোগসূত্রে গাঁথিবার অনাদৃত উপায় মাত্র। গল্পের মোড়কে epigram-এর চানাচুর তিনি পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন।

তাঁহার গল্পের শ্রেণী-বিভাগের প্রয়াস অনেকটা পণ্ডশ্রম, কেন না তাঁহার সর্বদা ক্রিয়াশীল বিদ্রূপ কুটিল মনোভাব সমস্ত শ্রেণীকে ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার করিয়া দিয়াছে। তথাপি তাঁহার দুঃসাহস ও প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মানদণ্ড হিসাবে শ্রেণীবিভাগের কতকটা সার্থকতা আছে। প্রণয়মূলক আখ্যানকে তিনি সর্বদাই tragedy হইতে tragi-comedy তে রূপান্তরিত করিয়াছেন। 'ট্র্যাজেডির সূত্রপাত' গল্পে এক প্রৌঢ়বয়স্ক অধ্যাপক পিতা নিজ পুত্রের শিক্ষাজীবনের কৃতিত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে প্রবৃত্তিদমন বিষয়ে শিক্ষার নিষ্ফলতার কথায় আসিয়া পড়িলেন ও ইহারই উদাহরণস্বরূপ নিজ সুনিয়ন্ত্রিত জীবনেও একটা দুরন্ত প্রণয়োচ্ছ্বাসের আবির্ভাবের কাহিনী বিবৃত করিলেন। এই অভাবনীয় প্রণয়োন্মেষের বর্ণনায় অধ্যাপকের সুরে একটু মোহাবেশের স্পর্শ লাগিয়াছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী ভূমিকায় তর্ক-বাহুল্য ও পরবর্তী মন্তব্যে বিদ্রূপের ছিটা ইহাকে কবিত্ব হইতে পরিহাসের পর্যায়ে লইয়া গিয়াছে। 'সহযাত্রী' গল্পে সিতিকণ্ঠ সিংহ ঠাকুরের প্রবল ব্যক্তিত্ব তাহার প্রণয়িজীবনের বিড়ম্বনাকে চাপা দিয়াছে। বিশেষতঃ নিজ লাঞ্ছনা বর্ণনায় তাহার অকুণ্ঠিত, সপ্রতিভ ভাব ও অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর অনুসন্ধানে বন্দুক হাতে ট্রেনে ট্রেনে ভ্রমণের উৎকট খেয়াল ইহার প্রচ্ছন্ন বেদনার দিকটা একেবারে আমাদের অনুভূতির অনধিগম্য করিয়াছে। 'বড়বাবুর বড়দিন' গল্পে বড়বাবুর প্রণয়বিহ্বলতার আতিশয্য একটা হাস্যাস্পদ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে—ইহাতে অবশ্য বড়বাবুর চরিত্রের ও স্ত্রীর প্রতি তাঁর মনোভাবের খুব বিস্তৃত ও শ্লেষাত্মক বিশ্লেষণই প্রধান অংশ জুড়িয়া আছে। থিয়েটারে তাঁহার দুর্গতি ও লাঞ্ছনার বর্ণনা গল্পটিকে প্রহসন-পর্যায়ভুক্ত করিয়াছে। 'ছোটগল্প'-এ প্রথমতঃ ছোট গল্পের বিশেষত্ব ও লক্ষণ লইয়া চুল-চেরা সূক্ষ্ম তর্ক; এই মুখবন্ধের পর যে গল্পটি উদাহরণস্বরূপ বিবৃত হইয়াছে তাহাতে প্রণয়ের আশাভঙ্গের ঈষৎ বেদনা ভুলধারণার হাস্যকর অসংগতির সহিত মিশিয়া একটা মিশ্র মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছে—এই মিশ্রভাবের

অনিশ্চিত আলোকে নায়কের আত্মোৎসর্গও তাহার নিজস্ব গৌরব হারাইয়া বীরত্বের অভিনয়ের মত হাস্যাস্পদ দেখাইয়াছে এবং গল্পশেষে পুরাতন আলোচনার পুনরাবির্ভাব আবার ইহাকে আর্টের স্বর্গলোকচ্যুত করিয়া তর্কের কণ্টকাকীর্ণ ক্ষেত্রে নামাইয়াছে। এই সমস্ত গল্পে লেখকের ভঙ্গীর চমকপ্রদ অভিনবত্ব, আমাদের চিরাগত প্রত্যাশার রূঢ় বৈপরীত্যসাধনই ইহাদের মৌলিক আকর্ষণের হেতু হইয়াছে।

কতকগুলি গল্প নিছক ব্যঙ্গচিত্র হিসাবেই পরিকল্পিত হইয়াছে। 'রাম ও শ্যাম' গল্পে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব-সংঘর্ষের তীব্র বিদ্রূপাত্মক, সরস চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। অবশ্য ইহাতে গল্পাংশ বিশেষ কিছুই নাই। কেননা গল্পের প্রত্যেক রেখা, প্রত্যেক বর্ণবিন্যাস ব্যঙ্গ-প্রধান উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। রাম ও শ্যামের তুলনামূলক চরিত্রা-লোচনার চেষ্টা সফল হয় নাই। এখানে epigram সত্যবিশ্লেষণকে অতিক্রম করিয়াছে। শেষের মন্তব্যটুকু এই ব্যঙ্গচিত্রকে একটু গভীরতার স্পর্শ দিয়াছে। 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার স্থলে ও জলে' গল্পে দুঃসাহসিকতার অংশ নিতান্তই অপ্রধান, ইহা লেখকের হাস্য-রসিকতাকে নূতন অবসর দিয়াছে মাত্র। গল্প দুইটির শেষে সংযোজিত দুইটি নীতি-উপদেশ ইহাদের হাস্যকরতাকে সুস্পষ্টতর রূপ দিয়াছে। বিপদ কাটিয়া গেলে আমাদের বিপৎকালের বিভ্রান্তভাব যে comic অবস্থার সৃষ্টি করে তাহাই লেখকের প্রধান উপজীব্য। 'ভাববার কথা'য় আগাগোড়া নিছক তর্কসংকুলতা—গল্প বলিবার ছদ্ম-প্রয়াসটুকু পর্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছে। '৺অবনীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি' নামক গল্পে অবনীর চরিত্রে পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্যে কোনরূপ সংগত কারণ-সংযোগ নাই, কেবলমাত্র খেয়ালের বশেই সেগুলি সংঘটিত হইয়াছে। ছাত্রজীবনে অবনীভূষণের যে দৃঢ়সংকল্প ও দেশ-হিতৈষণা তাহার চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব ছিল, তাহা সৌন্দর্যোপাসনার পিচ্ছিল পথ বাহিয়া কিরূপে বনিতা-বিলাস, ধর্মাশ্রয়, বেশ্যাসক্তি ও তপ-সাধনার স্তর দিয়া আধ্যাত্মিক সিদ্ধির চরম সার্থকতায় পৌঁছিল তাহারই অতি জটিল ইতিহাস এই গল্পে বিবৃত হইয়াছে। এই সমস্ত পরিবর্তনের যে একমাত্র কারণ দেখান হইয়াছে তাহা প্যারীলালের প্রভাব। এই প্রভাব-বিশ্লেষণ করিলে তাহার মধ্যে বিশেষ কোন সারবত্তা উপলব্ধি করা যায় না। প্যারীলাল এক-দিকে অবনীভূষণের মধ্যে সৌন্দর্যস্পৃহার বীজ বপন করিয়া তাহার অধোগতির পথ উন্মুক্ত করিয়াছে, অপরদিকে তাহাকে নিষ্কাম কর্তব্যনিষ্ঠায় প্রণোদিত ও শেষ পর্যন্ত তন্ত্রসাধনায় দীক্ষিত করিয়াছে—এই সমস্ত কার্যাবলীর মধ্যে যেমন কোন সামঞ্জস্য নাই, সেইরূপ তাহার চরিত্রের বিচিত্র বিকাশের মধ্যে এক paradox-প্রিয়তা ছাড়া আর কোনও যোগসূত্র নাই। লেখ-কের ধরণ দেখিয়া মনে হয় যে, এই গল্পে তিনি মনস্তত্ত্ববিদের বিশ্লেষণ-প্রণালীকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন।

নীল-লোহিত পর্যায়ভুক্ত গল্পগুলিতে অসম্ভব অতিরঞ্জনের সাহায্যে অম্লানবদনে আত্মগৌরব-প্রচারের কৌতুকপ্রদ প্রয়াস বিবৃত হইয়াছে। লেখকের মতে নীল-লোহিত একজন আদর্শ গল্প-রচয়িতা; তাঁহার সজীব বর্ণনাভঙ্গীতে যে অকুণ্ঠিত আত্ম-প্রত্যয় ফুটিয়া উঠিত, তাহা ব্যাবহারিক সত্যের বিরোধী হইলেও, গল্প-উপন্যাসের প্রাণস্বরূপ। তাঁহার গল্পে অবিশ্বাস করা পাঠকেরই রুচির দোষ, কেননা কল্পলোকের সত্যের সহিত ব্যাবহারিক জগতের সত্যের মিল হইতে পারে না, এবং সত্য-মিথ্যার ভেদজ্ঞানকে নৈতিক জগৎ হইতে কল্পনার রাজ্যে প্রবর্তন করা অবিধেয়। 'নীল-লোহিত', 'নীল-লোহিতের আদি প্রেম', 'নীল-লোহিতের সৌরাষ্ট্র-লীলা' ও 'নীল-লোহিতের

স্বয়ংবর' এই চারিটি গল্পের ভিতর দিয়া নীল-লোহিতের মনোভাব-বৈশিষ্ট্য ও গল্প বলিবার বিশেষ ভঙ্গী উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এই সমস্ত চমৎকার parody, অসম্ভবের কৌতুককর ও অসংকোচ সমাবেশের মধ্যে যে যোগসূত্র তাহা নীল-লোহিতের ব্যক্তিত্ব। যে সম্ভাবনীয়তা গল্পাংশ হইতে বর্জিত হইয়াছে, তাহা নীল-লোহিতের চরিত্র-পরিকল্পনায় ও ব্যবহারের সামঞ্জস্য-রক্ষায় কথঞ্চিৎ স্থান লাভ করিয়াছে—আমাদের বাংলা সাহিত্যে যে কয়টি স্বল্পসংখ্যক comic figure আছে সে তাহাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবার অধিকারী হইয়াছে।

কতকগুলি শোকাবহ ও গভীর-রস-প্রধান গল্পে লেখকের বৈশিষ্ট্য চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'দিদিমার গল্প', 'আহুতি' ও 'ভূতের গল্প'—এই তিনটি গল্পে তাঁহার কৌতুকপ্রিয়তা ও ব্যঙ্গ-প্রবৃত্তি বিষয় গৌরবের জন্য অনেকটা সংযত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি তাঁহার বুদ্ধিপ্রধান ও ভাবুকতাবিমুখ মনোবৃত্তি এখানেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রথম দুইটি গল্পে যে অত্যাচার ও প্রতিহিংসার ভীষণ কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাহা romantic temper-এর লেখকের হাতে রোমাঞ্চকর ভীতি-শিহরণের সৃষ্টি করিত; এবং লেখকও যে এই romantic প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াছেন তাহা নহে। বিশেষতঃ 'আহুতি'তে গল্প-বিবৃত tragedyর অভিশপ্ত লীলাভূমির বর্ণনায় তাঁহার উত্তেজিত কল্পনার আরক্ত উত্তাপ কতকটা অনুভব করা যায়। কিন্তু আসল ঘটনাতে আসিয়া এই অগ্নিশ্লেষাত্মক ও উত্তেজনাহীন বিবৃতির ভস্মাচ্ছাদনের তলে নিজ দীপ্তি ও দাহ গোপন করিয়াছে। যক্ষের ধন-রক্ষার জন্য শিশুবলি রবীন্দ্রনাথেরও একটি ছোট গল্পের বিষয়, কিন্তু তাঁহার বর্ণনা যে কল্পনা-সমৃদ্ধিতে ভয়াবহ ও শিশুর কাতর আবেদনে করুণার্দ্র হইয়া উঠিয়াছে, এখানে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। ধনঞ্জয় ও রঙ্গিণীর নৃশংসতা, কিরীটচন্দ্রের ব্যাকুল ছটফটানি ও রত্নময়ীর ভীষণ প্রতিহিংসার কাহিনী আমরা পাঠ করি বটে, কিন্তু লেখকের শান্ত, নিরুদ্বেগ, ঈষৎ-ব্যঙ্গ-সংশ্লিষ্ট বর্ণনাভঙ্গী আমাদের মনে কোনরূপ উত্তেজনা সঞ্চারে সহায়তা করে না। বিশেষতঃ লেখকের পাল্‌কী-যাত্রার সুদীর্ঘ মুখবন্ধ যে ব্যঙ্গপ্রধান প্রতিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা tragedyর রসবিকাশের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'দিদিমার গল্প'-এ দিদিমার বেনামী নিছক জুয়াচুরি, কেননা দিদিমা স্ত্রীলোক হইয়াও চৌধুরী মহাশয়ের কণ্ঠস্বর ও বর্ণনাভঙ্গী বেমালুম আত্মসাৎ করিয়াছেন; বক্তা-পরিবর্তনে বক্তৃতারীতির কোন পরিবর্তন হয় নাই। স্ত্রীলোক বক্তা হইলেও বর্ণনার মধ্যে কোন কোমলভাবপ্রবণতা বা রমণীসুলভ মাধুর্য সঞ্চারিত হয় নাই। 'ভূতের গল্প'-এ রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' বা 'নিশীথে'র হিম-শীতল অতীন্দ্রিয়তার স্পর্শলেশমাত্র নাই—contractor-এর বর্ণিত ও Engineer-এর অনুভূত ভৌতিক কাহিনী কেবল কৌতুককর অসংগতির ভাব জাগাইয়াছে। অতি-প্রাকৃত বর্ণনার অন্তর্গূঢ় মনোবৃত্তি অর্জন করিতে লেখক বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করেন নাই—সাদা চোখে ও বিদ্রূপকুঞ্চিত ওষ্ঠাধরে তিনি যে ভূতকে আবাহন করিয়াছেন তাহা সংসারের আর পাঁচটা বিসদৃশ আবির্ভাবের মত আমাদের মধ্যে হাস্যরসের সৃষ্টি করে মাত্র।

চৌধুরী মহাশয়ের 'চার ইয়ারী কথা' (১৯১৬) যদিও চারিটি বিচ্ছিন্ন গল্পের সমষ্টি, তথাপি ইহাদের অন্তর্নিহিত যোগসূত্র ইহাদিগকে উপন্যাসের পরিণতি ও গৌরব দিয়াছে। এক মেঘ-মূর্ছিত জ্যোৎস্নারাত্রে আসন্ন দুর্যোগের স্তব্ধতার মধ্যে, ক্লাবে সমবেত চারিটি বন্ধু ঘরে ফিরিতে না পারিয়া আপন আপন প্রণয়ঘটিত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছেন। এই গল্পগুলি কেবল যে

সময়ক্ষেপের জন্যই বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা নয়—লেখক ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, সেই ম্লান মেঘ-ভারাতুর চন্দ্রিকাই তাহাদের মনোরাজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের অন্তরের গোপন রহস্যকে টানিয়া বাহির করিয়াছিল। এই 'শনির দৃষ্টি'র মত আলোকের বর্ণনায় লেখক অপ্রত্যাশিত কল্পনা-সমৃদ্ধি ও ব্যঞ্জনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু এক প্রথম গল্প ছাড়া অন্য-গুলিতে এই অদৃশ্য প্রভাব ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। সেনের গল্পে এই বিকৃত, কলুষিত আলোকের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আর একটি প্রাণবেগচঞ্চল, জড়িমালেশশূন্য, জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাত্রির ব র্ণনা করা হইয়াছে, যাহার প্রভাবে বক্তার চির-অতৃপ্ত প্রেমিক-কল্পনা এক মুহূর্তের জন্য ফুলের ন্যায় সৌন্দর্যে ও সৌরভে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই ক্ষণলব্ধ স্বর্গ উন্মাদের অট্টহাস্যে খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছে ও এই অভিজ্ঞতার তীব্র অভিঘাত বক্তার মনকে চির-দিনের জন্য প্রণয়মোহ হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে প্রাত্যহিক বাস্তবতার সুদৃঢ় আবেষ্টনের মধ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মোটের উপর প্রথম গল্পটির সুর কবিকল্পনার উচ্চ গ্রামে বাঁধা ও লেখকের অতর্কিত স্বপ্নভঙ্গ, আদর্শলোক হইতে এক ধাক্কায় ভূতলে অবতরণই গল্প-মধ্যে comedyর একমাত্র লক্ষণ। গল্পের শেষ পরিণতির সহিত বক্তার ভূমিকা-সন্নিবিষ্ট আত্মচরিত্র-বিশ্লেষণেরও যথেষ্ট সুসংগতি আছে।

দ্বিতীয় গল্প—'সীতেশের কথা'য় পরিহাসের রসটি আরও জমাট বাঁধিয়াছে। সীতেশের কোমল, মেরুদণ্ডহীন, নারীজাতির আকর্ষণে সদাচঞ্চল মন, লণ্ডনের নিরানন্দময়, অবসাদপূর্ণ স্যাঁতসেঁতে বর্ষা, সস্তা-উপন্যাস-বর্ণিত অভিজাতবর্গের তরল প্রণয়কাহিনী—এই সমস্ত উপাদানে গঠিত প্রতিবেশের সহিত কেন্দ্রস্থ প্রণয়কাহিনীর হাস্যকর পরিণতি ঠিক একসুরে বাঁধা। স্থান-কাল-পাত্র এই তিনের রাসায়নিক সংযোগে প্রণয়িনীর ব্যবসাদার প্রতারিকাতে পরিবর্তন বেশ সুসংগতির সহিত নিষ্পন্ন হইয়াছে।

তৃতীয় গল্প—'সোমনাথের কথা' সোমনাথের অনন্যসাধারণ চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের পরিচয়ের দ্বারা অবতারিত হইয়াছে। সোমনাথ তীক্ষ্ণধী দার্শনিক, রূপযৌবনসম্পন্ন সুপুরুষ ও প্রণয়দ্বেষী। তাহার জীবনে রিনির আবির্ভাব যেরূপ আকস্মিক, তাহাদের প্রণয়কাহিনীও সেইরূপ প্রজাপতির ন্যায় চঞ্চল ও সঞ্চরণশীল। ইহাদের মধ্যে প্রথমদর্শনেই যে প্রণয়লীলা শুরু হইল তাহা বাহ্যতঃ flirtation হইতে অভিন্ন মনে হয়। কিন্তু এই লঘু-তরল ভাবের মধ্যে মাঝে মাঝে গভীরতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রিনির কৃতিত্ব এই যে, সে নিজে ধরা না দিয়া সোমনাথের চির-অনাসক্ত মনকে বাসনার পাশে বাঁধিয়াছিল। অবশেষে একদিন সমান আকস্মিকতার সহিত এই প্রেমের পরি-সমাপ্তি ঘটিল—রিনির পত্র প্রমাণ করিল যে, সে সোমনাথকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রণয়াবেগকে তীব্রতর করিবার উপায়স্বরূপ ব্যবহার করিতেছিল। George-এর বিবাহ প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে রিনির পক্ষে সোমনাথের প্রয়োজনীয়তা ফুরাইল। কিন্তু বিবাহের অল্পদিন পরে ভাগ্যচক্রের আর একটা আকস্মিক আবর্তনে প্রমাণ হইল যে, রিনি প্রতারণা করিতে গিয়া নিজে প্রতারিত হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যাপারটার উপর সোমনাথের মন্তব্য এই যে, ইহা প্রেমের স্বরূপের একটা যথার্থ অভিব্যক্তি। কেন না প্রেমের সমস্ত রহস্যলীলার অভ্যন্তরে একটা প্রকাণ্ড হাস্যকর ফাঁকি লুকান আছে। এই ভিতরকার ফাঁকিটাই অকস্মাৎ সশব্দে বাহির হইয়া পড়িয়া প্রেমের উপহাস্যতা ঘোষণা করে। এই গল্পে রিনির মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তনশীল অস্থির মনোভাবের বড়

সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহাতে সোমনাথের চরিত্র রিনির সহিত তুলনায় একেবারে ম্লান, নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে; তাহার দার্শনিক স্পর্ধা হৃতগৌরব হইয়া একেবারে প্রতিকারহীন অক্ষমতার ধূলিশয্যায় লুটাইয়াছে। সোমনাথের এই লজ্জাকর পরাজয় প্রেমের অগৌরবকে আরও পরিহাসার্হ করিয়াছে।

চতুর্থ গল্পে প্রেমের paradox চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। দাসীর গোপন অন্তঃনিরুদ্ধ প্রেম-কাহিনী, প্রেমিকের সহিত মিলনের জন্য তাহার আজীবন সাধনা আমাদের হৃদয়কে করুণরসে অভিষিক্ত করে, এমন সময় হঠাৎ তাহার পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ ও সেই ডাকবিভাগের সীমাবহির্ভূত প্রদেশ হইতে টেলিফোন-যোগে প্রণয়ীর সহিত ভাববিনিময়-প্রয়াস আমাদের মনের পৃষ্ঠে এমন একটা তীব্র অসংগতিবোধের চাবুক মারে যাহাতে আমাদের পূর্বভাব একেবারে শূন্যে মিলাইয়া যায়। মোট কথা, এই চারিটি গল্পে প্রেমের হাস্যকর অসংগতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে—উন্মাদের অট্টহাস্য, ছদ্মবেশিনী প্রেমিকার হেয় চৌর্যবৃত্তি, অস্থিরমতি প্রণয়িনীর অতর্কিতভাবে নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান, পরলোকবাসিনীর লৌকিক উপায়ে প্রণয়াস্পদের সহিত সম্বন্ধস্থাপন-প্রয়াস—এই সমস্তই প্রেমের আদর্শভাবমূলক আবেশের বিরুদ্ধে হাস্যরসের অভিযান, প্রেমের অমৃতকুণ্ডে বিদ্রূপের অম্লরস-নিক্ষেপ। এই বিরুদ্ধগুণসম্পন্ন দ্রব্যের সংযোগে যে মিশ্র পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা খুব উপাদেয় না হইলেও অভিনবত্বের জন্য উপভোগ্য। তবে এই ব্যঙ্গরস প্রেমের অস্থি-মজ্জার সহিত মিশায় নাই, যখন প্রণয়-রস পাক খাইয়া নিবিড় ও আবেশবিহ্বল হইয়া আসিতেছে, তখন আকস্মিকভাবে ইহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়া বিস্ফোরক দ্রব্যের মত প্রেমের স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করিয়াছে, ইহার নেশাকে উড়াইয়া দিয়াছে।

চৌধুরী মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্যে স্থান ঠিক তাঁহার রচনার উপর নির্ভর করে না—তিনি একজন সেই শ্রেণীর লেখক, যাঁহার প্রভাব লিখিত পুস্তককে অতিক্রম করিয়া ছড়াইয়া পড়ে। paradox-এর খোঁচা দিয়া তিনি আমাদের সহজেই ভাবাবেশপ্রবণ, সংস্কারাচ্ছন্ন, নিদ্রালু মনকে জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন—খাঁটি সত্যানুসন্ধিৎসা অপেক্ষা জড়ভাবের প্রতিষেধক উত্তেজনা-সঞ্চারই তাঁহার আসল উদ্দেশ্য। তিনি আমাদিগকে ভাববিহ্বলতার মোহ হইতে সচেতন করিয়া আমাদের চিন্তাশক্তিকে সক্রিয় আত্মানুশীলনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতবাদের মধ্যে যেটুকু সত্য আছে তাহা তিনি ইচ্ছাপূর্বকই অতিরঞ্জন-বিকৃত করিয়া আমাদের প্রতিবাদস্পৃহাকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন, এবং এই উপায়ে বাদপ্রতিবাদমূলক এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছেন যেখানে আমাদের স্বাধীন বিচার-শক্তি মুক্তবায়ুর ন্যায় অবাধে বিচরণ করিতে পারে। আমাদের ভক্তিরস-মদির ও আনুগত্য-মন্থর মনোরাজ্যে তিনি ফরাসী-দেশসুলভ লঘু-চপল ব্যঙ্গ-প্রিয়তা ও শ্রদ্ধা-বিমুখ, অথচ মার্জিতরুচি শ্লেষাত্মিকা মনোবৃত্তির আমদানি করিয়াছেন। অনেক নব্যতন্ত্রী লেখকের চিন্তাধারা ও রচনাভঙ্গী তাঁহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে এবং তাঁহাকে এক বিশিষ্ট রচনারীতির প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। তিনি তাঁহার নিজ নাম অপেক্ষা সাহিত্যিক ছদ্মনাম বীরবলের দ্বারাই অধিক সুপরিচিত। সাহিত্যে কথ্যভাষার প্রবর্তনে তিনি পথপ্রদর্শক না হইলেও একজন উৎসাহশীল সমর্থক, এবং এই বিষয়ে যে তুমুল বাদানুবাদের উদ্ভব হইয়াছিল সেই তর্কযুদ্ধে তিনি জয়ী হইয়া সাহিত্য-রাজ্যে কথিত ভাষার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রধানতঃ তাঁহারই পক্ষসমর্থনের জন্য আজ

কথিত ভাষা সাহিত্যের দ্বারে কেবল প্রসাদাকাঙ্ক্ষী ভিখারী নহে, পরন্তু সমবল প্রতিদ্বন্দ্বীর ন্যায় সাধুভাষার সিংহাসনের অর্ধেক অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এমন কি রবীন্দ্রনাথও তাঁহার যুক্তি ও দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া নিজের পরবর্তী রচনায় কথিত ভাষার প্রচলন করিয়াছেন। সুতরাং ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর স্থান সেরূপ উচ্চ না হইলেও আমাদের মন্দীভূত চিন্তাধারায় নূতন স্রোতোবেগ-যোজনা ও বুদ্ধিপ্রাধান্যমূলক মনোবৃত্তি-প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব তাঁহার প্রাপ্য। এবিষয়ে বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক Chestertonকে তিনি অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। Chesterton-এর বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় চোখ-ধাঁধানো বুদ্ধির অসি-ক্রীড়া তাঁহার নাই। তাঁহার মননশক্তির গুণাবলীর মধ্যে সুদূর-প্রসারী বিস্তার ও মৌলিক গভীরতার অপেক্ষা ক্রীড়াশীল চাপল্যই অধিকতর লক্ষণীয়। অনেক সময় বক্তব্য বিষয়ে গভীরতার অভাবের জন্য তাঁহার রচনাকে কেবল কথার মারপেঁচ বলিয়া মনে হয়; কখন কখন তাঁহার রচনা-ভঙ্গী বিকৃত মুখভঙ্গীর মতই দেখায়। এই সমস্ত অপকর্ষ সত্ত্বেও সাহিত্যের মজলিসে তাঁহার বিশিষ্ট স্থানকে কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। আপাততঃ তিনি নদীর বালি ভাঙিয়া যে কৃষিক্ষেত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাতে ফসল অপেক্ষা কাঁটারই প্রাধান্য; কিন্তু এই ক্ষেত্র যথেষ্ট উর্বরতা লাভ করিলে ভাবী কাল ইহাতে যে শস্য উৎপাদন করিবে তাহা সাহিত্য-ভাণ্ডারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

(৫)

প্রমথ চৌধুরীর পরে হাস্যরসপ্রধান কথা-সাহিত্যে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরামের স্থান। তাঁহার 'গড্ডালিকা' ও 'কজ্জলী' নামে দুইখানি ব্যঙ্গ-চিত্র-সমষ্টি তাহাদের প্রথম আবির্ভাবের সময় পাঠক ও রসগ্রাহী-সমাজে একটা হুলস্থূলের সৃষ্টি করে। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, বঙ্গ-সাহিত্যে একজন প্রথম শ্রেণীর হাস্যরসিক দেখা দিয়াছেন। ইঁহার হাস্যরসের প্রকৃতিটি যোগেন্দ্রচন্দ্র বা প্রমথ চৌধুরী হইতে ভিন্ন। যোগেন্দ্রচন্দ্র অতিরঞ্জন ও প্রমথ চৌধুরী নানা অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা, হাস্যকর সূক্ষ্মতর্ক ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ আলোচনা ও অতর্কিতভাবে বিপরীত রসের প্রবর্তন ইত্যাদি উপায়ে comedy সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এক নীল-লোহিত পর্যায়ের গল্পগুলি ছাড়া অন্যগুলিতে হাস্যরসের উৎস খুব গভীর নহে। বুদ্ধির কসরতের দ্বারাই হাস্য উদ্রিক্ত হইয়াছে। রাজশেখরবাবুর হাস্য-রসের মধ্যে একটা স্বতঃ-উৎসারিত প্রাচুর্য ও অনাবিল বিশুদ্ধি আছে। তাঁহার রসিকতার প্রবাহ বুদ্ধির বপ্র-ক্রীড়ায় ঘোলাটে হয় নাই, সূর্যকরোজ্জ্বল নির্ঝরের ন্যায় সহজ, সাবলীল নৃত্যভঙ্গে হাসির ঝিকিমিকি ছড়াইতে ছড়াইতে বহিয়া চলিয়াছে। হাস্যরসিকের প্রধান লক্ষণ হাস্যরসপ্রধান মৌলিক পরিকল্পনার উদ্ভাবনী শক্তি। গম্ভীরের জমিতে যাহারা হাসির সূক্ষ্ম পাড় বুনিতে চেষ্টা করেন তাঁহাদের কারুকার্য প্রশংসনীয় হইলেও মৌলিকতার অভাব আছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। রাজশেখরবাবু অপরের পরিকল্পনার উপর সূক্ষ্ম জাল বয়ন করেন নাই। তাঁহার রসিকতা কেবল derivative বা আহরণমূলক নহে; অপরের ভাব-ভঙ্গীর বিকৃতিমূলক অনুকরণের (parody) উপর তাঁহার খ্যাতি নির্ভর করে না। অবশ্য

এই সমস্ত উপাদান তাঁহার মধ্যেও অল্প পরিমাণে আছে, কিন্তু এগুলি তাঁহার সমস্ত রচনায় গৌণ স্থান অধিকার করে।

তাঁহার মৌলিক পরিকল্পনার উদাহরণস্বরূপ 'গড্ডালিকা'য় 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', 'চিকিৎসা-সঙ্কট' ও 'ভুশণ্ডীর মাঠে' ও 'কজ্জলী'তে 'বিরিঞ্চি বাবা' ও 'উলট-পুরাণ'-এর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' ও 'বিরিঞ্চি বাবা' আমাদের ধর্মের নামে জুয়াচুরি-প্রবৃত্তির প্রতি কটাক্ষ-পাত। প্রথমোক্ত গল্পে যৌথকারবার-প্রণালীর অভিনব প্রয়োগ, ধর্মক্ষেত্রে ব্যবসাদারী বুদ্ধির প্রবর্তনের মধ্যে যে তীব্র অসংগতি আছে তাহাই হাস্যরসের উপাদান। আবার এই হাস্যরসেব অবিরল প্রবাহের মধ্যে চরিত্রের পরিকল্পনায় হাসির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘূর্ণীপাক আছে। শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীর উদাস, নিস্পৃহ ধর্মসাধনা, গণ্ডেরীরামের ধর্মতত্ত্বের সূক্ষ্মজ্ঞান, রায় সাহেব তিনকড়ির জমাখরচের হিসাবমূলক ব্যবসায়-বুদ্ধি—এসমস্তই অতি নিপুণ হস্তে, দুই একটি রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত কৃপণ, সন্দিগ্ধমনা রায় সাহেবই বোকা বনিয়াছেন, তাঁহার উপর হাসির পিচকারি নিঃশেষে বর্ষিত হইয়াছে। 'বিরিঞ্চি বাবা'র পরিকল্পনা বিশেষ মৌলিকতার দাবী করিতে পারে না, কেননা ধর্মান্ধতা ও বিচারবিহীন গুরুবাদ আমাদের সনাতন লক্ষণ ও বহুদিন হইতেই ইহা সাহিত্যিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিষয়ীভূত। কিন্তু বিষয় পুরাতন হইলেও বিরিঞ্চি বাবা যে বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তির দাবী করিয়াছেন, তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার যে বিশেষ ক্ষমতার সম্মোহনে অভিভূত হইয়াছেন, তাহার মধ্যে কৌতুককর অভিনবত্ব আছে। কালের আবর্তন তিনি ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন, আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকত্ববাদ তিনি বিজ্ঞান-রাজ্য হইতে সরাইয়া ধনাগমের স্থূল প্রয়োজনে লাগাইতে পারেন—এই বিশ্বাসই ভক্তবর্গের উপর তাঁহার প্রভাবের হেতু। সত্যব্রত, গণেশমামা, গুরুপদবাবুর ভূতপূর্ব মুহুরি তুর্কবংশসম্ভূত ফরিদপুরী মুসলমান বছিরুদ্দি,প্রভৃতি হাসির এই বৃহৎ আবেষ্টনের মধ্যে নিজ নিজ চরিত্রানুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাসির কলধ্বনি তুলিয়াছে। 'চিকিৎসা-সঙ্কট'-এ নন্দদুলালের রোগের উৎপত্তি, চিকিৎসার বিচিত্র প্রণালী ও উপশম—সমস্তই একটি চমৎকার প্রহসন-সৃষ্টির কারণ হইয়াছে। বন্ধুবর্গেব স্নেহাতিশয্যে যে রোগের উদ্ভব,ও তাহাদের মন্ত্রণাবিভেদে যাহার বিস্তৃতি, নিবিড়তর সম্পর্কের অভ্যাগমেই তাহার নিবৃত্তি ও শাস্তি , সান্ধ্য মজলিসটির বিলোপ এই জগতে প্রচলিত অমোঘ ন্যায়নীতির (poetic justice) জয়লাভ। চিকিৎসক-গোষ্ঠীর রোগনির্ণয়-প্রণালী ও ব্যবস্থাপত্র-নির্ধারণে যে সুস্পষ্ট অতিরঞ্জন আছে তাহাতে সত্যের সূক্ষ্মরেখা একেবারে অদৃশ্য হয় নাই , সত্যের শক্ত মেরুদণ্ডই এই অতিরঞ্জন-স্ফীতিকে সম্ভাব্যতার সীমার মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছে।

'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পে ভৌতিক জগতের এমন একটা দিক্ চিত্রিত হইয়াছে, যাহার হাস্যকর অসংগতি আমাদিগের কৌতুকবোধকে প্রবলভাবে উদ্রিক্ত করে। মৃত্যুর পরেও যে সমস্ত প্রবৃত্তি জীবিত ও সক্রিয় থাকে, তাহাদের মধ্যে আড্ডা জমাইবার ও প্রণয়াকর্ষণ অনুভব করিবার প্রবৃত্তিও অন্তর্ভুক্ত। এই সনাতন, অবিনশ্বর প্রবৃত্তিগুলি লৌকিক জীবনেও যেমন, সেইরূপ ভৌতিক জীবনেও নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি করিয়া থাকে—বরং ভৌতিক জীবনে স্বাধীনতা-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জটিলতারও বৃদ্ধি হয়। যেখানে পার্থিব জীবনে এক স্বামী ও এক স্ত্রীর পক্ষে পারিবারিক শান্তিরক্ষা দুরূহ, সে অবস্থায় ভৌতিক জীবনে তিন জন্মের দম্পতির

একত্র সমাবেশ যে একটা অগ্ন্যুৎপাতের মত অবস্থা সৃষ্টি করিবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? আবার ইহার মধ্যে irony বা শ্লেষাত্মক বৈপরীত্যেরও অসদ্ভাব নাই। যে অবাঞ্ছিত সম্পর্ক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করিয়া শেষনিঃশ্বাসের সঙ্গে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছি, মৃত্যুর পর নূতন সংসার পাতিবার সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বজীবনের সেই অভিশাপ যদি পরজীবনেও আমাদের অনুসরণ করে, তবে ব্যাপারটা কি অসম্ভব রকম ঘোরাল হইয়া উঠে না? তার উপর জীবনত্রয়-ব্যাপী পরস্পরবিরোধী স্বত্বাধিকারের মীমাংসা বোধ হয় মানুষের বিচার-শক্তির অতীত। এই দুরূহ, মীমাংসাতীত সমস্যা ভৌতিক জীবনের নিশ্চিন্ত, নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার পক্ষচ্ছেদ, ইহার নির্মেঘ, সূর্যালোকিত দিবসের উপর ছায়াপাত করিয়াছে। এই প্রেত-জীবন মনুষ্য-জীবনেরই প্রতিচ্ছবি—কেবল মনুষ্য-জীবনের মাধ্যাকর্ষণ-প্রভাবমুক্ত। এই প্রেতলোক রোমাঞ্চকর বিভীষিকাবর্জিত, মানুষ-লোকের প্রতিবাসী ও তাহার রঙ্গ-ভঙ্গ ও কৌতুকলীলার সহচর। চিত্রকরের রেখা এখানে লেখনীর সহায়তা করিয়াছে, ও এই প্রেত-রাজ্যের সরল ও কৌতুককর বীভৎসতা এই দ্বিবিধ উপায়ে আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে।

'উলট পুরাণ' গল্পটি পরিকল্পনার মৌলিকতায় উজ্জ্বল—topsy-turvydom বা বর্তমান অবস্থার সম্পূর্ণ বৈপরীত্যমূলক চিত্রের জন্য উপভোগ্য। যদি কোন রাজনৈতিক ভূমিকম্পে ইংরেজ ও ভারতবাসীর আপেক্ষিক অবস্থা আমূল পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলে যে বিসদৃশ ব্যাপারের সংঘটন হইবে এই গল্পটি তাহারই একটা কৌতুককর আভাস। ভারতবাসীর ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ, ইংরেজী আচার-ব্যবহারের অনুকরণ, ইংরেজের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে আন্দোলন, তাহার মনের কান্না ও অভিমানের উচ্ছ্বাস এই সমস্তই ইংরেজে আরোপিত হইয়া এক অভূতপূর্ব comedyর সৃষ্টি করিয়াছে। সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য চিত্র হইয়াছে উড়িয়া পুলিশের দ্বারা ইংরেজ সার্জেন্টের স্থানাধিকার—তাহার অপ্রতিহত ক্ষমতার বিরুদ্ধে উৎপীড়িত ইংরেজ নাগরিকের সক্রন্দন অভিযোগ। এই রসিকতার দো-নলা বন্দুক ইংরেজ ও ভারতবাসী উভয়কেই আঘাত করিয়াছে—কিন্তু এই আঘাতের মধ্যে কোন বিদ্বেষের বিষ-জ্বালা নাই, আছে কৌতুকমণ্ডিত বিদ্রূপ।

অন্যান্য গল্পগুলির মধ্যে হাস্যরস যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও তাহাদের কেন্দ্রস্থ ভাব-ঐক্য খুব সুপরিস্ফুট নহে। 'লম্বকর্ণ' গল্পে মৌলিক ভাব অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সরস বর্ণনাই অধিকতর কৌতুকোদ্দীপক। রায় বাহাদুর বংশলোচনের দাম্পত্য কলহ, তাঁহার পারিষদবর্গের ছোটখাট রেষারেষি, বেলিয়াঘাটা কেরোসিন ব্যাণ্ডের সানুনাসিক শব্দবর্জনমূলক কথোপকথন ও তাহাদের লম্বকর্ণ কর্তৃক সংঘটিত দুরবস্থা, কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টিতে রায় বাহাদুরের প্রাণসংশয় ও লম্বকর্ণের সাহায্যে তাঁহার উদ্ধার-লাভ—এই সমস্তই বিমল হাস্যরসে অভিসিঞ্চিত হইয়াছে। তবে চাটুয্যে মহাশয়ের পাঁঠার ব্যাঘ্রে রূপান্তরিত হওয়ার গল্পটার মধ্যে একটু মাত্রাধিক্য ঘটিয়াছে। ঝড়ের বর্ণনায় ও 'কচি-সংসদ'-এ রেলগাড়ির দ্রুতগতির বর্ণনায় সাধারণতঃ নির্জীব ও মন্থরগতি বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে চমৎকার গতিবেগ সঞ্চার হইয়াছে, ও ইহার মধ্যে বিদ্রূপাত্মক ঈষৎ অতিরঞ্জনের ব্যঞ্জনা-সংযোগ বর্ণনাকে আরও উপভোগ্য করিয়াছে। তবে লম্বকর্ণের ক্ষুদ্র স্কন্ধের উপর গল্পের সমস্ত ভারকেন্দ্র চাপাইয়া দেওয়া ঠিক সামঞ্জস্য-বোধের অনুযায়ী হয় নাই—অবশ্য যদি তাহার তিন অধ্যায় গীতা উদরস্থ করার অদ্ভুত কীর্তি তাহার

নিকাম ভারবহন-ক্ষমতা অভূতপূর্বরূপে বাড়াইয়া না থাকে। 'মহাবিদ্যা' গল্পটিতে মৌলিক ভাবের অস্পষ্টতার জন্য তাহার ব্যাখ্যা ও বিবৃত্তিতে রসিকতা ভাল খোলে নাই—মহাবিদ্যা-লাভের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের আগ্রহ আশানুরূপ বিচিত্র সুরে ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। 'কচি-সংসদ' গল্পে কচি-সংসদের সভ্যদের নামকরণে যে সময়োপযোগী ব্যঙ্গ-শক্তির পরিচয় মিলে, সমস্ত গল্পটির কতকটা খাপছাড়া ভাবে ও শিথিল গঠন-প্রণালীতে তাহার মর্যাদা ঠিক রক্ষিত হয় নাই। কচি-সংসদের সঙ্গে কৃষ্ণের বৈবাহিক আদর্শের কোনও মিল নাই, এবং তাহার কচি-সংসদ ত্যাগ করিয়া হৈহয় সংঘে যোগদান এই অন্তরঙ্গ সম্পর্কের অভাবই সূচিত করে। বিশেষতঃ কৃষ্ণের 'হাইকোর্টশিপে' যে অভিনবত্ব আছে তাহার মধ্যে কষ্ট-কল্পনার আতিশয্য আবিষ্কার করা মোটেই কঠিন নহে। 'দক্ষিণ রায়' গল্পটি, যে সম্ভাব্যতার গণ্ডির মধ্যে আমাদের হাস্যরস তরঙ্গায়িত হয় তাহা অতিক্রম করার জন্য, শীর্ণ ও নির্জীব হইয়া নিষ্ফলতার বালুকারাশির মধ্যে নিজ স্রোতোবেগ হারাইয়া ফেলিয়াছে। 'স্বয়ংবরা' গল্পটি প্রহসনের মাত্রাধিক্যের জন্য সূক্ষ্মরসিকতার মর্যাদা হারাইয়াছে—উদ্ভট খেয়াল বাস্তবতার মাধ্যাকর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া একেবারে নিছক কল্পনারাজ্যে উধাও হইয়াছে। 'জাবালি' গল্পটির রসিকতা derivative, ইহা তপস্বী-জীবনের সাধারণ গতি ও আদর্শের ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা, বর্তমান যুগাদর্শের মানদণ্ডে বিচার করিয়া ইহার মধ্যে হাস্যজনক অসংগতির আবিষ্কার-চেষ্টা। এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন ব্যঙ্গ-প্রয়াস কোন একটি ব্যাপক সমালোচনার ঐক্য-সূত্র-গ্রথিত না হওয়ায় রসিকতার অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে রহিয়া গিয়াছে।

রাজশেখর বাবুর হাস্যরসের প্রধান উপাদান হাস্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভাবন-নৈপুণ্য। verbal wit বা উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক রসিকতার প্রাধান্য তাঁহার রচনায় নাই। তিনি হাস্য-রসিকের দৃষ্টি লইয়া জীবনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ খণ্ডাংশগুলি দেখিয়া তাহাদের মধ্যে হাস্যপ্রবাহ ছুটাইয়াছেন। তিনি জানেন যে, রসিকতার প্রকৃত উৎস শাণিত তীক্ষ্ণাগ্র বাক্য-পরম্পরা-সংযোগে নহে। সংসারের অধিকাংশ ব্যক্তিই unconscious humorist, অজ্ঞাতসারে হাস্যরস সৃষ্টি করে। তাহারা খুব গম্ভীরভাবে, একনিষ্ঠ একাগ্রতার সহিত, নিজ নিজ জীবননীতি ব্যাখ্যা করে, অপরে তাহার মধ্যে উপহাস্যতার সন্ধান পাইয়া তাহাকে হাসির খোরাকে পরিণত করে। রাজশেখরবাবুর পাত্র-পাত্রীরা এইরূপ unconscious humorist—রসিকতা করিবার পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য লইয়া তাহারা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয় নাই। পরিস্থিতির প্রভাবই তাহাদের মধ্যে হাস্যরস নিষ্কাশন করিয়াছে। হাসির বিন্দু যতই স্বচ্ছ হইবে, ততই তাহার মধ্যে চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, জীবন-সমালোচনার বিশেষ ধারা প্রতিফলিত হইবে। নিজ অন্তর্নিহিত প্রবণতা অপেক্ষা বাহ্য প্রতিবেশের প্রভাব প্রবলতর হওয়ার জন্য ইহাদের রসিকতা খুব উচ্চাঙ্গের বা গভীর-রসাত্মক হয় নাই। কিন্তু তথাপি স্বতঃ-উৎসারিত স্বচ্ছতার জন্য এই হাস্যরস বঙ্গসাহিত্যে একটি নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে।

এই সম্পর্কে হাস্যরসসৃষ্টির কার্যে চিত্রের সহায়তার কথাও উল্লেখযোগ্য। এসম্বন্ধে 'গড্ডা-লিকা'র উপর রবীন্দ্রনাথের অভিমত হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধার করিলেই চিত্রকলার সহযোগিতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হইবে। "ইহাতে আরও বিস্ময়ের বিষয় আছে, সে যতীন্দ্রকুমার সেনের চিত্র। লেখনীর সঙ্গে তুলিকার কী চমৎকার জোড় মিলিয়াছে, লেখার ধারা রেখার ধারা সমান

তালে চলে, কেহ কাহারো চেয়ে খাটো নয়। তাই চরিত্রগুলো ভাষায় ও চেহারায়, ভাবে ও ভঙ্গীতে, ডাহিনে ও বামে এমন করিয়া ধরা পড়িয়াছে যে, তাহাদের আর পলাইবার ফাঁক নাই।" দুর্ভাগ্যক্রমে পরবর্তী গ্রন্থ 'কজ্জলী'তে রেখাচিত্রের এই উজ্জ্বল প্রকাশ-ক্ষমতা, ইহার তীক্ষ্ণ ভাব-ব্যঞ্জনাশক্তি অনেকটা ম্লান ও মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। চিত্র-ব্যঞ্জনার এই ম্লানিমা মৌলিক পরিকল্পনার আপেক্ষিক অনুৎকর্ষের সত্য প্রতিচ্ছবি।

(৬)

রূপকথার রাজকন্যার নাকি হাসিতে মাণিক আর কান্নায় মুক্তা ঝরিয়া পডিত। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে ভাবরূপে হাসি ও কান্নার মধ্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য, মূল্যের দিক দিয়া তাহাদের সেরূপ কোন দুস্তর ব্যবধান ছিল না। সেইরূপ আধুনিক জীবনের জটিলতা একদিকে যেমন গভীর নৈরাশ্যবাদ জাগায়, অপবদিকে এই জটিলতার ভাঁজে ভাঁজে যে স্তরবদ্ধ অসংগতি আছে তাহা হাস্যরসের প্রচুর উপাদান যোগায়। সোজা দৃষ্টিতে যাহা মারণাস্ত্র, তির্যক্ কটাক্ষে তাহাই সুড়সুড়ি দেওয়ার যন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। ব্যবহারিক জগতে যে বজ্রগর্ভ নিবিড মেঘ দুঃখের ধারাবর্ষণে উন্মুখ, হাস্যরসিকেব ফুৎকারে তাহাই ফিকে হইয়া রামধনুর বিচিত্র বর্ণাভা প্রকাশ করে। জাল যখন শক্ত ফাঁসে পরিণত হইয়া শ্বাসরোধ ঘটায় তখন তাহা করুণ রসের উৎস—কিন্তু যখন লঘু হস্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া ইহা পাশে আবদ্ধ প্রাণীর মনে একটা লক্ষ্যহীন, অবোধ হাঁকু-পাঁকুর সৃষ্টি করে তখন ইহার প্রচেষ্টার উপহাস্য দিক্‌টাই বড় হইয়া দেখা দেয। সুতবাং আধুনিক জগৎ যেমন আমাদের জীবন-যাত্রাকে দুঃসহ ও দুঃখভার-মন্থর করিয়াছে তেমনি নানা কৌতুককব অসামঞ্জস্যের হেতু হইয়া হাস্যরস-বিলাসের নূতন নূতন বীজ বপন করিযাছে।

আবার আধুনিকতার চেহাবা সকল দেশে সমান নহে। ইহা বাঙ্গালীর ঐতিহ্য ও বিশিষ্ট মনোধর্মের সহিত যুক্ত হইয়া তাহার মনোজগতে যে নাগবদোলার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা অন্য দেশের প্রতিক্রিয়ার সহিত ঠিক মিলিবে না। অন্যান্য মনন-ধর্মী জাতির মধ্যে আধুনিকতা বহু শতাব্দীর সাধনার স্বাভাবিক পবিণতি, পূর্বতন যুগেব অঙ্কুরিত প্রবণতার ক্রমাভিব্যক্তির ফল। আমাদের দেশে ইহা অনেকটা অতর্কিত আগন্তুক, আমাদের সনাতন আদর্শ ও মানস অভ্যাসের মাঝখানে বোমার মত পডিয়া ইহার সহজ সুষমাকে বিধ্বস্ত ও ইহার উপাদান-সমূহকে নানা উদ্ভট সংমিশ্রণে সংযুক্ত করিয়াছে। আমাদের মনঃসংস্থানের যদি এক্সরে করা সম্ভব হইত তাহা হইলে দেখা যাইত যে, উহার মধ্যে প্রাচীনতম সংস্কার, অন্ধতম বিশ্বাস, মধ্যযুগসুলভ গুরুবাদ, অসম্ভবের প্রতি ঝোঁক প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সহিত নিতান্ত এলোমেলো ভাবে সংসক্ত হইয়া আছে। আমরা একই সময়ে বহুযুগে বাস করিয়া থাকি—বিভিন্ন কালের মিশ্রবাতাসে নিঃশ্বাস গ্রহণ করি। পুবাণোক্ত বামনদেবের ন্যায় স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতলের ত্রিলোকে একই সঙ্গে পদবিন্যাস করি। আমাদের অস্থি-মজ্জায় বহুপুরুষব্যাপী পিতামহদের যে লিপিসংঘ অদৃশ্য কালিতে লেখা আছে, তাহা কোন অতর্কিত প্রেরণায় একই সঙ্গে উজ্জ্বল হইয়া উঠে ও দৃষ্টিবিভ্রম জন্মায়। একটি বোতাম টিপিবামাত্রই আমরা বর্তমান যান্ত্রিক যুগ হইতে একেবারে ব্যাস-বাল্মীকির যুগে কালান্তরিত হই। আমাদের আধুনিক

উপকরণে সজ্জিত ড্রইংরুমে হঠাৎ শুভ্রশ্মশ্রু বীণাহস্ত নারদ ঋষির আবির্ভাব হয়। ভৃগু-সংহিতার নির্দেশ মানিয়া আমরা বৈজ্ঞানিক বীক্ষণাগারে গবেষণা আরম্ভ করি। এগুলিকে উদ্ভট খেয়াল বা লেখকের কল্পনার অবাধ ভ্রমণরূপে অভিহিত করা যায়। কিন্তু ইহাদের পিছনে আমাদের নিগূঢ় ইচ্ছার সমর্থন আছে। আমাদের অন্তরে এই বায়ুভ্রমণের প্রবণতা আছে বলিয়াই লেখক এত সহজেই আমাদের এই ধূম্রলোকে লইয়া যান। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের গভীরতা আমাদের শিথিল হইয়াছে সত্য, কিন্তু বর্ষাশেষে লঘু মেঘ-খণ্ডের ন্যায় অলৌকিকত্বের বিচ্ছিন্ন বাষ্পরাশি আমাদের মনোলোকে বিচরণ করে, এবং বাস্তববোধের সূর্যালোককে ঝাপ্‌সা করিয়া কর্মজগতের মধ্যে স্বপ্নজড়িমার আবরণ টানে। কাজেই আমাদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি, মোহমুক্ত প্রগতিশীলতা অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় একটু অদ্ভুত রকমের বিশৃঙ্খলার প্রবর্তন করিয়াছে—তীক্ষ্ণাগ্র বর্শাফলকে খোঁচা খাইয়া আমাদের অন্তরের প্রাচীন সংস্কারের ভূতের দল পুলিশী বেটনের কাছে আন্দোলনকারী জনতার মত চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়িয়া আরও চীৎকার ও গণ্ডগোল বাধাইয়া দেয়।

এই আধুনিকতার রসপুষ্ট নবযৌবন-প্রাপ্ত হাস্যরসের স্রষ্টা ও ইহার বিজয়-অভিযানের ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু। গড্ডালিকা (১৩৩২), কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন (১৩৫০), গল্প-কল্প (১৩৫৭) ও ধুস্তুরী মায়া (১৩৫৯)—এই গল্প-সংগ্রহ-গ্রন্থাবলী যে উদ্ভট কল্পনা ও অনাবিল হাস্যরসের অফুরন্ত নির্ঝর প্রবাহিত করিয়াছে বাঙ্গালী পাঠক তাহাতে অবগাহন করিয়া তাহার নানা-সমস্যা-বিড়ম্বিত জীবনে চিত্তবিনোদনের একটা আশাতীত উপায় লাভ করিয়াছে। এই গল্পগুলি পড়িয়া লেখকের অসামান্য উদ্ভাবনশক্তি, কল্পনা-প্রাচুর্যের অজস্রতা ও বিসদৃশের সমাবেশ-কৌশলে হাস্যরস-সৃষ্টির সাবলীল নিপুণতা আমাদিগকে বিস্ময়ে অবাক করিয়া তোলে। আমাদের এই প্রথাবদ্ধ, নিয়মশাসিত, অভাব-দৈন্য-পিষ্ট জীবনে যে এত সুপ্রচুর হাস্যরসের উপাদান সঞ্চিত আছে ইহা লেখক আমাদিগকে দেখাইয়া না দিলে আমরা কোনদিনই অনুভব করিতে পারিতাম না। পৌরাণিক সাহিত্য ও প্রাচীন যুগের জীবনযাত্রার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁহার অসঙ্গতি-বোধকে অসামান্যরূপ তীক্ষ্ণ করিয়াছে ও পরিহাস-রসিকতার অনেক নূতন উৎসমুখের সন্ধান দিয়াছে। অবশ্য কোন কোন গল্পে খেয়ালী কল্পনার নিরঙ্কুশ আতিশয্য মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে, লেখক আমাদিগকে নিছক মৃত্তিকাসম্পর্কহীন ধূম্রলোকের অলিতে-গলিতে, রূপকথার আধুনিক-সংস্করণ-জাতীয় ভূসংস্থানে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছেন; বাস্তবজীবনের রন্ধ্র-পথে অলৌকিক জগতের হিমেল বাতাস হঠাৎ আসিয়া পরিচিত দৃশ্যপটকে ঝাপ্‌সা করিয়া দিয়াছে। আমরা যেন আবার নূতন করিয়া শৈশব-কল্পনার স্বপ্ন-বাস্তব-মেশানো, অথচ মাধ্যাকর্ষণের পিছন-টানে নিয়ন্ত্রিত, এক মায়া-জগতের অবাধ স্বাধীনতা উপভোগ করিয়াছি। তথাপি এই উদ্দাম কল্পনা-বিলাসের কেন্দ্রস্থলে মানব-প্রকৃতির চিরন্তন সত্য স্থিরভাবে বিরাজমান,—খেয়ালের ঘুড়ি নানা বিচিত্র প্যাঁচ কসিয়া আকাশে উড়িতেছে, কিন্তু লাটাইটি মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের দৃঢ় মুষ্টিতে বিধৃত।

(৭)

পৌরাণিক গল্পগুলিতে সাধারণত দুইটি রীতি অনুসৃত হইয়াছে। প্রথমত, ঋষি বা দেব-সমাজে আধুনিক সমস্যা প্রবর্তিত হইয়াছে বা বর্তমানের দৃঢ় নিয়মবদ্ধতার উপর পৌরাণিক অতীতের অলৌকিক শক্তি ক্ষণস্থায়ী অধিকার বিস্তার করিয়াছে। মোটের উপর একজাতীয় খোসার মধ্যে অপর জাতীয় শাঁস ঢোকানোর ফলে, আধার ও আধেয়ের মধ্যে উৎকট অসামঞ্জস্যের জন্য, এক কৌতুকজনক অসঙ্গতিপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি স্বর্গের পারিজাতকে মর্ত্যজীবনের কটু তৈলে ভাজিয়া ও মরজীবনের বাসি ভাতে অমরলোকের যজ্ঞ-হবি মাখিয়া যে নূতন ধরণের খাদ্য তৈয়ারি করিয়াছেন তাহাতে আমাদের রসনা নূতন আস্বাদের পরিতৃপ্তি পায়। কোথাও তিনি স্বর্গীয় ব্যাপারকে মানবিক মানদণ্ডে, কোথাও বা মানবিক ঘটনাকে স্বর্গীয় মানদণ্ডে মাপিয়া উভয়ত্রই অসঙ্গতির হাস্যকর আবিষ্কার করিয়াছেন। 'ভুশণ্ডীর মাঠ'-এ হিন্দুধর্মের জন্মান্তরবাদ ও পাতিব্রত্যের আদর্শ প্রেতলোকে এক তুমুল বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছে, ভৌতিক জগতে মানবের অধিকারতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা এক বীভৎস পরিণতি ঘটাইয়া চিরন্তন আদর্শেরই ফাঁকিটা ধরাইয়া দিয়াছে। 'হনুমানের স্বপ্ন' ও 'ভরতের ঝুমঝুমি'তে পুরাণ-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা আধুনিক সমস্যার জালে জড়াইয়া একেবারে নাস্তানাবুদ হইয়াছেন। হনুমানের বীরত্ব তাহাকে বিবাহ-বিভ্রাট হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই, ও দুর্বাসার অগ্নিভাস্বর ব্রহ্মতেজ আধুনিক অর্বাচীনতার কাছে নিতান্ত খেলো প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতিমানবকে বামনের চক্ষে দেখিলে যাহা হয় এখানে তাহাই ঘটিয়াছে। 'প্রেমচক্র'-এ ঋষিকুমারেরা মানব-প্রেমের কুখ্যাত ত্রিভুজে আবদ্ধ হইয়া যে চড়কিনাচ নাচিয়াছিল তাহা তাঁহাদের সত্ত্বগুণ-প্রধান আর্য প্রকৃতির সহিত বেমানান বলিয়া আরও উপভোগ্য হইয়াছে। রেবতী ও বলদেবের মিলনে সত্য ও দ্বাপরের মাপকাঠির বৈষম্য যে কৌতুকাবহ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল, বলদেবের হলাকর্ষণের ফলে তাহার সমাধান হইয়া বর-কন্যার মধ্যে উচ্চতা-সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইল। 'দশকরণের বানপ্রস্থ'-এ দেবতার বরে মানুষের অতিরিক্ত শক্তিলাভ কেমন করিয়া তাহার সুখের পরিবর্তে অস্বস্তির কারণ হয় তাহার কৌতুকাবহ উদাহরণ।

'তৃতীয় দ্যূত-সভা' ও 'ভীমগীতা' মহাভারতের আখ্যান ও ভাষার ব্যঙ্গানুকৃতি (parody)। এইগুলিতে ভাষার ছদ্ম-গাম্ভীর্যের সহিত ভাবের লঘুতার অসঙ্গতি হাস্যরসের উপভোগ্যতা ও সাহিত্যমূল্য আরও বাড়াইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দ্যূত-ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে ও শকুনির শাঠ্যের বিরুদ্ধে চতুরতর ও উন্নততর শাঠ্যের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। সমস্ত প্রবন্ধটির পরিকল্পনা, পরিচালনা, সুষ্ঠু ভাবে চরিত্র-বিকাশের আয়োজন, ক্ষুদ্র-নাটকীয় ইঙ্গিত-প্রয়োগ ও পরিসমাপ্তি একটি সর্বাঙ্গসুন্দর কলারচনায় সুষমামণ্ডিত হইয়াছে। 'ভীমগীতা'য় ভগবদ্গীতার আদর্শ ভীমের বাস্তব বুদ্ধির দ্বারা পরিমার্জিত হইয়া যুগোপযোগী হইয়াছে।

মাঝে মধ্যে অমরবৃন্দ আধুনিক জগতের অসহনীয় ক্লেশ নিবারণের জন্য মর্ত্য-ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া সমাধানের উপায় চিন্তা করিতে মিলিত হইয়াছেন। 'রামরাজ্য', 'তিনবিধাতা' ও 'গন্ধমাদন-বৈঠক' এ বিষয়েরই আলোচনা। এগুলির মধ্যে হাস্যরস খুব

সার্থকভাবে বিকশিত হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ যে রসিকতার ক্ষীণ প্রলেপের নীচে গম্ভীর মননশীলতাই ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। সমস্যা এত উষ্ণ ও মর্মভেদী যে ইহা এখনও হাস্যরসিকের এলাকায় পৌছিবার মত ভাবমুক্তি ও সুখস্পর্শতা লাভ করে নাই। কাঁটা গলা হইতে বাহির না হইলে তাহাকে ক্রীড়াচ্ছলে উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া দেখা যায় না। রসিকতা কাল-ও-ভাব-গত ব্যবধানের অপেক্ষা রাখে। ব্যাস, বাল্মীকি, নারদ আমাদের বর্তমান জীবন হইতে বহুদূরে সরিয়া না গেলে তাহাদিগকে লইয়া মস্করা করা চলিত না। সুতরাং হাস্যরসিকের নিরপেক্ষ বুদ্ধি এইরূপ অতি-আধুনিক জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা হইতে প্রতিহত হইয়া যুক্তিপ্রধান আলোচনার মত ভোঁতা হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব দর্শনে যাহাকে তপ্ত-ইক্ষু-চর্বণের সহিত উপমিত করা হয়, এখানে আমরা লেখকের সেই জাতীয় মনোভাবেরই পরিচয় পাই—রসিকতা-মাধুর্য বিষয়ের দাহ-জ্বালার সহিত মিশিয়া একরকম অস্বস্তিই জন্মায়। আর বিশেষত দেববুদ্ধি এখানে মানববুদ্ধি অপেক্ষা স্বচ্ছতর বা অধিকতর রহস্যভেদী বলিয়া মনে হয় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আল্লা, সেণ্ট নিজেদের সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তা সম্বন্ধে যতই সচেতন থাকুন না কেন, কার্যক্ষেত্রে মানব যুক্তিরই পুনরাবৃত্তি করেন ও মানব-বুদ্ধির অসহায়তাই তাঁহাদের আলোচনায় প্রতিবিম্বিত হয়। এই জীবন-মরণ সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আপাতত দেবতা ও হাস্যরসিক উভয়েরই অধিকার মুলতুবি রাখিলে রসের বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না; উভয়কেই আপাতত সরিয়া দাঁড়াইবার জন্য অনুরোধ জানান যাইতে পারে। 'গামানুষ জাতির কথা'য় পুরাতন পৃথিবীর ধ্বংসের পর উদ্ভূত যে নূতন মানবজাতির কথা বলা হইয়াছে তাহাদের সহিত বর্তমান মানুষের কালের দিক্‌ দিয়া যতই ব্যবধান থাক, বুদ্ধির দিক দিয়া খুব যে পর্যায়ের পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কেন না গামানুষের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিগণ যাহা বলিয়াছে তাহা রোজই আমরা সংবাদপত্রে পাঠ করি। আমরা যাহাকে ভণ্ডামি বলিয়া জানি, গামানুষেরা সেই ভণ্ডামির মুখোস খুলিয়া দেখাইবার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে মাত্র।

আবার মানব যেখানে দেবতার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছে বা পারলৌকিক রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছে সেখানেও সে হাসির লহর ছুটাইয়াছে। বিরিঞ্চিবাবা আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা-বাদের আধ্যাত্মিক প্রয়োগ করিয়া শেয়ারের দর তাজা রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দৈবশক্তি প্রাকৃতিক নিয়মের নিকট হার মানিয়াছে। 'ধুস্তুরী মায়া' বৃদ্ধকে যুবাতে পরিণত করা রূপ নানা ভেল্‌কি খেলা সত্ত্বেও শেষে নিছক hallucination বা মতিভ্রম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। 'বদন চৌধুরীর শোকসভায়' অপদেবতার আবির্ভাব বক্তাদের রসনায় দুষ্ট সরস্বতীর ভর করাইয়া শোকসভার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়াছে, বক্তাদের মিথ্যা অভিনয়ের ভিতরকার সত্যটি নগ্নভাবে উদ্‌ঘাটন করিয়াছে। 'যদু ডাক্তারের পেসেণ্ট' ডাক্তারী বিদ্যাকে যোগবলের সহিত সহযোগিতার বন্ধনে বাঁধিয়া আমাদের কল্পনাকে খুব প্রবলভাবে নাড়া দিয়াছে—দৈবশক্তিতে যদি মস্তকচ্যুত ধরে প্রাণ রাখা সম্ভব হইল, তখন আর শুধু সেলাইএর জন্য ডাক্তারের সাহায্য লওয়ার প্রয়োজন কি? যোগবল কি সমুদ্র পার হইয়া শেষে গোষ্পদে গিয়া ঠেকিল? 'ষষ্ঠীর কৃপায়' ষষ্ঠীর বেড়ালের মাতৃমূর্তি গ্রহণ ঠিক আমাদের ঔচিত্যবোধকে তৃপ্তি দিতে পারিল না—কল্পনা যতই আজগুবি হউক তাহার

একটা অন্তঃসঙ্গতি ও পরিণতির স্বাভাবিকতা প্রয়োজন। যাহা হউক এই দেবলোক ও মর্ত্যলোকের সংমিশ্রণ যে রাজশেখর বাবুর হাতে নানা বিচিত্র রসসৃষ্টির হেতু হইয়াছে ও আমাদের কল্পনার পরিধিকে নানাদিকে প্রসারিত করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(৮)

অবশ্য লেখক সর্বদা কল্পনার উদ্ভট ধূম্রলোকে বিচরণ করিয়াছেন তাহা নহে—বহু স্থলে তিনি অতিপ্রাকৃত-স্পর্শহীন বস্তুর জীবনে অবতরণ করিয়া উহার অন্তর্নিহিত উপহাস্য অসঙ্গতিগুলি আবিষ্কার ও উপভোগ করিয়াছেন। এই আবিষ্কারের মধ্যে এমন একটা চমকপ্রদ মৌলিকতা আছে ও প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যে এমন একটি সরস কৌতুকাবহ ভঙ্গী আছে যে, ইহাদের ফলে পাঠকের মনে একটা স্বতঃস্ফূর্ত হাসির রসধারা প্রবাহিত হয়। সমাজ বা ব্যক্তিমানসের বাস্তব-প্রবণতা ব্যঙ্গমধুর অতিরঞ্জন ও সমাবেশ-কৌশলের মাধ্যমে হাসির উপাদানে রূপান্তরিত হয়—চেনা জিনিস আমাদের সম্মুখে এক অপরিচিতপ্রায়, অভিনব মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া পরিচিতের প্রতি উপেক্ষাকে নূতনের প্রতি বিস্মিত কৌতূহলে পরিণত করে। শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড আমাদের অতি বাস্তব ব্যবসায়-পরিচালনা-প্রথারই একটা নিখুঁত চিত্র। কিন্তু আধুনিক ব্যবসায়-ফন্দীর সঙ্গে প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের সংমিশ্রণ ইহাকে অভিনব রসরূপ দিয়াছে। শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীর গেরুয়া-কাপড়-পরা জুয়াচুরি, গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়ার দালালীর কমিশনের হিসাবে পুণ্যের পরিমাণ-নির্দেশ, রায়সাহেব তিনকড়ির বজ্র আঁটন-ফস্কা গেরো-নীতির ফলে ভরাডুবি—এ সমস্তই এই হাস্যসমুদ্রের উচ্ছল তরঙ্গরূপে আমাদিগকে নাকানি-চোবানি খাওয়ায়। সর্বোপরি পরিকল্পনার উদ্ভট মৌলিকতা, আমাদের পুণ্যলোভাতুরতার সুযোগ লইয়া তীর্থক্ষেত্রে যে ছোটখাট জুয়াচুরি চলিয়া থাকে তাহার মধ্যে এক বিরাট যৌথকারবারের অতিকায়ত্ব আরোপের উদ্ভাবনীশক্তি আমাদের হাস্য-প্রবণতার শীর্ণধারার মধ্যে এক প্রচণ্ড জলপ্রপাতের অসংবরণীয় বেগ সঞ্চার করে—আমরা বাস্তব জগতে থাকিয়াও যেন স্রোতোবেগে এক নূতন রাজ্যে ভাসিয়া যাই।

'চিকিৎসা-সঙ্কট'এও চিকিৎসাক্ষেত্রের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা লেখকের হাস্যরসসৃষ্টির কৌশলে, একটু অতিরঞ্জনের দ্বারা স্ফীত-কলেবর হইয়া, মেদস্ফীতা, বিজয়গর্বে স্মিতাননা মিসেস বিপুলামিত্রের ব্যঙ্গচিত্রের মতই আমাদিগকে হাস্যোচ্ছ্বাসে বেসামাল করিয়া ফেলে। বাস্তব জগতের দুর্ভোগ হাস্যরসিকের হাতে বিশুদ্ধ আনন্দরসের উপাদানে পরিণত হইয়াছে। কবিরাজ মহাশয়ের খুলনা অঞ্চলের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বাংলা বর্ণমালার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া রসনার উৎকট-অনুশীলন-জাত ইংরাজী শব্দধ্বনির ফোঁস-ফোঁসানির মধ্যে স্থিতিলাভ করিয়াছে; ইংরাজী ব্যঞ্জন ও বাংলা স্বরধ্বনির মধ্যে যেন একটা হরগৌরী-মিলন ঘটাইয়াছে। 'গড্ডালিকার' লম্বকর্ণ 'হনুমানের স্বপ্ন'-এ গুরু-বিদায়ের হেতু হইয়া তাহার প্রতিপালকের আশ্রিত-বাৎসল্যের ঋণ শোধ করিয়াছে—খল্বিদং স্বামীর সাত্ত্বিক আহার-পুষ্ট উদরে রাজসিক শক্তির বাহন শৃঙ্গ প্রয়োগ করিয়া উদর-নিরুদ্ধ তমোগুণকে মুক্তি দিয়াছে ও পশু হইয়াও সহজ সংস্কার বলে একটা ঘনায়মান দাম্পত্য সমস্যার সুমীমাংসা করিয়াছে। সে দধীচির মত তাহার নশ্বর-কান্তি দেহ বিসর্জন দেয় নাই; কিন্তু

দধীচির মতই তাহার শুষ্কাস্থি হইতে বজ্র নির্মাণ করিয়া প্রভুর দাম্পত্য প্রেমের স্বর্গরাজ্যকে অসুরের অভিভব হইতে উদ্ধার করিয়াছে। মানবিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হইয়াই তাহার পশু-জীবন সার্থক হইয়াছে। 'কজ্জলী'র 'কচি-সংসদ' আমাদের তারুণ্যের তুরীয় ভাব-বিহ্বলতা-প্রাপ্তির জন্য উৎকটসাধনারত যুব-সমাজের উজ্জ্বল চিত্র—সর্বসাধারণের মনে ইহাদের প্রতি যে একটা স্নিগ্ধ কৌতুক-প্রবণতার অর্ধস্পষ্ট রেশ আছে লেখক তাহাকে স্মরণীয় হাস্যোজ্জ্বল সুস্পষ্টতায় ফুটাইয়াছেন। 'হনুমানের স্বপ্ন'-এর 'রাতারাতি'তে রসরচনার নিবিড়তা কাহিনীর দৈর্ঘ্য ও অস্থির বাষ্পোচ্ছ্বাসের জন্য অনেকটা ফিকে হইয়াছে—এখানেও যুব-সমাজের আর একটা নূতন দিকের পরিচয় পাই। 'কচি-সংসদ'-এ যাহা বিশুদ্ধ ভাব-প্রবণতা ছিল এখানে তাহা যুগধর্মে উদ্ধত যুযুৎসায় পরিণত হইয়াছে—লম্বকর্ণের কচি মাথায় গুঁতাইবার শিং গজাইয়াছে। যে তারুণ্যরসসিক্ত বৃদ্ধ এই তরুণসংঘের অভিযানের সহযাত্রী হইয়াছেন তাঁহার দশা অনেকটা শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মত—তাঁহার নেতৃত্ব তীক্ষ্ণ-শরকণ্টকিত। শেষে তারুণ্যের এই তপ্ত কটাহ প্রেমের কূপে নিমজ্জনের ফলে শীতল হইয়াছে। কিন্তু এই কূপ পর্যন্ত পৌঁছাইতে তাহাকে গলদেশে রজ্জুবন্ধন স্বীকার করিতে হইয়াছে। 'রাজভোগ'-এ একদিকে অজীর্ণরোগগ্রস্ত রাজাবাহাদুরের ভোজ্য সম্বন্ধে উদগ্র কৌতূহল ও শেষ পর্যন্ত একবাটি বার্লি-পানে তাহার বাস্তব নিবৃত্তি, অপর দিকে হোটেল-কর্তার সরল, উচ্ছ্বসিত বর্ণনাও অতিমাত্রায় উত্তেজিত প্রত্যাশার হঠাৎ ভূমিসাৎ হওয়া একটি চমৎকার বৈপরীত্যরসের মাধ্যমে হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছে। মধ্যযুগে চরিতকারেরা ভোজ্যরসের মধ্য দিয়া ভক্তিরসকে ঘনীভূত করিতেন, পরশুরাম ইহার মধ্যে হাস্যরসের-উৎসের সন্ধান পাইয়াছেন। রাজাবাহাদুরের সঙ্গিনীটির নীরব ও নির্বিকার ঔদাসীন্যের মধ্যে যে একটি অবজ্ঞার তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎচমক মুহূর্তের জন্য ঝলক দিয়া গিয়াছে তাহা তাহার চরিত্রকে নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছে।

'লক্ষ্মীর বাহন' গল্পে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড-এর মত ধর্ম ও ব্যবসায়-বুদ্ধির সংমিশ্রণে এক অপূর্ব রসকল্পনা উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু এখানে সাধারণ পরিকল্পনা অপেক্ষা মুচুকুন্দের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। মুচুকুন্দের অতি-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রবদ্ধ জীবনযাত্রার চিত্রটি ও ইহার মধ্যে সাংসারিক ও পারমার্থিক এই উভয় দিকের দাবীর যে সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যবিধান হইয়াছে তাহার মৌলিকতা খুবই উপভোগ্য। লক্ষ্মীর বাহনের আকস্মিক আবির্ভাব ও তাহাকে লইয়া ব্যবসায়ী-মহলে হুড়াহুড়ি কাড়াকাড়ি হাঙ্গামা, আফিং খাওয়াইয়া তাহাকে বশ করিবার অদ্ভুত ফন্দি ও শেষ পর্যন্ত তাহার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই মুচুকুন্দের ভাগ্য-বিপর্যয়—এই সমস্ত ঘটনাবলী অনাবিল কৌতুকরসে অভিষিক্ত। এই হাসি কোথাও উতরোল বা অত্যুচ্চ নয়, লেখকের বর্ণনার ছদ্মগাম্ভীর্য ও মন্তব্যের বঙ্কিম কটাক্ষের ভিতর দিয়া ইহা চূর্ণরশ্মির মত ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে। মুচুকুন্দের স্ত্রী মাতঙ্গী উপযুক্ত সহধর্মিণী—তিনি বৈষয়িক স্বামীর পরিপূরকরূপে অধ্যাত্মশৃঙ্খলে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকে চিরতরে বন্দিনী করিবার মতলব আঁটেন, শেষ পর্যন্ত পেঁচা ফাঁকি দিলে স্বামীর হাত ধরিয়া কাশী যাত্রা করিয়া স্বর্গ-মর্ত্যের ভারসাম্য বজায় রাখেন।

'সিদ্ধিনাথের প্রলাপ' ও 'অক্রূর সংবাদ'-গল্পের সূক্ষ্ম তারে ঝোলানো মূলত মননধর্মী আলোচনা। এই দুইটি গল্পে দাম্পত্য-সম্পর্ক সম্বন্ধে চমকপ্রদ মৌলিকতত্ত্ব আলোচিত

হইয়াছে। অবশ্য বক্তার চরিত্রের সঙ্গে বক্তব্য বিষয়ের সংগতি-বিধানের দ্বারা গল্প-সাহিত্যের রীতি ও মর্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের প্রধান আকর্ষণ, মন্তব্য-আলোচনার তীক্ষ্ণ উপভোগ্য মৌলিকতা। সিদ্ধিনাথ রমণীর প্রসাধনকলার আদিম স্তরের উদ্ভব-কাহিনীকে চমৎকারভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। আজ যাহা আদর-সোহাগের নিদর্শন এককালে তাহাই বন্ধন-নির্যাতনের স্মৃতিচিহ্নরূপে দেহলগ্ন ছিল। তখন স্বামীর পশুবলের স্বর্ণকার-বিপণীতে এই সমস্ত আভরণরাশির প্রথম সূচনা নির্মিত হইত। এমন কি যে অলক্তক সিন্দুররাগ আজ সধবা-সৌভাগ্যের জলজ্বলে প্রমাণরূপে অভিনন্দিত হয় তাহা নারীদেহে বর্বর পুরুষের অস্ত্রাঘাত জনিত রক্তপাতের পরিণত সংস্করণ মাত্র। সিদ্ধিনাথ তাঁহার এই অসাধারণ মৌলিক গবেষণার দ্বারা পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেও তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে কিন্তু নারীর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন—যুক্তিবলে যাহাকে তিনি নশ্যাৎ করেন, সংস্কারবশে তাহারই নিকট ধূলিসাৎ হইতে তাঁহার বাধে না। এই বৈপরীত্য-সমাবেশই জীবন-জটিলতার বন্ধন-গ্রন্থি। 'অক্রূর সংবাদ'-এও দাম্পত্য নীতির অভিনব বিশ্লেষণ আমাদিগকে চমৎকৃত করে। দাম্পত্য-সম্পর্কের তিনটি প্রকারভেদ—স্বামী-প্রধান, স্ত্রী-প্রধান ও স্ব-স্ব-প্রধান—এই গল্পে খুব সরস ও চিত্তাকর্ষকভাবে আলোচিত হইয়াছে। অক্রূরবাবু এই তিন রকম সম্বন্ধই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু কোনটাই শেষ পর্যন্ত টেঁকে নাই। মোট কথা, তাঁহার খেয়ালী মনে আত্মপ্রাধান্য ভাবটি এতই প্রবল ও বদ্ধমূল যে প্রথমোক্ত সম্পর্ক-স্থাপন-প্রয়াসে অতিরিক্ত টানাটানিতে বন্ধনরজ্জু ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় প্রকরণ তাঁহার মেজাজ কোন দিনই বরদাস্ত করিতে পারে নাই ও তৃতীয় পন্থায় স্বামী-স্ত্রীর অন্যান্য-নিরপেক্ষতার কবি-নির্দিষ্ট আদর্শ স্ত্রীর স্থূল ও বাস্তব অধিকারবোধের কাছে কৌতুককর ভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে। আমরা যখন কলেজের ছাত্র তখন আমাদের সংস্কৃত পণ্ডিত মহাশয় প্রশ্নপত্রে 'একাকী হয়মারূহ্য জগাম গহনং বনং'—এই বাক্যটি সংশোধন করিতে দিয়াছিলেন। আমাদের সামান্য সংস্কৃতজ্ঞানে ইহার মধ্যে কোন ভুল ধরিতে না পারিয়া প্রশ্নটির উত্তরের চেষ্টাই করি নাই। পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, মূর্খ, বুঝিতে পারিতেছ না যে ঘোড়ায় চাপিলে আর একাকী হইল কি করিয়া? এই বেদান্ততত্ত্বগহন ব্যাকরণরহস্য ঠিক এখনও বুঝিতে পারি নাই, তখন যে বুঝি নাই তাহা বলা বাহুল্য। অনুরূপ যুক্তির প্রতিধ্বনি বাগেশ্রী দত্তের মুখে শুনিতে পাই। সে পৃথক গৃহে বাস, আলোকের বর্ণসঙ্কেতে পূর্ণিমা-তিথিতে আমন্ত্রণ, আবশ্যিক বিচ্ছেদের সাহায্যে প্রেমের নবীন-আকর্ষণ-রক্ষা প্রভৃতি সমস্ত সর্তই মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু উহাদের ব্যাখ্যার সময় একটু মানস ফাঁকি রাখিয়াছে। যে ঘরখানি তাহার জন্য নির্দিষ্ট হইবে তাহাতে সে তাহার বাপের বাড়ীর আত্মীয়-স্বজন—অর্থাৎ তাহার স্থূল সম্প্রসারিত সত্তাকে আশ্রয় দিবে। আর তাহার স্বামীর মহলে সে নিজে বাস করিবে, তাহার সূক্ষ্ম, আধ্যাত্মিক সত্তাকে সেখানে রাখিবে। এই চমৎকার সুবিধাজনক ব্যবস্থাতেও তাহাদের কাহারও একাকিত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে না। 'অক্রূর-সংবাদ'-এ কৌতুক-রস এই ন্যায়ের ফাঁকিটুকুকে আশ্রয় করিয়া স্ফুরিত হইয়াছে। আর প্রবন্ধের নামের পৌরাণিক ব্যঞ্জনাটিও সার্থক হইয়াছে—ভাগবত-বর্ণিত অক্রূরের আগমন ব্রজধামে বিরহ ঘোষণা করিয়াছিল। আধুনিক অক্রূরও নানারূপ

কূট-বিধি-নিষেধের বেড়াজালে জড়াইয়া নিজের মিলন-প্রয়াসী আত্মার জন্য চির-বিরহের ব্যবস্থা করিয়াছে। 'রটন্তীকুমার' গল্পটি সম্পূর্ণ বাস্তব ও প্রাত্যহিক ঘটনার সরল বিবৃতি, এবং ইহার হাস্যরস অতিরঞ্জন-উৎসারিত না হইয়া আমাদের সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা ও কন্যাদায়-উদ্ধারের সুপ্রচলিত কলা-কৌশল হইতেই উদ্ভূত।

(৯)

দীর্ঘকালের রক্ষণশীল সমাজ যখন ভাঙে তখন তাহার চেহারা অনেকটা নদীর বহু শাখায়-প্রশাখায় অনুপ্রবিষ্ট স্রোতোধারার দ্বারা বিধ্বস্ত ও বহুধা-বিদীর্ণ তটভূমির মত দেখায়। নদী-জলপ্রবাহের দ্বারা ইহার চৌকোস সুষমা নানারূপে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, শক্ত-মাটি-জলাভূমিতে মিশিয়া উঁচু-নীচু, আব্ড়া-খাব্ড়ার যদৃচ্ছ সম্মিলনে, মূলধারা সরিয়া গেলে শীর্ণাবশেষ বিচ্ছিন্ন পল্লবসমূহের ইতস্তত বিক্ষেপে,—সমস্ত ভূসংস্থিতির একটা বিকৃত, কিম্ভূত-কিমাকার রূপ চোখে পড়ে। এই বহুধা-বিকীর্ণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তির্যক রেখার বলিজালে সমাবৃত সামগ্রিক আকৃতিটি হয়ত অনেকের চোখে পড়ে না। অধিকাংশ ব্যক্তিই ইহার বিষাদ-উদ্দীপক দিকটাই লক্ষ্য করে। কবি অতীতের নষ্ট সুষমার জন্য শোক করেন; সমাজ-তাত্ত্বিক লাভ-লোকসানের হিসাব খতাইয়া, ধুলা-বালি সরাইয়া, কাদা ঘাঁটিয়া এক নূতন সমাজের ভিত্তি স্থাপনের আয়োজন করেন, প্রগতিবাদীর দল জীর্ণ ফাটল-ধরা সমাজ কবে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া বৈপ্লবিক নবীকরণের জন্য পথ ছাড়িয়া দিবে তাহার দিন গণনা করেন। সাধারণ মানুষ অনেকটা উদ্‌ভ্রান্ত-বিমূঢ় হইয়া বিলীয়মান অতীত ও আগন্তুক ভবিষ্যতের মধ্যে দোলায়মান চিত্তে অসহায়ভাবে প্রতীক্ষা করে। শুধু হাস্যরসিক এই বিকৃতির মধ্যে একটি রস-তাৎপর্যের সন্ধান পান—ভাঙা-গড়ার নানা এলোমেলো উদ্ভট সমাবেশের মধ্যে এক কৌতুককর অসঙ্গতি, কলাসুষমার একটা বক্র ইঙ্গিতের আবিষ্কার করেন। বাঙালীর মানসজগতে যে বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে, যে ওলট-পালট সংঘটিত হইয়াছে তাহার গভীর দিক্‌টা আমাদের কাব্য-সাহিত্য-ইতিহাস-সমাজনীতির মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার লোকহাস্যকর, পাঁচমিশেলী দিকটাই হাস্যরসিকের রসসৃষ্টির প্রেরণা যোগাইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, ইন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি বহু হাস্যরসিকই এই সমাজ-বিপর্যয়ের আলোড়নকে পরাবৃত্ত গতি দ্বারা হাস্য-রস-বৈপরীত্যের চাকা ঘুরাইবার কাজে নিয়োজিত করিয়াছেন। যে বায়ুতরঙ্গে এরোপ্লেন চলে, তাহাতে ঘুড়ি বা ফানুসও উড়ে। এই পরিহাসদক্ষ সংঘে সর্বশেষ যাঁহারা যোগ দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজশেখর বসু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের প্রথম সংঘর্ষ হইতে যে ধারা উদ্ভূত হইয়াছিল তাহাকে ইহারা আধুনিকতার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

অবশ্য ইহাদের পূর্ববর্তীদের সঙ্গে আধুনিক যুগের হাস্যরসিকদের একটা গুরুতর পার্থক্য আছে। ঈশ্বর গুপ্ত হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পর্যন্ত লেখকেরা যে হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার পিছনে সকলেরই একটা সংস্কারক মনোবৃত্তি ও প্রতিবাদের তীব্রজ্বালা প্রকট হইয়াছে। তাঁহারা মধু নহে, যে অম্লমধুর রস পরিবেশন করিয়াছেন

তাহার পিছনে ব্যঙ্গের হুল ও উদ্দেশ্যের রোষগুঞ্জন ছিল। তাঁহারা জাতীয় চরিত্রের অসংগতিকে সম্পূর্ণ মানিয়া লইতে পারেন নাই। মনে করিয়াছিলেন যে, হাসির চাবুকে ইহাকে সংশোধন করা যাইতে পারে—অর্থাৎ অসংগতিকে তাঁহারা অপরাধের পর্যায়ে ফেলিয়া হাসির অন্তরালে বিচারকের কঠোরতাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন। সেই জন্যই ইহাদের হাস্য-রসের উপভোগের মধ্যে একটা আত্মগ্লানির বেদনা রহিয়া যায়—আমরা সম্পূর্ণভাবে এই হাসির আনন্দে যোগ দিতে পারি না। যখন বঙ্কিমচন্দ্র 'হনুমৎ-বাবু-সংবাদ'-এ বাবুর গলদেশে হনুমানের দীর্ঘ-প্রলম্বিত পুচ্ছের প্যাঁচ কসিয়াছেন, তখন আমরা হাসিতে হাসিতে হঠাৎ চমকিত হইয়া নিজের গলায় হাত দিয়া দেখি যে সেখানে পুচ্ছবেষ্টনীর চাপ অনুভব করা যায় কিনা। কিন্তু কেদারনাথ ও রাজশেখরের মধ্যে সংস্কারক মনোবৃত্তির শেষ চিহ্নটিও বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহারা বাঙ্গালীর মনে যে উদ্ভট বিপর্যয় ঘটিয়াছে তাহাকে পুরাপুরি মানিয়া লইয়াছেন, উহার কোন পরিবর্তন তাঁহারা আকাঙ্ক্ষা করেন না। বরং এই উৎকেন্দ্রিকতা, এই গদগদ ভাববিলাস, এই উপাদান-সাঙ্কর্য যদি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠে তবে তাঁহাদের হাসির ধারা শুষ্ক হইয়া যাইবে এই মনোভাবই তাঁহাদের মধ্যে প্রকট। তাঁহাদের পরিহাসের মধ্যে কোথাও বিরাগের তীব্রতা নাই, অস্বীকৃতির ক্ষীণতম রেশও শোনা যায় না, চিত্তের প্রসন্ন গ্রহণশীলতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কেদারনাথ বাঙ্গালীর জীবনসমস্যা হইতে উদ্ভূত বেদনাকে হাসির রূপ দিয়াছেন—এই হাসির পিছনে অশ্রুবিন্দু টলমল করে, ইহা যেন কান্নারই একটা তির্যক রূপান্তর। তাহার 'ধেমো শালিকের' (domicile) ছন্নছাড়া জীবন কাঁদিতে লজ্জাবোধ করে বলিয়া হাসির পিচকারী-মুখে অন্তঃনিরুদ্ধ অশ্রুকে উড়াইয়া-ছড়াইয়া দেয়। বহুসন্তান-বিব্রত ভদ্রলোক তাঁহার সাতটি ছেলে-মেয়ের অবিশ্রান্ত চীৎকার-কোলাহলের মধ্যে সঙ্গীতের সপ্তসুর শুনিয়া তাঁহার দুর্ভর সমস্যার বোঝাকে লঘু করেন। কিন্তু তিনি বিহারে বাঙ্গালী-সমস্যার সমাধান কবিতেও চাহেন না, পবিবারবৃদ্ধি-নিবারণের জন্য জন্ম-নিয়ন্ত্রণ-প্রথারও পক্ষপাতী নন। রাজশেখরবাবু ও সেইরূপ পাগলা-গারদের একটা ভদ্রসংস্করণ—এই জীবনকে আনন্দপ্রস্রবণ ও হাসির নির্ঝররূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীর ফোঁটাতিলক মুছিয়া ও নামাবলী কাড়িয়া তাহাকে শ্রীঘরে পাঠাইতে তাঁহার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নাই। বরং ইহার বংশ চিরস্থায়ী হইলে আমরা ব্রহ্মানন্দকল্প হাস্যানন্দ উপভোগ করিতে থাকিব। কচি-সংসদকে সংস্কার করিয়া কচি ডাবকে ঝুনো নারিকেলে পরিণত করার কোন ইচ্ছা তাঁহার নাই, তাহাদের অনভিজ্ঞ বাষ্পোচ্ছ্বাস হইতে সাংসারিক রেলগাড়ী টানিবার সুনিয়ন্ত্রিত বাষ্পশক্তি তৈয়ারী করিবার অভিলাষও তিনি পোষণ করেন না। সংসারের মধ্যে দুই চারিটা 'ভুশণ্ডীর মাঠ' না থাকিলে ইহার কেজো উর্বরতা রস-মরুভূমিরই নামান্তর হইবে। বংশলোচন বাবু, তাঁহার গৃহিনী, শ্যালক, ভাগিনেয় প্রভৃতি পরিবারবর্গবেষ্টিত হইয়া, তাঁহার বৈঠকখানার আড্ডাধারী পারিষদ-মণ্ডলীর মধ্যমণিরূপে, সর্বোপরি তাঁহার হঠাৎ-পাওয়া রত্ন লম্বকর্ণের সঙ্গে নিজ উষ্ণীষের সমতা রক্ষা করিয়া কৌতুকরসের আধাররূপে বিরাজ করিতে থাকুন—সংস্কারের সম্মার্জনী যেন তাঁহাকে স্পর্শ না করে। যেখানে যত খেয়ালের উনপঞ্চাশ পবন বহিতেছে, যেখানে যত উদ্দাম কল্পনা ও নিরঙ্কুশ উচ্ছ্বাস বিজ্ঞতার অনুশাসন উপেক্ষা করিয়া আপন আপন নেশায় মশগুল, যেখানে যত ভূত-প্রেত-দানা মানবজীবনের ঊর্ধ্বে প্রলম্বিত হইয়াও

মানুষের কামনার মধ্যে বীজরূপে আসীন, সে সবই লেখকের রসসৃষ্টির উপাদান স্বরূপ তাঁহার গ্রন্থমধ্যে একত্র সমাবেশে মিলিত হইয়া পাঠকের রসপিপাসার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে থাকুক। না পাঠক না লেখক—কেহই এই বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত দৃশ্যাবলীর পরিবর্তে একঘেয়ে যুক্তিবাদ ও ধূসর সুস্থ-মস্তিষ্কত্বের প্রতিষ্ঠা দেখিতে চাহেন না। এবং সংসার-নাট্যের এই লীলা-বৈচিত্র্যের আবিষ্কারক ও রূপকার রূপে শ্রীরাজশেখর বসুও মুগ্ধ পাঠকের আনন্দ-পরিতৃপ্ত রুচিবোধের উপর স্বীয় অবিচল আসনটি চিরপ্রতিষ্ঠিত রাখুন।

(১০)

উপন্যাসক্ষেত্রে হাস্যরসিকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থানই বোধ হয় সর্বোচ্চ। হাস্যরসের অজস্র প্রাচুর্য ও প্রকাশভঙ্গীর দ্যুতিমান্ ও অর্থগৌরবপূর্ণ সংক্ষিপ্ততা তাঁহার সমস্ত রচনায় ঝলমল করিতেছে। রাজশেখর বসুর সহিত তুলনায় তাঁহার হাস্যরসের কতকগুলি প্রকৃতিবৈশিষ্ট্য সহজেই অনুভূত হয়। রাজশেখরবাবুর হাস্যরসের প্রাণ হইতেছে তাঁহার পরিকল্পনার উদ্ভট মৌলিকতা। তাঁহার চরিত্রসৃষ্টি এই পরিকল্পনার প্রতিবেশ-লীন, সুতরাং ইহা কখনই প্রধান হইয়া উঠে নাই। তাঁহার কোন চরিত্রই প্রতিবেশের আবছায়া হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া নিজ স্বাতন্ত্র্য-গৌরবে সুস্পষ্ট হয় নাই। তাহাদের কথাবার্তাও এই হাস্যকর পরিকল্পনার অসংগতি-স্পর্শে হাস্যোদ্দীপক হইয়াছে—ইহাদের মধ্যে wit বা বুদ্ধির তরবারি-দীপ্তির প্রাধান্য নাই। তাঁহার কোন বিশেষ উক্তিই পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজ প্রকাশ-ভঙ্গীর তীক্ষ্ণাগ্রতায় আমাদের স্মৃতিমূলে বিদ্ধ হয় না। আর হাস্যকর প্রতিবেশ-প্রভাবের জন্য তাঁহার রসিকতার মধ্যে করুণরস-সঞ্চারের কোন চেষ্টা পাওয়া যায় না। সুতরাং উচ্চাঙ্গের homour এর যে প্রধান লক্ষণ—হাস্যরসের সহিত করুণরসেব সমাবেশ, তাহা তাঁহার রচনাতে মিলে না। রাজশেখরবাবুর হাস্যবসেব আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা খুব সূক্ষ্ম পরিমিতি-বোধ ও সংযমজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত—তাঁহার হাসি মার্জিত সুরুচির সীমা কখনই লঙ্ঘন করে না, গ্রাম্য রসিকতা ও প্রহসনোচিত উচ্চহাস্যকে সর্বদা দূরে পরিহার করে।

এই সমস্ত বিষয়েই তাঁহার সহিত কেদারনাবুর পার্থক্য সুস্পষ্ট। কেদারবাবুর হাস্যরসের প্রধান গুণ হইতেছে ইহার সহিত করুণরসের সমাবেশ ও কোথাও কোথাও চমৎকার সমন্বয়। কি ছোট গল্প, কি বড় উপন্যাস—সর্বত্রই এই কারুণ্যপ্রবাহ তাঁহার হাসির মধ্যে বিষাদ-গাম্ভীর্যের একটা গাঢ়তব সুর ধ্বনিত করিয়াছে। তাঁহার হাসি উদাস, বৈরাগ্যপূর্ণ দীর্ঘশ্বাসের যমজ সহোদর; বেদনার ও সহানুভূতির গূঢ় মর্মস্থান উদ্ভিন্ন করিয়া ইহার ভোগবতী-ধারা ছুটিয়াছে। নির্মমতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হৃদয়-বৃত্তি ইহার উৎস-মুখ; নিরুদ্ধ, পতনোন্মুখ অশ্রুবিন্দু ইহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবস্থা। তারপর তাঁহার উক্তিগুলির মধ্যে witএর চাকচিক্য ও সংক্ষিপ্ত অর্থগৌরব প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। Witএর চমকপ্রদ আকস্মিকতা, ইহার ইঙ্গিত-ও-ব্যঞ্জনাগর্ভ প্রকাশভঙ্গী ও অনুপ্রাসের সমাবেশ-কৌশল, ইহার বাক্য-বিন্যাসের বাহুল্য-বর্জিত, গতিবেগ-চঞ্চল তীক্ষ্ণাগ্রতা—এ সমস্তেরই উপর তাঁহার অকুণ্ঠিত অধিকার।

হাসির প্রতিবেশে চরিত্র-সৃষ্টি-কুশলতা তাঁহার আর একটি বিশেষত্ব। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি কেবল হাসির বাহন নহে, হাস্যরসের স্রোতে তাহারা গা ভাসাইয়া দিয়া ব্যক্তিত্ব

বিসর্জন করে নাই। হাস্যরস তাহাদের চারিত্রিক বিশেষত্ব হইতে উৎসারিত। তাঁহার ছোট গল্পের অল্প-পরিসরের মধ্যে ও তাহার বৃহত্তম উপন্যাস 'কোষ্ঠীর ফলাফল'-এ হাসির অফুরন্ত নির্ঝর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করিয়াই বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রবাহিত হইয়াছে—রসিকতার আতস-বাজীর মধ্যে কোন একটি বিশেষ লোকের দৃষ্টি-ভঙ্গী ও আলোচনা-পদ্ধতি প্রতিফলিত হইয়াছে।

সূক্ষ্ম ও সুমার্জিত পরিমিতি-বোধের দিক্ দিয়া কেদারবাবুর রচনা অবিমিশ্র প্রশংসার দাবী করিতে পারে না। পরিকল্পনার সুরুচি ও মৌলিকতায় বোধ হয় রাজশেখরবাবুরই শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু এখানে একটা কথা স্মরণ রাখা উচিত। হাস্যরসের প্রাচুর্য আতিশয্য ও অতিরঞ্জনের সহিত অনেকটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। প্রাণখোলা উচ্চহাসি ইতর-জনসাধারণের সহিত একত্র উপভোগের বস্তু—মুষ্টিমেয় শিক্ষাভিমানী ও বুদ্ধিপ্রধান অভিজাতবর্গের আনন্দবিধান করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। হাসির ধারা যত স্বচ্ছ, ততই ক্ষীণ হইবে। যাঁহারা বিশুদ্ধির বিষয়ে অত্যন্ত রুচিবাগীশ তাঁহাদের উপভোগ-স্পৃহাকে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে হইবে। হাস্যরসের মধ্যে যে সার্বজনীন ইতরতা ও প্রাকৃত গুণের সমৃদ্ধি আছে, তাহাকে সংস্কৃত করিবার চেষ্টায় ইহারা হাসির মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের লবণ-ছিটা বা Ironyর দ্রাবকরস মিশাইয়া ইহাকে বিকৃত করিয়া ফেলেন। হাসির মধ্যে বুদ্ধিপ্রাধান্য সঞ্চারিত করার ফলে ইহার তীব্রতা ও আঘাত-শক্তি যে পরিমাণে বাড়ে, ইহার নির্দোষ উপভোগ্যতাও সেই পরিমাণে কমে। সুতরাং হাস্যরসসৃষ্টি ও উপভোগের মধ্যে একটা নির্বিচার উদারতা ও স্থূল বাস্তবতা না থাকিলে তাহার আবেদন খুব সংকীর্ণ হয়; হাসির মধ্যে খুব সূক্ষ্মকলা-কুশলতা ও সুরুচি-সংযম তাহার প্রাণরসকে শীর্ণ করে। Dickensএর হাস্যরস ইতর ও স্থূল উপাদানে পুষ্ট বলিয়াই তাহা সর্বজনপ্রিয়; যাঁহারা তাঁহার অপেক্ষা সূক্ষ্ম মীড়মূর্ছনায় অধিকতর সিদ্ধহস্ত তাঁহাদের পাঠকের গণ্ডি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অবশ্য কেদারবাবুর মধ্যে যে সূক্ষ্ম কারুকার্যের অভাব আছে, তাহা নয়; কিন্তু তথাপি তাঁহার রসিকতা Dickens জাতীয় বলিয়াই তাহার আবেদনের ব্যাপকতা এত অধিক। তাঁহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করার সময় এই সত্য আমাদের মনে রাখা উচিত।

কেদারবাবুর হাস্যরসপ্রবণতা তাঁহার প্রথম রচনা 'চীন-যাত্রী'তে (১৯১৮) আত্মপ্রকাশ করে। ইহা যদিও ভ্রমণ-কাহিনীর পর্যায়ভুক্ত, তথাপি ইহাতে আখ্যান-বৈচিত্র্য অপেক্ষা হাস্যোচ্ছ্বাসেরই আধিক্য। এই প্রথম রচনাতেই তাঁহার হাস্যরসিকতার ভবিষ্যৎ পরিণতির আভাস পাওয়া যায়। সিঙ্গাপুরে ফলের ব্যাপার, বিপত্নীক সবজজ মহাশয়ের কাহিনী, ঝড়ের সময়ের আতঙ্কিত কম্পের বর্ণনা, সকলের কৌতুক-উপহাসের পাত্র চাটুয্যের কীর্তি-কলাপ, যুদ্ধাবস্থায় সামরিক বিধিব্যবস্থার প্রয়োগে কেরাণীকুলের দুরবস্থা ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের মধ্য দিয়াই উচ্ছ্বসিত উচ্চহাস্যের প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে—হাসি প্রহসনের ধার ঘেঁষিয়া যাইতে সংকুচিত হয় নাই।

তাঁহার দ্বিতীয় রচনা 'শেষ খেয়া' (১৯২৫) উপন্যাসটিতে হাস্যরস করুণরসের নিকট প্রাধান্য হারাইয়াছে। এইটিই কেদারবাবুর একমাত্র অবিমিশ্র গম্ভীর ভাবের রচনা। কেবল-মাত্র নিমাই নন্দীর চরিত্রে ও কথাবার্তায় হাসিমেশানো বিদ্রূপের একটু চাপা, সংযত সুর শোনা

যায়—আর পাত্রের পিতা বিরূপাক্ষ ও তৎপত্নীর বৈবাহিক-সম্ভাষণে নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতার চিত্র উপহাসের ব্যঞ্জনায় কথঞ্চিৎ সহনীয় হইয়াছে। বাকী সর্বত্রই করুণরসের একাধিপত্য। উপন্যাসটির গঠনকৌশল নিখুঁত নহে—ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে এক নবীনের উপস্থিতি ছাড়া আর কোন যোগসূত্র নাই। নবীন ও ব্রজবাবুর পারিবারিক সমস্যা বিভিন্ন প্রকারের এবং উহাদের দুঃসহতাও এক স্তরের নহে। এই সমস্যার আলোচনা ও চরিত্রগুলির বিশ্লেষণও আশানুরূপ গভীরতা লাভ করে নাই। গণেশ ও চণ্ডিকার যে চরিত্র-চিত্র আমরা পাই তাহা অস্পষ্ট ও ছায়াময়—চণ্ডিকার এক তালবৃক্ষক্ষেপনৈপুণ্য ছাড়া আর অন্য পরিচয় বড় একটা আমরা পাই না। তাহার মনে অনুতাপ-সঞ্চারও নিতান্ত আকস্মিকতার সহিতই সম্পন্ন হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের চরিত্রাবলীর মধ্যেও বিশেষ কোন স্বাতন্ত্র্য-লক্ষণ আবিষ্কার করা যায় না। মোট কথা এক করুণ-রস-সৃজনে দক্ষতা ছাড়া আর কোনও ঔপন্যাসিক গুণের পরিচয় এই উপন্যাসে পাওয়া যায় না। কেদারবাবু তাঁহার প্রতিভার স্বাভাবিক গতির বিপরীত পথ অনুসরণ করিয়া এখানে ব্যর্থতা বরণ করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।

ইহার পরই কেদারবাবুর হাস্যরসের উৎস সম্পূর্ণরূপে বাধামুক্ত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে। 'আমরা কি ও কে' (১৯২৭), কবলুতি (১৯২৮), পাথেয় (১৯৩০) ও 'দুঃখের দেওয়ালী' (১৯৩২) দ্রুত পর্যায়ে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার রসিকতার অফুরন্ত বৈচিত্র্যের বিস্ময়কর সাক্ষ্য দিতেছে। আমাদের শুষ্ক, নীরস, কেবলমাত্র প্রাণধারণের প্রয়াসে গলদ্ঘর্ম ও রুদ্ধশ্বাস জীবনে যে এত সুপ্রচুর হাস্যরসের ফল্গুধারা ধূসর বালুকাবরণের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা ভাবিলে বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়। এমনকি আমাদের জীবনের সমস্ত বিফলতা, সমস্ত অসংগতি, সমস্ত বৃহৎ সংকল্পের অসদ্ভাব ও শীর্ণ রিক্ততা তাঁহার রসিকতার অপর্যাপ্ত উপাদান যোগাইয়াছে—জীবনের শুষ্কতা রসিকতার প্রবল বন্যা বহাইয়াছে।

এই রসিকতার বিচিত্র ধারা যে নানা শাখা-প্রশাখা বাহিয়া বহিয়াছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (১) কতকগুলির বিষয় হইতেছে বঙ্গসমাজ ও পরিবার-ব্যবস্থার অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—এগুলিতে করুণ ও হাস্যরসের আশ্চর্য সমন্বয় হইয়াছে। 'আমরা কি ও কে'তে বাঙ্গালীর বংশাভিমান ও আধ্যাত্মিক গৌরব-গর্ব, 'দেবী-মাহাত্ম্যে' আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থার প্রতি দুবিষহ ঔদাসীন্য; 'পেন্‌সনের পরে' শান্তি-প্রয়াসী অবসর-প্রাপ্ত বৃদ্ধের নির্যাতন ও দুরবস্থা; 'ছাতু'তে আমাদের ভোজন-বিলাসিতা ও সম্ভ্রম-রক্ষার জন্য উৎকট ব্যাকুলতা; 'শান্তি-জল'-এ একান্নবর্তী পরিবারের বহু-বিস্তৃত লৌকিক কর্তব্যের চাপে অবশ্যম্ভাবী দারিদ্র্যবরণ—আমাদের সমাজ-জীবনের এই সমস্ত ফাঁকি-ত্রুটি সমবেদনাস্নিগ্ধ বিদ্রূপের তীক্ষ্ণাগ্রে আমূল বিদ্ধ হইয়াছে। এই সমালোচনায় নীতিবিদের নিষ্ফল-গম্ভীর বাগাড়ম্বর ও ধর্মমূলক বক্তৃতাবাহুল্য নাই—প্রত্যেকটি আঘাত বেদনা-ব্যথিত হাসির আবরণে একেবারে পাঠকের মর্মস্থলে গিয়া পৌঁছে। (২) কতকগুলিতে আমাদের তথা-কথিত নিম্নশ্রেণীর লোকের ও হিন্দু-ধর্মের আদর্শমূলক জীবন-যাত্রার আশ্চর্যরূপ সহানুভূতিপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে হাস্যরস বিষয়-গাম্ভীর্যের ছায়াতলে কতকটা শান্ত-সংযত হইয়াছে—কিন্তু তাহার এই বিষাদ-ম্লানিমার মধ্যে যথেষ্ট সুষমা ও গভীরার্থব্যঞ্জনার পরিচয় মিলে। এই শ্রেণীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গল্প 'থ্রাকো' ও

'কালী করালী'। এই দুইটি গল্পে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কি গভীর, আত্ম-বিস্মৃত ধর্মভাব বদ্ধমূল ছিল, তাহাদের কথাবার্তায় ও ব্যবহারে কি আশ্চর্য বিনয়-নম্রতা ও মধুর দাস্যভাবের সেবাপরায়ণতা ফুটিয়া উঠিত তাহার চমৎকার বর্ণনা মিলে। 'থাকো' গল্পটি হাস্যরসের ক্ষীণ আভাসের মধ্য দিয়া Sublimeএর উন্নতশৃঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে। এই শ্রেণীর 'ছাক্ন' নামক করুণরসপ্রধান গল্পটি লেখকের প্রথম রচনার গৌরব দাবী করে। 'ব্যথার ব্যথী' ও 'সঙ্গীফল' এই দুইটি গল্পে পৈতৃক দুর্গোৎসবক্রিয়া-বর্জনকারী আধুনিক বড়মানুষদের খেয়ালের ফল যে কতদূর পর্যন্ত সঞ্চারিত হয়, সমাজ-দেহের কত সন্ধিস্থলে নিদারুণ আঘাত করে, কত দরিদ্র শ্রমিক-পরিবারকে অন্নহীন সর্বনাশের মধ্যে ঠেলিয়া দেয় তাহার করুণ-কাহিনী আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে।

(৩) তৃতীয় শ্রেণীর গল্পের মধ্যে সমাজ-সমালোচনার উদ্দেশ্য প্রকট হয় নাই। ব্যক্তি-বিশেষের জীবন-কাহিনী বা ঘটনা-বিশেষের সরস বর্ণনার মধ্য দিয়া লেখকের সমস্ত wit ও humourএর অক্ষয় ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইয়াছে। 'আনন্দময়ী-দর্শন' গল্পে সতীশ, সুলতান, গার্ড, স্টেশন-মাষ্টার, প্রভৃতি সকলের মধ্যেই যেন একটা মহত্ত্বের প্রতিযোগিতা চলিয়াছে—ফলে গল্পটি অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতায় আর্দ্র হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এই ভাবার্দ্রতা সত্ত্বেও ইহাতে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি ও বৈচির স্টেশনমাস্টারের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহার মধুর ও হাস্য-রস তুল্যরূপে উপভোগ্য। 'কবলুতি', 'বিচিত্রা', 'মূল্যদান', প্রভৃতি গল্পে witএর ফুলঝুরি চরিত্র-বিকাশের উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া উচ্চতর আর্টের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। কেদারবাবুর গল্প-সমষ্টির মধ্যে ইহাদেরই স্থান সর্বোচ্চ বলা যায়—কেননা জীবন বা সমাজ-সমালোচনা অপেক্ষা চরিত্রসৃষ্টি বা বিশিষ্ট মনোভাব-দ্যোতনা উচ্চতর কলাকুশলতার নিদর্শন। হাস্যরস-প্রধান ঘটনা-বিন্যাস-মূলক গল্পের মধ্যে 'দিল্লীর লাড্ডু', 'দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি', 'রেল-দুর্ঘটনা', 'ভগবতীর পলায়ন', প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি'র প্রমথ চৌধুরীর একটি গল্পের সহিত বিষয়-সাদৃশ্য আছে—বিষয়সাদৃশ্য উভয়ের পদ্ধতির পার্থক্য স্ফুটতর করিয়াছে। দুর্গেশনন্দিনীর plotএর ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনা উভয়েরই লক্ষ্য; চৌধুরী মহাশয় সে উদ্দেশ্য নানারূপ কূটতর্কের উত্থাপন ও অবান্তর-প্রসঙ্গের অবতারণার দ্বারা সিদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কেদারবাবুর মৌলিকতা এখানে কতকটা চৌধুরীমহাশয়ের প্রভাবে ক্ষুণ্ণ—তথাপি তিনি গল্পের মুখবন্ধ ও সমাপ্তিতে ও নিছক তার্কিকতার সংক্ষেপ-করণে নিজস্ব পদ্ধতির মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। চৌধুরী মহাশয়ের পরিধি বৃহত্তর, কিন্তু রসিকতার ধারা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ; কেদারবাবু পরিধি-সংকোচনের দ্বারা রসের গাঢ়তা লাভ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। 'ভগবতীর পলায়ন' গল্পে fantasy বা উদ্ভট-কল্পনার উপস্থিতি বৈশিষ্ট্য-সৃজনের হেতু হইয়াছে—দিগ্বিজয় গাঙ্গুলির বিরাট ব্যক্তিত্ব ও মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীল অভিনয়-রঙ্গ বাস্তবতাকে অতিক্রম করিয়া উদ্ভটের ধূম্রলোকে পদক্ষেপ করিয়াছে।

(৪) Fantasy জাতীয় গল্পে কেদারবাবুর কৃতিত্ব খুব বেশি খোলে নাই—খেয়ালের বাষ্পকে তিনি সুসংগত রূপ ও নিখুঁত ভাবগত ঐক্য দিতে পারেন নাই। স্থানে স্থানে ইহার ঘোরাল, জমাট ভাব ফিকে হইয়া যাওয়ায় চির-পরিচিত মাটির জগতের কংকালমূর্তি উঁকি মারিয়াছে। 'পঞ্জিকা-পঞ্চায়েৎ', 'পূজার প্রসাদ', 'আমাদের সানুডে সভা (২)', 'মুক্তি', 'সুবুদ্ধি

উড়ায় হেসে', 'জাগৃহি' (উপদেশাত্মক গল্প), প্রভৃতি গল্প-সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রযোজ্য। অবশ্য ইহাদের স্থানে স্থানে তাঁহার নিজস্ব রসিকতা ও সূক্ষ্মদর্শী সমালোচনা ছড়ান আছে; কিন্তু মোটের উপর ফল খুব সন্তোষজনক হয় নাই। পরিকল্পনার সমগ্রতা ও ঐক্যের অভাব অনুভূত হয়। এইখানে পরশুরামের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত।

কেদারবাবুর গল্প-সংগ্রহগুলির কালানুক্রমিক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, স্থানে স্থানে কষ্ট-কল্পনার ও 'টানা-বোনার' লক্ষণ থাকিলেও মোটের উপর তাঁহার রসিকতার ধারা অক্ষুণ্ণ আছে, যদিও ক্রমপরিণতির চিহ্ন সেরূপ সুপরিস্ফুট নহে। 'আমরা কি ও কে' গ্রন্থে তাঁহার রসিকতা টাট্‌কা, সতেজ, মৌলিক নবীনতায় উজ্জ্বল। 'কবলুতি'তে এই ধারা মুখ্যতঃ বজায় আছে, তবে উদ্ভট খেয়ালের গল্পগুলির আপেক্ষিক অনুৎকর্ষ ইহার পর্যায়কে একটু নিম্নগামী করিয়াছে। 'পাথেয়' গল্প-সমষ্টি প্রধানতঃ করুণরসবহুল ও স্থানে স্থানে কাঁচা হাতের লেখা—ইহাতে লেখকের হাস্যরস নিঃশেষিতপ্রায় হইবার লক্ষণ দৃষ্ট হয়। করুণরস-উদ্রেকের মধ্যেও মুন্সিয়ানার পরিচয় মেলে না। গুণমূলক ক্রম-পর্যায়ের তালিকায় ইহারই স্থান সর্বনিম্নে। 'দুঃখের দেয়ালী'তে আবার লেখক তাঁহার পূর্বগৌরব পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। ইহাতে হাস্যরসের পূর্বতন তীক্ষ্ণোজ্জ্বলতা বর্তমান, কিন্তু করুণরসের সহিত আশ্চর্য সমন্বয় ইহাকে গভীর আবেদন-মণ্ডিত করিয়াছে। এই শেষ গ্রন্থে তিনি যে কারুণ্যের ঘৃতসিক্ত দীপমালা প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন তাহাদের অম্লান উজ্জ্বলতাই তাঁহার রসিকতার অনির্বাণ দীপ্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কেদারবাবুর সর্বশেষ গল্পসমষ্টি 'নমস্কারী' (১৯৪৪) আশী বৎসর বয়সেও যে তাঁহার রসিকতার ধারা অক্ষুণ্ণ আছে তাহার বিস্ময়কর নিদর্শন। ইহার মধ্যে একটি গল্প 'মাথুর' যুদ্ধ-প্রতিবেশে কৃপণের বর্তমান কিংকর্তব্যমূঢ়তার মধ্যে হাস্যরসের উপাদান আবিষ্কার করিয়াছে। অন্যান্য গল্পগুলির মধ্যে পূর্বতন ধারাই অনুসৃত হইয়াছে। 'অপরূপ কথা' সমাজ-শাসনের মূঢ় অযৌক্তিকতাকে কিরূপ কৌশলে ব্যর্থ করা হইয়াছিল তাহার উপভোগ্য বিবরণ। সবিনয় বশ্যতাস্বীকারের অভিনয়ের অন্তরালে সমাজপতিদের উগ্র দণ্ড-বিধানকে পর্যুদস্ত করার ষড়যন্ত্রটি চমৎকার কৌতুকের সৃষ্টি করিয়াছে—মাতব্বরেরা নিজেদের ফাঁদে নিজেরা পড়িয়া নাকাল হইয়াছেন ও উদ্যত অস্ত্র সংবরণ করিয়া পিছু হটিয়াছেন। আবার গল্পের বিষয়-নির্বাচনে ও বিবৃতি-ভঙ্গীতে প্রাচীন-পন্থী দাদামহাশয় ও আধুনিকা নাতিনীদের ভিতর যে মতভেদ ও রুচিবৈষম্যের ইঙ্গিত পরিস্ফুট হইয়াছে তাহাও গল্পটির রসিকতাকে আরও উপভোগ্য করিয়াছে। 'খুড়ার পরলোক-দর্শন'-এ খুড়োর জীবন-দর্শন কিঞ্চিৎ দুর্বোধ্য ও কষ্ট কল্পনা-বিড়ম্বিত। তথাপি ইহাতে রেল-ভ্রমণে সুখসুপ্ত বাঙ্গালী আরোহীর আচরণে যে অভদ্রতা ও অবিবেচনা প্রকটিত হয় তাহার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ অনুযোগ সার্থকভাবে ধ্বনিত হইয়াছে। স্বদেশী যুগে ভ্রাতৃপ্রীতির মন্ত্রে দীক্ষিত বাঙ্গালীর এই আদর্শ-চ্যুতিতে লেখক শ্লেষাত্মক আক্রমণের সহিত খেদের দীর্ঘনিঃশ্বাস মিশাইয়া আঘাতের তীব্রতাকে মোলায়েম করিয়াছেন। 'নামঞ্জুর' গল্পে লেখকের করুণ ও হাস্যরস সংমিশ্রণের সুপরিচিত রীতিটি উদাহৃত হইয়াছে, কিন্তু এই দুইটি রস বিভিন্ন শাখায় প্রবাহিত। বিদ্যাসাগর-জয়ন্তী উৎসবের আড়ম্বরপূর্ণ কার্যসূচী ও আধুনিক সাহিত্যিকদের সহৃদয়তার অভাব ও 'ভালো দেখান'-নীতির উপাসনার বিরুদ্ধে ঈষৎ, অথচ ওস্তাদি হাতের মর্মভেদী খোঁচা; আর ক্ষান্তর আত্মবিলোপী পতিভক্তির মহান্, করুণ

অভিব্যক্তি—এই দুইটি আখ্যান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। লেখকের সাধারণ উপস্থিতির দ্বারাই ইহারা এক বাধ্যতামূলক একত্রাবস্থানের রজ্জুবদ্ধ হইয়াছে। 'বিদ্যুৎবরণ', 'নিতাই লাহিড়ী' ও 'বেয়ান-বিভীষিকা' গল্পত্রয়ে আত্মীয়-প্রতিবেশিবর্গের অনুদার আচরণ ও প্রকৃত সমবেদনার অভাব যুগপৎ হাস্য ও করুণ রসের উপাদান যোগাইয়াছে। হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়া চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত ফুটাইতে কেদারবাবু যে সিদ্ধহস্ততার পরিচয় দিয়াছেন, এই গল্পগুলিতে সেই উচ্চতর নৈপুণ্যেরও অভাব নাই। সমস্ত গল্পসংগ্রহে ভাষার সংক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণাগ্রতা, সাবলীল গতিভঙ্গী, তুলির একটি আঁচড়ে একটা সমগ্র চিত্রের উজ্জ্বল আভাস দিবার শক্তি—প্রভৃতি লেখকের রচনার উৎকর্ষ-লক্ষণগুলি—পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। অশীতিবর্ষোত্তীর্ণ লেখকের রচনায় এই সরসতার চেষ্টাহীন প্রাচুর্য সত্য সত্যই বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

(১১)

কেদারবাবুর বড় উপন্যাসের মধ্যে 'ভাদুড়ী মশাই' ও 'কোষ্ঠির ফলাফল' এই দুইখানিই তাঁহার প্রতিভার প্রতিনিধি হিসাবে বিচার্য। এক হিসাবে বলিতে গেলে বড় উপন্যাসের বিশেষ লক্ষণ তাঁহার রচনায় নাই—আকারে বড় হইলেও ইহারা ছোট গল্পের লক্ষণাক্রান্ত—episodic, বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদ-সমষ্টি। 'ভাদুড়ী মশাই'-এ তাঁহার হাস্যরসের প্রফুল্লতা ও মৌলিকতা কিঞ্চিৎ ম্লান হইয়াছে স্বীকার করিতেই হইবে। আচার্য মশাই-এর রসিকতায় স্বাভাবিকতার অভাব ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে যেন কৃচ্ছ্রসাধনের হাঁপানি শোনা যায়। সপ্তর্ষি-মণ্ডলের গ্রহ-গুলির মধ্যে কেবলমাত্র কিংশুকের ব্যক্তিত্বই কতকটা ফুটিয়াছে, তাহাও যেন তাহার উপর শুক্রগ্রহের অনুগ্রহ নিবন্ধন। অক্ষয়বাবুর গুরু-গম্ভীর ভাষা ক্ষয়িষ্ণুতার সমস্ত চিহ্ন বহন করিয়াই কালজীর্ণ স্তম্ভের ন্যায় কোন প্রকারে দাঁড়াইয়া আছে। এই গ্রন্থে কেদারবাবু প্রথম প্রেমের অবতারণা করিয়াছেন—তবে রসিকতার আবহাওয়ায় প্রেমের সলজ্জ রক্তিমা ও নিগূঢ় মাধুর্য ফোটে নাই। মীরা সর্বদাই অন্তরাল-বর্তিনী রহিয়াছে; উহার বাক্-চাতুর্য প্রণয় অপেক্ষা পিতামাতার সহিত দৈনন্দিন সম্পর্কেই বেশি ফুটিয়াছে। ঢোড়া বাবার স্বরূপ-আবিষ্কার-কাহিনীর উপর বিরিঞ্চি-বাবার সাদৃশ্যের ছায়াপাত হইয়াছে। মাতঙ্গিনী-মন্দাকিনীর চরিত্রও অপরিস্ফুট ও অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। মন্দাকিনীর জীবনে এক ভর্তৃ-শাসন ছাড়া আর কোনও গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হয় নাই; কিন্তু মাতঙ্গিনীর জীবন-সমস্যা যে সংকটময় অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত দেয় তাহার ব্যাখ্যার অসম্পূর্ণতা আমাদের কৌতূহলকে অতৃপ্ত রাখিয়া দেয়। ভাদুড়ী মহাশয়ের দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ-সংকল্প গ্রন্থমধ্যে এক ক্ষীণ সম্ভাবনার অর্ধ-স্ফুটতা ছাড়াইয়া পূর্ণমূর্তি পরিগ্রহ করে নাই। একদিকে ইহার হাস্যকর অসঙ্গতি অপর দিকে মাতঙ্গিনীর মনের উপর tragic প্রতিঘাত—এই উভয়দিকের মধ্যে একটা প্রতিকারহীন অসামঞ্জস্য রহিয়া গিয়াছে। মাতঙ্গিনীর এই অগ্নিপরীক্ষার চিত্রের অপরিস্ফুটতা গ্রন্থের প্রধান দুর্বলতা। নবীন অতিরিক্ত নমনশীলতার জন্য সার্থকনামা হইয়াছে—তাহার চরিত্রে গোড়ার দিকে যেটুকু প্রখরতা ছিল, তাহা প্রণয়-সঞ্চারের উত্তাপে গলিয়া জল হইয়া গিয়াছে। উপন্যাসের নাম-করণেও অপ-প্রয়োগের ছাপ রহিয়া গিয়াছে। ভাদুড়ী মশাই-এর মত দেহে ও মনে জড় মাংসপিণ্ড নায়কের গৌরবের অনুপযুক্ত। আচার্য মশাই অনধিকার-প্রবেশের অভিযোগ সত্ত্বেও গ্রন্থের প্রধান নায়ক—তাঁহার নামানুসারে উপন্যাসের নামকরণই শোভনতর হইত।

'কোষ্ঠির ফলাফল'ই কেদারবাবুর প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহাতে তাঁহার হাস্যরস-সৃজনের যে ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বৈচিত্র্যে ও উজ্জ্বলতায় অতুলনীয়। রসিকতার স্থানে স্থানে গ্রাম্যতা দোষ হয়ত আছে, কিন্তু হাস্যরসের প্রবল প্রবাহে এই সমস্ত ক্ষুদ্র আপত্তি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। গ্রন্থের সর্বপ্রধান গুণ হইতেছে হাস্যরসের সহিত চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সুসঙ্গতি—চরিত্রের তট বাহিয়া হাসির ধারার প্রবাহ ও হাসির সহিত করুণরসের আশ্চর্য সমন্বয়। এই হাসির দক্ষিণা বাতাসে প্রত্যেকটি চরিত্র আত্মবিকাশ লাভ করিয়াছে। এক-একটি ঘটনা, চিত্রশালায় সুসজ্জিত, বর্ণে সমুজ্জ্বল, আলোতে ঝলমল চিত্রের ন্যায় আমাদিগকে মুগ্ধ করে। প্রথমতঃ 'domiciled' বা ধেমোশালিকের তীব্র-আত্মগ্লানি-তিক্ত জীবনেতিহাস; তারপর দেওঘরে গৃহস্বামীর অদ্ভুত ভৃত্য-প্রীতির ও চিঠি দেওয়ার ব্যাপারে অতি-সতর্কতার খেয়াল; মাতুলের বংশাভিমান, আরামপ্রিয়তা ও অর্থাভাবজনিত অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ—এই ত্র্যহস্পর্শঘটিত রসিকতা, অমরের নিঃসংকোচ আত্মসম্মান-জ্ঞানহীন ঐশ্বর্যোপাসনা; 'করুণ-রসের কৌশল্যা' পিণু ঠাকুরের অদ্ভুত শাস্ত্র-জ্ঞান ও জীবন্ত পিতৃপুরুষের পিণ্ডদানের ব্যবস্থা; দয়াল পণ্ডিতের শিক্ষিতা-পত্নী-লাভরূপ দুরন্ত-সৌভাগ্যোদ্ভূত, দীর্ঘশ্বাসক্ষুব্ধ স্মিতহাস্য; জয়হরির ঔদরিকতার একনিষ্ঠ সাধনার সহিত শিশুসুলভ সরলতা, ও অকৃত্রিম পরদুঃখ-কাতরতার অপরূপ সংমিশ্রণ ও আশা-ভঙ্গ বা অন্য কোনরূপ মানসিক উত্তেজনার ঝোঁকে তাহার মধ্যে রসিকতার জোয়াবের আবির্ভাব; সর্বোপরি, লেখকের নিজের সুকুমার-ভাব-প্রবণ, বৈরাগ্য-ধূসর চিত্তেব স্বাভাবিক অভিব্যক্তিমূলক হাস্যরস—এই সর্বপ্রকারের হাস্যধারার একত্র সমাবেশ গ্রন্থখানির উপর হাস্যরসের মহাসঙ্গমস্থলের মাহাত্ম্য আরোপ করিয়াছে।

এই হাসির সহিত মিলিয়াছে করুণরসপ্রবাহ, পরস্পর পরস্পরকে বৈপরীত্যমূলক সম্বন্ধের দ্বারা তীব্রতব ও বিশুদ্ধতর করিয়াছে। করুণরসপ্রধান দৃশ্যগুলির মধ্যে আজিজ ও মানবের অপরূপ বন্ধুত্বের চিত্র শীর্ষস্থান অধিকাব কবিয়াছে। মানবের চরিত্রের উপর শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রনাথের অসংশয়িত ছায়াপাত হইয়াছে—উভয়েরই দুঃসাহসিকতার প্রতি আকর্ষণ, গভীর ভগবদ্‌ভক্তি ও পরোপকার-প্রবৃত্তি একেবারে অভিন্ন-জাতীয়। লেখক নিজে (লোকেন) শ্রীকান্তের স্থলাভিষিক্ত। আফ্‌গান আজিজের সহিত মানবের বন্ধুত্ব সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা'র সুদূর স্মৃতিতে অনুপ্রাণিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনায় কেদারনাথের চিত্র আরও তথ্যবহুল ও কঠোরতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বন্ধুত্ব অপেক্ষা স্নেহ সুলভতর হৃদয়বৃত্তি; ইহার আকর্ষণ ও ব্যবধান-নিরসনশক্তিও প্রবলতর। কাবুলি রহমৎ মিনির প্রতি অপত্যস্নেহ অনুভব করিয়া তাহাদের মধ্যে ব্যবধানের কথা ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃত হইবে ইহাতে বিস্ময়ের উপাদান খুব বেশি নাই। আর এই স্নেহের উদ্ভব—ইহাতেও বেশি কিছু আয়োজনের প্রয়োজন নাই। একদিকে একটি বিরহব্যথিত, স্নেহ-বুভুক্ষু পিতৃহৃদয়, অপরদিকে একটি সুন্দর, ফুটফুটে, বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্র বালিকা—এই দুই-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাব-সত্ত্বেও আকর্ষণের বৈদ্যুতিক শক্তি মিলন রচনা করিয়াছে। কিন্তু বন্ধুত্বের দাবী এত সহজ নহে—ক্ষণিকের আকর্ষণ ইহার ভিত্তি হইতে পারে না। ইহার জন্য প্রয়োজন সমপ্রাণতা, একটা নিগূঢ় আত্মীয়তার অসংশয় উপলব্ধি। এই উপলব্ধি প্রেমের মত, প্রথম দৃষ্টিক্ষেপেই জন্মিতে পারে; ইহা সব সময় সুদীর্ঘ পরিচয়ের প্রতীক্ষা করে না; কিন্তু ইহার উপস্থিতি বন্ধুত্বের অপরিহার্য বুনিয়াদ।

কেদারবাবু দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে বর্ধিত, ধর্মসংস্কার ও ভাষার ভেদে অপসারিত দুই তরুণ-হৃদয়কে কেবলমাত্র এক মনুষ্যত্বের মহামিলন-ক্ষেত্রে অমর-প্রেমের বন্ধনে সংযুক্ত করিয়াছেন। এই বন্ধুত্বের চিত্রে হয়ত স্থানে স্থানে ভাবাতিরেকের (sentimentality) ভিজে দাগ ধরিয়াছে; হয়ত আকস্মিকতার একটু সন্দেহ সর্বত্র বর্জন করা যায় না। তথাপি মোটের উপর ইহা আমাদের মনে যে মোহবিস্তার করে তাহার প্রভাব সমালোচকের সমস্ত সংশয়োত্তেজিত সচেষ্টতা কাটাইয়া উঠিতে পারে না। আমাদের প্রশংসার বেগ একটু মন্দীভূত হয়, যখন আমরা স্মরণ করি যে, এমন চমৎকার গল্পটির উপন্যাস-মধ্যে কোন বৈধ স্থান নাই, ইহাকে episodeএর খিড়কি দরজা দিয়া প্রবেশাধিকার দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষিত বেকার গণেনবাবুর আখ্যানে যে করুণরস সঞ্চারিত হইয়াছে তাহা সংযত, বিশুদ্ধ ও সর্বপ্রকার আতিশয্যবর্জিত; এবং ইহার প্রধান উপযোগিতা এই যে, ইহা জয়হরির চরিত্রের রূপান্তর-সাধনে সহায়তা করিয়াছে। এই দৃশ্যে আমরা আবিষ্কার করি যে, জয়হরির ক্ষুধা ও পরোপকার-প্রবৃত্তি তুল্যরূপেই প্রবল, সে ভোজ্য-দ্রব্যের শেষকণিকা ও সমবেদনার শেষবিন্দু পর্যন্ত নিজ ক্রিয়াশীলতা প্রসারিত করিতে সমভাবেই প্রস্তুত। গ্রন্থমধ্যে আমরা যে কয়টি চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই তাহারা সকলেই সজীব, সকলেরই একটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে; কর্তার খেয়ালে একটু caricature বা ব্যঙ্গাতিরঞ্জনের লক্ষণ মিলে; কিন্তু মাতুল, অমর, ও লেখক নিজে বেশ নিপুণভাবে অঙ্কিত; গৃহিণীরাও অন্তরালবর্তিনী থাকিয়া দুই-একটি অম্লমধুর মন্তব্যে, কেহবা স্বপ্নাবির্ভাবের মধ্যেও আত্মপরিচয় দাখিল করিয়াছেন। কিন্তু এই চরিত্রাবলীর মধ্যমণি হইতেছে জয়হরি; সে-ই লেখকের রসোদ্ভাবনেরও যেমন, তেমনি সৃজনী-শক্তিরও প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(১২)

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'রাণুর প্রথম ভাগ' (এপ্রিল, ১৯৩৭), 'রাণুর দ্বিতীয় ভাগ (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮), 'রাণুর তৃতীয় ভাগ' (জুলাই, ১৯৪০), 'বসন্তে' (আগষ্ট, ১৯৪১) ও' 'রাণুর কথামালা' (জানুয়ারী, ১৯৪২)—এই গল্প-সংগ্রহগুলি একজন নূতন শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাব সূচিত করে। গল্পগুলি প্রধানতঃ হাস্যরসমূলক; শেষের গ্রন্থগুলিতে লেখক হাস্যরসের সংকীর্ণ পরিধি অতিক্রম করিয়া গভীর বিষয়ের আলোচনায় ক্রমপরিণত কলা-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। হাস্যরসিকের লঘু দৃষ্টিভঙ্গীর অন্তরালে যে কবিসুলভ সৌন্দর্য-বোধ ও দার্শনিকের সূক্ষ্মদর্শিতা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। কাজেই বিভূতিভূষণের স্থান কেবল হাস্যরসিকদের মধ্যে নহে। তাঁহার রচনায় কাব্যধর্মের উৎকর্ষ ও তীক্ষ্ণ চিন্তাশীলতা ছোট গল্পের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে তাঁহার স্থান নির্দেশ করিয়াছে।

সাধারণতঃ তাঁহার হাস্যরসপ্রধান গল্পগুলিতে অকৃত্রিম হাসির নির্ঝর প্রবাহিত হইয়াছে। তবে শেষের দিকে কষ্ট-কল্পনা ও উদ্ভট, অবিশ্বাস্য অবস্থা-সৃষ্টির প্রচেষ্টাও মাথা তুলিয়াছে। 'রাণুর প্রথম ভাগ' গল্পটি শিশুমনের হাস্যকর অসংগতি ও অদ্ভুত কল্পনা-প্রবণতার বিষয় লইয়া যে কয়েকটি গল্প রচিত হইয়াছে তাহাদের মূল উৎস। ইহাতে শিশু রাণুর অকালপক্ক গৃহিণী-পণার অভিনয়, প্রথম ভাগের সহিত তাহার আপোষহীন বৈরিতা, না পড়িবার অসংখ্য ছল ও অজুহাতের আবিষ্কার যে হাসির আবেষ্টন সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার মধ্যে মেজকাকার সহিত

বিদায়বেলার শোকোচ্ছ্বাস হৃদয়-দ্রবকারী করুণরসে অভিসিঞ্চিত হইয়াছে। হাসির হালকা হাওয়ায় অশ্রুর আর্দ্রতা মর্মমূলে তীরের মত বিঁধিয়াছে। ইহার পর অন্যান্য অনেক গল্পে রাণুর অবতারণা যেমন তাহার জীবন-চরিতকে অযথা ভারাক্রান্ত করিয়াছে, সেইরূপ তাহার পরিকল্পনার সংগতিরও হানি করিয়াছে। 'দাঁতের আলো', 'স্বয়ংবরা', প্রভৃতি গল্পে রাণুর প্রথম পরিচয়ের বৈচিত্র্য-চমক অনেকটা ম্লান হইয়া আসিয়াছে; তাহার আসল মাতৃত্ব অপেক্ষা মাতৃত্বের অভিনয় আরও কৌতূহলোদ্দীপক। 'বাদল' গল্পে রাণুর আবির্ভাব নাই, তবে পরিবারের অন্যান্য ছেলেপিলে বাদলের দুরন্তপনার বিরুদ্ধে অভিযোগের দ্বারা একটি চমৎকার শিশু-জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে; মেজকাকার শিশু-মনস্তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ-পাঠের দ্বারা শিশুর নিরঙ্কুশ, নব-নব-দৌরাত্ম্য-উদ্ভাবনশীল মনকে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা কৌতুকাবহ হইয়াছে। এই গল্পগুলির মধ্যে শিশুচিত্তের নানা বিস্ময়কর খেয়াল ও কল্পনার বর্ণনা আছে, কিন্তু আর্ট ও ভাবগভীরতার দিক্ দিয়া কোনটিই 'রাণুর প্রথম ভাগের' সমকক্ষ হয় নাই।

আর এক শ্রেণীর গল্পে অতিক্রান্ত-শৈশব কৈশোরের চিন্তা ও উদ্ভট কল্পনা-বিলাস হাস্যরসের উপাদান হইয়াছে। 'পৃথ্বীরাজ' ও 'কাব্যের মূলতত্ত্ব'-এ বিদ্যালয়ের গুরু-গম্ভীর আবেষ্টনে শিক্ষাদানপদ্ধতির অসংগতি, ছাত্রের বিকৃত অর্থবোধ ও শিক্ষকের শাসন-ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিবার নানা অপকৌশল, ছাত্রদের বিভিন্ন দলের মধ্যে নানারূপ ঈর্ষ্যা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার বক্র প্রভাব উপভোগ্য হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। 'পৃথ্বীরাজ'-এ ঘটনা-সমাবেশ সম্ভাব্যতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে; কিন্তু ইহার হাস্যরসটি চমৎকার হইয়াছে। স্কুল হইতে একেবারে বিবাহ-মণ্ডপে উত্তীর্ণ হইলে কিশোর ছাত্রের মনে যে নানা অদ্ভুত আশা-কল্পনা ভিড় করে, কাল্পনিক বীররস ও অকালপক্ক মধুররসের সংমিশ্রণে যে ফেন-বুদ্‌বুদ্ গাঁজিয়া উঠে, তাহার কৌতুকাবহ প্রকৃতি আমাদিগকে মুগ্ধ করে। আর দুইটি গল্পে—'বিয়ের ফুল' ও 'মোটর-দুর্ঘটনা'য় বিবাহ-বিপত্তি—একটিতে দীর্ঘপোষিত আশাভঙ্গ, অপরটিতে কৌমার্যপালনের প্রতিজ্ঞাচ্যুতি—হাসির প্রবাহ বহাইয়াছে। দ্বিতীয় গল্পটির বিজ্ঞাপন-বিভ্রাটের পরিকল্পনাটি বড়ই সরস হইয়াছে। 'বরযাত্রী' নামক গল্পসমষ্টি বিবাহার্থী-যুবক ও তাহার বন্ধুদের বিবিধ সম্ভব-অসম্ভব দুরবস্থা-বর্ণনায় প্রহসনের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে।

কয়েকটি গল্প—যথা, 'মেঘদূত', 'বিপন্ন', 'বসন্তে' প্রভৃতি—নব-বিবাহিতের বাধা-খণ্ডিত, বাস্তব-বিড়ম্বিত প্রণয়াবেশের কাহিনী। 'মেঘদূত'-এ প্রাণি-দম্পতির হাব-ভাব-পর্যবেক্ষণের দ্বারা মানুষের প্রেমের গতিচ্ছন্দ নির্ণয়-চেষ্টা একটু উদ্ভট রকমের মৌলিক; আর জিমি কুকুরকে প্রেমের দৌত্যকার্যে নিয়োগ মহাকবি কালিদাসের কল্পনার ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণ হিসাবে উপভোগ্য হইলেও বাস্তবতার পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ বলিয়াই ঠেকে। 'বিপন্ন' গল্পের মৌলিকতা প্রশংসনীয়—বাঙ্গালীর সৌন্দর্যবোধ ও প্রসাধন-রুচিতে আস্থাশীল নব-পরিণীত বিহারী ছাত্র নবাগত বাঙ্গালী অধ্যাপকের নিকট বেনামীতে নিজ দাম্পত্য সমস্যার ইঙ্গিত দিয়া নাকাল হইয়াছে। 'বসন্ত'-এ দাস-দাসীর দ্বারা তরুণ মুনিবদম্পতির প্রণয়লীলাপদ্ধতির হুবহু অনুকরণ একটু অবিশ্বাস্য রকমের বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু গল্পটিতে বসন্তের মদির বিহ্বলতা, ইহার উচিত-অনুচিত, সম্ভব-অসম্ভবের সীমা-বিলোপী ভাব-প্লাবন, ইহার আত্মভোলা আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে সূক্ষ্ম অতৃপ্তির বেদনাবোধ অতি চমৎকার, কবিত্বপূর্ণ

অনুভূতির সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহার হাস্যরস ফিকে ও অস্বাভাবিক; ইহার প্রতিবেশ-রচনাতেই ইহার শ্রেষ্ঠত্ব। 'যুগান্তর'-এ আধুনিক যুগের সহিত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের বিবাহের আনন্দোৎসব-প্রতিবেশের সুন্দর তুলনা করা হইয়াছে। অতীতের কনেবউ-বরণ, আনন্দের মদির আবহাওয়ায় সমস্ত পরিবারের মধ্যে নিবিড় ঐক্যবোধ, আচার-অনুষ্ঠান-পালনের সতর্ক নিষ্ঠার মধ্যে শঙ্কিত শুভকামনা, বরবধূর মনে প্রথম প্রণয়ের আবেশ, ফুলশয্যার রাত্রির আশা-আশঙ্কা-মধুর প্রতীক্ষা—এই সমস্তই যেন আধুনিক যুগের কাজের হাওয়ায়, অতিতীক্ষ্ণ আত্মসচেতনতার মধ্যে, প্রখর সূর্যালোকে গোধূলির স্নিগ্ধতার ন্যায় উবিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তথাপি সজ্জা-প্রসাধন, চলাফেরার ভঙ্গী, রীতি ও রুচির পার্থক্যের মধ্যে তরুণ-তরুণীর অন্তরের কোন পরিবর্তন হয় নাই—প্রেমপ্রকাশভঙ্গীর বিভেদের অন্তরালে সেই সনাতন রহস্যটি ই যুগে যুগে অভিন্ন সত্তায় বিরাজ করিতেছে।

আর কয়েকটি গল্পে—'নোংরা,' 'হোমিওপ্যাথি', 'অব্যবহিতা', 'কস্মৈ হবিষা বিধেম', 'মধুলিড', 'তীর্থফেরত', 'পূর্ণচাঁদের নষ্টামি', 'সবজান্তা', 'মাথা না থাকিলেও', প্রভৃতিতে হাস্য-কৌতুকের মধ্যে একটু গভীরতর সুরসঞ্চার অনুভূত হয়। এগুলিতে হাস্যরস আসিয়াছে ঠিক অবস্থা-সংকট হইতে নয়, অনেকটা চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও তর্কালোচনা হইতে। 'নোংরা'তে পরিচ্ছন্নতার শুচিবায়ুগ্রস্ত-যুবক এক ধূলা-কাদামাখা বালিকার প্রেমে পড়িয়াছে—অবশ্য তাহার এই পরিবর্তন নিতান্ত একটা অকারণ খেয়াল মাত্র। 'হোমিওপ্যাথি'তে খুড়ার সর্বদা অসুখের ভান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার নীতি অনুসারে খুড়ীর উগ্রতর অভিনয়ের প্রতিষেধক ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। এই কপট রোগ-প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া উভয়ের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও দাম্পত্য সম্পর্কের প্রকৃতিটি চমৎকার ফুটিয়াছে। 'অব্যবহিতা'য় প্রতিবেশসূত্রে প্রণয়-সঞ্চার মামুলি ঘটনা, কিন্তু ঠাকুরদাদার স্নেহদুর্বল আশাবাদ ও প্রণয়ীর আত্মগোপন ইহার মধ্যে কিছু বৈচিত্র্যের প্রবর্তন করিয়াছে। 'কস্মৈ হবিষা বিধেম' গল্পে তর্কমূলক ভূমিকা ও প্রতিপাদ্য সত্যটি সাধারণ, কিন্তু বৃন্দাবনের মন্দিরে কপটভক্তিপরায়ণ দর্শনার্থীর অবস্থাসংকট-র না মৌলিক। 'তীর্থফেরত'-এ সদ্যতীর্থপ্রত্যাগতা বৃদ্ধা ধূলাপায়েই পাড়াতে কোন্দল বাধাইবার অভ্যস্ত অভিযানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে,—তাহার অনুপস্থিতিতে প্রতিবেশিমণ্ডলীর মধ্যে যে ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধবিরতির সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া যেন সে কয়েকদিনের নিষ্ক্রিয়তার ক্ষতিপূরণ করিয়াছে।

'মধুলিড'-এ গৌরীকান্ত বাবুর পুষ্প-প্রিয়তার রহস্যোদঘাটন সত্যই চমকপ্রদ—ফুলের যে আবেদন সৌন্দর্যবোধ ও ভাবাষঙ্গমূলক, গৌরীকান্তবাবু তাহাকে স্থূল ঔদরিকতার আকর্ষণে রূপান্তরিত করিয়াছেন—বিরহাগ্নির সূক্ষ্ম বৈদ্যুতীশক্তি জঠরাগ্নির ইন্ধনে পরিণত হইয়াছে। ফুলের সৌন্দর্য-লোকচ্যুতির এই পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম'-এ উদাহৃত প্রয়োজন-বাদের নিকট আত্মবিক্রয়ের জন্য কৌলীন্য-ভ্রষ্ট সজনের ফুলের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 'পূর্ণ-চন্দ্রের নষ্টামি', 'বসন্তের' ন্যায় প্রতিবেশ-রচনায় সিদ্ধহস্ততার নিদর্শন। তবে এখানে জ্যোৎস্না-প্রবাহ প্রণয়াবেশ না জাগাইয়া পুরুষের আত্মাভিমানকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। দিবালোকে বাস্তব অবস্থার শত তুচ্ছ প্রয়োজনের ব্যঙ্গভ্রূকুটিতে এই স্বপ্রতিষ্ঠার উচ্চাভিলাষ পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়াছে ও নানা হাস্যকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া আবার পক্ষ-সংকোচ করিয়াছে। 'সবজান্তা'য়

একজন অপরিচিতের ঘনিষ্ঠতার দাবী ও অতন্দ্র অভিভাবকত্ব নিমন্ত্রিতের ভোজ্য-তালিকা নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহার ভোজনের তৃপ্তিকে কৌতুকজনকভাবে নষ্ট করিয়াছে। 'মাথা না থাকিলেও' গল্পে মেস-প্রবাসী রাসুদার স্ত্রীর সেবাযত্নের কাহিনী ও মেসের বন্ধুবর্গের মধ্যে তাহার স্বহস্ত-প্রস্তুত মিষ্টান্ন বিতরণের কাল্পনিকতা হঠাৎ ধরা পড়িয়া যাওয়ায় এক করুণ-রসাত্মক প্রহসনের সৃষ্টি হইয়াছে ; কিন্তু এই নির্দোষ, প্রীতিমধুর প্রতারণার মৌলিক প্রেরণাটুকু অব্যাখ্যাত রহিয়া গিয়াছে। রাসুর বঞ্চিত জীবনের অপূর্ণ সাধ, স্নেহশীতল পরিচর্যার জন্য অতৃপ্ত লোলুপতা কেন এই তির্যক্ সুড়ঙ্গ-পথ বাহিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—লেখক এই স্বাভাবিক কৌতূহলের কোন সমাধান চেষ্টা করেন নাই। এই সমস্ত গল্পগুলির ভিতরে লেখকের হাস্যরস প্রহসনের অমার্জিত আতিশয্য ছাড়াইয়া সূক্ষ্ম, মার্জিতরূপ গ্রহণ করিয়াছে ও জীবনের গভীরতর বিকাশের সহিত সম্পর্কিত হইয়া খাঁটি humourএর পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে।

গভীরসুরে লেখা গল্পগুলির মধ্যে 'ননীচোরা', 'প্রশ্ন', 'মাতৃপূজা' ও 'আশা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইগুলিতে লেখকের কাব্য-সৌন্দর্য-সৃষ্টির ক্ষমতা চমৎকারভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। 'ননীচোরা' গল্পে বৈষ্ণব ভক্তিবিহ্বলতা, ভগবানকে শিশুরূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাকে মাতৃস্নেহের অজস্রধারায় অভিষিক্ত, ও উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল সেবা-পরিচর্যার নিবিড় বাহু-বেষ্টনীতে বক্ষোলগ্ন করার একাগ্র সাধনার সুন্দর বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। সময় সময় ঘরের দুরন্ত শিশু ভগবানের প্রতি উৎসর্গিত নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহারই মধুর লীলা, চপল ক্রীড়াভিনয় প্রকটিত করে ও মুহূর্তের জন্য উভয়ের অভিন্নত্ব বিদ্যুৎ-ঝলকের ন্যায় অনুভূতিতে প্রতিভাত হয়। 'প্রশ্ন' গল্পে যে সমস্যা আলোচিত হইয়াছে তাহা অধ্যাত্মসাধনার জগতে সুপরিচিত। স্নেহ-প্রেম-সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি স্বাভাবিক বৃত্তির নিরোধ মোক্ষলাভের প্রকৃত পন্থা কি না এই প্রশ্ন চিরকাল ধরিয়া মুক্তি-প্রয়াসী চিত্তকে মথিত করিয়া আসিতেছে এবং অভিজ্ঞতা বরাবরই এই ধারণার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছে। সুতরাং গল্পটির উৎকর্ষ প্রশ্নের মৌলিকতায় নহে ; তপোবনের প্রাকৃতিক প্রতিবেশ-রচনা, বৌদ্ধযুগের চিন্তাধারার সার্থক রূপায়ন ও সর্বোপরি চারুদত্তার গিরিনির্ঝরের মত মুক্ত, আনন্দ-চঞ্চল প্রকৃতির পরিকল্পনায়। ভাষা ও ভাবের কাব্যসমৃদ্ধির দিক দিয়া গল্পটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে। 'মাতৃপূজা' বাঙ্গালীর কুখ্যাত দলাদলিপ্রিয়তা তাহার সর্বপ্রধান উৎসব দুর্গা-পূজাকেও কেমন করিয়া দক্ষযজ্ঞে পরিণত করিতে পারে তাহার মর্মান্তিক উদাহরণ। এই পুণ্য উৎসবের প্রহসনান্ত পরিণতি মরণপথযাত্রী সান্ন্যাল মহাশয়ের বুকে যে নিদারুণ শেলাঘাত হানিয়াছে তাহার বেদনা পাঠকের মনেও সংক্রামিত হয়।

ভাবাবেগের দিক্ দিয়া যেমন 'রাণুর প্রথম ভাগ'-এর শ্রেষ্ঠত্ব, তেমনি কলাকৌশলের দিক্ দিয়া 'আশা' গল্পটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই গল্পে লেখক বিচিত্র দক্ষতার সহিত, অভিনব আবেষ্টনে ভৌতিক শিহরণ জাগাইয়াছেন। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে জনহীন সহরতলী, সদ্যরোগমুক্ত তরুণ কবির শিরায় শিরায় প্রাণচঞ্চলতার প্রবল উচ্ছ্বাস, ধরণীর পরিচিত রূপের উপর মায়াময় স্বপ্নসৌন্দর্যের আরোপ, প্রতিবেশীর রুদ্ধদ্বার, প্রতীক্ষাস্তব্ধ গৃহ, হানা বাড়ির জনশ্রুতি, প্রণয়োন্মুখ চিত্তে অপ্রাকৃত কল্পনার ভ্রান্তি—এই সমস্ত মিলিয়া অতিপ্রাকৃতের এক আদর্শ পটভূমিকা রচনা করিয়াছে। এই সুকৌশলে রচিত প্রতিবেশে অব্যবহৃত পালঙ্কে আলো-ছায়ার খেলা

স্বপ্নপ্রবণ চিত্তে দৃষ্টি-বিভ্রম জন্মাইয়া এক অলক্তকরঞ্জিতচরণা, সুখ-শায়িতা সুন্দরীর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহার উপর, যেমন এক দীপশিখা হইতে আর এক প্রদীপ জ্বালাইয়া লওয়া হয়, তেমনি মৃত দুহিতার প্রত্যাবর্তনের আশা-মরীচিকায় উদ্‌ভ্রান্ত, উৎকট অস্বাভাবিক প্রতীক্ষায় একাগ্রচিত্ত, বৃদ্ধদম্পতির মনোবিকার এই মোহগ্রস্ত তরুণের মনে সঞ্চারিত হইয়া তাহার সংশয়ান্দোলিত প্রত্যাশাকে স্থির প্রতীতিতে পরিণত করিয়াছে। এই গল্পগুলি হাস্যরসিকতার সংকীর্ণ সীমার বহির্ভূত বৃহত্তর ক্ষেত্রে লেখকের শক্তি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পরিচয় দেয়।

বিভূতিভূষণের সদ্যপ্রকাশিত দুইটি গল্প-সংগ্রহ 'হৈমন্তী' (জুলাই, ১৯৪৪) ও 'কায়কল্প' (অক্টোবর, ১৯৪৪) তাঁহার সাহিত্যিক উৎকর্ষকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এই দুইটি গ্রন্থে কয়েকটি নূতন হাস্য-প্রস্রবণ উন্মুক্ত হইয়াছে। 'আবু হোসেন'-এ দরিদ্র লেখকের লক্ষপতি হইবার স্বপ্ন ক্ষণিক বাস্তবরূপ-পরিগ্রহের মধ্য দিয়া নানা কৌতুকাবহ বৈপরীত্য-সৃষ্টির উপায় হইয়াছে—অফিসের বড়বাবু হইতে অবজ্ঞাশীল সম্পাদক পর্যন্ত যে সমস্ত উৎপীড়কের দল লেখকের আত্মসম্মানবোধের অমর্যাদা ঘটাইয়াছে, লেখক এই স্বপ্নের মধ্যে তাহাদের বিরুদ্ধে সঞ্চিত প্রচ্ছন্ন আক্রোশ মিটাইবার সুযোগ পাইয়াছেন। 'চ্যারিটি-শো', 'ফুটবল লীগ' ও 'ভক্ত' এই তিনটি গল্পে ফুটবল ও নাট্যাভিনয়ের প্রতি অতিরিক্ত নেশা তরুণ সমাজে যে কৌতুকাবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতেছে তাহারই হাস্যরসাত্মক আলোচনা। 'ভক্ত' গল্পটির মৌলিকতা সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য—এক চিত্র-তারকার (film-star) অতর্কিত উপস্থিতিতে কলিকাতার অদূরবর্তী পল্লীগ্রামের কিশোর-সম্প্রদায়ে যে কিরূপ হুলস্থূল ও চাঞ্চল্য জাগিয়াছে তাহাই সরসভাবে বর্ণিত হইয়াছে। চারিশত বৎসর পূর্বে ইহাদের পূর্বপুরুষেরা কোন দেবীর সশরীরে আবির্ভাবে যেরূপ সোৎকণ্ঠ ভক্তি-বিহ্বলতায় ও অসম্ভব সংঘটনের রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত, বর্তমান ক্ষেত্রে ছেলেদের ভাব-গদ্‌গদ বিমূঢ়তা যেন তাহারই আধুনিক সংস্করণ। হৃদয়-বৃত্তি সনাতন, ইহার পাত্র যুগে যুগে পরিবর্তনশীল। 'কালস্য গতি' গল্পে বোমা-বিভীষিকা শিশুর খেয়ালী মনে এক নূতন ধরণের খেলার কৌতুকমণ্ডিত হইয়া হাস্যরসের বিষয় হইয়াছে—ধ্বংসলীলার অনিয়ন্ত্রিত প্রচণ্ডতা নিজ আতিশয্যের জন্যই যেন শিশুর খেলাঘরের যথেচ্ছ, দায়িত্বহীন ভাঙ্গা-চোরার পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। প্রলয়ের সহিত মহাকালের তাণ্ডবনৃত্যের উপমা এই একই সম্বন্ধের দ্যোতক। ভয়াবহ সম্ভাবনার মধ্যে হাস্যরসের এই উপাদানের আবিষ্কার বিভূতিভূষণের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিকতার নিদর্শন। 'কায়কল্প'-এ ঘটনার অতিরঞ্জনের মধ্য দিয়া মানবমনের এক চিরন্তন প্রবণতা হাস্য ও করুণরসে মাখামাখি হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। নাতিনীর বিবাহ উপলক্ষে বৃদ্ধা পিতামহীর অর্ধশতাব্দীসুপ্ত যৌবনাবেশ সলজ্জ কুণ্ঠার সহিত আত্মসচেতন হইয়াছে। 'কালিকা' গল্পে 'গেছো মেয়ের' পরিকল্পনা ঠিক নূতন নহে; কিন্তু তাহার দুঃসাহসিকতার সহিত সরল ধর্মবিশ্বাস মিশিয়া তাহাকে ডাকাতি-প্রতিরোধ ব্যাপারে প্রধানা নায়িকার গৌরব অর্পণ করিয়াছে। ঘটনার অবিশ্বাস্যতা ঢাকা দিবার জন্য লেখককে অন্ধবিশ্বাসপ্রবণ সুদূর অতীতে পটভূমিকা রচনা করিতে হইয়াছে। অন্ধকারে কালিকামূর্তি-প্রত্যক্ষকারী ডাকাত-সর্দারের ভক্তিবিমূঢ় ভাবটি চমৎকার চিত্রিত হইয়াছে।

এই গল্পসংগ্রহ-গ্রন্থদ্বয়ে 'আর্ট', 'মানুষ' ও 'হৈমন্তী' এই তিনটি গল্প শ্রেষ্ঠ। প্রথম গল্পটিতে প্রৌঢ় বয়সে মোহভঙ্গের ফলে মানুষ কিরূপ পরসম্বন্ধে উদাসীন ও আত্মকেন্দ্রিক

হইয়া পড়ে এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে একটি চমৎকার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। নায়কের অপাত্রন্যস্ত বদান্যতা প্রতিহত ক্ষেপণাস্ত্রের ন্যায় তাহার আত্মপ্রসাদে মর্মান্তিক আঘাত হানিয়া এক উপহাস্য অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষ যত রকমে ঠকিতে পারে দান করিয়া লাঞ্ছিত হওয়া তাহার সর্বাপেক্ষা গ্লানিকর প্রকারভেদ। সিংহাসন-প্রার্থীর ধূলিসাৎ হওয়ার মত এই অপ্রত্যাশিত পরিণতি আমাদের মনে একটা প্রবল হাসির হিল্লোল বহাইয়া দেয়। 'মানুষ' গল্পে অন্ধভিখারী ও ফেরিওয়ালা অনাথ বালকের পরস্পরের প্রতি স্নিগ্ধ সম্পর্ক অতি সহজে অথচ অনিবার্যভাবে নায়কের মনে মানুষের প্রতি লুপ্ত বিশ্বাসকে ফিরাইয়া আনিয়াছে। 'বসন্তে' যেমন প্রেমের মদির বিহ্বলতার সার্থক প্রতিবেশ রচিত হইয়াছিল, 'হৈমন্তী' গল্পে তেমনি হেমন্ত-অপরাহ্নের দ্রুত-বিলীয়মান অস্তরাগের মধ্যে প্রৌঢ়জীবনে চরম ব্যর্থতার আকস্মিক অনুভূতি এক উদাস-করুণ আবহাওয়া বিস্তার করিয়াছে। এই সোণালি বর্ণপ্লাবন পরিচিত জগতের উপর যে মায়াময় প্রলেপ মাখাইয়া দিয়াছে তাহাতে স্মৃতির বহুদিন-রুদ্ধ দ্বার-গুলি যেন হঠাৎ খুলিয়া গিয়াছে, জীবন-বিচারের এক নূতন মানদণ্ড সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। সুস্থ, সার্থক দাম্পত্যজীবনের প্রতীক্ স্বরূপ এক সাঁওতাল-দম্পতি নায়কের কাজের নেশায় অভিভূত, ভাবাবেশবর্জিত জীবন-যাত্রার এক প্রকাণ্ড ফাঁক ও অভাব-বোধকে উন্মেষিত করিয়াছে। ধনেমানে, সফলতার আত্মপ্রসাদে নিরেট করিয়া গাঁথা জীবনের এই ফাঁক হইতে উদ্ভূত করুণ দীর্ঘশ্বাস সমস্ত জীবনের রং বদলাইয়া দিয়াছে। প্রথম যৌবনের উপেক্ষিত, স্বল্পায়ু প্রণয়াবেশের স্মৃতি নায়কের মানস আকাশকে হেমন্ত অপরাহ্নের আকাশের মতই গোধূলি-চ্ছায়ার পূর্বগামী ক্ষণিক বর্ণসমারোহে রঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছে।

বিভূতিভূষণ হাস্যরসিক লেখকদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ গল্পে পরিকল্পনার সরসতার সহিত আলোচনার শুচিতা ও সংযম মিলিত হইয়াছে। তাঁহার মন্তব্য ও গল্প বলিবার ভঙ্গীর মধ্যে একটি সহজ, আতিশয্য-বর্জিত রসিকতার সুর সর্বত্র পরিস্ফুট। ইহা ছাড়া তাঁহার সুকুমার সৌন্দর্যবোধ ও সূক্ষ্ম পরিমিতি-জ্ঞান তাঁহার রচনাগুলিকে অনবদ্য শিল্পসুষমায় মণ্ডিত করিয়াছে। হাসির গল্প ছাড়াও গভীর রসাত্মক গল্প-রচনাতেও তিনি প্রশংসার্হ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। প্রতিবেশ রচনা ও বিশেষ রকমের ভাব ফুটাইয়া তোলা বিষয়েও তাঁহার নৈপুণ্য অসাধারণ।

(১৩)

'নীলাঙ্গুরীয়' (আগষ্ট, ১৯৪২) বিভূতিভূষণের প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। এই উপন্যাসে প্রেমের ঘৃণা-ও-আকর্ষণ মিশ্রিত রহস্যময় দ্বৈতভাব বিশ্লেষণের চেষ্টা হইয়াছে। উপন্যাসের সর্বত্র মননশীলতা, সূক্ষ্মদর্শিতা, ও ঘটনাবিন্যাস ও কথোপকথনের সযত্ন নিয়ন্ত্রণের চিহ্ন পরিস্ফুট। লেখক কোথাও হাল ছাড়িয়া দিয়া স্রোতে আত্মসমর্পণ করেন নাই, কোথাও শিথিলতা বা আকস্মিকতার প্রশ্রয় দেন নাই—এক অতন্দ্র, সদাসক্রিয় সচেতনতা চিত্রের প্রত্যেকটি রেখাকে, মন্তব্যের প্রত্যেক সূক্ষ্ম ইঙ্গিতকে অভ্রান্তভাবে গভীর ভাবগত ঐক্যের কেন্দ্রাভিমুখী করিয়াছে। বাঙ্গালা উপন্যাসের অনিয়ন্ত্রিত অজস্রতার মধ্যে এই কঠোর পরিমিতিবোধ ও অস্খলিত লক্ষ্যানুবর্তন উচ্চাঙ্গের মননশক্তি ও কলাকৌশলের পরিচয় দেয়।

গ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়—আভিজাত্য-গৌরবশীলা ব্যারিস্টার-দুহিতা মীরার মনে দরিদ্র গৃহশিক্ষক শৈলেনের প্রতি অনিবার্য প্রণয়োন্মেষ, প্রেম ও বংশাভিমানের মধ্যে প্রবল বিরোধ। মীরার আচরণের অসংগতি, উহার খামখেয়ালী অস্থিরমতিত্ব, আত্মসমর্পণ ও বিদ্রোহ, ও শেষ পর্যন্ত মর্যাদার মিথ্যা মোহের নিকট প্রেমের অস্বীকৃতি এই বিরোধের বিভিন্ন স্তর নির্দেশ করে। অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রটি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইলেও বিষয়টি মৌলিকতার দাবী করিতে পারে না। কিন্তু এত সূক্ষ্ম ও অন্তর্ভেদী আলোচনা সত্ত্বেও মীরার প্রকৃতি-রহস্যটি পাঠকের নিকট অনবগুণ্ঠিত হয় না। তাহার মাতা অনতিক্রম্য বংশ-প্রভাব-মূলক যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা আমাদের কৌতূহল-চরিতার্থতার পক্ষে অপ্রচুর। বোধ হয় ইহার একটা কারণ এই যে, সমস্ত ব্যাপারটি শৈলেনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচিত হইয়াছে—মীরার মানসচিত্রটি আত্মবিশ্লেষণের পূর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত হয় নাই। কাজেই শৈলেনের নিকট যেমন, পাঠকের নিকটেও ঠিক সেইরূপ, সে শেষ পর্যন্ত দুরধিগম্য প্রহেলিকা রহিয়া গিয়াছে। লেখক নিজে তাহার চরিত্র-বিশ্লেষণের দুরূহ ভার গ্রহণ করেন নাই; শৈলেনের অর্ধবিমূঢ় উপলব্ধি ও বিহ্বল মানস প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়াই তাহার অসম্পূর্ণ পরিচয় অস্পষ্টভাবে ফুটিয়াছে বলিয়া আমাদের একটা অতৃপ্তি থাকিয়া যায়।

মীরার সহিত তুলনায় সৌদামিনীর সহিত শৈলেনের সম্পর্কটি সুস্পষ্ট ও চিত্তাকর্ষক। এক হিসাবে মীরার প্রতি শৈলেনের আকর্ষণ অমূল তরুর ন্যায়; ইহার অতর্কিত আবির্ভাবের পিছনে কোন পূর্বসূচনার অঙ্কুর নাই; ইহা কোন মধুর-স্মৃতি-বিজড়িত লীলাভূমি হইতে রস আকর্ষণ করে নাই। শৈলেনের ও সদুর পরস্পরের প্রতি মনোভাব বাল্য সাহচর্যের গভীর স্তরে মূল বিস্তার করিয়াছে, কৈশোর স্মৃতির সমস্ত মাধুর্য, জন্মভূমির প্রতি ধূলিকণার নিবিড় মোহ ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিত হইয়াছে। বঞ্চিত জীবনের প্রতি সহানুভূতি, বন্ধুর অনুযোগ-পূর্ণ আবেদন, প্রীতি-সেবা-আনন্দে গঠিত এক আদর্শ পরিবারের নীরব আকুতি, পল্লী-মাতার সস্নেহ আমন্ত্রণ—এই সমস্তই এই সম্বন্ধের চারিদিকে ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে। ইহা ব্যতীত, সদু নিজেও আপনার সহজ, সরল দাবী লইয়া, আমাদের নিতান্ত পরিচিত ও সহজবোধ্য; তাহার স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত জীবন-প্রবাহ মীরার ন্যায় কোন অদৃশ্য জোয়ার-ভাঁটার নিয়ন্ত্রণাধীন নহে, কোন দুর্বোধ্য বাধার ঘূর্ণীপাকে আবর্তিত নহে। নৈরাশ্যের অভিঘাতে তাহার অভাবনীয় প্রতিক্রিয়া, তুলসী-মঞ্চের স্নিগ্ধ দীপটির জ্বালাময়ী উল্কা-শিখায় পরিবর্তন তাহার বলিষ্ঠ, বেগবান্ প্রকৃতির স্বাভাবিক, এমন কি অনিবার্য স্ফুরণ। তথাপি এই সম্বন্ধে প্রেমের রহস্যময় জটিলতার পূর্ণবিকাশ হয় নাই, কেননা অন্ততঃ এক পক্ষে ইহা স্নিগ্ধ সমবেদনা ও কর্তব্যনিষ্ঠার পর্যায় ছাড়াইয়া যায় নাই।

উপন্যাস মধ্যে সর্বাপেক্ষা গভীর উপলব্ধির বিষয়, অপর্ণা দেবীর চরিত্র। পুত্র সম্বন্ধে তাঁহার নিদারুণ আশাভঙ্গ ও স্বামীর সহিত আদর্শ-বৈষম্য তাঁহাকে এক শোকাচ্ছন্ন, স্বপ্নভাষী মহিমায় আবৃত করিয়াছে, তাঁহার চারিদিকে এক সম্ভ্রমপূর্ণ, অনুল্লঙ্ঘনীয় অন্তরাল সৃজন করিয়াছে। পুত্রহারা বৃদ্ধা ভুটানীর প্রতি উদ্বেলিত সমবেদনার আতিশয্য, তাঁহার নিজের জীবনে অপরিতৃপ্ত পুত্রস্নেহের অসুস্থ মনোবিকারে পরিণতির কাহিনী ভয়াবহরূপে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। তাঁহার আত্মসমাহিত নির্লিপ্ততা পরিবারের প্রত্যেকের সহিত সম্পর্কে—স্বামীর প্রতি

ঔদাসীন্তে, মীরার দ্বৈতভাবের শিথিল প্রশ্রয়দানে ও তরুর শিক্ষাব্যবস্থার চলচ্চিত্ততায়—অভিব্যক্ত হইয়াছে। এক পুত্রের বাগ্‌দত্তা বধূ সরমার প্রতি একটা অস্বস্তিপূর্ণ মমত্ববোধ তাঁহার জীবনের সর্বব্যাপী রিক্ততার মধ্যে একবিন্দু শ্যামলতার স্পর্শ। কিন্তু এই সবুজের ছোপটুকুও অন্তরের অশ্রুসজলতারই বহিঃপ্রকাশ। উপন্যাসটি প্রেমের রহস্যোদ্ভেদ অপেক্ষা পূর্বস্মৃতিমন্থনের তন্ময়তায় অধিকতর সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। মীরার দ্বৈতভাবের ঘটনামূলক বিবৃতি মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যার দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। গ্রন্থের আসল আকর্ষণ পল্লীজীবনের স্মৃতি-সৌরভাকুল আবেদনের চমৎকার কাব্যাভিব্যক্তি। কলিকাতার যান্ত্রিক জীবনযাত্রার মূল প্রেরণা কি তাহা ধরা পড়ে না, কিন্তু অনিলের পরিবারে তাহার স্ত্রী অম্বুরীব প্রভাব যে কেন্দ্র-শক্তি তাহা নিঃসংশয় অনুভবের বিষয়। গৌণ চরিত্রের মধ্যে অম্বুরীর আদর্শ পতিপরায়ণতার মধ্যে একমাত্র ছিদ্র—সতুকে ঘরে স্থান দিতে মৌখিক সম্মতির পিছনে নীরব বিদ্রোহ—তাহার বাস্তবতারই নিদর্শন। ইমামুলের হাস্যকর, অথচ করুণ আত্ম-বঞ্চনা ব্যর্থ প্রেমের একটা প্রকারভেদ হিসাবে গ্রন্থের ভাবগত ঐক্যকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের ব্যঙ্গাত্মক চিত্র মামুলি ও বাহির হইতে আঁকা। কিন্তু ইহার চটুল সরসতা ও কৃত্রিম শিষ্টাচারের সহিত বৈপরীত্যে শৈলেনের বলিষ্ঠতর প্রকৃতি ও তীক্ষ্ণতর ব্যক্তিত্ব আরও ফুটিয়াছে। 'নীলাঙ্গুরীয়' উপন্যাস একেবারে প্রথম শ্রেণীর না হইলেও, ইহার মধ্যে লেখকের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হওয়ার যথেষ্ট উপাদান আছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

(১)

উপন্যাস-সাহিত্যে নূতন পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য প্রবর্তনের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। নরেশ-চন্দ্রের উদ্ভাবনী ও সৃষ্টিশক্তি সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে—তাঁহার রচিত উপন্যাসের সংখ্যা বোধ হয় গণনায় প্রথম স্থান অধিকার করে। তাঁহার প্রথম-রচিত উপন্যাসগুলিতে তিনি যৌন ও অপরাধতত্ত্ববিশ্লেষণকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়াছেন। উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসের যে অপরিহার্য দুর্বলতা তাহা এই সমস্ত উপন্যাসে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। পাপ বা যৌন আকর্ষণের তথ্য আবিষ্কার সম্বন্ধে লেখক এতই নিবিষ্টচিত্ত যে, চরিত্রসৃষ্টি তাঁহার নিকট গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার সৃষ্ট নর-নারী কেবল মাত্র তত্ত্বের বাহন হইয়াছে, রক্তমাংসের সজীব মূর্তি হইয়া উঠে নাই। ইহার উপর অতর্কিত ঘটনা-সমাবেশ ও অসম্ভব রকমের দ্রুত চরিত্র-পরি-বর্তন ইহাদের বাস্তবতাকে আরও ম্লান করিয়া দিয়াছে। সামাজিক উপন্যাসের সূক্ষ্ম ও তথ্য-বহুল বিশ্লেষণের সঙ্গে রোমান্স-সুলভ অতর্কিত পরিবর্তনের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণই এই উপন্যাস-গুলির প্রধান ত্রুটি। তাঁহার 'শুভা' উপন্যাসে (১৯২০) নায়িকার জীবন-কাহিনী ইহার সুন্দর উদাহরণ। তাহার জীবনে যত প্রকারের অভাবিত ঘটনাপরম্পরা কল্পনা করা সম্ভব সমস্তই পুঞ্জীভূত হইয়াছে। তাহার স্বামী-গৃহত্যাগ, স্বাধীন জীবনস্পৃহা, নাট্য-ব্যবসা অবলম্বন, প্রণয়া-কাঙ্ক্ষা, সমাজ-সেবার ব্রতগ্রহণ এ সমস্তই যেন অতর্কিত বন্যাপ্রবাহের মত তাহার জীবনে হুড়মুড় করিয়া আসিয়া পড়িয়াছে; তাহার নিজের ব্যক্তিত্ব এই ঘটনাস্রোতে গা ভাসাইয়া পরিবর্তনের তট হইতে তটান্তরে মুহূর্তের জন্য লগ্ন হইয়াছে। তাহার জীবনে সার্থকতালাভের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ লইয়া যথেষ্ট আলোচনা ও আত্মজিজ্ঞাসার অবতারণা হইয়াছে; কিন্তু ইহার সহিত জীবনের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে নাই—এই চিন্তাধারা জীবন-স্রোতের উপরিভাগে শৈবালপুঞ্জের মতই অসংসক্ত রহিয়াছে। তাঁহার আর একটি উপন্যাসের নায়িকা গোপার স্বামিত্যাগ ও প্রণয়ীর নিকট আত্মসমর্পণ এই প্রকারের লঘু ক্ষণস্থায়ী খেয়ালের তাগিদেই সম্পাদিত হইয়াছে। মোহ ও মোহভঙ্গ উভয়ই তুল্যরূপ অতর্কিততার লক্ষণাক্রান্ত। তাঁহার 'মেঘনাদ' উপন্যাসে মনোরমার চরিত্রে জন্ম-অপরাধীর স্বাভাবিক পাপপ্রবণতার চিত্রাঙ্কণের চেষ্টা হইয়াছে। এই চিত্রে বিজ্ঞান-সম্মত বিশ্লেষণ ও মৌলিকতা আছে, কিন্তু তদনুরূপ অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা নাই।

যে সমস্ত উপন্যাসে ঠিক উদ্দেশ্যমূলক আদর্শ অনুসৃত হয় নাই, সেগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক সাফল্যের দাবী করিতে পারে। পাঠকসমাজে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই খুব সুপরিচিত নয়;

কিন্তু তথাপি উদ্দেশ্যরূপ নাগপাশের বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া তাহাদের উপন্যাসোচিত গুণ অধিকতর স্ফূর্ত হইবার অবকাশ পাইয়াছে। 'লুপ্তশিখা' উপন্যাসে পতিতা নারী মালতীর যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহাতে আদর্শবাদের খাতিরে বাস্তবতার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই। অনাথ বালক বটুর প্রতি তাহার সহানুভূতি ও ভ্রাতৃস্নেহ তাহার চরিত্রের সুকুমার দিকের অভিব্যক্তি; আবার তাহার গণিকাবৃত্তি ও মদ্যাসক্তির দিক্‌টাও উপেক্ষিত হয় নাই। বটুর সম্মুখে তাহার পাপাচরণের কোন উল্লেখে তাহার সলজ্জ সংকোচ, বটুর সহিত কথাবার্তায় ও ব্যবহারে তাহার জীবনের ঘৃণিত দিক্‌টার সম্পূর্ণ বিলোপ-চেষ্টা—ইহার চিত্রটি সুন্দর হইয়াছে। তাহার চরিত্রের ক্রমিক অবনতি, তাহার সুকুমার সংকোচ ও শালীনতার অল্পে অল্পে তিরোভাব, একটা অসংকোচ ইতরতার প্রবলতর প্রকাশ, আর এই দ্রুত অধঃপতনশীলতার মধ্যে উদাস দীর্ঘশ্বাসের ভিতর দিয়া লুপ্তপ্রায় চরিত্রগৌরবের ক্ষণিক আভাস—এই পরিবর্তন-কাহিনীর স্তরগুলি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের সাহায্যে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। মালতীর শেষ জীবনের কদর্য বীভৎস আত্ম-প্রকাশ এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিতগুলির স্বাভাবিক পরিণতি।

'অভয়ের বিয়ে' ও 'তারপর' (১৯৩১) একটি যুগ্ম উপন্যাস। ইহাতে সাংসারিক জ্ঞানহীন, আত্মভোলা অথচ প্রগাঢ় পণ্ডিত অভয়ের সহিত মায়া ও সরমা দুই বোনের সম্পর্ক-জটিলতার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। সরমা শেষ পর্যন্ত মায়ার জন্য অভয়ের উপর দাবী প্রত্যাহার করিয়াছে, ও নানারূপ অবস্থা-পরিবর্তনের মধ্য দিয়া মায়ার পরিত্যক্ত প্রণয়ী অজয়কে পতিরূপে বরণ করিয়াছে। ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ কতকটা আছে কিন্তু ঘটনার অভাবনীয়তা বিশ্লেষণ-রেখাকে অস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

'মিলন-পূর্ণিমা'য় সৌরীন ও রেখার মধ্যে প্রণয়সঞ্চার, বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন সমস্তই তুল্যরূপে আকস্মিক। 'নিষ্কণ্টক'-এ অলক ও অঞ্জলির দাম্পত্য-বিরোধের কাহিনী মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য হইলেও ঔপন্যাসিক রসের দিক্ দিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। অঞ্জলির বালিকাসুলভ সারল্য পরিজনের স্তাবকতায় বিকৃত হইয়া কিরূপে কঠিন ঔদাসীন্যে রূপান্তরিত হইয়াছে; অলকের নির্দোষ প্রেম দীর্ঘ প্রতিকূলতায় ও প্রতিদানের অভাবে কিরূপে কলুষিত হইয়াছে—ইহার মনস্তত্ত্বমূলক পরিকল্পনা সুদক্ষ কিন্তু রসসৃষ্টির দিক্ দিয়া চিত্রটি অক্ষমতার পরিচয় দেয়। কুন্তলার সহিত অলকের সম্পর্কটি সম্পূর্ণরূপেই অস্পষ্ট ও অস্বাভাবিক হইয়াছে।

'সর্বহারা' (১৯২৯) উপন্যাসে অসীমের বেপরোয়া নাস্তিকতার চিত্রটি সজীব হইয়াছে। লতিকার প্রতি প্রেম-সঞ্চারও লেখকের অভ্যস্ত অতর্কিততাদুষ্ট নহে। শিল্পী-জীবনের সমস্যা বর্ণনাতেও কতকটা অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু হরিচরণের প্রণয়-কাহিনী একেবারেই ফোটে নাই। তাহার বঞ্চিত জীবন সহানুভূতি ও করুণ রসের উদ্রেক করে, কিন্তু প্রেমিক হিসাবে সে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে না।

মোটের উপর নরেশচন্দ্রের 'অগ্নি-সংস্কার' ও 'বিপর্যয়' এই দুই উপন্যাসকেই তাঁহার রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যাইতে পারে। লেখকের তথ্যসমাবেশ ও মনোভাব-বিশ্লেষণের মধ্যে সাধারণতঃ যে কল্পনা-দৈন্য ও ভাব-গভীরতার অভাব অনুভব করা যায়, এই দুইটি উপন্যাসে তাহার আংশিক ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। 'বিপর্যয়'-এ বিরোধের চিত্রটি অতি-বিস্তৃতির জন্য

কতকটা তীব্রতা হারাইয়াছে—মনোরমার কঠোর বৈধব্য-ব্রত পালন, আত্মনিগ্রহের মধ্য দিয়া যৌবন-চঞ্চলতার অনুভব ও এই নবজাত আকাঙ্ক্ষার বিবাহে পরিতৃপ্তি-সাধন; আর অনীতার ভোগৈশ্বর্যপূর্ণ জীবনের কঠোর বৈরাগ্য ও কোমল বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্ব-উপলব্ধির মধ্যে পরিসমাপ্তি—এই দুইটি চিত্র পরিবর্তন-সম্ভাবনীয়তার দুই বিপরীত সীমা স্পর্শ করিয়াছে। এই উভয়ের মধ্যে মনোরমার পরিবর্তন-কাহিনীটি পূর্ণতর। অনীতার জীবন একটা আকস্মিক আঘাতে তাহার পূর্বপ্রণালী ত্যাগ করিয়া এক অভিনব খাতে প্রবাহিত হইয়াছে, সুতরাং তাহার রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলার মধ্যে নিজ জীবনাদর্শ খুঁজিয়া পাওয়ার ব্যাপারটি খুব সন্তোষজনক ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্টীকৃত হয় নাই। তা ছাড়া ঘাত-প্রতিঘাতের বাহুল্যের জন্য মনোরমা ও অনীতার ব্যক্তিত্ব অনেকটা অভিভূত হইয়াছে—তাহাদের সমস্যা তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের কাহিনী যেন যে-কোন দুইটি তরুণীর মানসিক ইতিহাস। নরেশচন্দ্রের অনেক উপন্যাসেই নারীর ধর্মসাধনার ইতিহাস, ধর্মজীবনে শান্তি-লাভের প্রয়াস বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার 'তৃপ্তি' উপন্যাসে মিনতির জীবন-সমস্যা ধর্মমুখীনতার মধ্যে সমাধান খুঁজিয়াছে। কিন্তু এই ধর্মজীবনের ব্যাকুল তন্ময়তা আঁকিবার জন্য যে পরিমাণ অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনাশক্তির প্রয়োজন তাহা গ্রন্থকারের আয়ত্তাতীত। এখানে শুধু শুষ্ক বিশ্লেষণ ও তথ্য-সমাবেশ দ্বারা পাঠকের প্রতীতি জন্মান যায় না। ভাষার ব্যঞ্জনা-শক্তির সাহায্যে, পাঠকের কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া, অন্তরের গভীর বিক্ষোভ ও তুমুল আলোড়নকে প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত করিতে হইবে। যে গুণে বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্লেষণের সাহায্য না লইয়া নগেন্দ্রনাথের অনুতাপ ও শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের দৃশ্য আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়াছেন, সেই কল্পনার ইন্দ্রজাল ও কবিত্বের আবেশ এরূপ ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয়। ইহার অভাবের জন্যই চিত্রগুলি ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়াছে।

যেখানে এরূপ ঐশ্বর্যময়ী কল্পনার প্রয়োজন নাই—যেমন ইন্দ্রনাথ ও সরযুর দাম্পত্য জীবনের বর্ণনায়—সেখানে লেখক অনেকটা সফলতা লাভ করিয়াছেন। 'অগ্নিসংস্কার' উপন্যাসটি ঠিক এই কারণেই আপেক্ষিক উৎকর্ষলাভের সমর্থ হইয়াছে। ইহার সমস্যাটি কেবলমাত্র বুদ্ধিগত বিশ্লেষণের দ্বারা ফুটাইয়া তোলা যাইতে পারে। সত্যেশ ও ইলার মধ্যে যে একটি শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কারগত ব্যবধান ছিল তাহা বিবাহের প্রথম মোহ কাটিয়া যাইবার পর গভীরভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইলা তাহার কুমারীহৃদয়ের বিশুদ্ধ প্রণয়ের আকর্ষণে ও কতকটা পিতার ইচ্ছানুবর্তনের জন্য সত্যেশকে বিবাহ করিয়াছে—কিন্তু ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের চটুল বিলাসপ্রিয়তা ও স্বেচ্ছাচারমূলক আদর্শের প্রভাব হইতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপ বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই। সেইজন্য লোকলজ্জার ভয়ে, নিজ পারিবারিক আবেষ্টনের বিরোধিতা করিবার সৎসাহসের অভাবে সে স্বামীর প্রতি ভালবাসার উচ্ছ্বসিত প্রকাশকে নিরোধ করিয়াছে, স্বামীর নৈতিক আদর্শের অনুবর্তনে অবহেলা দেখাইয়াছে। সত্যেশের অভিমানী অথচ নিজ আদর্শে অটল-স্থির মন ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া ক্রমশঃ বিরাগের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। এই বিরোধের বিস্তৃতি ও ক্রমপরিণতির আলোচনা বেশ সুলিখিত ও মনস্তত্ত্বানুমোদিত হইয়াছে। ইলা ও সত্যেশ এই দুয়ের মধ্যে কেহই আমাদের সহানুভূতি হারায় নাই। অবশ্য ইলার অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত খুব সহজেই সম্পাদিত হইয়াছে। কেননা স্বামীর সহিত তাহার বিরোধ আন্তরিক

নহে, কতকগুলি বহিঃপ্রভাবের ফল মাত্র। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলিও সুপরিকল্পিত ও সজীব। মোটের উপর এই উপন্যাসখানি গঠন-কৌশল ও সংগতি-জ্ঞানের দিক্ দিয়া ও ইহার অন্তর্নিহিত সমস্যার সরস আলোচনার জন্য উচ্চস্থান দাবী করিতে পারে।

নরেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলি হইতে তাঁহার তীক্ষ্ণ মানসিকতা ও চিন্তাশীল বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার প্রধান অভাব হইতেছে রসানুভূতি ও ভাব-সঞ্চারের তীব্রতার। তাঁহার অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রগুলির মধ্যে যে পরিমাণ জটিলতা আছে তদনুরূপ ভাবগভীরতা নাই। বিশেষতঃ বর্ণনার সাবলীল ভঙ্গী ও সরস বিস্তার তাঁহার উপন্যাসে অতি দুষ্প্রাপ্য। তাঁহার ঘটনাসমাবেশ যেন শুষ্ক সার-সংকলন বলিয়া মনে হয়; যেন ইহা অতীতের প্রাণহীন পুনরাবৃত্তি, চোখের সামনে যাহা ঘটিতেছে তাহার সুস্পষ্ট, উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি নহে। তাঁহার অগণিত উপন্যাস হইতে এমন কোন দৃশ্যের উল্লেখ করা যায় না, যাহা স্মৃতির উপর উজ্জ্বলবর্ণে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার অবিসংবাদিত চিন্তাশীলতার সহিত যদি অনুরূপ ভাবগভীরতা ও কল্পনা-শক্তির সংযোগ হইত, তবে এই সমন্বয় উপন্যাস-ক্ষেত্রে নব-রাজ্য-প্রতিষ্ঠার গৌরব লাভ করিতে পারিত। বর্তমানে তিনি কেবল কতকগুলি নূতন ইঙ্গিত ও পথনির্দেশের কৃতিত্ব দাবী করিতে পারিবেন। তথাপি এই নূতন ধারা প্রবর্তনের দ্বারা তিনি যে উপন্যাসের সীমা প্রসারিত করিয়াছেন তাহা সর্বতোভাবে স্বীকার্য।

(২)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলি ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁহার 'চোর কাঁটা', 'যমুনা পুলিনের ভিখারিণী', 'দোটানা', প্রভৃতি উপন্যাসকে ঠিক মৌলিক বলা চলে না, তাহাদের উপর বৈদেশিক উপন্যাসের ছায়াপাত হইয়াছে। এই সমস্ত উপন্যাসে তাঁহার অনুবাদে সিদ্ধহস্ততার পরিচয় মিলে। তাঁহার অনুবাদ ঠিক ছত্র ধরিয়া ভাষান্তর নহে, গ্রন্থের পরিবেষ্টনী, চরিত্র, ঘটনা-বিন্যাস সমস্তকেই অতি সুকৌশলে বাঙ্গালী-জীবনের সহিত প্রায় নিশ্চিহ্ন ভাবে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বৈদেশিক গন্ধ যতদূর সম্ভব লুপ্ত হইয়াছে। জীবন সম্বন্ধে মন্তব্য ও সমালোচনার মধ্যেও ঋণ সহজে অনুভূত হয় না, ইহা তাঁহার কম কৃতিত্ব নহে। দুই একটা ঘটনার অস্বাভাবিকতা স্বীকার করিয়া লইলে পাঠকের আর বড় বেশি আপত্তি বা অবিশ্বাসের কারণ থাকে না। 'চোর কাঁটায়' সাধু মল্লিকের বাল্যজীবন বৈদেশিক প্রভাবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—গাঁটকাটার দলের মধ্যেও যে অদ্ভুত নিয়ম-শৃঙ্খলার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা কলিকাতার মাটিতে গজাইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তাহার পলাতক জীবনের অভিজ্ঞতা ও বিবাহের রোমান্সও বাঙ্গালী জীবনের পরিধি অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু মমতা ও পশুপতির গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র, মমতার উদার স্নেহশীলতা ও ক্ষমাপরায়ণতা ঠিক যেন আমাদের নিজের সমাজের কথা। নরেশচন্দ্রের উপন্যাসে যাহার প্রধান অভাব, সেই আবেগপূর্ণ সরস বর্ণনা ও রসানুভূতি চারুচন্দ্রের উপন্যাসে যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

'যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী'তেও বিদেশী কাহিনীকে সুকৌশলে স্বাদেশিকতার ছদ্মবেশ পরান হইয়াছে। মুহূর্ত-দৃষ্ট সুন্দরীর খোঁজে ভবঘুরে জীবন যাপন—সম্পূর্ণ বিদেশ হইতে আমদানী;

বাঙ্গালাদেশের মাটিতে ইহা এখনও শিকড় গাড়ে নাই। ফণীও একজন দুর্দান্ত ইউরোপীয় অভিজাতবংশীয়ের বাঙ্গালী সংস্করণ; তাহার দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর যে লাঞ্ছনা ও অপমান চিত্রিত হইয়াছে, তাহার রং দেশীয় সমাজ-ব্যবস্থায় অপ্রাপ্য। গ্রন্থের যমুনা নদীর সহিত আমাদের দেশের ভাবাসঙ্গ (association) কিছুই নাই, ইহাতে জীবনের যে ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে তাহার জন্ম কোন পাশ্চাত্ত্য দেশের আকাশ-তলে। এই উপন্যাসে বিদেশীর রূপান্তরসাধন অসম্পূর্ণ বলিয়াই ঠেকে। ছদ্মবেশের সমস্ত কারুকার্য আমাদের চক্ষুকে প্রতারিত করিতে পারে না।

'দোটানা' উপন্যাসের সমস্যাটিও বৈদেশিক—হৈমবতীর পদস্খলন ও তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য অশিক্ষিত চিত্রকর গোবর্ধনের সহিত তাহার এক অদ্ভুত সর্তে বিবাহ, সোজা পাশ্চাত্ত্য প্রতিবেশ হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু গোড়ার এই স্বীকার্য বিষয়টি বাদ দিলে অবশিষ্টাংশের রূপান্তর-সাধন-নৈপুণ্য আমাদের প্রশংসা আকর্ষণ করে। হয়ত গোবর্ধনের চরিত্রটি লেখক এই নূতন আবেষ্টনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে পারেন নাই—তাহার মধ্যে আমরা যে সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ ও রুচিসংযমের পরিচয় পাই তাহা আমাদের সমাজে ঐ শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিরল। তাহার অসাধারণ চরিত্র-গৌরব যে অশিক্ষিত শ্রেণীর অনায়ত্ত তাহাই ঠিক অবিশ্বাসের কারণ নহে—অনেক নিরক্ষর, নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে এধরণের ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু তাহার কথাবার্তায় ও সাধারণ ব্যবহারে কোন রুক্ষ কর্কশতা বা স্থূল অপটুতার লেশমাত্র চিহ্ন নাই। তাহার ভাষা ও ব্যবহারের শোভন পরিমিতিই তাহার অবাস্তবতা ধরাইয়া দিতেছে। কিন্তু এই দুইটি বিষয় ছাড়া বাকী সমস্তই প্রায় নিখুঁত হইয়াছে। বংশলোচন একেবারে সম্পূর্ণরূপে আমাদের দেশের লোক, আমাদেব সনাতন সাধনার পক্কতম ফল। তাঁহার সূক্ষ্মতম ইঙ্গিতটুকুও এদেশের আকাশ-বাতাসে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। তাঁহার ব্যথার বুক-ভাঙ্গা, শ্বাসরোধকারী হাসি, তাহার হতাশাপুষ্ট দুঃসাহস আমাদের নিজের জিনিস বলিয়াই আমরা চিনি। হৈমবতীর অন্তর্দ্বন্দ্ব খুব তীব্র উপলব্ধির সহিত বর্ণিত হইয়াছে। তাহার উপাসনার দেবতা তবল গোবর্ধনেব সঙ্গে তুলনায় কেমন করিয়া ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়াছে, তাহাব লঘু-চপল ইতরতা কিরূপে গোবর্ধনেব অটল সত্যনিষ্ঠাব নিকট তিরস্কৃত হইয়াছে তাহার বর্ণনাও খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। অবশ্য তরল ও গোবর্ধনের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রস্তাব আবার উপন্যাসটির বৈদেশিক উদ্ভবের কথা স্মবণ করাইয়া দেয়। শেষ পর্যন্ত হৈমবতীর আত্মহত্যা এই অশ্রান্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সমাধান করিয়া দিযাছে। উপন্যাসটির আর যে ত্রুটি থাকুক না কেন, তীব্র উপলব্ধি ইহার সে দোষের আংশিক ক্ষতিপূরণ করিয়াছে।

'হের-ফের' উপন্যাসটির গল্পাংশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দান বলিয়া লেখক স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার যে উপন্যাসটিকে অনুবাদের পর্যায়ে ফেলা যায় না, তাহারও প্লটের জন্য তিনি অপরের নিকট ঋণী। সে যাহা হউক, এই উপন্যাসটি সম্পূর্ণ বৈদেশিক-প্রভাব মুক্ত ও ইহাতে লেখকের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রজত ও শিশিরের মধ্যে বন্ধুত্ব কি করিয়া নিবিড় হইল ও কেমন করিয়া সাহিত্যিক প্রতিযোগিতার জন্য ইহা এক পক্ষে বিষাক্ত ও বিদ্বেষ-কলুষিত হইয়া উঠিল তাহার বিবৃতি খুব সুন্দর হইয়াছে। রজতের চরিত্রে উদারতার মধ্যে যে একটু আত্মপ্রচার ও গর্ব ছিল তাহাই অনুকূল অবস্থার সাহায্যে অতিমাত্রায় পুষ্ট হইয়া তাহাকে অধঃপতনের দিকে টানিয়াছে। সাহিত্যিক খ্যাতির বিষয়ে তাহার যে সূক্ষ্ম অভিমান ও যশঃস্পৃহা

ছিল সেইখানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তাহার বন্ধুবাৎসল্যের বহিরাবরণ খসিয়া পড়িয়াছে। অবশ্য রজতের অধঃপতনের চিত্রটি একটু বেশি ঘোরাল বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে—তাহার মদ খাওয়া ও বেশ্যাসক্তির যে পরিণতি দেখান হইয়াছে তাহার আকস্মিকত্ব কোন পূর্ব-সূচনার দ্বারা প্রতিহত হয় নাই। শিশিরের দারিদ্র্যাভিমান ও অটল সংকল্প কেমন করিয়া রজতের উচ্ছ্বসিত বন্ধু-প্রীতি এবং সন্ধ্যা ও সুনয়নীর স্নেহাভিষেকে কোমল ও নমনীয় হইয়াছে তাহার চিত্রটি বেশ চমৎকার। শিশিরের বাল্যজীবনের আত্মকাহিনীর মধ্যে যে সংযত ও ঈষৎ ব্যঙ্গপূর্ণ বিষাদের সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহার সুগভীর আন্তরিকতা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে।

কিন্তু এই উপন্যাসে বাস্তব স্তরের সহিত অতি-নাটকীয় (melodramatic) স্তরের একটা অশোভন সম্মিলন হইয়াছে। রজত, শিশির, সন্ধ্যা ও সুনয়নী—ইহারা বাস্তব স্তরের অধিবাসী। বিদ্যুৎ ও তাহাব মাতা ক্ষণপ্রভার মধ্যে এই অতি-নাটকীয় ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। বিদ্যুতের আবির্ভাব ও শিশিরের প্রতি তাহার প্রণয়-সঞ্চার ঠিক বাস্তব-শৃঙ্খলার অধীন নয়, ইহারা প্রতিবেশী রোমান্সের রাজ্য হইতে আমদানি। বিদ্যুৎ কৌতুকময় দৈবের অনুগ্রহ-দান, কৃতিত্বের ন্যায্য পুরস্কার নহে। কাজেই সন্ধ্যা ও সুনয়নীর মত তাহাকে এত জীবন্ত বলিয়া বোধ হয় না। ক্ষণপ্রভার কাহিনীটি একেবারে শূন্যগর্ভ ও অবান্তর—তাহার সংস্পর্শে বিদ্যুতের বাস্তবতা আরও ক্ষীণ হইয়াছে। বিদ্যুতের জন্মকাহিনীতে এই কলঙ্কারোপ গল্পের দিক দিয়া একেবারে নিরর্থক। ইহা শিশিরের ভালবাসার একটা অগ্নি-পরীক্ষা বলিয়া কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু শিশিরের পক্ষে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাহার প্রেমের উপর এমন কোন বিপরীত, বিরুদ্ধ প্রভাব ছিল না যাহার উপর জয়ী হওয়ায় উহার মর্যাদা এক বিন্দুও বাড়িয়াছে। সুলভ রোমান্সের প্রতি আমাদের বাস্তবতা-প্রধান ঔপন্যাসিকদেরও যে একটা অহেতুক আকর্ষণ আছে ইহা তাহারই একটা উদাহরণ মাত্র—বাস্তবের সহিত রোমান্সের একটু খাদ না মিশাইলে আমাদের সাধারণ রুচির বাজারে উপন্যাস যে অচল হইবে এই পরাভবশীল মনোবৃত্তি হইতেই এইরূপ প্রথার উদ্ভব।

'হাইফেন' উপন্যাসটি চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্যাতি বর্ধন করে নাই। মলয় ও মৃদুলার প্রণয়কাহিনী পূর্ব-বাগ্‌দানের রোমান্টিক আবেষ্টনে ইহার গাঢ়তা হারাইয়াছে—এই বাগ্‌দানের অবাঞ্ছিত সহায়তায় ইহার স্বাভাবিক শক্তি স্ফূর্তি লাভ কবিতে পারে নাই। এই পূর্ব নির্দেশের আশ্রয় না লইলে তাহাদের প্রেম স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আরও গৌরবান্বিত হইত। পিতৃআজ্ঞা পালনের কর্তব্যভার মাথায় লইযা এই ভালবাসা যেন নিতান্ত গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। বিলোপের 'নামধেয়-সদৃশ' আত্মবিলোপও বিশেষ লক্ষণীয় হয় নাই, মৃদুলার প্রতি তাহার মৃদু আকর্ষণ বন্ধু-প্রীতির প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। অনন্ত ও আহুতির ব্যভিচারস্পৃহা তাহাদের চরিত্রের দিক্ দিয়া যেমন নিন্দনীয়, লেখকের রুচি ও কলাকৌশলের দিক দিয়া ততোধিক গর্হিত। এমন একটা উৎকট কারণহীন অস্বাভাবিকতার চিত্র আঁকিয়া লেখক উপন্যাসটির অপূরণীয় ক্ষতি করিয়াছেন। মলয়-মৃদুলার দাম্পত্য প্রেম এই একান্ত দুর্বল ও কৃত্রিম প্রতিবন্ধককে প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া নিজেরই পাণ্ডুর রক্তাল্পতার পরিচয় দিয়াছে। মৃদুলার অভিমানে পতিগৃহ ত্যাগ তাহার স্বাভাবিক দ্বিধা-দুর্বল চিত্তের সহিত খাপ খায় না। বিলোপের 'হাইফেন' উপাধি একদিক দিয়া সার্থক হইয়াছে—

উপন্যাসটির মধ্যে তাহার নিজস্ব কোন স্থান নাই; সে কেবল প্রয়োজনাতিরিক্ত একটা সংযোগ-চিহ্ন মাত্র। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে উপন্যাসটি সম্পূর্ণ মৌলিকতার দাবী করিতে পারে তাহাতে তাঁহার অন্যান্য রচনার প্রধান গুণ—তীব্র অনুভবশীলতা—প্রায় সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে।

'মন না মতি' উপন্যাসে ব্রততী ও পলাশের নিবিড় দাম্পত্য মিলনে যে অন্তরায় উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা অপ্রত্যাশিত ও যথেষ্টকারণহীন। উল্কা নিজ নামের মতই রহস্যময়ী—পলাশকে লইয়া তাহার কৌতুক-ক্রীড়ার কোন সঙ্গত হেতু নাই। পলাশেরও অন্যাসক্তি-প্রবণতা তাহার পত্নী-প্রেমের নিবিড়তার বিষয়ে আমাদিগকে সন্দিহান করে। অবশ্য লেখক পলাশের এই অতর্কিত চিত্ত-চাঞ্চল্যের একটা মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন—ব্রততীর মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণই পলাশকে নিজ গোপন লালসা সম্বন্ধে আত্ম-সচেতন করিয়া ইহাকে অঙ্কুরিত হইবার সুযোগ দিয়াছে—কিন্তু এই ব্যাখ্যা আমাদের মনে ধরে না। পলাশ মোহের স্বাভাবিক পিচ্ছিল পথ ধরিয়াই চলিয়াছে, মোহাবিষ্ট অপর লোকের সহিত তাহার কোনই প্রভেদ নাই। মোট কথা, সমস্ত ব্যাপারটাই একটা কৌতুককর ক্ষণস্থায়ী চিত্ত-বিভ্রম বলিয়াই আমাদের কাছে ঠেকে, ইহার মধ্যে কোনরূপ গাম্ভীর্য বা ভাব-গৌরবের লক্ষণ পাওয়া যায় না।

উপন্যাস ছাড়া ছোট গল্প রচনাতেও লেখক সিদ্ধহস্ততার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার 'পঞ্চদশী', 'বরণ-ডালা', প্রভৃতি গল্পসংগ্রহে কয়েকটি গল্প খুব উচ্চ উৎকর্ষের দাবী করিতে পারে।

(৩)

আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে যথেষ্ট কলা-সংযম ও লিপিকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মন্তব্য-বিশ্লেষণে গভীরার্থক চিন্তাশীলতা ও সংক্ষিপ্ত প্রকাশ-ক্ষমতা যুগপৎ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার স্থির, সংযত বুদ্ধি-বৃত্তি সুলভ উচ্ছ্বাস ও ভাব-প্রবণতার দ্বারা সহজে বিচলিত হয় না। কথোপকথনের ধারার মধ্যে সহজ ভদ্রতা, সাবলীল উত্তর-প্রত্যুত্তর-নিপুণতা ও লঘু সরসতা প্রভৃতি গুণ সুপরিস্ফুট—তবে মার্জিত বুদ্ধি ও সুরুচির প্রাধান্যের জন্য ভাব-গভীরতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইঁহার সমস্ত উপন্যাসেই এই ভাবগভীরতার অভাব ইহাদিগকে অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্থান দিয়াছে—emotional crisis বা গভীর-ভাবমূলক চরম পরিণতি বিশেষ কোথাও দৃষ্টি গোচর হয় না।

'শশিনাথ' উপন্যাসেই উপেন্দ্রনাথ প্রথম খ্যাতি লাভ করেন। শশিনাথ, লীলা, সরযূ, বরেন ইহাদের মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের ঘাত-প্রতিঘাত বেশ একটি উপভোগ্য জটিলতার সৃষ্টি করিতেছিল। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে উহাদের পরস্পরের সম্পর্কের যে জটিলতার আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ-কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ লীলা ও শশিনাথের সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া একটি চমৎকার নাটকীয় পরিণতির প্রত্যাশা করা যাইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঘটনাবিন্যাসের ভিতর দিয়া একটা উৎকট আকস্মিকতার ঘূর্ণীবায়ু প্রবাহিত হইয়া এই সমস্ত সূক্ষ্মতর তন্তুজালকে বিপর্যস্ত করিয়া ছিঁড়িয়া দিয়াছে

যাহা হৃদয়ের মৃদুঘাত-প্রতিঘাতমূলক মনস্তত্ত্বকাহিনী হইতে পারিত তাহাকে দৈবের পরিহাসে রূপান্তরিত করিয়াছে। উপন্যাসটিতে উৎকর্ষের নিদর্শন আছে, কিন্তু অপ্রত্যাশিতের অতি-প্রাদুর্ভাব এই উৎকর্ষের স্বাভাবিক স্ফুরণ ব্যাহত করিয়াছে।

'রাজ-পথ' উপন্যাসটি অসহযোগ আন্দোলনের সহিত জড়িত। রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব শুধু যে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না, পরন্তু মনোজগতেও একটা বিপর্যয় ঘটায়, এই তথ্যই এই উপন্যাসে প্রমাণিত হইয়াছে। অসহযোগের ভাব-প্লাবন দুইটি সন্নিহিত হৃদয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, আবার দুইটি সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয় অথচ আকস্মিক পরিচয়-সূত্রে গ্রথিত হৃদয়কে নিবিড় মিলনে বাঁধিয়াছে। সুরেশ্বর ও সুমিত্রার মধ্যে অনুরাগ-সঞ্চার ঠিক সাধারণ সমতল রাজপথের ভিতর দিয়া পরিণতি লাভ করে নাই, একটু আঁকা-বাঁকা বিঘ্ন-বন্ধুর, বিরোধ-বিষম পথেই তাহার প্রবাহ মিলনের সাগর-সঙ্গমে পৌঁছিয়াছে। সুমিত্রার উদ্ধারকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতার মধ্যে তাহার স্বদেশীয়ানার আতিশয্যের বিরুদ্ধে একটা তীব্র আক্রোশ ও বিরুদ্ধতা মিশ্রিত ছিল—বোধ হয় এই বিরুদ্ধতার বেগ-সৃজনকারী বাধা না থাকিলে কৃতজ্ঞতা শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন প্রবাহে, প্রাত্যহিক শিষ্টাচারের বালুভূমিতে আপনাকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করিয়া দিত। জন্মদিনের উপহার ও উৎসব উপলক্ষে সুমিত্রার জীবনে সন্ধিক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই দুই দিনের মধ্যেই তাহার জীবনধারা ও অদৃষ্টলিপি অতীতের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন পথ ধরিয়াছে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তাহার মন বিচিত্র প্রকারের প্রতিক্রিয়ার আঘাতে বিরুদ্ধ শক্তির দ্বারা আবর্তিত হইয়াছে। সুরেশ্বরের প্রতি তাহার মনোবৃত্তি বিরাগ ও উন্মুখতার চরম-প্রান্তসীমার মধ্যে প্রবলভাবে আন্দোলিত হইয়াছে—এবং এক মুহূর্তে ইংরেজি সুট হইতে খদ্দরের শাড়ীতে পরিবর্তন এই আন্দোলনের প্রবলতার মানদণ্ড-স্বরূপ হইয়াছে। এইবার সুরেশ্বরের প্রতি বিমানের সহজ হৃদ্যতা একটু ঈর্ষা-বিকৃত হইয়া বক্র কটাক্ষ ও প্রতিকূল সমালোচনার রূপ ধরিয়াছে—এবং তাহার ব্যাকুল, সংকুচিত প্রেমনিবেদন সুমিত্রার হৃদয়কে অন্ততঃ মুহূর্তের জন্য স্পর্শ করিয়াছে। তারপর দুই মাস ধরিয়া এই দুই বিপরীত আকর্ষণ সুমিত্রার মনের উপর অধিকার-বিস্তারের জন্য পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে, এবং এই দ্বৈরথ যুদ্ধে বিমান সুমিত্রার সন্তোষ-বিধান ও মতানুবর্তিতার অতিরিক্ত আগ্রহে নিজ দাবীকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে। তথাপি যুদ্ধের ফল অনিশ্চিতই থাকিত, কিন্তু জয়ন্তীর অপটু এবং অশুভ সহযোগিতা, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ সৃজন করিয়া, বিমানের আশার একেবারে মূলোচ্ছেদ করিয়া দিল। সুরেশ্বরের জয়ের যাহা কিছু বাকী ছিল, তাহা মাধবীর দৌত্য ও তাহার নিজের কারা-প্রাচীরের অন্তরালে অন্তর্ধান সম্পূর্ণ করিয়া দিল। কোনও দিন প্রেমের আনুগত্য প্রকাশ্যভাবে স্বীকার না করিয়াও সুরেশ্বর প্রেমের বিজয়-মাল্য লাভ করিল। তাহার পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী ইতিমধ্যে কোন অলক্ষিত অবসরে তাহার প্রণয়ের ভারকেন্দ্র সুমিত্রা হইতে মাধবীতে স্থানান্তরিত করিয়াছে—সুতরাং তাহারও স্বার্থত্যাগ একেবারে অপুরস্কৃত থাকে নাই।

উপন্যাসে সমস্ত কথোপকথনের ও যুক্তিতর্কের বিনিময়ের মধ্যে লেখকের স্বভাব-সিদ্ধ ভাষা-নৈপুণ্য ও শোভনতাবোধের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার প্রধান দুর্বলতা

হইতেছে ভাব-গভীরতার অভাব। সুমিত্রার অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রের রেখাগুলি স্পষ্ট বটে, কিন্তু গভীর ও উজ্জ্বল নহে। তাহার ভিতর কোথাও প্রবল আবেগ সঞ্চারিত হয় নাই। সুরেশ্বরের জীবনেতিহাসে তাহার স্বদেশপ্রীতির সহিত তুলনায় তাহার প্রেম ম্লান ও নিষ্প্রভ—অথচ উপন্যাসের মধ্যে তাহার সমস্ত মর্যাদা দেশ-সেবক হিসাবে নহে, প্রণয়ী হিসাবে। সুরেশ্বরের ক্ষেত্রে তাহার প্রণয়-সঞ্চারের দিকটা একেবারে অস্পষ্ট ও অকথিত রহিয়া গিয়াছে। আবার মাধবী-বিমানের মিলন সম্পূর্ণরূপে ঘটনা-মূলক, মনস্তত্ত্বমূলক নহে; তাহাদের বন্ধন-ব্যাপারে চরকার মিহি-সুতা কিরূপে প্রণয়ের স্বর্ণসূত্রে রূপান্তরিত হইল তাহার কোনও আভাস মিলে না। বিমানবিহারীর পক্ষে ইহা গুণার্জিত নহে, কেবল সান্ত্বনা-বিধায়ক পুরস্কার (consolation prize)। বলা বাহুল্য উপন্যাসের আদর্শ এরূপ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারে না।

'অমূল তরু' উপন্যাসটিতে এক কৌতুককর প্রেমের অভিনয় কিরূপে স্বাভাবিক মনস্তত্ত্বমূলক পরিণতি ও বাহ্য ঘটনার সহযোগিতায় গভীর অনুরাগে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহার একটি উপভোগ্য চিত্র পাওয়া যায়। ষড়যন্ত্রে অনিচ্ছুকভাবে যোগ দেওয়ার পর হইতে সুনীতির মনের পরিবর্তন-স্তরগুলি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে—প্রতারণাপাত্র সুবোধের প্রতি সমবেদনায়, তাহার শিশুসুলভ সারল্য ও বিশ্বাস-প্রবণতার প্রতি সহানুভূতিতে, তাহার পত্রের গভীর, অসন্দিগ্ধ প্রেম-নিবেদনের স্পর্শে, তাহার মোহভঙ্গের দুঃসহ বেদনার প্রতি করুণায়, তাহার সাংঘাতিক রোগের জন্য দায়িত্ববোধেব অনুশোচনায়, ও রোগশয্যায তাহার ব্যাকুল, উদ্বেগমণ্ডিত পরিচর্যার ভিতর দিয়া কিরূপে প্রেমেব রক্তিমরাগ বিকশিত হইয়াছে তাহার বিবরণ খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। শেষেব দিকে ভুল ভাঙ্গার পর সুবোধ ও সুনীতি উভয়েরই সূক্ষ্ম আত্মমর্যাদাবোধ মিলনের পথে একটা ক্ষণস্থায়ী অন্তরায় সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল বটে, কিন্তু পাবিপার্শ্বিক আনুকূল্য ও উভয়েরই প্রবল আকর্ষণ এই বাধাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে ও অবিমিশ্র আনন্দের মধ্যেই গল্পের যবনিকাপাত হইযাছে।

'অমলা' উপন্যাসে একটা কুৎসিত, গ্লানিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে অমলার চরিত্র-দার্ঢ্য ও অবিচলিত ধর্মনিষ্ঠা উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অমলার শ্বশুরের অসহনীয় বর্বরতা ও দুর্ব্যবহার, স্বামী বিজয়নাথের কাপুরুষোচিত উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য, তাহার পিতা-মাতার দ্বারা প্রমথর হীন চক্রান্তের পোষকতা—এ সমস্তই গ্রন্থখানির বাতাসকে একটা অস্বাস্থ্যকর পীডাজনক গন্ধে ভারাক্রান্ত করিয়াছে। ইহাদের অপেক্ষা যডযন্ত্রের মূল নায়ক প্রমথ অধিকতর শ্রদ্ধার পাত্র—সে অর্থসাহায্যদ্বারা পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতাকে জয় করিতে চাহিয়াছে, অমলাকে লাভ করিবার ব্যাকুল আগ্রহ দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও ধৈর্যপূর্ণ সংযমের আবরণে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে। তথাপি মনে হয় যে, অমলার প্রতি তাহার কৌশলজাল-বিস্তার অত্যন্ত অনাবৃত ও সুপ্রকাশ্য হইয়া ব্যর্থ হইয়াছে—তাহার ফাঁদ পাতার চেষ্টা এতই সহজবোধ্য যে, ইহা অমলার সমস্ত সন্দেহ ও বিরুদ্ধতাকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে বাধাপ্রদানে উদ্রিক্ত করিয়াছে। অমলা কর্তৃক শেষ প্রত্যাখ্যানের পর তাহার নিরাশাপীড়িত মন ত্যাগস্বীকারের মহিমা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে ও তাহার বিদায়-বাণী গভীর ভাবের উত্তেজনাময় আবেগ-কম্পিত হইয়াছে। কিন্তু গোড়া হইতে অমলার প্রতি ব্যবহারে তাহার কোথাও সুগভীর

প্রেম বা সহানুভূতির স্বর ধ্বনিত হয় নাই। ইহার মধ্যে কেবল অতি চতুর লোকের সুচিন্তিত চালের পরিচয় মিলে। অমলার মত দৃপ্ত আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ও দৃঢ়সংকল্প নারীকে লাভ করার ইহা যে প্রকৃষ্ট পন্থা নয়, প্রমথর চতুরতা তাহাকে এতখানি অন্তর্দৃষ্টি দেয় নাই। প্রমথর সহিত পরিচয়ের প্রথম দিকে অমলার মনে কৃতজ্ঞতা ও অভিমান-সঞ্চারের উল্লেখের দ্বারা তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষীণ সংকেত দিবার চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু শেষ দিক্ দিয়া এই ক্ষীণ ইঙ্গিতগুলি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে ও অমলার হৃদয় প্রমথর বিরুদ্ধে একটা অপরিবর্তনীয়, নিস্তরঙ্গ বিমুখতায় জমাট বাঁধিয়াছে। অমলার অন্তরের শেষ সংঘাতের বিবরণটি নাটকোচিত তীব্রতা (dramatic intensity) লাভ করিয়াছে—তাহার স্বামী ও প্রমথ উভয়কেই আমন্ত্রণলিপি পাঠাইয়া দিয়া স্বর্গ-নরকের সন্ধিস্থলে দ্বিধা-কম্পিতচরণে দাঁড়াইয়া থাকার চিত্রটি উপন্যাসটিকে একটি নাটকীয় পরিণতির (dramatic climax) উচ্চ শিখরে উঠাইয়া দিয়াছে।

'অন্তরাগ' উপন্যাসটি ঘটনা-চক্রের অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর আবর্তনের জন্য অনেকটা রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত। বিনয় কমলার বাগ্‌দত্ত স্বামী হইতে হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতায় রূপান্তরিত হইয়া গল্পের উপসংহারের মধ্যে একটা অতর্কিত আকস্মিকতা আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই বিপর্যয়কারী সংঘটনের ভাবমূলক প্রতিক্রিয়া (emotional reaction) নিতান্তই সাধারণ ও বিশেষত্বহীনরূপে চিত্রিত হইয়াছে—ইহা বিনয়ের মনে একটা করুণ, উদাসভাব আনিয়া দিয়াছে, কিন্তু অন্তরে কোন তুমুল আলোড়ন জাগায় নাই। গ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় বিনয় ও কমলার মধ্যে প্রণয়-সঞ্চার ও বিনয়ের ভালবাসা লইয়া কমলা ও শোভার মধ্যে একটা নীরব প্রতিযোগিতা—কিন্তু এই উভয় চিত্রের মধ্যেই বেগবান্ আবেগ বা প্রচুর রস-ধারা সঞ্চারিত হয় নাই। কমলা ও বিনয়ের সম্পর্কটিতে অনেকটা শরৎচন্দ্রের 'দত্তা'র বিজয়া ও নরেনের ভ্রান্তি-জটিল, অভিমান-গূঢ় সম্পর্কের সাদৃশ্য-ছায়াপাত হইয়াছে, কিন্তু আর্টের উৎকর্ষের দিক্ দিয়া উভয়ের মধ্যে তুলনা হয় না। মোট কথা 'অন্তরাগ' উপন্যাসটিতে শক্তির আপেক্ষিক অভাবই লক্ষিত হয়।

'দিক্‌শূল' উপন্যাসটিতে মুখ্য বিষয় হইতেছে—বড়লোক শ্যালী কর্তৃক দরিদ্র রমাপদর শিশু-পুত্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের প্রস্তাব, এই প্রস্তাবে তাহার স্ত্রীর আংশিক সম্মতিতে তাহার মনে দুর্জয় অভিমানসঞ্চার ও এই অভিমানের বশে স্ত্রীর সহিত তাহার সাময়িক বিচ্ছেদ। এই উপন্যাসেও আকস্মিক সংঘটনের আতিশয্য আমাদের বিশ্বাসকে পীড়িত করে। রমাপদর হঠাৎ উচ্চপদ-লাভ, মুরলীধরের আকস্মিক মৃত্যু, ইত্যাদি ঠিক উপন্যাসের বাস্তবতার মর্যাদা রক্ষা করে না। সরযূর সহিত রমাপদর সম্বন্ধটি স্বাভাবিক করিতে গেলে যতটা বিশ্লেষণ-নিপুণতা ও বর্ণনা-কৌশলের প্রয়োজন তাহা লেখকের নাই। তাহাদের পরস্পরের প্রতি যে মনোভাব তাহাকে যথার্থভাবে অভিহিত করা কঠিন—ইহা কৃতজ্ঞতাও নহে, প্রেমও নহে, এক প্রকারের যৌন-আকর্ষণহীন, একত্র-বাস-জাত সৌহার্দ্য। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে এই অভূতপূর্ব বিচিত্র সম্পর্ক ফুটাইয়া তুলিবার উপযোগী গুণের কোন পরিচয় মিলে না—বাহিরের লোকের মত পাঠকও ইহাকে ভুল বুঝিতে থাকে। কিন্তু উপন্যাসের যে অংশটুকু সর্বাপেক্ষা কাঁচা, তাহা হইতেছে রমাপদ ও সরমার মধ্যে মর্মান্তিক বিচ্ছেদের কাহিনী। রমাপদ বারবারই

স্নেহশীল ও কর্তব্যনিষ্ঠ স্বামীরূপে চিত্রিত হইয়াছে, দারুণ অভিমানপ্রবণতার কোন যথেষ্ট পূর্ব-সংকেত তাহার অতীত জীবনে পাওয়া যায় না। তাহার আত্মমর্যাদা-বোধ যে তাহাকে পোষ্যপুত্রদানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাইয়াছে ইহা বেশ স্বাভাবিক, এবং এই বিষয়ে স্ত্রীর সহিত তাহার সামান্য মতানৈক্য যে তাহার মনে কতকটা অভিমান সঞ্চার করিবে ইহার মধ্যেও কিছু অসংগতি নাই। কিন্তু রুগ্ন ছেলের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে স্থান পরিবর্তনের প্রস্তাব যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনতিক্রম্য অন্তরায়ের সৃষ্টি করিবে এরূপ কোন ভয়াবহ পরিণতির জন্য রমাপদর পূর্বজীবনের সহিত পরিচয় আমাদিগকে প্রস্তুত করে নাই। স্থানপরিবর্তনপ্রস্তাবের পিছনে পোষ্যপুত্র-গ্রহণের অপরিত্যক্ত উদ্দেশ্য যে উঁকি মারিতেছে এই দৃঢ় প্রতীতিই রমাপদর ব্যবহারের সর্বাপেক্ষা সংগত ব্যাখ্যা। কিন্তু ইহাও স্ত্রীপুত্রের প্রতি তাহার সম্পূর্ণ স্নেহবিলোপের অস্বাভাবিকত্ব অপনোদন করে না।

উপেন্দ্রনাথের 'নবগ্রহ' ও 'গিরিকা' নামে দুইটি ছোট গল্পের সমষ্টি ছোটগল্প-সাহিত্যের পর্যায়ে উচ্চস্থান অধিকার করে। ইহাদের কয়েকটি গল্প করুণরসপ্রধান—'প্রতিক্রিয়া' নামক গল্পটি এই শ্রেণীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। হাস্যরসপ্রধান গল্পের মধ্যে 'কলি ও কুসুম' গল্পটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। 'শুভ যোগ' ও 'সোণা ও লোহা' নামক দুইটি গল্পে আখ্যানের অভিনবত্ব, বর্ণনার সরসভঙ্গী ও বিশ্লেষণকুশলতা লক্ষণীয়। মোটের উপর ঔপন্যাসিক সাহিত্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উপেন্দ্রনাথের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত বলা যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অতি-আধুনিক উপন্যাস

(১)

অতি-আধুনিক উপন্যাস সমালোচকের নিকট অনেকগুলি দুরূহ প্রশ্ন উপস্থাপিত করে। প্রথমতঃ, ইহার প্রসার ও সংখ্যা এত বেশি যে, ইহাকে অনেকটা দুর্ভেদ্য, পথ-রেখাহীন অরণ্যানীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। ইহার ঘন-বিন্যস্ত বৃহ শ্রেণী-বিভাগের চেষ্টাকে প্রতিহত করে ও দৃষ্টি-বিভ্রম জন্মায়। দ্বিতীয়তঃ, ইহার রূপ ও প্রকৃতির মধ্যে এখনও একটা পরীক্ষামূলক অনিশ্চয়তা লক্ষিত হয়; ইহার বৃহত্তর পরিধির মধ্যে নানা যুক্তি-তর্কমূলক আলোচনা ও অবান্তর মন্তব্য সমাবেশের জন্য পূর্বতন সুষমা ও সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়াছে ও একটা নূতন রূপ এখনও গড়িয়া উঠে নাই। ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও ইহার মন সর্বথা দ্বিধাশূন্য নহে—এই অনিশ্চিত উদ্দেশ্যও লেখক ও পাঠক উভয়েরই মনঃস্থির করার পক্ষে ঠিক অনুকূল হয় না। তৃতীয়তঃ, ইহার দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবন-সমালোচনার বিশেষত্বটুকুও পূর্বতন উপন্যাসের ধারা অনুসরণ করে না—অথচ ইহার মৌলিকতা এখনও সর্ববাদিসম্মতভাবে গৃহীত হয় নাই। সুতরাং ইহার বিচারে প্রচলিত রুচির বিরোধ কাটাইয়া উঠিয়া রসগ্রাহিতার পরিচয় দিতে হয়। চতুর্থতঃ, ইহার লেখকেরা অনেকেই এখনও স্ব স্ব প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ লাভ করেন নাই—ভুল-ভ্রান্তি ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া নিজ নিজ বিশেষ প্রবণতার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন। ইঁহাদের বিশেষত্ব সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা জন্মিয়াছে তাহা প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। এরূপ ক্ষেত্রে সমালোচকের পথ যে নিতান্ত বিঘ্নবহুল তাহা উপলব্ধি করা মোটেই দুরূহ নয়। সুতরাং বর্তমান আলোচনা আধুনিক উপন্যাসের কয়েকটি মূল সূত্র ও প্রবণতার বিশ্লেষণেই সীমাবদ্ধ থাকিবে—কোনও লেখকের চূড়ান্ত স্থান-নির্ণয় ইহার উদ্দেশ্য-বহির্ভূত।

এই উপন্যাসের জন্ম-মুহূর্তে ইহার সূতিকাগারের দ্বারদেশে যে প্রবল কোলাহল উঠিয়াছিল, তাহাকে ঠিক নবজাত শিশুর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শুভ-শঙ্খধ্বনির সঙ্গে তুলনা করা চলে না। ইহার দুর্নীতিপরায়ণতা ও যৌন আকর্ষণের অসংকোচ, নির্লজ্জ স্তুতিগান তীব্র বিরোধিতা ও তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই উত্তপ্ত বাদ-প্রতিবাদে সাহিত্য-বিচারের নিরপেক্ষ আদর্শ যে সর্বদা রক্ষিত হইয়াছিল, এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না। সুখের বিষয় এই অস্বাভাবিক ও অস্বাস্থ্যকর উত্তেজনা এখন অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে ও সমস্ত প্রশ্নটির ধীর সাহিত্যিক-আদর্শানুযায়ী পর্যালোচনার সময় আসিয়াছে। যে সমস্ত লেখক এই কুৎসিত, অরুচিকর সাহিত্য-সৃষ্টির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই হউক অথবা বিরুদ্ধ সমালোচনার অঙ্কুশে বিদ্ধ হইয়াই হউক, এই গ্লানিকর আতিশয্য বর্জন করিয়া অপেক্ষাকৃত নির্দোষ ও সুস্থ বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়াছেন। যৌন আকর্ষণজনিত চিত্তবিকার এখন তাঁহাদের সৃষ্টিশক্তির সমস্ত প্রচেষ্টা অধিকার করিয়া নাই।

তাঁহাদের সৃষ্টি যতই নূতন প্রণালী দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, নব নব বৈচিত্র্যের মধ্যে রূপ গ্রহণ করিতেছে, ততই ইহা পরিষ্কার হইতেছে যে, দুর্নীতি-মূলক যৌন প্রেমচিত্রণই আধুনিক উপন্যাসের সম্বন্ধে প্রধান কথা নহে। সুতরাং এ সম্বন্ধে বিতর্কের প্রয়োজনীয়তাও ঠিক এই অনুপাতে হ্রাস পাইতেছে।

তথাপি এ বিষয়ে কতকগুলি মূলসূত্রের আলোচনা প্রয়োজন। প্রথম কথা এই যে, সাহিত্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ অনেকটা বিষয়-নিরপেক্ষ। সমাজ-বিগর্হিত প্রেম লইয়া যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হইতে পারে তাহা কেবল গোঁড়া রুচি-বাগীশেরাই অস্বীকার করিবেন। ইহার স্বপক্ষে প্রমাণ ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে ভূরি ভূরি সংগ্রহ করা যাইতে পারে। তাহার কারণ এই যে, সমাজের অনুমোদন আমাদের নীতিবোধের অভ্রান্ত মানদণ্ড বা পথপ্রদর্শক নয়। সমাজের বিধি-নিষেধে যে নৈতিক আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা অনেকটা সুবিধাবাদ বা সংখ্যা-গরিষ্ঠ জনসাধারণের নীতিজ্ঞান বা স্বার্থসংরক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এমন অনেক অসাধারণ ব্যতিক্রম থাকিতে পারে যাহা সমাজের সাধারণ নীতিবোধ অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শের দাবী করিয়া থাকে এবং এই জন্যই সমাজের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ তীব্র হইয়া উঠে। আমাদের যে নীতিবোধ সমাজ-বিধির অন্ধ অনুসরণে কুণ্ঠিতাগ্র ও নিষ্প্রভ হইয়া থাকে, তাহা এই ব্যতিক্রমের বিদ্রোহে আবার তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসই এই জড়তা-গ্রস্ত নীতিবোধকে সচেতন করিবার চেষ্টা। তারপর উপন্যাস প্রধানতঃ মানুষের হৃদয়াবেগের কাহিনী; এবং হৃদযাবেগের উচ্ছ্বসিত প্রবাহ যে সকল সময় সমাজ-নির্দিষ্ট প্রণালীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না তাহা সমাজ-বিধির দিক্ দিয়া অসুবিধাজনক হইলেও অনস্বীকার্য সত্য। সুতরাং নিন্দিত প্রেমের বর্ণনা অন্ততঃ দুই দিক্ দিয়া সমর্থনের দাবী করিতে পারে—(১) উচ্চতর নৈতিক আদর্শ; (২) অসংবরণীয় হৃদয়াবেগ।

(২)

কিন্তু ইহা ছাড়া বাস্তবতার দিক্ দিয়া এই যৌন আকর্ষণের চিত্র আরও একটা সমর্থনের দাবী করিতে পারে। এই আকর্ষণের পিছনে যদি উচ্চতর নীতি ও হৃদয়াবেগ নাও থাকে, যদি চোখের দেখা ও ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা ইহার একমাত্র উত্তেজক হেতু হয়, তথাপি জীবনে ইহা ঘটে বলিয়াই উপন্যাসে ইহার অবতারণা সমর্থন-যোগ্য। এই যুক্তির অনুকূলেও ইউরোপীয় নজীরের দোহাই পাড়া চলে। Flaubert-এর Madame Bovary ও Zola-র অনেকগুলি উপন্যাস হৃদয়াবেগ একেবারে বর্জন করিয়া খাঁটি বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধিৎসার ভাবে নরনারীর যৌন-আকর্ষণ-বিষয়ক সমস্ত গ্লানিকর অথচ অবিসংবাদিত তথ্যগুলি পুঞ্জীভূত করিয়াছে। ইহাদের পিছনে যে মনোবৃত্তি তাহাতে বিদ্রোহের উত্তাপ ও উত্তেজনা নাই; আছে শুষ্ক, আবেগহীন সত্য-স্বীকার, বৈজ্ঞানিকের কঠোর সত্য-প্রিয়তা। মানুষের মধ্যে যে পাশবিকতা আছে, তাহাকে কল্পনার রঙিন ছদ্মবেশ না পরাইয়া, তাহার নগ্ন স্বরূপকে মানিয়া লওয়াই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। বাঙ্গালাদেশের এই

শ্রেণীর অধিকাংশ লেখকই আত্মসমর্থনের জন্য এই শেষোক্ত যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। এই শ্রেণীর ঔপন্যাসিকদের যথাযোগ্য বিচার করিতে হইলে এই সমস্ত যুক্তিতর্কের বিশ্লেষণ ও তাহারা বর্তমান ক্ষেত্রে কতদূর প্রযোজ্য তাহার নির্ধারণ করিতে হইবে।

আধুনিক বাংলা উপন্যাসে যৌন-সাহিত্যের যে অংশ প্রথম দুইটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের লইয়া তীব্র মতভেদ আজকাল আর নাই; প্রথম পরিচয়ের সন্দেহ ও অবিশ্বাস কাটিয়া গিয়া তাহাদের চিরন্তন সৌন্দর্য দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, অভয়া, বিরাজ বৌ, প্রভৃতি নায়িকা আমাদের শাশ্বত নীতিজ্ঞানের অনুমোদন ও সহানুভূতি পাইয়া উচ্চতর সাহিত্য-রাজ্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে—যেমন 'গৃহদাহ'-এ অচলা সম্বন্ধে এরূপ নিঃসংশয় নৈতিক অনুমোদনের অভাব—সেখানেও অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রাবল্য ও আবেগ-গভীরতা সমাজ-নীতি-উল্লঙ্ঘনের চিত্রকে বরণীয় না করিলেও ক্ষমণীয় করিয়াছে। দুর্দাম আবেগ ঠিক আদর্শস্থানীয় না হইলেও, আমরা ইহাকে অনেকটা ক্ষমা-মিশ্রিত সমবেদনার চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছি। প্রবল বিরুদ্ধ-শক্তির প্রতিকূলতায় মানুষের জীবন যে সমস্ত সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপদ আশ্রয় হইতে স্খলিত হইয়া উন্মার্গগামী হইতে পারে তাহা ক্রোধ ও অভিশাপ-বর্ষণ অপেক্ষা অশ্রুজলস্নিগ্ধ সহানুভূতিরই অধিক দাবী করিতে পারে। এই সমস্ত ব্যাপারে সমাজের বিচারক-সুলভ রক্তচক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত এবং শ্রদ্ধা ও সমবেদনায় কোমল হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আসল সমস্যা হইতেছে তৃতীয় যুক্তি লইয়া—কেবল বাস্তবানুগামিতা ও তথ্যানুসন্ধান আমাদের দেশে কুৎসিত যৌন-সাহিত্য-সৃষ্টিকে সমর্থনযোগ্য করিতে পারে কি না।

এই তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসের সমর্থনে ইউরোপীয় সাহিত্যের দৃষ্টান্ত ও ফ্রয়েডের যুগান্তর-কারী মনস্তত্ত্বমূলক আবিষ্কার (psycho-analysis) উল্লিখিত হইয়া থাকে। ফ্রয়েডের মতে মানুষের অনেক প্রচেষ্টাই মগ্ন-চৈতন্য-নিরুদ্ধ কাম-প্রবৃত্তির অজ্ঞাত প্রেরণাবশেই অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং মনুষ্য-জীবনে যৌন-আকর্ষণকে প্রাধান্য দেওয়া বা কাম-প্রবৃত্তির দুর্বার সঙ্কেতকে স্ফুট-তর করিয়া তোলা বৈজ্ঞানিক সত্যের অনুসরণ ছাড়া কিছুই নয়। ইহাতে ধর্ম ও নীতির দোহাই দিয়া যিনি আপত্তি করিবেন, তাঁহার আপত্তি সত্যেরই বিরুদ্ধাচারী, সত্যের প্রতি অসহিষ্ণুতা। আমাদের দেশে কোন কোন লেখকের মধ্যে যে নির্লজ্জ, নিরাবরণ যৌন আকাঙ্ক্ষা ও মিলনের চিত্র পাওয়া যায় এই যুক্তিতে তাহাকে সমর্থন করা যায় কি না সন্দেহ। ফ্রয়েডের তথাকথিত আবিষ্কার অনেকটা অনুমানসিদ্ধ ও এখনও পরীক্ষাধীন, ইহা সর্বদেশের সর্বপ্রকৃতির লোকের জীবন-রহস্যের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে। ইহার সার্ব-জনীন প্রযোজ্যতা মানিয়া লইলেও ইহা ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যপ্রণালীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিতে পারে কি না তাহাও সন্দেহজনক। নিরুদ্ধ কাম-প্রবৃত্তি যদি সত্য সত্যই আমাদের অধিকাংশ মানস-প্রচেষ্টার গোপন-শক্তি-উৎস হয়, তাহা হইলেও ব্যবহার-ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্য এই অদৃশ্য, অলক্ষিত প্রভাবের জন্য কেন ক্ষুণ্ণ হইবে? হৃদয়ের অন্ধতমসাচ্ছন্ন রহস্য-গুহায় অবতরণ করিয়া মনের গূঢ় মূলগুলিকে টানিয়া বাহির করায় ঔপন্যাসিক রস কিরূপে সমৃদ্ধিলাভ করিবে? যেখান হইতে সূর্যালোকের আরম্ভ, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির স্বচ্ছন্দ বিকাশ, সেখান পর্যন্তই ঔপন্যাসিকের রাজ্যের শেষ-সীমা।

যে দার্শনিক মতবাদ মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের পরিপন্থী, যাহা ভগবান, নিয়তি বা কোন অন্ধ সহজ প্রবৃত্তি (instinct) ইহাদের মধ্যে যে কোনটিকে মানবের ভাগ্য-নিয়ামক বলিয়া নির্দেশ করে তাহার ছায়াতলে উপন্যাসের প্রফুল্ল পাপড়িগুলি শীর্ণ-বিশুষ্ক হইয়া যায়। তথ্যানুসন্ধানের সব কয়টা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া অনুমানের অতল, সূর্যালোকহীন গহ্বর পর্যন্ত ঔপন্যাসিককে যে বৈজ্ঞানিকের সহযাত্রী হইতে হইবে এরূপ কোন বিধান এখনও তাহার পক্ষে অবশ্য-পালনীয় হয় নাই। মানব-প্রকৃতির যে মূল অন্ধকারে আত্মগোপন করে, আর যে ফুল আলোক-বাতাসের মধ্যে তাহার সৌন্দর্য ও সুরভি মেলিয়া ধরে—ইহাদের কোন্‌টি যে ঔপন্যাসিকের নিকট অধিক প্রার্থনীয়, এ প্রশ্নের উত্তরে বিশেষ বিলম্ব হয় না।

(৩)

এখন ইউরোপীয় সমাজের দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। ইউরোপীয় সমাজে, আমাদের সহিত তুলনায়, নর-নারীর মধ্যে যৌন-মিলন সম্বন্ধে যে অধিকতর শিথিলতা ও প্রচুরতর অবসর আছে তাহা তথাকার সমাজ ও সাহিত্যের সহিত পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। নর-নারীর সম্বন্ধ সামাজিক মিলন ও বন্ধুত্বের মধ্য দিয়া কত শীঘ্র ঘনিষ্ঠতম আকর্ষণে রূপান্তরিত হয় ও কিছুদিন পরে কিরূপে আবার পূর্বতন ঔদাসীন্যে বিলীন হয় ইউরোপীয় উপন্যাস তাহার কাহিনীতে পরিপূর্ণ। ইহা যেন ভাবের তাপমানে সামান্য কয়েক ডিগ্রী উত্তাপ উঠা-নামার মতই সাধারণ ঘটনা। আমাদের দেশে যুগ-যুগান্তরের সংস্কার, ধর্ম-বিশ্বাস ও লোক-মত দৈহিক মিলনের পথে যেরূপ দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃজন করে, সেখানে সেরূপ কোন প্রবল অন্তরায়ের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং ইউরোপীয় উপন্যাসে যৌন-মিলন দেশের সাধারণ মেলামেশার সঙ্গে ছন্দের সমতা রাখিয়াই ঘটিয়া থাকে। পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে যাহারা অসংবরণীয় আবেগের জন্যই হউক বা চিন্তাধারার সহানুভূতির জন্যই হউক, ক্ষণস্থায়ী অবৈধ বন্ধনে সংযুক্ত হয়, তাহাদের সমস্যা আমাদের দেশের মত এত জটিল ও সমাধানহীন নহে। সমাজের উদারতা ও নূতন জীবন-যাত্রার সম্ভাবনীয়তা সকল সময়েই তাহাদের প্রত্যাবর্তনের পথটি খোলা রাখে—সুতরাং এ জাতীয় সংকল্প-গ্রহণের পূর্ববর্তী অবস্থায় তাহাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা আমাদের সহিত তুলনায় অনেক কম। তাছাড়া, সমাজের চক্ষে এই নৈতিক পদস্খলন খুব একটা অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া বিবেচিত না হওয়ার জন্য বহুচারিণী নারীও সমাজে তাহার সম্ভ্রম-মর্যাদা হারায় না। সুরুচি ও সৌন্দর্যের আবেষ্টনে, সূক্ষ্ম ও সুকুমার অনুভূতি ও আলোচনার মধ্যে সে তাহার জীবন কাটাইয়া দিতে পারে। কলঙ্ক-কালিমা তাহার দেহে ও আত্মায় চিরকালের মত লিপ্ত হইয়া থাকে না। আরও একটা দিক্‌ দিয়া ইউরোপীয় সাহিত্যে যৌন-মিলনের সুলভতা বিচার্য। অনেক সময় দেখা যায় যে, রোমাঁ রোলাঁর নায়ক জ্যাক্রিস্তফের ন্যায়-উচ্চাঙ্গের প্রতিভা-সম্পন্ন ও আদর্শবাদপরায়ণ ব্যক্তিও যেন নিতান্তই অনায়াসে প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়াছেন—অনেকটা আমাদের বেদপুরাণ-বর্ণিত মুনি-ঋষির ন্যায়। ইহাদের পক্ষে এই অভিজ্ঞতাটুকু তাঁহাদের শিল্পী-জীবনের মধ্যে উষ্ণ ভাব-প্রবাহ, উত্তেজিত রক্তধারা সঞ্চারিত করিয়া তাহার উৎকর্ষ ও পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয়। তারপর

ইহাদের জীবনের প্রসার এত অধিক ও বহুমুখী, ইহার গতিবেগ এত প্রবল যে, এক-আধটু কলঙ্কস্পর্শ এই প্রবল জীবন-প্রবাহে নিশ্চিহ্ন হইয়া ধুইয়া মুছিয়া যায়। ভস্মাচ্ছাদিত অঙ্গার-খণ্ডের উপর বায়ুপ্রবাহের ন্যায় অভিজ্ঞতা-বৈচিত্র্য ও গভীর আলোড়ন ইহাদের সৃষ্টিশক্তিকে দীপ্ততর করিয়া থাকে। সেখানে স্রোত নাই, সেখানে তল-দেশের পঙ্ক লইয়া নাড়াচাড়া করিলে জল সমল ও কলুষিত হইয়া উঠে মাত্র—স্রোতোহীন জীবনে পাশবিক প্রবৃত্তির অতি-প্রাধান্য সমস্ত আকাশ-বাতাসকে পূতিগন্ধময় করিয়া তোলে।

এই আলোচনা হইতে ইউরোপীয় সাহিত্যের আদর্শ আমাদের দেশে কতখানি প্রযোজ্য তাহার একটা ধারণা করা যাইতে পারে। এখানে দীর্ঘদিনের সংস্কারকে ছিন্ন করিতে যে পরিমাণ দুর্দমনীয় আবেগ ও প্রবল অন্তর্বিপ্লবের প্রয়োজন হয়, ঔপন্যাসিক তাহা নিজ উপন্যাসে ফুটাইয়া তুলিতে বাধ্য। সুতরাং এক শ্রেণীর আধুনিক উপন্যাসে পথে-ঘাটে, অলিতে-গলিতে, কর্জন পার্কে, বোটানিক্যাল গার্ডেনে, এমন কি শিক্ষামন্দিরের দ্বারদেশে যে নির্লজ্জ ও অহেতুক প্রণয়লীলা পথিপার্শ্বস্থ তৃণ-গুল্মের জঙ্গলের মতই গজাইয়া উঠিতেছে, তাহা নীতি-হিসাবে যাহাই হউক, বাস্তবতা-হিসাবেই সমর্থনযোগ্য নহে। তরুণ-তরুণীর সাক্ষাৎ মাত্রই যে দৈহিক সম্পর্কের জন্য লোলুপতা জাগিয়া উঠিবে ইহা মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও আর্টের দিক্ দিয়া স্বাভাবিকতার দাবী করিতে পারে না। যদি বলা যায় যে, জীবনে এরূপ ঘটিয়া থাকে, তথাপি জীবনে যাহা কেবলমাত্র আকস্মিক বা সহজ-প্রবৃত্তিপ্রণোদিত, তাহা উচ্চাঙ্গের আর্টের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। এরূপ মিলনের ক্রমবিকাশের স্তরগুলি ফুটাইয়া না তুলিলে, আকর্ষণের সূত্রগুলি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ না করিলে তাহা আর্ট হিসাবে অসার্থক থাকিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'কে আধুনিক উপন্যাসে নিষিদ্ধ প্রেমের অতি প্রচলনের উৎস-মূল বলা যাইতে পারে। বৌদিদির প্রতি প্রেমাকর্ষণ, যাহা আধুনিক ঔপন্যাসিকের অতি মুখরোচক বিষয় এবং যাহার উপর 'শনিবারের চিঠি'র তীক্ষ্ণতম বিদ্রূপাস্ত্র বর্ষিত হইয়াছে, ইহার উপজীব্য বিষয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মানব-সুলভ সহজ প্রবৃত্তিকেই এই আকর্ষণের একমাত্র হেতু বলিয়া ধরিয়া লন নাই। তিনি অমল ও চারুর সম্পর্কে কিরূপে ধীরে ধীরে অচল অনিবার্যরূপে কলুষিত আবেগের সঞ্চার হইয়াছে তাহা সবিস্তারে চিত্রিত করিয়াছেন—ভূপতির নির্বিকার ঔদাসীন্য এবং অমল ও চারুর সাহিত্যচর্চার ভিতর দিয়া ক্রমবর্ধমান নিবিড় মোহ—বর্ণনার দ্বারা চিত্রটি স্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। আবার আত্মসমর্পণের শেষ পিচ্ছিল সোপানে পদক্ষেপ করিয়া অমলের হঠাৎ বিবেক-সঞ্চার ও তাহার অটল, কঠোর সংযম মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া গল্পটির উপভোগ্যতা বাড়াইয়াছে। আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা উদাহরণটি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বিষয়টিকে গ্রহণযোগ্য করিতে যে পরিমাণ নিপুণতা, সুরুচিজ্ঞান ও কলা-সংযমের প্রয়োজন তাহার অনুশীলন করা প্রযোজন বোধ করেন নাই।

অবশ্য ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে, কোন বিষয় যে স্বতঃই বর্জনীয় তাহা নহে। অবৈধ প্রেমের মধ্যে যে তীব্র বিক্ষোভ ও প্রবল আবেগ সঞ্চিত হইয়া উঠে তাহা ঔপন্যাসিকের পরম প্রার্থনীয়। এই সমস্ত বিষয়-বিচারে যদি আমরা খুব গোঁড়া ও সংকীর্ণ নীতিবাদের মধ্যে আবদ্ধ থাকি, তবে নানাবিধ উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-রসাস্বাদন হইতে আমরা বঞ্চিত থাকিব ও আমাদের রসোপলব্ধির শক্তি শীর্ণ ও দুর্বল হইবে। জীবনে প্রেম একটা জ্বলন্ত সত্য। সংস্কারগত নীতি-

বোধের খাতিরে তাহাকে অস্বীকার করিলে জীবন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। জীবনে যাহা উচিত কেবল তাহাই যদি ঘটিত তবে তাহার বৈচিত্র্য ও দুর্জ্ঞেয়তা, তাহার অপ্রত্যাশিত বিস্ময়কর বিকাশগুলি বিলুপ্ত হইয়া যাইত। সুখের বিষয়, আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা যৌন-আকর্ষণ সম্বন্ধে খুব খোলাখুলি আলোচনার দ্বারা আমাদের সত্যাসহিষ্ণুতা ও দুর্বল নীতিসংকোচ অনেকখানি অপসারিত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিরুদ্ধে যে ধরণের অভিযোগ শোনা যাইত—যথা, মন্দির-মধ্যে প্রেমের উদ্ভব অসম্ভব, বা কোন ক্ষেত্রেই পতিব্রতা নারীর পতিগৃহত্যাগ অবিধেয়—তাহা এখন চিরতরে শুব্ধ হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আমরা নীতিভয়গ্রস্ত শৈশব অতিক্রম করিয়া স্বাধীন-চিন্তার যৌবনে পদার্পণ করিয়াছি, এইরূপ দাবী নিতান্ত অসংগত মনে হইবে না। তবে আমাদের সাবধান থাকিতে হইবে যেন আমাদের এই নবার্জিত দৃপ্ত যৌবন অতি শীঘ্র অক্ষম লোলুপতায় ঘৃণাস্পদ, কুৎসিত স্মৃতির রোমন্থনে নিস্তেজ অকাল-বার্ধক্যে পর্যবসিত না হয়। আঁগুন লইয়া খেলা করিতে গিয়া যেন আমরা দেহ-মনকে কেবল ভস্মকালিমালিপ্ত না করিয়া বসি। সামাজিক আবেষ্টন অনুকূল না হইলে নর-নারীর মধ্যে স্বাধীন, অবাধ প্রেম জন্মিবার অবসর পায় না—এবং যদিও ধীরে ধীরে সমাজনীতি এই আদর্শের দিকে পরিবর্তিত হইতেছে, তথাপি সাহিত্যের উপর এই পরিবর্তনের প্রভাব সংক্রামিত হইতে এখনও বিলম্ব আছে বলিযা মনে হয়। কেবল রীতির অনুবর্তনের জন্য, ইতর রুচির পরিপোষণার্থ, কেবল গতানুগতিকভাবে এ সাহিত্য সৃষ্ট হইবার নয়—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুর ধ্বনিত না হইলে ইহা ইহার প্রধান সমর্থন হইতেই বঞ্চিত হয়। বিষপান করিয়া নীলকণ্ঠ হইবার যোগ্যতা সকলের নাই, এই সত্যটি মনে জাগ্রত থাকিলে সাহিত্য ও সমাজ উভয়েরই মঙ্গল।

চতুর্দশ অধ্যায়

কাব্যধর্মী উপন্যাস—বুদ্ধদেব বসু; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(১)

অতি-আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সর্বপ্রথম উল্লেখ-যোগ্য। রচনার অজস্রতা ও অভিনব লিখন-ভঙ্গী—এই দুই দিক্ দিয়াই তাঁহারা খ্যাতি ও বৈশিষ্ট্য অর্জনের অধিকারী। পুরাতনের সীমা-রেখা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া উপন্যাসকে নূতন আকার দেওয়া ও নূতন পথে পরিচালিত করার কৃতিত্ব ইঁহারা দাবী করিতে পারেন। পরিকল্পনা ও রচনা-ভঙ্গীর মৌলিকতা ইঁহাদিগকে পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত উপন্যাস-সাহিত্য-বিবর্তনের যে প্রধান ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, ইঁহারা সেই স্রোতের সহিত না মিশিয়া শাখা-পথে পাড়ি জমাইয়াছেন। অবশ্য এই শাখা-পথে স্রোতোবেগ স্থায়ী হইবে অথবা মূলধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য ইহার রসপ্রবাহ অল্প দিনেই শীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া পড়িবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে ইহা নিশ্চিত যে, ইঁহারা উপন্যাসের ভবিষ্যৎ পরিণতির নূতন সম্ভাবনা জাগাইয়া তুলিয়াছেন।

ইঁহাদের উপন্যাসের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইঁহারা খুব ব্যাপক ও গভীরভাবে গীতি-কাব্য-ধর্মী। অবশ্য উপন্যাসের মধ্যে গীতি-কাব্যের উন্মাদনা ও ঝংকার মোটেই নূতন উপস্থিতি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। বঙ্কিমের অনেক উপন্যাসই গীতি-কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা কেবল যে কবিতার অফুরন্ত নির্ঝরে উৎসারিত হইয়াছে তাহা নহে, গদ্যের কারুকাযখচিত পাত্রকেও ভরিয়া তুলিয়াছে, তিনি এক ছত্র কবিতা না লিখিলেও তাঁহার উপন্যাসের প্রকৃতি-বর্ণনা ও চিত্ত বিশ্লেষণ তাঁহার কবিত্বশক্তির অবিসংবাদিত প্রমাণ-স্বরূপ দাঁড় করান যাইত। শরৎচন্দ্র সাধ্যমত কবিত্ব-উচ্ছ্বাস বর্জন করিলেও অসতর্ক মুহূর্তে তাঁহার অন্তর্লীন কাব্যবীণায় ঝংকার দিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু অচিন্ত্য-বুদ্ধদেবের কবিত্ব উপন্যাসের মধ্যে সর্বব্যাপী; তাঁহাদের দৃষ্টি-ভঙ্গী ও বিশ্লেষণ-প্রণালী একান্তভাবে কাব্যধর্মী। তাঁহারা উপন্যাসে যে সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত ও মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেন তাহাতে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের পরিবর্তে কাব্যোচ্ছ্বাসেরই প্রাধান্য। মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ যেন কাব্যের সোনালী কাপড়ের সীমান্তে একটু ছোট পাড়; কবিতার তরঙ্গিত উচ্ছ্বাসকে ধরিয়া রাখিবার জন্য একটু উচ্চ তটভূমি মাত্র।

জীবনের বিশেষ মুহূর্তগুলিকে দেখিবার ভঙ্গী, জীবন-সমালোচনার প্রণালী ইঁহাদের সম্পূর্ণ কাব্যানুপ্রেরিত। জীবনের উপরিভাগের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের তীক্ষ্ণ কোণ ও অতর্কিত পরিবর্তন ছাড়াইয়া যে নিঃসঙ্গ, গভীর, শব্দহীন তলদেশে আত্মার নৈর্ব্যক্তিক রহস্য অবগুণ্ঠিত থাকে সেখানে অবতরণ করিয়া ইঁহারা সেই আত্মবিস্মৃত আত্মার অবগুণ্ঠন-মোচনে প্রয়াসী হইয়াছেন। সামাজিক প্রয়োজনের দ্বারা শতধা-খণ্ডিত, ব্যক্তিগত পরিচয়ের ছদ্মবেশাবৃত আত্মার নগ্ন, জ্যোতির্ময়, নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ ইঁহারা ভাষার স্বচ্ছ দর্পণে ধরিতে চাহেন। কোন বিশেষ মানসিক

অবস্থা বা কোন বিশেষ ঋতু বা সময়ের নিগূঢ় সাংকেতিকতা ফুটাইয়া তোলাতে ইহাদের প্রবণতা ও কৃতিত্ব দেখা যায়। ইহাদের প্রকৃতি-বর্ণনা এমন কি বেশভূষা বা গৃহসজ্জা-বর্ণনার চারিধারে একটা সাংকেতিকতার অর্ধ-ভাস্বর জ্যোতির্মণ্ডলের পরিবেষ্টনী অনুভব করা যায়। ইহাদের প্রায় প্রত্যেক উপন্যাস হইতেই এই বিশেষত্বের উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। বুদ্ধদেবের 'যেদিন ফুটলো কমল'-এর 'বর্ষা' অধ্যায়ে বর্ষার ও 'দুখানি চিঠি'তে রাত্রির অন্ধকার-ময় সত্তার mystic উপলব্ধি; 'একদা তুমি প্রিয়ে'র চতুর্থ পরিচ্ছেদে পলাশের অন্তর্দ্বন্দ্ব-বর্ণনার মধ্যে অন্ধকার ও স্তব্ধতার পটভূমিতে মানবাত্মার নগ্ন নিঃসহায়তার অনুভূতি—"তার থেকে জেগে উঠছে অন্তরের চিরন্তন নিঃসঙ্গতা, চিরন্তন বিরহ, যখন আমরা উন্মোচিত, উদ্‌ঘাটিত, উন্মথিত, চেতনার তীরে পড়ে—নগ্ন, আক্রমণীয়, নিঃসহায়"; ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে মেঘ-সাগরের সুদূর নিঃস্পন্দতায় রচিত ঐন্দ্রজালিক স্তব্ধতা, ও বনের সান্ধ্য অন্ধকারে বৃষ্টির মর্মর-শব্দের মধ্যে নূতন প্রেমের উদ্ভব-কাহিনী; 'অসূর্য্যম্পশ্যা'য় দার্জিলিঙের কুয়াসা-ঘেরা, পর্বত-প্রাচীর-প্রতিহত নির্জনতার মধ্যে, অন্ধকার মন্দিরগৃহে দেবতার মত, সরমার হৃদয়ে প্রথম প্রণয়ের ভয়াবহ, রহস্যময় আবির্ভাব; 'বাসর-ঘরে' 'কালপুরুষ' অধ্যায়ে মধ্যরাত্রে নব-বিবাহিতা দম্পতীর অতীন্দ্রিয় অনুভবশীলতা—'চেতনার শক্ত শ্বেত দীপ্তি থেকে সে মুক্তি পেয়েছে—দুজনের মধ্যে জন্ম নিলো বিশাল, রহস্যময় নদী, রাত্রের হৃদয়ে এই দ্বৈত নিঃসঙ্গতা'; অচিন্ত্যকুমারের 'আসমুদ্র'-এ নবম পরিচ্ছেদে বনানীর বিলীয়মান সত্তা ও তাহার নিগূঢ় চেতনার অন্ধকার হইতে মুক্তি; ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে সন্ধ্যার অন্ধকারে সৌম্যের অতৃপ্ত আত্মার নিজ সত্য, গভীর পরিচয়-লাভের ব্যাকুল কামনায় অশান্ত আর্তনাদ, ষোড়শ পরিচ্ছেদে বনানীর জাগরণ—'তার রশ্মি-বিদ্ধ প্রখর উন্মোচন, তার উন্মেষের সৌগন্ধ্য, তার জীবন্ময় আরণ্য বৈকল্য'—এই সমস্তই তাঁহাদের উপন্যাসের, সূর্যালোকিত, সহজ পরিচয়ের পথ ছাড়াইয়া মানবাত্মার নিগূঢ়-গোপন সত্তার অতীন্দ্রিয় স্পর্শ লাভের প্রচেষ্টা হিসাবে উল্লিখিত হইতে পারে।

মানব-মনের কোন বিশেষ ভাব বা প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যেও এই সাংকেতিকতার তীব্র, তীক্ষ্ণ, গীতিকাব্যোচিত অনুভূতির পরিচয় মিলে। বুদ্ধদেবের 'বাসর-ঘর'-এ ব্যারাকপুরে কুন্তলা-পরাশরের বিবাহিত জীবনের মুহূর্তগুলির—দিন, জ্যোৎস্নারাত্রি ও অন্ধকার রাত্রির—কবিত্বপূর্ণ, অতীন্দ্রিয় আভাসে ভরপুর বর্ণনা, চাঁদের ডাইনি-প্রভাবের রহস্যময় শিহরণ ভাষার ইন্দ্রজালে ফুটাইয়া তোলার অপূর্ব চেষ্টা, তাহাদের অভিমান-দুর্বিষহ বিচ্ছেদ-রাত্রির আশ্চর্য স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন—"শব্দহীন, স্পর্শহীন, প্রেতে পাওয়া"; অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে'তে 'বাতাসী' পরিচ্ছেদে নদীতীরবর্তী বিস্তৃত প্রান্তরের অস্ফুট ইঙ্গিত-আভাসগুলির কবিত্বপূর্ণ, অর্থব্যঞ্জনা-সমন্বিত বর্ণনা; 'আসমুদ্র'-এ নববধূর প্রথম পরিচয়ের মধ্যে রহস্যময় সাংকেতিকতার সুর আবিষ্কার—'একটি শঙ্খের মধ্যে যেমন বিশাল সমুদ্রের নিঃশ্বাস শোনা যায়, তেমনি মেয়েটির মধ্যে নিমীলিত হ'য়ে আছে জীবনের বিচিত্রিত অপরিমেয়তা'; নবীন প্রেমের বিহ্বল মাদকতার ও সহজ-স্ফূর্ত আধ্যাত্মিকতার ইঙ্গিত—'শিপ্রার হাত লেগে ছোট ছোট খুঁটি-নাটি কাজগুলো পর্যন্ত গানের টুকরোর মত বেজে উঠেছে। কাজগুলির দাম একমাত্র তাদের চপল অনাবশ্যকতায়, শিপ্রার সশরীর আত্ম-বিকীরণে। কাজগুলিই তার আকাশের দিকে প্রসারিত জীবনের ছোট ছোট জানালা—তার ছুটি, তার উদ্‌বৃত্তি'; কলিকাতার সন্ধ্যার ধূসর শ্রান্তি,

কুহেলিকাচ্ছন্ন শীত প্রভাতের সাংকেতিক অস্পষ্টতা; বৃষ্টিপ্লাবিত অপরাহ্নের অপরিচয়ের রহস্য, শিপ্রার রোগ-কক্ষের মৃত্যু-ব্যঞ্জনা--"মৃত্যুদিয়ে মাখান, প্রতীক্ষায় নিমজ্জিত—সমস্ত বাড়ির উপর বিশাল একটা ছায়া যেন পাখা মেলে আছে, মৃত্যুর ছায়া, বনানীর প্রত্যাসন্ন আবির্ভাবের ছায়া"—এই সমস্ত দৃষ্টান্তই লেখকদ্বয়ের ব্যঞ্জনা-শক্তির উপর অসাধারণ অধিকার সূচিত করে।

ইঁহাদের উপন্যাসে যে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের অভাব আছে তাহা নহে, কিন্তু ইহার আলোচনা কবিত্বপূর্ণ মনোভাবের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। 'যেদিন ফুটলো কমল'-এ শ্রীলতা পার্থ-প্রতিমের সম্পর্কটি যেরূপ সহপাঠিত্ব, রুচি-সাম্য ও চরিত্র-গত বাধা-সংকোচের ভিতর দিয়া প্রেমের পর্যায়ে পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহা মূলতঃ মনস্তত্ত্বমূলক সমস্যা; কিন্তু কতকটা পুস্তকটির কাব্যময় প্রতিবেশের জন্য ও তাহাদের ভালবাসা আত্ম-অচেতন ভাবে বাড়িয়া উঠায় সমস্ত ব্যাপারটি যেন কাব্যেরই একটা অধ্যায়রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। বিবাহ-সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যানের পর পার্থের ভালবাসা প্রথম আত্ম-সচেতনভাবে জাগিযা উঠিয়াছে—বাস্তবের এই রূঢ় অভিঘাতে সে শ্রীলতাকে সাহিত্য হইতে নারীত্বের আবেষ্টনে স্থানান্তরিত করিয়া তাহাকে প্রথম প্রিযারূপে অনুভব করিযাছে। উপন্যাসেব শেষে যে রেশ আমাদের অনুভূতিতে স্থায়ী হয় তাহা গীতি-কাব্যের।

'একদা তুমি প্রিয়ে' উপন্যাসেও বিশ্লেষণের কাব্যাভিষেক আরও সুপ্রকট। পলাশ ও রেবার মধ্যে অধুনা-অন্তর্হিত প্রেমের পূর্ব-স্মৃতি এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। স্মৃতি প্রকৃত প্রস্তাবে মৃত্যুদূত হইলেও জীবনের নিবিড়তম অনুভূতির সহিত তাহাব একটা অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক আছে বলিয়া জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে ইহা স্বর্ণময় যোগ-সূত্র। রেবা এই স্বর্ণ-সূত্র ধরিয়া আবার তাহাদের প্রেমের নবযৌবন জাগাইতে চাহে, পলাশ কিন্তু জানে যে অতীতের স্মৃতি মৃত প্রেমের জীবন দান করিতে পাবে না। তাহাদের পুনর্মিলন এক অদ্ভুত সংকোচ-জড়তার সৃষ্টি করিয়াছে। পলাশের মনে পূর্বস্মৃতিব প্রেত-পদধ্বনি, ও কর্তব্যবোধ বা করুণার মোহে মিথ্যা প্রেমের অভিনয় না করার দৃঢ়সংকল্প, রেবার মনে একটা অশুভ, অস্পষ্ট আবেগ ও মোহভঙ্গের মধ্যেও সহানুভূতি-লাভের একটা ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা। এই নিদ্রাহীন, পূর্বস্মৃতিব গুরুভারে অসহনীয় রাত্রে রেবার প্রতি পলাশের সেই নিষ্ঠুর, সর্বধ্বংসী আকর্ষণ, এক বন্য দুর্বার অন্ধশক্তির ন্যায় সান্ত্বনাহীন হাহাকারে জাগিয়া উঠিয়াছে—অন্ধকাবে বহুক্ষণব্যাপী তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের পর সে এই প্রজ্জ্বলিত কামনার শিখাকে নির্বাপিত করিতে পারিয়াছে। শেষে পলাশ ও রেবা উভয়েই এই স্মৃতির অসহ্যভার ঝাড়িয়া ফেলিতে ব্যগ্র হইয়াছে, উভয়েই বুঝিয়াছে যে, স্মৃতির আবর্জনা-স্তূপ জীবনের নবীন, নিষ্ঠুর বিকাশের পক্ষে অন্তরায় মাত্র, অতীতের ভগ্নাবশেষ নবীন জীবন রচনার ভিত্তি হইতে পারে না। শেষ পর্যন্ত রেবা প্রণয়িনী হইতে বন্ধুতে অবতরণ করিয়া পূর্বস্মৃতির তীব্র, জ্বালাময় অস্বস্তি হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে। প্রেমের দুঃসহ উত্তাপেব পরিবর্তে একটা শীতল, শিশির-সিক্ত অনুভূতি তাহার হৃদয়ক্ষতে স্নিগ্ধ প্রলেপ লাগাইয়াছে।

কিন্তু এদিকে ভগ্ন মন্দিরের ফাটলে ফুলের ন্যায়, পূর্বস্মৃতিসমাকুল, বহির্জগত হইতে প্রতিহত মনের কোন নিভৃত অবকাশে নূতন প্রেম রক্তিম সৌন্দর্যে অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রতিমা রেবার কিশোরী ছাত্রী, উচ্ছ্বসিত কৌতূহল ও কৈশোরের স্বতঃস্ফূর্ত লীলাময়তায় চঞ্চল। সে

রেবা ও পলাশের সম্বন্ধের মধুর রহস্যটির কস্তুরী-গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াছে, ও সেই রহস্যের পূর্ণ পরিচয় লাভের জন্য ব্যগ্র ও উন্মুখ হইয়াছে। এই নবোদ্ভিন্ন-প্রেম কিশোরী,—রেবার সহিত পলাশের সম্পর্ক-রহস্য উন্মোচনের জন্য রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রতীক্ষমানা—ক্রমশঃ রেবার উপগ্রহ হইতে স্বাধীন সত্তায় পরিণতি লাভ করিযাছে—'সে যেন কল্পনার জ্যোতিশ্চক্র থেকে বেরিয়ে আস্‌তে চায়, তার চোখে যুদ্ধ-ঘোষণার দুঃসাহস।' অবশেষে মেঘ-সাগরের নির্জন তীরে, বৃষ্টিধারা ও বন-মর্মরের মধ্যে পলাশ ও প্রতিমা নূতন প্রেমের জন্ম অনুভব করিল—শুক্লপক্ষের প্রথম চাঁদ, মৃত্যুর গহ্বর থেকে উঠে-আসা, তাদের এই নবজাত প্রেমের উপর জ্যোতির তিলক পরাইয়া দিল। নানারূপ সাংকেতিক পূর্ব-সূচনা আমাদিগকে এই প্রেমের আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত করে—তীব্র গোলাপের গন্ধ, প্রতিমার তাম্বুল-রক্ত অধর—ইহারা যেন প্রতিমার আরক্ত প্রেমের symbol বা রূপক, রেবার মধ্যবর্তিতার ছদ্মবেশ-বর্জন ও পলাশের জন্য গোলাপ ফুলের উপহার এই প্রেমের স্পর্ধিত প্রকাশ্যতায় আত্মপরিচয়-ঘোষণা। কিন্তু পলাশের পূর্ব-স্মৃতিজর্জর, অতীত অভিজ্ঞতায় জীর্ণ হৃদয় এই তীব্রদ্যুতিময়, তরুণ আবির্ভাবকে সহ্য করিতে পারিল না—সে এই 'হঠাৎ ঝল্‌সে ওঠা জীবনের ভয়ঙ্কর উজ্জ্বল কোণ থেকে' পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। যে গোলাপের উপহার সে স্বহস্তে গ্রহণ করিতে সাহস করে নাই, তাহার সৌরভ তাহার স্মৃতিসমাকুল চিত্ত-জগৎকে নূতন গন্ধে ভারাক্রান্ত করিয়াছে।

'বাসর-ঘর'-এ মনস্তত্ত্বমূলক সমস্যা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট—এখানে কবিতারই অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্য। কুন্তলা ও পরাশরেব পূর্বরাগের মধ্যে এই সমস্যার কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে, কিন্তু মোটের উপর উপন্যাসটি মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণেব বিশেষ কোন সহায়তা না করিয়া নিছক কাব্য-চর্চায় পর্যবসিত হইয়াছে। তাহাদের প্রেম যেন তৃতীয় ব্যক্তিব উপস্থিতিতে আরও নিবিড় হইযা উঠিত। জন-সমাকীর্ণ আবেষ্টনেই তাহারা যেন "পরস্পরের সুখ-উপস্থিতি" সমস্ত সত্তা দিয়া অনুভব করিত। "তাদের কথা হ'তো থেমে থেমে, আশ্বিনের বৃষ্টির ছোট ছোট পশলার মত, ভরা হৃদয়ের অস্ফুট ছলছলানি, পাখিব ঝরে' পড়া ছোট পালক যেন হাওয়ায অনেকক্ষণ ভেসে বেড়ায়।" বিবাহে তাহাদের আপত্তি ছিল। সামাজিক অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা তাহাদের প্রেমের অবমাননা, ভালোবাসার উপর সমাজের নাম-সই ছিল তাহাদের সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত। কিন্তু এই ব্যাপাবে কুন্তলা সমাজ-সমর্থনকে দেখিত উদাসীনতার চক্ষে, পরাশর দেখিত প্রবল বিরুদ্ধতার চক্ষে, সমাজেব দাবীব বিরুদ্ধে অতি-সতর্কতার জন্য পরাশরের উপর কুন্তলার ছিল অভিমান। এই অভিমানই পবে প্রবল মতভেদের আকার ধারণ করিয়া তাহাদের পরবর্তী জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য ও সুসমার উপব ক্ষণস্থাযী সংঘর্ষের রূঢ় অভিঘাত আনিয়া দিয়াছে। তাহাদের প্রেমের আর একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহা সাহিত্য-চর্চার সহযোগিতা চাহে না—'সাহিত্যের বালুচরে যাহাতে প্রেমের অবসান না ঘটে' সে বিষয়ে অন্ততঃ পরাশরের তীক্ষ্ণ সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি। আবার ভালবাসার নাম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ বিসর্জন, ভালবাসার মোহ দিয়ে ব্যক্তিত্বের বিলোপ—ইহাও তাহাদের অনভিপ্রেত। এমন কি এই প্রেম "পারস্পরিক বোধগম্যতার" দৃঢ় ভিত্তির উপরও প্রতিষ্ঠিত হইবার দাবী রাখে না। যে প্রেম রহস্যের মায়া ছিন্ন করিয়া অতি-পরিচয়ের সাহায্যে নিজ স্থায়িত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, তাহার মহিমা তাহাদের মতে প্রাত্যহিকতার ধূলিতে মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।

তারপর বাড়ি খোঁজার ব্যাপারে এই প্রেম "ধূসর মধ্যবিত্ততার" বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে ও রঙিন কল্পনার স্বপ্নজালে নিজ বিচিত্র আবরণ রচনা করিয়াছে। অথচ যে প্রেম বাড়ি-খোঁজার ব্যাপারে কল্পনার লীলা ও সৌন্দর্য-প্রিয়তার চরম আদর্শে পৌছিয়াছে, তাহাই আবার গৃহসজ্জা ও উপকরণবাহুল্যকে শ্বাসরোধকারী পাষাণভারের ন্যায় তীব্র বিতৃষ্ণায় বর্জন করিতে চাহিয়াছে ও এই আসবাব-কেনা লইয়াই পরাশর ও কুন্তলার প্রেমে বিচ্ছেদের ফাটল দেখা দিয়াছে।

এই প্রেমের বিশেষত্বের যে বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, মনস্তত্ত্ব-প্রধান উপন্যাসে এই বিশেষত্বের তীক্ষ্ণ কোণগুলি স্ফুট হইয়া উঠিত, চরিত্রের বঙ্কিম রেখা পূর্বাভাসের অনুবর্তনে আপনাকে প্রখরতর করিত, সংঘর্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউগুলি সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়া বিশাল উর্মির তীব্র অবিচ্ছিন্নতা লাভ করিত। কিন্তু কবি-মনোবৃত্তির সংস্পর্শে আলোচনার ধারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে, প্রত্যাশিত পথে প্রবাহিত হয় নাই। কবিত্বের প্লাবন আসিয়া মনস্তত্ত্বঘটিত এই সমস্ত সূক্ষ্ম ইঙ্গিতগুলিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন-ভাবে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, ঘাত-প্রতিঘাতের সুস্পষ্টতা, প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার সুনির্দিষ্টতা সবই যেন কবিত্বের দিগন্ত-প্রসারী ঘন-শ্যাম-রেখায় বিলীন হইয়াছে। কুন্তলা-পরাশর এই প্রেমের বিহ্বল মাদকতায় তাহাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিয়াছে —তাহারা যেন বসন্ত-পবন-হিল্লোলে উড়ন্ত দুইটি রঙিন প্রজাপতির মত ভার-মুক্ত ও লঘু-গতি, মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবাতীত। এ কবিত্বের আবহাওয়ায় সৌন্দর্য বিকশিত হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিত্ব শীর্ণ ও খর্ব হয় তাহা সুনিশ্চিত। পরাশর-কুন্তলা সনাতন প্রেমিক-প্রেমিকা; আধুনিক যুগের রীতি নীতি ও ভাষা তাহাদের আত্মার বহিরাবরণ মাত্র, কিন্তু আধুনিক যুগের উপযোগী তাহাদের অন্য কোনও নূতন পরিচয় নাই। তাহাদের চরিত্রের যে বিশেষত্ব, সংঘর্ষের যে শক্তি মাঝে মধ্যে মাথা তুলিয়াছে, তাহা যেন প্রেমের সম্মোহন ইন্দ্রজালে অভিভূত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

অচিন্ত্যকুমারের 'আসমুদ্র' উপন্যাসেও কবিত্বের এই অতি-প্রাধান্যের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সৌম্য ও বনানীর মধ্যে যে নিবিড়-রহস্যময় সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে, নগ্ন মানবাত্মার যে ব্যাকুল আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়াছে মনস্তত্ত্বের মাপকাঠিতে তাহার মূল্যনির্দেশ চলে না। ইহা গীতি-কাব্যেরই বিষয়। সৌম্যের সহিত বনানীর সহজ আলাপ ও বনানীর গৃহস্থজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঙ্গিতকে অতিক্রম করিয়া উদ্বেলিত মানবাত্মার সমুদ্র-কল্লোল বা স্তব্ধতার অতলস্পর্শ গহনতা তরঙ্গিত হইয়াছে। গৃহস্থালীর তুচ্ছ কর্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে, সহজ ভদ্রতার আদান-প্রদানের মধ্যে মধ্যে আত্মপরিচয়লাভ, পূর্ণ আত্মানুভূতির জন্য ব্যাকুল, অশান্ত ক্ষোভ গুঞ্জরিত হইয়াছে। বনানীর ব্যক্তিত্ব যেন সম্পূর্ণরূপে সাংকেতিকতার দুর্গম অরণ্যানীতে অদৃশ্য হইয়াছে; সে সম্পূর্ণ পরিচয়হীন, ব্যক্তিত্বের বর্ণলেশহীন, আত্মার বিস্ফুরিত শ্বেত দীপ্তিমাত্র। মানবের চিত্ততলে অর্ধ-চেতন আত্মার কারাগৃহে যে অন্ধকার, গহন বন আছে, সে যেন তাহারই প্রতীক ও প্রতিচ্ছবি। সৌম্যের চরিত্রে শিপ্রা ও বনানীর সাহচর্যে দুইটি দিক্ বিকশিত হইয়াছে; তাহার ব্যক্তিত্ব যেন স্বপ্নবিধুর ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আধ্যাত্মিক অনুভূতির তটহীন তরলতায় বিগলিত হইয়াছে। বনানীর অন্তর্ধানের পর তাহার চরম বিফলতার মুহূর্তে ঘরের দরজা খুলিয়া রাখার জন্য তুচ্ছ সাংসারিক ভাবনা তাহার ব্যক্তিত্বের এই দ্বৈততাই

সূচনা করে। এক শিপ্রার মধ্যেই তীক্ষ্ণ বাস্তবতা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। তাহার চরিত্রটিই মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের মানদণ্ডে বিচারণীয়। শিপ্রার বধূজীবনের অপরিমেয় সাংকেতিকতা কেমন করিয়া ধীরে ধীরে গৃহিণীপণার সুনির্দিষ্ট কর্তব্য-পরিধির মধ্যে সংকুচিত, সাংসারিকতার স্থূল আবেষ্টনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে—সে "এখন সমর্পণের সমতলতা থেকে অভিজ্ঞতার চূড়ায় উঠে এসেছে। তার সেই প্রথম ক্ষণিক চিরন্তনতা থেকে নেমে এসেছে প্রত্যহের প্রয়োজনে, তাকে অতিক্রম করে নেই যেন আর সেই অশরীরী স্বর"—, তার আটপৌরে শাড়ী কেমন করিয়া অভ্যাসের ধূলি-মলিন হইয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে, তাহার বর্ণনা মনস্তত্ত্বঘটিত পরিবর্তনের সামিল। তাহার গৃহিণীপণার তীক্ষ্ন আত্মপ্রচারই সৌম্যের সঙ্গে তাহার ব্যবধানের প্রথম স্তরের সৃষ্টি করিয়াছে। তারপর বনানীর আবির্ভাবে তাহার দাম্পত্যজীবনের সৌভাগ্য-গর্বে ঈর্ষ্যার বিদ্যুৎ-ঝলক সঞ্চারিত হইয়াছে। এখন হইতে বনানীর প্রতি একটা তীব্র, অশোভন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব তাহার জীবনে প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার সন্তানের জন্ম তাহাকে পরিবর্তনের আর এক স্তরে লইয়া গিয়াছে—অবশ্য এই পরিবর্তন ঠিক ব্যক্তিগত নয়, সমগ্র নারীজাতির পক্ষে সাধারণ। তাহার শিশুপুত্র তাহাকে স্বামীর প্রতি উদাসীন করিয়া তাহাদের দাম্পত্য-জীবনের ব্যবধান বিস্তৃততর করিয়াছে, আবার এই ঔদাসীন্যের প্রতি সৌম্যের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া তাহার সন্দিগ্ধতাকে সর্বগ্রাসী করিয়া তুলিয়াছে। শেষ পর্যন্ত স্বামীর গতিবিধির উপর লক্ষ্য করিবার জন্য গুপ্তচর লাগাইয়া সে সৌম্যকে অকুণ্ঠিত, নির্লজ্জ বিদ্রোহ-ঘোষণায় উত্তেজিত করিয়াছে। একদিন মাত্র তার এই ঈর্ষ্যা বিকল, সন্দেহ-ধূমাকুল চিত্তে উপলব্ধির আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আত্মবিসর্জনের একটা প্রবল ঢেউ আসিয়া তাহার ইতর মনোবৃত্তি, স্বার্থরক্ষার প্রবল প্রচেষ্টা ও ক্ষয়কারী দুশ্চিন্তাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। এই কাব্য-কুহেলিকার মধ্যে শিপ্রাই সুস্পষ্ট চরিত্রাঙ্কনের একমাত্র নিদর্শন, কবিতা-প্লাবনের মধ্যে একমাত্র সেই পরিচিত মৃত্তিকা-স্পর্শ।

(২)

বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্যকুমারের সমগ্র উপন্যাসাবলীর কালানুক্রমিক আলোচনার জন্য গ্রন্থমধ্যে স্থানাভাব, বিশেষতঃ সেরূপ আলোচনাও নিষ্প্রয়োজন। তাঁহাদের যে কয়টি উপন্যাসের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, তাহা হইতেই তাঁহাদের সাধারণ প্রবণতা ও ভঙ্গী-বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হইবে। তাঁহাদের ক্রমপরিণতির ধারা-অনুসরণও সংক্ষেপে সারা যাইতে পারে। বুদ্ধদেবের প্রকাশিত উপন্যাসের তালিকা 'অকর্মণ্য' (জানুয়ারি, ১৯৩১), 'রডোডেনড্রন গুচ্ছ' (নবেম্বর, ১৯৩২), 'সানন্দা' (মে, ১৯৩৩), 'যেদিন ফুটলো কমল (আগষ্ট, ১৯৩৩), 'অসূর্য্যম্পশ্যা' (ডিসেম্বর, ১৯৩৩), 'একদা তুমি প্রিয়ে' (মে, ১৯৩৪), ও 'বাসর-ঘর' (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫) হইতে তাঁহার পরিণতির ধারা মোটামুটি বুঝা যাইবে। তাঁহার প্রথম তিনটি উপন্যাসে চরিত্রগুলি যেন reflections-এর স্রোতোবেগে ভাসমান তৃণগুচ্ছের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। 'সানন্দা'য় সানন্দার চরিত্র-পরিকল্পনায় কতকটা মৌলিকতা থাকিলেও ইহাতে নিয়ম-শৃঙ্খলা অপেক্ষা খামখেয়ালিরই প্রাধান্য। রবীন্দ্র-ভক্তদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক অনুযোগ, অনুকরণাত্মক সাহিত্য-বিচারপদ্ধতির বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ, ধীরাজ, প্রসন্ন, পুরন্দর, চন্দ্রিকা, প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর কবি-

যশঃপ্রার্থীদের অতিরঞ্জিত ব্যঙ্গ-চিত্র—ইহাদের মধ্যে ঝাঁঝালো, অথচ ছেলেমানুষি ব্যঙ্গ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

'যেদিন ফুটলো কমল'-এই প্রথম কতকটা পাকা হাতের পরিচয় মিলে; উপন্যাসের গঠনও বিক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খল চিন্তা-ধারায় কেন্দ্র-সংহতির পরিচয় দেয়। লেখক এলোমেলো চরিত্রসৃষ্টি ও reflections বর্জন করিয়া একটি নিবিড় অনুভূতিপূর্ণ প্রেমকাহিনীর পরিণতির দিকে স্থির লক্ষ্য রাখিয়াছেন—নায়ক-নায়িকার চরিত্রেও কাব্য-প্রতিবেশ হইতে স্বতন্ত্র একটা ব্যক্তিত্ব আছে। 'একদা তুমি প্রিয়ে' ও 'বাসর-ঘর'-এ এই কেন্দ্র-সংহতি আরও পরিস্ফুট হইয়াছে, যদিও ইহার সঙ্গে সঙ্গে কাব্য-প্রবণতা বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

জুলাই ১৯৪২-এ প্রকাশিত 'কালো হাওয়া'য় বুদ্ধদেবের বাস্তবপ্রবণতা ও কাব্যাবেশবর্জন যে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে তাহা বোঝা যায়। মনে হয় বুদ্ধদেব এতদিনে কাব্য হইতে উপন্যাসকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে শিখিয়াছেন ও খাঁটি ঔপন্যাসিকের উপযুক্ত আলোচনা-পদ্ধতি ও জীবন-অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। ভাষার আতিশয্য-বর্জিত সংযম, মানস ঘাত-প্রতিঘাতের দৃঢ়, সুস্পষ্ট উপলব্ধি, বিশ্লেষণের সাবলীল নৈপুণ্য, ঘটনা-প্রবাহের সুদক্ষ নিয়ন্ত্রণ—এই সমস্ত দিক্ দিয়াই পরিণতির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। অরিন্দম, হৈমন্তী, মিনি, বুলু, অরুণ, উজ্জ্বলা—অরিন্দমের পরিবার-বৃত্তের আদর্শ-বিরোধ ও পরস্পরের প্রতি প্রীতি-বিমুখতা-মিশ্র-মনোভাব সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে। সমগ্র পরিবারের জীবন-যাত্রার উপর মা মহামায়ার সর্বনাশী প্রভাব ছায়াপাত করিয়াছে—তীব্র এসিডের মত ইহা পারিবারিক সংহতির স্নেহ-সূত্রকে তিলে তিলে ক্ষয় করিয়া একটা নির্লিপ্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অরাজকতা সৃষ্টি করিয়াছে। পারিবারিক জীবনের এই নিবিড় শূন্যতা ভয়াবহ সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করিয়া সমস্ত বাড়ির আকাশ-বাতাসে পক্ষবিস্তার করিয়াছে। হৈমন্তীর ধর্মোন্মাদে অভিভূত, অর্ধজড় ইচ্ছাশক্তি অতর্কিত উত্তেজনার বশে স্বামীর বুকে পিস্তল চালাইয়া এই আসন্ন বিপদের ছায়াকে বাস্তবরূপ দিয়াছে। এই সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার ফলে হৈমন্তীর চিত্ত-বিকার তাহার অস্বাভাবিক আত্মনিরোধের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া। পিস্তলের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মননক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটিয়াছে—বাড়ির লোকের নিদারুণ বিক্ষোভ ও শশব্যস্ত ছুটাছুটি অর্থহীন খণ্ড-দৃশ্যের ছায়াবাজির ন্যায় তাহার উদ্‌ভ্রান্ত মনে প্রতিফলিত হইয়াছে। হৈমন্তীর এই অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া-পড়ার বর্ণনা কলাকৌশল ও মনস্তত্ত্বের অনুবর্তন—উভয় দিক্ দিয়াই প্রশংসনীয় হইয়াছে। বুদ্ধদেব-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিষয়বস্তুর অকিঞ্চিৎকরতা ও বাস্তববোধের অভাবের জন্য যে একটা অভিযোগ প্রচলিত আছে, বর্তমান উপন্যাস তাহার আংশিক খণ্ডন।

অচিন্ত্যকুমারের পরিণতির ধারা 'বেদে', 'উর্ণনাভ' (জুলাই, ১৯৩৩) ও 'আসমুদ্র' (জুন, ১৯৩৪) এই উপন্যাস কয়েকটির ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। 'বেদে' ও 'টুটা-ফুটা' নামক একটি ছোট গল্পের সমষ্টিতে লেখক জীবনের কুৎসিত, বীভৎস, দারিদ্র্য-পিষ্ট, বিদ্রোহ-ক্ষুব্ধ, পাপ-পিচ্ছিল দিকের প্রতি একটা অস্বাস্থ্যকর প্রবণতা দেখাইয়াছেন। ইংরেজী রোমান্টিক যুগে Byronismএর মত আধুনিক ঔপন্যাসিকদের ইহা একটা pose বা বাহ্যাড়ম্বর। দারিদ্র্য ও জীবনের অবিচারের বিরুদ্ধে একটা তিক্ত, নৈরাশ্যমূলক ক্ষোভ ও উদ্ধত নৈতিক বিদ্রোহ—আমাদের তরুণ ঔপন্যাসিকদের অন্তঃরুদ্ধ বাষ্পনিষ্কাশনের একটা পথ ও সুলভ

উপায় মাত্র। কিন্তু এই ক্ষোভের মধ্যে সহজ আন্তরিকতা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অপেক্ষা সাড়ম্বর বিদ্রোহ-ঘোষণা ও বাস্তবের সীমাতিক্রমকারী অতিরঞ্জনের পরিচয় পাওয়া যায়। বিষয়-বস্তুর অভাবও এই কুৎসিত-প্রবণতার আর একটা কারণ বলিয়া মনে হয়। দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি ও হৃদয়হীন সমাজ-ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযান যে সকল সময়েই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা দিতে পারে না, বিষয়-নির্বাচনের উপরেই যে সাহিত্যিক উৎকর্ষ নির্ভর করে না, এই সম্ভাবনার প্রতি আমাদের তরুণ সাহিত্যিকেরা যথেষ্ট সজাগ আছেন বলিয়া মনে হয় না। আবার এই কুৎসিত আবেষ্টনের মধ্যে অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্যসঞ্চার, বীভৎসতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুষমার গোপন প্রবাহ—ইহাও এই প্রকার বিষয়-নির্বাচনের পক্ষে একটা প্রবল আকর্ষণ। 'বেদে' উপন্যাসে 'বাতাসী' অধ্যায় এইরূপ কাব্য-সুষমা-মণ্ডিত। অচিন্ত্যকুমারের পরবর্তী পরিণতি লক্ষ্য করিলে ইহাই মনে হয় যে, বীভৎসতার প্রতি তাঁহার কোন স্বাভাবিক প্রবণতা নাই, বরং কুৎসিতের ঊষর মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া এক দুরধিগম্য সৌন্দর্যলোকে উত্তীর্ণ হওয়াই তাঁহার প্রকৃত কাম্য।

'আকস্মিক' (১৯৩০) 'বেদের' ঠিক পরবর্তী রচনা বলিয়া মনে হয়। 'বেদের' বীভৎস অশ্লীলতা ইহার নাই ; কিন্তু গণিকা-জীবনই ইহার উপজীব্য। চরিত্র-পরিকল্পনা, ঘটনা-সন্নিবেশ ও জীবন-সমালোচনায়—সর্বত্রই আকস্মিকতার অতি-প্রাদুর্ভাব, কারণ-শৃঙ্খলার একান্ত অভাব উপন্যাসটিকে অন্বর্থনামা করিয়াছে। গ্রন্থের চরিত্রগুলির জীবনযাত্রা যেন মাধ্যাকর্ষণ-নিয়ন্ত্রণের ধার ধারে না। শশী দামিনীকে খুন করিয়া বেকসুর উধাও হইল ; মাতালেরা তাড়ি খাইয়া জীবন্ত মানুষ নিকুঞ্জকে পোড়াইল। এখানে আইন নিষ্ক্রিয় ; সমাজ নীরব ; বিবেক-দংশন মূক। নিকুঞ্জের স্ত্রী কুঞ্জ গণিকা হইতে অকস্মাৎ পাতিব্রত্যধর্মের প্রতীকে রূপান্তরিত হইয়াছে। সে পঞ্চুর আশ্রয়ে আসিয়াও নিজ সতীত্ব রক্ষা করিয়াছে। এদিকে আবার রাখুর প্রতি তাহার সর্বগ্রাসী অপত্যস্নেহ ভাব-বিলাসের চরম সীমা স্পর্শ করিয়াছে। উপন্যাসের চরিত্রাবলীর মধ্যেই এক পঞ্চুই জীবন্ত সৃষ্টি—তাহার নীড় বাঁধিবার করুণ আগ্রহ ও নিদারুণ মোহভঙ্গ তাহার প্রতি পাঠকের সমবেদনার উদ্রেক্ করে। উপন্যাসের মধ্যে নিছক খামখেয়ালি ছাড়া কোনও গভীরতর উদ্দেশ্যের সন্ধান মিলে না।

'কাকজ্যোৎস্না' উপন্যাসে ভাব-সংহতির দিক্ দিয়া কিছু উন্নতি দেখা গেলেও, চরিত্র চিত্রণে, পাত্র-পাত্রীর আচরণে উদ্ভট অস্বাভাবিকতার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। প্রদীপ ও অজয় উভয়েই বিধবা নমিতার নিরর্থক কৃচ্ছ্রসাধনের বিরোধী—অজয়ের তীব্র সমালোচনার সহিত তুলনায় প্রদীপ অনেকটা এই নিষ্ফল আত্মনিগ্রহের প্রতি ক্ষমাশীল। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল যে, একদিন প্রদীপ যে রুদ্ধদ্বার ঘরে নমিতা সাড়ম্বর স্বামীপূজার ব্যর্থ, অতৃপ্তিকর অভিনয়ে নিযুক্ত ছিল সেখানে উন্মত্ত ঝড়ের মত প্রবেশ করিয়া তাহার পূজোপকরণসমূহকে পদাঘাতে লণ্ড-ভণ্ড করিয়াছে ও সমাজবন্ধন প্রকাশ্যভাবে ছিন্ন করিবার জন্য তাহাকে উত্তেজিত করিয়াছে। তার পরের দিন নমিতা যখন গৃহত্যাগে তাহার সঙ্গী হইবার জন্য প্রদীপকে আমন্ত্রণ পাঠাইয়াছে, তখন প্রদীপের সমস্ত বীরত্বের আস্ফালন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে ও নিতান্ত সাধারণ হিসাবী মানুষের ন্যায়ই সে ভবিষ্যৎ ফলাফল বিবেচনা করিয়া দুঃসাহসিকতার

এই আমন্ত্রণ অস্বীকার করিয়াছে। তাহার মনের তাপমানযন্ত্রে পারদের এই উত্থান-পতন সম্পূর্ণ কারণহীন ও আকস্মিক বলিয়াই ঠেকে।

'প্রচ্ছদপট' (১৯৩৪) উপন্যাসটি মূলতঃ কাব্যধর্মী—শ্রীপর্ণা ও নিরঞ্জনের পূর্বরাগ, প্রেম ও বিবাহে পরিণতির কাব্যোচ্ছ্বাসময় বিবরণ ইহার প্রথমাংশের আলোচ্য বিষয়। পরবর্তী-স্তরে শ্রীপর্ণার পূর্বস্বামীর ঔরসজাত পুত্র আদিত্যের প্রতি তাহার অপত্যস্নেহের অপরিমিত আতিশয্য এই নবজাত দাম্পত্য প্রেমকে অভিভূত করিয়াছে। এই উভয়বিধ আকর্ষণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ-কুশলতার দাবী করে—এইখানেই লেখক প্রত্যাশিত পটুতা দেখাইতে পারেন নাই। প্রেমের প্রবল জোয়ারের মধ্যে যে মতদ্বৈধ ও অনৈক্যের বীজ নিহিত ছিল, উভয়ের চরিত্রের মধ্যে যে অসামঞ্জস্যের আভাস আত্মগোপন করিয়াছিল লেখক তাহার কোন পূর্বসূচনাই দিতে পারেন নাই। পলাতক প্রেমকে ধরিয়া রাখিতে কেহই কোন চেষ্টা করে নাই—আদিত্যের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমিক-প্রেমিকা যেন পরস্পরের সম্মতিক্রমেই দূরে সরিয়া গিয়াছে। সাংকেতিকতার অতি-প্রাদুর্ভাব শ্রীপর্ণা-নিরঞ্জনের ব্যক্তিত্বকে শীর্ণ করিয়াছে—তাহাদের ব্যবহারের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছার ক্রিয়া অপেক্ষা স্বপ্নাভিভূত, যান্ত্রিক আড়ষ্টতাই বেশি প্রকট হইয়াছে। প্রত্যেক বাক্য ও কার্য, প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে আত্মার বিস্ফুরণ আরোপ করিতে গেলে মানুষ যেন "আত্মদৈত্যের" হাতের অসহায় ক্রীড়নক হইয়া পড়ে। উপন্যাসটিতে কাব্যধর্মী সাংকেতিকতার প্রভাবে সচেতন বিশ্লেষণ সম্মোহিত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

'উর্ণনাভ' উপন্যাসটির পরিকল্পনার মৌলিকতা অচিন্ত্যকুমারের অগ্রগতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ—ইহার মধ্যে তাঁহার প্রথম উপন্যাসের কোন প্রভাবই দেখা যায় না। এক তরুণ কবি দারিদ্র্যের শোষণকারী প্রভাব হইতে আত্মরক্ষার জন্য স্নেহপরায়ণ অভিভাবকত্বের নিশ্চিন্ত নীড়ে আশ্রয় লইয়াছে—কিন্তু ইহাতে তাহার কবিজীবনের সমস্যা মেটে নাই। দারিদ্র্যের অভিঘাত ও অভিভাবকের স্নেহাঞ্চল—ইহার মধ্যে কোন্‌টা কবি-প্রতিভা-বিকাশের কম অনুকূল তাহা নির্ণয় করা কঠিন, বিশেষতঃ যখন ইহাদের মধ্যে প্রেমের অপ্রতিরোধনীয় আবির্ভাব জীবনে ও কবিতায় এক দারুণ অসামঞ্জস্য ও উন্মত্ত বিক্ষোভ জাগাইয়া তোলে। কুবেরের কাব্যজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের এই ইতিহাস উপন্যাসের বিষয়-হিসাবে চমৎকার মৌলিকতার দাবী করিতে পারে—তাহার কাব্য-বিকাশের ক্রমিক স্তরগুলি খুব সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দেয়। তাহার প্রথম কাব্য-প্রেরণা আসিয়াছে শহর ও তাহার বিচিত্র বৈপরীত্যের উৎস হইতে। তারপর তাহার কবিতার অভিজাত নির্জনতা ভঙ্গ হইল গদ্যের গণতান্ত্রিক কোলাহলে, এবং সাহিত্যিক ব্যবসায়-বুদ্ধির নিকট আত্ম-সমর্পণের ফলে তাহাকে 'নিজের অনুভূতির চূড়া থেকে জন-সাধারণের সহজ-বোধ্যতায়' অবতরণ করিতে হইল। 'বিবুবিয়সের তলায় বসে সে প্রকৃতির উদার স্নেহের কথা লিখ্‌তে পারলো না, কাঁটায় যে শুয়ে আছে তার কাছে ফুলের কথা শুন্‌তে চাওয়া পাগ্‌লামি'। সুশান্তের আরামপূর্ণ আশ্রয় লাভের পর তাহার কাব্যজীবনে পরিবর্তনের তৃতীয় স্তর উপস্থিত হইল—জীবন হইতে কোনরূপ উত্তেজনা বা চাপ না পাইয়া, কোন অনুভূতির তীব্র তাপ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহার সাহিত্য-সাধনার উপর শূন্যতার মৃত্যু-নীরবতা নামিয়া আসিল। বেবির সহিত পরিচয়ে

তাহার কাব্য ও ব্যক্তিগত জীবনে এই নিশ্চেষ্টতার অবসান হইয়া প্রবল বিপ্লবের প্লাবন আসিল। 'কুবের আবার তার শিরা-স্নায়ুতে কবিতার কান্না শুনতে পেলো'। আবার বেবি যে নিছক কবিতার বিষয় নয়, সে যে বিশেষ একটি নারী, সে যে কুবেরের মনে কেবল কবিতা জাগায় তাহা নয়, তাহার অমিত, বলদৃপ্ত যৌবনকে উদ্দীপিত করে—এই অতর্কিত উপলব্ধি তাহাব মধ্যে এক অননুভূত-পূর্ব বিহ্বলতা আনিয়াছে। এই সন্ধিক্ষণে সুশান্তর নিশ্ছিদ্র অভিভাবকত্ব ও এই অভিভাবকত্ব মানিয়া চলায় তাহার প্রতি বেবির তীব্র ঘৃণা তাহার অন্ত বিপ্লবকে আরও অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। কুবেরের নূতন প্রেম-কবিতা হইতে একটা তীব্র অগ্নি-দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইয়াছে—"আগের কবিতা লেখা চোখের জলে, এখনকার কবিতা লেখা গাঢ, মদির রক্তে, আগের কবিতায় ছিলো রেখায় অস্পষ্টতা, রঙের কোমলাভ, বিষণ্ণ প্রশান্তি, ভাবের অস্ফুট কাব্যোচ্ছ্বতা, এখন পূজার স্থানে তীব্র পিপাসা, অভিনন্দনের দূরত্ব অতিক্রম করে অন্তরঙ্গতার বুকফাটা হাহাকাব। বেখাগুলি এখন ক্ষুরধার, স্পষ্ট রঙে এসেছে বিহ্বল প্রগল্ভতা, ভাবে কামনার উত্তাপ, ভাষায় আর্ত্তনাদের লেলিহান বহ্নিচ্ছটা।" এই তুলনাব সূক্ষ্মদর্শিতা ও প্রকাশনিপুণতা উচ্চ প্রশংসার উপযোগী।

কুবের এবাব সুশান্তর অভিভাবকত্বেব ক্লান্তিকর তীক্ষ্ণতা হইতে অব্যাহতি পাইবাব আবেদন জানাইযাছে। এমন সময় ঝডেব মত অগ্নিমূর্তি বেবি ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে তাহাব তীব্র ঘৃণার দ্রাবকে ক্ষত-বিক্ষত কবিযাছে। বেবিব অনুযোগ যে, তাহার নাম দিযে প্রকাশিত কুবেরের উষ্ণ, আবিল প্রেম কবিতা তাহার নারীত্বের অপমান করিয়াছে। বিশেষতঃ যখন লেখকের এই উষ্ণ প্রেমধারা জীবনে প্রবাহিত করার সাহস নাই। এই আঘাতে কুবেরের জীবনে পরিবর্তনেব শেষ স্তব আসিয়া পৌছিয়াছে—'কবার চেযে হওয়ার নেশা তাকে পেযে বসেছে'—প্রেম-কবিতা রচনা অপেক্ষা জীবনে প্রেমেব নিবিড অনুভূতি-লাভ কাম্যতর বলিয়া সে বুঝিতে পারিয়াছে। এই মুহূর্তে বেবির প্রখব ব্যক্তিত্ব সামাজিক ও পারিবারিক অনুমোদনের প্রতি তাহাব তীব্র অবজ্ঞা কুবেরের নিশ্চেষ্টতাকে অভিভূত করিয়া তাহাকে বেবির নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য কবিয়াছে এবং বেবি ও কুবেরের অপ্রত্যাশিত মিলনেব মধ্যে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

চরিত্র-সৃষ্টির দিক্ দিয়া উপন্যাসটি কোন কৃতিত্বপূর্ণ বিশেষত্বেব দাবী করিতে পারে না। কুবেরের নিষ্ক্রিয়তা, তাহাব অবিচ্ছিন্ন পরমুখাপেক্ষিতা তাহার চরিত্রকে নির্জীব করিয়াছে—প্রেমেব ব্যাপারেও সে করধৃত পুত্তলিকার ন্যায় বেবির অঙ্গুলি-হেলনে চালিত হইয়াছে। তাহার কাব্য তাহার ব্যক্তিগত জীবনকে অতিক্রম করিয়াছে। এমন কি বেবিও পরি-কল্পনায় যতটা প্রখর-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলিযা কীর্তিত হইয়াছে ব্যবহারিক জীবনে তদনুরূপ হয় নাই। 'আবির্ভাব' সম্প্রদায়ের চিত্রটি তীব্র অন্তর্ভেদী ব্যঙ্গেব প্রয়োগে অতিশয় উপভোগ্য হইয়াছে, ইহার সদস্যদের বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্যিক দুরাকাঙ্ক্ষা উপহাসের তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ হইয়া পাঠকের ব্যঙ্গ-রসাস্বাদনস্পৃহাকে তৃপ্তি দিয়াছে। 'তাদের কৌটো করা তুলোর বিছানায় বিলাসী আঙুরের জীবন, যারা বাস করে জীবন্ত মিউজিয়ামে, জ্ঞানের ল্যাবরেটারিতে'—এই বর্ণনার মধ্যে অভ্রান্ত লক্ষ্য-সন্ধানের সহিত তীব্র শ্লেষের ঝাঁজ মিশিয়াছে। সুশান্তর চরিত্রে সহৃদয়তার সহিত কর্তৃত্বাভিমানের, উদারতার সহিত আত্মরক্ষামূলক সতর্কতার সুন্দর মিলন

সংঘটিত হইয়াছে। বোধ হয় চরিত্রসৃষ্টিতে সুশান্তই সকলের চেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করিয়াছে। সুশান্তর বড়বৌদিদি ও মেজোবৌদিদির মধ্যে প্রকৃতি-গত পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, কিন্তু তাহারা অপ্রধান চরিত্র বলিয়া এই ইঙ্গিতকে বিশেষ পরিস্ফুট করা হয় নাই। মোট কথা উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ চরিত্র-সৃষ্টি নহে। কাব্য ও জীবন সম্বন্ধে গভীর ও চিন্তাশীল মন্তব্য—ইহাই অচিন্ত্যকুমারের আসল কৃতিত্ব।

'আসমুদ্র' উগন্যাসের বিস্তৃত আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে—ইহাতে অচিন্ত্যকুমারের পরিণতির একটা নূতন দিক্ দেখা যায়। উপন্যাসটি আগাগোড়া অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তার সুরে বাঁধা। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, লেখকের অগ্রগতি বাস্তবতার পথ অনুসরণ না করিয়া বুদ্ধদেবের প্রদর্শিত সাংকেতিকতার পথ ধরিয়াই চলিয়াছে। ভাষা, বর্ণনা-ভঙ্গী, জীবন-সমালোচনা এই সমস্ত বিষয়েই বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্যের মধ্যে আশ্চর্য ঐক্য দেখা যায়। এই ঐক্যের একটি চমৎকার উদাহরণ মিলে 'বিসর্পিল' উপন্যাসে (এপ্রিল, ১৯৩৪)—ইহা অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের মিলিত রচনা বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই উপন্যাসে বিভিন্ন হাতের রচনার মধ্যে কোন বিচ্ছেদ-রেখা ধরা যায় না। মোটের উপর ইহাতে কবিত্ব অনেকটা সংকুচিত থাকায় ও বাস্তবতা অনেকটা প্রাধান্য লাভ করায় ইহাতে বুদ্ধদেবের প্রভাব সর্বাপেক্ষা কম বলিয়া অনুমান করা যায়। পরিকল্পনার কৃতিত্ব বোধ হয় অচিন্ত্যকুমারের, কেননা ইহার সহিত তাঁহার পূর্বতন উপন্যাস 'ঊর্ণনাভ'-এর বিশেষ বিষয়সাদৃশ্য আছে। ইহার বাস্তব-প্রবণতা ও একপ্রকার শুষ্ক, সংযত ব্যঙ্গের সর্বব্যাপী অস্তিত্বের জন্য দায়িত্ব বোধ হয় প্রেমেন্দ্রের। এই অনুমানসিদ্ধ বিভাগ সত্য হউক আর নাই হউক, এই তিন বিভিন্ন ব্যক্তির রচনা নিশ্চিহ্নভাবে এক হইয়া গিয়াছে। সিতিকণ্ঠের আত্মসম্মানলেশহীন ইতরতা ও উদ্দেশ্যহীন ঈর্ষ্যা ও কৃতঘ্নতা একটু যেন অতিরঞ্জনের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে—তাহার সাহিত্যিক প্রতিভা ও চরিত্রগত নীচতার মধ্যে অসামঞ্জস্য যেন অহেতুক বিকৃতির মতই দেখাইয়াছে। মাধুরীর সঙ্গে রথীর বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য সিতিকণ্ঠের প্রাণান্ত চেষ্টা আমাদিগকে Iagoর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহার মুহূর্তব্যাপী আন্তরিকতা ও আত্মগ্লানি যেন তাহার স্বভাবসিদ্ধ, অতলস্পর্শ কুটিলতার আর একটা ছদ্মবেশমূলক আত্মপ্রকাশ—এই ধারণাই আমাদের বদ্ধমূল হয়। এই সবল উচ্ছ্বাস তাহার বিষদিগ্ধ মনের কোন্ নির্মল উৎস হইতে প্রবাহিত, উপন্যাস মধ্যে তাহার কোন ইঙ্গিত মিলে না। সিতিকণ্ঠের চরিত্র-পরিকল্পনায় এই আতিশয্যটুকুই মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের দিক্ দিয়া উপন্যাসের কেন্দ্রস্থ দুর্বলতা।

রথীর অদৃষ্টে দুর্দৈব-সংঘটনের যে একটা মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা সম্ভবতঃ প্রেমেন্দ্রেরই পরিকল্পনা—কেননা ইহার অনুরূপ কিছু বুদ্ধদেব বা অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাসে পাওয়া যায় না। রথী সাধারণ মানুষ হইয়া অসাধারণত্বের দুরাশায় নিজ জীবনে দুর্দৈবকে ডাকিয়া আনিয়াছে—এই ব্যাখ্যা খুব যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় না। তথাপি এই প্রয়াসই বুদ্ধ-অচিন্ত্য হইতে প্রেমেন্দ্রের স্বাতন্ত্র্যের নিদর্শন।

অচিন্ত্যকুমারের দুইটি ছোট গল্পসমষ্টি—'ইতি' (১৯৩২) ও 'অকাল বসন্ত'—তাঁহার ছোট গল্প-রচনা-নৈপুণ্যের নিদর্শন। 'যে কে সে' ও 'দিনের পর দিন' দুইটি গল্পে প্রেমেন্দ্রের রোমান্স-বিমুখ, শ্লেষপ্রধান মনোভাবের প্রভাব লক্ষিত হয়। প্রথমটিতে 'ধূসর মধ্যবিত্ততার'

শ্বাসরোধকারী সংকীর্ণতার তীব্র অনুভূতি, রূঢ় বাস্তবের অভিঘাতে গরিব কেরানীর আদর্শ-স্বপ্নভঙ্গ অভিব্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে চির-রুগ্ন স্ত্রীর সেবাক্লান্ত স্বামীর মুক্তি-ব্যাকুলতা, স্ত্রীর কর্কশ সন্দিগ্ধ ব্যবহার ও স্বামীর জড় ঔদাসীন্যে প্রথম প্রণয়াবেশের সম্পূর্ণ অবলুপ্তির কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 'অরণ্য' গল্পটি এক পরিবারভুক্ত বিভিন্ন স্ত্রী-পুরুষের পারিবারিক ঐক্যের অন্তরালে প্রধূমিত ক্ষোভ-আকাঙ্ক্ষা-ব্যর্থতাবোধের চিত্র। শেষে একটি বালকের দুর্ঘটনামূলক মৃত্যু এই কেন্দ্রাতিগতার প্রতিরোধ করিয়া প্রত্যেক বিভিন্নমুখী হৃদয়ের উপর শোকের সাম্য-যবনিকা টানিয়া দিয়াছে। 'বিবাহিতা' গল্পে রাখাল, স্বামী কর্তৃক উৎপীড়িতা তাহার বাল্য সহচরী বিমলার প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে গিয়া, তাহারই ষড়যন্ত্রে লাঞ্ছিতা হইয়াছে। রাখালের প্রতিবেশী-সুলভ, ভাবার্দ্র সমবেদনা বিমলার চরম বিদ্রোহে উন্মুখ মনোভাবের সহিত সমতা রাখিতে অক্ষম--তাই সে তাহার নিষ্ফল হিতৈষণাকে কলঙ্ক-লাঞ্ছিত করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। যে স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুতে বিচরণকামী তাহাকে পিত্রালয়ে লইয়া যাওয়ার, পিঞ্জর হইতে পিঞ্জরান্তরে বদলি করার, প্রস্তাবের মধ্যে যে তীব্র অসংগতি ও উপহাস্যতা আছে নির্দোষ রাখালের অপমানে তাহারই সার্থক পরিণতি।

'নীরব কবি' ও 'উপজীবিকা' গল্পদ্বয়ে কাব্য-চর্চার দুই বিপরীত পারিপার্শ্বিকের আলোচনা হইয়াছে। প্রথমটিতে কবিযশঃপ্রার্থী কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিভাকে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ-দানের জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ব্যাকুল, উৎকণ্ঠিত প্রয়াস, সদা-জাগ্রত, সতর্ক শ্যেনদৃষ্টি ও কনিষ্ঠের প্রতিষ্ঠা-গৌরবে গৌরবান্বিত, উৎফুল্ল মনোভাবের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে অতি-প্রশ্রয়ের উৎকোচ-লব্ধ অবসর প্রায়ই বন্ধ্যাত্বের অভিশাপগ্রস্ত হয়—কর্তব্যচ্যুতির অস্বাভাবিক প্রেরণায় বর্ধিত অনুশীলন-বৃক্ষে কাব্যসৃষ্টি মুকুলিত হয় না। দ্বিতীয়টিতে ইহার ঠিক বিপরীত প্রতিবেশ—সাংসারিক প্রয়োজনের অচ্ছেদ্য গ্রন্থি-রজ্জুতে প্রতিভার উদ্বন্ধন-অপমৃত্যু। 'সন্ধ্য সূর্যোদয়' ও 'যৌবন' গল্পদ্বয়ে তরুণের আদর্শ-স্বপ্নের প্রতি বৃদ্ধের সমবেদনাপূর্ণ মনোভাব বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম গল্পে পিতা নিজ পূর্ব প্রণয়-জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে নারী-জাতির আদর্শ-নিষ্ঠায় বিশ্বাস হারাইয়াছেন। তাই তাঁহার কন্যার সহিত নির্ধন, তরুণ কবির বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ীর প্রতি সহানুভূতির মধ্য দিয়া তাঁহার নিজের অতীত মোহভঙ্গের করুণ স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। শেষ পর্যন্ত এক অবিরল-বর্ষণ সন্ধ্যায় কন্যার রুদ্ধদ্বার কক্ষে এই ব্যর্থ প্রণয়ীর আবিষ্কার পিতার চিন্তা-ধারাকে বিষাদময় ভাব-রোমন্থন হইতে বাস্তবের হাস্যকর অসংগতির মধ্যে লইয়া গিয়াছে—যাহাকে অনাদরে বিদায় করিয়াছিলেন, তাহাকে আবার সাদর অভ্যর্থনায় বরণ করিয়াছেন। 'যৌবন'-এ মৃত পত্নীর ধ্যানবিভোর বৃদ্ধ—করুণার পিসেমশাই—তরুণ প্রেমের তুচ্ছতম খেয়ালের সোৎসাহ সমর্থন করিয়াছেন। তরুণের আনন্দ-যজ্ঞ পূর্ণ করিবার জন্য বৃদ্ধের আত্মাহুতির কাহিনীটি বড়ই করুণ ও ভাবৈশ্বর্যপূর্ণ। 'ইতি' গল্পে এক গণিকা থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য আহূত হইয়া ক্ষণিকের জন্য উচ্চতর ভাবানুভূতির আস্বাদ পাইয়াছে ও নিজ শ্রীহীন জীবনের কদর্যতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে। বৃহত্তর মুক্তি-রাজ্যে এই ক্ষণিক অভিযান তাহার জীবনে একটি চিরস্থায়ী মাধুর্যের রেশ রাখিয়া গিয়াছে। 'ছায়া' গল্পটি এই সংগ্রহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ—ইহা প্রেতাবির্ভাবের সূক্ষ্মার্থদ্যোতক, মৌলিক পরিকল্পনা। হিমাদ্রি ব্যর্থপ্রেমের জ্বালায় আত্ম-

ঘাতিনী এক তরুণীর ভৌতিক আবির্ভাবের সহিত সংশ্লিষ্ট বাড়ি ভাড়া লইয়া প্রতি রাত্রিতে প্রতীক্ষমান অন্তরে ইহার উপস্থিতি কামনা করিয়াছে। শেষে একদিন লাবণ্যময়ী রমণীর বেশে দীর্ঘ-অপেক্ষিত প্রেতমূর্তি দেখা দিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই প্রেতমূর্তি তাহার এক উপেক্ষিতা প্রণয়িনী উর্মিলার প্রতিচ্ছায়া। কিন্তু যে দিন সে উর্মিলার সহিত বিবাহে রাজি হইয়াছে, সেই দিন হইতেই এই ছায়ারূপিনীর অন্তর্ধান। এই ছায়া তাহার প্রথম প্রেমের স্বপ্ন, যাহা শরীরী উপস্থিতির ভার-অসহিষ্ণু, "মোহে যাহার জন্ম, মুক্তিতে যাহার অবসান।" এই ছায়ার অনুসরণে সে কায়ার মাধ্যাকর্ষণ ছাড়াইয়া দূরে দিগন্তমায়ার দিকে পক্ষবিস্তার করিয়াছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বুদ্ধিপ্রধান জীবন-সমালোচনা—প্রেমেন্দ্র মিত্র ও প্রবোধ সান্ন্যাল

(১)

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বুদ্ধ-অচিন্ত্য (group) বেষ্টনীতে যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্বাভাবিক স্থান, এই সত্যের আভাস লেখকত্রয়ের একই উপন্যাস-রচনায় সহযোগিতার মধ্যেই পাওয়া যায়। কিন্তু তথাপি প্রেমেন্দ্রের প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁহার ছোট গল্পের সমষ্টি 'বেনামী বন্দর' (১৯৩০), 'পুতুল ও প্রতিমা' (১৯৩২), 'মৃত্তিকা' (১৯৩২), 'ধূলিধূসর' ও 'মহানগর' (জুলাই ১৯৪৩) তাঁহার বিশেষত্বের পরিচয় দেয়। কাব্যের আতিশয্য বিষয়ে তিনি অচিন্ত্য ও বুদ্ধদেব হইতে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। কল্পনা-বিলাস বা কাব্য-চর্চার লেশমাত্র বাষ্প তাঁহার উপন্যাসে নাই। এক প্রকার শুষ্ক, আবেগহীন, বুদ্ধিপ্রধান জীবন-সমালোচনা, বাঙ্গালী-সুলভ ভাবার্দ্রতার (sentimentality) সম্পূর্ণ বর্জন ও আবেগ-প্রবণতার কঠোর নিয়ন্ত্রণই তাঁহার মুখ্য বিশেষত্ব। যে করুণ-রস উদ্দীপনার ক্ষমতা বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ বলিয়া মনে করেন, প্রেমেন্দ্র মৃদু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও অবশ্যম্ভাবী দুঃখবরণের ঈষৎ-বিষণ্ন মনোভাবের দ্বারা তাহার প্রতিষেধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার গল্পগুলির মধ্যে যে কল্পনার একেবারে অভাব তাহা ঠিক নহে; কিন্তু এই কল্পনার মধ্যে এক প্রকার অপ্রকৃতিস্থতা (morbidity) বা মনোবিকারের ইঙ্গিত আছে। 'বেনামী-বন্দরে' 'পুন্নাম' গল্পে মানুষের যে হৃদয়বৃত্তি সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও স্বার্থলেশশূন্য বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই অপত্যস্নেহের ভিতরেও যে হতাশ্বাসপূর্ণ ব্যর্থতা ও প্রকাণ্ড আত্মপ্রতারণা আছে তাহা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। 'পুতুল ও প্রতিমা'র 'হয়ত' ও 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' প্রেমেন্দ্রের স্বভাব-সিদ্ধ গুণগুলির সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় স্থল। প্রথম গল্পে মহিম ও লাবণ্যের সন্দেহ-বিষ-জর্জর, অথচ আকস্মিক অনুরাগের জোয়ারে উচ্ছ্বসিত দাম্পত্য জীবনের যে কাহিনী দেওয়া হইয়াছে, তাহার অসাধারণত্ব চমকপ্রদ; সমস্ত প্রতিবেশের রহস্যময় বর্ণনা ও ঘটনার অবশ্যম্ভাবী অথচ অপ্রত্যাশিত পরিসমাপ্তি পাঠকের মনকে বিস্ময়-চমকে অভিভূত করে। 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পটিতে পতিতা-জীবনের ভাবাবেশ-বর্জিত, অথচ সহানুভূতির রেশে পূর্ণ কাহিনী বিবৃত হইয়াছে—ইহার নিরুপায় বীভৎসতার সংযত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইহাতে পতিতাকে আদর্শবাদের সাহায্যে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টামাত্র লক্ষিত হয় না; এবং এই বিষয়ে ইহার অন্যান্য লেখকের পতিতা-কাহিনীর সহিত মৌলিক পার্থক্য। 'দিবা-স্বপ্ন' গল্পটিরও মৌলিকতা সম্পূর্ণ উপভোগ্য—পরস্পরের প্রতি প্রণয়-মুগ্ধ রমেশ ও প্রিসিলার একদিনের সাক্ষাতে মোহভঙ্গ ইহার বিষয়-বস্তু। ব্যঙ্গের ক্ষীণস্বর, দুঃখ-বাদের ম্লান কৌতুকপ্রিয়তা গল্পটিকে বিশিষ্টতা দিয়াছে। 'মৃত্তিকা' গল্পটিতে Barrack-lifeএর সরস বর্ণনার প্রতিবেশে এক দীর্ঘদিনরুদ্ধ অন্তর্ক্ষোভের অগ্নিস্রাব উদ্গীরিত

হইয়াছে এবং অতর্কিত ভূমিকম্পের মধ্য দিয়া প্রকৃতি এই হৃদয়তাণ্ডবের সহিত সপরিহাস সহযোগিতা করিয়াছে। 'বেনামী-বন্দর'-এর 'এই দ্বন্দ্ব', ও 'মৃত্তিকা'র 'পাশাপাশি' ও 'পরাভব'-এ শরৎচন্দ্রের প্রভাবের ছায়াপাত সত্ত্বেও লেখক নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছেন। প্রথমোক্ত গল্পটি ভারকেন্দ্রচ্যুত বলিয়া মনে হয়, কেননা পরীর হৃদয়-সমস্যার মূল যেখানে, সেই প্রাক্-বিবাহিত জীবনের পরিবর্তে তাহার বিবাহোত্তর জীবনেরই আলোচনা হইয়াছে—সুতরাং 'অসীম ঘৃণা ও অদম্য প্রেমের' সমাবেশ-রহস্য অনাবিষ্কৃতই রহিয়া গিয়াছে। 'পাশাপাশি'তে অমলের সরস কৌতুকপ্রিয়তার বর্ণনায় ও 'পরাভব'-এ পিসিমার প্রতি সুষমার আক্রোশের কারণ-বিশ্লেষণে প্রেমেন্দ্র শরৎচন্দ্রের প্রভাব অতিক্রম করিয়া মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। 'লজ্জা' ও 'সুরু ও শেষ' এই দুইটি গল্পের সমাপ্তি-সূচক মন্তব্য প্রেমেন্দ্রের মনোভাব-দ্যোতক—"দেবতার মহত্ত্ব মানুষের নাই, মানুষ পিশাচের মত নিষ্ঠুরও নয়, মানুষ শুধু নির্বোধ"; "মনে হয় বুঝি জীবনের সব কাহিনীর ধারাই এমনি সামান্য ঘটনার উপল-খণ্ডে আহত হইয়া চিরদিনের মত আমাদের আয়ত্তের বাহিরে অভাবিত পথে চলিয়া যায়।" জীবনের বিচিত্র ঐকতান হইতে এই খেদ-মিশ্রিত ব্যর্থতার সুরটিই যেন তাঁহার কানে বিশেষভাবে ধ্বনিত হইয়াছে।

প্রেমেন্দ্রের মানস বৈশিষ্ট্য তাঁহার পরবর্তী গল্প-সংগ্রহগ্রন্থ 'ধূলিধূসর'-এ আরও অসন্দিগ্ধ ও পরিণত অভিব্যক্তি পাইয়াছে। 'ধূলিধূসর' নামকরণ চমৎকাররূপে সার্থক হইয়াছে। আদর্শ প্রেমের দিব্যোজ্জ্বল আভা প্রাত্যহিকতার ধূলির প্রক্ষেপে, অভ্যাসের জড় পৌনঃপুনিক আবর্তনে, মোহভঙ্গের ধূসর ক্লান্তিতে যে মলিন ও বিবর্ণ হইয়া আসে এই প্রমাণিত সত্যই সমস্ত গল্পগুলির বিষয়-বৈচিত্র্যের মধ্যে যোগ-সূত্র-স্বরূপ হইয়াছে। প্রেমের প্রত্যাশিত সরস ও অম্লান সৌন্দর্যের মধ্যে বিকৃতি, পারুষ্য, নির্বিকার ঔদাসীন্য, নিষ্ঠুর আত্মপীড়ন, আঘাত হানিবার দুর্বোধ্য খেয়াল ও পাণ্ডুর রক্তহীনতার বীজাণু-সমূহ লেখক অভ্রান্ত দৃষ্টিতে আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রেমের অমৃত-পাত্রে যে প্রচ্ছন্ন অম্ল, লবণাক্ত ও তিক্ত-স্বাদের আভাস আছে সেইগুলির অনুভূতি তাঁহার অসামান্যরূপ তীক্ষ্ণ। আবার অন্যদিকে প্রেমের রহস্যময় সাংকেতিকতার সুরও তাঁহার শান্ত, সংযত, ঈষৎ ব্যঙ্গের আমেজযুক্ত, মননশক্তি-সমৃদ্ধ রচনারীতির মধ্য দিয়া সুস্পষ্ট, জড়িমাহীন অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

এই সংগ্রহের প্রথম গল্প 'একটি-রাত্রি' সাংকেতিকতার বিদ্যুৎ-ঝলকে ভাস্বর—পরিকল্পনার মৌলিকতায়, রূপক-ব্যঞ্জনার সুদূরপ্রসারী অর্থগৌরবে ও আলোচনার নিখুঁত পরিপূর্ণতায় অপরূপ-সৌন্দর্য-মণ্ডিত। কুয়াসাচ্ছন্ন রাত্রির মহানগরী যেমন নিজের, তেমনি মানুষেরও, এক নূতন, প্রাত্যহিকতার ছদ্মবেশমুক্ত পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। মীরার প্রতি সুব্রতের প্রকৃত মনোভাব এই মায়াঘন, অস্তিত্বের পূর্ণতর আভাসে চমকিত রাত্রির যাদুপ্রভাবে অনবগুণ্ঠিত হইয়াছে। 'যাত্রাপথ'-এ অজয় ও মলিনার প্রথম প্রেমের আবেশ পরস্পরের চরিত্রের সাধারণতা ও রূঢ় পারুষ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঙ্গিতে সন্দেহ-কণ্টকিত হইয়াছে। 'অমীমাংসিত' গল্পে নবপরিণীতা স্ত্রীর দারুণ অভিমানের ভয়ে ভীত প্রকাশ তাহার অবিচলিত ঔদাসীন্যের সন্দেহে আরও গুরুতর উদ্বেগ ও অশান্তি অনুভব করিয়াছে—অভিমানের ঘূর্ণীপাক এড়াইতে গিয়া প্রেমের নৌকা অসাড় নির্বিকারতার চড়ায় ঠেকিয়া গিয়াছে। 'থার্মোফ্লাস্ক ও চীনের

যুদ্ধ'-এ প্রেমের ঈর্ষ্যাজনিত দারুণ মনোবিকার ইহার সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন-যাত্রাকে বিষজর্জর ও বিঘ্নবহুল করিয়াছে—দাম্পত্য সম্পর্ককে একটা অস্থির, সন্দেহ-প্রণোদিত পরীক্ষার আবর্তে অবিশ্রাম ঘূরপাক খাওয়াইয়াছে। এই গল্পের পরিসমাপ্তি-সূচক মন্তব্য লেখকের জীবন-সমালোচনার সহজ সুরটির দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধার করা যাইতে পারে। —"যুগে যুগে পৃথিবীময় ছড়ানো ধ্বংসস্তূপের আবর্জনায় একটা রঙ-চটা থার্মোফ্লাস্ক, আর একটা বুকচেরা প্রশ্ন।"

'ভস্মশেষ'-এ প্রেমের জ্বলন্ত, বিদ্রোহী আবেগ কেমন করিয়া ধীরে ধীরে নিবিয়া আসিয়া সাহসিকতাহীন, জড় অভ্যাসের ভস্মরাশিতে পরিণত হয় তাহার চমৎকার বিশ্লেষণ। অমরেশ তাহার প্রণয়িনী, অপরের বিবাহিত পত্নী—সুরমাকে সর্বস্বপণ ধৈর্য ও দৃঢ়তার সহিত অনুসরণ করিয়াছে। সুরমা তাহার প্রচণ্ড আকর্ষণে বিচলিত হইয়াছে; কিন্তু সে চরম সিদ্ধান্তের জন্য সময় চাহিয়াছে। অমরেশ এই পরিণতির জন্য অপেক্ষা করিয়াছে। কিন্তু প্রতীক্ষাকাল একটু বেশি দীর্ঘ হওয়ায় অন্তরের বহ্নিশিখা কখন নির্বাপিত হইয়া অঙ্গারস্তূপের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে তাহা কেহই লক্ষ্য করে নাই। আজ বারান্দার এক কোণে তিনখানি চেয়ারে উপবিষ্ট স্বামী, স্ত্রী ও বাতিল প্রণয়ী যেন একই পারিবারিক জীবনযাত্রার কক্ষাবর্তনে নিজ নিজ অভ্যস্ত নিয়মিত স্থান গ্রহণ করিয়াছে। আজ স্বামীর অসাড় নিদ্রালুতা মধ্যে মধ্যে ঈষৎ ব্যঙ্গহাস্যে চমকিত হইয়া উঠিতেছে; স্ত্রী সংসারের মোট-বহার কাজে স্বামী অপেক্ষা ভূতপূর্ব প্রণয়ীর উপর বেশি নির্ভর করিয়া ও তাহার প্রতি অনুরোধের রেশযুক্ত আদেশ প্রচার করিয়া অতীত অনুরাগের ম্লান সাক্ষ্য দিতেছে। আর পোষমানা ধূমকেতু বা নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির ন্যায় ব্যর্থ, হতাশ প্রেমিক সংসারযন্ত্র-পরিচালনায় নিজ প্রতিহত শক্তিকে নিয়োজিত করিতেছে—তেজস্বী আরবী ঘোড়া যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া ভারবাহী গর্দভে পরিণত হইয়াছে। অপরাহ্নের ম্লান ছায়া কি গভীর অর্থপূর্ণ সাংকেতিকতার সহিত, কি বেদনা-করুণ স্মৃতির বাহন হইয়া ইহাদের শান্ত, ভাবলেশহীন মুখের উপর সঞ্চারিত হইয়াছে। এই চমৎকার গল্পটি ব্রাউনিংএর "The Statue and the Bust" নামক বিখ্যাত কবিতার সহিত এক সুরে বাঁধা। এই কথায় গাঁথা কহিনীটি কোন চিত্রকরের বর্ণ-রেখা-বিন্যাসে রূপ পাইবার উপযোগী বিষয় বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু দাম্পত্য জীবনের সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ সম্ভাবনা রূপ পাইয়াছে "শৃঙ্খল" নামক গল্পটিতে। যখন পতিপত্নীর মধ্যে সম্বন্ধের মাধুর্যটুকু একের বা উভয়ের দোষে নিঃশেষে উবিয়া যায়, তখন অচ্ছেদ্য বন্ধনে শৃঙ্খলিত, জগতের মধ্যে নিকটতম সম্পর্কান্বিত এই দুই প্রাণীর বাধ্যতামূলক একত্রবাস কি সাংঘাতিক, হিংস্র বিতৃষ্ণা ও বিরাগের হেতু হইয়া উঠে, তাহাই এই গল্পের আলোচ্য বিষয়। ভূপতি ও বিনতির সম্পর্ক 'পুতুল ও প্রতিমা'র 'হয়ত' গল্পে মহিম ও লাবণ্যের অস্বাভাবিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ভূপতির উত্তেজনাহীন শ্লেষের মধ্যে অস্বাভাবিকরূপে তীব্র, ক্রূর হিংস্রতা, প্রিয়জনকে আঘাত করিবার অকারণ উল্লাস আমাদিগকে স্তম্ভিত করে। বিনতির মনে এই দুর্বোধ্য ব্যবহার অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া জাগাইয়াছে। শেষ পর্যন্ত পরস্পরের প্রতি জীবনের মূল পর্যন্ত বিস্তৃত বিদ্বেষ, মৃত্যুর ন্যায় সীমাহীন, নীরব বিমুখতা—প্রেমের বিকৃত রূপান্তর—উভয়ের মধ্যে আমরণ অবিচ্ছিন্ন সংযোগের হেতু হইয়াছে।

অন্যান্য গল্পগুলিতেও প্রেমের সুস্থ, পরিপূর্ণ বিকাশের পথে যে সমস্ত সাধারণ, অথচ

অনতিক্রম্য বাধা-বিঘ্ন-অন্তরায় আছে সেগুলি আলোচনা হইয়াছে। 'শরতের প্রথম কুয়াসা' গল্পে নিরঞ্জন ও অতসীর একদিনের অন্তরঙ্গতার দুই বিপরীত-ধর্মী প্রতিক্রিয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। তরুণ নিরঞ্জন অভিজাত-সমাজের উজ্জ্বল তারকা অতসী ঘোষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করার গৌরবে উৎফুল্ল, নিজের অতর্কিত সৌভাগ্যে বিহ্বল-প্রায়। অকস্মাৎ তাহার এই আত্মপ্রসাদের উচ্ছ্বাসের মধ্যে সংশয় জাগিয়াছে—সে কি নিজ স্পর্ধিত ধৃষ্টতায় আপনাকে অতসীর নিকট উপহাস্য করিয়া তুলিয়াছে? অতসীর মনোভাব আরও মর্মান্তিকভাবে করুণ—তাহার চোখে অতলস্পর্শ ক্লান্তি ও নৈরাশ্য। তাহার ক্ষীয়মান যৌবন কেবল ক্ষণস্থায়ী মোহ সৃষ্টি করিতে পারে; ইহা প্রথম পরিচয়ের উদ্বেলিত উচ্ছ্বাসকে চিরন্তন সম্বন্ধের তটভূমিতে ধরিয়া রাখিবার শক্তি হারাইয়াছে। তাই সে এই বহুপরিচিত মোহভঙ্গের পুনরনুভূতির আশঙ্কায় কণ্টকিত। 'একটি রাত্রি'তে সুব্রতের মত, অতসীও সেইজন্য এই বিভ্রমকারী অভিজ্ঞতাকে দ্বিতীয়বার আস্বাদন করিতে চাহে না—"তার অস্তমান যৌবনের আকাশে এই শেষ স্মৃতি-তারকা থাক অম্লান হয়ে।" 'ব্যাহত রচনা' গল্পটি প্রণয়ী-যুগল পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া চলিতে চলিতেও প্রেমের গহন অরণ্য মাঝে কেমন করিয়া পথ হারাইয়া ফেলে তাহার ব্যঞ্জনায় অর্থগূঢ়। "মধুর গল্প রচনা করিবার জন্য যাহাদের ডাকিয়াছিলাম তাহারা আমার কাহিনীকে এ কোন্ নিরর্থক কথার জটিলতায় লইয়া আসিল!" 'পরিত্রাণ'-এ হতাশ প্রেমিক সাময়িক মস্তিষ্কবিকারের ক্লোরোফর্মের সাহায্যে তাহার আশাভঙ্গের তীক্ষ্ণ বেদনা-বোধকে কিয়ৎ পরিমাণে অসাড় করিয়াছে। 'নিশাচর' গল্পে দাম্পত্য-কলহের পটভূমিকায় একটি নূতন ধরণের অতিপ্রাকৃত কাহিনী রচিত হইয়াছে। লেখক অবশ্য ভৌতিক রোমাঞ্চ অপেক্ষা পারিবারিক বিরোধের সম্বন্ধেই অধিক আগ্রহশীল। তথাপি এই উভয় অংশের মধ্যে যোগ বেশ সহজ ও স্বাভাবিক হইয়াছে ও প্রেতের আবির্ভাবও আবেষ্টনের সহিত সামঞ্জস্যহীন হয় নাই। সমস্ত গল্প-সংগ্রহটিই উচ্চাঙ্গের কলা-কৌশল, ঘটনা ও মন্তব্যের যথাযথ সন্নিবেশ ও সর্বোপরি বাস্তব প্রভাবে প্রেমের বিকার ও রূপান্তরের সূক্ষ্ম অনুভূতির জন্য বিশেষ ভাবে প্রশংসার্হ।

'মহানগর' গল্প সংগ্রহে (জুলাই ১৯৪৩) প্রেমেন্দ্রের শিল্পচাতুর্য অক্ষুণ্ণ আছে। 'মহানগর' গল্পটি সাংকেতিকতার সুষ্ঠু প্রয়োগে অপরূপ অর্থ-ব্যঞ্জনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। রাত্রির মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার ও উষার কুহেলিগুণ্ঠিত তরল যবনিকা মহানগরীর প্রান্তশায়িনী নদীর উপর বিস্তৃত হইয়া তাহার চারিপার্শ্বের দৃশ্য ও বক্ষপ্রসারিত অগণিত নৌযানের জটিল, বিশৃঙ্খল সমাবেশের মধ্যে এক অতলস্পর্শ রহস্যের ইঙ্গিত সঞ্চারিত করিয়াছে। এই সর্বব্যাপী রহস্যের এক তীব্র ঝলক ব্যথিত প্রতীক্ষায় উৎসুক, অজ্ঞাত আশা-আশঙ্কায় কম্পিত-বক্ষ, বাস্তবানভিজ্ঞ, দুঃসাহসিক ভালবাসার প্রেরণায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বালকের মনে দুর্বোধ্য, অভিমান-ক্ষুব্ধ বেদনায় রূপান্তরিত হইয়াছে। সহর ও মানব-সম্পর্কের জটিলতার ভিতর দিয়া একই রহস্যের বিদ্যুৎ-শিখা খেলিয়া গিয়াছে। রাজধানীর গহন, ভয়াবহ অতিকায়-তা ও পতিতা দিদি কেন বাড়ি ফিরিতে পারে না, কেনই বা রতনের দিদির গৃহে স্থান নাই সমাজনীতির এই দুরধিগম্য সমস্যা বালকের মনের একই তারে ঘা দিয়াছে।

ইট-কাঠ-পাথরের স্তূপে যে রহস্য ক্রূর ঔদাসীন্যে বিভীষিকার ভ্রূকুটি তুলিয়াছে তাহারই মানবিক সংস্করণ—দিদির ব্যবহার—ভালবাসার ব্যাকুল আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করিয়া সংসার-জ্ঞানহীন বালকের হৃদয়ে বিস্ময়বিমূঢ়, আর্ত নৈরাশ্যের অনুভূতি জাগাইয়াছে। 'অরণ্যপথে'ও প্রকৃতি ও মানুষের, সুন্দরবনের দুর্ভেদ্য জঙ্গল ও মানব মনের গোপন—গুহাশায়ী বন্য, উগ্র বিকারের ছন্দোসমতা দেখান হইয়াছে, কিন্তু এই আবিষ্কারের মধ্যে খানিকটা কষ্টকল্পনা আছে মনে হয়। মানুষ যেমন ষ্টীমারের সুরক্ষিত আশ্রয়ের মধ্য হইতে পথিপার্শ্বের অরণ্য-বিভীষিকাকে ব্যঙ্গ করিতে পারে, সেইরূপ সুন্দরী তরুণীর অপ্রকৃতিস্থতা ও অঙ্গবিকৃতি আকস্মিক চমকের আঘাতে সৃষ্টির অসংগতির প্রতি এক প্রকার শ্লেষাত্মক বিস্ময়বোধ জাগাইয়াছে। 'দুর্লভ্য' গল্পে অব্যবহিত অতীত ও অতি আধুনিক যুগের মনোভাবে ও প্রণয়-চর্চাবিধির বৈষম্যের মনোজ্ঞ আলোচনার ক্রেমে প্রণয়িণীর মোহভঙ্গকর পরিবর্তনের ছবিটি আঁটা হইয়াছে। সপ্রতিভা, হাস্যলাস্যময়ী কিশোরী ও স্বামী-প্রেমের স্মৃতিবিভোরা সদ্যবিধবা তরুণীর, এক শুচিবায়ুগ্রস্তা, দেহে ও মনে নিঃশেষিত-লাবণ্যা প্রৌঢ়া নারীতে পরিণতি আমাদিগকে রবীন্দ্রনাথের গল্পের বদায়ুনের নবাবপুত্রীর প্রেমাস্পদ, একদা ব্রাহ্মণ্যতেজ-ভাস্বর, অধুনা পাহাড়িয়া অনার্যনারীর সহিত সহবাসে মলিন ও মর্যাদাভ্রষ্ট, কেশরলালের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 'মুহূর্ত্ত' ও 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী গল্প দুইটি প্রেমের সেই সনাতন অতৃপ্তি ও চলচ্চিত্ততার কাহিনী—'ধূলিধূসর' গল্প সংগ্রহের গল্পগুলির সহিত একসূত্রে বাঁধা। প্রথমোক্ত গল্পে স্ত্রীর উত্তাপহীন নির্বিকারতায় ব্যাহত স্বামীর অতৃপ্ত মিলনৌৎসুক্য এক ভূমিকম্পের রাত্রিতে অপ্রত্যাশিত, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী সার্থকতা লাভ করিয়াছে। মসৃণ, সুনিয়মিত জীবন-যাত্রার মধ্যে সৃষ্টি-প্রারম্ভের যে আদিম আতঙ্ক সুপ্ত থাকে, ভূমিকম্পের আলোড়নে তাহারই রুদ্ধ উৎস খুলিয়া গিয়া সেই পথে নিরুদ্ধ প্রেমের এক ঝলক বাহিরে আসিয়াছে ও প্রেমিকের নিবিড় আলিঙ্গনপাশে ধরা দিয়াছে। অতর্কিত বিপদে আত্মরক্ষার সহজ সংস্কারের ভিতর আত্মবিস্মৃত প্রেমের আবেশ মুহূর্তের জন্য সঞ্চারিত হইয়াছে, বলিষ্ঠ বাহুর আশ্রয়লাভের ত্বরিত প্রয়োজন ভালবাসার চরম আত্মনিবেদনের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। কিন্তু ভয় ও ভালবাসা, প্রেম ও প্রয়োজনের এই মিলন ক্ষণিকের মাত্র—ইহাই গল্পটির অন্তর্নিহিত ট্র্যাজেডি। বিনিদ্র শশাঙ্কের মনে ঘড়ির অশ্রান্ত শব্দ জীবনের ব্যর্থতার প্রতীকে পরিণত হইয়াছে—এই রূপক-সৃষ্টি লেখকের সাংকেতিকতার উপর অসাধারণ অধিকারের আর একটি নিদর্শন। দ্বিতীয় গল্পে 'ধূলিধূসর' এর 'ভস্মশেষ' গল্পের ন্যায় প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে একটি আকর্ষণ-বিকর্ষণের পালা চলিয়াছে। অপরের বিবাহিতা স্ত্রী করুণা খানিকটা অস্থির আত্মদ্বন্দ্ব, ঔদাসীন্যের অভিনয় ও ব্যর্থ আত্মদমন-চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত প্রেমিকের সহিত গৃহত্যাগের সংকল্প স্থির করিয়াছে, কিন্তু প্রেমিকের দুর্বল-চিত্ততার জন্য সেই সংকল্পের উপর একটা ছলনার আবরণ টানিয়া দিয়াছে। লেখক এই মেরুদণ্ডহীন আচরণকে কাপুরুষতা আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। লেখকের আধুনিকতম রচনায় কোন কোন গল্পে পুনরাবৃত্তি-প্রবণতা লক্ষিত হইলেও মোটের উপর পরিধি-বিস্তার ও অগ্রগতির প্রমাণ সুস্পষ্ট।

বড় উপন্যাস রচনায় প্রেমেন্দ্র তাঁহার শক্তির অনুরূপ সাফল্য এখনও লাভ করিতে পারেন নাই। লেখক এখনও এ বিষয়ে পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান কার্যে ব্যাপৃত আছেন

মনে হয়—সাধনার দুর্গম পথ অতিক্রমের পর সিদ্ধি এখনও তাঁহার করায়ত্ত হয় নাই। তবে তাঁহার উপন্যাস 'কুয়াসা'তে অপেক্ষাকৃত পরিণত শক্তির পরিচয় মিলে। পরিকল্পনার মৌলিকতা —একজন যুবা পুরুষের অকস্মাৎ স্মৃতিলোপ এবং পরিণত মনোবৃত্তি ও হৃদয়াবেগ লইয়া জীবনের সহিত নূতন সম্পর্ক-স্থাপনের তীব্র ব্যাকুলতা—উপন্যাসটির প্রধান আকর্ষণ। অবশ্য এই আকস্মিক স্মৃতিবিভ্রমের অসম্ভাব্যতাটুকু উপেক্ষা করিতে হইবে—ইহা মানিয়া লইলে প্রদ্যোতের জীবন-সমস্যার বিশ্লেষণ খুব সূক্ষ্ম ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। শিশুর অস্পষ্ট স্মৃতি ও ধীরে ধীরে উন্মেষশীল ব্যক্তিত্বের সহিত তাহার অপরিণত চিন্তাশক্তি ও ভাবাবেগের একটা সহজ সামঞ্জস্য আছে। তাহার ক্ষুধাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপকরণ-প্রাচুর্য সমান্তরাল রেখায় অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু পূর্ণব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট অথচ অতীত স্মৃতির সহিত সম্বন্ধচ্যুত যুবা-পুরুষের সমস্যা অত্যন্ত বিচিত্ররূপে স্বতন্ত্র—সে বিরাট শূন্যতার মধ্যে কুম্ভকর্ণের বুভুক্ষা লইয়া জাগিয়া উঠে। প্রদ্যোতের নব-জাগ্রত চেতনার ভয়াবহ শূন্যতাবোধ, অমলের পরিবারবর্গের সহিত স্নেহ-সম্বন্ধ-স্থাপনের উদগ্র ব্যগ্রতা, সহজ জীবনযাত্রার নিবিড়, তীব্র রসোপলব্ধি, বিস্মৃত অতীতকে জানিবার ও ভুলিবার তুল্যরূপ প্রবল প্রয়োজনের অনুভব—সমস্তই অতি নিখুঁত মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও সৌন্দর্য-সৃষ্টি-কুশলতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। এই বিরল-পদচিহ্ন, বস্তুভারমুক্ত জীবনে প্রথম প্রেমের রহস্যানুভূতি ও রোমাঞ্চ-শিহরণ যেন সৃষ্টির আদি-যুগের তরুণ আকাশে প্রথম নক্ষত্র-দীপ্তিবিচ্ছুরণের মতই অপরূপ-বিস্ময়মণ্ডিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—এই প্রেমের আবির্ভাব-বর্ণনাই গ্রন্থের চরম গৌরব। শেষে লেখকের স্বাভাবিক রোমান্স-বিমুখতা নায়কের অবাঞ্ছিত অতীতকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া, তাহার জীবনে এক অপ্রত্যাশিত জটিলতা আনিয়াছে। সার্থকতার যে উজ্জ্বল ছবি তাহার কল্পনায় রূপ গ্রহণ করিতেছিল, তাহা অকস্মাৎ মসীলিপ্ত ও অস্পষ্ট হইয়াছে—স্মৃতিবিভ্রমের যবনিকা অপসারিত হইয়া তাহার ভদ্র, শিক্ষিত ও আদর্শ-বাদপ্রবণ বর্তমানের পিছনে এক কলঙ্কিত অতীতের বিভীষিকা ব্যঙ্গহাস্যে মুখ-ব্যাদান করিয়াছে। এই শেষ অধ্যায়টি, যেমন নায়কের পক্ষে তেমনি উপন্যাসের পক্ষেও, একটু অসু-বিধাজনক হইয়াছে—স্মৃতি-লোপের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবস্থার উল্লেখে ইহার কারণটি মোটেই সুস্পষ্ট হয় না ও গল্পটি যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে অনুপ্রাণিত এই ধারণা জন্মে। তথাপি "কুয়াসা" বড় উপন্যাস রচনায় প্রেমেন্দ্রের অগ্রগতির একটা বিশেষ আশাপ্রদ নিদর্শন।

(২)

প্রবোধ সান্যাল

উপন্যাসের অতি-প্রসার ও মাত্রাতিরিক্ত জনপ্রিয়তার যুগে এমন অনেক লেখক উপন্যাস-ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হন, যাঁহাদের রুচি ও মনীষা ঠিক উপন্যাসের স্বভাবধর্মের অনুবর্তী নহে। আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিম-যুগে এই জাতীয় লেখক ছিলেন সঞ্জীবচন্দ্র। আমার মনে হয় যে, প্রবোধকুমার সান্যালকেও এই শ্রেণীর লেখকের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে H. G. Wells ও G. K. Chestertonও এই পর্যায়ে পড়েন। ইহাদের জীবন-কৌতূহলের মধ্যে একটু নির্লিপ্ততা, একটু কল্পনার মায়া-লীলা লক্ষ্য করা যায়। জীবন সম্বন্ধে একটা বিশেষ উপপত্তি (theory) লইয়া, সমাজ-বিন্যাসের একটা অচিন্তিতপূর্ব রূপ-কল্পনার

প্রেরণায় ইহারা জীবন-পর্যালোচনায় অগ্রসর হন। ইহারা জীবনকে দেখেন হয়ত সত্যানুগ দৃষ্টিতে, কিন্তু একটু তির্যক ভঙ্গীতে। জীবনের ভাল-মন্দ, হাসিকান্না, নিয়ম-বিশৃঙ্খলা সব লইয়া ইহার সমগ্রতা হইতে ইহারা রস আহরণ করেন না, জীবনের যতটুকু খণ্ডাংশে ইহাদের পূর্বনির্ধারিত মানস কল্পনা সমর্থিত হয়, ততটুকুর প্রতি ইহাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। জীবনকে ইহারা দেখেন, কিন্তু একটু সূক্ষ্ম ব্যবধানের অন্তরাল হইতে; নানা অপ্রত্যাশিত অবস্থার মধ্যে ইহার যে অতর্কিত বিকাশ ঘটে তাহাতেই তাঁহাদের সত্যিকার আগ্রহ। জীবন-গ্রন্থের কয়েকটি পাতা, জীবন-নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যাবলী অবলম্বন করিয়াই ইহাদের বিশিষ্ট জীবনদর্শন গড়িয়া উঠে। মানবিক রসের গাঢ়তাকে অন্তরের ভাব-কল্পনার সংযোগে কিঞ্চিৎ ফিকে করিয়া, উহার পরিচিত স্বাদে নূতন মশলার সাহায্যে কিছুটা অনাস্বাদিতপূর্ব বৈচিত্র্যের সঞ্চার করিয়া, ইহারা এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শোধিত রসটিই তাঁহাদের উপন্যাসে পরিবেশন করিতে ভালবাসেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' যেমন তাঁহার মনোভংগীর দর্পণ, প্রবোধকুমারের 'মহাপ্রস্থানের পথে'-ই তেমনি তাঁহার জীবন-রসিকতার বৈশিষ্ট্যের মূল উৎস। উভয়েই তাঁহাদের উপন্যাসে এই মানসপ্রবণতাই গল্পের মাধ্যমে সম্প্রসারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 'মহাপ্রস্থানের পথে' ভ্রমণকাহিনীই মুখ্য—ইহার দৃশ্য-পরিবর্তনের ফাঁকে ফাঁকে, ইহার চলিষ্ণুতার গতিচ্ছন্দে ঔপন্যাসিক রস খানিকটা জমাট বাঁধিয়াছে। গ্রন্থটিতে লেখকের দার্শনিক অনাসক্তি, উদার মননশীলতা, বৈরাগ্যস্পৃষ্ট শিথিল জীবনানুসন্ধিৎসা পরিস্ফুট—ইহার মানবিক আবেগ বিচ্ছিন্ন ও পরিণতিহীন ক্ষণিকতায় পর্যবসিত। লেখক আসক্তির জালে জড়াইয়া পড়েন নাই, জীবনের গভীরে অবগাহন করেন নাই, জীবনস্রোতের কয়েকটি তরংগকে তীরের নিরাপদ দূরত্ব হইতে লক্ষ্য করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে'ও এই উদাসীন জীবন-পর্যবেক্ষণের সুর শোনা যায়, কিন্তু আবেগের রহস্যময় গভীরতা যখন তাঁহার বৈরাগী চিত্তকে আহ্বান জানাইয়াছে, তখন তিনি এই ডাকে সম্পূর্ণ সাড়া দেন বা না দেন, গভীরতার পরিমাপ করিতে ভুলেন নাই, ইহার অতল রহস্যকে স্বীকৃতি জানাইয়াছেন। প্রবোধকুমারের গ্রন্থে এই ক্ষণিক মোহাবেশ নিঃসংগ হিমালয়-শৃঙ্গে ইন্দ্রধনুরঞ্জিত কুহেলিকা-জালের ন্যায় খানিকটা বর্ণমায়া সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু এই কুহক মিলাইতে বেশি সময় লাগে না। মনে ইহা কিছুটা দাগ কাটে বটে, কিন্তু অবিস্মরণীয় রেখায় অংকিত হয় না। প্রবোধকুমারের রচনায় ভ্রমণের এই মায়া-কাটানো মানস মুক্তি, এই দেখিতে দেখিতে আগাইয়া যাওয়ার অশৃঙ্খলিত স্বাধীনতা প্রধান আকর্ষণ, ইহাতে সহস্রবন্ধনে আবদ্ধ ঘন সম্মোহের আবেগ-আবিল বদ্ধ হাওয়া একেবারেই অনুভূত হয় না।

প্রবোধকুমারের মানবজীবনচর্যা অনেকটা পরীক্ষাগারের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক মনোভাব-প্রসূত। কোন্‌টা সম্ভব, কোন্‌টা অসম্ভব, কোন্‌টা স্বাভাবিক, কোন্‌টা অস্বাভাবিক ইহা লইয়া তিনি খুব বেশি মাথা ঘামান না। মানুষকে নানা নূতন অবস্থার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া, নূতন আদর্শে তাহার চিত্তের সহজ গতিকে শাসিত করিয়া, মানব-প্রকৃতির পরিবর্তন-সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া তিনি নর-নারীর সম্বন্ধের মধ্যে নানা বিচিত্র অভাবনীয়তার ছবি আঁকিয়াছেন। তাঁহার মনন-কৌতূহল সময় সময় তাঁহার বাস্তব-নিষ্ঠাকে অতিক্রম করিয়াছে। যৌন আকর্ষণের ভিত্তিকে অস্বীকার করিয়া তিনি নরনারীর মধ্যে সহজ

সৌহার্দমূলক, লালসাহীন সম্বন্ধ অনুমান করিয়াছেন এবং এই অনুমানকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত সমাজব্যবস্থার রূপান্তর সাধন করিয়াছেন। H. G. Wells যেমন প্রাকৃতিক নিয়মের বৈপরীত্য, বিজ্ঞানপ্রসাদে মানবশক্তির কল্পনাতীত প্রসারের ভিত্তিতে মানবসমাজের এক অভিনব বিন্যাসের চিত্র আঁকিয়াছেন, প্রবোধকুমারও অনেকটা মানবের জৈব প্রবৃত্তি, সমাজ-বন্ধনের মূল তত্ত্বকে পাল্টাইয়া সমাজের সম্ভাবিত রূপটি প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আদিম প্রবৃত্তির আগ্নেয় উচ্ছ্বাস শান্ত, নিরুত্তাপ হইলে, সৌন্দর্যের লালসাময় মদিরতা সুস্থ দৃষ্টিকে ঘোরালো না করিলে, রক্তধারার বিদ্যুৎকণিকা হিমানীকণিকায় পরিণত হইলে সমস্ত পৃথিবীর চেহারা যে বদলাইয়া যাইত, মানবের কাব্য-ইতিহাস যে নূতন ধারায় প্রবাহিত হইত এই আনুমানিক সত্য তাঁহার উপন্যাসে ঘটনা-চরিত্রের নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। তাঁহার 'প্রিয়বান্ধবী' উপন্যাসে এই কল্পনাটিই বাস্তব পরিবেশের কাঠামোতে রূপায়িত হইয়াছে।

আদর্শবাদের বিরুদ্ধে কথঞ্চিৎ তীব্রতর প্রতিবাদ, ও ব্যঙ্গশীলতার তীক্ষ্ণতর প্রকাশ প্রবোধ-কুমার সান্যালের উপন্যাসে পাওয়া যায়। তাঁহার 'প্রিয়বান্ধবী' উপন্যাসটির মৌলিকতা অনেকটা উদ্ভট-রকমের—মনে হয় যেন এই উপন্যাসের মধ্য দিয়া তিনি স্ত্রী-পুরুষের একটি নূতনতর সম্পর্কের পরিকল্পনা প্রচার করিতে চাহিয়াছেন। শ্রীমতী ও জহরের আকস্মিক মিলনের ফলে তাহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধটি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে প্রেমের তীব্র আকর্ষণ আছে, কিন্তু তাহার মদির, লোলুপতা-সিক্ত আবেগ, মান-অভিমান ও পরস্পরনির্ভরতা নাই। মনে হয় যেন সমাজ ও কাব্য দীর্ঘ-শতাব্দীর অনুশীলনের ফলে প্রেমের যে মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, লেখক তাহাকে চূর্ণ করিয়া তাহার ভিতরের মৌলিক আকর্ষণটুকু পৃথক করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রেম হইতে যৌন ও আবেগমূলক এই উভয়বিধ উপাদান বর্জন করিয়া তাহাকে বন্ধুত্বের উত্তেজনা-হীন শান্ত-স্নিগ্ধ পর্যায়ে নামাইয়া আনিতে চাহিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী জহরকে আহ্বান করিয়াছে প্রেমের প্রয়োজনে নয়, জহরের দগ্ধ হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ দিতে, তাহার নিষ্ফল বিদ্রোহের অপচয় বন্ধ করিয়া তাহার মধ্যে নব শক্তি সঞ্চার করিতে। প্রেমের এই অভাবাত্মক সংজ্ঞার মধ্যে নূতনত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের প্রেরণা হিসাবে ইহার অপ্রাচুর্য অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু এই উপন্যাসের বিশেষত্ব ইহার পরিকল্পনায় নাই, আছে ইহার ধূসর আশাভঙ্গমূলক মনোবৃত্তির অগণিত তীব্র প্রকাশে। এই প্রকারের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গশীলতার অনেক উদাহরণ ইহা হইতে সহজেই সংগ্রহ করা যায়। 'সমস্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মূলে যেটা থাকে, সেটা দান নয়, শোষণ'; 'সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মপ্রকাশ বর্বরতার মধ্যে'; 'জীবনে যাহারা মনুষ্যত্ব আহরণ করে নাই, ধর্মকে অপহরণ করিবার লোভ তাহাদেরই অধিক'; 'যাহারা ধার্মিক নয়, তাহারা ধর্ম্মভীরু'; 'মূল্যদান করিয়া আজকাল দানের মূল্য দিতে হয়'; 'মাটি, পাথর ও চিত্রপটই মানুষের অসংখ্য নির্বোধ কামনার সাক্ষ্য'; 'সন্দেহ-জনক বয়স যার কেটে গেছে, সেই বেশী সন্দেহজনক'; 'ঘুমোনো কবিদের নেশা, আর ঘুম-পাড়ানো তাদের পেশা'; 'সে ক্ষণিক-বাদিনী'—এই সমস্ত মন্তব্যের মধ্য দিয়া এক নূতন চিন্তাধারা ও মনোভাবের অভিব্যক্তি সূচিত হইয়াছে।

প্রবোধকুমারের 'অগ্রগামী' উপন্যাসেও (১৯৩৬) স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একটা নূতন, সমাজ-বিরোধী, পরীক্ষামূলক সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু এই পূর্ণতর প্রেমের

পরিকল্পনা মোটেই সার্থক হইয়া উঠে নাই। প্রেমের সনাতন আদর্শবাদের উচ্ছ্বাস ও ইহার বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল ব্যঙ্গপ্রধান, বিপ্লবাত্মক মনোভাবের একপ্রকার অদ্ভুত, অসংলগ্ন সংমিশ্রণ উপন্যাসের মধ্যে দুই বিপরীত ধারার সৃষ্টি করিয়াছে। মায়ালতা ও সুরপতি উভয়েই এক দুর্বোধ্য খেয়ালের প্রেরণায় ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে ও সাক্ষাৎ মাত্র তাহাদের সম্বন্ধটি একলম্ফে প্রেমাবেগের উচ্চতম পর্যায়ে আরোহণ করিয়াছে। আবার অমরেশ ও মায়ালতার সম্পর্কের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের নিরুত্তাপ মাধুর্যের সঙ্গে প্রেমের তীব্রতর হৃদয়াবেগ মিশিয়াছে। অমরেশ কবি ও সৌন্দর্যের উপাসক—মায়ালতার সান্নিধ্য তাহার কাব্যসৃষ্টির উৎস, তাহার সৌন্দর্যবোধের প্রেরণা। শেষ পর্যন্ত অমরেশের সাহচর্যে সে তাহার আদর্শ, অনধিগম্য দয়িতের ধ্যান করিবার জন্য হরিদ্বার যাত্রা করিয়াছে। সেক্রেটারী সুরেশবাবুর নির্লজ্জ, যৌন অনুসরণ তাহার মনে শান্ত প্রতিরোধ মাত্র জাগাইয়াছে, তাহাকে তীব্র বিরাগ ও চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যানে উত্তেজিত করে নাই—এই যৌন আকাঙ্ক্ষার বিজ্ঞাপন যেন তাহার পক্ষে অবাঞ্ছিত বন্ধুত্ব অপেক্ষা অধিকতর বিরক্তিকর নহে। এই সমস্ত বিরোধী ভাবের যদৃচ্ছ সংমিশ্রণ উপন্যাসের আবহাওয়াকে অসংগতিতে পূর্ণ করিয়াছে। প্রেম সম্বন্ধে কোন মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী এই অস্পষ্ট কুহেলিকাজাল হইতে উন্মেষিত হয় নাই। ইহার মধ্যে চিন্তাশীল মন্তব্যের অসদ্ভাব নাই। কিন্তু চরিত্র-সংগ্রবহীনতার জন্য ইহার বিশেষ কোন ঔপন্যাসিক সার্থকতা নাই। এই গভীর-উদ্দেশ্যহীন, খেয়ালী পরীক্ষা-প্রবণতা খানিকটা লঘু কাল্পনিকতার উচ্ছ্বাস মাত্র, ইহার মধ্যে না আছে অন্তঃসংগতি, না আছে মানস পরিণতির পূর্বাভাস।

তাঁহার ছোটগল্পের সমষ্টি 'অবিকল'-এর (১৯৩৩) মধ্যে দুইটি গল্প উল্লেখ-যোগ্য—'অবৈধ' ও 'অপরাহ্ণে'। প্রথম গল্পে গ্রাম্য বালিকা হরিদাসীর রেলগাড়ীতে মাতৃপরিত্যক্ত শিশুর প্রতি দুর্বার আকর্ষণের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই শিশুর জন্য সে স্বামী, সংসার সমস্ত পরিত্যাগ ও মিথ্যা কলঙ্ক বরণ করিয়া অনাথাশ্রমে আশ্রয় লইয়াছে। মাতা কর্তৃক শিশু-পরিত্যাগের বিবরণ নিতান্ত আকস্মিক ও অবিশ্বাস্য কিন্তু হরিদাসীর ব্যাকুল, সর্বগ্রাসী স্নেহের চিত্রটি খুব চমৎকার হইয়াছে। 'অপরাহ্ণে' গল্পে স্টেশন মাস্টারের করুণ, ব্যর্থ-জীবন, তাহার পূর্ব প্রণয়িনীর সহিত অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ ও লৌকিক লজ্জায় অভিভূত প্রণয়িনী কর্তৃক পূর্বস্মৃতির রূঢ় প্রত্যাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। এই ছোট-গল্প দুইটির করুণরসের মধ্যে লেখকের ব্যঙ্গশীলতার কিছুমাত্র পরিচয় মিলে না—ইহাদের উপর আমাদের সাহিত্যিক পূর্বধারারই অক্ষুন্ন প্রভাব।

প্রবোধকুমারের 'তুচ্ছ' উপন্যাসটিতে তিনি অনেকটা খাঁটি ঔপন্যাসিক প্রেরণার বশবর্তী হইয়াছেন। এখানে অবশ্য তিনি একটি ছোটছেলের জবানীতে একটি সমগ্র কুলীন পরিবারের প্রাচীন-সংস্কার-শাসিত জীবনযাত্রার চিত্র আঁকিয়াছেন, ও এই পরিবার-জীবনের পটভূমিকা স্বরূপ কলিকাতার গোড়াপত্তনের যুগে নাগরিক জীবনের সহিত পল্লী-সমাজের যে বিস্তৃততর প্রতিবেশ-বন্ধন, প্রতিবেশীর প্রতি সহৃদয় মনোভাবের সংমিশ্রণ ছিল তাহাও পরিস্ফুট করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে ব্যক্তিসত্তা অপেক্ষা বৃহত্তর সমাজসত্তাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ঘটমান কাহিনীগুলি বালকের অস্ফুট, রহস্যের আঁধার-ঘেরা চেতনার মধ্যে এক দ্রুত-সঞ্চারী বোঝা না-বোঝার মিশ্রিত ছায়াছবির অপরূপত্ব-মণ্ডিত হইয়াছে। কুয়াসার মধ্যে দেখা

দৃশ্যাবলীর ন্যায় ইহার মানবচরিত্রগুলি অভিনব আয়তন লইয়া অতিরঞ্জিত মহিমার দেখা দিয়াছে। গৃহকর্ত্রী, বালকের দিদিমা, উহার উত্তরাধিকার-বঞ্চিত, অকর্মণ্য বাক্যবীর মাতুল, পাড়াপড়শীর সংসারের নর-নারী, আত্মীয়-কুটুম্বের যাতায়াত, অধিকার-বঞ্চিতা মেয়েদের ঈষৎ অভিব্যক্ত মনোবেদনা, ছোটছেলের লোভ ও কামনা-কল্পনা, ভালবাসার অলক্ষ্য আবির্ভাব এই সমস্ত মিলিয়া জীবনের যে বিচিত্র রূপ তাহা বালকের মুগ্ধ, বিস্ময়মণ্ডিত অনুভূতির প্রাকার পটে উজ্জ্বল, বর্ণাঢ্য রেখায় প্রতিফলিত হইয়াছে। অবশ্য এই সত্যিকার উপন্যাস-গুণ-সমৃদ্ধ রচনায়ও প্রবোধকুমারের মৌলিক বৈশিষ্ট্যটি প্রায় অক্ষুণ্ণই আছে। তাঁহার দার্শনিক উদাসীনতা ও জীবনের তীক্ষ্ণ, মর্মান্তিক বিকাশগুলিকে পাশ কাটাইয়া ইহার বিসর্পিত, আকস্মিকের চমকপূর্ণ গতিচ্ছন্দটিকে অনুসরণ করার প্রবণতা এখানেও বালকের অনভিজ্ঞ, বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টির মধ্যে প্রকাশের অবসর পাইয়াছে। বালক জীবনকে অনুভব করে বিচ্ছিন্ন চিত্রপরম্পরার যোগসূত্রহীন সমষ্টি-হিসাবে; ইহাদের মধ্যে একটি কেন যায়, অপরটি কেন আসে, ইহাদের আলো-আঁধার, আনন্দ-বেদনার বিশৃঙ্খল শোভাযাত্রার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তাহার নিকট অজ্ঞাত; ইহারা তাহার বোধশক্তিকে উদ্রিক্ত না করিয়া তাহার কল্পনা, অনুভূতি, তাহার অফুরন্ত বিস্ময়রসেরই পুষ্টিসাধন করে। প্রবোধকুমারের অন্যান্য উপন্যাসে যেমন গৃহছাড়া পথিক, তেমনি এখানে সংসারবোধহীন বালক দার্শনিকের প্রতীকরূপে কল্পিত হইয়াছে।

প্রবোধকুমারের 'বনহংসী' তাঁহার ঔপন্যাসিক জীবনানুভূতির আর একটি প্রকাশ। সাধারণত যুদ্ধকালীন বিপর্যয় আমাদের সমাজ ও মনোজীবনের যে ভাঙ্গন ধরাইয়াছে, বাংলা উপন্যাসে তাহার বহির্মুখীন, করুণরসাত্মক পরিচয়ই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অন্নবস্ত্রের অভাবে মানুষের কি নিদারুণ বেদনা, কত রকম ফন্দি-ফিকির করিয়া অত্যাবশ্যকীয় জিনিষগুলি সংগ্রহ করিতে হয়, চোরাকারবারী ও মনাফাখোর সমস্ত জীবনের উপর কিরূপ ভয়াবহ কালোছায়া বিস্তার করিয়াছে. কোন্ বস্ত্রহীনা নারী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়া কেমন করিয়া অসহনীয় লজ্জার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে—বাঙ্গালা উপন্যাস এই বহির্মুখী লাঞ্ছনার, এই বস্তুগত অভাববোধের কাহিনীর অশ্রান্ত, করুণরসসিক্ত পুনরাবৃত্তি। প্রবোধ-কুমার এই বিপর্যয়ের গভীরতর অন্তর্জীবন-সম্পৃক্ত স্তরে অবতরণ করিয়াছেন—অর্থ নৈতিক রিক্ততার সঙ্গে জীবনের মর্যাদার অবলুপ্তি, শাশ্বত নীতিবোধ ও জীবনাদর্শের উন্মূলন, উৎকট আত্মস্বাতন্ত্র্য ও কলুষিত রুচির ব্যাপক প্রাদুর্ভাবের মনস্তত্ত্বপ্রধান রূপায়নে মনোনিবেশ করিয়াছেন। দারিদ্র্য অধঃপতনের গতিবেগকে দ্রুততর করিয়াছে ইহা সত্য কিন্তু ইহার বীজ অন্তরে অংকুরিত না হইলে এরূপ সামগ্রিক ভাঙ্গন ঘটিত কি না সন্দেহ। মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্তর্নিহিত স্থূল স্বার্থপরতা, রুচির অমার্জিত স্থূলতা, ভোগের উৎকট আকাঙ্ক্ষা ও পারিবারিক নিয়মবন্ধন মানিবার অনিচ্ছা, এক কথায় উচ্চ আদর্শের প্রতি আস্থাহীনতাই যাহা ঘটিয়াছে তাহার মূল কারণ। বাড়ীর প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে এই ঘূর্ণীবায়ুর দ্বারা নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী এক একটি বিশেষরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার পথে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে—অন্তরের কুৎসিত প্রবণতা বাহিরে নিরংকুশ বিকটতায় প্রকটিত হইয়াছে। দীপেন উৎকট শোষণনীতি ও হীন প্রতারণার পথে নামিয়াছে, দ্বিজেন সোজাসুজি চুরি ধরিয়াছে। দুই মেয়ের মধ্যে যমুনা যৌনলালসার অপূর্ণ স্বপ্নে ও নিষ্ক্রিয় ভাবরোমন্থনে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালমৃত্যু বরণ করিয়াছে। ছোট

যন্ত্রণা আত্মবিক্রয় করিয়া ছদিনের সখ মিটাইয়াছে। মা তরুবালা দীর্ঘকাল সংসার পরিচালনার দায়িত্ব বহন করিয়া মুখ থুবড়াইয়া-পড়া ভারবাহী পশুর ন্যায় মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে ও শেষ জীবনে অভাবের অসহনীয় চাপে তাহার চরিত্রের শালীনতা ও গৃহিণীর শাশ্বত আদর্শনিষ্ঠা হইতে স্খলিত হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা শোচনীয় পরিবর্তন, ভাস্বতীর প্রতি তাহার উদার স্নেহশীলতা কদর্য সন্দেহ ও বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছে। এক সংসারের কর্তা মৃগেন্দ্র আদর্শে স্থির থাকিয়া বিনা প্রতিবাদে অভাব ও অক্ষমতার অন্ধতম গহ্বরে নামিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি বহু পূর্ব হইতেই তাঁহার পরিবারের উপর সমস্ত প্রভাব হারাইয়া নিষ্ফল আত্ম-ধিক্কারে দগ্ধ হইয়াছেন। একটি পরিবারের জীবনে এই নীতি-বিপর্যয়ের করুণ কাহিনী উপন্যাস-টিতে প্রশংসনীয় মনস্তত্ত্বজ্ঞানের, ব্যক্তিপ্রকৃতির সার্থক অনুবর্তনের সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

কিন্তু এই নির্মম বাস্তব বিশ্লেষণের মধ্যেও প্রবোধকুমার আদর্শের স্বপ্নবিলাস, অভিনব উন্মেষের জন্য প্রতীক্ষা, অপরূপ জীবনানুভূতির জন্য স্পর্শোন্মুখতার উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। যে পঙ্ক সকলের দেহে মনে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে, তাহারি গ্লানিকর প্রতিবেশে এক অপূর্ব শুচিশুভ্র পঙ্কজ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাস্বতীর চরিত্র ও উহার সহিত অতনুর সম্পর্ক-পরিকল্পনায় লেখক তাঁহার পরীক্ষামূলক মনোভাবের, তাঁহার সর্বদা নূতনের অনুসন্ধিৎসু মানস কৌতূহলের পরিচয় দিয়াছেন। প্রথমত মৃগেন্দ্রের পরিবারে ভাস্বতীর স্থান পাওয়াটাই এক অসম্ভবের ধার-ঘেঁসিয়া-যাওয়া কল্পনাবিলাসের পর্যায়ভুক্ত। ভাস্বতী এই পরিবারে রক্তসম্পর্কহীন, দৈবাগত আগন্তুক না হইলে উহাকে কেন্দ্র করিয়া ঝটিকার সমস্ত গতিবেগ, বিদ্বেষের পঙ্কিল প্রবাহের সমস্ত তরঙ্গভঙ্গ আবর্তিত হইত না। দীপেন যতই আত্মকেন্দ্রিক হউক, তাহার মায়ের পেটের বোনদের অন্তত পরিবারে আশ্রয়লাভের অধিকার সে অস্বীকার করে নাই। তারপর অতনুর সঙ্গে তাহার বিচিত্র সম্পর্ক, অতনুর অর্থে তাহার অবাধ অধিকার ও সেই অর্থের জোরে ঘরকে উপবাসী রাখিয়া বাহিরের অভাব-মোচনের অস্বাভাবিক প্রচেষ্টা স্বভাবতই এই উড়িয়া-আসিয়া-জুড়িয়া বসা পরগাছার বিরুদ্ধে তীব্র বিরূপতারই উদ্রেক করিয়াছে। অর্থানুকূল্য হইতে বঞ্চিত পরিবার তাহার স্বভাবমাধুর্য, নিরলস সেবা ও নিঃস্বার্থ হিতৈষণার যে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় নাই ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অগ্নিকুণ্ডের মাঝে যদি একটুকরা বরফ রাখা হয়, তবে উহার শৈত্যগুণ ত অনুভূত হইবেই না, বরঞ্চ প্রতিটি শিখা উহার হিংস্র দাহন শক্তি লইয়া এই ব্যতিক্রমধর্মী পদার্থের উপরই ঝাঁপাইয়া পড়িবে। অজ্ঞাতকুলশীলা মেয়েকে ঘরে রাখিয়া ও উহাকে ঘরের মেয়ের সঙ্গে সমান মর্যাদা দিয়া, এই অজুহাতে অতনুর সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে অস্বীকৃতি মানব চরিত্রের উদ্ভট স্ববিরোধপ্রবণতারই একটি নিদর্শন। প্রবোধকুমার এই উদ্ভট অসঙ্গতির মধ্যেই নিজ আদর্শধর্মী কল্পনাবিলাসের ভাবগত প্রেরণা ও ঘটনাগত আশ্রয় খুঁজিয়া পান।

সে যাহা হউক, ভাস্বতীর মধ্যে লেখক এই নানা বিরোধ-বিড়ম্বিত, অসংবৃত প্রবৃত্তির তাড়নায় উদ্‌ভ্রান্ত, স্থির আদর্শের আশ্রয়হীন, আধুনিক কালের একটি যুগোচিত আদর্শকে রূপ দিতে চাহিয়াছেন। ইহার প্রধান লক্ষণ এই যে ইহা কোন স্থায়ী বন্ধনে বাঁধা না পড়িয়া চিরপথিক হইবে ও যৌন আকর্ষণের পরিবর্তে জনসেবার সূত্রে ইহার সমাজ-পরিমণ্ডল রচনা করিবে। প্রাচীন কোন আদর্শের সহিত ইহারা মিলিবে না, কেন না অতীব বাস্তব পরিস্থিতি

ও ভাবপ্রেরণার সঙ্গে বর্তমানের দুরতিক্রম্য ব্যবধান। ইহা সর্বব্যাপী কলঙ্কের মধ্যে শুচি, নিরন্তর নির্যাতনের মধ্যে প্রসন্ন, আসক্তির সংকীর্ণতার মধ্যে মুক্ত, উদার, নিয়মিত চক্রাবর্তনের মধ্যে অশ্রান্ত অগ্রগতিশীল। কোন বিশেষ আকর্ষণে যদি ইহা ধরা দেয়, সমদর্শিতার সমতলভূমির মধ্যে যদি ইহাকে কোন ভাব-বন্ধুর গিরিশৃঙ্গের দুরারোহ উচ্চতার দিকে পদক্ষেপ করিতে হয়, তখন যে ইহার কেমন রূপ ও ছন্দ হইবে তাহা কিন্তু অনির্ণেয়ই রহিয়া গিয়াছে। অতনু-ভাস্বতীর সমগ্র উপন্যাস-জোড়া বোঝাপড়ার চেষ্টা, তাহাদের ভাববিনিময়ের সুদীর্ঘ ক্লান্তিকর, পুনরাবৃত্তির চক্রাবর্তন-ক্লিষ্ট ইতিহাসও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্কটিকে ঘূর্ণ্যমান নীহারিকার অস্পষ্টতাজাল হইতে উদ্ধার করিতে পারে নাই। কথার ঘন কুহেলিকা ভেদ করিয়া কোন স্পষ্টরূপ অনুভূতিগম্য হইয়া উঠে নাই। দার্শনিক পরিভাষার সাহায্যে ঈশ্বরের স্বরূপ-প্রমাণের প্রয়াসের ন্যায় এই ইঙ্গিত-সঙ্কেতে অভিব্যক্ত নূতন আদর্শ ও আমাদের ধাঁধাঁয় ফেলিয়াছে। অতনু বেচারাও এই "ভাব হইতে রূপ ও রূপ হইতে ভাবে" অবিরাম যাওয়া-আসার লীলাভিনয়ে বিভ্রান্ত হইয়াছে কিন্তু আশা ছাড়ে নাই। সে একটা দুর্বোধ্য-অনিশ্চিত প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া মিলনের প্রতীক্ষা করিতেছে। অতনু নিজে একজন অসহায় দর্শক মাত্র, তাহার সমস্ত গতিবিধি ভাস্বতীর ক্রিয়াকলাপের প্রতিক্রিয়ামাত্র, সে নিজে হইতে আগাইয়া কিছু করে নাই। এই পুরুষ-প্রকৃতিলীলায় হরিদাসের প্রবর্তনের দ্বারা ইহাকে খানিক মানবিক রূপ দিবার বৃথা চেষ্টা করা হইয়াছে— ইহার সবটাই অতিমানবিক স্তরের সূক্ষ্ম রস-বিলাসের ব্যাপার। হরিদাস-হাইফেনের দ্বারা এই অনাসক্ত নারী ও ব্যাকুল পুরুষের মধ্যে ব্যবধান বিলুপ্ত করা অসম্ভব। এই সব-বাঁধন ছেঁড়া, সর্বাশ্রয়চ্যুত যুগে বাস্তবের পুঞ্জীভূত গ্লানি ও চিত্তবৈকল্যের উপর ঊর্দ্ধাকাশে যে আদর্শের দীপ্ত রেখা নূতন আশা ও পরম আশ্বাসের ইঙ্গিতে ঝলসিয়া উঠে তাহা এখনও সর্বজনবোধ্য নিবিষ্টতায় স্থির রূপ লাভ করে নাই, তাহার আভাস মিলে আদর্শবাদীর স্বপ্ন-কল্পনায়, দার্শনিকের রহস্যভেদী মননে, পলাতক সৌন্দর্য-সুষমার ক্ষণিক চমকে—'বনহংসী'তে সেই অনাগত জীবনের দূরশ্রুত ছন্দই ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

প্রবোধ সান্যালের সদ্য-প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ গল্প সংগ্রহে তাঁহার শুষ্ক, ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব ও শিল্পোৎকর্ষ-পরিণতির পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক বিপর্যয়ের চাপে বিকৃত ও বাঁকাচোরা মানব-প্রকৃতির অসঙ্গতিগুলির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি অসামান্যরূপ তীক্ষ্ণ ও এই অস্বাস্থ্যকর বিকারগুলিকে তিনি সার্থক রসসৃষ্টির প্রয়োজনে লাগাইয়াছেন। 'ক্যামেরাম্যান' গল্পে সিনেমার ছবি তোলার জন্য নির্বাচিত আরণ্য ভূমির প্রতিবেশে অতনুর ব্যক্তিত্ব-রহস্য শিল্পীর অভিনব অনুভূতির প্রতি আগ্রহ ও খেয়ালী মনের অস্থিরতার মাধ্যমে চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে—সিনেমার ছবিতে কেবল দৃশ্যবৈচিত্র্য নহে, মানবিক পরিচয়ের অপূর্বতাও উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই ছন্নছাড়া জীবনে পূর্বপ্রণয়িনীর সঙ্গে অতর্কিত সাক্ষাৎ তাহাকে মানব-চরিত্র সম্বন্ধে কৌতূহলের একটা নূতন উপলক্ষ্য দিয়াছে। পূর্ব প্রেমের করুণ স্মৃতিকে সে আহত আত্মমর্যাদার চিত্তবিকারে রূপান্তরিত করিয়া ক্যামেরাতে ইহাকে চিরকালের মত ধরিয়া রাখিয়াছে। 'ঐতিহাসিক' গল্পে শিমলা পাহাড়ের বনভোজন উৎসব অতীত যুগের হৃদয়াবেগের কঙ্কালাকীর্ণ পূর্বস্মৃতিকে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রেরণা—ও বৃদ্ধদের ভ্রান্তি যে তরুণদের জীবনে

পুনরাবৃত্ত হইতেছে তাহারও ইঙ্গিত দিয়াছে। 'প্রেতিনী' গল্পটি চন্দ্রময়ীর অতৃপ্ত অপত্যস্নেহ কিরূপ বক্র-কুটিল পথে, কিরূপ আত্মমর্যাদাহীন দুর্বোধ্য আচরণের ছদ্মবেশে তাহার ভাড়াটে-পরিবারগুলির জীবনযাত্রার সহিত মিলিতে গিয়া বার বার হীন সন্দেহ ও কঠোর প্রত্যাখ্যানের বাধায় প্রতিহত হইয়া ফিরিয়াছে তাহার করুণ ও খানিকটা অরুচিকর কাহিনী। মানুষের বিশুদ্ধতম আবেগ মাতৃস্নেহের এরূপ বীভৎস, কিরূপ পরিণতি মানবজীবনের প্রতিই একটা অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দেয়। 'বিষ' গল্পে টুনির দুরন্তপনাকে গৌণ করিয়া তাহাকে আফিংএর নেশার মৃত্যুগ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাহার স্বামী কর্তৃক তাঁহার উপর দৈহিক নিপীড়নের চূড়ান্ত প্রয়োগের বীভৎসতা প্রাধান্যলাভ করিয়াছে।—দাম্পত্য প্রেমের এরূপ উৎকট বহিঃপ্রকাশ লেখকের কল্পনার বিকৃত বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ। 'মুক্তিস্নান' ও 'গুহায় নিহিত' দুইটি গল্পে পূর্ব প্রেমের দুইটি বিপরীতমুখী বিকার বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম গল্পে এক কিশোরী বাল্যসঙ্গিনী প্রৌঢ় বয়সে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে ও বেকার স্বামীকে লইয়া ষ্টেশন-মাষ্টার হারাধনের বাড়ীতে উঠিয়াছে ও অতি নির্লজ্জ আতিশয্যের সহিত এই পুরাণো প্রেমের দোহাই দিয়া নানারূপ অসঙ্গত ও ইতর আবদার জানাইয়াছে—শেষ পর্যন্ত চুরি করিয়া এই সুকুমার মনোবৃত্তির হেয়তম অবমাননা ঘটাইয়াছে। দ্বিতীয় গল্পে শিক্ষিতা মহিলা দেবীরাণী তাহার সম্পর্কিতা ভগিনীর স্বামী ও তাহার পূর্ব প্রণয়ী প্রিয়কুমারের ঘরে অতিথিরূপে আসিয়া সেই অবিস্মৃত ভালবাসাকে নানা ছদ্মবেশের ভিতর দিয়া অনুভব করিতে ও করাইতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রতিমার সন্দেহলেশহীন সরলতা, খুড়ীমার সদা-সন্দিগ্ধ সতর্কতা ও প্রিয়কুমারের লঘু পরিহাসে সংবৃত, আত্মসংযমে কঠিন ছদ্ম, ঔদাসীন্য এই তীর্যক বাসনা প্রকাশের পরিবেশ রচনা করিয়াছে। মাঝে মধ্যে এই দৃশ্য ও শান্ত প্রতিবেশের মধ্যে দুই একটি আপাত-নির্দোষ নিগূঢ়ার্থক সংলাপ অগ্নিগর্ভ কামনার স্ফুলিঙ্গরূপে অন্তঃরুদ্ধ দাহ্য পদার্থ সমাবেশের ইঙ্গিত দিয়াছে। 'কল্পান্ত' গল্পে যুদ্ধকালীন বিপর্যয়ের ফলে মানবাত্মার চরম অধোগতির শিহরণকারী চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ভদ্রগৃহস্থ বিধবা ও তাহার একমাত্র কন্যা অভাবের অসহ্য তাড়নায় ও কালের অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে সৈনিক কর্মচারীদের বিলাসসঙ্গিনীতে পরিণত হইয়াছে—এই পরিবর্তন কেবল ব্যক্তিগত চরিত্রের পরিবর্তন নহে, একটা সমগ্র যুগাদর্শের অবসান। এই গল্পগুলির মধ্যে প্রবোধকুমারের জীবন সমালোচনা সমস্ত ভাববিলাস ও আদর্শানুস্মৃতি পরিহার করিয়া কেমন করিয়া অসুস্থ মনোবিকার ও চরম অধোগতি প্রবণতাকে জীবনের কেন্দ্রিক অভিব্যক্তিরূপে, উহার মুখ্যতম যুগপরিণতিরূপে গ্রহণ করিয়াছে ও এই পরিবর্তিত জীবনাদর্শের রেখাচিত্র তিনি কিরূপ সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ও গভীর অনুভূতির সহিত আঁকিয়াছেন তাহার বিস্ময়কর ও খানিকটা বিষাদজনক নিদর্শন পাওয়া যায়।

ষোড়শ অধ্যায়

সমস্যা-প্রধান উপন্যাস—দিলীপকুমার রায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(১)

দিলীপকুমার রায়

অতি-আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে দিলীপকুমার রায়ের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। উপন্যাসের একটি বিশেষ ক্ষেত্র তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজের করিয়া লইয়াছেন—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্তরঙ্গ মিলন। প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের প্রথম পরিচয় ও সংঘর্ষ ও উহাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার বিবরণ বাঙ্গালা সাহিত্যের ও উপন্যাসের একটা বড় অধ্যায়। পশ্চিমের চিন্তাধারা ও জীবনের প্রতি দৃষ্টি-ভঙ্গী, তাহার হৃদয় ও জীবনসমস্যা আমাদের কবি-ঔপন্যাসিকেরা ক্রমশঃ আমাদের ঘরের বিষয়, আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের একাঙ্গীভূত করিয়া তুলিতেছিলেন। দিলীপকুমার এই বহু-ব্যবহৃত পথে সর্বাপেক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি বাঙ্গালীর চিত্তকে পাশ্চাত্ত্য মহাদেশের বৈঠকখানা ও বহির্জীবন, সামাজিক মিলন ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্তর অতিক্রম করাইয়া একেবারে তাহার নিভৃত মর্মস্থল, তাহার গভীরতম ভাব-বিনিময়ের অন্তঃপুরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রেম নিজ পরিচিত আবেষ্টনের বাহিরে, নিজ সনাতন সাথী-সহচরের সঙ্গচ্যুত হইয়া, এক সম্পূর্ণ নূতন মূর্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। দিলীপকুমারের মন এক দিকে যেমন সমাজ ও হৃদয়-সমস্যার আলোচনায়, যুক্তি তর্কে তীক্ষ্ণ নিপুণতা ও গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছে, অন্যদিকে কাব্য ও ললিত-কলার রসোপলব্ধির দিক্ দিয়া নিজেকে সূক্ষ্ম ও সুকুমার অনুভূতিশীল বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। এই চিন্তাশীলতা ও নিবিড় রসোপলব্ধির যুগপৎ মিলন তাঁহার রচনাকে আকর্ষণীয় করিয়াছে। বোধ হয় নিছক culture-এর দিক্ দিয়া উপন্যাস-সাহিত্যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ আছেন কিনা সন্দেহ এবং এই culture তাঁহার উপন্যাসের কেবল বহিরাবরণ বা বাহ্যসৌষ্ঠব নয়, ইহা ইহার কেন্দ্রীভূত সারাংশ, ইহার আবেদনের মূল সুর।

দিলীপকুমারের প্রথম উপন্যাস 'মনের পরশ'-এ (১৯২৬) নিবিড় ভাবানুভূতি অপেক্ষা তর্ক-সংকুলতারই অধিক প্রাদুর্ভাব। ইউরোপের বিভিন্ন-প্রকৃতি নর-নারীর মতামত ও সহানুভূতির স্পর্শলাভ-আকাঙ্ক্ষাই ইহার বর্ণনীয় বস্তু। গোড়ার দিকে ইহার রসটি প্রণয়ের ব্যঞ্জনায় নিবিড় হয় নাই, শুধু মতামতের আদান-প্রদান, ঔদার্য-সহানুভূতির বিনিময়েই পর্যবসিত হইয়াছে। সঙ্গীত-শিক্ষার্থী, কেম্ব্রিজ-প্রবাসী পল্লব, মিসেস নর্টন, মিঃ টমাস, মিঃ স্মিথ, প্রভৃতি নানা-প্রকৃতির ব্যক্তির সংস্পর্শে তাহাদের মতামত ও মানসিক প্রবণতার স্বাদ-গ্রহণে ঔৎসুক্য দেখাইয়াছে। ম্যাডাম রিশারের সহিত তাহার পরিচয়ের ফলে উভয়ের মধ্যে একটা সহানুভূতি-স্নিগ্ধ, করুণ-মধুর সম্পর্কের সূত্রপাত হইয়াছে; এবং ম্যাডাম রিশারের নিজ করুণ জীবন-কাহিনী ও সমাজ-বিধি-উল্লঙ্ঘনের বিবরণ সর্বপ্রথম পল্লবের মনে নির্মম নীতি-কাঠিন্যের নাগপাশ হইতে মুক্তির সূচনা করিয়াছে। তারপর ক্রমান্বয়ে কয়েকটি

প্রেমের অভিজ্ঞতা—মিস্ কুপার নামক ল্যাণ্ড-লেডির কন্যার প্রতি আকর্ষণানুভব, নাস্তালি ভগিনী-চতুষ্টয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা ও সর্বশেষে আইরিনের সঙ্গে নিবিড় সর্বত্যাগী প্রেমের সম্পর্ক-স্থাপন—তাহার হৃদয়কে গভীর, অভিনব অনুভূতির প্লাবনে ভরিয়া দিয়া পূর্বতন বিধি-নিষেধের সীমারেখাকে নিশ্চিহ্নভাবে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। শেষ পর্যন্ত আইরিন পল্লবেরই মুখ চাহিয়া তাহারই হিতার্থে নিজ গভীর অনুরাগ সংযত করিয়াছে। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে দুইখানি পত্র বন্ধুত্ব ও প্রেমের বিদায়-বাণী বহন করিয়া উপসংহার আনিয়াছে—একখানি সৌহার্দ্যের স্নিগ্ধ সমবেদনায় শীতল, আর একখানি প্রেমের দুঃসহ আত্ম-দমনের বিক্ষোভে

এই উপন্যাসে তর্কসংকুলতা একটু অধিক ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তর্কের বিষয়ের মধ্যে ইউরোপীয় ও প্রাচ্য দেশের নৈতিক নিষ্কলংকতা ও পবিত্রতা সম্বন্ধে আদর্শভেদ ও প্রেমের আসল স্বরূপ সম্বন্ধে খুব সূক্ষ্ম আলোচনা হইয়াছে। পদস্খলনের ফল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সমাজে তুল্যরূপ গুরুতর নহে—নিষ্কলংকতার যে উচ্চ মূল্য আমরা ধার্য করি, তাহা দিতে না পারার জন্য আমাদিগকে চিরজীবন মিথ্যাভাষণ ও কপটাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তার পর ভবিষ্যৎ ফলাফল বিবেচনা করিয়া প্রেমস্বীকার বা বর্জন করা উচ্চতর সার্থকতার দিক্ দিয়া কতটা যুক্তি-যুক্ত, সে সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য এই যে, সাবধানতার খাতিরে প্রেম-প্রত্যাখ্যান মনকে রিক্ত করে ও একটা শূন্যগর্ভ অহমিকার প্রশ্রয় দেয়। প্রেমের প্রকৃতিনিরূপণে দুঃসাধ্যতার বিষয় বিচারকালে লেখক বলেন যে, প্রেমকে অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামাজিক কর্তব্য ও অনুষ্ঠান হইতে বিচ্ছিন্ন করা নিতান্ত দুরূহ—প্রেমের শিখা স্থায়িত্বের জন্য মেলা-মেশা, সন্তান-স্নেহ, সামাজিক অনুমোদন প্রভৃতি নানাবিধ অনুকূল ইন্ধনের দাবী করে। এই সমস্ত মন্তব্যের মধ্য দিয়াই লেখকের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তি ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তর্কের সহিত উপন্যাসের রসবস্তুর সংযোগ গভীর ও অন্তরঙ্গ হয় নাই—দিলীপকুমারের প্রথম উপন্যাসের আপেক্ষিক দুর্বলতা এইখানে।

'রঙের পরশ' (১৯৩৪) উপন্যাসে দিলীপকুমার তাঁহার প্রথম উপন্যাস হইতে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। অতনু ও দীপা অল্পদিন ছাড়াছাড়ির পর হঠাৎ ইতালীতে পরস্পরের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাহাদের পূর্ব প্রণয়-আলোচনায় ও চিত্ত-বিশ্লেষণে রত হইয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, কবিতার সুকুমার আবেগ, প্রেমের পূর্বস্মৃতি-রোমন্থন, সুপ্ত মনোভাবের অতর্কিত আত্ম-প্রকাশ, বিষাদ-মিশ্রিত, দীর্ঘশ্বাস-ক্ষুণ্ণ হাস্য-পরিহাস—এই সকলে মিলিয়া প্রণয়ালোচনার এক অপরূপ প্রতিবেশ রচনা করিয়াছে। দীপার ইতিহাস অপেক্ষাকৃত সরল ও সংক্ষিপ্ত—সে অতনু ও রাজা উভয়ের যুগপৎ আকর্ষণে দোটানার মধ্যে পড়িয়াছিল ও নিজের মন ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য অবসর চাহিয়াছিল। সুতরাং অতনুকে কিছুদিন অনুপস্থিত থাকার অনুরোধ জানাইতেই তাহার অভিমান ও অন্তর্ধান এবং রাজার সহিত দীপার বিবাহ; আবার অতনুর পুনরাবির্ভাবে তাহার প্রতি দীপার অনুরাগ-সঞ্চার—ইহাই মোটামুটি দীপার প্রণয়েতিহাস। রাজা তাহার প্রতি দীপার প্রণয় অম্লান রাখিবার জন্য প্রেম হইতে সমস্ত বাধ্য-বাধকতা ও কর্তব্যের দাবী সরাইয়া লইয়া দীপাকে একাকিনী প্রণয়াভিসারে পাঠাইয়াছে; দীপা এই উদার বিশ্বাসের অমর্যাদা করে নাই।

অতনুর কাহিনী আরও জটিলতর ও ঘাত-প্রতিঘাত-সংকুল। রুভা ও লরা এই উভয় প্রণয়িনীর প্রবল, অথচ বিপরীত-ধর্মী প্রেমের আকর্ষণে তাহার ইতস্তত ভাব ও কিংকর্তব্য-বিমূঢ়তা চরম সীমায় উঠিয়াছে। রুভার প্রেম অনেকটা সাধারণ, বিশেষত্ববর্জিত, রূপ-গুণের আকর্ষণমূলক। তবে ইহার মধ্যে বেশ সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বমূলক অন্তর্দৃষ্টির অভাব নাই। তাহার প্রেমের এতই অভ্রান্ত অনুভূতি যে, উদ্যত আলিঙ্গনের মধ্যে ঈষৎ স্পর্শ-সংকোচ ইহার নিকট ধরা পড়ে, আদরের পরিবর্তে সহানুভূতি ইহার উচ্ছ্বসিত অভিমানের উৎস-মুখ খুলিয়া দেয়। কিন্তু লরার প্রেমকাহিনী আগাগোড়া অসাধারণত্বের উপাদানে পূর্ণ। লরা বিধবা—তাহার শ্রী ছিল, সৌন্দর্য ছিল না; তাহার কণ্ঠস্বর, আবৃত্তি ও কাব্যানুরাগ অতনুর আকর্ষণের প্রথম হেতু। লরার পূর্ব স্বামীর প্রতি মনোভাবও সাধারণ অভিজ্ঞতার বহির্ভূত। লরার দুশ্চরিত্র স্বামীর প্রতি স্নেহপরায়ণ মাতৃভাব, তাহার নিঃসঙ্গতা, মধ্যযুগ-সুলভ মনোবৃত্তি, দেহশুদ্ধির প্রতি অতি-মনোযোগ, গভীর ধর্ম-বিশ্বাস এই সমস্তই তাহার চরিত্রে বৈশিষ্ট্য আরোপ করিয়াছে। লরার মনে যে প্রেমের আদর্শ ভাস্বর ছিল, তাহা দেহাতীত; তাহার স্বামীর লুব্ধ উপভোগ-স্পৃহা এই দেহাতীত প্রেমকে পদে পদে অপমান করিয়াছে। কিন্তু স্বামীর এই ব্যবহার লরার মনে ঘৃণা অপেক্ষা করুণারই অধিক সঞ্চার করিয়াছে। লরার স্বামী যখন অতৃপ্ত রূপমোহের তাগিদে ব্যভিচার-রত হইল, তখন লরা অযোগ্য স্বামীর প্রতি ভালবাসা একটা আধ্যাত্মিক সাধনার মত আরও বেশি করিয়া অনুশীলন করিয়াছে।

লরার আগমন রুভার আকর্ষণকে ব্যর্থ করিয়া অতনুর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল; লরাও তাহার স্বভাবসিদ্ধ একনিষ্ঠতা ও কঠোর আত্মসংযমের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অতনুর আকর্ষণ এড়াইতে পারিল না। ইতিমধ্যে গুস্তাভের পত্রে লরার প্রেমবিবশতার বিবরণে লরার রুদ্ধদ্বার খুলিয়া গেল, তাহার প্রেম কাব্যের আদর্শলোক হইতে দেহের চতুঃ-সীমার মধ্যে অবতরণ করিল। অতনুর প্রতি তাহার অনিবার্য প্রেমসঞ্চার সে নিজ সমস্ত শক্তি দিয়া রোধ করিতে চেষ্টা করিল—কেবল দৈহিক বিশুদ্ধতার খাতিরে নয়, তার নিজ নিঃশেষিত -প্রায় প্রাণশক্তি, নির্বাপিত-প্রায়, ভস্মাবশেষ যৌবন-শিখার জন্য সংকোচেও। তারপর একদিন সমস্ত বাধা-সংকোচ ঠেলিয়া অনিবার্য মিলনের অপূর্ব কবিত্বময় জয়গান ধ্বনিত হইয়া উঠিল—পুরোহিতমন্ত্রহীন বিবাহ তাহাদের স্বতঃবিকশিত একাত্মতাকে অবিচ্ছেদ্য পবিত্র বন্ধনে যুক্ত করিয়া দিল।

এদিকে রোগশয্যাশায়িনী রুভার কাতর অনুরোধে লরা অতনুকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর নিকট পাঠাইল। রুভার রোগশয্যা খুব স্বাভাবিক কারণেই প্রণয়-শয্যায় রূপান্তরিত হইল। অতনু লরার প্রেমের প্রতিষেধক সত্ত্বেও এই নব-জাগ্রত আকর্ষণের নিকট আত্ম সমর্পণ করিল। আত্ম-সমর্পণের পর গভীর অনুতাপ ও আত্মধিক্কার অতনুকে অধিকার করিয়া বসিল—সে নিজ দুর্বলতা স্বীকার করিয়া ও যে কোন প্রায়শ্চিত্তের জন্য নিজেকে প্রস্তুত জানাইয়া লরার নিকট পত্র লিখিল। লরার উত্তর আসিল—অনেক বিলম্বে। তাহাতে সে অতনুকে এক বৎসরের প্রতীক্ষার জন্য উপদেশ জানাইল। লরা অতনুর মধ্যে দুই বিপরীত ভাবের প্রবাহ লক্ষ্য করিয়াছে—এক যৌবনের ভোগ-প্রবণতা ও কর্মশক্তি; আর এক, আধ্যাত্মিক জীবনের একনিষ্ঠ পরম প্রশান্তি। রুভার নিকট আত্ম-সমর্পণের জন্য এই দ্বৈত

সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং কোন্‌দিকে তাহার আসল প্রবণতা সে বিষয়ে নিঃসংশয় হইবার জন্য এই বর্ষব্যাপী প্রতীক্ষা। পত্রের ছত্রে ছত্রে মধুর আন্তরিকতা, অসংশয় আদর্শবাদ-নিষ্ঠা ও আত্ম-বিলোপী প্রেমের সুর ঝংকৃত হইয়াছে।

এই উপন্যাসে মন্তব্য ও আলোচনা উপন্যাসের মূল ঘটনার সহিত একাঙ্গীভূত হইয়াছে—তাহাদিগকে আর বাহিরের আগন্তুক বলিয়া মনে হয় না। উচ্ছ্বাস ও তাহার বহিঃপ্রকাশ, গানের আবেদন, গান ও কবিতার তুলনামূলক আলোচনা প্রভৃতি বিষয়ক মন্তব্যের মধ্যে সূক্ষ্ম চিন্তাশীলতা ও সুকুমার রস-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের, বিশেষতঃ দীপা, রুভা ও লরা এই তিন নায়িকার চরিত্রের মধ্যে—পার্থক্য অতি চমৎকারভাবে দেখান হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে রুভার চরিত্রে বৈশিষ্ট্যের আপেক্ষিক অভাব, কিন্তু অভিমান ও ঈর্ধ্যাপ্রবণতা তাহাকে সাধারণ নায়িকা হইতে পৃথক্ করিয়াছে। সমস্ত উপন্যাসের আকাশে-বাতাসে প্রেমের গন্ধসার অপর্যাপ্ত পরিমাণে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে—প্রেমের পটভূমিকার এরূপ নিপুণ সমাবেশ বাংলা উপন্যাসে বিরল।

'বহুবল্লভ' ও 'দুধারা' (১৯৩৫)—এই উপন্যাস দুইটিও দিলীপকুমারের প্রেম-সমস্যা-আলোচনার প্রতি অতি-পক্ষপাতের উদাহরণ। বস্তুতঃ, তাঁহার উপন্যাসে প্রেমের যেরূপ সূক্ষ্ম, ব্যাপক ও বহুমুখী বিশ্লেষণ হইয়াছে তাহা অন্যত্র দুর্লভ। ইউরোপীয় সমাজে তাঁহার প্রেমের লীলা-ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হওয়ায় এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য নরনারীর মধ্যে অভিনব প্রণয়-সম্পর্ক গড়িয়া উঠায় তিনি পূর্বতন ঔপন্যাসিকদের অপেক্ষা অনেক বেশী বৈচিত্র্য অবতারণার সুযোগ পাইয়াছেন, ইহা সত্য। তথাপি প্রেম সম্বন্ধে অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম অনুভবশীলতা না থাকিলে তিনি ইহার আলোচনায় এতটা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেন না। এই দুইটি উপন্যাসে প্রেমের যে সমস্যা আলোচিত হইয়াছে তাহা এই যে, প্রেমে একনিষ্ঠতা প্রার্থনীয় কি না, একই সময় সমান আন্তরিকতার সহিত উভয়ের প্রতি আসক্তি সম্ভব কি না বা একনিষ্ঠতা প্রেমের একটা অপরিহার্য অঙ্গ কি না। শেষ পর্যন্ত লেখকের নির্ধারণ এই যে, বহুমুখী প্রেম সমর্থন-যোগ্য, ইহা হৃদয়ের দৈন্য নয়, ঐশ্বর্য। প্রেম ও বিবাহের সম্বন্ধ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্য এই যে, প্রেমের উন্মাদনা ও আবেগ একটা পলাতক, ক্ষণস্থায়ী মনোভাব, বিবাহের পাত্রে ইহাকে চিরস্থায়ী করা যায় না। যেখানে কেবল সাময়িক মোহ নয়, আসল প্রেমের উদ্ভব হইয়াছে সেখানে বিবাহ ব্যতীত দৈহিক মিলনে বিশেষ কিছু হানি আছে কি না, ইহার মীমাংসা হইয়াছে একটু অনিশ্চিত। সংযমের মহিমা, প্রাপ্তির জন্য মূল্যদান, দৈহিক লালসায় প্রেমাস্পদের নিকট হীন না হওয়ার চেষ্টা, আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস—ইত্যাদি নানাবিধ উদ্দেশ্য একত্র হইয়া ব্যাপারটির মীমাংসাকে খুব জটিল করিয়াছে। আর একটা প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছে, যথা, সতীত্ব একটা নিত্য-সত্য না স্থান-কাল-পাত্র, যুগ-বিবর্তন ও সামাজিক প্রয়োজন অনুসারে তাহার মূল্য পরিবর্তনশীল। এ সম্বন্ধে লেখকের নির্দেশ এই যে, সতীত্বের গৌরব আর যে কারণের জন্যই হউক, প্রেমের স্থায়িত্বের মধ্যে তাহা নিহিত নয়। প্রেম স্থায়ী হয় বন্ধুত্ব বা মনের মিলের জন্য, কিন্তু এই বন্ধুত্ব প্রেমের অপরিহার্য অঙ্গ নয়। প্রেম সর্বদা নূতনত্ব চাহে তাহার মাদকতা সজীব রাখার জন্য। বিশ্লেষণে ইন্দ্রধনুর সৌন্দর্যের যেমন, তেমনি প্রেমেরও মর্মস্থল স্পর্শ করা যায় না। এইরূপ দীর্ঘ অথচ প্রাসঙ্গিক তর্কে কাহিনীর

প্রবাহ প্রতিপদে প্রতিহত হইয়াছে, কিন্তু আলোচনার সৌন্দর্য ও সুসংগতি ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতে দেয় নাই। কিন্তু এই গভীর ও সূক্ষ্ম আলোচনার শেষ প্রশ্নটি অমীমাংসিত থাকে। যে প্রেমের পলাতক প্রবৃত্তি সমাজ-ব্যবস্থা ও বিবাহের স্থিতিশীলতার বিরুদ্ধে স্বতঃই বিদ্রোহ-শীল, যাহা জীবনে একটা সর্বোত্তম সফলতা বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছে, যাহার অনুসরণে কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা, প্রেমের পূর্বস্মৃতি, দৈহিক পবিত্রতারক্ষা সকলকেই বলি দেওয়া যায়, যাহা মনকে অপরূপ আবেশ ও নিবিড় ব্যথা-কোমলতায় পূর্ণ করে, তাহার প্রকৃত মূল্য কি? মিনা-নিলয়ের প্রেম যদি মিলনে সার্থকতা লাভ করিত, তবে মানুষ হিসাবে তাহারা কি উচ্চতর সফলতার দাবী করিতে পারিত, তাহাদের জীবন কি উন্নততর পর্যায়ে আরূঢ় হইত, এই প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর মিলে না।

'বহুবল্লভ' উপন্যাসে শ্রীলা ও ডায়েনার বিপরীত আকর্ষণের মধ্যে প্রদীপের চলচ্চিত্ততা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীলা স্বভাব-অকৃতজ্ঞা, দারুণ অভিমানিনী ও প্রশ্রয়-বিলাসিনী, ডায়েনার প্রতি তাহার ঈর্ষ্যা অতি সামান্য কারণেই অগ্ন্যুদ্গার করিয়াছে—ডায়েনা ও প্রদীপের কাব্যালোচনায় তাহার বিরক্তি অশোভন রূঢ়তার সহিত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ডায়েনা স্থির, শান্ত, আত্মদমনশীলা, প্রদীপের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী, কিন্তু শ্রীলার আগমনের পর হইতে সে উহাদের সান্নিধ্য বর্জন করিতে সচেষ্ট। প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রেমের শিখাকে কেমন করিয়া উজ্জ্বলতর করিয়া তোলে ডায়েনা ও প্রদীপের ব্যবহারেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। প্রদীপের শ্রীলাকে গ্রাস্মিয়ারে আনার আসল, অথচ নিজের কাছেও অজ্ঞাত উদ্দেশ্য, ডায়েনার অনুরাগের উত্তাপে শ্রীলার দ্বিধাগ্রস্ত মনকে অসংশয়ে তাহার দিকে আকৃষ্ট করিতে—ডায়েনার ছোঁয়াচে শ্রীলার কামনা জাগাইতে, তাহার মনের গূঢ়, সুপ্ত, অজ্ঞাত ইচ্ছাকে অনবগুণ্ঠিত করিতে। চার্লসের প্রতি ডায়েনার প্রণয়াভিব্যক্তি প্রদীপের উপর ঠিক একই প্রকারের প্রভাবান্বিত। শ্রীলার মূর্ছা বিভূতি ও প্রদীপের বিপরীতমুখী আকর্ষণের অন্তর্দ্বন্দ্বপ্রসূত। প্রদীপ ডায়েনা ও শ্রীলার মধ্যে শেষ নির্বাচনে মনঃস্থির করিতে পারে নাই—উভয়ই তুল্যরূপে প্রার্থনীয় ও অবর্জনীয় বলিয়া তাহার মনে হইয়াছে। এই একনিষ্ঠতার অভাবের জন্যই শেষ পর্যন্ত উভয়েই প্রদীপকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। রূঢ় আঘাতে বিচলিত প্রদীপ সংসারের এই মূঢ় নিষ্ঠুরতার বিষয় চিন্তা করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে—তাহার মনোবীণা Shelleyর Epipsychidion এর সুরেই বাঁধা—

> True love in this differs from gold and clay
> That to divide is not to take away.

এই তিনটি নর-নারী ছাড়া, ডায়েনার খুড়া সার ফ্রান্সিসের চরিত্রটি চমৎকার ফুটিয়াছে। তাঁহার অন্তঃকরণে আভিজাত্য-গর্ব ও স্নেহের বিরোধ সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। স্নেহ মানুষের অন্তর্দৃষ্টিকে কত তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী করে, সার ফ্রান্সিস তাহার উদাহরণ। ইহা ছাড়া ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পবিত্র-স্মৃতিজড়িত, সাহিত্যের মহাতীর্থ গ্রাস্মিয়ার ও হ্রদপ্রদেশের সুকুমার ও মনোজ্ঞ বর্ণনা, পাতায় পাতায় কবিবরের কাব্য-সুরভির অজস্র বিকীরণ উপন্যাসের আকর্ষণ বহুগুণে বাড়াইয়াছে। A. E.র Outcast কবিতার চমৎকার ভাষান্তর সমস্ত উপন্যাসের উপর আদর্শলোকের নক্ষত্রদীপ্তি বর্ষণ করিয়াছে।

'দুধারা' গল্পে তার্কিকতার ফাঁকে ফাঁকে যে করুণ হৃদয়াবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা তর্কের সীমা ছাড়াইয়া রস-সাহিত্যের পর্যায়ে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। তর্কের মধ্য দিয়া ওল্‌গা, রেণে, নিলয় ও পিয়ারের ব্যক্তিত্ব, তাহাদের মত-সংঘর্ষ ও হাস্য-পরিহাস অবাধে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পিয়ারের দুর্ভাগ্যপূর্ণ দাম্পত্য অভিজ্ঞতা, নিলয়ের প্রেমকাহিনীর করুণ ব্যর্থতা তর্ককে সংযত ও শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে। বিশেষ করিয়া প্রতিবেশ-প্রভাব—মেঘের সঙ্গে চাঁদের লুকোচুরি খেলা, নদীর কম্পিত প্রবাহ, গানের সুরের করুণ-ব্যঞ্জনাপূর্ণ রেশ সমস্তই—তর্কের উপর গীতিকাব্যের মাধুর্য ও সুষমা আরোপ করিয়াছে।

আসল গল্পটির বর্ণনা ও বিশ্লেষণ-কৌশলও চমৎকার। প্রেমের রহস্যময় অনুভূতি, কঠোর ক্ষত-বিক্ষতকারী, রক্তস্রাবী অন্তর্দ্বন্দ্ব, গূঢ় মান-অভিমান, উন্মুখতা পরাঙ্মুখতা—এক কথায় প্রেমিক-হৃদয়ের অমৃত-হলাহলমিশ্রিত সমুদ্রমন্থন খুব নিপুণ সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত বিবৃত হইয়াছে। নিলয়ের সংকোচ ও সংযম, হারমানের অতি-মানব উদারতা, মিনির প্রাণঘাতী সংশয়ান্দোলন—সমস্তই মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে লেখকের কৃতিত্বের নিদর্শন। বিশেষতঃ মিনির ডায়েরীতে উদ্‌ঘাটিত ভূমিকম্পের ন্যায় দুর্বার, সর্বধ্বংসী অন্তর্বিপ্লব যেন আগ্নেয় অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার হৃদয়-ব্যাকুলতা যেন সহস্র ধারে, নির্ঝরের শত উৎসারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। প্রতি হৃদয়-স্পন্দন, প্রত্যেকটি আকর্ষণ-বিকর্ষণের তীব্র গতিবেগের উপর প্রেমের অপরূপ দীপ্তি বিকীর্ণ হইয়াছে। প্রেমের এই অগ্নিগর্ভ আলোড়নের চিত্র হিসাবে এই ক্ষুদ্র গল্পটি স্মরণীয় হইবে।

উপন্যাস-রচনা ছাড়া আরও দুইটি ক্ষেত্রে দিলীপকুমারের সাহিত্যিক প্রচেষ্টা বিস্তৃত হইয়াছে—অনুবাদ ও সাহিত্য-সমালোচনা। মোটের উপর কবিতার অনুবাদে তিনি আশ্চর্য-রূপ সিদ্ধহস্ততার পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য সমস্ত কবি সম্বন্ধে তিনি তুল্যরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত যে সমস্ত কবির প্রকাশভঙ্গী সরল ও ঋজু, তাঁহাদের কবিতার অনুবাদ শব্দবাহুল্যের দ্বারা অযথা ভারাক্রান্ত হইয়াছে। "She was a Phantom of Delight" কবিতার অনুবাদ অলংকারবাহুল্যের জন্য কবির প্রতিভার বিশিষ্ট ধারাটি রক্ষা করিতে পারে নাই। কিন্তু যে সমস্ত কবির মধ্যে mysticism বা মর্মপন্থিতার স্পর্শ বা ভাবব্যঞ্জনার প্রাচুর্য আছে তাহাদের ভাষান্তর-করণে দিলীপকুমারের সাফল্য অবিসংবাদিত ও উচ্চ প্রশংসার অধিকারী। ভাবের তীক্ষ্ণ সংক্ষিপ্ততা, ভাষার ক্ষিপ্র দ্যুতি, চিন্তাধারার দ্রুত-পরিবর্তনগুলি আশ্চর্য লঘুতার সহিত ও অবলীলাক্রমে ভাষান্তরের নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। A E.র Outcast কবিতাটির অনুবাদ সূক্ষ্ম ও নিখুঁত অনুবর্তন-নিপুণতার চমৎকার উদাহরণ—ইহা মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টির গৌরব দাবী করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

সমালোচনার ক্ষেত্রে দিলীপকুমার একটি বিশিষ্ট মতবাদের পক্ষ-সমর্থনকারী। উপন্যাসের প্রকৃতি ও আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার যে বিতর্ক হইয়াছিল, তাহাতে তিনি সাহিত্যে রস-সর্বস্বতার (art for art's sake) বিরুদ্ধে মতবাদ অবলম্বন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক উপন্যাসে সমাজনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থার বিশ্লেষণমূলক অবান্তর প্রসঙ্গের অতি-প্রাচুর্যের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—তিনি উপন্যাসের রস-ভাণ্ডার নিছক বুদ্ধি-গত উপকরণ-বাহুল্যে ভারাক্রান্ত করার প্রবণতাকে সম্পূর্ণ সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিতে

পারেন নাই। দিলীপকুমারের প্রধান বক্তব্য বিষয় এই যে, উপন্যাসের পরিধি ও প্রসার ক্রমবর্ধনশীল—ইহার মধ্যে মানবজীবনের সমস্ত প্রশ্নসঙ্কুলতা, সমস্ত উত্তরহীন জিজ্ঞাসা, ইহার সমস্ত ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সা, আদর্শলোকের অভিমুখে অভিযান প্রয়াস—এক কথায় বর্তমান যুগে মানব-চিত্তের সমস্ত আলোড়ন ও অনুপ্রেরণা—আশ্রয় লাভ করিবে ইহাই স্বাভাবিক। এই সর্বব্যাপী আতিথেয়তা আধুনিক উপন্যাসের ত্রুটি নহে, গৌরব। নিছক রসোপভোগের মানদণ্ডে এই সমস্ত তরঙ্গিত বিক্ষোভকে বর্জন করিলে উপন্যাস মানুষের চিত্ত-স্পন্দনের সহিত তাল রাখিতে না পারিয়া ক্রমশঃ শীর্ণ ও পঙ্গু হইয়া পড়িবে। এই মতবাদ তিনি সুপ্রযুক্ত যুক্তিতর্ক সহযোগে ও যথেষ্ট দৃষ্টান্ত সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন—যুক্তি ও ভাষার প্রয়োগ-কৌশলে তাঁহার নিবন্ধ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিযোগিতার অনুপযুক্ত হয় নাই। সমস্ত নিবন্ধটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অপ্রত্যাশিত সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে একটা ক্ষুব্ধ স্নেহানুযোগ ধ্বনিত হইয়া উহার সাহিত্যিক উৎকর্ষবৃদ্ধির হেতু হইয়াছে। Theory-র দিক দিয়া দিলীপের মতবাদ যে সর্বথা সমর্থনযোগ্য তাহা নিঃসন্দেহ—আর্টের সৌন্দর্য জীবনের বিচিত্র-তরঙ্গায়িত, চঞ্চল প্রবাহে নিজ অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া লইতে বাধ্য, জীবনবিশ্লিষ্ট আর্ট ক্ষণভঙ্গুর ও স্বল্পায়ু। কিন্তু প্রয়োগক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণীর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। আর্ট জীবনের অনুগামী সত্য কিন্তু তাই বলিয়া জীবনের সমস্ত বিশৃঙ্খলা, আকস্মিকতা ও অর্থহীন বস্তুস্তূপও যে তাহাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এমন কথা বলা যায় না। জীবনের যতটুকু অংশ সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলায় রূপান্তরিত করা যায়, ততদূর পর্যন্ত আর্টের বিস্তৃতি সাধনে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। আর্টের দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত থাকিবে কিন্তু তাহার মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে হইলে বিশৃঙ্খল জনতাকে নিয়ন্ত্রিত ও শ্রেণীবদ্ধ হইতে হইবে। জীবনের অবাধ প্রবেশাধিকার স্বীকার্য, কিন্তু আর্টের সনাতন মর্যাদা অনুসারে প্রবেশের জন্য উপযুক্ত মূল্যদানও অপরিহার্য। কোনও বিশেষক্ষেত্রে জীবনের কোন খণ্ডাংশ আর্টের গণ্ডির মধ্যে অনধিকার প্রবেশের জন্য অপরাধী হইয়াছে কি না, তাহার বিচার শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত রসবোধের উপর নির্ভর করে। অনধিকার-প্রবেশের সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে উদাহরণ পুঞ্জীভূত করার প্রয়োজন নাই—দিলীপকুমারের রচনা হইতেই তাহার দৃষ্টান্ত মিলিবে। তাঁহার 'মনের পরশ'-এ যে তার্কিকতা সৌন্দর্যে ও সুষমায় অপরিণত রহিয়া গিয়াছে, 'বহুবল্লভ' ও 'দুধারা'য় তাহাই সৌন্দর্যরসে অভিষিক্ত ও হৃদয়াবেগে সঞ্জীবিত হইয়া উপন্যাসের মূল বিষয়ের একাঙ্গীভূত হইয়াছে।

এই সমস্ত উপন্যাসের একত্র বিচার করিলে, বিষয়ের সংকীর্ণতার জন্য কিছু একঘেঁয়েমির ভাব অস্বীকার করা যায় না। প্রেমের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে অতিরিক্ত আলোচনার ফলে ইহাদের মধ্যে কতকটা বলিষ্ঠ পৌরুষের অভাব ও রমণীসুলভ কোমলতার (effeminacy) আধিক্য অনুভূত হয়। বাঙ্গালীর ছেলের প্রেমে পড়িবার জন্য ইউরোপীয় মেয়েদের মধ্যে একান্ত ব্যাকুলতা ও প্রতিযোগিতামূলক দ্বন্দ্ব আমাদের জাত্যভিমানকে যে পরিমাণে পুষ্ট করে, ঠিক সেই পরিমাণে অবিশ্বাসের হাসিরও উদ্রেক করে। তথাপি, এ সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও দিলীপকুমারের উপন্যাসগুলির যে একটা বৈশিষ্ট্য ও স্থায়িত্ব-সম্ভাবনা আছে তাহা অকুণ্ঠিত-ভাবে বলা যাইতে পারে।

(২)

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রচনা অপেক্ষা সাহিত্যিক আলোচনার জন্যই অধিকতর লব্ধ-প্রতিষ্ঠ। তাঁহার গল্পসমষ্টি 'রিয়ালিষ্ট' (১৯৩৩)-এ তিনি প্রমথ চৌধুরীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার গল্পরচনার রীতি ঠিক একই রূপ—গল্পের conventionএর প্রতি বিদ্রূপ ও তাহার ভিতরকার কল-কব্জার রহস্যোদ্‌ঘাটন। চৌধুরী মহাশয়ের বুদ্ধির লঘু ক্ষিপ্রতা ও epigram রচনায় সিদ্ধহস্ততা ধূর্জটিপ্রসাদ ঠিক আয়ত্ত করিতে পারেন নাই—বাগাড়ম্বর ও অবান্তর-প্রসঙ্গের বাহুল্য তাঁহার রচনাকে অনেকটা ভারাক্রান্ত করিয়াছে। 'একদা তুমি প্রিয়ে' গল্পে লেখক একটি সুপরিচিত গানের মনোভাবমূলক প্রতিবেশ কল্পনা করিবার জন্য একটি উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। 'রিয়ালিষ্ট' গল্পটি সর্বোৎকৃষ্ট; ক-বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্রটি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-প্রিয়তায় বেশ মুখরোচক হইয়াছে। মনোরমার সহিত ক-বাবুর ঘনিষ্ঠতার কাহিনীটি প্রারম্ভে উপভোগ্য হইলেও, অযথা বাগাড়ম্বরের চাপে উহার তীক্ষ্ণাগ্রতা হারাইয়াছে।

ধূর্জটিপ্রসাদের পরবর্তী তিনখানি উপন্যাসে—'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫) 'আবর্ত্ত' ও 'মোহানা'য় —তিনি অনুকরণ কাটাইয়া মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। উপন্যাসত্রয়ীতে তীক্ষ্ণ মনন-শক্তির সহিত খাঁটি ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের সমাবেশ হইয়াছে। খগেনবাবুর আত্মসন্ধান ও জীবন-সমালোচনার ফাঁকে ফাঁকে তাঁহার দাম্পত্য-বিরোধের যে খণ্ড খণ্ড দৃশ্য ও হ্রস্ব সংকেত মিলে সেগুলি বর্ণৌজ্জ্বল্যে ও নির্বাচন-সার্থকতায় এক সম্পূর্ণ চিত্রে সংহত হইয়াছে। সাবিত্রীর সন্দেহ-প্রবণ, অভিমানী, একগুঁয়ে প্রকৃতিটি কয়েকটি ক্ষুদ্র আভাস-ইঙ্গিতে চমৎকার ফুটিয়াছে। একদিকে সাবিত্রীর স্থূল ফ্যাশন-অনুবর্তিতা, অন্যদিকে খগেনবাবুর শ্লেষপ্রবণ, অসহিষ্ণু আদর্শবাদ —এই উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের যে আগুন জ্বলিয়াছে, সাবিত্রীর আত্মহত্যা তাহাতে পূর্ণাহুতি দিয়াছে। উপন্যাসের আসল বিষয় হইল সাবিত্রীর বন্ধু রমলার সহিত খগেনবাবুর এক অতি সূক্ষ্ম, জটিল হৃদয়াবেগের সম্পর্ক গড়িয়া ওঠার বিবরণ। রমলার খগেনবাবুর প্রতি সমবেদনা ও শুশ্রূষা শীঘ্রই প্রবল প্রেমে রূপান্তরিত হইয়াছে। খগেনবাবুর মননশীলতার আভিজাত্য-বোধ তাঁহাকে আত্মানুশীলন ও অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য নির্জনবাসে প্রণোদিত করিয়াছে। কিন্তু কাশী যাওয়ার পর সামাজিকতার প্রয়োজনবোধ আবার তীব্র হইয়াছে। চিঠিপত্রের মধ্য দিয়া রমলার সাহচর্য-লাভের জন্য যে ব্যাকুল আগ্রহ ফুটিয়াছে, তাহাকে প্রেমের অগ্রদূত আখ্যা দেওয়া যায়। গ্রন্থের শেষে সুজনকে লিখিত পত্রে অধিকতর শান্ত ও সংযতভাবে এই সুরই পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। মৈত্রী ও উদাসীন নারী-প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের প্রতি সচেতন আগ্রহের প্রথম শিহরণ—এই উভয়ই নায়কের সঙ্গ-পিয়াসী মনের নিকট কাম্য হইয়া উঠিয়াছে। রমলার উত্তরে অকুণ্ঠিত প্রেমনিবেদন ব্যক্ত হইয়াছে।

খগেনবাবুর দিন-লিপিতে জীবন সম্বন্ধে বিচিত্র ও বহুমুখী আলোচনা একদিকে সর্বত্রসঞ্চারী তীক্ষ্ণধীর পরিচয়-স্থল, অন্যদিকে হৃদয়ান্দোলনের তরঙ্গে হিল্লোলিত ও প্রাণময়। গভীর চিন্তা-শক্তি অন্তর্দ্বন্দ্বের কেন্দ্র-বিন্দু হইতে উদ্ভূত হইয়া যেন সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি-সীমা

পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। কাশীর আকাশ-বাতাসে, ধর্ম-চর্চার কৃচ্ছ্রসাধনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ রুদ্ধ বাসনার অঙ্কুরোদ্গমের যে অনিবার্য প্রেরণা প্রচ্ছন্ন আছে তাহাই খগেনবাবুর চিত্তে সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়াশীল হইয়াছে। এই প্রাণধর্মের প্রবল ঝলকে জীবন সম্বন্ধে নূতন সত্যের অনুভূতি ঝলসিয়া উঠিয়াছে। আদর্শবাদের মানদণ্ডে জীবনকে মাপিবার প্রচেষ্টার সাংঘাতিক ভুল ধরা পড়িয়াছে। জীবনে প্রেম যে সহজ ও সুন্দর সামঞ্জস্য আনিয়া দেয়, ও প্রেমাস্পদের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের স্বাধীন, অকুন্ঠিত স্ফুরণ যে এই সামঞ্জস্যের একটা প্রধান অঙ্গ—এই সত্যের উপলব্ধি আসিয়াছে। প্রেমের স্নিগ্ধ স্পর্শের জন্য একটা ব্যগ্র উন্মুখতা জাগিয়াছে। কিন্তু এই সত্যোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে সাধারণ অনুভূতিকে বিশেষ সম্বন্ধের মধ্যে সংহত ও কেন্দ্রীভূত করিতে কুণ্ঠা—অতিরিক্ত চিন্তাজর্জর জীবনেব চিরন্তন অভিশাপ, হ্যামলেটের 'বাঁচি কিংবা মরি'—চলচ্চিত্ততার ছোঁয়াচ। "সাহসের অভাবই হল আমার প্রধান বিপত্তি, ভয়ই আমার প্রধান রিপু;" "প্রেমে যে বিরোধের অবসান সে অবসান আমার নয়"—এই স্বীকারোক্তিই রমলার সহিত তাহার প্রকৃতির পার্থক্যকে স্ফুট করিয়াছে। "রমলার ধর্ম আছে, তার অভিজ্ঞতা উত্তমরূপেই ধৃত, তাই তার পদক্ষেপ লঘু। অধার্মিকেরাই স্থুল হয়।"

প্রেমের দ্বারা বিরোধ অবসানের অসম্ভাব্যতা উপলব্ধি করার পর আর্টের পথে সামঞ্জস্য লাভ কতদূর সম্ভব তাহাই আলোচিত হইয়াছে। প্রধানের সহিত অপ্রধান, সার্থকের সহিত অবান্তরের সমাবেশ-কৌশল আর্টের বিশেষত্ব—ইহা কি জীবনে সংক্রামিত হইতে পারে—এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া অনেকটা অমীমাংসিত রহিয়াছে। এই আলোচনাতে উচ্চাঙ্গের মনন শক্তির পরিচয় থাকিলেও, ইহা উপন্যাসের বিশেষ সমস্যার সহিত অপেক্ষাকৃত নিঃসম্পর্ক। তারপর আসিয়াছে আবার এক বিপরীতমুখী দোলা—শুষ্ক বুদ্ধির বিরুদ্ধে বুভুক্ষু হৃদয়াবেগের দাবী-সমর্থন। এবার ফুটিয়াছে রমলার প্রতি প্রেমের পরিবর্তে কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস ও সহানুভূতির আবেদন। এই মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তনশীলতার মধ্যে আবার আত্মরতির পরিবর্তে কর্ম-প্রেরণা ও সেবাব্রত-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছে—এবং এই সংকল্পই অবিরত আত্মবিশ্লেষণে ক্লান্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে ক্ষণস্থায়ী আশ্রয় দিয়াছে। ফল হইয়াছে কাশী ছাড়িয়া আরও সুদূর অজ্ঞাতবাস ও পরিব্রাজকের জীবন-যাত্রা অবলম্বন।

'আবর্ত'—'অন্তঃশীলা'র উপসংহার—পূর্বগামী উপন্যাসের ঘটনা ও চিত্ত-বিশ্লেষণের জের টানিয়া চলিয়াছে। ইহাতে 'অন্তঃশীলা'র কয়েকটি অপ্রধান চরিত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে ও তাহাদের সমস্যা ও জীবনাদর্শ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। রমলা এখন সমস্ত সংযম, শালীনতার আবরণ ছিঁড়িয়া নিজ কামনার নগ্ন বাস্তবতা প্রকটিত করিয়াছে। খগেনবাবুর প্রতি তাহার লোলুপতা অন্তর-বাহিরের সমস্ত বিরুদ্ধতা অতিক্রম করিয়া অনিবার্য বুভুক্ষার মূর্তি ধরিয়াছে। এইবার সুজনের হৃদয়-উন্মোচনের পালা। রমলার সহিত তাহার সম্বন্ধের মধ্যে ছোট ভাইএর স্নেহবুভুক্ষার সহিত অজ্ঞাতসারে প্রণয়ীর অধিকারমূলক অসপত্ন দাবীর অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছিল। রমলার নিজ ব্যবহারেই এই কামনার বীজ সুজনের মনে অঙ্কুরিত হইয়াছে। এখন খগেনবাবুর প্রতি রমলার নিসংকোচ প্রেমাভিব্যক্তিতে এই অবচেতন লালসা দুর্নিবার তীব্রতার সহিত অনবগুণ্ঠিত হইয়াছে। কাশীতে অক্ষয়ের গৃহে তাহাদের একরাত্রির একত্রবাসে এই অন্তঃরুদ্ধ আবেগের সমস্ত অসহনীয় উত্তাপ ও জ্বালার বিকীরণ অনুভব করা যায়—যদিও ঘটনার দিক্ হইতে ইহার

স্বাভাবিকতা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইহার মধ্যে বঞ্চিত প্রেমিকের তিক্ত ক্ষোভ ও খগেন বাবুর প্রতি তাহার উচ্চ ধারণার বিপর্যয়ে আদর্শবাদের মোহভঙ্গ প্রায় সমপরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে। সে বিজনকে আনাইয়া বালির বাঁধের দ্বারা সমুদ্রতরঙ্গরোধের হাস্যকর চেষ্টা করিয়াছে ; মাসীমার সংস্কারকে উত্তেজিত করিয়া রমলার উদগ্র কামনার এক প্রতিদ্বন্দ্বী-শক্তিকে যুদ্ধক্ষেত্রে নামাইয়াছে। শেষ পর্যন্ত পরাশ্রয়ী জীবনের সমস্ত বুকজোড়া ক্লান্তি ও আশালেশহীন ঔদাস্য লইয়া সে রঙ্গমঞ্চ হইতে অপসৃত হইয়াছে।

গ্রন্থমধ্যে বিজনের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত। সে সুজন ও খগেনবাবুর বিপরীতধর্মী—সুস্থ, স্বাভাবিক তারুণ্যের প্রতীক। সুজন যেন লরেন্সের জগৎ হইতে আমদানী, ছোটভাই ও প্রেমিকের সংমিশ্রণ , বিজন খাটি ও অবিমিশ্র ছোটভাই। খগেন-বাবুর প্রতি তাহার সুগভীর অবজ্ঞা, সামঞ্জস্যহীন বিরোধ। যে জটিল চিন্তাধারার আবর্তে খগেনবাবু হাবুডুবু, সুজন যে সাংঘাতিক ঘূর্ণীচক্রের দিকে নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, বিজন তীরের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া কতকটা অবজ্ঞা-মিশ্রিত অনুকম্পার সহিত তাহাদের সেই দুর্দশা দেখিতেছে। তাহারও যৌবন-সুলভ খেয়াল আছে —সে সাম্যবাদের একটানা স্রোতে নিজ অনভিজ্ঞ ভাব-বিলাসের চিত্রিত তরণী ভাসাই-য়াছে। তথাপি সেও রমাদি ও সুজনের মধ্যে যে স্তব্ধ ঝটিকার পূর্বাভাস-পূর্ণ, বিদ্যুদ্গর্ভ নীরবতা নামিয়া আসিতেছে তাহার স্পর্শ অনুভব করিয়াছে, এবং এই আসন্ন বিচ্ছেদের সন্ধিক্ষণে যে সুজনেরই পাশে দাঁড়াইয়াছে। রমলার সান্নিধ্য হইতে পলায়নের জন্য সে সুজনকে যে সনির্বন্ধ, স্নেহানুযোগ-ক্ষুব্ধ অনুরোধ জানাইয়াছে, তাহা যেন সমস্যাপীড়িত প্রৌঢ়জীবনের প্রতি অপরিণতবুদ্ধি যৌবনের আন্তরিক, কিন্তু কার্যতঃ অক্ষম, সতর্কবাণী— সে বিপদের প্রকৃতি না বুঝিয়াও তাহার গুরুত্ব বোঝে।

রমলার একরোখা আগ্রহাতিশয্য প্রতিহত হইয়াছে তাহার প্রেমাস্পদের পারদের ন্যায় চঞ্চল, দানা বাঁধিতে অক্ষম, বিভিন্নমুখী আকর্ষণে আন্দোলিত প্রকৃতির দ্বারা। তাহার মুহূর্ত-পূর্বের বিগলিত হৃদয়ধারা পরমুহূর্তে বরফের ন্যায় জমাট বাঁধিতেছে— একদিনের আগ্রহ পরদিনের ঔদাসীন্যে সংকুচিত হইতেছে। হিমালয়-ভ্রমণ ও হরিদ্বারে আশ্রমবাসের সময় রমলার উগ্র কামনার স্মৃতি কখনও কখনও খগেনবাবুকে অভিভূত করিয়াছে ; এক একদিন নিজেরও আদিম, অসংস্কৃত প্রবৃত্তি তাহার প্রত্যুত্তর দিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর রমলা সম্বন্ধে তাহার মনোভাব আর কোনও নূতন পরিবর্তন-রেখায় দৃঢ়াঙ্কিত হয় নাই। প্রেমের চিন্তা অপেক্ষা আশ্রমের কৃত্রিম ও শূন্যগর্ভ জীবনাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই স্পষ্টতর অভিব্যক্তি পাইয়াছে। "হিমালয়ের বিপুলতায় আশ্রম যেন প্রক্ষিপ্ত, গীতার নিষ্কাম ধর্ম যেমন মহাভারতের স্বাভাবিক ক্ষাত্র ধর্মে প্রক্ষিপ্ত, যেমন প্রকৃতির উপর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পরমাত্মা প্রক্ষিপ্ত"— এই মন্তব্যই আশ্রম সম্বন্ধে তাহার মনোভাব-দ্যোতক। হিমালয়ের নিজস্ব মহিমা, তাহার বিপুল প্রশান্তি মানুষের বুদ্ধির অহংকার ও হ্যামলেটিয়ানার আত্মসর্বস্বতার প্রতিষেধক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে—তথাপি খগেনবাবু সেখানেও নিজ সমস্যার সমাধান পায় নাই। কাশী ফিরিয়া রমলার সহিত মুখোমুখি বোঝাপড়ার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। আবার নায়কের স্বভাবসিদ্ধ দুর্বলতা, চরম নিষ্পত্তি গ্রহণে অক্ষমতা প্রকটিত হইয়াছে। সে

আবার আত্মপরীক্ষার জন্য অবসর চাহিয়াছে। রমলা এই সমস্ত বিলম্ব ঘটাইবার অজুহাত সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়াছে এবং পরবর্তী দুই দিন কতকটা রমলার প্রবল ইচ্ছাশক্তির ও কতকটা কাশীর সানাইএর সম্মোহন, সমন্বয়কারী প্রভাবে খগেনবাবুর সন্দেহ-দোদুল চিত্তে প্রেমের আবেগ ও সহজ মাধুর্য সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু অতি সামান্য কারণে এই হৃদয়াবেগের পূর্ণ উচ্ছ্বাসে ভাটার টান ধরিয়াছে। রমলার চাঁপা রঙের শাড়ী ও অনাবৃত বাহু—তাহার অন্তরের বহ্নিজ্বালার রক্তিম প্রতিচ্ছবি—নায়কের ধূসর, চিন্তাক্লিষ্ট মনে বর্ণোচ্ছ্বাসের বিহ্বলতা, অসংযম ও আতিশয্যের ভীতি সঞ্চার করিয়াছে। মাসীমার সহিত সাক্ষাতের পর আবার নূতন সংশয়ে তাহার মন দোলায়িত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত বিজনের দোহাই দিয়া যে উষ্ণ, বেগবান্ আবেগধারা তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, তাহাকে সে রোধ করিতে চাহিয়াছে। সুজন, রমলা ও খগেনবাবু—তিন জনের নিকটই বিজনের বিশেষ মর্যাদা ও মূল্য আছে। সুজন রমলার অসংযত হৃদয়াবেগকে লজ্জা দিবার জন্য তাহাকে হাজির করিয়াছে, রমলা লজ্জা এড়াইবার জন্য তাহার সান্নিধ্য পরিহার করিয়াছে, খগেনবাবু বিজনের সাম্যবাদমূলক সমাজ-ব্যবস্থায় তাহাদের এই অসামাজিক প্রেমের কিরূপ অভ্যর্থনা হইবে তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য চূড়ান্ত নিষ্পত্তিক্ষণকে পিছাইতে চাহিয়াছে। রমলা ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকে বলি দিতে নারাজ, খগেনবাবু—ভবিষ্যৎহীন বর্তমানের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে অনিচ্ছুক, যে মিলনে ভবিষ্যৎ সৃষ্টির বীজ নাই তাহা তাহার নিকট অর্থহীন। কাজেই শেষ পর্যন্ত চালমাত দাঁড়াইয়াছে, অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়া আবর্তের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি জীবনে স্থায়ী হইয়াছে। উপন্যাসের শেষ ঘটনা—মাসীমার মৃত্যু অবস্থার কোন পরিবর্তনের ইঙ্গিতরূপে গ্রহণ করা যায় না। (যদিও পরবর্তী খণ্ড 'মোহানায়' ইহার উপর এইরূপ গুরুত্বই আরোপিত হইয়াছে)।

মনন-ক্রিয়ার আধিক্য ও বিস্তার সত্ত্বেও চরিত্রগুলি জীবন্ত হইয়াছে। চিন্তার নানামুখী তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়াও খগেনবাবুর সত্তার কেন্দ্রবিন্দু স্থির আছে। রমলা, সাবিত্রী ও সুজনেরও দুর্বিষহ জীবন-সমস্যা তাহাদের জীবন্ত হৃদয়-স্পন্দনকে চাপা দেয় নাই—সমস্যা জীবন-তরুরই কণ্টকিত পল্লব। বিজন ইহাদের মধ্যে অনেকটা যান্ত্রিক ও প্রয়োজনমূলক সৃষ্টি—তাহার নিজের জীবন অপেক্ষা অপরের উপর তাহার প্রভাবই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। মাসীমাও এইরূপ গৌণ চরিত্রের পর্যায়ে পড়েন—খগেনবাবুর প্রতি তাঁহার স্নেহশীলতা মাঝে মাঝে সন্দেশ খাইবার আমন্ত্রণেই নিঃশেষিত, তাঁহার মধ্যে ঔদাসীন্য ও শুভানুধ্যায়িতার সমন্বয় স্বাভাবিক হইয়া উঠে নাই। 'অন্তঃশীলা'য় নায়ক খগেনবাবু—তাহাকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বব্যাপী চিন্তাধারা জ্ঞানের পরিধিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। 'আবর্ত'-এর নায়ক প্রকৃত পক্ষে সুজন—গ্রন্থে তাহারই প্রকৃতিরহস্য-উন্মোচন, এখানে মনন-শক্তির আপেক্ষিক সংকোচ। সোসিয়ালিজমের আলোচনা যেন সমাজনীতির রাজ্য হইতে আমদানি, ঔপন্যাসিক চরিত্রের সহিত প্রাণ-সম্পর্ক-হীন। মোটের উপর উপন্যাসদ্বয় উচ্চ প্রশংসার উপযুক্ত—নূতন রীতি-পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ ও বৈদগ্ধ্যের সহিত বাস্তব সৃষ্টির সুষ্ঠু সমন্বয়।

এই উপন্যাস-ত্রয়ীর শেষ পর্যায় 'মোহানা'য় পূর্ববর্তীদের উৎকর্ষের মানদণ্ড অনেকটা নিম্নাভিমুখী হইয়াছে। মাসীমার মৃত্যু খগেনবাবু ও রমলার মিলনের পথের লৌকিক অন্তরায়কে

অপসারিত করিয়াছে। কিন্তু কতকটা খগেনবাবুর উদাসীনতা ও অনাসক্তি, কতকটা উভয়ের আদর্শ-বৈষম্যের জন্য এই ক্ষীণজীবী প্রেম সার্থক হয় নাই। উপন্যাসের আলোচ্য বিষয় খগেনবাবু-রমলার সম্পর্কের মানসিক আবেদন এবং কানপুরের শ্রমিক ধর্মঘটের কর্মপদ্ধতি ও আদর্শের আলোচনার মধ্যে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়াছে। বিজন একদিকে অতীত ও বর্তমান, অপরদিকে হৃদয়-সম্পর্কের অসুস্থ জটিলতা ও শ্রমিক আন্দোলনের সরল কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে যোগ-সূত্র রচনা করিয়াছে। কিন্তু বর্তমান উপন্যাসে তাহার যান্ত্রিক প্রয়োজনের দিক্‌টা আরও অনাবৃতভাবে প্রকট হইয়াছে। সে একদিকে রমলাকে গৃহস্থালী পাতাইতে সাহায্য করিয়াছে, অন্যদিকে খগেনবাবুকে ধর্মঘটের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহার দুরারোগ্য চলচ্চিত্ততাকে সাময়িকভাবে একটা বিশেষ-লক্ষ্যাভিমুখী করিয়াছে। তাহার নিজের যে মানস পরিণতি ঘটিয়াছে তাহা উপন্যাসের একটা গৌণ বিষয়; এবং সফিকের সঙ্গে মতভেদ তাহাকে আবার এক নূতন কর্তব্য-বিমূঢ়তার প্রান্তদেশে পৌঁছাইয়াছে। শ্রমিক ধর্মঘটের আলোচনায় ও এতৎ-সম্পর্কীয় বিরুদ্ধ মতবাদের বিশ্লেষণে লেখক স্থানে স্থানে পূর্বের ন্যায় সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন সত্য; আন্দোলনের উত্তেজনাপূর্ণ, জরাতুর (hectic) আবহাওয়ার দ্রুতস্পন্দনও কতকটা লেখনীমুখে ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি মনে হয় যেন দুই বিরোধী পক্ষের শক্তি-পরীক্ষার মত্ত আস্ফালন ও বিকারগ্রস্ত যান্ত্রিকতা ইহার খাঁটি মানবিকতাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। ধর্মঘটের নেতা সফিকের কূটনীতি ও প্রচণ্ড ইচ্ছা-শক্তি তাহার মানবিক পরিচয়কে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এই মজুর-বিক্ষোভ খগেনবাবু ও রমলার মধ্যে ব্যবধানকে আরও বাড়াইয়া উভয়ের সম্বন্ধকে আর একটা পরিবর্তনের সন্ধিস্থলের দিকে লইয়া গিয়াছে। এই পরিবর্তনের ইঙ্গিতগুলি বেশ সুস্পষ্ট নহে—তথাপি মোটামুটি ইহা রমলাকে নিজ অতৃপ্ত হৃদয়াবেগের পরিতৃপ্তির জন্য পুরুষান্তরকে কেন্দ্র করিয়া মোহাবেশের রঙ্গিন জাল বুনিবার প্রেরণা দিয়াছে, আর খগেনবাবুকে সফিক-নির্দিষ্ট কর্মপন্থার অনুসরণে ব্রতী করিয়াছে। খগেনবাবুর শেষ পরিণতি কাজের মানুষে; রমলার, রঙ্গিন-পাখা-মেলা, স্বচ্ছন্দবিহার প্রজাপতিতে। কিন্তু এই পরিণতি তাহাদের পূর্বজীবনের অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থের পরিসমাপ্তি কি যাত্রার শেষ না মধ্যপথে ক্ষণিক বিরতি—এই প্রশ্ন মনকে সন্দেহাকুল করে।

(৩)

অন্নদাশঙ্কর রায়

অতি-আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যাহারা ব্যক্তিজীবন-বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে যে পৃথিবী-ব্যাপী জটিল চিন্তাধারা ও সমস্যা-সংকুলতা মানবমনকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিতেছে তাহার আলোচনাতেই মুখ্যভাবে ব্যাপৃত থাকেন, অন্নদাশঙ্কর রায় বোধ হয় সেই শ্রেণীর শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার মননশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ও সক্রিয়। অতি সহজ, সরল কথায়, তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়া তিনি দুরূহ আলোচনার মর্মভেদ করিতে পারেন। ইহা ছাড়া যে সমস্ত নর-নারী আত্মকেন্দ্রিক জীবনে সীমাবদ্ধ নহে, বিশ্বব্যাপী বিক্ষোভ ও আন্দোলন যাহাদের বক্ষস্পন্দনকে দ্রুততর করিয়া ব্যক্তিজীবনকে সমৃদ্ধ করে, পৃথিবীকে নূতন করিয়া গড়িবার আকাঙ্ক্ষা, বিভ্রান্ত

জগৎকে নূতন পথ-নির্দেশের প্রেরণা যাহাদের ব্যক্তিগত কামনা-ভালবাসার প্রকৃতি ও গতিবেগ নির্ধারণ করে, অন্নদাশঙ্করের সুবৃহৎ উপন্যাস 'সত্যাসত্য'-এ তাহাদের বহিঃপ্রচেষ্টা ও অন্তরের আকৃতি সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। আজকাল পাশ্চাত্ত্য দেশ-সমূহের অধিবাসীর একটা বিশিষ্ট অংশ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহারা সর্বদা একটা যুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ায় বাস করে; আপন আপন দলের মতপ্রতিষ্ঠা ও বিরুদ্ধমত-খণ্ডন ইহাদের জীবনের মুখ্যতম প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টায় ইহাদের বক্ষোরক্ত, ইহাদের তীব্রতম অনুভূতি ও কাম্যতম আকাঙ্ক্ষা আলোড়িত হইয়াছে। ব্যক্তিজীবনের স্বাধীনতাকে ইহারা যথাসাধ্য সংকুচিত করিয়া আনিয়াছে। প্রেম, বন্ধুতা, সমবেদনা, প্রভৃতি সুকুমার হৃদয়বৃত্তিগুলি এই রণোন্মাদের তালে তালেই স্পন্দিত হইয়াছে; ইহার অনুমতি ব্যতীত এক পা'ও অগ্রসর হইতে সাহসী হয় নাই। জীবনকে লইয়া অশ্রান্ত পরীক্ষা চলিয়াছে—ইহাকে সর্বদা নূতন নূতন আদর্শে যাচাই করা হইয়াছে, নব নব অনুভূতির স্পর্শে, নব নব সমস্যার প্রভাবে ইহার উদ্দেশ্য ও যাত্রাপথ-নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে। রাজপথের ধূলিজালের মধ্যে, ইহার চিন্তা ও কর্মজগতের দ্রুতগামী তরঙ্গোচ্ছ্বাসের কেন্দ্রস্থলে অন্তর-লোকের অভিনয়-লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

অবশ্য এই নূতন প্রণালীর সুবিধা অসুবিধা দুই আছে। পটভূমিকার বিস্তৃতির সঙ্গে সমপরিমাণে উপলব্ধির গভীরতা কমে। বহির্মুখী জীবনের বিক্ষেপ ইহার রসকে তরল করে, বাহ্যবস্তুর পুঞ্জীভূত চাপে অন্তরের স্বচ্ছন্দ বিকাশ কতকটা প্রতিরুদ্ধ হয়। জীবনের যে স্তরে আমরা তর্ক করি, জগতের কল্যাণ চিন্তা করি, দলগত প্রতিপত্তি-বর্ধনে যত্নবান, এমন কি জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন হই; আর যে স্তরে ভালবাসি, আত্মবিস্মৃত যৌবন-স্বপ্ন রচনা করি, সহজ আত্মীয়তার টানে আকৃষ্ট হই, হৃদয়ের প্রত্যক্ষ, যুক্তিতর্ক-নিরপেক্ষ অনুভূতির স্পর্শ পাই—এই দুই স্তর সমান গভীর নহে। কাজেই বাদল, সুধী, প্রভৃতি চরিত্রগণ যখন নানা অভিজ্ঞতার স্তর দিয়া, নানা লোকের সাহচর্যে ও মতবাদের সংঘর্ষে, বিচিত্র পরিবেষ্টনীতে নিজ আদর্শ খুঁজিয়া বেড়ায়, তখন যেন তাহাদের ব্যক্তিত্বের উপরিভাগের স্তর মননশক্তিতে ভাস্বর ও উত্তেজনায় বেগবান্ হইয়া উঠে, কিন্তু ইহার গভীরতম রহস্যটুকু ধরা পড়ে না। যে মন পরিবর্তনের তরঙ্গে সর্বদা দোলা খাইতেছে, তাহার আন্দোলনের অস্থির ঝিকিমিকি বিশ্লেষণ শক্তির গভীরতাকে প্রতিহত করে। উজ্জয়িনী যতদিন তাহার একনিষ্ঠ হৃদয়বৃত্তি দিয়া বাদলের সহিত মিলন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে, ততদিনই তাহার গভীরতম পরিচয় আমাদের মনে মুদ্রিত হয়। যখন সে বিলাতে আসিয়া তাহার সহস্র চটুল বিক্ষেপ ও উদ্‌ভ্রান্তকারী মাদক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বাদলকে ভুলিতে ও নিজের কেন্দ্রচ্যুত মনের ভার-সাম্য পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেছে, তখন তাহার একটি সাময়িক, সংশয়-জড়িত রূপই আমাদের চোখে ধরা দেয়। পক্ষান্তরে ইহাও সত্য যে, ইহাদের প্রাণবেগ-চঞ্চলতা এইরূপ মত-সংঘর্ষের উন্মাদনা ও জনাকীর্ণ সমাজের বিচিত্র প্রভাব-আকর্ষণের তির্যক্ পথ ধরিয়াই স্বাভাবিক বিকাশ খোঁজে। ইহারা আত্মার সমগ্রতাকে আবিষ্কার করে আদর্শ অনুসরণের প্রেরণায়, তার্কিকতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আলোকে, সপক্ষ বিপক্ষের সমবেত সহযোগিতায় নিষ্ক্রমানস অনিশ্চয়তার অপসারণে, পথ-চলার গতিবেগের ছন্দে। কাজেই এই সমস্ত কর্মশীলতার সহিত ইহাদের প্রগাঢ়তম হৃদয়ানুভূতিগুলি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া পড়ে। তর্কের উত্তেজনায় ইহাদের

হৃদয়বৃত্তি স্ফুরিত হয়; ইহারই ঝোড়ো হাওয়ায় ইহাদের অন্তর-যবনিকা অপসারিত হয়; তীক্ষ্ণ, শাণিত যুক্তি-প্রয়োগের ফাঁকে ফাঁকে ইহাদের কণ্ঠস্বর হঠাৎ আবেগে ভারী হইয়া উঠে। বাদ-প্রতিবাদের কোদালি দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে ইহারা অকস্মাৎ হৃদয়ের গভীর-স্তরশায়ী কোহিনুরের সন্ধান পায়। তর্ক ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তির আস্ফালন মাত্র নহে, ইহাদের সমস্ত প্রকৃতিটির আত্মানুশীলন। সেইজন্য ইহাদের যে চিত্তবিশ্লেষণের চেষ্টা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অগভীর নহে। এই পথেই ইহাদের সত্য পরিচয় মিলে। মানবজাতির উন্নয়ন ও ভবিষ্যতের পথ-সন্ধানই বাদলের গভীরতম হৃদয়াকুতিকে গ্রাস করিয়াছে—ব্যক্তিগত প্রেম ইহার সহিত তুলনায় নিতান্ত গৌণ। সুধীও তাহার আদর্শনিষ্ঠার বেদীমূলে তাহার ভালবাসাকে অবিচলিত-ভাবে বলি দিয়াছে। অবশ্য প্রেমের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই বৃহত্তর আদর্শের শ্রেষ্ঠতা কেবল তর্কে নহে, চরিত্রদের কর্মে, ব্যবহারের ও অনুভূতির আন্তরিকতার দিক্ দিয়া নিঃসংশয়িত-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। লেখক এই চেষ্টায় মুখ্যতঃ সফল হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহার উপন্যাসের উৎকর্ষ।

স্থানে স্থানে ঘটনা-প্রবাহের প্রাধান্যের নিকট চরিত্রস্ফুরণ যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহার নিদর্শনের অভাব নাই। বাদলকে পরিবর্তনের এত ক্ষিপ্রগতি ঘূর্ণীপাকের মধ্যে ফেলা হইয়াছে যে, তাহার চরিত্রের অগ্রগতি ইহার সহিত সমতা রাখিতে পারে নাই। তাহার অবিমিশ্র বুদ্ধিবাদ কি করিয়া সম্পূর্ণ আত্মবিলোপী সেবাব্রত-নিষ্ঠায় রূপান্তরিত হইল তাহা অপরিস্ফুট রহিয়াছে। তাহার এই নেশাটুটার কারণও যথেষ্ট মনে হয় না। আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাদলের গভীর অনুসন্ধিৎসা তাহার অথবা লেখকের তীক্ষ্ণ মননশীলতার পরিচয়। কিন্তু এই দার্শনিক উপলব্ধি তাহার চরিত্রের সহিত একাঙ্গীভূত হয় নাই। তাহার শ্বশুরের মৃত্যুতে তাহার নিজের জীবিত থাকার অখণ্ডনীয় প্রমাণ আবিষ্কার হাস্যকর অসঙ্গতিরই সৃষ্টি করিয়াছে। বাদল যতই আত্মভোলা হউক না কেন, ইহাই যে তাহার মৃত্যুর সহিত প্রথম পরিচয় তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। উজ্জয়িনীর চরিত্রেও তাহার বৈষ্ণব ভাব-বিহ্বলতা গভীর উপলব্ধি অপেক্ষা অনিচ্ছাকৃত ব্যঙ্গানুকরণের (parody) সহিতই অধিকতর সাদৃশ্যান্বিত। বিলাতে আসিয়া বাদলের সহিত পুনর্মিলনের সম্ভাবনা লুপ্ত হইবার পর তাহার অস্থির চিত্ত-চাঞ্চল্য নানা বিক্ষেপ ও পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোন স্থির পরিণতিতে সংহত হয় নাই। ঘটনা-প্রধান, তত্ত্বালোচনা-বহুল উপন্যাসের ইহাই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। লেখক তাঁহার সর্বশেষখণ্ডে উপন্যাসটিকে মহাকাব্যরূপে অভিহিত করিবার দাবী প্রত্যাহার করিয়া ইহার রসোপলব্ধিকে সহজ ও বাধাহীন করিয়াছেন। বর্তমান যুগের মহাকাব্য বিশৃঙ্খলার সীমাহীন ব্যাপ্তি ও বিস্তার—প্রাচীন যুগের মহাকাব্যের সহিত ইহার একমাত্র সাদৃশ্য অতিকায়তায়, ইহার মর্মগত ঐক্য-বাণীতে নহে।

অন্নদাশঙ্করের প্রাথমিক রচনাগুলি নিষিদ্ধ প্রেম ও বিলাত-প্রবাসীর অভিজ্ঞতা লইয়া লেখা—এগুলি অগভীর ও লঘুচপল—প্রায় প্রহসনের লক্ষণাক্রান্ত। 'সত্যাসত্য'-এ বিরাট ও গভীর তাৎপর্যের কোনও পূর্বসূচনা ইহাদের মধ্যে মিলে না। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'অসমাপিকা' (১৯৩০) বুদ্ধদেব-অচিন্ত্য-গোষ্ঠির মনোভাবের চিহ্নাঙ্কিত। সুচারু ও সুরুচির প্রেমের আবির্ভাব যেরূপ আকস্মিক, ইহার ভবিষ্যৎ পরিণতিও সেইরূপ খামখেয়ালী। সুচারু

সুরুচির গর্ভে নিজ মানস কন্যার আগমনের জন্য অতিমাত্রায় উৎসুক। যখন সে আবিষ্কার করিয়াছে যে সুরুচি ইতিপূর্বেই অন্তঃসত্ত্বা তখন তাহার প্রণয়িণীর এই অবাঞ্ছিত মাতৃত্বে তাহার দাম্পত্য সুষমার আদর্শ রূঢ় আঘাত পাইয়াছে ও তাহাদের প্রণয়োচ্ছ্বাস নানারূপ সূক্ষ্ম, অনির্দেশ্য অতৃপ্তির প্রভাবে খণ্ডীভূত হইয়া আসিয়াছে। শেষ পর্যন্ত এই ক্রমবর্ধমান চিত্ত-ক্ষোভ তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে ও সুরুচি শিশু কন্যাসহ আবার পিতৃগৃহে ফিরিয়াছে। এই প্রণয়লীলার সমাজতান্ত্রিক ও পারিবারিক দিক্‌টা লেখক একবারেই উপেক্ষা করিয়াছেন। নবজাত শিশু ও লেখকের প্রথম রচনা উভয়ের প্রতিই 'অসমাপ্ত' নামকরণ সমভাবে প্রযোজ্য —গ্রন্থে ভাষার সৌষ্ঠব ছাড়া কোনওরূপ মনস্তত্ত্বকুশলতার পরিচয় নাই।

লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'আগুন নিয়ে খেলা' (সেপ্টেম্বর, ১৯৩০) এক ইংরেজ তরুণীর সহিত বাঙ্গালী যুবক সোমের চটুল প্রেমাভিনয়ের কাহিনী। যুদ্ধোত্তর যুগের কর্মভার-ক্লান্ত, যান্ত্রিকতা-ক্লিষ্ট জীবনে নর-নারীর মধ্যে নৈতিক সংযম কত সহজে শিথিল হয় ও ক্ষণস্থায়ী প্রণয় বিকশিত হইয়া আবার ঝরিয়া পড়ে, তাহাই ইহার বর্ণনীয় বিষয়। এ যেন গৃহ ছাড়িয়া পথেই বাসর-শয্যা পাতা। এই সম্পর্কের ক্ষণিকতাই ইহাকে একটি করুণ, মধুর সৌন্দর্যে অভিষিক্ত করে—সপ্তাহান্তের সম্বন্ধটি জীবনে স্থায়ী করা যাইবে না বলিয়াই একটা ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস মাঝে মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এই পলাতক প্রেম চঞ্চল, বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতির মত চোখের উপর একটা রং-এর হিল্লোল খেলাইয়া অন্তর্হিত হয়। হাস্য-পরিহাসপূর্ণ, রসিক কথাবার্তার মধ্য দিয়া সুনিপুণ প্রেম-নিবেদন এই উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ। বিশ্লেষণ ও চরিত্রসৃষ্টির কোন চেষ্টা নাই—সোম ও পেনি আধুনিক যে কোন তরুণ-তরুণীর প্রতিনিধি। মাঝে মধ্যে অভিমান ও প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়া এই আকর্ষণের ক্রম-পরিণতির স্তর দেখাইবার চেষ্টা আছে, কিন্তু ইহার বিশেষ কোন মনস্তাত্ত্বিক মূল্য নাই। শেষ পর্যন্ত বিবাহের সম্ভাব্যতার আলোচনার মধ্যে গ্রন্থের আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। পথের রোমান্স ঘরের ধরাবাঁধা রুটিনে পর্যবসিত হইবার পূর্বেই ধূসর অনিশ্চয়তায় মিলাইয়াছে।

'পুতুল নিয়ে খেলা' (১৯৩৩)—'আগুন নিয়ে খেলা'র শেষাংশরূপে গণ্য হইতে পারে। পূর্ববর্তী গ্রন্থের নায়ক সোম দেশে ফিরিয়া পাত্রী নির্বাচন উপলক্ষে কয়েকটি প্রহসনের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেক মেয়ের নিকট প্রেম নিবেদনের পূর্বে সে নিজ অতীত ইতিহাস জানাইতে চাহিয়াছে—কিন্তু কেহই এ শর্তে তাহাকে গ্রহণ করিতে রাজি হয় নাই। নির্জন সাক্ষাতের অবসর-প্রার্থনা প্রত্যেক পরিবারেই তুমুল বিক্ষোভ জাগাইয়াছে। লজ্জা-সংকোচের জড়পিণ্ড শিবানী, সংগীতপ্রিয়া সুলক্ষণা, হেডমাস্টার-দুহিতা বি. এ. অনার্স অমিয়া, ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজ-বিহারিণী প্রতিমা, ও অসহযোগ আন্দোলনে সংশ্লিষ্টা মায়া সকলেই কোন-না-কোন ভাবে নিজেদের অন্তর্নিহিত, অনুদার রক্ষণশীলতা ও ইতর সন্দেহ-প্রবণতার পরিচয় দিয়াছে। কেহই ভাবী স্বামীর চরিত্রস্খলনকে উদার সহানুভূতি ও সাহসিকতার সহিত গ্রহণ করিতে পারে নাই। কেহ বা চিরাচরিত নীতি, কেহ বা ভাবাবেশ, কেহ বা পিতার প্রতি একান্ত আনুগত্য, কেহ বা 'ফর্ম'-জ্ঞান বা সুরুচি, আর কেহ বা শ্লীলতার দিক্ দিয়া সোমের এই খোলাখুলি স্বীকারোক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে। কোথাও কোথাও প্রহসনের আতিশয্যে সম্ভাব্যতা ও সুরুচির সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে। তথাপি বইখানির মধ্যে যথেষ্ট উপভোগ্য

সরলতা ও লীলাচঞ্চল প্রাণ প্রবাহের পরিচয় আছে। বিবাহের নামে যে প্রকাণ্ড প্রহসন সমাজে চলিতেছে, যে পুতুলখেলার অভিনয় অনুষ্ঠিত হইতেছে, বিভিন্ন শিক্ষাদীক্ষা ও আবেষ্টনের মধ্যে সেই নির্জীব প্রথা-দাসত্বের কবন্ধ-নৃত্য লেখক আবিষ্কার করিয়াছেন। চরিত্রগুলিও ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জন সত্ত্বেও জীবন্ত ও ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট হইয়াছে।

'সত্যাসত্য' (১৯৩২-১৯৪২) সুবৃহৎ উপন্যাস, ছয়টি খণ্ডে সম্পূর্ণ। ইহাতে আধুনিক যুগের সমস্ত জটিল সমস্যা, সমস্ত নূতন, অনিশ্চয়তামূলক পরীক্ষা, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক মতবাদ, মানব-কল্যাণের পরস্পর-বিরোধী আদর্শ অতি সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের পুরাতন উদার-নৈতিক মত—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও রাষ্ট্রনিরপেক্ষ স্বাধীন চেষ্টার জয়-ঘোষণা—, শ্রমিক, কমিউনিষ্ট ও বলশেভিক আদর্শের যুক্তিবিচার, গান্ধীবাদ ও অহিংস আন্দোলনের সার্থকতা ও সার্বভৌম প্রয়োগ, বুদ্ধিবাদ ও হৃদয়ানুভূতির তুলনা, যুদ্ধবর্জন ও শান্তিবাদ-প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা, বিবাহ-বন্ধনের চিরন্তনতা, ইত্যাদি যে সমস্ত চিন্তাধারা যুদ্ধোত্তর যুগের সমস্যা-পীড়িত মানব-মনকে অহরহ আলোড়িত করিতেছে, তাহারা সকলেই এই উপন্যাসের অধ্যায়গুলিতে, মননশীলতা ও হৃদয়াবেগের সহিত যুক্ত হইয়া, প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে। সুতরাং কেবল মননশীলতার মানদণ্ডে উপন্যাসটির স্থান খুব উচ্চে। কিন্তু ব্যক্তি-নিরপেক্ষ মতবাদ-আলোচনা ঔপন্যাসিকের চরম উৎকর্ষের পরিচয় নহে। বর্তমান উপন্যাসে বাদল, সুধী ও উজ্জয়িনী এই তিনটি জীবনকে কেন্দ্র করিয়া এই সমস্ত সমস্যা আবর্তিত হইয়াছে। ইহারা এই সমস্ত মতবাদ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে—এই যুক্তি-তর্ক সর্বত্র না হইলেও অনেক স্থলে, বুদ্ধিগত আলোচনার স্তর ছাড়াইয়া হৃদয়ের গভীরতর প্রদেশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী, অভিজ্ঞতার রূপ ও রংকে বদলাইয়াছে। তাছাড়া অশোকা তালুকদার, দে সরকার, প্রভৃতি আরও কয়েকটি চরিত্র গৌণ-হিসাবে প্রবর্তিত হইলেও হৃদয়াবেগের কৌলীন্য-মর্যাদার দাবীতে গ্রন্থমধ্যে প্রধানত্বের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। তাহারা তর্কে যোগ দেয় নাই, কিন্তু যুক্তি-ক্ষেপ-প্রতিক্ষেপের ঝড়ে চারিদিকের আবহাওয়ায় যে উত্তাপের সৃষ্টি হইয়াছে তাহারই সুবিধা গ্রহণ করিয়া অন্তরের কামনাকে স্ফুরিত ও আবেগ-তপ্ত করিয়াছে।

উপন্যাসের নায়ক বাদল সেন এই তর্কের ঝড়ে ও পথ-অনুসন্ধানের প্রেরণায় সবাপেক্ষা বেশি দোলা খাইয়াছে। সুধী আত্মপ্রতিষ্ঠ, নানা অভিজ্ঞতার আলোড়নেও নিজ অন্তরের প্রজ্ঞানুভূতিতে স্থিরতর হইয়াছে। গ্রাম্য সমাজের সহিত একাত্মতা স্থাপন, কলকারখানার বিক্ষেপ হইতে কুটির-শিল্পের অবিক্ষুব্ধ শান্তি ও সন্তোষে প্রত্যাবর্তন, ভারতের সনাতন অধ্যাত্ম-বাদের পুনরুদ্ধার ও রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার বাস্তব প্রয়োগ—ইউরোপীয় সভ্যতা সংস্কৃতির সমস্ত বিভ্রান্তকারী মাদকতার মধ্যে তাহার লক্ষ্য এই আদর্শে অবিচলিত রহিয়াছে। অশোকার ব্যাকুল আবেদন, উজ্জয়িনীর পরম নির্ভরশীল আশ্রয়-প্রার্থনা, সুজেতের নীরব, প্রকাশ-কুণ্ঠ ভালবাসা—সমস্তই তাহার আদর্শবাদের লৌহবর্মে ঠেকিয়া প্রতিহত হইয়াছে। বিলাত-প্রবাসে তাহার পূর্ব সংকল্প দৃঢ়তর ও স্পষ্টতর হইয়াছে—তাহার অবলম্বিত পথ যে মানব-কল্যাণের একমাত্র উপায়, তাহার ইউরোপের নানামুখী চিন্তাধারার ও কর্মপ্রচেষ্টার সহিত পরিচয় তাহার এই প্রতীতিকে আরও অসংশয়িত করিয়াছে। এক হিসাবে, সুধী'র কোন

পরিবর্তন হয় নাই—তাহার অভিজ্ঞতার পরিধিবিস্তার হইয়াছে, কিন্তু তাহার মৌলিক প্রকৃতিটি অক্ষুণ্ণ আছে। লেখক সুধীকে সত্যের রূপক হিসাবে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। মনে হয় যে, তাহার মানবতার প্রীতিস্নেহ-ভালবাসার অন্তরালে তাহার এই রূপক-প্রতিভাস নৈর্ব্যক্তিক শিখায় জ্বলিতেছে। সত্যের মতই তাহার মুখে অপার্থিব জ্যোতিঃ; সত্যের মতই তাহার অনমনীয় দৃঢ়তা। ইহাতে হয়ত মানুষ হিসাবে তাহার আকর্ষণ কিছু কমিয়াছে। একমাত্র উজ্জয়িনীর ব্যবহারের বিচারেই তাহার অমোঘ আদর্শনিষ্ঠা সাময়িকভাবে বিচলিত হইয়াছে—শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর সমাজ-নিয়ন্ত্রণই জয়লাভ করিয়াছে।

এই সমুদ্রমন্থনের সবটুকু ফেনিল আলোড়ন বাদলের জীবনে আবর্তিত হইয়াছে। বাদলকে লেখক অসত্যের প্রতীক করিয়া আঁকিবেন এইরূপ মনস্থ করিয়াছিলেন। পাঠকের সৌভাগ্য-বশতঃ এই পরিকল্পনা কার্যতঃ ফলবতী হয় নাই। ফলে দাঁড়াইয়াছে যে বাদল অসত্যের নহে, মানবাত্মার মুক্তিসন্ধানের প্রতীক্। লেখক অনেক স্থলেই তাহার ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়া তাহার এই রূপকাভাসকে প্রতিবিম্বিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাদলের সগর্ব আত্মপ্রত্যয়, চিন্তা-নায়কের অধিকারের ঘোষণা, ইতিহাসের বিবর্তনধারার নিয়ন্ত্রণশক্তির দাবী, তাহার বাদল-'কালের' আবিষ্কার, সর্বোপরি তাহার অপরাজেয় আদর্শবাদ—সমস্তই এই রূপকেরই বিস্ফুরিত জ্যোতিঃ। কিন্তু তথাপি বাদলের মানবতাই আমাদের নিকট তাহার মুখ্য আবেদন। তাহার দুর্বলতা, ব্যাকুল আবেগ, অনুসন্ধানের দুর্দম আগ্রহ, প্রতি চিন্তাধারা ও মতবাদ-সংঘর্ষের অভিঘাতে হৃদয়ের স্নায়ু-তন্ত্রীর তীব্র কম্পন—সবই তাহার মানবিকতার পরিচয়। সে বিশুদ্ধ আদর্শ বা রূপক নহে, সুখ-দুঃখের অনুভূতিপূর্ণ, বেদনা-আনন্দে তরঙ্গায়িত মানবাত্মা। অবশ্য তাহার আবেগের উৎস ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে সমস্ত মানবজাতির কল্যাণ-কামনা ও মুক্তি-পিপাসা। রবীন্দ্রনাথের গোরা যেমন মূর্ত স্বদেশ-প্রীতি, বাদল সেইরূপ মূর্ত মানব-হিতৈষণা—উভয়েরই আদর্শের বিশালতা তাহাদের উপর কতকটা নৈর্ব্যক্তিকতার অর্ধাবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়াছে।

সমস্ত পরিবর্তনের স্রোত বাদলের উপর দিয়া অবারিত বেগে প্রবাহিত হইয়াছে। পার্লিয়ামেণ্ট শাসন-প্রণালীতে প্রগাঢ় আস্থা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, রাষ্ট্র ও সমাজের একাধিপত্যে প্রবল আপত্তি ও বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ—বিলাত যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত ইহাই ছিল বাদলের মানস পরিস্থিতির উপাদান। তাহার সংকল্প যে সে মনে প্রাণে ইংরেজ হইবে ও ইংলণ্ডের ভাব ও কর্মজীবনকে তাহার জন্মভূমির আবেষ্টন স্বরূপ অতি সহজভাবে গ্রহণ করিবে; ইউরোপীয় চিন্তানায়কদের সহিত সমতালে পা ফেলিবে। এই ব্রতসাধনের জন্য সে তাহার পূর্বজীবনকে নিশ্চিহ্নভাবে মুছিয়া ফেলিতে কৃতসংকল্প। পিতা ও স্ত্রীর সহিত সম্বন্ধ সম্পূর্ণ অস্বীকার ও ইংরেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার জন্য আবাল্য-সুহৃদ সুধী'র সাহচর্য-বর্জন—তাহার বিলাতে পদার্পণের পর প্রথম কার্য।

পুস্তকবিক্রেতা কলিন্সের সঙ্গে আলাপ ও বন্ধুতা ও তাহার দোকানে সমবেত ইংরেজ যুবকদের সঙ্গে তর্ক ও আলোচনা তাহার ইংরেজ সমাজের সহিত নিবিড় পরিচয়ের প্রথম সোপান। ক্রমশঃ ইংরেজ-সমাজে প্রচ্ছন্ন রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণবাদ (dictatorship) গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার ঘোরতর বিপদ সম্বন্ধে তাহাকে সচেতন করিল। নেতিবাদী, আত্মার অস্তিত্বে

সংশয়শীল, ফললাভের আকাঙ্ক্ষা ও সক্রিয়তার সম্পূর্ণ বর্জনকারী ওয়েলির সঙ্গে পরিচয় তাহার ভারকেন্দ্রকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহাকে দার্শনিক আত্মজিজ্ঞাসার জন্য ওয়াইট দ্বীপের নির্জনবাসে পাঠাইল।

দ্বিতীয় খণ্ড 'অজ্ঞাতবাস'-এ বাদলের নির্জন সাধনার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। শারীরিক জড়তা দার্শনিক অগ্রগতির পায়ে শৃঙ্খলস্বরূপ হইয়াছে। অসুস্থ শরীরের পিছনটানে মন অগ্রগতির ব্যপদেশে কেবল বৃত্তানুবর্তন করিয়াছে। 'অশ্বারোহণ পর্ব্ব'-এ ক্লান্ত বাদল আত্মার অস্তিত্বের সমাধানহীন সমস্যাকে মুলতুবি রাখিয়া স্পেশ ও টাইমের আপেক্ষিক সম্বন্ধের অপেক্ষাকৃত অনায়াস-সাধ্য আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এই গবেষণা-সমুদ্র হইতে আহৃত কৌস্তুভ-রত্ন 'বাদল-কাল' বা 'Ego-time'। মদিরার আস্বাদন ও বেগবান্ মননের বাহ্য প্রতিরূপ, অশ্বারোহণ চেষ্টা হইতে অনেক হাস্যকর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু ইহারা চিন্তাক্লিষ্ট মানবাত্মার মাঝে মাঝে ইন্দ্রিয়ের পুলক-শিহরণ, নবীন প্রাণ-হিল্লোল অনুভব করিবার আকাঙ্ক্ষার নিদর্শন।

'খণ্ডভারতী' অধ্যায়ে গত মহাযুদ্ধে বিকলাঙ্গ মারউড নামক এক যুবকের সহিত আলোচনায় বাদল চরম নৈরাশ্যবাদের হিমশীতল স্পর্শ পাইয়াছে। মহাযুদ্ধের বিষবাষ্প এই খণ্ডের সমস্ত মানস আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া তাহাকে অতিমাত্রায় বক্রদৃষ্টি ও সন্দেহপ্রবণ করিয়াছে। সমস্ত জীবনযাত্রা তাহার চক্ষে এক শোচনীয় অপচয়—জীবনের চিত্রিত ছদ্মবেশের পিছনে নৈরাশ্যের শুষ্ক কঙ্কালের দংষ্ট্রা সর্বদা বিকশিত। বাদলের আদর্শবাদ এই বিষদিগ্ধ নিঃশ্বাসস্পর্শে অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে মডলিনের সহিত আলোচনায় মতবাদের সংঘর্ষ তাহার আশাবাদের দীপশিখাকে উজ্জ্বল রাখিয়াছে, সংশয়ের বাষ্পে বিহ্বল হইতে দেয় নাই। তবে এই তার্কিকতার অতি-পল্লবিত বিস্তার নিছক মননশীলতার পরিচয়, বাদলের জীবনের উপর ইহার কি স্থায়ী প্রভাব তাহা দুর্বোধ্য।

নির্জনবাস হইতে সমাজে ফিরিয়া বাদল এক বোর্ডিং হাউসে আশ্রয় লইয়াছে। মোটের উপর বিলাতী সমাজ ও পরিবার-জীবনের পূর্ণতম চিত্র এই অধ্যায়েই পাওয়া যায়। ভিলি, মিসেস ফ্রেজার, ফ্রাউ ও মারিয়ান ভাইসম্যান—ইহাদের সম্মিলিত প্রভাব যে তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে বাদলের আত্মসর্বস্বতা বিচলিত হইয়াছে। সে কূট-দার্শনিক চিন্তা ও মানব-কল্যাণের উচ্চাভিলাষ ভুলিয়া ক্ষণকালের জন্য সামাজিক আমোদ-প্রমোদে গা ভাসাইয়াছে। ভিলি তাহাকে যৌন আকর্ষণের রহস্য শুনাইয়াছে, মারিয়ান তাহাকে নৃত্যসঙ্গী করিয়া তাহার অঙ্গে অঙ্গে উত্তেজনার তাড়িত-প্রবাহ বহাইয়াছে; মিসেস ফ্রেজারের প্রণয়-ইতিহাস তাহাকে বিবর্তন ও অপচয়তত্ত্বের নূতন নূতন সমস্যা ভাবাইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সমস্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাহার আত্মাকে স্পর্শমাত্র করিয়াছে, অভিষিক্ত করে নাই—তাহার উপর কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়া কোন নূতন পরিণতি ঘটায় নাই।

এইবার বাদলের জীবনে এক অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণতম বিকাশ যাহার আদর্শ, বুদ্ধি-প্রাধান্য যাহার প্রধান কাম্য হঠাৎ তাহার উপর দিয়া এক ধর্ম-ভাবের প্লাবন বহিয়া গিয়াছে। সে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া নির্বিচারে আদেশ পালন, সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ ও হীনতম সেবাকার্যের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই

আমূল পরিবর্তনের কোন উপযুক্ত কারণ দেওয়া হয় নাই। তাহার অব্যবহিত পূর্ব অভিজ্ঞতা —জীবন-মদিরার আস্বাদ-গ্রহণ-এরূপ পরিণতির জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করে না।

এই আশ্রমবাসকালে উজ্জয়িনীর সহিত বাদলের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছে। কিন্তু উজ্জয়িনী ও পাঠকের পক্ষে দীর্ঘ-প্রত্যাশিত এই মিলন-মুহূর্তটি লেখকের কোন বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দেয় না। তাঁহার বুদ্ধিপ্রধান ও বিশ্লেষণ-প্রবণ মনোবৃত্তি নিবিড় হৃদয়াবেগের আলোচনাকে অনেকটা ফিকে ও নিরুচ্ছ্বাস করিয়াছে। তাহাদের আলাপ সাধারণ মত-বিনিময়ের স্তরেই সীমাবদ্ধ হইয়াছে, গভীর অনুভূতির ধার পর্যন্ত ঘেঁসে নাই। উজ্জয়িনীর শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ আত্মনিবেদন এই ভাব-রিক্ততার অভাব কথঞ্চিৎ পূর্ণ করিয়াছে। জাহাজে তাহার মন যে প্রেমতন্ময়তার উঁচু সুরে বাঁধা ছিল, প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের সময় তাহা অনেক নিম্নস্তরে নামিয়া আসিয়াছে।

এদিকে বাদলের মতবাদ পরিবর্তনের পূর্ণচক্র আবর্তন করিয়া আবার পূর্বস্থানে স্থিতিশীল হইয়াছে। ব্যক্তিত্বলোপের সঙ্গে দুঃখবোধ সম্বন্ধে অসাড়তা, প্রতিকার সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয়তা, দুঃখের উৎকর্ষ-স্বীকার, সভ্যতার অবাঞ্ছিতত্ব, ও বর্বরতার সারল্যের অভিনন্দন—বাদলের মনীষাভিমান ক্রমাবনতির ধাপে ধাপে নামিয়া এই নিম্নতম বিন্দু স্পর্শ করিয়াছে। ইহার পর যখন সে জানিয়াছে যে, আশ্রমের ধনভাণ্ডার অস্লোৎপাদনের বিষ-প্রস্রবণ হইতে পূণ তখন আবার একটা তুমুল প্রতিক্রিয়া জাগিয়াছে। বাদল বুঝিয়াছে যে মানব-প্রকৃতির পরিবর্তন সম্ভব নহে, সম্ভব আবেষ্টন ও ব্যবস্থাব উন্নতি। আত্মবিলোপেব দ্বারা মানুষ রাতারাতি দেবতা হইবে না—এক মুহূর্তে পৃথিবীর স্বর্গে পরিণতির আশা সময়-সংক্ষেপের প্রতি মানুষের চিরন্তন মোহের আর একটা নিদর্শন। সুতরাং বাদল এই ভাব-বিলাসের নাগপাশ হইতে আবার মুক্তিলাভ করিয়াছে।

মুক্তিলাভের পর বাদলের ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, শোষণক্রিয়াকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া লভ্যাংশের উদ্বৃত্ত হইতে দরিদ্রের অভাব-মোচন-চেষ্টা গরু মারিয়া জুতাদানের মতই হাস্যকর ও অসংগতি-পূর্ণ। সামাজিক ও ব্যক্তিগত ন্যায়নিষ্ঠাই তাহার জীবনের মূলমন্ত্র হইল। ইহার পর সে তারাপদ কুণ্ডু-পরিচালিত কমিউনিষ্ট আড্ডায় বাসা লইযাছে। কিন্তু সেখানেও তাহার সূক্ষ্ম নীতিবোধ পরিতৃপ্তি পাইল না। কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ দুইটি- রাষ্ট্রের একাধিপত্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা লোপ, ও বিপ্লব ঘটাইবার ব্যপদেশে অপরিমিত রক্ত-পাতে উৎসাহ। রুষিয়ার দৃষ্টান্ত তাহার এই উভযবিধ ভয়কেই সমর্থন করিয়াছে। শ্রেণী-সংগ্রাম ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধের ভয়াবহ সম্ভাবনা তাহার মনে অস্বস্তির কণ্টক বিঁধিয়াছে। মার্গারেট, ব্রনস্কি, বাউয়ার্স, প্রভৃতি সাম্যবাদী নেতাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যক্রম তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিয়া তুলিয়াছে। শেষ পর্যন্ত ক্ষ্যাপার পরশ-পাথর খোঁজার মত সে এক অসম্ভব আদর্শের মরীচিকার পিছনে ছুটিয়াছে। কেমন করিয়া যুদ্ধ ও বিপ্লব ছাড়া উহাদের ফল ভোগ করা সম্ভব এই কূট চিন্তা তাহার সমস্ত চিত্তকে মথিত ও বিপর্যস্ত করিয়াছে। বন্ধু-বান্ধবের উপহাস, নিজ আদর্শকে স্পষ্ট রূপ দিবার ব্যর্থ চেষ্টা ও ইহার সাফল্য সম্বন্ধে সংশয় তাহাকে অপ্রকৃতিস্থতার সীমান্ত-প্রদেশ পর্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। এই সময়ের ব্যাকুল, অশান্ত আবেগ, ও তীব্র অস্বস্তি ও বিহ্বলতা, শুধু তর্কে নয়, বাদলের দেহে-মনে পর্যন্ত অতি-

চমৎকারভাবে সংক্রামিত হইয়াছে। সুধী'র মধ্যবর্তিতায় উজ্জয়িনীর সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা আবার ব্যর্থ হইয়াছে। এই আলোচনাতেও যুক্তি ও আদর্শবাদ হৃদয়াবেগের কণ্ঠরোধ করিয়াছে।

বাদলের জীবনের শেষ পরিবর্তন আবার এক যুক্তিহীন উচ্ছ্বাসের পথ ধরিয়া আসিয়াছে। শ্রেণী-বৈষম্য ঘুচাইবার কোন সার্বভৌম উপায় না পাইয়া সে নিজে মধ্যবিত্তের সমস্ত জাত্যভিমান বিসর্জন দিয়া সর্বহারাদের দলে মিশিয়াছে। সে দেশলাই ফিরি করিয়া ও টেমস নদীর বাঁধে শুইয়া জীবন কাটাইতে মনস্থ করিয়াছে। শ্রমিকদের দলে যোগ দেয় নাই, কেননা তাহা হইলে শ্রেণী-সচেতনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। ন্যূনতম সঞ্চয় ও নির্দিষ্ট বাসস্থান—এই উভয় প্রাথমিক প্রয়োজনেরও নিম্নতম স্তরে সে অবতরণ করিতে চাহিয়াছে। তাহার আশা যে মাটির নীচে প্রবেশ করিলে, ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের মধ্যে বিচরণ করিলে সে একদিন ভূমিকম্পের অনায়াসলব্ধ সমতাকারী শক্তি অর্জন করিবে। এই সংকল্পের মধ্যে যে একটা শূন্যগর্ভ ভাব-বিলাস আছে, কিছু-না-চাওয়ার অহংকারের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন আত্মাবমাননা বর্তমান, নূতন পরীক্ষার উৎসাহাতিশয্যে সে তাহা ভুলিয়াছে। এই পরীক্ষার মধ্যেই তাহার জীবনব্যাপী দ্বন্দ্ব ও পথ খোঁজার অবসান হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত সে উপলব্ধি করিয়াছে যে, এ যুগের বাণী তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় নাই; সে বর্তমানের সত্য আশা-আকাঙ্ক্ষার মুখপাত্র নহে। আজকার মানুষ চাই সমান অধিকার, স্বাধীনতা নহে। কাজেই অধিকার-সাম্যের ঘুষ দিয়া তাহার স্বাধীনতাস্পৃহাকে ঘুম পাড়ান যায় না। প্রতিনিধিত্বের যে উচ্চভূমিতে বাদল এতদিন দণ্ডায়মান ছিল, তাহা ভূমিসাৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রচণ্ড বিশ্বাস ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির মেরুদণ্ড ভগ্ন হইয়াছে। সে সভয়ে নিজের মধ্যেই ডিক্‌টেটরশিপের বীজাণু আবিষ্কার করিয়াছে—পৃথিবীর ভূত ছাড়াইবার সরিষাই ভূতাবিষ্ট হইয়াছে। পৃথিবীতে তাহার কাজ ফুরাইয়াছে বলিয়াই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। বাদলের মৃত্যু-সংঘটনে লেখকের রূপক-মোহ আবার প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—যে মরিল সে যেন ব্যক্তি নয়, একটা আদর্শবাদ ও তাহার মৃত্যু আসিয়াছে সাধারণভাবে নয়, অপরিহার্য ঐতিহাসিক প্রয়োজনে। এই দ্বিধা-বিভক্ত মন লইয়া লেখক বাদলের বিদায়-দৃশ্যে করুণরস ফোটাইতে পারেন নাই। Ideaর আত্মসংহরণে ট্র্যাজেডির অবসর কোথায়? উজ্জয়িনীর অশ্রু বৃথাই তাহার যন্ত্র-শীতল, উষ্ণরক্তহীন দেহকে অভিষিক্ত করিয়াছে। তাহার পিতার শোকার্ত রোদন এই আবেগ-বিহীন, বুদ্ধিবাদের কৃত্রিম বায়ুসঞ্চালনে সচল আবহাওয়ায় অশোভন চীৎকারের মতই শোনায়। যে রাজ্য হইতে হৃদয়োচ্ছ্বাসকে নির্বাসিত-প্রায় করা হইয়াছে, লেখকের খুশিমত তাহাকে আর সেখানে ফিরাইয়া আনা যায় না, তাহার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব যে অনধিকার-প্রবেশেরই সামিল হয় এই সত্যই এই শেষ দৃশ্যে মর্মান্তিকভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে উজ্জয়িনীর চরিত্রই গভীরতম উপলব্ধির সহিত চিত্রিত হইয়াছে। রূপক-অভিনয়ে উজ্জয়িনীরও একটা নির্দিষ্ট অংশ ছিল—সে নাকি পুণ্যের প্রতিচ্ছবিরূপে কল্পিত। কিন্তু সে সম্পূর্ণরূপে এই রূপকের রাহু-গ্রাস হইতে মুক্তি পাইয়াছে। তাহার প্রণয়াবেশ ও বিরহ-বেদনা বাদলের সমস্ত অস্থির পক্ষ-বিক্ষেপ ও সুধী'র স্থির আদর্শনিষ্ঠা অপেক্ষা আমাদিগকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। হৃদয়ানুভূতি বুদ্ধির অনুশীলন অপেক্ষা যে অধিকতর মর্মস্পর্শী উজ্জয়িনী-চরিত্রেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

বিবাহের আবেশ বাদলকে স্পর্শ করে নাই, কিন্তু উজ্জয়িনীকে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া

তাহাকে স্মৃতি-রোমন্থনে নিয়োজিত করিয়াছে। উজ্জয়িনীর এই উদাস, বিরহ-ব্যাকুল, প্রতীক্ষমান চিত্রটি বড়ই সুন্দর। এই স্মৃতি-বিভোর অবস্থায় বাদলের স্মৃতি-পরিপূর্ণ শ্বশুরালয়ে গমন তাহার বিহ্বলতাকে আরও বাড়াইয়াছে। প্রতিবেশিনী বীণার প্রভাব তাহার আকুলতাকে তীব্রতর ও তাহার ধর্মোন্মাদকে অঙ্কুরিত করিয়াছে।

'উপেক্ষিতা' অধ্যায়ে উজ্জয়িনীর ধর্মপ্রবণতা বৈষ্ণব-রস-সাধনার অভিমুখী হইয়াছে। পিতার সহিত বিচ্ছেদ তাহার নিঃসঙ্গতাকে গভীরতর করিয়া তাহার পরিবর্তনের গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়াছে। 'কলঙ্কবতী' গ্রন্থে তাহার ধর্মজীবনের বিচিত্র কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তাহার অতৃপ্ত প্রেম, ভক্তি-গ্রন্থ-পাঠ, বৈষ্ণব-সাহচর্য ও শ্বশুরের নির্লিপ্ত ব্যবহারের ফলে, কানুতে আত্মসমর্পণের নিবিড় মোহে পরিণতি লাভ করিয়াছে। বৃন্দাবনলীলা তাহার কল্পনা ও নিগূঢ়তম আকাঙ্ক্ষাকে অভিভূত করিয়া তাহার মনে বাস্তব-বিমুখতা জাগাইয়াছে। কবি ত্রিভঙ্গমুরারিকৃত সৌন্দর্যস্তব তাহাকে উপেক্ষিত দেহ-সৌন্দর্যের প্রতি সচেতন করিয়াছে। মাতাজীর করুণ, অথচ ভাবান্ধ জীবন-কাহিনী, তাহার পিতার অতর্কিত মৃত্যু ও শ্বশুরের সান্ত্বনাদানে হাস্যকর অক্ষমতা এই সমস্তই তাহাকে সংসার-ত্যাগে প্রণোদিত করিয়াছে। শোকের রূঢ় অভিঘাত ও ভক্তির বাষ্পময় অস্পষ্টতা—এই উভয়ের প্রভাবে একপ্রকার আচ্ছন্ন মনোভাব লইয়া স্বপ্নসঞ্চরণ-চারিণীর ন্যায় সে কানুর অভিসারে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

এই পর্যন্ত উজ্জয়িনীর চিত্ত-বিভ্রমের ইতিহাস মনোবিজ্ঞান-সম্মত বিশ্বাস্যতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ 'গৃহত্যাগ' অধ্যায়ের অষ্টম পরিচ্ছেদে তাহার মদ-বিহ্বল, আলস্য-মন্থর, নব-জাগ্রত যৌবনের যে সুন্দর চিত্রটি দেওয়া হইয়াছে তাহা রূপে, রংএ, ও নিগূঢ় সাংকেতিকতায় Forsyte Sagaর An Indian Summer অধ্যায়ের সহিত তুলনীয়। কিন্তু পথে বাহির হইবার পর এই স্বপ্ন-সুষমা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়াছে—গৃহের নির্জন ধ্যানতন্ময়তা পথের সহস্র আকস্মিকতায় খণ্ডিত হইয়াছে। ট্রেনে সুশীলাবতীকে কানু-ভ্রম ও সেই একই ভ্রমে ভুমনলালের আলিঙ্গনে ধরা দেওয়ার চরম আত্ম-প্রতারণা—বিশ্বাস্যতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে। বৃন্দাবন-প্রবাসকালে এক গোবিন্দজীর মন্দিরে গীত-তন্ময়তা ছাড়া তাহার অন্য সমস্ত আচরণ স্বাভাবিকতা ও সংগতি হারাইয়াছে। মোট কথা এইরূপ আবেগ-বিহ্বল, আত্মবিস্মৃত অবস্থা বর্ণনা করিতে যতটুকু গভীর কল্পনাশক্তি ও অসংশয়িত বিশ্বাসের প্রয়োজন লেখকের ব্যঙ্গ-প্রধান মনোবৃত্তিতে তাহার একান্ত অভাব। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত, বা 'যোগাযোগ'-এ কুমুদিনীর ধ্যানাবিষ্ট ভাবের সহিত তুলনায় উজ্জয়িনীর এই চরম মোহের বিবরণ কল্পনা-সমৃদ্ধি ও গভীর উপলব্ধির দিক্ দিয়া অনেক নিম্নস্তরের। লেখকের গ্রন্থন-শিথিলতার অসংখ্য রন্ধ্রপথ দিয়া অবিশ্বাস ব্যঙ্গপূর্ণ কটাক্ষপাত করিতেছে। কল্পনার এই ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ-চেষ্টায় লেখকের অনভ্যস্ত পদক্ষেপ বারবার স্খলিত হইয়াছে।

মোহভঙ্গের দারুণ আঘাতে যখন উজ্জয়িনী ম্রিয়মাণ, তখন সুধী ও বিভূতির সহিত তাহার অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হইয়াছে। সুধী'র সঙ্গে তাহার বোঝাপড়ায় অনেক গোঁজামিল ও জোড়া-তাড়ার চিহ্ন মিলে। শেষ পর্যন্ত সুধী তাহাকে সংসারে ফিরিতে রাজি করিয়াছে ও বাদলের নিকট কোন প্রত্যাশা না করিয়া কোন কল্যাণব্রতে আত্মনিয়োজনের যৌক্তিকতা দেখাইয়াছে। তাহার পিতার উইলও তাহাকে এই জন-সেবা-ব্রতে আহ্বান করিয়াছে। বিলাত-প্রবাসিনী

মাত্রের আমন্ত্রণ তাহাকে এক নূতন জীবন-যাত্রার সুযোগ দিয়াছে। সে সুধী'র সঙ্গে বিলাত যাত্রা করিয়াছে।

জাহাজে উজ্জয়িনীর হৃদয় আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বে কম্পিত; তাহার অনুতপ্ত মন আত্মনিগ্রহে প্রায়শ্চিত্ত করিতে উন্মুখ। স্বামীর সহিত মিলনের সম্ভাবনা তাহার হৃদয়ে শঙ্কিত প্রতীক্ষার কম্পন তুলিয়াছে। কিন্তু বিলাতে পা দিয়া তাহার মধুর সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাদল তাহাদের সম্বন্ধকে অস্বীকার করিয়া তাহার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষাকে রূঢ় আঘাত দিয়াছে। তাহাদের বোঝাপড়ার মধ্যে কোন গভীর আবেগের সুর ধ্বনিত হয় নাই। বাদলের দিক্ হইতে আসিয়াছে যুক্তিতর্কের সাহায্যে আত্মপক্ষ-সমর্থন: উজ্জয়িনীর দিক্ হইতে আসিয়াছে, যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাকে নিষ্ক্রিয়, অসহায়ভাবে গ্রহণ। মাঝে মধ্যে একটু অভিমান, একটু ঈর্ষ্যা, বাদলের মনোভাব বুঝিবার বিশেষ আগ্রহ, ও তাহার নিন্দা-প্রশংসায় উৎকর্ণতার বক্র পথে দাম্পত্য-সম্পর্কের স্বপ্নাবশিষ্ট মাধুর্য নিজ অস্তিত্বের পরিচয় দিয়াছে। সুধী'র আশ্বাস ও সমবেদনা কিছুদিন পর্যন্ত সম্বন্ধচ্ছেদের রূঢ় সত্যের উপর একটা স্নিগ্ধ আবরণ টানিয়া দিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উজ্জয়িনী বুঝিতে বাধ্য হইয়াছে যে, বাদলকে বাদ দিয়াই আবার তাহাকে নূতন করিয়া জীবন পরিকল্পনা করিতে হইবে।

এই বিরাট শূন্যতার প্রথম প্রতিক্রিয়া হইয়াছে উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীনভাবে লঘু আমোদ-প্রমোদে বিস্মৃতি ও অন্যমনস্কতার অনুসন্ধান। এই হালকা হাস্য-পরিহাস ও সামাজিকতার মধ্য দিয়া উজ্জয়িনীর মনে এক বেপরোয়া, বিদ্রোহীভাব ক্রমশঃ তীক্ষ্ণাগ্র হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বৈষ্ণব-সাধনানুযায়ী ভক্তি-বিহ্বলতা, একাগ্র প্রেম ও অন্তর্মুখী গভীরতা প্রতিহত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল আদর্শহীন জীবনযাত্রার অভিমুখী হইয়াছে। সমাজের বিধি-নিষেধ, শালীনতাকে আঘাত করিবার, জীবনের প্রতি মুহূর্তকে নিজ খেয়ালমত উপভোগ করিবার একটা উদ্দাম, নিরঙ্কুশ প্রবৃত্তি তাহার চরিত্রের প্রধান অভিব্যক্তি দাঁড়াইয়াছে। নানা উদ্ভট কল্পনা তাহার মাথায় কুণ্ডলী পাকাইয়াছে। ভারতে নারী-আন্দোলনের নেতৃত্বগ্রহণ, দেশ-বিদেশে লক্ষ্যহীন, উদ্‌ভ্রান্তভাবে ভ্রমণ, অসামাজিক নীতি ও আচরণের অকুণ্ঠিত পোষকতা এই সকলের ভিতর দিয়া তাহার অন্তরের ক্ষোভ-বাষ্প ফাটিয়া পড়িয়াছে। ইহারই ফাঁকে ফাঁকে সুধী'র সহিত আলোচনায় জীবনের চরম ব্যর্থতার জন্য এক গভীরতর অনুশোচনার সুর ধ্বনিত হইয়াছে। এই অশান্ত, অস্থির বিক্ষোভের অন্তরালে তাহার জীবন নূতন উদ্দেশ্য ও কেন্দ্র-সংহতির জন্য অজ্ঞাতসারে প্রস্তুত হইয়াছে।

জীবনকে লইয়া ছিনি-মিনি খেলার মধ্যে দুইটি প্রভাব তাহার উপর কার্যকরী হইয়াছে—সুধী'র অতন্দ্র হিতৈষণা ও দে সরকারের অশ্রান্ত, অথচ কৌশলময় প্রেম-নিবেদন। তাহার ভবিষ্যৎ লইয়া উভয়ের মধ্যে এক সুদীর্ঘকালব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে। সুধী তাহাকে অসংযম ও পদস্খলন হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়াছে—দে সরকার তাহার দিকে প্রসারিত করিয়াছে একাগ্র কামনার ব্যাকুল আলিঙ্গন। দে সরকারের ভালবাসা ক্রমশঃ সাধারণ ভোগ-লিপ্সা হইতে উন্নততর, বিশুদ্ধতর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাহার চটুল, ব্যঙ্গ-বহুল রসিকতা ও সুলভ প্রেমাভিনয়ের (gallantry) মধ্যে ধীরে ধীরে গভীর আন্তরিকতার সুর বাজিয়াছে। তাহার অসংকোচ সুবিধাবাদের চারিদিকে এক ব্যর্থ-করুণ আদর্শবাদের ম্লান জ্যোতি সঞ্চারিত

হইয়াছে। তাহার অক্লান্ত আনুগত্য ও মনোরঞ্জন প্রবৃত্তির সাহায্যে সে শেষ পর্যন্ত মালঞ্চের মালাকর হইতে প্রার্থিত প্রণয়ীর শ্লাঘ্যতর পদে উন্নীত হইয়াছে।

উজ্জয়িনী এই যুগ্ম প্রভাবেই সাড়া দিয়াছে। প্রথম সে সুধী'র প্রতি প্রেম-নিবেদন করিয়াছে, কিন্তু সুধী'র কঠোর নীতি-পরায়ণতার নিকট ইহা কোন প্রশ্রয় পায় নাই। বিবাহের প্রারম্ভ হইতে স্বামীর নিকট যে সস্নেহ ব্যবহার প্রাপ্য ছিল উজ্জয়িনী তাহা সুধী'র নিকটই পাইয়া আসিয়াছে। বাদলের সহিত মীমাংসা-চেষ্টায় সুধী'র আপ্রাণ প্রয়াস ও ইহার ব্যর্থতায় তাহার স্নিগ্ধ সহানুভূতি, তাহার স্নেহপূর্ণ অভিভাবকত্ব, ও তাহার চরিত্রের মাধুর্য ও দৃঢ়তা—সমস্তই উজ্জয়িনীর আকর্ষণের হেতু। সুতরাং সে যে সর্বপ্রথম বাদলের শূন্য সিংহাসনে সুধীকে অভিষিক্ত করিতে চাহিয়াছে তাহা স্বাভাবিক। সুধী'র অস্বীকৃতির পর দে সরকারের পথ নিষ্কণ্টক হইল। সুধীও এই অনিবার্য পরিণতিতে অনিচ্ছা সহকারে সম্মতি জানাইতে বাধ্য হইয়াছে। উজ্জয়িনীর চরিত্রে কলঙ্কস্পর্শ তাহাকে দে সরকারের সাধারণ, কলঙ্ক-মলিন জীবনের প্রতি পক্ষপাতী করিয়াছে। আদর্শবাদীর নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া সে কতকটা উদ্ধতভাবে সরল, নিরহংকার, অনিন্দনীয়তার দাবীহীন সুবিধাবাদের অর্ঘ্যোপহার হাত পাতিয়া লইয়াছে। কার্লসবাডের অভিমুখে ট্রেন-যাত্রায় ও সেখানের হোটেলে উজ্জয়িনীর দীর্ঘদিন-রুদ্ধ যৌবন-কামনা, কৈশোরের স্বপ্নময় অবাস্তবতা ও ভাব-বিলাস ও পরবর্তী-জীবনের বিক্ষুব্ধ অনিশ্চয়তা কাটাইয়া, অনিবার্য-বেগ, প্রদীপ্ত শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই নগ্ন, তীব্র আবির্ভাবের সহিত কোন লুকোচুরি চলিবে না, কৈশোরের ভাব-বিহ্বলতায় ইহার স্বরূপ আবৃত হইবে না; এমন কি আদর্শ-সাম্যের শেষ আচ্ছাদন পর্যন্ত ইহা প্রত্যাখ্যান করিবে। দে সরকারকে উজ্জয়িনী গ্রহণ করিয়াছে সম্পূর্ণ সাদা চোখে, মোহাবেশ-মুক্ত অন্তঃকরণে, বিদ্রোহের ইঙ্গিতরূপে, যৌবনের অনিবার্য তাগিদে। তাহাদের মিলন উজ্জয়িনীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতালাভের প্রতীক্ষা করিবে—ইহা দাম্পত্য সম্বন্ধের স্থায়ী বন্ধনে ধরা দিবে কি না তাহা অমীমাংসিত রহিয়াছে। উজ্জয়িনীর কৈশোর স্বপ্নাবেশ ও যৌবনের প্রখর উন্মেষ, তাহার প্রেমের প্রভাত-জাগরণ ও মধ্যাহ্ন-দীপ্তি উভয়েই চমৎকারভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উজ্জয়িনীর সম্বন্ধে রূপক-মোহ লেখক সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়াছেন, তাহা না হইলে দে সরকারের অতি-বাস্তব বাহুপাশে তাহাকে সমর্পণ করিতে পারিতেন না। পুণ্যকে সুবিধাবাদের প্রেমালিঙ্গনে বাঁধা, আর যাহাই হউক, রূপক-সাহিত্যের সনাতন রীতির অনুমোদিত নহে।

অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে দে সরকার কেমন করিয়া উপগ্রহ হইতে অন্যতম প্রধান চরিত্রের পদবীতে উন্নীত হইয়াছে, তাহা পূর্বেই দেখা গিয়াছে। অশোকা সুধী'র প্রণয়িনী—তাহার প্রণয়-নিবেদনের আন্তরিকতা ও সাহস, দীর্ঘ-অন্তর্দ্বন্দ্ব, ও শেষ পর্যন্ত দুর্বল আত্মসমর্পণ লইয়া খুব জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। সুজেতের মধুর, ব্রীড়াসংকুচিত চরিত্রটিও স্বল্প কয়েকটি রেখায় ভালই ফুটিয়াছে। অন্য কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে লেখকের সুপরিচিত শ্লেষাত্মক মনোবৃত্তি ও অতিরঞ্জন-প্রবণতা প্রতিফলিত হইয়াছে। সুজাতা গুপ্ত, মায়া তালুকদার, অশোকার পাণিপ্রার্থী স্নেহময় সরস ব্যঙ্গ-প্রিয়তার সহিত অঙ্কিত। যোগানন্দের মধ্যে ব্যঙ্গের সহিত সহানুভূতি মিশ্রিত। অতিরঞ্জন প্রহসনোচিত আতিশয্য লাভ করিয়াছে বাদলের পিতা

রায় বাহাদুর অহিমচন্দ্রের চরিত্রে। তারাপদ কুণ্ডুর চরিত্রাঙ্কনে ব্যঙ্গ আরও তীক্ষ্ণ ও ঝাঁঝালো হইয়াছে—ইহার সঙ্গে তাহার অদ্ভুত কার্যকুশলতা ও মানুষের দুর্বলতা ও আদর্শবাদের সুযোগ লইবার ক্ষমতার জন্য কতকটা প্রশংসাও জড়িত হইয়াছে। অন্য সমস্ত চরিত্র প্রায়ই তর্ক-মূলক—তর্কের অন্তরালে কাহারও কাহারও প্রকৃতিটি আকস্মিক হৃদয়াবেগের আলোকে মুহূর্তের জন্য দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। স্বামী-সন্তান-হারা ললিতা গ্রন্থ মধ্যে নিতান্ত আগন্তুক হইলেও, তাহার করুণ, ভাগ্য-বঞ্চিত জীবন-কাহিনীটি গভীর, সংযত সহানুভূতির সহিত বর্ণিত হইয়াছে; তাহার চরিত্রের উপর এই নিদারুণ অভিজ্ঞতার প্রভাবও সুসংগত হইয়াছে।

কিন্তু গ্রন্থটির প্রকৃত উৎকর্ষ অন্য কারণে। ইহার জন্য মহাকাব্যের দাবী লেখক নিজেই প্রত্যাহার করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি ইহার মধ্যে একটা মহাকাব্যোচিত বিস্তার ও বিশালতা বিদ্যমান। বিংশ শতাব্দীর মহাকাব্য গ্রীস ও ট্রয় কিংবা রাম-রাবণ ও কৌরব-পাণ্ডবের যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি হইতে পারে না। ইহাতে সহস্র প্রকারের বাদ-বিসংবাদ, অসংখ্য মত-বৈষম্যের সংঘর্ষ, পথ-অনুসন্ধানের অগণিত, বিচিত্র-পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা, মানব মনের অশ্রান্ত কর্মশীলতা ও সমস্যা-সমাধানের অসীম আকুতি, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আনিবার জীবনব্যাপী উদ্যম ও সাধনা—সকলে মিলিয়া এক বিরাট, আপাতদৃষ্টিতে বিশৃঙ্খল ও অসংবদ্ধ, কিন্তু বস্তুতঃ কেন্দ্রাভিমুখী ও নিগূঢ়-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ক্রিয়াশীলতার সৃষ্টি করিয়াছে। উপন্যাসের পাতাগুলিতে সমস্ত পৃথিবীর প্রতিনিধি, সমস্ত মতবাদের মুখপাত্র ভিড় করিয়া আসিয়াছে। সেখানে সমবেত মানবকণ্ঠের কি বিপুল কোলাহল, শক্তির কি বিচিত্র আত্মপ্রকাশ, আকাঙ্ক্ষার কি অদম্য ঊর্ধ্বগতি, ভাঙ্গাগড়ার কি দুর্দম ইচ্ছা ও দুর্জয় দুঃসাহসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গীর কি বিপ্লবকারী অভিনবত্ব! এই বিরাটকায় উপন্যাসের স্বচ্ছ দর্পণে আমরা আধুনিক মানবের অন্তর-রহস্যের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই। সে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া চাহে সমগ্র মানবজাতির মুক্তি, সাম্য, সর্ববিধ শোষণের বিলোপ, অনবদ্য সমাজ-ব্যবস্থা, আত্মার পরিপূর্ণ স্বাধীনতার উপযুক্ত নিখুঁত, ন্যায়নীতি-নিয়ন্ত্রিত আবেষ্টন। এই নূতন ইচ্ছা তাহাকে নেশার মত পাইয়া বসিয়াছে—ইহার তীব্র আকর্ষণের নিকট তাহার পূর্বতন আদিম সংস্কার ও প্রবৃত্তিগুলি গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। সংকীর্ণ নীড়-রচনা, শুদ্ধ, শান্ত, একনিষ্ঠ প্রেম, অভ্যস্ত কর্তব্যের কক্ষাবর্তন, স্নেহপ্রীতির সহজ আদান-প্রদান, আত্মকেন্দ্রিক জগতে স্বস্তি-রোমন্থন, বৃহত্তর পৃথিবীর সংস্রব এড়াইয়া গজদন্তের গম্বুজে (ivory tower) আশ্রয়-গ্রহণ—এই বহু শতাব্দীর সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন-যাত্রার নিবিড় মোহ সে কাটাইয়া উঠিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের যে অগ্নিবেষ্টনে তাহাকে নিশ্চিন্ত আশ্রয় হইতে তাড়াইয়াছে, তাহার সৃষ্টি-ধ্বংসী অনল-শিখায় সমাজের যে বিভীষিকাময় রূপ তাহার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতাই অতীতে প্রত্যাবর্তনের পথকে চিরকালের মত রোধ করিয়াছে। তাই আধুনিক মানুষ আর গৃহী নহে, পথিক, সুপ্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী নহে, রিক্ত, সর্বস্বীকৃত আদর্শবাদের দ্বারা সুরক্ষিত নহে, নূতন অবলম্বনের অন্বেষণে উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত, প্রেমিক নহে, রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা প্রেমের বিশুদ্ধী-করণে ও স্বাস্থ্য-সংরক্ষণে বিব্রত। সে আর সমতল ভূমিতে বিচরণ করে না—সর্বদাই সমাজের তলদেশ খুঁড়িয়া পাকা বনিয়াদ আবিষ্কার করিতে ব্যস্ত। বোমা-বর্ষণের ভয়ে সে আর ঘর বাঁধে না, তাঁবুতে জীবন কাটায়, তাহার স্থাবরত্ব ঘুরিয়া যাযাবরত্বের পালা শুরু হইয়াছে।

প্রেম, বন্ধুপ্রীতি, পারিবারিক বন্ধন, রাজনৈতিক আনুগত্য—সমস্তই আজ তর্ক-বিতর্ক ও পরীক্ষার বিষয়—অনিশ্চয়তার বাষ্পে আবৃত ও কম্পমান ভিত্তির উপর টলমলভাবে দণ্ডায়মান। সমগ্র পাশ্চাত্ত্য সমাজ সর্বনাশের বংশীরবে কানু-পাগলিনী শ্রীরাধিকার ন্যায় যেন ঘর ছাড়িয়া অভিসারে বাহির হইয়াছে। যে মহামন্ত্রে আবার পৃথিবী স্থির হইবে, বিচলিত ভারসাম্য ফিরিয়া আসিবে, মানুষ আজ তাহারই অনুধ্যানে বিভোর। অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসে এই বিপ্লবোন্মুখ, ভার-কেন্দ্রচ্যুত, নবীন সৃষ্টির স্বপ্নাবিষ্ট পৃথিবীর সাময়িক উদ্‌ভ্রান্ত রূপ স্মরণীয়ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—ইহা তাঁহার উপন্যাসের সর্বপ্রধান পরিচয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবা রাত্রির কাব্য' ও 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) দুইখানি উপন্যাসের মধ্যে অসংলগ্ন অবাস্তবতার সহিত আশ্চর্য পরিণত চিন্তাশীলতা ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের পরিচয় মিলে। 'দিবা রাত্রির কাব্য' একটি বস্তু-সংকেতের কল্পনামূলক রূপক কাহিনী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। চরিত্রগুলির অবাস্তবতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, 'চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের Projection, মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ'। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের ভূমিকা-স্বরূপ যে ক্ষুদ্র কবিতাটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে গল্পের এই সাংকেতিকতার সার-সংকলনের চেষ্টা দেখা যায়, যদিও কবিতাগুলির দুর্বোধ্যতার জন্য লেখকের উদ্দেশ্য অস্পষ্টই থাকে। বিশ্লেষণের মাঝে মাঝে চরিত্রগুলির উপর এক একটা সাংকেতিক সংজ্ঞাও আরোপিত হইয়াছে। চন্দ্রকলানৃত্যে আনন্দের অসহ্য তীব্র পুলক-অবসাদ ও সেই নৃত্যের চরম উত্তেজনার মুহূর্তে তাহার প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে তিরোভাবও সেই সাংকেতিক রহস্যের সূচনা করে। তথাপি এই সাংকেতিকতার অর্ধভাস্বর আবেষ্টন সত্ত্বেও মানুষগুলিকে রক্ত-মাংসের জীব-হিসাবেই আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে।

লেখকের এই রূপক-বিলাস যে একেবারে ভিত্তিহীন তাহা নহে। যেমন কোন কোন স্থূলবস্তুকে হঠাৎ আলোকের দিকে ফিরাইলে তাহার ভিতরটা স্বচ্ছ ও রঙ্গিন বলিয়া মনে হয়, তেমনি এই কয়েকটি নর-নারীর জটিল সম্পর্ক-জালের মধ্যে একটা অতর্কিত সংকেত-লোকের দ্যুতি ঝলসিয়া উঠে। তাহাদের সমস্যা-আলোচনা-প্রসঙ্গে যে সমস্ত গভীর মানবপ্রকৃতিরহস্য-মূলক মন্তব্য করা হইযাছে তাহাতে তাহাদের ব্যক্তিগত জীবন ছাড়াইয়া প্রতিনিধিত্বের দিকটাই অধিক ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত গল্পটির মধ্যে অবাস্তবতার ছায়া এতই ঘনীভূত হইয়াছে যে, মনে হয় লেখক কতকগুলি abstract পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার রচনা আরম্ভ করেন; এবং পরে ইহার উপর রক্ত-মাংসের একটি অনতিস্থূল আবরণ দিলেও ইহার ভিতর দিয়া abstractionএর কঙ্কাল উঁকি মারিতে ছাড়ে না।

প্রথম ভাগ 'দিনের কবিতা'য় হেরম্ব ও সুপ্রিয়ার সম্পর্কটির আভাস দেওয়া হইয়াছে। সুপ্রিয়া হেরম্বকে ভালবাসে, কিন্তু অভিভাবকের শাসনে পুলিস-দারোগা অশোককে বিবাহ করিয়াছে। পাঁচ বৎসর বিবাহিত জীবনের পর তাহার ধৈর্য নিঃশেষিত হইয়াছে, এবং সে অকুণ্ঠিতভাবে হেরম্বের সঙ্গে গৃহত্যাগের সংকল্প ঘোষণা করিয়াছে। হেরম্ব তাহার উচ্ছ্বসিত প্রণয়-নিবেদনে বিন্দুমাত্র সাড়া দেয় নাই এবং ছয় মাসের পরে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির আশা দিয়া অতিকষ্টে তাহাকে থামাইয়া রাখিয়াছে।

দ্বিতীয় ভাগ 'রাতের কবিতা'য় হেরম্ব আনন্দের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিয়াছে। অনাথ ও মালতীর সকল দিক্ দিয়া ব্যর্থ ও কলঙ্কিত প্রণয়েতিহাস ও মালতীর নিদারুণ মনোবিকৃতির অভিব্যক্তি-স্বরূপ তাহার ব্যবহারের অমার্জিত ইতরতা—এই অবাঞ্ছিত প্রতিবেশের মধ্যেই আনন্দের ক্ষীণ জ্যোৎস্নার ন্যায় ম্লান, অপার্থিব সৌন্দর্য বিকশিত হইয়াছে। আনন্দের হিম-সংকুচিত, সংশয়দষ্ট, মুহূর্তের জন্য রক্তিম সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত প্রণয়-বিকাশ এই প্রতিবেশ-প্রভাবেরই ফল। আনন্দ সম্বন্ধে হেরম্বের কৌতূহল, তাহার সহিত প্রেমের অস্থায়িত্বের ও জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনায় আনন্দের অতর্কিত ঔদ্ধত্য-প্রকাশ, তাহাদের নীরব প্রশ্ন-বিনিময়, নৃত্যের পর আনন্দের পরমনির্ভরশীল আত্মসমর্পণ—এই সমস্ত তাহাদের প্রেমের অগ্রগতির স্তর।

তৃতীয় ভাগ 'দিবারাত্রির কাব্য'-এ সুপ্রিয়ার আবির্ভাব হেরম্বের মনে অন্তর্দ্বন্দ্বকে আবার প্রবলভাবে পুনর্জীবিত করিয়াছে। সুপ্রিয়া ও আনন্দের পাশাপাশি দাঁড়ানোতে তাহাদের মধ্যে রূপক-প্রতিভান স্পষ্টতর হইয়াছে। সুপ্রিয়া তাহার স্নেহ-মমতা-বেদনা ও নীড়-রচনার অনিবার্য প্রয়োজন লইয়া সাধারণ, সুস্থ মানব-প্রেমের প্রতীক হইয়াছে; আনন্দের বিহ্বল, স্পর্শভীরু, সাংসারিকতার লেশহীন প্রণয় পৃথিবী অপেক্ষা আদর্শ-লোকের নীলাকাশে সঞ্চরণের পক্ষেই অধিকতর উপযোগী। হেরম্ব এই দুই প্রণয়ের মাঝে পড়িয়া মন স্থির করিতে পারে নাই। তাহার জীর্ণাবশিষ্ট যৌবন ও অর্ধমৃত প্রেম লইয়া সে আনন্দের মনের প্রথম বসন্তোৎসবের সঙ্গে নিজেকে মিলাইতে অক্ষম হইয়াছে। আবার তাহার অপরাধ-জটিল, আত্মবিশ্বাসহীন, অসুস্থ জীবন সুপ্রিয়ার নির্ভীক বিদ্রোহের সহিত সমতালে পা ফেলিতে পারে নাই। তাহার জীবন এই চিরন্তন দ্বিধার রাহুগ্রাস কর্তৃক অভিভূত হইয়াছে।

এই শিথিল, মন্থর, আত্ম-বিশ্লেষণের স্বপ্নাবিষ্ট, অর্ধ-সাংকেতিকতার গোধূলিচ্ছায়াতলে অভিনীত জীবনযাত্রার পশ্চাতে যে দুই-একটি তীব্র, অমার্জিত পাশবিকতার নিষ্ঠুর ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা বাস্তবিকই চমকপ্রদ। দুঃস্বপ্নের পিছনে মগ্নচৈতন্যলীন বিভীষিকার ন্যায় এই অন্তরালবর্তী ঈষৎ-প্রকাশিত নৃশংসতা আমাদের সম্মুখে এক ভয়াবহ সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে। হেরম্বের স্ত্রীর আত্মহত্যা, অশোক ও সুপ্রিয়ার ভীতি-ব্যঞ্জনাপূর্ণ দাম্পত্য-জীবন, পুরীতে অপ্রকৃতিস্থ উচ্ছ্বাসের মাত্রাধিক্যে অশোকের সুপ্রিয়াকে ছাদ হইতে ঠেলিয়া ফেলার চেষ্টা—এই সমস্ত দৃশ্যে স্বাস্থ্য ও বিকার, জীবন ও মৃত্যু, প্রণয় ও ঈর্ষা—ইহাদের নিবিড় আলিঙ্গনবদ্ধতার চিত্র আমাদের উত্তেজিত কল্পনার সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। উপন্যাসের গঠন ও উপজীব্য বিষয় (form and content) লইয়া আধুনিক যুগে যে বিচিত্র পরীক্ষা চলিতেছে, বর্তমান উপন্যাস সেই পরীক্ষাকার্যেরই অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় বাস্তবতার প্রসার কিছু বেশি কিন্তু অসংলগ্নতা প্রায় পূর্ববৎই রহিয়াছে। গাউদিয়া গ্রামের জীবন-যাত্রা-প্রণালী ও বিশেষ কয়েকটি সমস্যার যে ছবি আঁকা হইয়াছে তাহা এক হিসাবে আমাদের সাধারণ পল্লীসমাজচিত্রেরই একটি খণ্ডাংশ। কিন্তু তথাপি ইহার রেখা ও আলো-ছায়ার বণ্টন এরূপভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে যাহাতে অপরিচয়ের একটা সূক্ষ্ম যবনিকা ইহাকে আড়াল করিয়া থাকে। এই অপরিচয় সাংকেতিকতার বা রূপকের জন্য নহে;

লেখকের মন্তব্য ও জীবন-সমালোচনার পিছনে যে একটা বিশিষ্ট মনোভাব আছে তাহাই এই আপেক্ষিক অপরিচয়ের হেতু। উপন্যাসের নায়ক শশীর জীবনে যে কয়েকটি সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাদের প্রভাব যেন অনেকটা অসংলগ্ন বলিয়াই মনে হয়। এই প্রভাবের ফলে তাহার মনে বিশেষ কোন ছাপ পড়ে নাই; রেখাগুলি বিচ্ছিন্নই রহিয়া গিয়াছে, ঐক্য-সংহত হয় নাই। শশীর জীবনে প্রধান সমস্যা তাহার এক প্রতিবেশীর স্ত্রী কুসুমের তাহার প্রতি এক প্রকারের অবর্ণনীয়, দুর্বোধ্য আকর্ষণ। শশী দীর্ঘকাল তাহার এই অনুচ্চারিত ভালবাসা লইয়া খেলা করিয়াছে, তাহার ডাকে কোন সাড়া দেয় নাই। যখন প্রতিদান-বঞ্চিত ভালবাসা শীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তখন একদিন বিস্মিত বেদনার সহিত সে ইহার আবেদন উপলব্ধি করিয়াছে। কিন্তু অনাদৃত প্রেম অকাল-সিঞ্চনে বাঁচিয়া উঠে নাই। এই অভিজ্ঞতায় শশীর মনোরাজ্যে কি পরিবর্তন হইয়াছে তাহা পরিষ্কার করা হয় নাই। সংসারে ঔদাসীন্য ও গ্রামত্যাগের ইচ্ছা—ইহারা হতাশ প্রেমের এত সাধারণ প্রতিক্রিয়া যে শশীর বিশেষত্ব তাহাতে কিছুমাত্র সূচিত হয় নাই। তাহার পিতা গোপালের সহিত সংঘর্ষ তাহার জীবনের আর একটি প্রবল ধারা, কিন্তু এখানেও প্রাত্যহিক জীবনে একটু তিক্ততা আস্বাদন ছাড়া আর কোন স্থায়ী ফল লক্ষ্য করা যায় না। শেষ পর্যন্ত গোপালের পিতৃস্নেহসুলভ কৌশল শশীকে পরাজিত করিয়া তাহাকে গ্রামত্যাগের সংকল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে। শশীর চরিত্রের যে দুইটি দিক্ গ্রন্থারম্ভে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কোন নিবিড় সমন্বয় গড়িয়া উঠে নাই।

গ্রন্থমধ্যে আর দুইটি খণ্ডাংশ তাহাদের অসাধারণত্বের জন্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম, বিন্দুর দাম্পত্য-জীবনের ভয়াবহ অস্বাভাবিকতা। তাহার স্বামী তাহাকে অনিচ্ছায় বিবাহ করিয়া তাহাকে পরিণীতা পত্নীর মর্যাদা দেয় নাই, তাহাকে গণিকার ন্যায় দূরে রাখিয়াছে ও তাহার গণিকাসুলভ চিত্ত-বিনোদনী বৃত্তিগুলির অনুশীলনের ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহার ফলে বিন্দুর মনে একপ্রকার বিকৃত উত্তেজনার প্রয়োজন স্থায়ী হইয়াছে—সে সাধারণ গৃহস্থকন্যার ধূসর, বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রায় শান্তিলাভ করিতে পারে নাই। মদের নেশার জন্য তাহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা কোন নৈতিক শাসন বা দুর্নামের ভয়ের দ্বারা রুদ্ধ হয় নাই। অবশ্য তাহার শেষ পরিণতির চিত্র আমাদের দেখান হয় নাই, কিন্তু অস্বাভাবিকতার এই ইঙ্গিত আমাদের মনকে ভয়াবহ সম্ভাবনায় বিচলিত করে।

দ্বিতীয়টি হইতেছে কুমুদ ও মতির পূর্বরাগ ও দাম্পত্য-জীবন। বিবাহিত জীবনে এরূপ Bohemianism বা উচ্ছৃঙ্খল যাযাবরত্বের চিত্র বঙ্গসাহিত্যে আর নাই। কুমুদের প্রণয়ের মধ্যে এমন একটা অস্থিরতা, একটা নির্লিপ্ততা ও ঔদাসীন্যের আস্তরণ আছে যাহাতে নব-পরিণীতা বধূর নির্ভর-প্রয়োজনের তৃপ্তি হইতে পারে না। বিবাহের মত একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেও সে জুয়াখেলার অনিশ্চয়তা ও অদৃষ্টবাদিত্ব আরোপ করিয়াছে। মতিরও চরিত্র তাহার প্রভাবে নিগূঢ়ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। কুমুদের নূতন ভাগ্যপরীক্ষার পথে সেও তাহার সঙ্গী হইয়া তাহার জীবন-নীতিকেই বরণ করিয়া লইয়াছে। লেখক ভবিষ্যৎ কোন উপন্যাসে তাহাদের পরবর্তী জীবনের বিবরণ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি এ পর্যন্ত রক্ষিত হয় নাই।

(২)

এই দুইটি উপন্যাসের পর মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মানদীর মাঝি', 'জননী', 'অহিংসা', 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' (আগষ্ট, ১৯৩৮), 'সহরতলী', 'চতুষ্কোণ', 'প্রতিবিম্ব' (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩), প্রভৃতি উপন্যাস ও 'অতসী মামী', 'সরীসৃপ', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'মিহি ও মোটা কাহিনী' ও 'ভেজাল' (১৯৪৪) প্রভৃতি ছোট-গল্প-সংগ্রহ প্রকাশের দ্বারা ঔপন্যাসিক হিসাবে নিজ প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় করিয়া লইয়াছেন। এই সমস্ত রচনার মধ্য দিয়া তাঁহার সুর ও দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য, জীবন-আলোচনার স্বকীয় রীতিটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যে উদ্ভট কল্পনা-বিলাস ও সূক্ষ্ম বাস্তব পর্যালোচনা তাঁহার 'দিবারাত্রির কাব্য' ও 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় লক্ষ্যগোচর হয়, সেই উভয় বিশেষত্বই হয় মিশ্রিত না হয় এককভাবে তাঁহার সমস্ত রচনাতেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উপন্যাসের আসরে এই নূতন সুর প্রবর্তনাই তাঁহার মৌলিকতার নিদর্শন।

'পদ্মানদীর মাঝি' বোধ হয় তাঁহার রচিত উপন্যাসাবলীর মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। ইহার একটা কারণ অবশ্য বিষয়ের অভিনবত্ব—পদ্মানদীর মাঝিদের দুঃসাহসিক ও কতকটা অসাধারণ জীবন-যাত্রার আকর্ষণী শক্তি। দ্বিতীয় কারণ, পূর্ববঙ্গের সরস ও কৃত্রিমতা-বর্জিত কথ্য ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ। কিন্তু উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হইতেছে ইহার সম্পূর্ণরূপে নিম্নশ্রেণী-অধ্যুষিত গ্রাম্যজীবনের চিত্রাঙ্কণে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিমিতিবোধ, ইহার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সনাতন মানব-প্রবৃত্তিগুলির ক্ষুদ্র সংঘাত ও মৃদু উচ্ছ্বাসের যথাযথ সীমা-নির্দেশ। এই ধীবর-পল্লীর জীবন-যাত্রায় শিক্ষিত আভিজাত্যের মার্জিত রুচি ও উচ্চ আদর্শবাদের ছায়াপাত হয় নাই। এই শ্রেণীর একমাত্র প্রতিনিধি—মেজবাবুর কথা মাঝে মধ্যে শোনা গেলেও, তিনি কিন্তু বরাবরই যবনিকার অন্তরালে রহিয়াছেন। ইহার অধিবাসীদের ঈর্ষ্যা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রীতি-সমবেদনা, চক্রান্ত-দলাদলি সমস্তই বাহিরের মধ্যবর্তিতা ছাড়া নিজ প্রকৃতি-নির্ধারিত, সংকীর্ণ কক্ষপথে আবর্তিত হইয়াছে। কুবের মাঝি নিষিদ্ধ ভালবাসার অস্বস্তি ও দহনজ্বালা অনুভব করিয়াছে, তাহার মনোভাব ক্ষুব্ধ, নীরব অভিমান ও ঈষৎ-উচ্ছ্বসিত আবেগের মধ্যে সংকোচ-বিস্ফারণে আন্দোলিত হইয়াছে, কিন্তু এই হৃদয়-বেদনা লইয়া সে কোথাও কাব্যসুলভ আতিশয্যের অভিনয় করে নাই। নিজ শান্ত, নিয়মিত কর্মধারার মধ্যে এই অশান্ত স্পন্দনকে সংহরণ করিয়া লইয়াছে। কপিলার আদিম, অসংস্কৃত মনোবৃত্তির মধ্যে ছলনাময়ী নারী-প্রকৃতির সনাতন রহস্য বাসা বাঁধিয়াছে। সে দীর্ঘকাল কুবেরের সম্মুখে মোহ-জাল বিস্তার করিয়াও ছদ্ম ঔদাসীন্যের অভিনয় করিয়া শেষ পর্যন্ত এক দুর্বোধ্য, অনিবার্য আকর্ষণে সেই ফাঁদে নিজেই জড়াইয়া পড়িয়াছে—সংগতিপন্ন স্বামিগৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া এক বিপৎ-সংকুল, অনিশ্চিত অভিসার-যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আবার কুবেরের খোঁড়া মেয়ে গোপীকে বিবাহ করিবার দাবী লইয়া যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তাপ ও জ্বালা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে শেষ পর্যন্ত কুবেরের ঘর পুড়িয়াছে—এ যেন ছেলেদের জন্য ট্রয় নগরী ধ্বংসের এক গ্রাম্য সংস্করণ, মহাকাব্যের ঝুমুরগানে পরিণতি। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মহিমের গৃহদাহের সহিত কুবেরের ঘর-পোড়ার তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে ভাবস্তরের পার্থক্য অনুভূত হইবে।

কিন্তু এই অতি-সংকীর্ণ, জীবিকার্জনের ক্ষুদ্র মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, গ্রাম্য

জীবনের চারিদিকে এক সুদূর অপরিচয়ের রহস্য-মণ্ডিত পরিবেষ্টনী প্রসারিত হইয়াছে। যে পদ্মানদী এই ধীবর-সমাজের প্রাণবায়ুসঞ্চালনের প্রণালী-স্বরূপ, তাহাই এই রহস্যের ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিয়াছে। হোসেন মিয়ার আবিষ্কৃত সমুদ্র-পরিবেষ্টিত নির্জন দ্বীপটি, পার্থিব জীবনের ঊর্ধ্বে পরলোকের পরিকল্পনার মত, গ্রামবাসীদের কল্পনার সম্মুখে যুগপৎ অপরিচয়ের ভীতি ও সীমাহীন আশার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। ইহা যেন একাধারে মিলিত স্বর্গ-নরকের ন্যায় গ্রামের সরল অশিক্ষিত লোকগুলিকে অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। অগ্নিশিখার প্রতি ধাবমান পতঙ্গের ন্যায় জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত, নৈরাশ্য-ক্লিষ্ট নর নারী ইহার ভয়াবহ রমনীয়তায় ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য ব্যগ্র বাহু মেলিয়াছে।

আর হোসেন মিয়ার দ্বীপটি যেমন গ্রামবাসীদের পক্ষে বেহেস্ত-জাহান্নামের অদ্ভুত সংমিশ্রণ, সেইরূপ হোসেন মিয়া নিজে তাহাদের বিধাতা পুরুষ। এই হোসেন মিয়া লেখকের অভিনব সৃষ্টি। তাহার দুর্ভেদ্য রহস্যাবৃত প্রকৃতি ও গতিবিধি, তাহার মৃদু, সস্নেহ ব্যবহারের মধ্যে এক অনমনীয় দৃঢ়তা ও তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টির ইঙ্গিত, তাহার সমস্ত হিসাব-নিকাশ, লাভ-লোকসানের চিন্তার ঊর্ধ্বে নিশ্চিন্ত, বলিষ্ঠ উদারতার ব্যঞ্জনা,—এই সমস্তই তাহার প্রতিবেশীদের চক্ষে তাহাকে প্রায় দেবলোকের মহিমা-মণ্ডিত করিয়াছে। পদ্মার স্রোতোরাশি যেমন সমুদ্রে মিশিয়াছে, সেইরূপ গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটি লোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন-প্রবাহ, তাহাদের স্বতন্ত্র কর্ম-প্রচেষ্টা ও আশা-কল্পনা শেষ পর্যন্ত হোসেন মিয়ার মনোগহনের অতল গভীরতায় আশ্রয় ও সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। উপন্যাসের গ্রাম্য সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে—ক্ষুদ্র কর্মশীলতা, ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুদ্র ঈর্ষ্যাদ্বন্দ্ব, ক্ষুদ্র উচ্ছ্বাস আবেগ—হোসেন মিয়া ও তাহার দ্বীপ যেন তাহারই ঊর্ধ্বতম চূড়া, তাহার শীর্ষদেশে সূর্যালোক-ঝলকিত জ্যোতির্বিন্দু। সমস্ত মিলিয়া এক আশ্চর্য সুসংগতি ও নিখুঁত সম্পূর্ণতা পাঠককে মুগ্ধ করে।

'জননী' গ্রন্থটিও মোটের উপর সুলিখিত। রবীন্দ্রনাথ 'দুই বোন' গল্পে যে মাতৃ ও প্রণয়িনী এই দুই জাতীয় নারীর পার্থক্যের উদাহরণ দিয়াছিলেন, 'জননী'তে তাহার মধ্যে প্রথমোক্ত জাতির একটি সম্পূর্ণ, তথ্যবহুল চিত্র মিলে। এই উপন্যাসে কোন আদর্শবাদের আতিশয্য নাই—মাতৃত্বকে দেবীত্বের পর্যায়ে পৌঁছাইবার কোন কাব্যসুলভ, কৃত্রিম চেষ্টা নাই। জননী ও গৃহিণী সংসার বৃত্তের কেন্দ্র-বিন্দু, প্রেয়সী ইহার প্রত্যন্তপ্রদেশের একটা বিচিত্র ক্ষণস্থায়ী বর্ণপ্রলেপ। কাজেই বাস্তব জীবনে প্রত্যেক নারীর মধ্যেই প্রিয়া হইতে জননীর বিকাশ খুব স্বাভাবিক পরিণতি। শ্যামার জীবনে তাহার যৌবনের প্রণয়াবেশ অপেক্ষা তাহার গৃহিণীত্বই সুপরিস্ফুট। তাহার স্বামী খেয়ালী, দুর্বলচিত্ত ও দায়িত্ববোধহীন বলিয়াই প্রণয়ের ঘোর তাহার শীঘ্রই কাটিয়া গিয়াছে ও সুস্থ দাম্পত্যজীবন তাহার কোনও দিন গড়িয়া উঠে নাই। সংসার-পরিচালনার শ্রান্তিহীন পেষণে তাহার সমস্ত সূক্ষ্ম, সুকুমার উন্মেষগুলি উন্মূলিত হইয়া গিয়াছে। হয়ত দীর্ঘদিনের ব্যবধানে এক অসতর্ক, আত্মবিস্মৃত মুহূর্তে বসন্তপবনস্পর্শে একটা অতর্কিত যৌবন-উচ্ছ্বাস তাহার মধ্যে হিল্লোলিত হইয়াছে, বা প্রৌঢ়জীবনের সীমান্তদেশে উপনীত হইয়া পুত্রবধূর তীব্র, বহ্নিজ্বালাময় যৌবন-বিকাশ তাহার মনে একটা ঈর্ষ্যার ঝলক জাগাইয়াছে। কোনও দিন বা চোখের সামনে তরুণ-তরুণীর অসংকুচিত প্রেমাভিনয় তাহার নীতিবোধকে উত্তেজিত করিয়া তাহাকে তীব্র বিতৃষ্ণায় পূর্ণ

করিয়াছে। কন্যা বকুলের প্রতি শঙ্করের মোহের দিকে সে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছে, কন্যা-জামাতার মিলন সুখময় না হইবার আশঙ্কায় সে কন্যার প্রতি অসংবরণীয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষুদ্র, সাময়িক ব্যতিক্রম তাহার শান্ত গৃহিণীত্বের মূল সুরটিকে আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছে, এবং তাহার সমস্ত চরিত্রকে পূর্ণতা ও সংগতি দিয়াছে।

সন্তান-প্রসবের পর হইতে জননীর জীবনারম্ভ। কাজেই শ্যামার প্রথম দুইটি সন্তানের জন্মে তাহার মানস প্রতিক্রিয়া সূক্ষ্ম ও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম প্রসবের পর তাহার অদ্ভুত, স্তিমিত-বেদনা-বিদ্ধ অনুভূতি, সূতিকাগৃহে অজ্ঞাত ভয়ের ও থাকিয়া থাকিয়া বিস্ময়-মিশ্রিত আনন্দের নিবিড় স্পর্শ-শিহরণ, পিতৃপুরুষের অদৃশ্য জনতার রহস্যময়, অস্পষ্ট উপলব্ধি, শিশুর অকাল মৃত্যুতে তাহার অনুশোচনা ও আত্মগ্লানি—এই সমস্ত জননীর প্রথম অভিজ্ঞতার চমৎকার বিশ্লেষণ। দ্বিতীয় শিশুর জন্মকালে তাহার মনোভাব সম্পূর্ণ বিপরীত—আনন্দের আতিশয্য ও উত্তেজিত কল্পনার পরিবর্তে শান্ত, বিষণ্ণ বাস্তব-স্বীকৃতি, তীক্ষ্ণ আশঙ্কা-উদ্বেগের স্থলে অদৃষ্টবাদের নিকট উদাসীন আত্মসমর্পণ। এই মনোভাব-বৈপরীত্য নারীজীবনের একটা আমূল পরিবর্তন সূচনা করে। প্রথম সন্তান মাতার নিকট কল্পতরুর পারিজাত কুসুম, নিরবচ্ছিন্ন বিস্ময়, দ্বিতীয়, সংসার-যন্ত্রের আবর্তনের একটা মধুর পরিণতি, সংসার-বৃক্ষের মিষ্টতম ফলমাত্র। প্রথম সন্তানের উপর প্রসূতি যে মুগ্ধ, বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া ধরে, তাহা তাহার যৌবনের অপরূপ কল্পনার শেষ-রশ্মিমণ্ডিত, দ্বিতীয় সন্তানকে সে দেখে মাতার বিস্ময় লেশহীন, দায়িত্ববোধের চাপে আনমিত, সংসার-জ্ঞান-স্তিমিত দৃষ্টিতে।

শ্যামার সুদীর্ঘ জননী জীবনের পরিবর্তন-স্তরগুলি,—স্বচ্ছল অবস্থার আশা-মধুর পরিকল্পনা, দুঃসময়ের প্রারম্ভে কঠোর মিতব্যয়িতা ও আত্মনিয়মন, অতর্কিত আঘাতে ব্যাকুল অসহায়তার সহিত ভাঙ্গিয়া পড়া ও আশ্রয়ান্তরের অন্বেষণ, চরম দুর্দশায় পরের সংসারে আশ্রয়লাভের হীনতাস্বীকার ও ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধা, পুত্রকে অবলম্বন করিয়া নূতন নীড়-রচনার আগ্রহ ও সংকল্প এবং শেষ পর্যন্ত পুত্রবধূর নিকট গৃহিণীত্বের মর্যাদার ত্যাগ-পত্র স্বাক্ষর—প্রত্যেক নারীরই সাধারণ অভিজ্ঞতা। শেষের দিকে ক্লান্তি-অবসাদের পাষাণভার ক্রমশঃ প্রবল ইচ্ছাশক্তিকে অভিভূত করিতে থাকে, গৃহিণীর দিক্‌চক্রবালে উদাসীনতার ধূসর বাষ্প সঞ্চিত হইতে থাকে, সময় সময় হাল ছাড়িয়া দিয়া শ্রান্ত মন অবসরের স্বপ্ন দেখে। এই সমস্তই শ্যামার জীবনে চমৎকারভাবে দেখান হইয়াছে।

শ্যামার বৈশিষ্ট্য হইতেছে প্রণয়ব্যাপারে ও সংসার পরিচালনায় স্বামীর সহিত উভয়ত্রই অসহযোগ, সময় সময় প্রবল বিরোধ। শীতলের অযোগ্যতা ও ঔদাসীন্যের জন্য সংসারের ভার-কেন্দ্র সম্পূর্ণভাবে শ্যামার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। শীতলের সহিত তাহার সম্পর্ক ও অভিভাবকত্বের পর্যায়ে উঠিয়াছে। তাহার স্বামী প্রৌঢ়জীবনে বাহিরের বিলাস হইতে প্রতিহত হইয়া তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ইতিমধ্যে শ্যামার প্রেয়সীত্বের সমস্ত সরস মাধুর্য শুকাইয়া গৃহিণী-পণার কঠোর, প্রশ্রয়হীন, হিসাবী মনোভাবে পরিণত হইয়াছে। একদিন শীতল তাহার এই মাধুর্যহীন অতি-সতর্কতার বিরুদ্ধে জ্বালাময় বিদ্রোহে উত্তেজিত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণতঃ সে এই অবস্থাকে ক্ষুণ্ণ নৈরাশ্যের সহিত মানিয়া লইয়াছে। যে একদিন সম্পূর্ণভাবে তাহারই ছিল,

সে ক্রমশঃ তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া সংসাররূপ বিরাট যন্ত্রের গলায় বরমাল্য অর্পণ করিয়াছে।

গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্র সংক্ষেপে অথচ স্বাভাবিকতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। মন্দা গৃহিণীর মর্যাদা পাইয়া সপত্নীকে স্বামীর প্রণয়ের অংশ ছাড়িয়া দিয়াছে। বিধানের বাল্যজীবনে যে বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, ভবিষ্যতে তাহার বিশেষ কোন সার্থকতা দেখা যায় না। সে যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই নিজ ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা বর্জন করিয়া সংসারের কার্যেই আত্মনিয়োগ করিয়াছে, মাতার দুর্বল, কম্পিত হস্ত হইতে পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। শ্যামার ন্যায় তাহার জীবনেও প্রণয় মুকুলিত হইবার অবসর পায় নাই—তাহার বিবাহ সংসার-সেবার অঙ্গ স্বরূপ। শ্যামার প্রথম সন্তানের আবির্ভাবের সঙ্গে যে গ্রন্থের আরম্ভ, তাহার পুত্রবধূর প্রথম প্রসবের সহিত তাহার শেষ—এই ঘটনা যেন সংসার-রাজ্যের রাজ্ঞী-পরিবর্তনের ঘোষণা।

'অহিংসা' ও 'অমৃতস্য-পুত্রাঃ' গ্রন্থ দুইখানি অবিমিশ্র অসাফল্যের উদাহরণ। প্রথমটিতে আশ্রমের ইতিহাসটি ভণ্ডামি, ধর্মান্ধতা এবং কখনও গোপন, কখনও প্রকাশ্য যৌনলালসার উদ্ভট লীলাক্ষেত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই দুর্বোধ্য আখ্যানে লেখকের কোন স্থির লক্ষ্য বা স্পষ্ট উদ্দেশ্য দৃষ্টিগোচর হয় না। মাঝে মধ্যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-চেষ্টা ও গ্রন্থকারের নিজের জবানীতে উক্তি গ্রন্থের ঘোবালো আবহাওয়াকে আরও দুর্ভেদ্য করিয়াছে। মহেশ চৌধুরী, সদানন্দ, বিপিন, মাধবী, বিভূতি প্রভৃতি কোন চরিত্রই ঠিক বোধগম্যতার স্তরে পৌঁছায় নাই—ইহারা যেন অন্ধকার কুয়াসার মধ্যে পরস্পরের সহিত ঠেলাঠেলি সংঘর্ষ বাধাইয়া ও ক্ষণস্থায়ী, মূলহীন সম্বন্ধে জড়িত হইয়া এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'-এর মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও উদ্দেশ্যহীনতার চিহ্ন আরও সুপরিস্ফুট। এই দুইখানি উপন্যাসে গ্রন্থকারের উদ্ভট কল্পনা-প্রবণতা বাস্তবনিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করিয়া এক সংগতিহীন ধূম্রলোক রচনা করিয়াছে।

16-12-85

(৩)

✓ 'সহরতলী' উপন্যাসে লেখক বিষয়-নির্বাচন ও চরিত্র পরিকল্পনায় মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। সাধারণতঃ উপন্যাসে যে স্তরের নর-নারীর জীবন সমস্যা বর্ণিত হয়, এখানে তদপেক্ষা নিম্নস্তরের কথাই আলোচিত হইয়াছে। ভদ্রলোকের প্রাণহীন, নিস্তেজ, একঘেয়ে জীবন-কাহিনীতে যে সরস নূতনত্বের অভাব, তাহা শ্রমিক শ্রেণীর জীবনে অপেক্ষাকৃত সুপ্রচুর। বাহিরের ঠাট বজায় রাখিবার প্রাণান্ত চেষ্টায় ইহাদের সবদা মুখোস পরিয়া থাকিতে হয় না, সুলভ ভাব-প্রবণতায় ইহাদের জীবন আর্দ্র, স্যাঁতসেতে নহে। ইহাদের ব্যবহারে একটা বলিষ্ঠ সরলতা আছে, ইহাদের জীবনকে উপভোগ করিবার অবসর যত কম, উপভোগ-স্পৃহা সেই পরিমাণ তীক্ষ্ণ ও অকুণ্ঠিত। ঈর্ষ্যা, ক্ষোভ, অকৃতজ্ঞতা প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তিগুলি ইহাদের মধ্যে লজ্জায় আত্মগোপন না করিয়া অনাবৃত তীব্রতার সহিত অভিব্যক্তি লাভ করে। ইহাদের সমস্ত স্থূল, ইতর আমোদ-প্রমোদের মধ্যে প্রাণশক্তির সতেজ স্ফূর্তি প্রচুর ধারায় প্রবাহিত। 'সহরতলী'তে এই নূতন বিষয়ের অভিনব স্বাদবৈচিত্র্য একটা প্রধান আকর্ষণের হেতু। মতি, সুধীর, জগৎ, ধনঞ্জয়, কালো, চাঁপা প্রভৃতি যশোদার ভাড়াটেরা এই শ্রমিক জগতের প্রতিনিধি

—ইহাদের জীবন যতই খণ্ডিত ও বিকৃত হউক, ইহা খাঁটি ও অকৃত্রিম, অন্তর-বাসনার ছদ্ম-বেশহীন, নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। ইহাদের মধ্যে সুধীরের চরিত্রই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে—তাহার ক্রূর ঈর্ষ্যা, যশোদার নিকট প্রণয-যাচ্ঞার স্পর্ধা, খুঁতখুঁতে অসন্তুষ্ট ভাব তাহাকে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে।

কিন্তু এই শ্রমিকসমাজ ভদ্রসমাজের সংস্পর্শহীন নহে, জীবিকার্জনের সূত্রে ইহাদের কর্ম-ক্ষেত্র এক ও স্বার্থ-ও-আদর্শগত সংঘাত অনিবার্য। এই সংঘর্ষ সত্যপ্রিয় মিলের মজুরদের মধ্যে ধর্মঘটের রূপ গ্রহণ করিয়াছে—যে ধর্মঘট বুদ্ধিজীবীর অস্ত্রাগারে শাণিত হইয়া অধুনা শ্রমিকের অনভ্যস্ত, অপটু হস্তে ধৃত হইতেছে। যশোদা মজুরদের ব্যক্তিগত হিতৈষিণী হইতে ক্রমশঃ তাহাদের কর্মজীবনের সুবিধা-অসুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বাধ্য হইয়াছে। সে শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটে প্ররোচনা দিয়া মিলের মালিক সত্যপ্রিয়ের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে; কিন্তু এই অনভ্যস্ত যুদ্ধ-প্রণালীর বিশেষ রণকৌশল তাহার অনায়ত্ত থাকায় সে সহজেই সত্যপ্রিয়ের কূট-বুদ্ধির নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছে। সে সত্যপ্রিয়ের ফাঁদে পা দিয়া শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব, মজুরদের বিশ্বাস ও আনুগত্য হারাইয়াছে।

যশোদা ও সত্যপ্রিয়—এই দুইটি শ্রেষ্ঠ চরিত্র পরস্পারের প্রতিদ্বন্দ্বী ও পরিপূরকরূপে কল্পিত হইয়াছে। যশোদার পরিকল্পনার অনন্যসাধারণত্ব পাঠককে মুগ্ধ করে। এমন বলিষ্ঠ, আত্মনির্ভর-শীল, দৃপ্ত-আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন, ভাবপ্রবণতাহীন, অথচ রূঢ় ব্যবহারের অন্তরালে মায়া-মমতায় কোমল, সেবানিপুণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি স্ত্রীলোক সংসারে, বা সাহিত্যে সুলভ নহে। তাহার সমস্ত ব্যবহার ও কার্যকলাপ একটি সুনির্দিষ্ট নীতি দ্বারা অবিচলিতভাবে নিয়ন্ত্রিত। সর্বপ্রকার ভাবাবেগ, রমণীসুলভ কোমলতা, ন্যাকামি ও দুর্বল গতানুগতিকতার প্রতি সে খড়্গহস্ত। অথচ শ্রমিক শ্রেণীর খেয়ালী ব্যসন-বিলাস, তাহাদের সাময়িক অবসাদ ও শ্রান্তি, ছেলেমানুষী আবদার ও দূরদৃষ্টিহীন অমিতব্যয়িতা, স্বার্থহানিকর আত্মঘাতী প্রবৃত্তির প্রতি তাহার আছে একদিকে তীব্র, কঠোর ভর্ৎসনা, অন্যদিকে সস্নেহ ক্ষমার প্রশ্রয়। অপরাধীর শাস্তি দিবার জন্য তাহাদের আহার-বন্দের আদেশ-প্রচার ও স্বেচ্ছায় অনুপস্থিতির দ্বারা সেই আদেশ-লঙ্ঘনের সুযোগ-প্রদান—এই দুইই তাহার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের বিপরীতমুখী বিকাশ। তাহার ভাই নন্দর কীর্তনানুরাগ ও ভাবার্দ্রতা, তাহার চাকুরীজীবী ভদ্রলোক হইবার জন্য লোলুপতা ও চরিত্রের মেরুদণ্ডহীন দৌর্বল্য—সমস্তই তাহার অবজ্ঞার উদ্রেক করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত নন্দ যখন সুবর্ণের প্রভাবে সবাক্ চিত্রের অভিনেতৃ-জীবন অবলম্বন করিয়াছে, তখনও যশোদার মনে তাহার খ্যাতি ও নূতন পদবীর প্রতি সম্ভ্রমের সঙ্গে একটা অনুকম্পার ভাব মিশ্রিত হইয়াছে। কুমুদিনীর বিষাক্ত সমালোচনা, পুরুষের সাময়িক চিত্ত-বিকার, সুধীরের প্রেম নিবেদন ও মাতাল মতির আলিঙ্গন-প্রয়াস—তাহার বলিষ্ঠ প্রকৃতি এই সমস্ত অশিষ্ট ব্যবহারের প্রতি উদার, ক্ষমাশীল উপেক্ষা দেখাইয়াছে। ভদ্রলোকের জীবন-যাত্রায় শূন্যগর্ভ আদর্শবাদের মিথ্যা অভিমান, সুরুচি-সৌজন্যের আবরণে ঐশ্বর্যগর্বের আড়ম্বর-প্রচার, মান-রক্ষার জিদে সহজ স্নেহের অস্বীকার প্রভৃতি বিকারগুলির প্রতি তাহার দৃষ্টি অসামান্যরূপ তীক্ষ্ণ। এই মেকী ও ফাঁপা জীবনের সহিত তাহার সন্ধিহীন যুদ্ধ-ঘোষণা।

যশোদার চরিত্রে পুরুষ ও পুরুষোচিত গুণের প্রাধান্য-সত্ত্বেও তাহাকে নারী বলিয়া

চিনিতে আমাদের বাধে না—তাহার কর্তৃত্বাভিমান-পূর্ণ, ঝাঁঝালো ব্যক্তিত্বের মধ্যে নারী-দুর্লভ সহৃদয়তা মেশানো আছে। তাহার অবয়বের বিশালত্ব ও রূপহীনতার জন্য তাহার যে অব্যক্ত ক্ষোভ আছে তাহা মাঝে মধ্যে বাক্যে প্রকাশিত হয়। তাহার 'চাঁদের মা' পরিচয়টি যদিও সাধারণতঃ তাহার পুরুষ ভাড়াটিয়াদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বোধন-প্রয়াসের প্রতিষেধক রূপে ব্যবহৃত হয়, তথাপি তাহার পূর্ব-জীবনের শোকস্মৃতি-বিজড়িত এই অভিধান তাহার অবরুদ্ধ মাতৃত্বের, তাহার কঠোর প্রকৃতির মধ্যে এক ব্যথাপূর্ণ, কোমল স্তরের দিকে সার্থক ইঙ্গিত করে। তাহার বিবাহিত জীবন ও স্বামী তাহার ইতিহাসে অনুল্লিখিত রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু যৌবনের স্বপ্ন, প্রেমের কল্পনা এখনও তাহার বলিষ্ঠ, কর্মব্যস্ত জীবনযাত্রার ফাঁকে ফাঁকে এক অতি সূক্ষ্ম, ক্ষণস্থায়ী মোহজাল রচনা করে। বিরাটকায়, খঞ্জ, শিশুর ন্যায় অসহায় ও অভিমানী ধনঞ্জয় তাহার এই স্বপ্ন-প্রবণতার সাক্ষ্য ও নিদর্শন। উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধটি একটা মধুর অনিশ্চয়তায় রহস্যাবৃত হইয়া আছে। বৈজ্ঞানিকের মনের অন্ধকার কোণে ভূতের ভয়ের মত, যশোদার বস্তুনিষ্ঠ, আবেশ-জড়িমাহীন, স্ফটিক-স্বচ্ছ অন্তরের এক সুদূর, প্রত্যন্ত-প্রদেশে অস্বীকৃত প্রেমের লঘু বাষ্প-পুঞ্জ প্রকৃতির কোন এক খেয়ালী বিধানে সঞ্চিত রহিয়াছে।

সত্যপ্রিয় লেখকের চরিত্রাঙ্কনশক্তির আর একটা উজ্জ্বল নিদর্শন। জ্যোতির্ময়ের বিবাহের নিমন্ত্রণ-সভায় তাহার যে কৌশলময়, দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতিটির সহিত পরিচয়ের সূত্রপাত হয়, তাহার প্রত্যেক পরবর্তী আবির্ভাবে এই পরিচয় স্পষ্টতর হইয়া এক ভয়াবহ, অতলস্পর্শ রহস্যের ধারণা জন্মায়। তাহার রাজনৈতিক মতবাদের অসাধারণত্ব, অফিস-পরিচালনা ও কর্মচারী-পরীক্ষার অভিনব বিধি, বিনয় ও সহাস্য শিষ্টাচারের পিছনে অনমনীয় সংকল্প ও অমোঘ কূটনীতি-কৌশল এই সমস্ত মিলিয়া এক দুরবগাহ মনুষ্য-চরিত্রের ছবি ফুটাইয়া তোলে। শরৎচন্দ্রের 'দত্তা'র রাসবিহারীর সহিত সত্যপ্রিয়ের কতকটা সাদৃশ্য আছে; কিন্তু রাসবিহারীর সহিত তুলনায় সত্যপ্রিয় অনেক বেশি জটিল ও বহুমুখী, আরও সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে পরিকল্পিত।

"সহরতলী'র দ্বিতীয় পর্বে যশোদা ও সত্যপ্রিয় উভয়েরই পরিচয়ের নূতন স্তর উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। সত্যপ্রিয়ের ব্যবসায়-জীবনে প্রশান্ত, নির্বিকার নির্মমতা দ্বিতীয় পর্বে তাহার পারিবারিক জীবনে পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। তাহার কন্যা-জামাতার সহিত ব্যবহারে আমরা সেই সুপরিচিত ক্রূরতা, সেই অমোঘ কর্মক্রম, সেই দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিরই পুনরভিনয় লক্ষ্য করি। উভয় ক্ষেত্রেই একই অস্ত্র সমান নির্মমতার সহিত প্রযুক্ত হইয়াছে। এই অন্দর-মহলের ছবি যেমন একদিকে সত্যপ্রিয়ের পরিচয় সম্পূর্ণ করিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে তাহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে একটা সংকীর্ণ যান্ত্রিকতার দিক্ আছে তাহার উপরও আলোকপাত করিয়াছে। যে ব্যক্তি মিলের শ্রমিক ও ঘরের কন্যা-জামাতা উভয়ের অবাধ্যতার জন্য একই শাস্তিবিধান করে, তাহার প্রকৃতিতে প্রসার ও নমনীয়তার যে একান্ত অভাব তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

দ্বিতীয় পর্বে যশোদাও এক পরিবর্তনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছে। নূতন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইয়া তাহার পূর্ব বদ্ধমূল ধারণা কোন কোন ক্ষেত্রে শিথিল ও দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছে। প্রথম, তাহার দীর্ঘকালের পুরাতন আবেষ্টন ছাড়িবার সম্ভাবনা তাহাকে কতকটা বিচলিত করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, অজিত ও সুব্রতার সংস্পর্শে আসিয়া সে এমন একটি ভদ্র পরিবারের সন্ধান পাইয়াছে

যাহার সম্বন্ধে তাহার পূর্বের অবজ্ঞাসূচক ধারণা ঠিক প্রযোজ্য নহে। এই তরুণ দম্পতীর মধ্যে ক্ষয়িষ্ণুতার চিহ্ন মোটেই লক্ষ্য-গোচর নহে—তাহাদের জীবনে সহজ আনন্দ, সুরুচিপূর্ণ সৌন্দর্যবোধ ও উচ্ছ্বসিত প্রাণশক্তির প্রাচুর্য, বিশুদ্ধ, সবল, সাহসিক প্রেমের উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। যশোদা অনেকটা বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধার সহিত ভদ্রজীবনের এই অপ্রত্যাশিত, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যপূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করিয়াছে। এই নব উপলব্ধিটিকে অন্তরে স্থান দিবার ফলে তাহার ব্যবহার ও চাল-চলনে, তাহার জীবনাদর্শে একটু নূতনত্বের স্পর্শ লাগিয়াছে। সুব্রতাকে কেন্দ্র করিয়া প্রতিবেশী ভদ্র পরিবারগুলির সঙ্গে তাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়াছে ও মজুরদের অন্নবস্ত্র যোগাইবার ভার হইতে ভদ্র পরিবারে সংগীত-চর্চার ব্যবস্থা পর্যন্ত তাহার কর্মপরিধি বিস্তার লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় পর্বে যশোদার প্রখর ব্যক্তিত্ব ও অটল আত্মপ্রত্যয় কতকটা ম্লান হইয়াছে। নূতন অবস্থার অনিশ্চয়তার মধ্যে তাহার পদক্ষেপ, অভ্যস্ত দৃঢ়তা হারাইয়া, কিয়ৎ পরিমাণে সতর্ক ও সঙ্কোচ-শ্লথ হইয়াছে। অপরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে সে যে নূতন জীবন-যাত্রা আরম্ভ করিবে, তাহা সম্ভবতঃ এই পরিবর্তিত আদর্শের গতিচ্ছন্দেই নিয়মিত হইবে।

(৪)

'চতুষ্কোণ' উপন্যাসটি লেখকের যৌনব্যাপার-সম্পর্কিত অসুস্থ মনোবিকারের ছবি আঁকিবার যে প্রবল প্রবণতা আছে তাহারই চূড়ান্ত উদাহরণ। এই উপন্যাসে যৌন কল্পনার অবাধ ব্যাপ্তি ও বিচরণের, ইহার সূক্ষ্মতম, অনির্দেশ্যতম খেয়াল পরিতৃপ্তির, উপযোগী প্রতিবেশ আশ্চর্য কলা-কৌশলের সহিত রচিত হইয়াছে! এই প্রতিবেশে সমাজ-জীবনের সমস্ত নৈতিক অনুশাসন ও নিয়ম-সংযম, ইহার ভারী ও স্থায়ী উপাদান ও মনোবৃত্তিসমূহ—এক কথায় ইহার মধ্যে ক্রিয়াশীল মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিকে—সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া এক লঘু, স্বপ্নাবেশমন্থর, স্বপ্রতিষ্ঠ ও আত্মকেন্দ্রিক জগৎকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। গোটা মানুষ ও তাহার মানস সমগ্রতাকে বাদ দিয়া তাহার সাধারণতঃ অবদমিত অংশবিশেষকে, তাহার যৌন আকাঙ্ক্ষার অসংখ্য অণু-পরমাণুকে, অগণিত বুদ্‌বুদরাশির ন্যায় দ্রুত উত্থান-বিলয়শীল, যৌন কল্পনার ছায়াছবিগুলিকে একটা অবিচ্ছিন্ন ঐক্য, একটা অখণ্ড জীবনের প্রতিরূপ দেওয়া হইয়াছে। রোমান্স-লেখক জীবনের জটিল বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করিয়া অবিমিশ্র সৌন্দর্য-রোমাঞ্চের জন্য যে কল্পনামূলক স্বৈরাচারের দাবী করেন, এখানে অবরুদ্ধ যৌন কামনার বেপরোয়া পক্ষবিস্তারের জন্য, মনোবিকারের উদ্ভট আতিশয্যের খাতিরে, সেই চরম দাবীই উত্থাপন করা হইয়াছে। কল্পলোক এতদিন বাস্তবতার নিকট যে বিশেষ অনুগ্রহের প্রার্থী হইয়াছে, অধুনা অবচেতন মনের অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন, বিশৃঙ্খল বীভৎসতা সেই অনুগ্রহের অংশভাক্ হইবার দাবী জানাইতেছে।

এই পূর্বস্বীকৃতিটুকু মানিয়া লইলে উপন্যাসটির প্রতিবেশরচনায় নিখুঁত সামঞ্জস্য বিস্ময়ের উদ্রেক করে। যে চিত্রকর সরল, দৃঢ় রেখা বাদ দিয়া, বস্তুগত কাঠিন্য গোধুলির আবছা অস্পষ্টতায় বিলীন করিয়া কেবল বঙ্কিম, ভাঙ্গা-চোরা বর্ণ-সন্নিবেশে জীবনের ছবি আঁকিতে পারেন তাঁহার বিষয়বস্তু যাহাই হউক শিল্পচাতুর্য উপেক্ষণীয় নহে। রাজকুমার, রিণী, মালতী, সরসী ও শেষ পর্যন্ত কালীকে লইয়া যৌন আকর্ষণের সূক্ষ্ম বৈদ্যুতীপূর্ণ ও যৌন কল্পনা-বিলাসের লঘু

বাষ্পরাশি-বেষ্টিত এক ছায়া-জগৎ গড়িয়াছে। স্থূল, বাস্তব জগতের একমাত্র প্রতিনিধি গিরীন্দ্র-নন্দিনীর নিকট তাহার এই অসুস্থ মনোবিকার রূঢ় প্রতিঘাত লাভ করিয়া এই স্বত্নরচিত অনুকূল আবেষ্টনে আশ্রয় লইয়াছে। এখানে এই রোগস্ফীত, অপরিমিত কল্পনাকে বাধা দিবার কেহ নাই—এই ধূম্রাকৃতি দৈত্য বাস্তবজীবনের সংকীর্ণ বোতল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সমস্ত আকাশ-বাতাস পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। সমাজের সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তি এখানে নিশ্চেষ্ট; অভিভাবকের সতর্ক প্রতিরোধ এখানে সম্মোহিত। যে কয়েকটি প্রাণী এই জগতের অধিবাসী তাহারা পরস্পরের সম্মতিক্রমে যৌনবোধের অবাধ কারবারের জন্য এক যৌথ-সমবায়-সমিতি গঠন করিয়াছে। ইহার নিয়ম-কানুন সাধারণ জগৎ হইতে একেবারে স্বতন্ত্র; ইহা বাহিরের বা বিবেকের কোন শাসন না মানিয়া কেবল নিজ আভ্যন্তরীণ, অনির্দেশ্য তৃপ্তি-অতৃপ্তিবোধের নির্দেশ অনুসরণ করে। এ যেন যৌন-সাধনার একপ্রকার তূরীয় অবস্থা—ইহার ব্রহ্মলোকে উন্নয়ন।

রাজকুমারের যৌন আকর্ষণ অসাধারণ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী—রিণী, মালতী ও সরসী প্রত্যেকেই তাহার সহিত যৌন সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য উদ্‌গ্রীব। রাজকুমার কিন্তু সম্ভোগ অপেক্ষা রোমন্থনেরই পক্ষপাতী; প্রাপ্তি অপেক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনার চারিদিকে কল্পনা-বিলাসের সূক্ষ্মতন্তু-নির্মিত জাল বুনিতেই অধিক মনোযোগী। রিণীর উদ্যত চুম্বনের নিকট হইতে সে পিছাইয়া আসে ও এই পশ্চাদপসরণের সমাজনীতিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে। মালতীর বিগলিত আত্মসমর্পণের সুযোগ না লইয়া মাত্র কেশ-চুম্বনের দ্বারা তাহার অর্ঘ্যগ্রহণের স্বীকৃতি জানায়—ভক্ত-নিবেদিত নৈবেদ্যে দেবতার দৃষ্টিভোগের ন্যায়। মালতীর সহিত হোটেলে রাত্রি-যাপনের ব্যপদেশে সে তাহাকে সংযম শিখাইতে চাহে—মালতী যেন তাহার পরিবর্তে শ্যামলকে ভালবাসে। একমাত্র সরসীর সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ অনেকটা সুস্থ ও স্বাভাবিক—সরসী তাহাকে ভালবাসে, কিন্তু অন্ধ, মোহজড়িত আবেগের পরিবর্তে সুস্পষ্ট সহানুভূতি ও পরিষ্কার বোধশক্তির সহিত। রাজকুমারের অসুস্থ, জটিল মানস পরিস্থিতি, তাহার মনোগহনের গোলকধাঁধা সেই একমাত্র বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে। কালীর সহিত তাহার যে সহজ সম্বন্ধটি গড়িয়া উঠিতে পারিত, তাহা যেন এই জটিল মনো-বিকারের দুর্ভেদ্য অরণ্যমধ্যে রাস্তা খুঁজিয়া না পাইয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। রাজ-কুমারের যৌন কামনার বাস্তব চরিতার্থতার উপযোগী সতেজ ও সুস্থ জীবনীশক্তি নাই—ইহার ধারা অন্তহীন আত্মবিশ্লেষণে, নানা পরীক্ষামূলক অনুশীলনের বালুকা-বহুল শাখাপথে, শীর্ণ-কৃশ রেখায় চক্রাবর্তন করিয়াছে।

এই বিকারের বীজাণুপূর্ণ আবহাওয়ায় রাজকুমারের অপ্রকৃতিস্থ মনে নানা উদ্ভট খেয়াল গজাইয়া উঠে। নারীর নগ্ন দেহে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন-যাত্রার ইঙ্গিত আবিষ্কারের অদ্ভুত কল্পনা তাহাকে পাইয়া বসে। এই পরীক্ষার সুযোগ পাইবার জন্য সে তাহার পরিচিত প্রত্যেক নারীর অঙ্গের উপর তীক্ষ্ণ, অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তাহার এই খাপছাড়া আচরণ তাহার প্রণয়িনী-ত্রয়ীর মধ্যে নিজ নিজ চরিত্রানুগত বিভিন্নরূপ প্রতিক্রিয়া জাগাইয়াছে। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সে তাহাদের একজনের—রিণীর নিকট, নিতান্ত নিরাসক্ত, বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সহিত, তাহার নিরাবরণ দেহ দেখিবার দাবী জানায়। রিণী এই প্রস্তাব ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য করে, কিন্তু তাহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয় প্রস্তাবের অশ্লীলতায় নহে, রাজকুমারের নিরাসক্তির সাড়ম্বর ঘোষণায়। মালতীর নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপনের অবসর হয় নাই, কিন্তু সরসী

স্বেচ্ছায় এই অনুরোধ পালন করিয়া রাজকুমারের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার প্রমাণ দিয়াছে।

যৌনানুভূতির এই অন্ধকার সুরঙ্গ পথে দীর্ঘ-পদচারণার ফলে রাজকুমার ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। ছদ্মবেশী যৌনকামনার আত্মগোপন-প্রবণতার অনেক কৌতূহলজনক উদাহরণ তাহার গোচর হইয়াছে। মনোরমা যে কালীর মারফৎ নিজেরই একটা অবরুদ্ধ, হয়ত অজ্ঞাত যৌন লালসা চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছে, কালীর প্রত্যাখ্যানের আঘাতে এই অস্বীকৃত সত্য তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর অভিভাবকত্বের ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিণীর তীব্র আকাঙ্ক্ষা, রাজকুমারের মন্থর, দ্বিধাগ্রস্ত গতিতে অসহিষ্ণু হইয়া, তাহার দুর্বোধ্য, আত্মবিরোধী আচরণে পীড়িত হইয়া, অবশেষে পাগলামিতে ফাটিয়া পড়িয়াছে। ইহার সর্বাপেক্ষা জটিল, রহস্যময় প্রকাশ হইয়াছে মালতীর ক্ষেত্রে। রাজকুমারকে ভালবাসিবার কোমল, আবেগার্দ্র আগ্রহে, তাহার নিকট নির্বিচারে আত্মদান-প্রবণতায় সেই সবচেয়ে বেশি অগ্রসর হইয়াছে। রাজকুমারকে না হারাইবার ব্যাকুল, একনিষ্ঠ সাধনায় সে শ্যামলের প্রতি নিষ্ঠুরতম ব্যবহার করিয়াছে। কিন্তু আত্মসমর্পণের মুহূর্তে সে কোন দুর্বোধ্য প্রেরণার বশে পিছাইয়া আসিয়াছে। একদিনের হীন গোপন মিলন তাহার পক্ষে যথেষ্ট নয় ও দুই তিন মাসের অবাধ-প্রকাশ্য সহবাসের ক্রমে রাজকুমারের প্রতি তাহার আকর্ষণের পরিতৃপ্তি হইবে না, এই মিথ্যা অজুহাতে সে তাহার অবচেতন মনের বিমুখতা ঢাকিতে চাহিয়াছে। তাহার ঐশ্বর্যাকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়াই তাহার দারিদ্র্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। শেষ পর্যন্ত রাজকুমার বুঝিয়াছে যে, মালতীর সহিত তাহার সম্বন্ধ শ্রদ্ধা-স্নেহের, ভালবাসার নহে ও ভালবাসার দুরন্ত ইচ্ছাই সব সময় তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ নহে। ইহাও সেই মায়াবী মনোভাবের আর একটা নিপুণ ছদ্মবেশ।

এই সূত্রে রাজকুমার নিজের সম্বন্ধেও অনেক অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের দ্বারা অন্যথা-অপ্রাপ্য আত্মপরিচয় লাভ করিয়াছে। প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতার দ্বারা তাহার আত্মোপলব্ধির এক একটি নূতন স্তর উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সে স্বভাবতঃ যৌন বিষয়ে একটু বেশিমাত্রায় কৌতূহলী, যৌন অনুভূতি সম্বন্ধে উগ্ররূপে স্পর্শ-সচেতন (Sensitive)। কিন্তু বাস্তবজীবনে তাহার এই ইচ্ছা প্রতিহত হয় বলিয়া সে চিন্তাজর্জর, অবসন্ন ও পথসন্ধান-বিমূঢ়। এই দ্বিধা ক্লিষ্ট ভাব হইতে সে পরিত্রাণ পাইয়াছে সরসীর উৎসাহ সমর্থন ও সহযোগিতায়। সরসীর নগ্ন দেহে সে নিজ অদ্ভুত কল্পনা যাচাই করিবার সুযোগ পাইয়া এমন উৎফুল্ল হইয়াছে যে, বোধ হয় নিউটন মাধ্যাকর্ষণ-নিয়ম আবিষ্কার করিয়া এতটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু মালতীর অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে আবার তাহার মনে সংশয়ের মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে। শেষ পর্যন্ত রিণীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি তাহার মনোবিকারের উপর এক ঝলক তীক্ষ্ণ, চোখ-ধাঁধানো আলোকপাত করিয়া তাহাকে তাহার ব্যাধির ভয়াবহ দুরারোগ্যতা সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছে। এই আলোকে সে তাহার চরিত্রের বিকলাঙ্গ অসামঞ্জস্যের প্রকৃতিটি সুস্পষ্টভাবে, খোলা বইএর পাতার মত পড়িয়াছে। অতিরিক্ত থিওরি-বিলাসের ফলে তাহার সুস্থ, স্বাভাবিক পরিণতি—কৃতজ্ঞতা, প্রেম, অপরের সম্বন্ধে কল্যাণ-কামনা-প্রণোদিত কৌতূহল—সমস্তই যেন শুষ্ক, শীর্ণ হইয়াছে। এই স্বীকারোক্তির তীব্র, আত্মগ্লানিপূর্ণ আন্তরিকতা আমাদিগকে অভিভূত করে, লেখকের মন-

সুক্ষ্ম-বিশ্লেষণ-কুশলতার ইহা একটা চমৎকার পরিচয়। রীণি, মালতী ও সরসীর চরিত্র-পার্থক্যও সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে—রিণী খেয়ালী, অভিমানপ্রবণ, আদুরে মেয়ে, যাহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা কোন বাধা-বন্ধ মানে না; মালতী—কোমল, ভাবপ্রবণ, আত্মদানোন্মুখ, কিন্তু ভালবাসার প্রকৃতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ; সরসী—কর্মঠ, ব্যবহারিক জীবনে সহজ-নিপুণ, অবদমিত যৌন বুভুক্ষার মূল্য স্বরূপ স্বচ্ছ দৃষ্টি ও সুস্থ সহানুভূতিসম্পন্ন।

যৌনতত্ত্ব-বিশ্লেষণের দিক্ দিয়া উপন্যাসটির উৎকর্ষ বিশেষভাবে প্রশংসার্হ। তবে এ সমস্ত ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের গভীরতা ফ্রয়েডের অনুমান সিদ্ধান্তের স্তর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। জীবনের যে কোন খাপছাড়া ব্যবহারই মূলতঃ যৌন প্রেরণা হইতে উদ্ভূত এই স্বতঃসিদ্ধটা মানিয়া লইলে যৌন প্রেরণার কারণ দেখান নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। ইহা বৈজ্ঞানিকদের প্রথম কারণ (First cause) পর্যন্ত পৌছিতে অক্ষমতার জন্য দ্বিতীয় কারণে (Secondary cause) আশ্রয়-গ্রহণের অনুরূপ ব্যাপার। বাতাসে বীজাণু আছে ইহাই রোগের কারণ নির্ধারণে যথেষ্ট হইলে বাতাসে বীজাণু কোথা হইতে আসিল এই প্রশ্ন অনুত্থাপিত ও অমীমাংসিত থাকে। সেইরূপ উপন্যাসের চরিত্রগুলির প্রত্যেকটি অস্বাভাবিক আচরণের সূত্র ধরিয়া টান দিলে দেখা যায় যে, ইহারা শেষ পর্যন্ত কামানুভূতির মূল-সংলগ্ন। এই পর্যন্ত ব্যাখ্যা বেশ সন্তোষজনক; কিন্তু কোন অবিশ্বাসী যদি ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, রাজকুমারের সঙ্গে এত-গুলি তরুণীর এইরূপ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল কি উপায়ে, তবে লেখক এই কৌতূহলকে তাঁহার সীমা-বহির্ভূত বলিয়াই নির্দেশ করিবেন। রাজকুমারকে রূপক বা প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করায় বিরুদ্ধে লেখক মুখবন্ধে তাঁহার আপত্তি জানাইয়াছেন—কিন্তু তিনি যে কারণ দেখাইয়াছেন যে, সে অনেকের কামপ্রবৃত্তির সাধারণ ও ঈষৎ অতিরঞ্জিত সারসংকলন, তাহাতে তাহার রূপকত্ব না হউক প্রতিনিধিত্বের অনুমান সমর্থিতই হয়। বোধ হয় আর্টের সংগতি ও সম্পূর্ণতার দিক্ হইতে রাজকুমারকে রূপক হিসাবে লইলেই পূর্বোল্লিখিত সংশয়ের যথাসম্ভব নিরসন হইতে পারে। কেননা রূপকের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল সাধারণতঃ সুপ্ত থাকে—যে স্তরে ইহা সাংকেতিকতার বিচ্ছিন্ন রশ্মিগুলি মিলাইয়া সম্পূর্ণমণ্ডল ভাস্বরতা লাভ করে আমরা সেই স্তরেই ইহার সমালোচনা সীমাবদ্ধ রাখিতে অভ্যস্ত। সে যাহাই হউক, রাজকুমারকে রূপক বা ব্যক্তি যে হিসাবেই গ্রহণ করা যাউক, সে যে জীবনের একটা প্রচ্ছন্ন, অনুদ্‌ঘাটিত দিক্ হইতে যবনিকা অপসারিত করিয়াছে ইহা সর্বথা স্বীকার্য।

'প্রতিবিম্ব' উপন্যাসে (১৯৪৩, সেপ্টেম্বর) ঔপন্যাসিক ভারকেন্দ্র একটু দুর্নিরীক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। কোন অনির্দিষ্টনামা রাজনৈতিক দলের মতবাদ ও কর্মপদ্ধতির আলোচনা তারকের চরিত্রের ভিতর দিয়া কেন্দ্রীভূত করার ইচ্ছা হয়ত লেখকের ছিল, কিন্তু সে ইচ্ছা কার্যতঃ পূর্ণ হয় নাই। তারকের ব্যক্তিগত পরিচয় আমরা যেটুকু পাই—তাহার চাকরী করিতে অনিচ্ছা, চাকরীর বন্ধন এড়াইবার জন্য নানা অজুহাত-সৃষ্টি ও কৌশল-প্রয়োগ, দেশসেবার প্রকৃষ্ট পদ্ধতির দ্বিধাজড়িত অনুসন্ধান—রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত বলিয়া ঠেকে না। আর এই পরিচয়ের মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু নাই। কলিকাতা-কেন্দ্রে তাহার পার্টির জীবনাদর্শ ও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা-প্রণালী তাহার কাছেও দুর্বোধ্য ও খাপছাড়া ঠেকিয়াছে। সদস্যদের সমষ্টিগত জীবনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সংকোচ-বিধানকে সেও ঠিক মানিয়া লইতে পারে নাই। যৌথ

ব্যবস্থার রন্ধ্রপথে ব্যক্তিগত ভাববিলাস ও বিশেষ দাবী মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক তীব্রতার সহিত আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহাকে চমকিত করিয়াছে। কাজেই তারকের দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক দলগত মতবাদের প্রতিবিম্ব নহে—ইহা সাধারণ, সুস্থ আদর্শবাদী দেশপ্রেমিকের বিচারবুদ্ধির অনুসরণ করিয়াছে।

সুতরাং উপন্যাসের প্রধান বিষয় হইতেছে, এই রাজনৈতিক দলের চিন্তা ও কর্ম-ধারার বিশ্লেষণ ও সমালোচনা। ইহার মধ্যে যতটা তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় আছে, ততটা ঔপন্যাসিক রসসৃষ্টির নাই। পার্টির আদর্শ ঠিক আত্মপ্রতিষ্ঠ নয়, অভাবাত্মক (negative)—কংগ্রেসের পন্থার ভ্রান্তি-ঘোষণাই ইহার প্রধান অঙ্গ। গ্রন্থে কোন সত্যিকার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে এই অভিযোগ অস্বীকার করিয়া লেখক এক দীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। এই কৈফিয়ৎ রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়-এর' কৈফিয়তের মত সত্য হইলেও তাহার কোন সাহিত্যিক মূল্য নাই। গ্রন্থের আলোচনার মধ্যে যে অংশে ঔপন্যাসিক সম্ভাবনা ও উৎকর্ষ আছে তাহা মনোজিনীর সহিত সীতানাথের সম্পর্ক ও প্রসঙ্গক্রমে যৌন আকর্ষণ সম্বন্ধে দলের বিশেষ মতবাদ ও আদর্শ বিষয়ক। অবাধ মেলামেশার সুযোগদান ও ভাবলেশহীন কর্মব্যস্ততার প্রতিবেশ-রচনা—এই দুই ব্যবস্থা যে যৌন সম্পর্কের মোহাবেশ-মুক্তির প্রকৃষ্ট উপায় তাহা লেখক মনোজিনীর মুখ দিয়া খুব সূক্ষ্ম অনুভূতি ও মননশীলতার সহিত অভিব্যক্ত করিয়াছেন। সীতানাথের আদুরে ছেলের মত ক্রমবর্ধমান আবদার ও মনোজিনীর উত্তেজনাহীন, সস্নেহ প্রশ্রয়ের ছবিটি গ্রন্থের অন্যান্য আলোচনা—প্রধান অংশের সহিত তুলনায় উজ্জ্বলবর্ণে ও মানব-প্রকৃতির রহস্যজড়িত হইয়া ফুটিয়াছে।

(৫)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট-গল্প-সংগ্রহের মধ্যে কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর গল্প আছে। প্রেম ও দাম্পত্য সম্পর্কমূলক গল্পগুলিই প্রধান, কিন্তু পারিবারিক জীবনের অন্যান্য দিক্ ও ব্যক্তিগত সমস্যার বিষয়ও উপেক্ষিত হয় নাই। 'নেকী', 'শিপ্রার অপমৃত্যু', ও 'সপিল' ('অতসী মামী'), 'মহাকালের জটার জট', 'বিষাক্ত প্রেম' (সরীসৃপ), 'শৈলজ শিলা', 'খুকী' ('মিহি ও মোটা কাহিনী')—গল্পগুলিতে প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ আলোচিত হইয়াছে। 'নেকী' গল্পটি লেখকের প্রথম রচনার অন্যতম—ইহার উপর শরৎচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ্য হয়; ইহার গঠন-বিন্যাসও ঠিক নির্দোষ বলা যায় না। 'শিপ্রার অপমৃত্যু' গল্পে পরাশরকে অনিন্দিতার হাত হইতে ছিনাইয়া লইবার জন্য অতিক্রান্তপ্রায়-যৌবনা শিক্ষয়িত্রী শিপ্রার স্পর্ধিত ও দুঃসাহসিক কৌশল-জাল-বিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত শিপ্রার ডুবিয়া মরার সম্ভাবনায় পরাশরের নিরুদ্‌বিগ্ন নিশ্চেষ্টতায় এই অস্বাভাবিকরূপে তীব্র ও বেগবান প্রেমাভিনয়ের আকস্মিক পরি-সমাপ্তি ঘটিয়াছে। শিপ্রার অশোভন ও নির্লজ্জ আকর্ষণ-প্রয়াসের বর্ণনা খুব উপভোগ্য হইয়াছে। 'সর্পিল' গল্পটি দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে অসুস্থ মনোবিকার ও ক্রূর, অকারণ হিংসার ভয়াবহ ছবি। গ্রন্থকারের 'দিবা-রাত্রির কাব্য'-এর অশোক ও সুপ্রিয়ার অস্বাভাবিক, অপ্রকৃতিস্থ সম্পর্কের মৌলিক বীজটি যেন এই ছোট গল্পটিতে নিহিত আছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'হয়ত' ও 'শৃঙ্খল' গল্প দুইটিও এই একই বিকৃত প্রেরণার অভিব্যক্তি। স্বামী শঙ্করের ধর্মোন্মাদ, তাহার

স্ত্রীর আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতি, সংগীতপ্রিয়তা ও বন্ধু-সাহচর্যের বিরুদ্ধে উত্তপ্ত-মস্তিষ্ক-প্রসূত বিজাতীয় বিদ্বেষ, কৃত্রিম সারল্য ও সংসার-বিরাগের আবরণে পত্নী ও তাহার প্রণয়ীকে চরম শাস্তি প্রদানের সতর্ক, আট-ঘাট-বাঁধা উদ্যোগ, ভয়াবহ সম্ভাবনার ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনাপূর্ণ গৃহাবেষ্টন ও মানবের ক্রূর, কুটিল জিঘাংসার সহিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের দৈব-সংঘটিত সহযোগিতা—এই সকলের সমন্বয়ে এক অজ্ঞাতভীতি-শিহরণ-কণ্টকিত প্রতিবেশ রচিত হইয়াছে। এই সংগতিপূর্ণ পটভূমিকা-বিন্যাসই প্রেমেন্দ্রের পূর্বোল্লিখিত দুইটি গল্পের সহিত তুলনায় এই গল্পটির শ্রেষ্ঠত্বের কারণ।

'মহাকালের জটার জট' গল্পে দুই প্রতিবেশী পরিবারের মধ্যে উদ্ভট, খাপছাড়া, আপাত-দৃষ্টিতে অসম্ভব কয়েকটি যৌন আকর্ষণের ইঙ্গিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় দুই পাশাপাশি বাড়ির লোকেরা একে অপরের প্রতি যে বেশি পক্ষপাত বা টান-আকর্ষণের যে তারতম্য দেখাইয়া থাকে, লেখক সেই অকারণ প্রীতি-বৈষম্যের একটা যৌন-তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যাপারটির বৈজ্ঞানিকতা অপেক্ষা ইহার হাস্যকর অসংগতির দিকটাই বেশি ফুটিয়াছে। 'বিষাক্ত প্রেম'-এ লেখক গণিকাসক্ত যুবকের স্বার্থ-কলুষিত প্রেমাভিনয়ের মধ্যে এক উচ্চতর প্রবৃত্তির অতর্কিত স্ফূরণ দেখাইয়াছেন। সত্য সরলার অলংকার-চুরির উদ্দেশ্যে একদিন তাহাকে বিষপ্রয়োগে অচেতন করিয়াছে; কিন্তু উদ্দেশ্য-সিদ্ধির মুহূর্তে হয় বিবেকের দংশন না হয় সত্য ভালবাসার আকস্মিক উচ্ছ্বাস আত্ম-রক্ষার ছদ্মবেশে বিশ্বাসঘাতক প্রেমিকের হাত চাপিয়া ধরিয়াছে। সে সরলার গহনা চুরি না করিয়া সেবা-শুশ্রূষার দ্বারা তাহার চৈতন্য-সম্পাদন করিয়াছে ও নিজেকে বুঝাইয়াছে যে, ফাঁসি হইতে বাঁচিবার জন্যই তাহার এই আকস্মিক পরিবর্তন। বিষের মধ্যে হঠাৎ এক ঝলক অমৃতধারা উছলিয়া উঠিয়াছে। 'সরীসৃপ' গল্পটিতে ভদ্র পরিবারে বৈষয়িক সুবিধার জন্য দেহ-লালসা-উদ্রেকের কুৎসিত ও গ্লানিকর প্রচেষ্টার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ মিলে। মধ্যবয়স্কা চারু, এককালে ধনশালিনী, অধুনা তাহার শ্বশুরের মোসাহেব-পুত্র বনমালীর আশ্রিতা—ও তাহার কনিষ্ঠা ভগ্নী, সদ্যোবিধবা ও তরুণী পরী বনমালীর অনুগ্রহ লাভের জন্য তাহার মনোরঞ্জনের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছে। চারু বনমালীর দুরন্ত লালসাকে বহুকাল ঠেকাইয়া আসিয়া, তাহার প্রভাবকে মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। পরী কিন্তু গায়ে-পড়া আত্ম-সমর্পণের দ্বারা শীঘ্রই বনমালীর মোহ নিঃশেষ করিয়া তাহার মনে ঔদাসীন্য ও বিমুখতা জাগাইয়াছে। চারু ভগ্নীকে সরাইবার জন্য তাহাকে কলেরার বীজানুদুষ্ট প্রসাদ খাইতে দিয়া নিজেই কলেরায় মরিয়াছে। মোটের উপর মৃত চারুর প্রভাব জীবিত পরীর আকর্ষণকে অতিক্রম করিয়া জয়ী হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত চারু ও পরী উভয়েরই স্মৃতি বনমালীর স্থূল, নির্বিকার আত্ম-সর্বস্বতায় বিলীন হইয়াছে। দুই ভগ্নীর অনুসৃত উপায়ের পার্থক্য ও বনমালীর উপর ইহাদের বিভিন্ন প্রভাবের বর্ণনায় নিতান্ত অপ্রীতিকর ব্যাপারে উচ্চাঙ্গের মনস্তত্ত্ব-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়।

'শৈলজ শিলা' গল্পটি পরিণত-বয়স্ক নিঃসম্পর্ক অভিভাবকের তরুণী শিলার প্রতি অনিবার্য প্রণয়-সঞ্চারের কাহিনী। প্রৌঢ়ের এই অস্বাভাবিক প্রেমনিবেদনে তরুণীর হাসিখুশি এক বিষাদ-গম্ভীর মৌন ঔদাসীন্যে পরিবর্তিত হইয়াছে। অভিভাবকের ভাবান্তর নিম্নলিখিত বাক্যে চমৎকারভাবে বর্ণিত হইয়াছে—"বাৎসল্যের সিমেণ্ট দিয়া গাঁথা যৌবনের শক্ত-গারদ

ভাঙ্গিয়া চৌচির।" প্রেমের সনাতন, বিচার-বিবেকহীন, জৈব প্রেরণা সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য: "বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায় আমি যে আমার বিশাল, লোমশ বুকে দুই হাতের হাতুড়ি দিয়া কচি মেয়েটাকে ছেচিতে চাই, ইহার মধ্যে আমিও নাই, শিলাও নাই, আছে শুধু অনাদি, অনন্ত, শাশ্বত প্রেম,—পশু, পাখী, মানুষকে আশ্রয় করিয়াও যে প্রেম চিরকাল নিজের সমগ্রতা বজায় রাখিয়াছে।" 'খুকী' গল্পে এক সরল, ভাবাবেগহীন বালিকার নিকট প্রণয়-কলা-পক্ক যুবার আচরণের সমস্ত জটিল মারপেঁচ ও সূক্ষ্ম অভিনয়কৌশল কেমন করিয়া প্রতিহত হইয়াছে তাহারই বিবরণ। বালিকা কাদম্বিনীর নিকট যুবক সৌম্য নিজ অর্ধ-আন্তরিক আবেগের কথা জানাইয়াছে, ও তাহার মনে হতাশ-প্রণয়ক্লিষ্ট রোমান্সের নায়িকার অশান্ত ছটফটানি জাগাইতে চাহিয়াছে। কিন্তু কাদম্বিনীর সারল্য ও স্থূল অনুভূতির কঠিন বর্মে ঠেকিয়া এই সমস্ত তীক্ষ্ণ অস্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত সৌম্য কাদম্বিনীকে বিবাহ করিয়া তাহার সহজ বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। সৌম্যের প্রেমাভিনয়ের বিভিন্ন স্তরগুলি ও কাদম্বিনীর যথাযথ প্রতিক্রিয়া সমূহের বর্ণনায় লেখক উপভোগ্য মুন্সিয়ানা দেখাইয়াছেন। 'কবি ও ভাস্করের লড়াই'-এ লেখক যে প্রেমের দ্বন্দ্ব কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন তাহা আদর্শ ভাব লোকের উর্ধ্বাকাশেই বিচরণ করিয়াছে, ইহার মধ্যে বাস্তব-সংস্পর্শ অতি গৌণ।

প্রেম ছাড়া সাধারণ সংসার-যাত্রার জটিল ঘাত-প্রতিঘাত সম্বন্ধেও কয়েকটি উৎকৃষ্ট গল্প রচিত হইয়াছে। জীবনের বিশেষ অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের একটা সাধারণ, ভাসা-ভাসা-রকম জ্ঞান থাকে। লেখক এই সাধারণ অভিজ্ঞতার সূক্ষ্মতর স্তরগুলি, ভাবের জোয়ার-ভাঁটার নিখুঁত রেখা-চিত্রসমূহ উদ্ঘাটন করিয়াছেন। দীর্ঘদিন পরে প্রবাস হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তি পুরাতনের স্নেহাবেষ্টনে যে আনন্দ প্রত্যাশা করে, সেই প্রত্যাশার মধ্যে প্রায়ই মোহভঙ্গের একটা ছোট-খাট আঘাত জড়িত থাকে। 'আগন্তুক' ('অতসী মামী') ও 'প্রকৃতি' ('প্রাগৈতিহাসিক') এই দুইটি গল্পে এই পূর্বধারণার ঈষৎ-বেদনা-স্পৃষ্ট বিপর্যয়ের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। দীর্ঘপ্রবাসের পরে ঘরে ফিরিয়া মুকুল তাহার পরিবারবর্গের সানন্দ অভ্যর্থনার মধ্যে কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টভাব, স্বার্থপরতার মুখোস-ছেঁড়া অভিব্যক্তি অনুভব করিয়াছে। তাহার স্ত্রী পর্যন্ত পাখি-পড়ার মত প্রাণহীন, যান্ত্রিকভাবে তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছে। 'প্রকৃতি' গল্পের সমস্যা আরও একটু জটিল। বড়লোক হইতে গরীবে পরিণত অমৃত দশবৎসর পরে আবার ধন অর্জন করিয়া ও তাহার তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে একটু বাঁকাচোরা, বিকৃত মনোভাব লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়াছে। এই মনোভাবের প্রধান উপাদান—ধনীর প্রতি বদ্ধমূল বিরাগ ও দারিদ্র্যের প্রতি একপ্রকার ভাব-বিলাসমূলক সহানুভূতি, মধ্যবিত্তের প্রতি শ্রদ্ধা তাহার এই নব মনোভাবের মেরুদণ্ড। কিন্তু পরীক্ষা-ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, তাহার পূর্ব-হিতৈষী এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সহিত পুনর্মিলন তাহার মনে তৃপ্তির পরিবর্তে ক্ষোভই জাগাইল। এই পরিবারের পুরুষদের বিমূঢ়, অনুগ্রহ-প্রার্থী-সুলভ, কুণ্ঠিত ভাব, আয়োজনের অস্বাচ্ছন্দ্য ও অপরিচ্ছন্নতা, গৃহিণীর দারিদ্র্য-গোপনের সংকুচিত প্রয়াস, বিবাহিতা মেয়ে সুনীতির শ্রীহীন আকৃতি ও অশোভন সাহায্য-যাচ্ঞা—সব মিলিয়া তাহার অন্তরকে বিমুখ করিয়া তুলিল। ছোটমেয়ে সুমতি—যাহাকে

সে বিবাহ করিবার কল্পনা করিতেছে সেও—এই গ্লানিকর পরিবেষ্টনে, তাহার কুমারী-জীবনের মাধুর্য হারাইয়া ফেলিল। এও একদিন সুনীতির মত হইবে এই সম্ভাবিত পরিবর্তনের পূর্বাভাস তাহার সমস্ত আগ্রহকে জুড়াইয়া দিল। "দারিদ্র্য যদি সুনীতির না সহিয়া থাকে, টাকা সুমতির সহিবে কেন?"—এই প্রশ্ন বারংবার তাহার চিত্তকে অঙ্কুশ-বিদ্ধ করিল। মোটর চাপা ভিক্ষুকের রক্তাক্তদেহ কর্তব্যবোধে সে নিজের মোটরে তুলিয়া লইল, কিন্তু তাহার স্বাভাবিক রুচির সৌকুমার্য এই অশুচি, ক্লেদাক্ত স্পর্শে শিহরিয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র এই উভয় সম্প্রদায় হইতে প্রতিহত হইয়া সে আবার নিজ আভিজাত্যের দুর্গে আশ্রয় লইল, ও আন্তরিকতাহীন ধনী সমাজের সহিত মৌখিক শিষ্টাচার-বিনিময় দ্বারা চিরাভ্যস্ত কৃত্রিম জীবনযাত্রার সূত্র পুনর্যোজনা করিল।

'ফাঁসি' ('প্রাগৈতিহাসিক') লেখকের আর একটি চমৎকার গল্প। ফাঁসির আসামী খালাস হইলে তাহার মনে যে এক বিভ্রান্তিকর আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তাহা আমরা সাধারণভাবে জানি। এই গল্পে অনুরূপ অবস্থাপন্ন ভদ্রবংশীয় ও শিক্ষিত গণপতির মানস বিপর্যয়ের স্তরগুলি খুব সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হইয়াছে। খালাসের দিনের সন্ধ্যায়, পরিবার বর্গের সহিত পুনর্মিলনের ক্ষণে তাহার মনোভাব নিছক মুক্তির উল্লাস বা প্রিয়জন মিলনের আনন্দ নহে—নানাবিধ সূক্ষ্ম ও জটিল প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি। কান্না,—"আনন্দে নয়, শ্রান্তিতে নয়, বিগলিত মানসিক ভাবপ্রবণতার জন্য নয়, সম্পূর্ণ অকারণে—একটা চিন্তাহীন, স্তব্ধ অন্যমনস্কতায়—", জীবনলাভের আনন্দ যে অন্যান্য তুচ্ছ আনন্দের সহিত তুলনায় অধিক বিশুদ্ধ বা প্রগাঢ় নয়, অনুভূতির রাজ্যে যে একপ্রকার গণতান্ত্রিক সাম্য আছে, উপলক্ষের গুরুত্বের সঙ্গে তাল রাখিয়া যে আবেগের তীব্রতা নিয়মিত হয় না এই সত্যের আবিষ্কার, মূর্ছা, আত্মসম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য নানারূপ আত্মপ্রতারণা, নির্জন কারাকক্ষের প্রতি অতর্কিত লুব্ধতা, স্ত্রী ও পরিবারের মনোভাবের সুস্পষ্ট, ভাবাবেশহীন চকিত উপলব্ধি—তাহার ফাঁসি হইলেই যে তাহার পরিবারবর্গ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিত এই গ্লানিকর সত্য সম্বন্ধে সচেতনতা—এতগুলি বিপরীত ভাবের সংঘাত তাহার বাহিরের শান্ত স্তব্ধতার আড়ালে কোলাহল জমাইয়াছে ও মুক্তির আনন্দের মূল সুরের সহিত নানা বিরোধী সুরের সূক্ষ্ম মীড় মূর্ছনা জুড়িয়া দিয়াছে। এই মিলন মধুর রাত্রিতে গণপতির স্ত্রী রমার উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা এই আনন্দের মগ্ন চৈতন্যে যে বিভীষিকার দুঃস্বপ্ন নিহিত ছিল তাহার বীভৎস ও অনাবৃত আত্মপ্রকাশ।

'মহাসঙ্গম'-এ ('অতসী মামী') পশুপতির অতিবার্ধক্যের শিথিল অসহায়তা, ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংকোচন ও অনুভূতির অসাড় অস্পষ্টতার চমৎকার ছবি আঁকা হইয়াছে। 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পে বৃষ্টির জলে জীর্ণ আশ্রয় ত্যাগ করিতে বাধ্য খঞ্জ ও বিকলাঙ্গ নীলমণির মানসিক অবস্থা—তাহার অভিমানভরা ক্রোধ, স্ত্রী ও কন্যার নীরব ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে তীব্র অস্বস্তি, ও বিধাতা ও মানুষ সকলের বিরুদ্ধে অসহায় আক্রোশ—সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। মজার কথা এই যে, অভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের পীড়নে পিষ্ট এই দরিদ্র, মৃতকল্প পরিবারের প্রত্যেকেরই, দুর্বলতরের উপর গায়ের ঝাল মিটাইবার একটা প্রবল প্রেরণা আছে। 'মমতা দি' ('সরীসৃপ') ও উহার শেষাংশ 'বৃহত্তর ও মহত্তর' ('অতসী মামী')

গল্প হিসাবে খুব উৎকৃষ্ট নহে; কিন্তু শেষ গল্পটিতে তীরের ন্যায় শাণিত, সংক্ষিপ্ত উক্তি-পরম্পরার ভিতর দিয়া লেখক ভাষা ও যুক্তিতর্কের উপর যে অসাধারণ অধিকার দেখাইয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। পারিবারিক জীবন বর্জন করিয়া দেশের কাজে আত্মনিয়োগের জন্য নারীর যে দাবী সাধারণতঃ সংবাদপত্রে ও রাজনৈতিক বক্তৃতায় শিথিল, ভাবার্দ্র, চিন্তা-সংগতিহীন যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয়, লেখক সেই অতি-সাধারণ বিতর্কটিকে মানস পরিণতির অনেক উচ্চতর স্তরে উন্নীত করিয়াছেন। এই গল্পটির মধ্যে আমরা লেখকের কেবল ঔপন্যাসিক উৎকর্ষ ছাড়া মানস প্রসার ও চিন্তাশীলতারও নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাই।

'ভেজাল' (১৯৪৪) ছোট-গল্প-সংগ্রহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আধুনিক। এই গ্রন্থে সৃষ্টির নবীনতা হয়ত কিয়ৎ পরিমাণে ম্লান হইয়াছে, কিন্তু সমালোচনার তীক্ষ্ণ সচেতনতা এই ত্রুটি পূরণ করিয়াছে। ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ ইহার ভূমিকা। এই ভূমিকায় 'প্রকাশকের নিবেদন' নিবন্ধে মানিকবাবুর বৈশিষ্ট্যের যে চমৎকার বিশ্লেষণ আছে তাহা ভাবের সূক্ষ্মদর্শিতা ও ভাষার শাণিত দীপ্তিতে অতুলনীয়। মনে হয় যে, প্রকাশকের নিবেদনের অন্তরালে লেখক তাঁহার দোলায়মান-চিত্ত, সন্দেহাকুল পাঠকবর্গের নিকট আত্মপরিচয় দাখিল করিয়াছেন। বিশ্লেষণের যাথার্থ্য ও গভীরতা ও ভাষার তীক্ষ্ণাগ্র, অর্থগূঢ় সংক্ষিপ্তি লেখকের নিজ রচনার সহিত অভিন্ন ঠেকে। সে যাহা হউক, লেখক এই পরিচয়ের দ্বারা সমালোচকের কার্য যে অনেকটা অনাবশ্যক করিয়া দিয়াছেন তাহা জোর করিয়া বলা যায়। সমালোচকের যে কর্তব্যটুকু অবশিষ্ট রহিল তাহা এই রচনায় উদ্ঘাটিত মূলসূত্রটির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ-সাফল্যের নির্ধারণ।

সাহিত্যে যে বাঁ চোখের নজরের একটা বিশেষ সার্থকতা আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না; এবং এই বাম নয়নের দৃষ্টি যে এতাবৎকাল সাহিত্যে বিশেষ কার্যকরী হয় নাই তাহাও স্বীকারে বাধা নাই। কিন্তু সাহিত্যের কাজ সত্যরূপের স্ফুরণ। দক্ষিণ ও বাম উভয় চক্ষু হইতে বিস্ফুরিত, মিলিত রশ্মিরেখা-সমষ্টির সাহায্যেই বিষয়ের সত্য সমগ্ররূপ উদ্ভাসিত হয়—দুয়ের মধ্যে কেহই উপেক্ষণীয় নহে। আসল প্রশ্ন এই যে, এই তির্যক দৃষ্টির অতিপ্রয়োগে সৃষ্টির ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কি না। জীবনের বিকৃতিগুলি যদি জীবনের সমগ্র রূপ-পরিবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট প্রভাবশালী না হয়, তবে তাহাদিগকে মনের গোপন, অবচেতন স্তর হইতে টানিয়া বাহির করার মজুরি পোষায় না। ঘরের সিঁড়ির বিশেষ খবর লইবার সার্থকতা সেইখানে যেখানে সিঁড়ির জঞ্জাল-স্তূপ ও অবাঞ্ছিত পদক্ষেপ সমস্ত ঘরের উপর সূক্ষ্মভাবে একটা ধূলি-মলিন শ্রীহীনতার বায়ু-স্তর বিস্তার করে। যেখানে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই সেখানে সাহিত্যের কুলায় ধুলা ওড়ান কেবল নাসিকার পীড়া উৎপাদন করে, উচ্চতর আনন্দের হেতু হয় না। এতাবৎকাল সাহিত্য-সৃষ্টিতে দক্ষিণ চক্ষুর অবদান অতিপ্রাধান্য লাভ করিয়াছে বলিয়া এখন বামচক্ষুর আবিষ্কারের উপর অত্যধিক জোর দেওয়া প্রতিক্রিয়া ও বৈচিত্র্যের দিক্ দিয়া সমর্থনীয়, এমন কি আকর্ষণীয় হইতে পারে, কিন্তু ইহার ফল অভিনব একদেশদর্শিতা। যদি সত্যই না পাওয়া গেল, তবে সৌন্দর্য বলি দিবার ক্ষতিপূরণ কোথায়?

গল্প-সংগ্রহের প্রথম গল্প 'ভয়ঙ্কর' মানবমনের এক নূতন রকমের প্রতিক্রিয়া উদ্ঘাটিত করিয়াছে। ভয়াবহ ও বীভৎস অভিজ্ঞতার চাপে এক দুর্বলচিত্ত, পরমুখাপেক্ষী ব্যক্তির মোহ টুটিয়া তাহার মধ্যে কেমন করিয়া অকুণ্ঠিত আত্মনির্ভর ও দৃঢ় উদ্দেশ্যের উদ্ভব হইয়াছে

গল্পটিতে, সেই চমকপ্রদ আবিষ্কারের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। "মনটা প্রসাদের আশ্চর্য্য রূপ সাফ মনে হয়। ঝড় সাফ করে দিয়েছে মৃত্যুভয়, ভূষণ সাফ করে দিয়েছে মানুষের ভয়, আশা সাফ করে দিয়েছে মাছির মত অন্যের চট্‌চটে ঘন কামনায় আটকা পড়ার ভয়।" এই পরিবর্তনের বিস্ময়করত্বের ভিতর দিয়া মানবজীবনের এক নিগূঢ় সত্যের আভাস অনুভব করা যায়—কাজেই এই গল্পটি সার্থক শিল্পসৃষ্টি। 'রোমান্স', 'ধনজনযৌবন' ও 'মুখে ভাত' এই তিনটি গল্পে ব্যভিচারের আবেগপ্রধান, রঙ্গিন আদর্শবাদের দিকটার পরিবর্তে ইহার স্থূল, বাস্তব প্রেরণার দিক্‌টার উপরই লক্ষ্যকে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে। প্রথম গল্পে সুখময়ীর উৎকট, নির্লজ্জ লালসা ও সুবলের ভাবলেশহীন, ইতর সুবিধাবাদ উভয়ে মিলিয়া যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা যেমন কুৎসিত তেমনি সত্যানুগামী। দ্বিতীয় গল্পে নির্মলেন্দুর খামখেয়ালি রুচি ও প্রবৃত্তি পশুবল-প্রণোদিত ধর্ষণের মধ্য দিয়া নিজ ক্ষণিক পরিতৃপ্তির অস্বস্তিকর উপায় আবিষ্কার করিয়াছে—সুমতির শান্ত, প্রসন্ন আত্মসমর্পণ ও রাঘবের নিষ্ফল আত্মগ্লানি উভয়েই ইহার হাস্যকর অসংগতি ও বীভৎসতার দিক্‌টা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। নির্মলেন্দুর অশেষবিধ যথেচ্ছাচারের মধ্যে পিস্তল হাতে অভিসার-যাত্রা আর একটা নূতন খেয়াল মাত্র। তাহার চরিত্রের বিকারগুলি দেখান হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের মৌলিক প্রেরণাটি অনাবিষ্কৃতই রহিয়াছে। তৃতীয় গল্পে রাঁধুনি বামুনের সহিত বাড়ির মেয়ের অবৈধ সংসর্গের ফলে যে পুত্র জন্মিয়াছে, তাহারই অন্নপ্রাশন উপলক্ষে পাচকের ব্যর্থ কামনার জ্বালা এক অদ্ভুত উপায়ে—ভোজ্যদ্রব্যে অতিরিক্ত লবণ-প্রক্ষেপের দ্বারা—আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এইরূপ আর একটা অদ্ভুত মনোবৃত্তি—বিবাহিতা সহচরীদের সহিত তুলনায় নিজ কুমারী-জীবনের প্রতি তিক্ত ব্যর্থতা-বোধ—আভিজাত্য-গর্বিতা বেলারাণীকে পাচক ব্রাহ্মণের শয্যাসঙ্গিনী হইবার প্রেরণা যোগাইয়াছে। এইভাবে এক গ্লানিকর, হৃদয়সম্পর্কহীন দৈহিক মিলনের দুইটি অসাধারণ প্রতিক্রিয়ার উপর এক এক ঝলক আলোকপাত হইয়াছে।

'মেয়ে' ও 'দিশেহারা হরিণী' গল্প দুইটিতে রস বেশ জমাট বাঁধে নাই। প্রথমটিতে বাপ ও মেয়ের সম্পর্ক-বৈশিষ্ট্যটি ভাল করিয়া ফুটে নাই—মেয়েব সেবা-শুশ্রূষা ও বাপেব শুভানুধ্যায়ী স্নেহের পিছনে কোমলতার পরিবর্তে এক প্রচ্ছন্ন জবরদস্তি ও একগুঁয়েমির ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। আবার স্বামীর সেবার ভার মেয়ের উপর ছাড়িয়া দেওয়ার মধ্যেও স্ত্রীর দাম্পত্য বিরাগ ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন ইঙ্গিতগুলি উদ্দেশ্যের সূত্রগ্রথিত হইয়া সুসংবদ্ধরূপ গ্রহণ করে নাই। দ্বিতীয়টি উদ্ভট ও অসংলগ্ন—পার্টি-হিতৈষণার চোরা-গলিতে প্রেমের কাণা-মাছি খেলার কাহিনী। ইহার আকস্মিকতা আর্টের সংগতি লাভ করে নাই। 'মৃতজনে দেহ প্রাণ' ও 'যে বাঁচায়' এই দুইটি গল্পে অপ্রত্যাশিত পরিণতি বক্রকুটিল ব্যঙ্গের (irony) বাহন হইয়াছে। প্রথম গল্পে কুলটা স্ত্রী ও তাহার প্রেমিকের গৃহে আশ্রয়গ্রহণকারী মৃত্যু-পথযাত্রী স্বামী কেবলমাত্র অপরাধী যুগলের পারিবারিক শান্তি বিধ্বস্ত করার ক্রূর আনন্দেই মৃত্যুকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। দ্বিতীয়টিতে দুর্ভিক্ষ, পীড়িতদের রক্ষাতৎপর, আত্মগৌরব-স্ফীত দানশীলতা হঠাৎ মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া নিজ প্রসারিত হস্তকে ফিরাইয়া আনিয়াছে। 'বিলাসসন', 'বাস' ও 'স্বামী-স্ত্রী' গল্পগুলিতে ব্যঙ্গাত্মক বিকৃতি উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা সেরূপ প্রকট নহে। অত্যাচারী সাহেব ম্যানেজারের ব্যক্তিত্ব ও তৎ-কন্যার

মদির কটাক্ষের নিকট ভালোমানুষ গ্রাম্য জমিদারের নিরুপায়, বিহ্বল নিষ্ক্রিয়তা; শহর ও মহকুমার মধ্যে যাতায়াতশীল বাসের মাঝ রাস্তায় থামিবার আড্ডা একটি ছোট পল্লীর জীবনে বাস পৌঁছাইবার পূর্বক্ষণে এক প্রতীক্ষা-চঞ্চল, আশা-আশঙ্কায় দোলায়িত উত্তেজনার সঞ্চার, বাসের গতিবেগ হইতে আহরিত একটি মৃদু ঘূর্ণাবর্তের স্বজন; আকস্মিক অতিথি-সমাগমে বাধাপ্রাপ্ত দাম্পত্য মিলনের আত্মচরিতার্থতার নূতন উপায় উদ্ভাবন—এই বিষয়বস্তু-সমূহের মধ্যে বক্র দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রচ্ছন্ন বিকারের ব্যঞ্জনা অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই গল্পসংগ্রহে কয়েকটি গল্প মানিকবাবুর অভ্যস্ত রচনারীতির সুন্দর উদাহরণ হইলেও, মোটের উপর সমস্ত গ্রন্থটিতে অগ্রগতির অসন্দিগ্ধ প্রমাণ আবিষ্কার করা কঠিন। ছোটগল্প ও উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে নানামুখী বৈচিত্র্য ও আশ্চর্য মৌলিকতা দেখাইয়াছেন তাহাই তাঁহার উদ্ভট অবাস্তবতা ও যৌনবিষয়ের প্রতি অতি-পক্ষপাত সত্ত্বেও তাঁহাকে আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী করিয়াছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

বাস্তব-প্রধান যুগে রোমান্সের প্রতি অনুরাগ অল্পসংখ্যক লেখকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে ঐতিহাসিক রোমান্সের সিংহদ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উপন্যাসে যে রোমান্স প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা প্রধানতঃ কাব্যধর্মী, প্রকৃতির রহস্যানুভব-মূলক। রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ধারাই আধুনিক লেখকেরা অনুসরণ করিয়াছেন—কেহ কেহ ঐতিহাসিকতার অব্যবহৃত রুদ্ধ দ্বারের চাবী খুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই লেখকদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মানিত স্থান অধিকার করেন।

তারাশঙ্করের ছোট গল্পের সমষ্টি—'জলসাঘর' (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭), 'রসকলি' (এপ্রিল, ১৯৩৮) ও 'হারানো সুর'—তাঁহার ক্রমবর্ধমান শক্তির সুন্দর পরিচয় স্থল। এই ছোট গল্প-গুলিতে এখন পর্যন্ত সাহিত্য-ক্ষেত্রে উপেক্ষিত রাঢ় দেশের জীবনযাত্রাধারার কয়েকটি ক্ষুদ্র শাখাচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। 'জলসাঘর' গল্পটির দুই খণ্ডে এক অভিজাত বংশের মধ্যাহ্ন-গৌরব ও সায়াহ্ন-ম্লানিমা পাশাপাশি প্রদর্শিত হইয়াছে। আমাদের সামাজিক ইতিহাস-লেখক ও ঔপন্যাসিকগণ একটা কথা বিশেষ স্মরণ রাখেন না যে, মধ্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া গত দুই-তিন শতাব্দী জমিদারবংশই প্রদেশের প্রাণশক্তির কেন্দ্রস্থল ও আধার ছিল। এই কার্যতঃ স্বাধীন, অপ্রতিহত-প্রভাব ভূস্বামিকূলের আদর্শ-আকাঙ্ক্ষা, বিলাস-ব্যসন, অত্যাচার, আশ্রিতবাৎসল্য, সৌন্দর্য-রুচি ও গুণগ্রাহিতাকে কেন্দ্র করিয়াই জাতীয় জীবনযাত্রা আবর্তিত হইয়াছে। গত দুই-তিন শত বৎসরের দেশকে বুঝিতে হইলে এই জমিদারদিগকে বুঝিতে হইবে—তাহাদেরই কেন্দ্র-বিকীরিত শক্তি দেশের প্রান্ত-দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। জন-সাধারণের বিশেষ কোন আত্ম-স্বাতন্ত্র্য বা আত্ম-নির্ধারণ-শক্তি ছিল না—জমিদারের প্রভাবই তাহাদের প্রাণস্পন্দনের গতিবেগ ও ক্রিয়াশীলতার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া দিত। দেশের মধ্যে যে দুর্ধর্ষ, নিয়ম-শৃঙ্খলার পরিপন্থী বিদ্রোহ শক্তি ছড়ান ছিল, তাহা জমিদারের অত্যাচারের দ্বারাই উত্তেজিত হইয়া ঐক্য ও সংহতি লাভ করিত। জমিদারের দানশীলতা নদী-প্রবাহের ন্যায় দুই ধারে শ্যামলতা বিস্তার করিত। তাহার দৃপ্ত পৌরুষ জাতির দুঃসাহসিকতাকে আত্মপ্রকাশের অবসর দিত, তাহার অত্যাচারের বজ্রপাত প্রজার প্রতিকার-শক্তিকে উদ্‌বোধিত ও সংঘবদ্ধ করিত, তাহার ক্রম-প্রসারিত দাবী-দাওয়া জনসাধারণের বৈষয়িক বুদ্ধি ও স্বভাব-সিদ্ধ চতুরতাকে তীক্ষ্ণতর করিয়া তুলিত। সুতরাং জাতির মুখপাত্র ও নেতা হিসাবে এই অভিজাতবর্গের সাহিত্যে ও ইতিহাসে স্থান আছে। কিন্তু সাহিত্য এই শ্রেণীর প্রতি বিশেষ সুবিচার করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। একজন তরুণ ঔপন্যাসিক-প্রমথনাথ বিশী—'জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার' নামক উপন্যাসে এই নেতৃশক্তির পরিচয়

দিয়াছেন। আর তারাশঙ্কর দুইটি স্বল্প-পরিসর গল্পে ও কয়েকখানি উপন্যাসে ইহার দূরপ্রসারী প্রভাবের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

'রায়বাড়ী' গল্পে রাবণেশ্বর রায়ের দৃপ্ত শৌর্য, ভোগ-লিপ্সার মধ্যে অটল ভগবদ্‌ভক্তি, শোকে অবিচলিত ধৈর্য, দানে মুক্তহস্ততা ও বৈর-নির্যাতনে অনমনীয় দৃঢ়-সংকল্প—এই সমস্ত দোষ-গুণ মিলিয়া তাঁহার চরিত্রকে রাজোচিত বিশালতা দিয়াছে। অল্প কয়েকটি রেখাপাতে ও ক্ষুদ্র দুই একটি ইঙ্গিতের দ্বারা একটা বিরাট ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তোলা কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে। তবে এই চরিত্রাঙ্কনে একটা ত্রুটি লক্ষিত হয়। প্রজাদের যে দারুণ বিশ্বাসঘাতকতার দারুণতর শাস্তি দিতে গিয়া রাবণেশ্বরের জীবনে দৈবের অভিশাপ অতর্কিত বজ্রপাতের ন্যায় নামিয়া আসিল, গল্পের মধ্যে তাহার কোন পূর্বসূচনা দেওয়া হয় নাই। জমিদারের ভীম-কান্ত গুণ যে প্রতিবেশ-প্রভাবের ফল তাহার কোনই ইঙ্গিত মিলে না। লেখক বাঘ আঁকিয়াছেন, কিন্তু বাঘের স্বাভাবিক বিচরণভূমি সুন্দরবনের আরণ্য ভীষণতার উপর এক ঝলক আলোক-পাত করেন নাই। রাবণেশ্বরের প্রতিহিংসাও কাপুরুষোচিত—তাঁহার উদার, তেজঃপূর্ণ পৌরুষের সহিত ইহার কোন সংগতি নাই। প্রজা-শাসনে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত কালী বাগ্দীর নিঃশব্দ, অন্ধকার-লুপ্ত সক্রিয়তার রহস্যটি তুলির একটি স্বচ্ছন্দ টানেই আশ্চর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে —"নাট-মন্দিরের থামের সুদীর্ঘ-ছায়া যেন কায়া গ্রহণ করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।"

দ্বিতীয় গল্প 'জলসাঘর'-এ ঐশ্বর্যের এই সগর্ব আড়ম্বর, এই উচ্ছ্বসিত প্রাণ-শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয় পাইয়া নির্বাণের শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আত্মীয়-স্বজন, অর্থী-প্রত্যর্থী, দাস-পরিজনের কর্ম-মুখরতা পারাবত-গুঞ্জনের করুণ নিঃসঙ্গতায় পর্যবসিত হইয়াছে। বহিঃপ্রকাশ-রুদ্ধ আভিজাত্যাভিমান এখন ক্ষুব্ধ, বেদনা-বিদ্ধ আত্ম-মর্যাদাজ্ঞানে রূপান্তরিত হইয়া অন্ধকার, নিঃসঙ্গ গৃহকোণে আত্মগোপন করিয়াছে। অফুরন্ত প্রাণ-প্রবাহ শীর্ণ ও সংকুচিত হইয়া পূর্ব-গৌরবের লুপ্তাবশেষ একটি হাতীর ও একটি ঘোড়ার প্রতি করুণ স্নেহাতিশয্যে সীমাবদ্ধ হইয়াছে। দুই একটি পুরাতন ভৃত্য ও কর্মচারীর অপরিবর্তিত সম্ভ্রম ও সেবাযত্ন ভগ্নস্তূপের উপর শেষ সূর্যাস্তরেখার ন্যায় তাহার করুণ অসহায়তাটিকে আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছে। নূতন ধনী বংশের সবিদ্রূপ প্রতিযোগিতা ও ছদ্ম-সমবেদনার স্পর্ধিত অপমান লাঞ্ছনার কণ্টক-শয্যা বিছাইয়া দারিদ্র্য-দুঃখকে আরও অসহনীয় করিয়াছে। শেষে একদিন এই প্রতিযোগিতার আহ্বানের রন্ধ্রপথ দিয়া সুদূর অতীতে নিমজ্জিত, বিগত যৌবনের বিলাস-বিভ্রমের স্মৃতি এক সঙ্গীত-সুরা-বিক্ষুব্ধ, বিহ্বল বসন্ত-রজনীতে নূতন জীবনে জাগিয়া উঠিয়াছে। এই আকস্মিক দীপ্তি নির্বাণোন্মুখ দীপের স্বল্পাবশেষ জীবনীশক্তিকে একেবারে নিঃশেষ করিয়াছে; স্মৃতিজর্জর বিশ্বম্ভর রায় যৌবনের ফেনিলোচ্ছল সুরা আকণ্ঠ পান করিয়া মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। সমস্ত গল্পটির উপর সন্ধ্যার ম্লান ছায়া, উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবনের গাঢ় বিষাদ সঞ্চারিত হইয়াছে। 'জলসাঘর'-এ সাড়ম্বর ঐশ্বর্যবিলাসের মধ্যে নিয়তির অলঙ্ঘনীয় অভিশাপের গূঢ়-ব্যঞ্জনা চমৎকারভাবে সংক্রামিত হইয়াছে।

জমিদার-জীবনের আরও কয়েকটা বিচিত্র দিক্ 'হারানো সুর' গ্রন্থের 'পুত্রেষ্টি', 'সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার' ও 'ব্যাঘ্রচর্ম' গল্পগুলিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রথম গল্পটিতে নিঃসন্তান জমিদার সন্তান-লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় মস্তিষ্ক-বিকৃতির প্রান্তদেশে পৌঁছিয়াছে—ইহার সহিত

ধর্মোন্মাদ যুক্ত হইয়া তাহার প্রকৃতি-বিপর্যয়কে আরও ঘনীভূত করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর আর্ত, মর্মচ্ছেদী চীৎকারে পরের ছেলে বলি দিতে উদ্যত মেজবাবুর ধর্মান্ধতার নেশা টুটিয়াছে। দ্বিতীয় গল্পটিতে নিঃস্ব, উপাধি-মাত্র-সর্বস্ব জমিদারের লুপ্ত সম্ভ্রম-প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার প্রাণান্ত চেষ্টা যুগপৎ করুণ ও হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছে। ঢোঁড়া সাপের গোখুরার অভিনয় করার মত এই প্রচেষ্টা একাধারে হাস্যকর ও মর্মান্তিক। শেষ পর্যন্ত প্রজাদের অবাধ্যতা, নিজ পরিবারের বিরোধিতা, ধনী অংশীদারের অবজ্ঞা-মিশ্রিত অনুকম্পা, এমন কি নিজ পেয়াদার পর্যন্ত বিরক্তিপূর্ণ অসহযোগ এই আত্মপ্রতারণার স্বপ্নকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছে। জমিদার আদায়-তহসিলের ভার অন্যের উপর ন্যস্ত করিয়া কাশীবাসী হইয়াছে। তৃতীয় গল্পে ভীমকায় রতন বাগ্দী নিজ দুর্দান্ত প্রকৃতির মিথ্যা আস্ফালনের দ্বারা গ্রামবাসীদের মনে বিভীষিকা সঞ্চার করিয়া ও জমিদার সরকারের চাকরি যোগাড় করিয়া স্বচ্ছন্দ জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। যেদিন তাহার উপর সত্যিকার দুঃসাহসিক, নৃশংস কাযের ভার অর্পিত হইয়াছে, সেইদিনই তাহার বড়াইএর শূন্যগর্ভতা ধরা পড়িয়াছে। রতনের মুখর আত্মপ্রচারের সহিত 'রায়বাড়ী' গল্পের কালী বাগ্দীর নীরব, অথচ ভয়াবহ আজ্ঞানুবর্তিতা তুলনীয়।

'কুলীনের মেয়ে' গল্পে রাঢ়দেশস্থ ব্রাহ্মণ-পরিবাব-সংস্থানের একটি শোচনীয় বৈশিষ্ট্যের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এখানেও জমিদার-বংশের অধিষ্ঠাত্রী ক্রূরা নিয়তিদেবী কুলীন-কন্যা তরুবালার মর্মান্তিক পরিণামের ক্ষেত্র রচনা করিয়াছেন। খেয়ালী, সংসারজ্ঞানহীন জমিদার পিতার অদূরদর্শিতা তরুবালাব অবাঞ্ছিত বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া তাহার জীবন-নাট্যে ট্র্যাজেডি-অভিনয়ের সূত্রপাত করিয়াছে। তাহার বলিষ্ঠ, আত্মনির্ভরশীল প্রকৃতি সত্ত্বেও সে নিয়তির অনতিক্রম্য প্রভাবে ভ্রাতার সাংসারিক দুর্দশার অংশভাগিনী হইয়াছে। তারপর কঠোর দারিদ্র্য, আত্মসম্মানজ্ঞানের বিলোপ, চৌযবৃত্তিব কলঙ্কস্পর্শ, আত্মহত্যা—তাহার ক্রমা-বরোহণের স্তর নির্দেশ করিয়াছে।

বংশানুক্রমিক, অনর্জিত আধিপত্যের অস্থির-ভাব-কেন্দ্র উচ্চমঞ্চে আরূঢ় এই হতভাগ্যদের জীবনে যে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব অস্বাভাবিকরূপে তীব্র, তাহাদের রক্তমধ্যেই যে নানাবিধ বিকৃতি, অপ্রকৃতিস্থতা, উদ্ভট বাস্তববিমুখ খেয়ালের বীজ উপ্ত থাকে, প্রকৃতিদেবী যে গোড়া হইতেই তাহাদিগকে একপেশে ও উৎকেন্দ্রিক (eccentric) করিয়া সৃষ্টি করেন, তারাশঙ্করের জমিদার-বিষয়ক গল্প ও উপন্যাসগুলি এই সত্যটিকে চমৎকাবভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই অভিজাত-সম্প্রদায়ের চিত্রই বাংলা উপন্যাসে তাঁহার বিশিষ্ট অবদান।

'পদ্ম বউ' গল্পটিতে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামীর প্রতি ভক্তি ও অক্লান্ত স্বামি-সেবার মধ্যে সুপ্ত বিদ্রোহ অন্ধ-বিশ্বাসের অহিফেন নেশায় অসাড় হইয়াছিল। যেদিন এই বিশ্বাস ভাঙিল সেদিন তাহার এই বিদ্রোহ অগ্নিস্রাবের ন্যায় অসংবরণীয় জ্বালায় আত্মপ্রকাশ করিল। আবাব তাহার বিশ্বাস যে ভ্রান্ত নয় ইহা যখন প্রমাণিত হইয়াছে তখন সে সমস্ত বোঝা-পড়ার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে—ইহাই গল্পটির বিদ্রূপাত্মক সারাংশ। 'ডাক-হরকরা' গল্পটিতে দীনু ডোমের নিজের কর্তব্যের প্রতি একপ্রকার অগাধ আস্থা, প্রশ্ন-সন্দেহের অতীত ধর্মনিষ্ঠার ন্যায় মনোভাব ইহাকে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে। তাহার কর্তব্য-পরায়ণতা হিসাব-নিকাশ বা বুদ্ধি-বিবেচনার ব্যাপার নহে—ইহা একপ্রকার সহজাত সংস্কার। গল্পের প্রথমে শ্রাবণ-নিশীথে নির্জন পথে খদ্যোৎ

দীপ্তির সহিত অভিন্ন, ডাক-হরকরার লণ্ঠনের আলোক-বিন্দুর যেরূপ ব্যঞ্জনাপূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, গল্পটি ঠিক সেরূপ উঁচু সুরে বাঁধা নহে। দীনুর কর্মত্যাগ তাহার নিরুদ্দেশ পুত্রের প্রাপ্য স্নেহ-ঋণের পরিশোধ।

'হারানো সুর'-এর অন্তর্ভুক্ত 'চৌকিদার' গল্পটি নিম্নশ্রেণীর গ্রাম্য-সেবকের জীবনযাত্রা-চিত্রণের চেষ্টা। তবে 'ডাক-হরকরা'র ন্যায় চৌকিদারের জীবনে কোন কঠোর কর্তব্যসংঘাত বা আদর্শ নিষ্ঠার আলোড়ন সঞ্চারিত হয় নাই। নির্জন নিশীথ গ্রাম্য-পর্যটন তাহাকে কতকগুলি বিচিত্র অনুভূতির সহিত পরিচিত করিয়াছে মাত্র—সে সময় প্রাকৃত-অতিপ্রাকৃতের সীমা-রেখায় পদক্ষেপ করিয়াছে। মর্মান্তিক দাম্পত্য বিচ্ছেদ তাহার জীবনে একটা আকস্মিক পরিণতি; গল্পের মূল সুরের সহিত ইহা সম্পর্ক-বিহীন।

'মধু-মাষ্টার' গল্পে এক গ্রাম্য শিক্ষকের আত্ম-ভোলা প্রকৃতির ও অসাধারণ জ্ঞান-স্পৃহার ও তেজস্বিতার বিবরণ আছে। চিত্রটি বেশ সজীব; শেষের কয়েক পংক্তিতে তাহার বিধবা স্ত্রীর মুখে যে গভীর প্রেম-ব্যঞ্জক দুই একটি কথা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তাহার চরিত্রের একটা নূতন গৌরবময় দিক্ উদ্ভাসিত হইয়াছে। তারিণী মাঝি দীনু ডাক-হরকরার ন্যায় রাঢ়-দেশের নিম্নশ্রেণীর লোক—কিন্তু তাহার সহজ ভদ্রতা ও উচ্চবংশীয় স্ত্রী-পুরুষের সহিত সসম্ভ্রম হাস্য-পরিহাস তাহার নিরক্ষতার ত্রুটি সংশোধন করিয়াছে। তাহার কথাবার্তায় রাঢ়-দেশের টান ও দেশ-প্রচলিত প্রবাদ-বাক্যের ব্যবহার তাহার ভাষাতে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে। ময়ূরাক্ষীর বন্যার বর্ণনা বেশ চমৎকার হইয়াছে। স্ত্রী সুখীর প্রতি তাহার প্রেম আত্মরক্ষার ভীষণ প্রয়োজনে অন্তর্হিত হইয়াছে—যে প্রেমালিঙ্গন আমাদের শ্বাসরোধ করে, তাহার কবল হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রিয়াকে মৃত্যুমুখে ঠেলিয়া দিতেও আমাদের বাধে না। জীবনের সহিত প্রেমের বিরোধের এই বাস্তব দিক্‌টা মনস্তত্ত্বের এক কৌতূহলোদ্দীপক রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। 'রাখাল বাঁড়ুয্যে' গল্পে কৃপণ, অর্থলোভী, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণের অপরিমেয় নীচতা ও বিধবা হৈমর দৃপ্ত তেজস্বিতার বিপরীত চিত্র বড় উপভোগ্য হইয়াছে। উভয়ের চরিত্রই অল্প পরিসরের মধ্যে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই গল্প-সংগ্রহের প্রায় সমস্ত গল্পই উচ্চাঙ্গের উৎকর্ষ-মণ্ডিত হইযাছে।

'রসকলি' গল্পসংগ্রহেও অধিকাংশ গল্প বিষয়-বৈচিত্র্য ও ভাবের অকৃত্রিমতার জন্য প্রশংসনীয়। 'রসকলি' (ফেব্রুয়ারী, ১৩২৮) তাঁহার প্রথম গল্প হিসাবে পাঠকের কৌতূহল আকর্ষণ করে। ইহাতে বৈরাগী জীবনের সরস উচ্ছৃলতা ও প্রণয় ব্যাপারে স্বাধীনতা উজ্জ্বল-বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। মঞ্জরী ও গোপিনীর প্রণয়-প্রতিযোগিতা ও কথা-কাটাকাটি একটু অতিরিক্ত মাত্রায় খর হইলেও ইহা তাহাদের হৃদয়ের বেগবান্ ঘাত-প্রতিঘাতের যোগ্য বহিঃপ্রকাশ। শেষ পর্যন্ত মঞ্জরীর উদার আত্মত্যাগে পুলিন ও গোপিনীর দাম্পত্য সম্পর্ক গ্রন্থিমুক্ত হইয়াছে। এই প্রথম রচনাটি লেখকের শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দেয় ও ইহাতে লেখকের 'রাইকমল' উপন্যাসের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। 'শ্মশান-বৈরাগ্য' ও 'অগ্রদানী' দুইটি গল্প 'জলসাঘর'-এর 'রাখাল বাঁড়ুজ্যে' গল্পের সমজাতীয়। একটিতে সুদখোর মহাজনের চরিত্রের অদ্ভুত অসামঞ্জস্য, অপরটিতে লোভী, আত্মসম্মানবর্জিত অগ্রদানী ব্রাহ্মণের জীবনে অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাসের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। মৃত্যুর আবির্ভাব শুধু অর্থপিশাচ মহিম বাঁড়ুজ্যের নয়, প্রতিবেশী

সমস্ত স্ত্রী-পুরুষের অন্তরে যে ক্ষণস্থায়ী বৈরাগ্য জাগাইয়াছে, তাহার সহিত তাহাদের চিরাভ্যস্ত সংসারাসক্তির বৈপরীত্য এক কৌতুকাবহ অথচ মর্মস্পর্শী অসংগতির সৃষ্টি করিয়াছে। উদর-সর্বস্ব অগ্রদানী ব্রাহ্মণ যে রাজভোগের লালসায় নিজ পুত্র জমিদারকে সঁপিয়া দিয়াছিল অকাল-মৃত সেই পুত্রের শ্রাদ্ধে পিণ্ডভক্ষণে সেই সর্বগ্রাসী লোলুপতার নিবৃত্তি হইয়াছে। 'প্রতিমা' গল্পে প্রতিমা-নির্মাতা কুমারীশ মিস্ত্রীর নির্দোষ সৌন্দর্যোপাসনা ইতর-সন্দেহ-পরায়ণ পরিবার-বর্গের দ্বারা কুৎসিত-ব্যাখ্যা-বিকৃত হইয়া বাড়ির ছোট বউকে আত্মহত্যায় প্রণোদিত করিয়াছে। এই মূল ব্যাপারের সহিত, ছোটবউএর স্বামী অমূল্যের মাতাল অবস্থায় গোঁয়ার্তুমির বর্ণনা ঠিক খাপ খায় নাই। গল্পটির বিভিন্ন সূত্রগুলি সুগ্রথিত হয় নাই। 'তাসের ঘর' গল্পে অতিবঞ্চন-প্রবণা অথচ সরলহৃদয়া এক বধূর শাস্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে—বিষয়ের নূতনত্ব উপভোগ্য। 'মতিলাল' গল্পে গাজনের সংএর প্রধান নায়ক মতিলালের বীভৎস ছদ্মবেশ-ধারণের দ্বারা দর্শকবৃন্দের মনে বিভীষিকা-সঞ্চারে পটুতার কথা আলোচিত হইয়াছে। এই বাহাদুরীর বাড়াবাড়িতে একদিন তাহার ভাগ্যে পুরস্কারের পরিবর্তে প্রহার মিলিয়াছে। সেই প্রহারের তাডনায় তাহার সরল, আমোদপ্রিয় মনে নিজ কুৎসিত আকারের জন্য আত্মগ্লানির এক তীব্র উচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠিয়াছে। সরল, অনভিজ্ঞ গ্রামবাসীর মনে যে উচ্ছৃঙ্খল ব্যসন-বিলাস, জুয়াখেলার উন্মত্ত লোলুপতা সুপ্ত থাকে, তাহা মেলার উৎসবের উত্তেজনাপূর্ণ প্রতিবেশে বৎসরের মধ্যে কয়েক দিনের জন্য বীভৎসভাবে আত্মপ্রকাশ করে। লেখক 'জুয়ারী' গল্পে গ্রাম্যজীবনের এই মত্ত অসংযমের, ভাগ্যপরীক্ষার এই সর্বনাশী নেশার চমৎকার চিত্র আঁকিয়াছেন। মেলার উজ্জ্বল আলোক, গীতবাদ্যের সম্মোহন প্রভাব, বিচিত্র পণ্যসম্ভার, অগণিত জনসমাবেশ—চাষার ধূসর মনে রং ধরাইয়া দেয়। তাহার স্তিমিত রক্ত-ধারায় জোয়ারের উচ্ছ্বাস জাগে, কণ্ঠস্বর ও হাসি উচ্ছৃঙ্খলতার উচ্চগ্রামে পৌছায়। জীবন-ব্যাপী নিয়ম-সংযমের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে, শোভন-অশোভন, সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা বিলুপ্ত হয়, তাহার শিষ্ট-শান্ত জীবনযাত্রায় ঘূর্ণিবায়ুর দুরন্ত আবেগ সঞ্চারিত হয়—সুমিষ্ট, শীতল পানীয় এক মুহূর্তে সুরার ফেনিল আবিলতায় কলুষিত হইয়া উঠে। তারাশঙ্করের গল্পটিতে এই পরিবর্তনের সম্পূর্ণ চিত্র নাই বটে, তবে ইহার নিগূঢ় ইঙ্গিত নিহিত আছে।

'কালাপাহাড'-এ আমাদের কৌতূহল মনুষ্য ও পশুজগতের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া রসানু-ভূতিতে বাধা পাইয়াছে। শেষ পর্যন্ত রংলালের গৃহ-বিপ্লব গৌণ হইয়া কালাপাহাড়ের শোকোন্মত্ত তাণ্ডব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। 'মুসাফির-খানা'য় রেলস্টেশনের চঞ্চল খণ্ডচিত্র-গুলি খুব সজীব বটে, কিন্তু ইহারা কোন কেন্দ্রীভূত রসানুভূতির সহিত সংলগ্ন হয় নাই। এই বিচ্ছিন্ন দৃশ্যসমষ্টির মধ্যে বক্তার দাম্পত্য সমালোচনার তীব্র ঝাঁজ একটু বেসুরো ঠেকে। এই গল্পসংগ্রহের শ্রেষ্ঠ গল্প 'হুটু মোক্তারের সওয়াল'। হুটুর বক্তৃতার তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও চরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তা দুইই সমভাবে হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। শেষ পর্যন্ত আভিজাত্যমর্যাদার মোহের নিকট আত্মসমর্পণ ও দুঃস্থ আত্মীয়বর্গের প্রতি রূঢ় আচরণ তাহার চরিত্রে দুর্বলতার গোপন বীজটি উদ্ঘাটিত করিয়াছে। এই সুন্দর গল্পের মধ্যে যে নাটকীয় সম্ভাবনা ছিল তাহা লেখকের পরবর্তী নাটক 'দুইপুরুষ'-এ চরিতার্থ হইয়াছে।

ছোটগল্প-লেখক হিসাবে তারাশঙ্করের রচনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তীক্ষ্ণাগ্র সাংকেতিকতা, হৃদয়ের জটিল অরণ্যপথে বিচরণের স্বচ্ছন্দনৈপুণ্য বা সুবোধ ঘোষের অর্থগূঢ় প্রতিবেশ-রচনাকৌশলের অভাব। মনে হয় যে, ছোটগল্পের আঙ্গিকও তিনি সর্বত্র আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার অনেকগুলি ছোটগল্পে গঠন-শিথিলতা, দৃঢ়বদ্ধ সংহতির অভাবের উদাহরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। তথাপি তাঁহার রচনায় এমন একটা জীবনের রসোচ্ছলতা ও ভাব ও প্রকাশভঙ্গীর আন্তরিকতা বিদ্যমান যাহাতে আঙ্গিকের এই সমস্ত ত্রুটি ঢাকিয়া যায়। তিনি ততটা আর্টিষ্ট নহেন যতটা জীবনরসের রসিক। আর্টিষ্টের সদাজাগ্রত উদ্দেশ্যবোধ ও নিগূঢ়-কলা-কৌশল অপেক্ষা স্বচ্ছন্দ বিচরণের মধ্য দিয়া জীবনের সুগভীর রসোপলব্ধি, ইহার বৈচিত্র্যের স্বাদ-গ্রহণ, ইহার সহজ, সরল বিকাশগুলির প্রতি অকৃত্রিম আগ্রহেই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষের মূল নিহিত। দুর্ভেদ্য জটিলতার প্রতি মোহে তিনি রুগ্ন, ক্ষয়িষ্ণু মনোবিকারের দিকে আকৃষ্ট হন নাই; বিরল, বীভৎস ব্যতি-ক্রমের মধ্যে তিনি জীবনের তাৎপর্য খোঁজেন নাই। প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যো। ও সুবোধ ঘোষের সূক্ষ্ম কারু-কলার মধ্যে কিছু পরিমাণ সচেষ্টতা ও অস্বাভাবিকতার সন্ধান মিলে। তারাশঙ্করের অপেক্ষাকৃত ঋজু ও সরল রীতি—অন্ততঃ যেখানে তিনি রাজনীতির সুলভ উন্মাদনায় বিভ্রান্ত হন নাই—স্বাস্থ্য ও সহজ শান্তির পরিচয় বহন করে।

(২)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় উপন্যাসের মধ্যে অকৃত্রিমতা ও ভাষার ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শ্রমিকের যে অতৃপ্ত, অশান্ত বুভুক্ষা ও ক্ষুব্ধ বিদ্রোহোন্মুখতার চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে সত্যসত্যই প্রধূমিত বহ্নি-শিখার উত্তাপ ও দীপ্তি অনুভূত হয়। অন্যান্য লেখক শ্রমিকদের দুর্গতি বর্ণনা করিতে কেবল তথ্য-সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহাদের অবস্থা দৈন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছেন ও তাহাদের রিক্ত, ভাগ্য-বিড়ম্বিত জীবন-কাহিনীতে করুণ রস সঞ্চার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু তারাশঙ্করের ভাষার শুষ্ক কঠোর ভাব-ব্যঞ্জনা-শক্তি ইহাদের নাই, ভাষার এই সাংকেতিকতার সাহায্যে তিনি এক ধূসর, উদাস, মরুভূমির ন্যায় জ্বালাময়, ছায়ালেশহীন জীবন-প্রতিবেশ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

'নীলকণ্ঠ' (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩)—এক সচ্ছল অবস্থাপন্ন কৃষক-পরিবার দারিদ্র্যের দারুণ নিষ্পেষণে কিরূপ ছন্নছাড়া যাযাবর জীবন যাপনে বাধ্য হইয়াছে তাহার করুণ ইতিহাস। শ্রীমন্ত নিজ ভাগিনেয়ীকে অযোগ্যপাত্রে সম্প্রদান হইতে রক্ষা করিতে গিয়া একদিকে সর্বস্বান্ত হইয়াছে, অপরদিকে অসহ্য ক্রোধের বশে তাহার ভগ্নীপতির মাথায় লাঠি মারিয়া মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। স্নেহাতিশয্যের রন্ধ্রপথে তাহার জীবনে শনির প্রবেশ ঘটিয়াছে। অভাবের চাপে এই কৃষক-পরিবার আত্মসম্মান হারাইয়াছে—ঋণ ও প্রবঞ্চনা, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ও মিথ্যাভাষণের হীনতা তাহাদের জীবনকে কলঙ্কিত করিয়াছে। শ্রীমন্তের জেলের পর গিরির সমস্যা আরও নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার দৃঢ়সংকল্প ও স্বাধীনচিত্ততা দারিদ্র্যের সঙ্গে অবিশ্রাম যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়াছে। স্বামীর বন্ধু বিপিনের লালসা-ক্লিষ্ট হিতৈষণা সে প্রথম প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাহার অনশন ও আত্মহত্যার বৃথা চেষ্টার জ্বালাময় চিত্র লেখকের বর্ণনাশক্তির সুন্দর নিদর্শন। গত্যন্তর না দেখিয়া সে বিপিনের আগ্রহাতিশয্যের

নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহার ফলে গ্রামে যে কলঙ্ক-রটনা ও লাঞ্ছনার বান ডাকিয়াছে—তাহাতে গিরি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। শেষ পর্যন্ত গিরি এক দানবীয় জিঘাংসায় অনুপ্রাণিত হইয়া ঘরে দ্বারে আগুন দিয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছে ও নদীর জলে প্রাণ হারাইয়াছে। তাহার পিতৃপরিচয়হীন সন্তান নীলকণ্ঠ, মাতৃপরিত্যক্ত হইয়া গ্রামের লোকের অবজ্ঞামিশ্রিত অনুকম্পার সাহায্যে মানুষ হইয়াছে। এই অবস্থায় সদ্য-জেলমুক্ত শ্রীমন্তের সহিত তাহার মিলন ঘটিয়াছে ও পরস্পরের পরিচয় না জানিয়া উভয়ে একসঙ্গে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বাহির হইয়াছে। এই উপন্যাসে, অপরিপক্বতার অনেক লক্ষণ থাকিলেও, শ্রীমন্ত ও গিরির মনোজগতে সংঘটিত বিপর্যয়ের বিবরণ মনস্তত্ত্বজ্ঞান, লিপিকুশলতা ও দারিদ্র্যের প্রতি সত্যিকার সমবেদনার পরিচয় দেয়।

'রাইকমল' উপন্যাসে (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪) শক্তির পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অপ-প্রয়োগেরও নিদর্শন আছে। বাঙ্গালী সমাজে বৈষ্ণবের জীবনযাত্রা যেন রোমান্সের শেষ আশ্রয়স্থল। ইহার অসামাজিক স্বাধীনতার ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথ দিয়া হিন্দু সমাজের রুদ্ধঘরে দক্ষিণ-বায়ুর স্পর্শ কতকটা স্বাভাবিকভাবে অনুভূত হইতে পারে। বৈষ্ণবের স্বচ্ছন্দ প্রণয়লীলা, সংগীত প্রভৃতি ললিতকলায় অনুরাগ ও নৈপুণ্য, স্বভাবের উদারতা ও মাধুর্য ও কচিৎ মহাপ্রভুর ধর্মের অনুপ্রেরণায় সত্যকার চরিত্রগৌরব—হিন্দুর বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিকতার মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে স্বাতন্ত্র্যের হেতু হইয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যটুকু বাস্তবানুগ বলিয়া ঔপন্যাসিকের উপজীব্য হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু প্রয়োগ-ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক ঠিক মাত্রা রাখিতে পারেন না—সুর চড়াইয়া ও অতিরঞ্জিত বর্ণবিন্যাসের দ্বারা বিষয়কে বিকৃত ও অবিশ্বাস্যরূপে আদর্শায়িত (idealise) করিয়া ফেলেন। শরৎচন্দ্রের কমললতা ও তাহার আবাস-কুঞ্জ এই অসংযত আদর্শবাদের উদাহরণ। তারাশঙ্কর এখানে শরৎচন্দ্রেরই ধারা অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার রাইকমলের স্বপ্ন-বিভোর তন্ময়তা, তাহার প্রণয়াবেশের পার্থিব হইতে অপার্থিব স্তরে উন্নয়ন সাধারণ বৈষ্ণবের অনুভূতির অনেক ঊর্ধ্বে। ইহাকে বিশ্বাসযোগ্য করিতে হইলে যে বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন, লেখক তাহা দেন নাই। রসিক-দাসের সহিত রাইকমলের মালা-বদল ঘটনা হিসাবে অবিশ্বাস্য হইলেও, এই ব্যাপারে রসিকদাসের মানস প্রতিক্রিয়া সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আসক্তি ও বৈরাগ্য, পার্থিব ও ঐশ প্রেমের অবিরত অন্তর্দ্বন্দ্বে উভয়েই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে—যদিও আত্মগ্লানি রসিক-দাসেরই বেশি ও বন্ধনচ্ছেদের প্রথম প্রেরণা তাহার দিক্ হইতেই আসিয়াছে। উভয়ের হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত, আচরণ, কথোপকথন ও হাস্য-পরিহাস সমস্তই বৈষ্ণব পদাবলীর সুরে বাঁধা—পদের কলির খণ্ডাংশ তাহাদের কথাবার্তার মধ্যে সুরভি নিঃশ্বাসবায়ুর ন্যায় আসা-যাওয়া করিতেছে। তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে খেদ ও ক্ষোভের সহিত যে সূক্ষ্ম, সুকুমার সুষমা জড়িত আছে, তাহা সাধারণ বৈষ্ণবের অনধিগম্য। বৈষ্ণব-ধর্মের নিগূঢ় অধ্যাত্মসাধনার এই বিকাশ বাস্তব জীবনের প্রতিবেশে, সাধারণ স্তরের নর-নারীর চরিত্রে বিসদৃশ মনে হয়।

রঞ্জনের সহিত চির-প্রতীক্ষিত মিলনের পর কমলের জীবনে যে পরিণতি আসিল তাহা অধিকতর বাস্তবানুগামী। অবশ্য তাহাদের এই জীবন-যাত্রাকে বৈষ্ণব-ধর্মের রস-মাধুর্যে পূর্ণ করিয়া বৈষ্ণব উৎসবসমূহের ললিত ছন্দে ইহার গতি নিয়মিত করার কবিত্বপূর্ণ চেষ্টা লেখক

যথাসাধ্য করিয়াছেন। তথাপি ঝুলন-রাস-দোলের মধুস্মৃতি-সুরভিত প্রণয়োচ্ছ্বাসে অনিবার্যভাবে ভাটার টান আসিয়া পড়িয়াছে। শেষে কমলের প্রত্যাখ্যানে পরীর অভিশাপ ফলিয়া বাস্তব জগতে যে ন্যায়নীতির প্রাদুর্ভাব, তাহার মর্যাদা রক্ষা হইল। তাহার জীবনের এই শেষ অধ্যায় সম্পূর্ণরূপে বাস্তবধর্মী না হইলেও, বাস্তব অভিজ্ঞতার সীমা-বহির্ভূত নহে। গ্রন্থটির মধ্যে লেখকের লিপি-চাতুর্য ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতির পরিচয় থাকিলেও, উপন্যাস হিসাবে ইহা অপরিণত। কমলের প্রাণশক্তি আছে, কিন্তু ইহার ধারা নানা উদ্ভট, অকারণ খেয়ালের শাখাপথে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রধান ত্রুটি ভাবাবেগমত্ততা, বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া উচ্ছ্বাসের অপব্যয়, জীবনের সত্যকে অতিক্রম করিয়া ইহার কাল্পনিক কাব্য-সৌন্দর্যের প্রতি অসংযত প্রবণতা।

বৈষ্ণব জীবনের সত্য চিত্র হিসাবে শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায় চৌধুরীর 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী', ও 'সোমলতা' (১৯৩৮)—এই তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ উপন্যাসাবলী উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বৈরাগী-বৈরাগিনীরা বাস্তব সমাজ-জীবনের সহিত বেশ সুসম্বদ্ধ—অতিরিক্ত আদর্শ-বাদের দ্বারা স্ফীত ও বাষ্পায়িত হয় নাই। ইহারা অনেকটা উদাসীন, নীড় রচনায় ঐকান্তিক আগ্রহহীন; সমাজের সহিত সংস্রবও অনেকটা শিথিল। মনে সংস্কারহীন মুক্তির আনন্দ, মুখে গানের ফোয়ারা; সমাজের নৈতিক শাসন অপেক্ষা স্বাধীন খেয়ালের দ্বারাই ইহাদের জীবন অধিকতর নিয়ন্ত্রিত। সাধনায় আড়ম্বর নাই, বিধি-নিষেধের কঠোরতা নাই। তবে এই বৈষ্ণব সাধনা যে জীবনের উপর সত্যই প্রভাবশালী তাহা প্রমাণিত হয় চিত্তের নির্মল শান্তিতে ও পারিবারিক বন্ধনের মোহ-মুক্ত শিথিলতায়। রসময়, গৌরহরি ও ললিতার মধ্যে এই সহজ ও নির্লিপ্ত মনোভাব সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ললিতা ও রসময়ের সম্বন্ধের মধ্যে সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনের দাম্পত্য অধিকার-প্রতিষ্ঠার তীব্র অসহিষ্ণুতা একেবারেই নাই। ললিতার মন এমন সংস্কারমুক্ত যে, তারাপদর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াও তাহার কোন গ্লানি বা অশুচিতার স্পর্শ লাগে নাই। রসময়ও কোনদিন ললিতার উপর অসপত্ন অধিকারের দাবী রাখে নাই—দাম্পত্য বন্ধন তাহার নিকট মাকড়সার জালের মত ক্ষণভঙ্গুর। বিনোদিনীর সঙ্গে অবৈধ সম্বন্ধে জড়িত হইবার পর গৌরহরির মনে আত্মগ্লানি অপেক্ষা বিমূঢ়তাই জাগিয়াছে বেশি—তাহার নীতিবোধ অপেক্ষা রুচিই ইহার দ্বারা অধিক বিড়ম্বিত হইয়াছে। তাহার বিমুখতা আসিয়াছে বিনোদিনী তাহার কৈশোর কল্পনার দাবী মিটাইতে পারে নাই বলিয়া, সে যে অপরের বিবাহিত পত্নী সে জন্য নহে। এই নৈতিকতার প্রভাবমুক্ত ও সাংসারিক আসক্তির দ্বারা অশৃঙ্খলিত মনের স্বচ্ছন্দ গতি বাউল জীবনের বিশেষত্ব। এই চরিত্রগত বিশেষত্ব ও বৈষ্ণব সমাজের ইতর জনসাধারণের মধ্যে স্থূল, অমার্জিত রসিকতা ও মেলা-মেশার নিঃসংকোচ স্বাধীনতা এই উপন্যাসগুলিতে বেশ সরসভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আরও একটা কারণে বৈষ্ণব সমাজ ঔপন্যাসিকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। কেবল মাত্র এই সমাজেই নরনারীর অবাধ মিলনের ও স্বাধীন ইচ্ছা অনুবর্তনের ফলে প্রাক্-বিবাহ পূর্বরাগ স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত হইতে পারে।

এই কয়েকটি বৈরাগী নর-নারীর জীবনের সহিত বিনোদিনী ও হারাণের জীবনযাত্রা জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। এই কৃষক-পরিবারের দাম্পত্য সংঘর্ষ, তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্ম-

প্রতিষ্ঠার সংকল্প, ঘরসংসার পাতিবার প্রবল ইচ্ছা ও সমাজ-শাসনের নিকট অসহায় অবনতি বৈরাগীর আলগা, উড়ুউড়ু, অর্ধ-যাযাবর জীবনের সম্পূর্ণ বিপরীত। ওখানে যেমন পাখা মেলিবার আগ্রহ, এখানে তেমনি সহস্র-শিকড়-জালে মাটিকে আঁকড়াইয়া ধরিবার ব্যাকুলতা। ইহাদের চরিত্রে অস্বাভাবিক গভীরতা নাই, আছে হিল্লোলিত, সহজ প্রাণপ্রবাহ। হারাণের সরল, উত্তেজনাপ্রবণ, রুক্ষ পারুষ্যের আড়ালে অসহায়, স্নেহাতুর প্রকৃতিটি বেশ সজীব হইয়াছে। বিনোদিনীর চরিত্র অপেক্ষাকৃত জটিল। পূর্ব-প্রেমের স্মৃতি হারাণের প্রতি তাহার মনোভাবকে অস্পষ্ট ও সংশয়জড়িত করিয়াছে। স্বামীর সহিত নিত্য কলহ-বিরোধের সঙ্গে তাহার বলিষ্ঠ প্রকৃতির উপর একান্ত নির্ভর ও গৃহস্থালীর প্রতি মায়া অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া গিয়াছে। একদিকে গৌরহরি, আর একদিকে তারাপদ তাহার এই দোদুল মনে স্পর্শ দিয়া তাহাকে আরও উন্মনা করিয়া তুলিয়াছে। স্বামী-গৃহত্যাগের পর ললিতার আখড়াতে তাহার জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। তাহার মনের তলদেশে দুর্জয় অভিমান ও প্রকাশবিমুখ আত্মনিরোধের পাষাণ-ভার প্রচ্ছন্ন আছে—কিন্তু তথাপি রসময়, ললিতা, তাম্রকূটভক্ত স্কুল-পলাতক দুইজন ছাত্র ও সাময়িকভাবে অভ্যাগত তারাপদ এই সকলে মিলিয়া যে হাস্য-পরিহাসমুখর, প্রীতিস্নিগ্ধ আবেষ্টন রচনা করিয়াছে সে তাহার সহিত বেশ সহজভাবে মিশিয়া গিয়াছে। গৃহস্থ রমণী আখড়ার ভারমুক্ত আবহাওয়ায় তাহার সাংসারিক দুশ্চিন্তাকে লঘু করিয়া ফেলিয়াছে।

'সোমলতা'য় পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর বিনোদিনীর সমস্যা চরম জটিলতার স্তরে পৌঁছিয়াছে। এই বিচারালয়ের মত ক্ষমাহীন, বিরুদ্ধভাবাপন্ন আবেষ্টনে তাহার প্রকৃতি আরও সংকুচিত হইয়া মূক যান্ত্রিকতার লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে। ইহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ গৌরহরির প্রতি তাহার আকর্ষণ অসংবরণীয় হইয়া পড়িয়াছে। সে নির্লজ্জভাবে গৌরহরির অনুসরণ করিয়াছে, তাহার হতবুদ্ধি, বিপন্ন ভাবে হিংস্র, উন্মত্ত ক্রোধে ফাটিয়া পড়িয়াছে, সে গৌরহরির বিবাহের সম্ভাবনায় ঈর্ষ্যা ও বিদ্রূপে দেহ-মনে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে। শেষ পর্যন্ত এই জ্বালা প্রশমিত হইয়া সে নিজ নিয়তিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে ও অনেকটা প্রসন্ন মনে স্বামী-গৃহে ফিরিয়াছে। এই প্রত্যাবর্তন-মুহূর্তে লেখক তাহার প্রতি সাংকেতিক গৌরব আরোপ করিয়াছেন—সে যেন কলঙ্কে ও মহিমায় মাখামাখি, ধূলি ও চন্দনে অনুলিপ্ত বসুন্ধরার প্রতীক।

লেখকের একটি বিশেষ গুণ এই যে, চরিত্র-পরিকল্পনায় ও মন্তব্য-প্রকাশে তিনি কোথাও সংযম ও পরিমিতিবোধ হারান নাই। আধুনিক উপন্যাসের একটা বিশেষত্ব over-emphasis বা সুর চড়াইবার প্রবণতা। ইহার চরিত্রগুলি সর্বদাই বিস্ফোরণের (explosion) সীমান্তে দণ্ডায়মান, বিদ্রোহে ফাটিয়া পড়িবার ঠিক পূর্ববর্তী অবস্থায় প্রধূমিত। লেখকের মন্তব্য-বিশ্লেষণও যেন পাঠককে বধির ভাবিয়া লইয়া তাহার কর্ণে অবিমিশ্র উচ্চ চীৎকার। সর্বত্র অস্বাভাবিক তীব্র গতিবেগ, পরিবর্তনের ঘূর্ণীবায়ু, ভূমিকম্পের ভারকেন্দ্রচ্যুত বিপর্যয়, ভাব-বিলাসের অনিশ্চিত বাষ্পাকুলতা। এই সাধারণ প্রবণতার মধ্যে সরোজকুমার একটি প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম। তাঁহার উপন্যাস খুব গভীর বা জটিল নয়, কিন্তু ইহার মধ্যে একটি মৃদু, শান্ত সত্যপ্রিয়তা বর্তমান। বাংলার কৃষক-প্রধান পল্লীজীবনের যে ব্রত-পার্বণ উৎসবে চাষার

আনন্দ ও সৌন্দর্যবোধ উথলিয়া পড়ে, কৃষিকার্যের বিভিন্ন স্তরকে আশ্রয় করিয়া তাহার মনে যে আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভক্তি-বিশ্বাসের মৃদু কম্পন দোলা দেয় লেখক তাহা কোনরূপ অতিরঞ্জন না করিয়া, খুব সহজ ভাবে আঁকিয়াছেন। তাঁহার এই গ্রন্থত্রয়ে অতিরঞ্জন-প্রবণতার মাত্র দুইটি উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রথম, বিনোদিনীর মৃত্যু সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণার অবিশ্বাস্য প্রসার; দ্বিতীয়, রাত্রিতে রাস্তাচলায় তারাপদর রোমাঞ্চকর অনুভূতি ('গৃহকপোতী' ৬ অধ্যায়)। তথাপি মোটের উপর তাঁহার জীবন-আঁকার প্রণালী ও সমালোচনার ভঙ্গী অত্যুক্তিবর্জিত ও সত্যসন্ধানশীল।

(৩)

'পাষাণপুরী' উপন্যাসটি লেখকের গোড়ার দিকের রচনা, কিন্তু ইহা তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইবার উপযুক্ত। জেলের নিরানন্দ, তিলে তিলে আত্মমর্যাদা-ক্ষয়কারী, নৈরাশ্য ও অবসাদের গুরুভারগ্রস্ত আবহাওয়াটি অতি তীক্ষ্ণভাবে অথচ অনবদ্য ভাব-সংহতির সহিত চিত্রিত হইয়াছে। কয়েদীদের বিভিন্ন নৈতিক স্তরগুলি চমৎকারভাবে পৃথক্ করা হইয়াছে। নিম্নতর স্তরের কয়েদীগুলি—সাইদ, গৌর, কেষ্ট, সাইদের প্রিয়পাত্র ছেলেটি, চৈতন, গোঁসাই, ওস্তাদ, প্রভৃতি—জেলের অভ্যস্ত অধিবাসী। দীর্ঘ সংস্রবের ফলে তাহারা পরস্পরের মধ্যে একটা আত্মীয়তার সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিয়াছে। ইতর আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে সমস্ত সুকুমার বৃত্তির ক্রমিক লোপ হইতে উদ্ভূত একটা রুক্ষ, বেপরোয়াভাব ইহাদের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করিয়াছে। মাঝে মধ্যে সহানুভূতির স্নিগ্ধ, বিরল উচ্ছ্বাস, পারিবারিক জীবনের স্নেহ-প্রেম-মমতার সাময়িক স্মৃতি ও অসহনীয় বেদনার তীব্র আঘাত তাহাদের অসাড় জীবনের মরিচা-ধরা তারে ঘা দিয়া তাহাদের উচ্চতর মনুষ্যত্বকে সময় সময় স্ফুরিত করে। মোটের উপর ইহারা হাসিয়া খেলিয়া, ঈর্ষ্যা-দ্বেষের লঘু অভিনয় করিয়া, জেলের নিয়ম ফাঁকি দিতে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া, জেলের অনিবার্য আকর্ষণে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া একরকম স্বচ্ছন্দেই জীবন কাটায়।

এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম খুনের আসামী কালী কামারের মধ্যে উদাহৃত হইয়াছে। খুনের রক্তাক্ত স্মৃতি, গৃহদাহের লেলিহান অগ্নিশিখার উত্তপ্ত স্পর্শ, মৃত্যুভীতি, নির্জনবাসের উন্মাদকর আতঙ্ক—সমস্ত মিলিয়া তাহার মনে আরোগ্যাতীত চিত্তবিকারের অনপনেয় রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। বাসিনীর সহিত সাক্ষাতের মুহূর্তে মনের এই ঘনকৃষ্ণ যবনিকা ভেদ করিয়া একটা তুচ্ছ সম্ভাষণ ও একটু তৃপ্তির হাসি মাত্র বাহিরে আসিবার পথ পাইয়াছে। তাহার প্রণয়-পাত্রীর সহিত শেষ বিদায়ের পর ও ফাঁসির অব্যবহিত পূর্বে তাহার কণ্ঠে যে আর্ত, মর্মভেদী চীৎকার ধ্বনিত হইয়াছে তাহাই তাহার চিত্তবিভ্রমের আচ্ছন্ন আত্মবিস্মৃতির মধ্যে ব্যর্থ-করুণ জীবন-লোলুপতার নিদর্শন।

কয়েকটি ভদ্রলোক আসামী মিলিয়া কারাজীবনে এক উচ্চতর অভিজাত-শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারা অন্যান্য আসামীদের সহিত সংস্পর্শহীন এক স্বতন্ত্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। অথচ এই শ্রেণী-সাম্যের মধ্যেও চরিত্র-বৈচিত্র্য সূচিত হইয়াছে। চাটুজ্যে, সুরেশ ও অমর বিভিন্ন মনোভাব ও জীবনাদর্শের প্রতিনিধি। চাটুজ্যে জেলের আবহাওয়ায় বেশ স্বচ্ছন্দ-

ভাবে মিশিয়া গিয়াছে; সুবিধাবাদ, ইতর ভোগলিপ্সা ও স্বার্থপরতা, যেমন জেলের বাহিরে তেমনি জেলের ভিতরেও, তাহার জন্য আরামের নীড় রচনা করিয়াছে। তাহার স্থূল, ভোগ-সর্বস্ব মনে অন্ধ ধর্মনিষ্ঠা সত্যিকার কোন অনুশোচনার উদ্রেক করে নাই। সুরেশ ও অমর উচ্চতর মনোবৃত্তির অধিকারী; সুরেশের চিন্তাশীলতা ও মননশক্তি ও অমরের মিথ্যা কলঙ্কে লাঞ্ছিত চরিত্রগৌরব এই পাষাণ বেষ্টনীর গ্লানিকর অবরোধের বিরুদ্ধে নিষ্ফল প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ হইয়াছে। সময় সময় ইহারা এই অবিরাম আত্মদ্বন্দ্বে শ্রান্ত হইয়া চাটুজ্যে-প্রদত্ত গাঁজার ধূমে বিস্মৃতি খুঁজিয়াছে ও চাটুজ্যের নৈতিক স্তরে নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর লৌহশলাকার উপর ডানা-ঝটপটানি ইহাদের জীবনের গতি ও প্রচেষ্টার যথার্থ প্রতীকরূপে গৃহীত হইতে পারে।

এই অতলস্পর্শ অন্ধকার গহ্বরের মধ্য হইতে মানব-মহিমার তুঙ্গতম শৃঙ্গ মাথা তুলিয়াছে। যেখানে মানবাত্মার চরম অবমাননা সেইখানেই তাহার সর্বাপেক্ষা জ্যোতির্ময় বিকাশ। অনশন-ব্রত মৃত্যু-বরণকারী নরুর মধ্যে মানবত্বের উচ্চতম গৌরব মূর্ত হইয়াছে। উপন্যাসে তাহার কোন সক্রিয় অংশ নাই, কিন্তু তথাপি তাহার প্রভাব জেলের সমস্ত শ্বাসরোধকারী আকাশ-বাতাসে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। জেলের অভ্যস্ত জীবনযাত্রা তাহার উপস্থিতিতে যেন নীরব ভর্ৎসনায় কুণ্ঠিত হইয়াছে। ইতর কয়েদীর দল তাহার মহান আত্মোৎসর্গের মাহাত্ম্য না বুঝিয়াও যেন এক অজ্ঞাত মন্ত্রশক্তিতে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। ভদ্র কয়েদীরা এই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের সান্নিধ্যে এক নিগূঢ় অস্বস্তি ও আত্মধিক্কার অনুভব করিয়াছে। জেলের কর্ম-চারিবৃন্দ তাহাদের সমস্ত লৌহনিগড়বদ্ধ, যান্ত্রিক জীবনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চ-স্পর্শে শিহরিয়া উঠিয়াছে। এইরূপে নরুর জীবনাদর্শ কিছু দিনের জন্য জেলের আবহাওয়াকে রূপান্তরিত করিয়া ইহার মধ্যে এক ঝলক অপার্থিব জ্যোতির সঞ্চার করিয়াছে। এই প্রভাব যে জীবনে স্থায়ী হয় না, মাধ্যাকর্ষণের নিম্নগামিতাকে যে কোন শক্তিই চিরতরে প্রতিরোধ করিতে পারে না, ইহাই মানব-জীবনের উপর বিধাতার নিষ্ঠুরতম অভিশাপ।

'আগুন' (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭)—নরুর পূর্বস্মৃতির মধ্য দিয়া চন্দ্রনাথ ও হীরু নামক তাহার দুই সহপাঠীর সহিত সম্পর্কের বর্ণনা। চন্দ্রনাথ দৃপ্ত তেজস্বিতায় পূর্ণ স্বাধীনচেতা; হীরু বড়লোকের ছেলে, খেয়ালী, ব্যসনপ্রিয়। উভয়েই সংসার বিষয়ে উদাসীন ও প্রথানুগত্যের বিরোধী। চন্দ্রনাথ কল-কারখানার সাহায্যে নূতন সৃষ্টি করিতে চায়, হীরু সৌন্দর্যপিয়াসী। চন্দ্রনাথ পরুষ ক্ষাত্রশক্তির প্রতীক, হীরু কোমল রমণীয়তার আধার। উভয়েরই জীবন-রহস্য দুর্জ্ঞেয়, সাধারণ মানদণ্ডের সাহায্যে অনধিগম্য। চন্দ্রনাথের প্রখর, অস্থিরমতি ব্যক্তিত্বের পাশে তাহার পঞ্জাবী স্ত্রী মীরা ম্লান, শীর্ণ ও সংকুচিত, তাহার প্রবল আত্মপ্রচার মীরার ব্যক্তিত্ব ও সহজ স্ফূর্তিকে চাপিয়া রাখিয়াছে। ফলে মীরা, একদিনের অতর্কিত, অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের পর, পাগল হইয়া গিয়াছে। হীরুর খেয়ালী উচ্ছৃঙ্খলতা যাযাবরীর মধ্যে মত্ত, ক্ষণস্থায়ী তৃপ্তির আস্বাদ পাইয়াছে। চন্দ্রনাথ ও মীরার প্রেমের অসম গতি ও হীরুর প্রতি যাযাবরীর মুগ্ধ আকর্ষণ—উভয়ই সুচিত্রিত; তবে দ্বিতীয়টির মধ্যে একটু উদ্ভট আতিশয্য আছে।

মানভূমের আরণ্য প্রকৃতি ও যন্ত্রের বিরাট দৈত্যশক্তি-বর্ণনায় লেখক উচ্চাঙ্গের লিপি-

কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। এই উভয়বিধ প্রেমের চিত্রণে ও ইহাদের প্রাকৃতিক পটভূমিকা-বিন্যাসে লেখকের মিতভাষিতা ও সংযম সুপরিস্ফুট। তারাশঙ্কর বুদ্ধ-অচিন্ত্যের ন্যায় কাব্য-প্লাবনে গা ভাসাইয়া দেন নাই। উচ্ছল গিরিনির্ঝরের পাশে মীরার চন্দ্রালোকনৃত্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবা-রাত্রির কাব্য'-এ আনন্দের চন্দ্রকলানৃত্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়; কিন্তু তারাশঙ্করের চিত্রে মানিকবাবুর উদ্ভট, অবাস্তব সাংকেতিকতার স্পর্শ নাই—ইহা মীরার চরিত্রকল্পনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ও তাহার অভ্যস্ত আবেগ-নিরোধের প্রতিক্রিয়ার সুসংগত অভিব্যক্তি। প্রেম-কাহিনীতে গভীর মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ নাই, কিন্তু ইহাদের মৃদু, দীপ্তির আতিশয্যহীন স্বাভাবিকতা ও সৌন্দর্যময়, সার্থক আবেষ্টন-রচনা লেখকের শক্তির সুস্থ পরিমিতিবোধের নির্দেশক। এই উপন্যাসে লেখকের ক্রমোন্নতি সূচিত হইয়াছে।

'কবি' (মার্চ, ১৯৪২) তারাশঙ্করের আর একটি মনোরম সৃষ্টি। বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতি, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের প্রভাব কেমন করিয়া সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া, আপামর জনসাধারণের মনে সৌন্দর্যবোধ ও সরসতার সঞ্চার করিয়াছে, বাংলার কবিয়াল-সম্প্রদায়ই তাহার চমৎকার প্রমাণ। গ্রন্থে এইরূপ একটি নিম্নশ্রেণীর প্রতিনিধির মধ্যে কবিত্বশক্তির স্ফুরণের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। নিতাই কবি, সমস্ত সত্যিকার কবির মত, স্বাভাবিক সুরুচি ও সুকুমার অনুভূতির অধিকারী—জীবনের প্রত্যেক অভিজ্ঞতা, ভাবের প্রতি উচ্ছ্বাস তাহার মনে অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে, গীতি-গুঞ্জনে রূপান্তরিত হয়। তাহার মনের এই দ্রুত, অবাধ সংবেদনশীলতা ও উদাস, উদার নির্লিপ্ততা তাহাকে প্রকৃত কবির সগোত্রীয় করিয়াছে। এই কবিত্ববিকাশের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে যে উত্তেজনাময় সুন্দরে-কুৎসিতে মিশ্রিত প্রতিবেশ ইহার সূতিকাগৃহ, তাহার চমৎকার ছবি দেওয়া হইয়াছে। অশিক্ষিত, ইতর শ্রোতৃবৃন্দের অশ্লীল রুচি ও যৌনলালসামিশ্র ভক্তি কবিয়ালদের কাব্যানু-শীলনের অন্তর্নিহিত প্রেরণা, এই বিকৃত ছাঁচেই তাহাদের সৌন্দর্যবোধের অভিব্যক্তি। ঝুমুরের দলের যে ছবি লেখক আঁকিয়াছেন তাহা যেমনি বাস্তব তেমনি চিত্তাকর্ষক, ইহার বীভৎস কদাচারের মধ্যে সত্যিকার শিল্পানুরাগ ও খানিকটা নিয়মানুবর্তিতা ও আদর্শবাদ আছে। বসন, ললিতা, নির্মলা, মাসী ও পুরুষ-শিল্পীরা মিলিয়া যে পরিবার গড়িয়াছে, যে যাযাবর জীবন-যাত্রার অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহাতে ক্ষণিকতা ও নির্মম স্বার্থপরতার সহিত কতক পরিমাণে বন্ধনহীনতার আনন্দ ও স্নেহ-মায়া-সমবেদনা মিশ্রিত হইয়াছে। বসন্তের চরিত্রে তীক্ষ্ণ, হিংস্র আঘাত করিবার প্রবৃত্তি ও উদ্দাম, বেপরোয়া জীবনোপভোগ-স্পৃহার সঙ্গে আত্মগ্লানি ও একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা-উপলব্ধির চমৎকার সমন্বয় হইয়াছে। তাহাকে রাইকমলের মত অসম্ভব রকম আদর্শান্বিত করিবার চেষ্টা নাই, গণিকা-বৃত্তির পঙ্কে এইরূপ মলিন ও কীটদষ্ট পঙ্কজই ফুটিয়া থাকে। এই উপন্যাসে লেখক বোধ হয় সর্বপ্রথম প্রেমের বৈদ্যুতীশক্তি অনুভব করিয়াছেন। ঠাকুরঝি ও নিতাই-এর মধ্যে সম্বন্ধটি একটি মধুর, অপরিস্ফুট হৃদয়াবেগের রহস্য-মণ্ডিত, প্রেমিকের কল্পনায় তাহার চলমান মূর্তিটি যে স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুলের রূপক-ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হইয়াছে তাহাই এই সম্বন্ধের কাব্য মাধুর্যের দ্যোতক। বসন্তের ভালবাসায় তীক্ষ্ণতর স্বাদবৈচিত্র্য অনুভূত হয়। নিতাই-এর চরিত্রে তাহার হীনজাতি ও বিনয়-কুণ্ঠিত আচ-রণের মধ্য দিয়া চরিত্রগৌরব এবং কবির মানস আভিজাত্য ও অতৃপ্তি চমৎকার ফুটিয়াছে।

(৪)

'ধাত্রীদেবতা' (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯), 'কালিন্দী' (আগষ্ট, ১৯৪০), 'গণদেবতা' (সেপ্টেম্বর, ১৯৪২) ও 'পঞ্চগ্রাম' (জানুয়ারী, ১৯৪৪)—তারাশঙ্করের ক্রমপরিণতির আর একটা উচ্চতর পর্যায় সূচিত করে। এই উপন্যাসগুলিতে রাঢ়ের জীবনযাত্রা-প্রণালীর বিভিন্ন স্তর চমৎকার-ভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রথম দুইখানিতে মধ্যযুগের আদর্শে লালিত জমিদার-গোষ্ঠীর জীবনে আধুনিক প্রভাবের বিক্ষোভ ও শেষ দুটিতে রাঢ়ের একটি জনপদে সমগ্র প্রজাসাধারণের সংসার-যাত্রায় নূতন নূতন জটিল সমস্যার উদ্ভবই তাঁহার আলোচ্য বিষয়। পূর্ববর্তী উপন্যাসের সহিত তুলনায় এগুলিতে বিষয় গৌরব, গঠনসংহতি, রসের গাঢ়তা ও বর্ণনা-ও বিশ্লেষণ শক্তির দিক্ দিয়া উৎকর্ষ ও অগ্রগতির লক্ষণ সুপরিস্ফুট। এই উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়া তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক সংঘে প্রথম শ্রেণীতে আসন পাইবার অধিকার সুদৃঢ় হইয়াছে।

'ধাত্রীদেবতা'য় জমিদারের ছেলে শিবনাথের শৈশব হইতে কৈশোর ও যৌবন পর্যন্ত পরিণতির কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। বাল্যে যে দুঃসাহসিকতা তাহাকে যুদ্ধাভিনয় ও নেকড়ের বাচ্চা ধরিতে উত্তেজিত করিয়াছিল, কৈশোরে তাহাই তাহাকে মহামারীর প্রতিষেধক প্রচেষ্টায় ও যৌবনে সন্ত্রাসবাদ ও অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে প্রেরণা দিয়াছে। সুতরাং তাহার চরিত্রে একটা জীবনব্যাপী অখণ্ড আদর্শের ঐক্য অনুভব করা যায়। লেখক তাহার জীবনে দুই বিরোধী প্রভাবের সংঘর্ষ দেখাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাহার পিসীমা তাহাকে সনাতন আভিজাত্য-গৌরব, জমিদারের পুরুষ-পরম্পরাগত নেতৃত্ব-সংস্কারের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে তাহার মাতা তাহার মনে স্বদেশপ্রেম ও জনহিতৈষণার বীজ অঙ্কুরিত করিতে চাহিয়াছেন। যতদিন পর্যন্ত শিবনাথের নিজ ব্যক্তিত্ব স্ফুরিত হয় নাই, ততদিন প্রখর-ব্যক্তিত্বসম্পন্না, অভিমান-প্রবণা পিসিমার প্রভাবই তাহার শান্ত, আত্মনিরোধ-শীল মাতার প্রভাবের উপর জয়ী হইয়াছে। তাহার বাল্যবিবাহ ও জমিদারী আদব-কায়দায় দীক্ষা পিসিমার প্রভাবের ফল; তাহার বিদ্যাশিক্ষার জন্য কলিকাতা-যাত্রায় একবার মাত্র তাহার মাতার ইচ্ছা কার্যকরী হইয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিত্বস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে আভিজাত্য-গৌরবের খোলস সম্পূর্ণভাবে শিবনাথের মন হইতে খসিয়া গিয়াছে—পিসিমার শিক্ষাপ্রসূত দৃপ্ত মর্যাদাবোধ মাতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশপ্রীতি ও জনসেবার অভিনব পথ অনু-সরণ করিয়াছে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত মাতার আদর্শই শিবনাথের চরিত্রে মঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। শিবনাথের উপর এই দুই বিপরীতমুখী, অথচ প্রকৃত মনুষ্যত্ব স্ফুরণের পক্ষে সমভাবে উপযোগী, প্রভাবের ফল সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে।

কিন্তু নায়কের জীবনে কেবল বাহিরের বিক্ষোভ নহে, অন্তর্দ্বন্দ্বও প্রবলভাবে সংক্রামিত হইয়াছে। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব আসিয়াছে তাহার দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যবর্তিতায় এবং ইহাই শিবনাথের চরিত্রকে এত সজীব করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার কিশোরী পত্নী গৌরীর ধনগর্ব, বিষাক্ত সন্দেহপরায়ণতা ও নিঃস্নেহ কাঠিন্য ও তাহার শ্বশুর-পরিবারের বিদ্রূপ-মিশান অবজ্ঞা তাহাকে রাজনৈতিক আবর্তে ঝাঁপাইয়া পড়িবার উপযুক্ত প্রচণ্ড গতিবেগ যোগাইয়াছে। শিবনাথের শেষ আত্মোৎসর্গ গৌরীর মনের সুপ্ত মহত্ত্ব, গভীর হৃদয়াবেগ ও স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমকে জাগাইয়াছে। কারাবরোধের মধ্যে গৌরীর ক্ষণিক অপরাধ-কুণ্ঠিত স্বামী-সম্ভাষণ

তাহাদের ভবিষ্যৎ মিলনের ভূমিকা রচনা করিয়াছে, ইহা অনুভব করা যায়, কিন্তু গৌরীর এই অতর্কিত পরিবর্তন-কাহিনী আমাদের অবিশ্বাসকে নিঃশেষে উন্মূলিত করিতে পারে না।

শিবনাথের জীবনের সন্ধিস্থলগুলিতে কয়েকটি পরম অনুভূতি নূতন পরিণতির সূচনা করিয়াছে। প্রথম মহামারীর নিদারুণ অগ্নিস্পর্শ ও মিথ্যা কলঙ্কের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাহাকে কল্পনাপ্রবণ কৈশোর হইতে দায়িত্বজ্ঞানপূর্ণ যৌবনে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে। কলিকাতায় আগমন ও সুশীল-পূর্ণের সাহচর্য তাহার সম্মুখে বিভীষিকাময় বিপ্লববাদের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। সাঁওতাল পরগণার জ্যোৎস্না ও ছায়াতে মেশানো বন্যপথ বাহিয়া ভূতপূর্ব বিপ্লবপন্থীর আশ্রমে গমন ও তাহার প্রসন্ন চিত্তে, ক্ষমাস্নিগ্ধ ঔদার্যের সহিত মৃত্যুবরণ শিবনাথের জীবনে অনপনেয় রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে ও তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারিত করিয়াছে। মাতৃবিয়োগের রাত্রিতে তাহার বৈরাগ্যোদ্ভাসিত চিত্তে জীবন-মৃত্যুর অসীম রহস্যের স্বরূপ-উপলব্ধি তাহার আর একটা স্মরণীয় অভিজ্ঞতা—তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের উদার অনাসক্তি ও অতন্দ্র সাধনা যেন এই অনুভূতির সুরে বাঁধা। সর্বশেষে ময়ূরাক্ষীর বালুকাময় গর্ভে প্রদোষান্ধকারের রহস্য-ঘেরা অস্পষ্টতার মধ্যে সুশীলের সহিত তাহার দীর্ঘকাল পরে মিলন আবার তাহার শান্ত পল্লী-সংগঠন-প্রচেষ্টার মধ্যে রণোন্মাদের দুঃসহ আবেগ সঞ্চারিত করিয়াছে—সে তাহার অখ্যাত, নিরাপদ, উত্তেজনাহীন কর্মপ্রণালী ত্যাগ করিয়া দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত মুহূর্তগুলির প্রভাব যে ঔপন্যাসিক পূর্ণভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহা নয়, এই বিচ্ছিন্ন ধারাগুলি শিবনাথের জীবনে কিরূপে একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ কাহিনী লিপিবদ্ধ হয় নাই। তবে আমরা ইঙ্গিতে-আভাসে বুঝি যে, এই অনুভূতি-সমষ্টিই শিবনাথের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের উপাদানে রূপান্তরিত হইয়াছে।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে পিসিমা তাঁহার উগ্র মর্যাদাবোধ, প্রখর তেজস্বিতা ও মুহুর্মুহুঃ উত্তেজিত অভিমানপ্রবণতা লইয়া খুব জীবন্ত হইয়াছেন। বধূ গৌরীর সহিত মনোমালিন্যের দায়িত্ব প্রধানতঃ তাঁহারই—তাহার কর্কশ শাসনের নীচে সত্যিকারের স্নেহশীল হিতকামনার পরিচয় মিলে না। গৌরীর প্রত্যাগমনের পর দিনই কাশীযাত্রা তাহার উৎকট অসহিষ্ণুতার আর এক নিদর্শন। শিবনাথের মাতার সহিত তাহার মতভেদ যখনই অভিব্যক্ত হইয়াছে, তখনই নিছক জিদ ও অভিমানের জোরেই পিসিমার জয় হইয়াছে। কাশীবাসের ফলে পিসিমা যে শেষ পর্যন্ত তাহার ভ্রাতৃজায়ার আদর্শের গৌরব উপলব্ধি করিয়াছেন ইহা ঠিক স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া ঠেকে না। বরং শিবনাথের সান্নিধ্যে, তাহার কার্যাবলীর সস্নেহ বিচারে ও তাৎপর্য-গ্রহণে এই পরিবর্তন ঘটা সম্ভব ছিল। উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে সর্ববিরোধ সমন্বয় ঘটাইবার প্রলোভন সাধারণতঃ লেখককে বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করিয়া আদর্শলোকের কাল্পনিক সুষমার প্রতি লোলুপ করিয়া তোলে; পিসিমার মতপরিবর্তন যেন সেই আদর্শ-লোলুপতার একটা দৃষ্টান্ত। জ্যোতির্ময়ী প্রখরতরা ননদিনীর দ্বারা অনেকটা আচ্ছাদিত হইয়াও নিজ স্বাধীন মতবাদ শান্ত দৃঢ়তার সহিত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অতর্কিত মৃত্যু উপন্যাসের মধ্যে তাঁহার সক্রিয়তার পরিধি অযথা সংকুচিত করিয়াছে। মাষ্টার রামরতন বাবু, সন্ন্যাসী গোঁসাই-বাবা, ঝি, পাচিকা, প্রভৃতি সমস্ত গৌণ চরিত্রও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

নায়েব রাখাল সিংহ তাহার সম্পদে-বিপদে অপরিবর্তিত বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তি লইয়া জমিদারী-প্রথার একটা প্রশংসনীয় পরিণতির প্রতীক। ডোম বৌ ও দুর্ভিক্ষপীড়িতা, রোগজীর্ণ স্বামীর জীবনরক্ষার জন্য চৌর্যবৃত্তি-পরায়ণা ভিখারিণী স্ত্রীলোক—এই দুইজন, নিম্নতম শ্রেণীর মধ্যেও অপ্রত্যাশিত মহত্ত্বের বিকাশ ফুটাইয়া তুলিবার যে ক্ষমতা লেখকের আছে, তাহার চমৎকার নিদর্শন।

শুধু চরিত্রসৃষ্টি ও জীবনের মধ্যে মহান্, গৌরবময় ভাব-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত ফুটাইয়া তোলার মধ্যেই তারাশঙ্করের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নহে। রোগ-মহামারীর প্রাদুর্ভাব, অনাবৃষ্টি বা অন্য কোনরূপ আকস্মিক বিপৎপাতে পল্লীজীবনে যে নিদারুণ বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে, তাহার ভারসাম্য যে সাংঘাতিকভাবে বিচলিত হইয়া উঠে তাহার চমৎকার বর্ণনার অনেক দৃষ্টান্ত তাঁহার উপন্যাসগুলিতে মিলে। এই বর্ণনাতে ভাবাবেগপূর্ণ তথ্য-বিবৃতির চারিদিকে এক ভয়াবহ ব্যঞ্জনার সূক্ষ্মতর পরিমণ্ডল ফুটিয়া উঠিয়াছে। কলেরার আক্রমণে গ্রামবাসীদের ত্রস্ত, অসহায় ভাব, ইতর শ্রেণীর মধ্যে পারিবারিক বন্ধন-ছেদন, সনাতন ধর্মসংস্কারের নিকট ব্যাকুল, অন্ধ আত্মসমর্পণ, উত্তেজিত কল্পনার সম্মুখে নানা অর্ধ-অবাস্তব বিভীষিকার ছায়ামূর্তি-পরিগ্রহ—এই সমস্ত মিলিয়া এক ভীতিশিহরণ-স্পন্দিত, শ্বাসরোধকারী আবহাওয়া সৃষ্ট হইয়াছে। অমাবস্যারাত্রে রক্ষাকালী পূজার বর্ণনায়, অনাবৃষ্টিতে শুষ্যমান শস্যক্ষেত্রের সোঁ সোঁ ধ্বনিতে এক অতিপ্রাকৃত উপস্থিতির ভীষণ আভাস ছায়াপাত করিয়াছে। সর্বশুদ্ধ উপন্যাসটি আদর্শ-প্রবণতার আতিশয্য সত্ত্বেও—বা উহারই জন্য—করুণ-গভীর আবেদনে মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে।

পরবর্তী উপন্যাস 'কালিন্দী' (১৯৪০) অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরের। 'ধাত্রীদেবতা'-তে জমিদার-গোষ্ঠীর প্রতিদিনের সমস্যা, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টিতে খাজনা অনাদায়ের জন্য অর্থকৃচ্ছ্রতা আলোচিত হইয়াছে। 'কালিন্দী'তে জমিদারের সমস্যা জটিলতর। জ্ঞাতিবিরোধ, প্রজাবিদ্রোহ, নবোত্থিত চরের স্বত্ব লইয়া মামলা-মোকদ্দমা, আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার প্রবলতর ও অধিকতর সুনিয়ন্ত্রিত শক্তির সহিত সংঘর্ষ; বিশেষতঃ, একটি ভাগ্যহত, রিক্তসম্পদ্ অভিজাত-পরিবারের উপর নির্মম দৈবাভিশাপ—এই সমস্ত জটিল সূত্র মিলিয়া উপন্যাসের বিষয়-বস্তু বয়ন করিয়াছে। এই সৈন্য-সমাবেশে দুর্ভেদ্য রণস্থলে কোন চরিত্রই প্রধান সেনাপতির গর্বোন্নত শিরে দাঁড়াইতে পারে নাই। চরিত্রগৌরব ঘটনার প্রাধান্যে গৌণ হইয়াছে। ইন্দ্ররায় কিছুক্ষণের জন্য দৃঢ়হস্তে রথরশ্মি ধারণ করিয়াছে; কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ তাহার ক্ষীণ নিয়ন্ত্রণশক্তিকে উপহাস করিয়া মানুষের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। মহীন্দ্র ও অহীন্দ্র এই ক্ষুরধার স্রোতে বুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইয়াছে। আর যাহারা গৌণ চরিত্র তাহারা নিয়তির উৎসমুখ হইতে উৎক্ষিপ্ত কালিন্দীর এই বেগবান্ প্রবাহের তীরে দাঁড়াইয়া জটলা করিয়াছে। নদীগর্ভে তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের জাল ফেলিয়াছে, কিন্তু ইহার গতির প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দুইটি—এক, মানুষ রামেশ্বর; ও দ্বিতীয় জড়প্রকৃতি, কালিন্দীর চর। একজন ট্র্যাজেডির বীজ বপন করিয়া নিজেও অভিশপ্ত জীবন যাপন করিয়াছে ও নিজ সন্তান-সন্ততির উপর এই অভিশাপ সংক্রামিত করিবার হেতু

হইয়াছে। আর নদীগর্ভ হইতে নিয়তির ইঙ্গিতে উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত কালিন্দীর চর বিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া উপন্যাসের দুই প্রধান পরিবারের অদৃষ্টরথের চক্রাবর্তন-চিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে।

অবশ্য এই দুই দিক্ দিয়াই লেখকের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য উপন্যাসের মধ্যে ঠিক সার্থক রূপ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যে পরিমাণ কল্পনাসমৃদ্ধি থাকিলে জড় প্রকৃতি-প্রতিবেশকে মানবীয় বিরোধের কেন্দ্রস্থলে সক্রিয় অংশভাক্‌রূপে প্রতিষ্ঠা করা যায়, লেখক ততখানি বিদ্যুৎ-শক্তিপূর্ণ কল্পনার পরিচয় দিতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে সুনীতির ক্ষুব্ধ, অস্বস্তিপূর্ণ দীর্ঘশ্বাসের ভিতর দিয়া প্রকৃতির এই দৈবপ্রভাব সম্বন্ধে একটা মজ্জাগত সংস্কার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; লেখকের নিজ মন্তব্য ও বর্ণনাভঙ্গীও চরের এই সাংঘাতিক প্রবণতার ইঙ্গিত বহন করে। ঋতু-ভেদে, দিবা-রাত্রির প্রহর-মুহূর্তভেদে, চরের বিচিত্র-পরিবর্তনশীল রূপের অন্তরালে যে একটা অগ্নিগর্ভ ক্রূরশক্তি অবিচলিত উদ্দেশ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে ঔপন্যাসিক পাঠকের মনে এইরূপ ধারণা জন্মাইতে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু এই চেষ্টায় তিনি যে সম্পূর্ণ সফল হইয়াছেন এরূপ দাবী করা যায় না। মহীন্দ্রের পরিণামের জন্য চরের দায়িত্ব আছে, কিন্তু ইহা পরোক্ষ রকমের। রায় ও চক্রবর্তী-বংশের দীর্ঘকালের বিরোধ ইহা নূতন করিয়া জ্বালাইয়াছে, কিন্তু অহীন্দ্র-উমার বিবাহে এই বৈরানল শান্তিবারি-প্রক্ষেপে চিরনির্বাণ লাভ করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত অহীন্দ্রের যে দুঃখময় পরিণতি ঘটিয়াছে, তাহার মূল চরের পলিমাটিতে না খুঁজিয়া কলিকাতার বৈপ্লবিক-শোণিত-সিক্ত, পাথর-বাঁধানো রাজপথেই অনুসন্ধেয়। অবশ্য গ্রামের চাষী প্রজার মধ্যে ইহা একটা লোলুপতার তুফান বহাইয়াছে, কাহারও কাহারও চক্ষে শ্বাপদ-সুলভ হিংস্র-দীপ্তিও জ্বালাইয়াছে, কাহাকেও কাহাকেও প্রলুব্ধ করিয়া সর্বনাশের রসাতলে পাঠাইয়াছে। যাযাবর সাঁওতাল-সম্প্রদায় অল্পদিনের জন্য ইহার আতিথেয় বক্ষে নীড় রচনা করিয়া আবার ইহার স্নেহশীতল, অথচ পিচ্ছিল অঙ্ক হইতে দূরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে —চর ইহাদিগকে মাতার ন্যায় আহ্বান করিয়া বিমাতার ন্যায় বিসর্জন দিয়াছে। কলওয়ালা মিঃ মুখার্জির লৌহ-শাসনে ইহা নিজ বন্যপ্রকৃতি হারাইয়া যান্ত্রিক সভ্যতার কবলে আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং যন্ত্রোচিত নির্মমতার সহিত ইহার পূর্বতন প্রভুর সর্বনাশ-সাধনের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং উপন্যাস মধ্যে কালিন্দীর চর যে একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। তবে ইহার ভাগ্যনিয়ন্তৃত্ব প্রধানতঃ অপ্রধান চরিত্রের উপরেই প্রযুক্ত হইয়াছে। বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক হার্ডির Egdon Heathএর সহিত তুলনা করিলে কালিন্দীর চরের পরিকল্পনার আপেক্ষিক অপকর্ষ পরিষ্কার হইবে। হার্ডির উপন্যাসে ঊষর প্রান্তরের সহিত মানুষের একেবারে শতপাকে জড়ানো নাড়ীর সম্পর্ক রচিত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি খেয়াল, সীমাহীন বিস্তৃতির উপর রৌদ্রছায়ার খেলা, গাম্ভীর্য-চাপল্যের প্রত্যেকটি পরিবর্তনশীল মুখভঙ্গী, ইহার বন্য প্রকৃতির চিরন্তন উদাসীনতা এক নিগূঢ় উপায়ে মানব-চরিত্রগুলির অন্তরের অন্তরে সংক্রামিত হইয়াছে। কালিন্দীর চর ইহার প্রতিবেশী মানব-জীবনকে দূর হইতে স্পর্শ করিয়াছে, ইহার আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

রামেশ্বরের তরুণ যৌবনের গোপন পাপ উপন্যাসের নৈতিক ভিত্তিভূমি রচনা করিয়াছে। শূন্যগর্ভ সুরঙ্গের উপর নির্মিত জীবন-ব্যবস্থা বারে বারে ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। পিতার কলুষিত

নিঃশ্বাস নিরপরাধ পুত্রদের জীবনে বিষ-বাষ্প ছড়াইয়াছে। মহীন্দ্রের নরঘাতী পিস্তলে যে বারুদ সঞ্চিত হইয়াছে তাহা তাহার পিতৃ-অপরাধের ভূগর্ভস্থ খনি হইতে সংগৃহীত। অহীন্দ্রের ক্ষেত্রেও সুখ-শান্তির প্রচুর উপকরণ থাকা সত্ত্বেও জীবন যে তিক্ত ও বিকৃত হইয়া গেল তাহারও মূল কারণ উত্তরাধিকার-সূত্রে সংক্রামিত মনোবিকার; শুধু জমিদারী প্রথার শোষণ-ব্যবস্থার উপলব্ধি ও প্রজার অসহায় রিক্ততার প্রতি সহানুভূতি তাহাকে বৈপ্লবিকতার রক্তাক্ত পথে পরিচালিত করার যথেষ্ট কারণ নহে। পত্নীহন্তার ধমনী-প্রবাহিত উন্মত্ত শোণিতোচ্ছ্বাস উহার ব্যাধিগ্রস্ত স্পর্শে পুত্রদের সুস্থ, সুনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপনের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ করিয়াছে —কোথাও বা অসংযত ক্রোধ, কোথাও বা আদর্শবাদের আতিশয্য সর্বনাশের উপলক্ষ্য হইয়াছে। সুতরাং রামেশ্বরই উপন্যাসের কেন্দ্রস্থ চরিত্র—সে তাহার সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ ও অদৃষ্ট-পরিণতির উপর তীব্রতম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

কিন্তু লেখকের মনোগত উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, উপন্যাসের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ সার্থক হইয়া উঠে নাই। রামেশ্বরের পঁচিশ বৎসর পূর্বে অনুষ্ঠিত পত্নীহত্যা উপন্যাসের পরবর্তী ঘটনার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া যায় নাই। এই সুদীর্ঘ কালের ব্যবধান আর্টের সেতু-বন্ধনে বিলুপ্ত হয় নাই। পরবর্তী শোচনীয় পরিণতিকে এই অস্বাভাবিক নৃশংসতার অপ্রতি-বিধেয় ফলরূপে আমরা অনুভব করি না। তা ছাড়া পত্নীহত্যার ব্যাপারটাও ঠিক সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া ঠেকে না। রামেশ্বরের কাব্যানুরাগ ও সৌন্দর্য-প্রিয়তার সহিত এই সাংঘাতিক উপাদান কি করিয়া মিশিল তাহার কোন সন্তোষজনক কারণ দেওয়া হয় নাই। হয়ত জীবনে এরূপ অদ্ভুত সমন্বয় ঘটিয়া থাকে—লেখকের সম্মুখে হয়ত সুদূর অতীতের কোন জনপ্রবাদ সমর্থক প্রমাণরূপে উপস্থিত ছিল। কিন্তু লেখকের বিশ্লেষণে এই উদ্ভট রাসায়নিক সংযোগের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় নাই—তিনি হয়ত শোনা কথা পাঠককে শোনাইয়াছেন, নূতন সৃষ্টি করেন নাই। ব্যক্তিগত চরিত্র হিসাবে রামেশ্বরের পরিকল্পনা প্রশংসনীয়—তাহার রোগজীর্ণ, অসুস্থ-কল্পনাপ্রবণ মনোবিকারের অভিব্যক্তি সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু তাহার উপর যে সাংকেতিক গৌরব আরোপিত হইয়াছে, সেই গুরুভার বহনের যোগ্যতা তাহার নাই। কেবল একবার মাত্র, কলওয়ালা সাহেবের অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া তাহার স্তিমিত, ধূমাচ্ছন্ন চিত্ত উত্তেজনার অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এই ক্ষণিক দীপ্তি অবসাদের ভস্মবিশেষে বিলীন হইয়াছে। রামেশ্বর উপন্যাস মধ্যে অর্ধাধিগম্য প্রহেলিকাই রহিয়া গিয়াছে।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে ইন্দ্ররায় প্রাচীন জমিদারী মনোবৃত্তির যোগ্য প্রতিনিধি। কিন্তু আধুনিকতার প্রবল স্রোতে সে ঠিক হালে পানি পায় নাই—তাহার পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র ও রণনীতি এই পরিবর্তিত অবস্থায় ব্যর্থ হইয়াছে। নেতৃত্বের দণ্ড তাহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়াছে—তাহার মনের প্রশংসনীয় বৃত্তিগুলিও উপযুক্ত পরীক্ষার অভাবে ক্ষুব্ধ, নিষ্ফল অভিমানে রূপান্তরিত হইয়াছে। তাহার ভবিষ্যৎ বেদনা-বিদ্ধ কৌতূহলের উদ্রেক করে। হয় সে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন অতিকায় প্রাণীর ন্যায় বর্তমান যুগের প্রতিকূল প্রতিবেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, না হয় তাহার জ্ঞাতিভ্রাতা শূলপাণির ন্যায় আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার দাসত্ব স্বীকার করিবে। জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত রায়ের কাশীবাস-সংকল্প দুর্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে

আত্মগোপনের ন্যায় এক সঙ্গে কৌতুকাবহ ও করুণ। মজুমদার নায়েব—জমিদার নারায়ণের হাতের সুদর্শন-চক্র—প্রভুর ন্যায়ই মলিন ও হৃতগৌরব। সেও তাহার কূটবুদ্ধি যন্ত্রশক্তির সেবায় নিয়োগ করিয়াছে, কেননা সে বুঝিয়াছে যে অতীত যাহারই হউক না কেন ভবিষ্যৎ এই নূতন আবির্ভাবের। 'ধাত্রী-দেবতা'র রাখাল সিংহের সহিত তুলনায় সে অধিকতর বাস্তব ও সুবিধাবাদী। অচিন্ত্যবাবু তাহার কাল্পনিক ব্যবসায়-বুদ্ধি লইয়া মোসাহেবের রূপেই জমিদার-গোষ্ঠী-চক্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে—তবে সে নূতন আগন্তুক বলিয়া এই ব্যবস্থার সহিত অনেকটা শিথিলভাবে সংশ্লিষ্ট। একদিকে যেমন তাহার জমিদারের প্রতি নিবিড় আনুগত্য নাই, তেমনি অপরদিকে তাহার তোষামোদবৃত্তিও অস্থিমজ্জাগত সংস্কার হইয়া দাঁড়ায় নাই। সে জমিদারী গুড়ে নূতন-আকৃষ্ট মক্ষিকা—মিষ্ট নিঃশেষ হইতেই পলায়নের জন্য ডানা মেলিয়াছে।

স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে ভদ্র মহিলাগুলি প্রায় এক ছাঁচের—বিশেষত্ব-বর্জিত। হেমাঙ্গিনী ও সুনীতি আদর্শ-সহোদরা—তাঁহাদের যাহা কিছু পার্থক্য তাহা অবস্থাভেদ হইতে উৎপন্ন। সুনীতিকে বেশী সহিতে হইয়াছে বলিয়া তাঁহার সহিষ্ণুতার অধিক প্রসার হইয়াছে। হেমাঙ্গিনীর অন্তরে প্রিয়জনের যে অমঙ্গলাশঙ্কা ছায়ার ন্যায় সঞ্চরমান তাহাই সুনীতির দুর্ভাগ্য-বিড়ম্বিত জীবনে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তবে হেমাঙ্গিনীর জীবনে এক উদার, আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ অতীতের সুখস্মৃতি শুকতারার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া আছে—সংস্কৃত-কাব্যের সুরভি-স্পৃষ্ট, কাদম্বরীর সৌজন্য-পরিপ্লুত প্রিয়-সম্ভাষণ-রীতি, হাস্য-পরিহাসসরস কুটুম্ব-পরিচর্যার প্রীতি-মাধুর্য তাহার মনের এক কোণে লগ্ন থাকিয়া ইহার নবীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। সুনীতি এই কাব্য-সুষমা মণ্ডিত আনন্দ-লোকে প্রবেশাধিকার পায় নাই—হেমাঙ্গিনীর সহিত ইহাও তাহার একটা গুরুতর প্রভেদ। উমার কিশোর মন পূর্ণ পরিণতির অবসর পায় নাই—তাহার অন্তরে দাম্পত্য প্রেমের যে অতৃপ্তির ইঙ্গিত করা হইয়াছে তাহা অপরিস্ফুট অবস্থাতেই আছে। শ্বশুরের সঙ্গে তাহার যে কাব্যাস্বাদমূলক সৌহৃদ্য গড়িয়া উঠিতেছিল স্বামীর উপর বজ্রপাতের ফলে তাহার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইল তাহাও অনিশ্চিত রহিয়া গেল। এক সাঁওতাল রমণী সারী তাহার কৃত্রিম-বন্ধনহীন জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও পরবর্তী কলঙ্ক-লাঞ্ছনা লইয়া স্বকীয়তা অর্জন করিয়াছে।

অহীন্দ্র ও অমলের সহৃদয় বন্ধুত্ব তাহাদের ব্যক্তিগত পরিচয়কে ছাপাইয়াছে। অহীন্দ্র শিবনাথের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয় নাই। সাঁওতালদের প্রদত্ত আখ্যা তাহার বাহিরের উজ্জ্বল গৌরবর্ণের উপর আলোকপাত করিয়াছে, তাহার চরিত্রবৈশিষ্ট্যের উপর নহে। সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা তাহার ঠাকুরদাদার সহিত তাহার চরিত্রগত মিল নিতান্ত আকস্মিকভাবে বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহার পূর্বতন জীবনে এই পরিণতির কোন ইঙ্গিত নাই। শিবনাথের বৈপ্লবিকতা তাহার চরিত্র ও সংসর্গের দ্বারা বিশ্বাসযোগ্য হইয়াছে—অহীন্দ্রের ক্ষেত্রে ইহা যেন লেখকের একটা বদ্ধমূল মানস প্রবণতার নিরর্থক অনুবর্তন। চরিত্রস্ফুরণের দিক্ দিয়া শিবনাথের সমকক্ষ কোন সৃষ্টি 'কালিন্দী'তে মিলে না।

সাঁওতাল-গোষ্ঠীর জীবন-যাত্রা ও সমাজ-বন্ধনের বর্ণনায় অভিনবত্বের চিত্র-সৌন্দর্য প্রচুর

পরিমাণে বিদ্যমান। তাহাদের উদ্ভট কল্পনা, সরল আমোদ-প্রমোদ ও বিচিত্র সমাজ-ব্যবস্থা লেখকের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দেয়, কিন্তু উপন্যাসের সহিত ইহার সংস্রব নিতান্ত শিথিল। রাত্রের অন্ধকারে পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় অপসরণশীল সাঁওতাল-সংঘ চরের আশ্রয়ের নির্ভরযোগ্যতার অভাব সপ্রমাণ করে, কিন্তু উপন্যাসের সম্পর্ক-জটিলতার মধ্যে ইহাদের কোন স্থান নাই। একমাত্র সারী উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের সহিত একটু বেশী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়াছে, কিন্তু তাহার কাহিনীও মোটের উপর অবান্তর। উপন্যাসে যে অনেক অনাবশ্যক লোকের ভিড় ও কতক অসংলগ্ন ঘটনার যদৃচ্ছ সমাবেশ হইয়াছে তাহা ইহার নাটকীয় রূপে আরও উগ্রভাবে প্রকট। উপন্যাসের গঠন-শিথিলতার মধ্যে যাহা চোখ এড়াইয়া যায়, নাটকের কঠোরতর সংহতির মধ্যে তাহা বিচার-বুদ্ধিকে পীড়িত করে।

(৫)

'গণ-দেবতা' (১৯৪২) উপন্যাসে পল্লীজীবনের আর একটা সমস্যা-সংকুল দিক্ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এখানে আধুনিক অবস্থা-পরিবর্তনের প্রভাবে গ্রাম-সমাজের প্রাচীন রীতি-নীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের কথা আলোচিত হইয়াছে। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের আত্মনিয়ন্ত্রণ-প্রচেষ্টা, সমাজ-শৃঙ্খলা-রক্ষার প্রয়াস বর্তমান যুগের অনুপযোগী প্রাতবেশে কিরূপে প্রতিহত হইয়াছে তাহাই উপন্যাসের বর্ণনার বিষয়। উপন্যাসের চরিত্রসমূহ প্রায় সমান অবস্থার চাষী গৃহস্থ; তাহাদের মধ্যে সমাজ-নেতার উচ্চ আসনে সমাসীন কোন অভিজাত-বংশীয় ব্যক্তি নাই; কাজেই এই গ্রাম্যজীবনে গণতান্ত্রিক সাম্যের প্রভাব অধিকতর পরিস্ফুট। এই সমাজে চারিজন ব্যক্তি সাধারণ সমতার মাত্রাকে অতিক্রম করিয়াছেন। (১) দ্বারিক চৌধুরী জমিদারী-চ্যুত হইয়া সাধারণ চাষীর পর্যায়ে নামিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আত্মমর্যাদাপূর্ণ স্নিগ্ধ ব্যবহার প্রমাণ করে যে, তিনি অর্থগৌরব হারাইয়াও তাঁহার চরিত্রগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। (২) ছিরু ওরফে শ্রীহরি পাল—চাষী হইতে জমিদারে উন্নীত, উচ্চ ও নীচ প্রবৃত্তির অদ্ভুত সংমিশ্রণ। শ্রীহরির সদ্য-অর্জিত সম্পদ্ তাহাকে এখনও আভিজাত্যের কালজয়ী মর্যাদা অর্পণ করে নাই। বুনিয়াদী ঘরের প্রতিষ্ঠা-লাভই তাহার জীবনে সর্বপ্রধান কাম্য; ইহার প্রতি লুব্ধতাই তাহাকে জনহিতকর কার্যে রত করাইয়াছে। (৩) দেবুপণ্ডিত অতর্কিতভাবে এক অত্যুচ্চ আদর্শলোকে উন্নীত হইয়াছে, পল্লীগ্রামের সাধারণ জীবনযাত্রা ও মনোভাবের অনধিগম্য দূরত্বে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার পরিকল্পনায় আদর্শবাদের আতিশয্য গ্রাম্যজীবনের গতিধারার ছন্দোপতন ঘটাইয়াছে। অশিক্ষিত জনসাধারণ ঘেঁটুর গানে তাহার প্রশস্তিরচনার দ্বারা তাহার প্রতি অকৃত্রিম প্রীতিভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছে। দেবুর স্ত্রী-পুত্রকে মৃত্যুকবলিত করিয়া লেখক তাহার চরিত্রে এক লোকাতীত, পৌরাণিক মহিমা অর্পণ করিয়াছেন। (৪) সর্বশেষে মহাগ্রামের মহামহোপাধ্যায় শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন তাঁহার পুণ্যভাস্বর ব্রাহ্মণ্য মহিমা লইয়া এই বিরোধ-তিক্ত, নীচ স্বার্থপরতা ও ইতর লোলুপতার ধূলিজাল-সমাচ্ছন্ন গ্রাম্যসমাজের উপর জ্যোতির্ময়, প্রসন্ন দেবাশীর্বাদের প্রতীকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। উপন্যাসমধ্যে তাঁহার বিশেষ কোন কার্য নাই। পূর্বযুগের সুনিয়ন্ত্রিত, কর্তব্য ও অধিকারের ভারসাম্যে দৃঢ়ীভূত, কল্যাণবুদ্ধি ও ন্যায়পরতার আশ্রয়চ্ছায়াস্নিগ্ধ, গ্রাম্যসমাজ-সৌধের শীর্ষ-

দেশে বিন্যস্ত রত্নময় মঙ্গলকলসের ন্যায় তিনি অপার্থিব জ্যোতিতে দেদীপ্যমান। সমাজের বন্ধনশক্তি যখন শিথিল হইয়া গেল, যখন ইহার বিভিন্ন অংশ সংহতি-ভ্রষ্ট হইয়া খণ্ডীকৃত হইল, তখন সমাজ-চূড়ার এই গৌরব, ব্রাহ্মণ্যশক্তি ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। উপন্যাস মধ্যে দেবুর ভক্তিপ্রণত শিরে ন্যায়রত্নের আশার্বাদ-বর্ষণ সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্ত—সমাজজীবনের চরম সার্থকতার ইঙ্গিত ইহাতে নিহিত।

এই নির্জীব, নিশ্চেষ্ট গ্রাম্যজীবনের প্রাণশক্তির একমাত্র পরিচয় ঈর্ষ্যা-বিক্ষুব্ধ দলাদলিতে। দলাদলির সূত্রপাত কামার, নাপিত, ছুতার, প্রভৃতি শিল্পীদের কাজ ও পারিশ্রমিক সম্বন্ধীয় সনাতন ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘনের জন্য দণ্ডবিধান-চেষ্টাতে। মুমূর্ষু, অক্ষম সমাজ দীর্ঘ অবহেলার পর হঠাৎ শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যে সুবিচার ও ন্যায়নিষ্ঠতা সমাজ-শাসনের ভিত্তি ছিল তাহা বহু পূর্বেই ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। কল-কারখানার সস্তা দ্রব্যজাত গ্রামশিল্পীর আয়ের পরিধি সঙ্কীর্ণ করিয়া তাহাকে কর্তব্য-পালনে শিথিল করিয়াছে। সুতরাং গ্রামবাসীর অভিযোগের বিরুদ্ধে তাহার খুব যুক্তিপূর্ণ উত্তর আছে। ইতিমধ্যে গ্রাম্যসমাজে ধনের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া ইহার শাসনের নৈতিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। যে সমাজ শ্রীহরিকে শাসন করিতে পারে না, অনিরুদ্ধ তাহার কর্তৃত্ব অস্বীকার করে। এইরূপে বহু শতাব্দীর যত্নরচিত বিধি-বিধান, বাহিরের অভিভব, নিজ অন্তর্জীর্ণতা ও ঐশ্বর্যের নিকট নতিস্বীকার এই ত্রিবিধ অস্ত্রে খণ্ডিত হইয়া, নিজ কল্যাণশক্তি হারাইয়াছে। সমাজশাসনের দুর্বলতার রন্ধ্রপথ দিয়া ব্যক্তিগত অত্যাচার ও প্রতিশোধস্পৃহার অরাজকতা আবার মাথা তুলিয়াছে। এই চমৎকারভাবে অঙ্কিত প্রতিবেশের মধ্যেই আধুনিক যুগে পল্লীর জীবনযাত্রা অভিনীত হইতেছে।

বিরোধের উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ায় কয়েকটি লোক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম অনিরুদ্ধ কামার। তাহার মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অনুকূল পবন-প্রবাহে সর্বগ্রাসী অনল-শিখায় প্রজ্বলিত হইয়াছে। এই আগুনে সে তাহার সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য, দাম্পত্য সুখ-শান্তি, সামাজিকতা, আত্মমর্যাদাজ্ঞান সমস্ত আহুতি দিয়াছে। শেষ পর্যন্ত সে একটা দুরন্ত, উন্মাদ ধ্বংসশক্তির বাহনে পরিণত হইয়াছে। স্বেচ্ছায় কারাবরণ তাহার নিঃশেষিত-প্রায় মনুষ্যত্বের শেষ চিহ্নস্বরূপ তাহার ভবিষ্যৎ উদ্ধারের আশ্বাস বহন করে। দ্বিতীয়, শ্রীহরি পাল। তাহার ইতর, লম্পট, প্রভুত্বগর্বোদ্ধত চরিত্রে অতর্কিতভাবে মহত্ত্বের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। ক্ষমতালাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে নৈতিক দায়িত্ববোধ স্ফুরিত হইয়াছে। তাহার শাসন সমাজের কল্যাণার্থী নেতৃত্ব-কামনার উপর প্রতিষ্ঠিত। সময় সময় এই সদ্যোজাগ্রত নীতিজ্ঞানকে অভিভূত করিয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ আদিম বর্বরতা অন্ধরোষে গর্জন করিয়া উঠে; কিন্তু এই পাশবিক স্তরে অবতরণ তাহার বাস্তবতাকে বাড়াইয়াছে। তৃতীয় ব্যক্তি, দুর্গা মুচিনী। তাহার প্রকাশ্য স্বৈরিণীবৃত্তির মধ্য দিয়া অনেক-গুলি সদ্গুণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার সপ্রতিভতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, হৃদয়ের উদারতা, প্রতিবেশীর দুঃখে কষ্টে সহানুভূতি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সৎসাহস তাহাকে নীচকুল ও হেয় বৃত্তির গ্লানি হইতে অনেক ঊর্ধ্বে উন্নীত করিয়াছে। মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া অনিরুদ্ধের স্ত্রী পদ্ম সর্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক। তাহার দাম্পত্য প্রেমের স্বাভাবিক প্রসার প্রতিরুদ্ধ

হইবার ফলে তাহার দেহে মনে নানা জটিল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। দেহে মূর্ছারোগের ব্যাপ্তি ও মনে একপ্রকার নিষ্ক্রিয়, উদাস অসাড়তা তাহার ব্যাধির লক্ষণ। তাহার বিকারগ্রস্ত মনের বিচিত্রতম বিকাশ রাজবন্দী যতীনের প্রতি তাহার অদ্ভুত মাতৃভাবের স্ফুরণ। যতীনের সহিত বয়সের তারতম্য ও পরিচয়ের স্বল্পকালীনত্ব বিবেচনা করিলে এই ভাবের অকৃত্রিমতার প্রতি সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। লেখকের জটিল মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন-বর্জনের প্রবণতার প্রমাণ এইখানে পাওয়া যায়—শুক্তির গর্ভে মুক্তার জন্মের ন্যায় সন্তান-স্নেহবুভুক্ষিতা পল্লীরমণীর হৃদয়ে এই তির্যক-সঞ্চারী বিচিত্র মমতার আবির্ভাব তিনি স্বতঃস্বীকৃতির মত ধরিয়া লইয়াছেন, ইহার বিকাশ ও পরিণতি দেখাইবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। একবার মাত্র যতীনের মুখ দিয়া এই সম্বন্ধের দুরধিগম্য বিস্ময়ের বিষয়ে তিনি সচেতনতা প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যান্য চরিত্রগুলি বিশেষভাবে স্বতন্ত্র ও সক্রিয় না হইয়া পল্লীসমাজের জটিল সংঘাতের মধ্যে নিজ নিজ অপ্রধান অংশ অভিনয় করিয়াছে, উহার সম্মিলিত জীবনধারায় নিজ নিজ ক্ষুদ্র শক্তি মিশাইয়া দিয়াছে। রাজবন্দী যতীন, গ্রামের জীবনযাত্রার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট না হইয়াও, গ্রামের অর্ধস্ফুট রাজনৈতিক সংস্কার ও সামাজিক বিবেক-বুদ্ধিকে স্পষ্টতর আত্ম-সচেতনতার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে।

দেবু পণ্ডিত তাহার অতি উগ্র আদর্শবাদ লইয়া এই সমাজের সহিত খাপ খায় না ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাকে বাদ দিলে উপন্যাসের মধ্যে নায়কের অংশ গ্রহণ করিবার উপযোগী কেহ নাই। কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় স্বার্থসংঘাতে ক্ষুব্ধ, অনিয়ন্ত্রিত, দ্রুত-রসাতলগামী পল্লীসমাজের চিত্র খুব বাস্তবানুযায়ী হইয়াছে। দূর পূর্বদিক্-চক্রবালে, দিগন্তবিস্তৃত কুয়াসার মধ্য দিয়া অরুণোদয়ের ঈষৎ আভাস এই মৃত্যুপথযাত্রী সমাজের সম্মুখে আশার ক্ষীণতম রশ্মির ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রভাব সমাজ-জীবনে কতদিনে কার্যকরী হইয়া ইহার মরণোন্মুখতার প্রতিষেধক হইবে তাহা গভীর সন্দেহের বিষয়। ইতিমধ্যে গ্রাম তাহার ব্রত-পূজা-পার্বণ, তাহার কৃষিলক্ষ্মীর উদ্বোধনকারী উৎসবচক্র, তাহার অন্ধ ভক্তিসংস্কার ও ক্ষুদ্র, আত্মঘাতী কলহ লইয়া চিরাভ্যস্ত কক্ষপথের আবর্তনের মধ্যে অবিচলিত ধৈর্যে নবজীবনের প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে।

'পঞ্চগ্রাম' (জানুয়ারী, ১৯৪৪) 'গণদেবতা'র শেষাংশ—'গণদেবতা'য় পল্লীসমাজের যে ধারাবাহিক জীবনযাত্রা চিত্রিত হইয়াছে তাহারই অনুবর্তন . এই উপন্যাসে পল্লীজীবনের অভ্যস্ত কক্ষাবর্তন কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনের চাপে সংকটময় পরিণতির উগ্রতর আবেগ ও দ্রুততর গতিবেগ অর্জন করিয়াছে। বিশেষতঃ, মুসলমান চাষীদের দৃঢ়তর ইচ্ছাশক্তি ও ঐক্যবোধ জমিদারের খাজনা-বৃদ্ধি-প্রস্তাবের প্রতিরোধে ব্যূহবদ্ধ হইয়া এমন একটা মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার সহিত তুলনায় হিন্দুদের তুচ্ছ সামাজিক আত্মকলহ ছেলেখেলা বলিয়া মনে হয়। এই মুসলমান-সমাজের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল হিন্দুদের সহিত প্রায় অভিন্ন-রূপেই অঙ্কিত হইয়াছে। কৃষি-জীবনের প্রয়োজন-সাম্যে, একত্রাবস্থানে ও একইরূপ সমস্যার নিষ্পেষণে হিন্দু-মুসলমান-সভ্যতার মৌলিক প্রভেদটুকু পশ্চিমবঙ্গে প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্ষার মেঘকে আবাহন করিয়া হিন্দু ও মুসলমান কৃষক প্রায় একই গান গায়; বঙ্গমাতার স্নিগ্ধ শ্যামল প্রতিবেশ তাহাদের মনে একইরূপ সৌন্দর্যবোধের উন্মেষ করে। মুসলমানের উৎসব ও

পূজা-পার্বণগুলি অবশ্য হিন্দুদের হইতে স্বতন্ত্র—এগুলি আরবের উষর মরুভূমি হইতে বাঙ্গালার আর্দ্র-কোমল আবহাওয়ায় স্থানান্তরিত হইয়া সব সময় প্রতিবেশের সহিত ঠিক খাপ খায় নাই। ঘরে যখন শস্যভাণ্ডার নিঃশেষিত তখন উৎসবের কালনির্দেশ মুসলমান চাষীর মনে আনন্দ অপেক্ষা অস্বস্তিই বেশী জাগায়। তারাশঙ্কর মুসলমান সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্যগুলি বেশ সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন—তথাপি মনে হয় যে তিনি হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই এগুলিকে লক্ষ্য ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুসলমান ধর্মজীবন, ইসলাম ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন ও মহাপুরুষের প্রভাব, তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আখ্যায়িকা ও লৌকিক কাহিনী—লেখকের জ্ঞানপরিধি ও অঙ্কনশক্তির বহির্ভূত। ইরসাদ দেবুরই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ; দৌলতশেখ শ্রীহরি ঘোষ ও কঙ্কণার জমিদারবাবুদের স্বগোত্রীয়; কেবল রহম চাচা, অনিরুদ্ধের মত অতিরিক্ত কোপনস্বভাব ও গোঁয়ার হইলেও, তীব্রতর ঝাঁজ ও উগ্রতর আক্রমণাত্মক মনোভাবের জন্য তাহার মুসলমানী মেজাজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছে। জমিদার-পক্ষে যোগ দেওয়ার জন্য সাময়িক আত্মগ্লানি, দেবুর প্রতি বিরুদ্ধতার মধ্যে স্নেহশীলতা ও ভাব-প্রবণতার আতিশয্য তাহার চরিত্রকে সজীব ও অন্য সকল হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছে।

করবৃদ্ধির সম্ভাবনায় পঞ্চগ্রামের কৃষকের মধ্যে ধর্মঘট চালাইবার যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গৃহীত হইযাছে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিরাট ঐক্যবোধের সূচনা হইয়াছে, গ্রামের স্তিমিত জীবন-ধারায় প্রাণ-শক্তির যে উচ্ছ্বসিত জোয়ার আসিয়াছে, দুর্ভাগ্যক্রমে পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ ও আত্মকলহের জন্য, নৈতিক শক্তি ও অধ্যবসায়ের অভাবে, দারিদ্র্যের তাড়নায়, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে ও জমিদারের ষড়যন্ত্র-কুশলতায় তাহা স্থায়ী হয় নাই। একজন আদর্শবাদী ছাড়া প্রায় সকলেই জমিদারের সঙ্গে আপোষ করিয়া দেবুর নেতৃত্বের অমর্যাদা করিয়াছে। এই উৎসাহ ও অবসাদের ক্রমপর্যায়টি, আদর্শবাদের সহিত আত্মরক্ষার দ্বন্দ্বটি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। গ্রাম্য জীবনের আরও কয়েকটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা মহাকাব্যোচিত প্রসার ও উদাত্ত, গৌরবময় বর্ণনাভঙ্গীর সহিত বিবৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ ঘনান্ধকার নিশীথে ডাকাতির সংকেতধ্বনি সুপ্ত গ্রামগুলির ভিতর এক ভয়াবহ সম্ভাবনার রোমাঞ্চ জাগাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ময়ূরাক্ষীর কূলপ্লাবী বন্যার ধ্বংসলীলা—ইহার ভীষণ পূর্বসূচনা ও প্রতিরোধের ব্যর্থ প্রচেষ্টা, এই আগন্তুক বিভীষিকার প্রতি সম্পন্ন ও নিঃস্ব গৃহস্থের বিভিন্ন মনোভাব, বিপন্ন গ্রামবাসীর করুণ অসহায়তা ও যুগযুগান্তর-নির্দিষ্ট পন্থায় আত্ম-রক্ষার প্রয়াস, সর্বোপরি ইহার ফলে গ্রাম্যজীবনের সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যঘটিত বিপর্যয়—এই সমস্ত দৃশ্যগুলি কি দৃঢ়, অকম্পিত রেখায়, কি বলিষ্ঠ, ব্যঞ্জনাপূর্ণ ভাষায়, কি সংযত-গভীর ভাবাবেগের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। অনেক সময় মনে হয়, তারাশঙ্কর ঠিক ঔপন্যাসিক নহেন; তিনি গ্রাম্যজীবনের চারণ কবি। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'-এর সহিত তারাশঙ্করের পল্লীজীবন-চিত্রের তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিস্ফুট হইবে। শরৎচন্দ্র একটি বিশেষ উদ্দেশ্য অনুসারে পল্লীসমাজের একটি খণ্ডাংশ নির্বাচন করিয়াছেন। ইহা প্রধানতঃ রমেশ ও রমার বিরোধ-তিক্ত, অথচ অস্বীকৃত প্রেমের ফল্গু-প্রবাহে স্নিগ্ধ সম্পর্কের পটভূমিকা স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে; আর গৌণত ইহা পল্লীজীবনের সংকীর্ণ স্বার্থপরতা ও হীন নৈতিক আদর্শের বাস্তব চিত্র। তারাশঙ্কর পল্লীজীবনের মূল প্রবাহ

অনুসরণ করিয়াছেন—ইহার উৎসাহ-অবসাদ, গৌরব-গ্লানি, বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা ও মরণধর্মী জড়তা, নূতন ভাবের ও প্রয়োজনের সংঘাতে ও পুরাতন আদর্শের ভাঙনে ইহার অসহায় কর্তব্যবিমূঢ়তা—এই সমস্তই কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের কেন্দ্রানুগ না হইয়া তাঁহার রচনায় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। ঘটনার সরল অগ্রগতি কোন বিশেষ জটিলতার ঘূর্ণাবর্তে পাক খায় নাই, কোন অতলস্পর্শ গভীরতার ইঙ্গিত বহন করে না; সূর্যকরোজ্জ্বল ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গের ন্যায় পথ-চলার মধ্যেই হৃদয়াবেগের ক্ষণিক দীপ্তি ও দাহ বিকীরণ করিয়াছে। রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় তারাশঙ্করের রচনাতেও চরিত্রসৃষ্টি আখ্যায়িকার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে নিহিত আছে; গল্পকে থামাইয়া মন্তব্য ও বিশ্লেষণের অতিপ্রাচুর্যকে তিনি কোথাও প্রশ্রয় দেন নাই। সেইজন্য তাঁহার উপন্যাসে প্রেমের জটিল, ঘাতপ্রতিঘাতসংকুল স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন প্রাধান্য পায় নাই। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে আবেগের সামান্য ছোঁয়াচ, অসামান্য রক্ত-চাঞ্চল্যের ক্ষণিক অনুভূতি, ইহাই তাঁহার প্রেমসম্বন্ধে সচেতনতার নিদর্শন। সমাজচিত্রের ব্যাপক সমগ্রতা, সমাজনীতির সূক্ষ্ম, গভীর আলোচনা, চলমান ঘটনা-প্রবাহের সার্থক, ভাবব্যঞ্জনামূলক বর্ণনা, প্রেমের আপেক্ষিক অভাব—এইসমস্ত লক্ষণ তাঁহার রচনাকে উপন্যাস অপেক্ষা মহাকাব্যের সহিত নিকটতর সম্পর্কান্বিত করিয়াছে।

তারাশঙ্করের অন্যান্য রচনার সহিত তুলনায় 'পঞ্চগ্রাম' সমধিক ঔপন্যাসিক গুণসম্পন্ন। ইহাতে আখ্যায়িকার মালভূমি হইতে বিশেষ কয়েকটি ঔপন্যাসিক মুহূর্ত পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত তাঁহার পৌত্র বিশ্বনাথের আদর্শ-বিরোধ একটা তীব্র ও সাংঘাতিক পরিণতিতে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। তথাপি এই কাহিনীতে কিছু মাত্রায় অতিনাটকীয়ত্ব অনুভূত হয়—এ সংঘর্ষ যেন রক্তমাংসবিশিষ্ট মানুষের মধ্যে নয়, প্রস্তর-কঠিন যান্ত্রিক আদর্শের মূঢ় ঘাত-প্রতিঘাত। বিশ্বনাথের সহিত জয়ার সম্পর্কের অস্পষ্টতা লেখকের প্রেমসম্বন্ধে উপেক্ষার আর একটি দৃষ্টান্ত। অভাবের তাড়নায় ভদ্রগৃহস্থ তিনকড়ির ডাকাতের দলে যোগদান—রহস্য-মণ্ডিত মানবাত্মার একটি চমকপ্রদ বিকাশ। তাহার সমস্ত ব্যর্থ মনুষ্যত্বের ক্ষোভ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিষ্ফল, জীবনব্যাপী প্রতিবাদ, কতকটা অভিমানে, কতকটা উপায়ান্তরের অভাবে এই হিংস্রতার অভিযানে ফাটিয়া পড়িয়াছে। পদ্মের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, গৃহিণীত্ব ও মাতৃত্বের অবরুদ্ধ কামনা, দীর্ঘদিনের প্রধূমিত ভস্মাবরণ ত্যাগ করিয়া এক শেফালি-গন্ধ-বিধুর বর্ষা রাত্রিতে প্রদীপ্ত শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই সুস্পষ্ট আত্ম-প্রকাশের মুহূর্তে পদ্মের মানবিক পরিচয় তাহার সমস্ত দ্বিধাগ্রস্ত জড়তা ও অসুস্থ মনোবিকারের রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া আপন মহিমায় ভাস্বর হইয়াছে। ক্রিশ্চান জোসেফ নগেন্দ্র রায়ের স্ত্রীরূপে নিজ চিরপোষিত স্বপ্নকে সফল করার দৃঢ়সংকল্প সে নিজ নবলব্ধ শক্তির উৎস হইতে আহরণ করিয়াছে। এতদিনে যেন সে উপন্যাসের পাত্রী হিসাবে নূতন জন্ম লাভ করিয়াছে। দুর্গাও তাহার উন্নত বৃত্তিগুলির অনুশীলনের ফলে ও দেবু ঘোষের সংসর্গ-প্রভাবে আত্মবিশুদ্ধির দিকে আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে।

কিন্তু এই উপন্যাসে যাহার পরিচয়-রহস্য সম্পূর্ণরূপে অনবগুণ্ঠিত হইয়াছে সে উপন্যাস-দ্বয়ীর নায়ক দেবু ঘোষ। পূর্ববর্তী উপন্যাসে তাহার ব্যক্তিত্ব আদর্শলোকের জ্যোতিঃতে অনেকটা প্রচ্ছন্ন ছিল। বর্তমান উপন্যাসে সে আদর্শবাদের উচ্চশিখর হইতে সাধারণ গ্রাম্যজীবনের

সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে। গ্রাম্য-সমাজের হীন অবিশ্বাস তাহার নেতৃত্বের শুভ্র নিষ্কামতায় কলঙ্কস্পর্শ ঘটাইয়াছে; পদ্ম ও দুর্গার সহিত তাহার সম্পর্কও প্রতিবেশীর কুৎসা-রটনায় গ্লানিকর হইয়াছে। এই প্রতিবেশ-প্রভাব তাহাকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রকৃতির নিগূঢ় পরিচয় ধরা দিয়াছে বিলু ও খোকনের স্মৃতি-তন্ময়তার মধ্যে তাহার মুহুর্মুহুঃ আত্মবিস্মৃতিতে। এই সমস্ত রন্ধ্রপথে দেশ-প্রেমিকের লৌহ-বর্মের নীচে স্পন্দনশীল মানব-হৃদয় উঁকি মারিয়াছে। তাহার অনলস কর্মনিষ্ঠার ফাঁকে ফাঁকে জোর করিয়া চাপা গার্হস্থ্য জীবনের স্মৃতি মুক্তি পাইয়া তাহার সমস্ত মনকে উদাস করিয়া দিয়াছে। শিউলিতলার আধ-আলো, আধ-অন্ধকারের মধ্যে একবার পদ্ম, আর একবার দুর্গাকে বিলু বলিয়া ভ্রম করিয়া সে নিজ অন্তঃরুদ্ধ আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে নিঃসারিত করিয়াছে। বিলু ও খোকনের জ্বালাময় স্মৃতি তাহাকে অনুশোচনায় পূর্ণ করিয়াছে ও গ্রাম-সেবাব্রত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তীর্থভ্রমণে পাঠাইযাছে। সর্বোপরি ময়ূরাক্ষীর বালুময় গর্ভে শীতসন্ধ্যার গোধূলিতে জঙ্গলের ভিতর বায়ুতাড়িত শুষ্ক পত্ররাশির প্রেতপদধ্বনি তাহার মনে বিলু ও খোকনের আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ ক্রীড়ার ভ্রান্তি জন্মাইয়া তাহাকে এক দীর্ঘস্থায়ী অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মোহাবিষ্ট করিয়াছে। এইখানে তারাশঙ্কর উপন্যাসোচিত উপায়ে তাঁহার নায়কের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। দেশসেবকের পরিচয় বাহিরের পরিচয়; এই আত্মবিভোর মোহাবেশের মধ্যে নায়কের অন্তরঙ্গ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তা ছাড়া তাহার মুহুর্মুহুঃ শ্রান্তি ও অবসাদ, দ্বিধা ও চিত্তবিক্ষেপ, নূতন নূতন উপলব্ধি ও ভাবুকতাময় ভবিষ্যদ্দৃষ্টি তাহাকে জীবন্ত সৃষ্টি হিসাবে 'পথের পাঁচালী'র অপুর সহিত একস্তরে অধিষ্ঠিত করিয়াছে। স্বর্ণের সহিত গ্রন্থশেষে তাহাব ভাব-বিনিময় বোধ হয় উভয়ের মধ্যে এক নূতন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সূচনা করে।

কিন্তু তারাশঙ্করের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব সমগ্র সমাজ-প্রতিবেশের চিত্রণে। 'গণদেবতা'তে সমাজবন্ধন কেমন করিয়া শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, সামাজিক দলাদলির ক্রূরতা ও দুর্নীতিতে তাহা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। 'পঞ্চগ্রাম'-এ এই ধ্বংসোন্মুখ সমাজ যে কয়েকটি অসাধারণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাতে ইহার অন্তর্জীর্ণতা ও যুগধর্মের সহিত ব্যবধান আরও নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। এমন কি মুসলমান-সমাজের অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ সংগঠনও অদূরদর্শিতা ও উচ্চ নৈতিক আদর্শের অভাবের জন্য আধুনিক জীবনসংগ্রামে জয়ী হইতে পারিতেছে না। হিন্দুসমাজ ত ধীরে ধীরে অপ্রতিবিধেয় মরণের দিকে চলিয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দেশত্যাগ সুদীর্ঘকাল হইতে সক্রিয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির হাল ছাড়িয়া দেওয়ার দ্যোতক। যে বিশাল বটবৃক্ষ এতদিন পর্যন্ত সমাজকে স্নিগ্ধ ছায়াশ্রয়ে রক্ষা করিয়াছিল, তাহার উন্মূলনে ইহাকে অভাব ও অসন্তোষের খররৌদ্রতাপ হইতে আচ্ছাদন করিবার আর কিছু রহিল না। এই বণিকধর্মী যুগে কুলদেবতা পর্যন্ত কেনা-বেচার সামগ্রীতে দাঁড়াইয়াছেন। অতীত আদর্শের পরিবর্তে আর কোন নূতন আদর্শ গড়িয়া উঠার সম্ভাবনা এখনও সুদূর-পরাহত। ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথ উপবীত বর্জন করিয়া ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে অস্বীকার করিয়া সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার করিয়াছে—কিন্তু এই নূতন মতবাদের মুখের বক্তৃতা হইতে সমাজের মর্মমূলে সঞ্চারিত হইতে অনেক দেরি। চাষী গৃহস্থ নিঃস্ব হইয়া মজুরে পরিণত হইয়াছে—শ্রমজীবীরা চাষ ছাড়িয়া সহরস্থ কল-কারখানার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। যখন

কোন গণ-আন্দোলন প্রবর্তিত হয়, তখন এই মুমূর্ষু, জড়তাগ্রস্ত জনসাধারণ তাহাতে সাড়া দেয়, দেশের মরা গাঙে আবার নূতন জোয়ার আসে। কিন্তু এই উৎসাহ ও উদ্দীপনা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। এইরূপে আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত সমাজ প্রাণধারণের সমস্ত গ্লানি বহন করিয়া পথ চলিতেছে। এই পথ কোথায় লইয়া যাইবে—মৃত্যুর অতল-স্পর্শ গহ্বরে না নবজীবনের সিংহদ্বারপানে—তাহা অনিশ্চিত। উপন্যাসের শেষে দেবুর কণ্ঠে আশাবাদের সুর ধ্বনিত হইয়াছে, তাহার ধ্যানতন্ময় কল্পনার সম্মুখে ভবিষ্যতের সার্থক, নিরাময় জীবনের উজ্জ্বল ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা কি কল্পনার মরীচিকা না অনাগত বাস্তবের পূর্বগামী ছায়া তাহা কে বলিবে? এই উদ্‌ভ্রান্ত, অনিশ্চয়তার বাষ্পে রুদ্ধদৃষ্টি, অগ্রগতির পথ-খোঁজায় বিমূঢ়, সমাজের ছবি তারাশঙ্করের উপন্যাসে স্মরণীয়ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

'মন্বন্তর' (জানুয়ারী, ১৯৪৪) তারাশঙ্করের পরবর্তী রচনা। ইহাতে লেখক বোমা-বর্ষণের ভয়ে আতঙ্কবিমূঢ় কলিকাতার স্বল্পকালস্থায়ী বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতাকে উপন্যাসের মধ্যে চিরন্তন রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তা ছাড়া দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট, কঙ্কালসার নরনারীর কলিকাতায় অভিযান, খাদ্যনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থায় দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দারুণ দুর্দশা, মহাত্মা গান্ধীর একবিংশতি-দিবসব্যাপী অনশন উপলক্ষে সমস্ত দেশের অসহ্য উদ্বেগ ও রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা—ইত্যাদি যে সমস্ত সমস্যা জনসাধারণের চিত্তকে ইদানীন্তন কালে আলোড়িত করিয়াছে, সেইগুলি উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সংবাদপত্রের স্তম্ভ ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্র, তাহাদিগকে উপন্যাসের পৃষ্ঠায় স্থানান্তরিত করায় উপন্যাসের পরিধি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নূতন করিয়া ভাবিবার প্রয়োজন ঘটিয়াছে। উপন্যাসটি পড়িতে পড়িতে সন্দেহ জাগে যে, ইহা কি সংবাদপত্রেব ঢেঁকির সাহিত্যের পুষ্পকরথে স্বর্গারোহণ, না সাময়িক ঘটনা-বিবৃতির ক্ষেত্রে সাহিত্যের অনধিকার-প্রবেশ? কালের সূতিকাগার হইতে সদ্য-নিষ্ক্রান্ত নবজাত শিশুকে কি সাহিত্যলোকের চিরন্তনতায় উন্নীত করা সম্ভব? যে আঘাত এখনও আমাদের শিরা-স্নায়ুতে অনুরণিত হইতেছে, যে আতঙ্ক আমাদের রক্তপ্রবাহে এখনও সক্রিয়, যে হিমশীতল স্পর্শ এখনও আমাদের হৃৎস্পন্দনকে অবশ ও অসাড় করিয়া দিতেছে, তাহারা কি এত শীঘ্র এই অচির-উপলব্ধ ভয়ের মুখোস খুলিয়া আর্টিষ্টের নিকট নিজ সনাতন সত্যরূপটি উদ্‌ঘাটিত করিবে? ইহারা কি আমাদের ভীতি-বিহ্বলতার ধূম্রলোক অতিক্রম করিয়া চিরন্তন সত্যের সূর্যালোকে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার দূরত্ব ও রূপ-বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে? এই ঘটনাগুলি আমাদিগকে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছে সত্য; লেখকও গভীর আবেগপূর্ণ অনুভূতি ও মননশীলতার সহিত ইহাদের আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি মনে হয় যে, আমরা যাহা পাইতেছি তাহা উপন্যাসের কাঁচা মাল মাত্র, ইহার পরিণত শিল্পসৌন্দর্য নহে।

অবশ্য লেখকের উদ্দেশ্য যে আবেগময় তথ্য-বিবৃতি তাহা নহে; এই সমস্ত তথ্যের সাহায্যে তিনি এক যুগান্তর-সূচনাকারী ধ্বংসোন্মুখতার প্রতিবেশ রচনা করিতে চাহেন। এই চেষ্টার সাফল্যের উপরই উপন্যাসের সার্থকতা নির্ভর করে। এই সর্বব্যাপী আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা, ভয়তাড়িত পশুর ন্যায় সমাজ-সংহতি হইতে দূরোৎক্ষিপ্ত নর-নারীর উন্মত্ত পলায়ন, পারিবারিক বন্ধনচ্ছেদ, সমাজ-ব্যবস্থায় চরম বৈষম্যের বীভৎস আত্মপ্রকাশ, দানবীয় ধ্বংসশক্তির অবাধ

তাণ্ডবলীলা, একদিকে; অপরদিকে, এই প্রলয়-দুর্যোগের মধ্যে মানবের কল্যাণ-কামনা ও সেবাপ্রবৃত্তির উদ্বোধন, মহাত্মার কৃচ্ছ্রসাধনের ভিতর দিয়া অধ্যাত্মশক্তির পুনঃ-প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক সাম্যের উপর নূতন সমাজ ও অহিংসার উপর নব রাষ্ট্রশক্তি-গঠনের মহান্ পরিকল্পনা; এই উভয়ের সমাবেশ এক সুদূরপ্রসারী সাংকেতিকতার অর্থগৌরব বহন করে। কিন্তু এই সাংকেতিক অর্থটি কয়েকটি ব্যক্তি বা পরিবারের মানস পরিস্থিতির মধ্যে ফুটাইয়া তোলাই ঔপন্যাসিকের বৈশিষ্ট্য; এইখানেই রাজনৈতিক আলোচনার সহিত উপন্যাসের প্রভেদ। তারাশঙ্কর এই লক্ষ্য আন্তরিকতার সহিত অনুবর্তন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সাইরেনের ধ্বনি সর্বসাধারণের মনে যে ভীতিশিহরণ জাগায় তিনি তাহাই ফুটাইয়াছেন; কিন্তু ইহা যখন ঘনায়মান অন্তর দুর্যোগের তীক্ষ্ণ ও সার্থক বহিঃপ্রকাশরূপে প্রতিভাত হয় তখনই যে ইহা ঔপন্যাসিকের বিশেষভাবে আপনার বস্তু হয়, এই সত্য তিনি সর্বদা স্বীকার করেন নাই। উপন্যাস মধ্যে যে কয়েকবার সাইরেন বাজিয়াছে তাহার মধ্যে ইহা একবার মাত্র থিয়েটারের রাত্রে কানাই ও নীলার পরস্পরের প্রতি ক্ষুব্ধ অনুযোগভরা, উত্তেজিত হৃদয়বৃত্তির ও কানাই-এর প্রতি হীরেনের অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হিংস্র মনোভাবের সহিত এক সুরে বাঁধা বলিয়া ঠেকে। শেষবার ইহা শিশুর শ্বাসরোধে-মৃত্যু ঘটাইয়া ভাবার্দ্রতার আতিশয্য দ্বারা আমাদের অশ্রুসিক্ত জীবনপথকে আরও কর্দম-পিচ্ছিল করিয়াছে। অন্য সময় ইহা কেবলমাত্র বিপদের যান্ত্রিক সংকেতের অংশ অভিনয় করিয়াছে।

'মন্বন্তর' গ্রন্থে ঔপন্যাসিক আদর্শচ্যুতির রেখাটি স্পষ্টভাবে অনুসরণ করা যায়। গ্রন্থারম্ভে সুখময় চক্রবর্তীর পরিবারের ব্যাধি-বিকৃত, দারিদ্র্যপিষ্ট, অন্তর্জীর্ণ আভিজাত্য-মোহের চিত্রে একটি চমৎকার উপন্যাসের বীজ উপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা অনুভব করি। এই ধ্বংসোন্মুখ পরিবারের যে বংশানুক্রমিক পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা আমাদিগকে Galsworthyর Forsyte Saga-র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বংশ-শাখার ধাপে ধাপে এই বিকৃতির লক্ষণ যে স্ফুটতর ও ক্ষয়জীর্ণতা প্রকটতর হইয়া আসিতেছে তাহা সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। মেজকর্তার যে আভিজাত্য-গৌরব একটা স্পর্ধিত, বেপরোয়া উদারতার স্তিমিত শিখায় বাঁচিয়া আছে, কানাইএর পিতার মধ্যে তাহা স্বার্থপর, অক্ষম ভোগলোলুপতায় নির্বাপিত হইয়াছে; আবার কানাইএর ছোট খুড়িমার মধ্যে তাহা শ্লেষব্যঙ্গ-বক্রোক্তিপ্রবণতায় নিষ্ঠুর আঘাত হানিয়া পৃথিবীর উপর প্রতিশোধ তুলিবার প্রবৃত্তিতে, এক বিকৃত রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। এই বংশের গৃহিণীদের অন্ধ পাতিব্রত্য ও মূঢ় ভক্তি-বিহ্বলতা ইহার শোচনীয় ক্ষয়শীলতাকে করুণ অসহায়তার ম্লান গোধূলি-ছটায় অভিষিক্ত করিয়াছে। কানাইএর উপর মেজকর্তার তীব্র রোষের অগ্ন্যুৎক্ষেপ ও ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের পর ক্ষমাস্নিগ্ধ আশীর্বাদবর্ষণ, তাঁহার মধ্যে যে সত্যিকার মহিমান্বিত বংশপ্রেরণা ছিল তাহার শেষ-রশ্মি-বিকীরণ। গীতাদের বাড়ির আভ্যন্তরীণ অবস্থাও উপন্যাসের প্যাটার্ণের মধ্যে পড়ে; কিন্তু দেবপ্রসাদের গার্হস্থ্য জীবনে রাজনৈতিক প্রভাবেরই প্রাধান্য। লেখক চক্রবর্তী বংশের কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী উপেক্ষা করিয়া বোমাবিভ্রাটে পর্যুদস্ত সাধারণ নাগরিক জীবনের প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। অবশ্য চক্রবর্তীবাড়ির উপর বোমা ফেলিয়া তিনি কতকটা তাঁহার প্রথম পরিকল্পনার অনুবর্তন করিয়াছেন—দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে,

জীবনের সুস্থ অগ্রগতির সহিত নিঃসম্পর্ক, মাকড়সার জালের মত নিজ অসুস্থ মনোবিকারের জটিল পাকে বন্দী, অতৃপ্ত ভোগকামনার অন্তঃরুদ্ধ উত্তাপে দেহে ও মনে জীর্ণ, বংশের উপর বিধির অমোঘ ব্যবস্থায় প্রলয়ের বজ্র নামিয়া আইসে। কিন্তু এই প্রমাণে অনিবার্যতা অপেক্ষা আকস্মিকতারই উপাদান বেশী। লেখক দৈনিক সংবাদপত্র হইতে সংবাদ-সংকলনে অতি-মাত্রায় ব্যগ্র হইয়া এই চমৎকার ঔপন্যাসিক সম্ভাবনাটির অকালমৃত্যু ঘটাইয়াছেন। তিনি সস্তা জনপ্রিয়তার মোহে আত্মসমর্পণ করিয়া ঔপন্যাসিকের উচ্চ চূড়া হইতে সাংবাদিকতায় (journalism) সমতলভূমিতে অবতরণ করিয়াছেন।

উপন্যাসের চরিত্রগুলির ব্যক্তিগত জীবন, সাধারণ বিপৎপাত যে অভিন্ন যৌথ অবস্থার সৃষ্টি করে, তাহার দ্বারা অভিভূত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কানাই-গীতার ব্যক্তিগত জীবন সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট। কানাই ব্যক্তিগত প্রেরণায় নিজ পরিবারের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে; নীলার প্রতি আকর্ষণে হৃদয়াবেগ অপেক্ষা আদর্শ-সাম্যই অধিকতর প্রভাবশীল। গীতার তরুণ জীবনের নিদারুণ অভিজ্ঞতার স্মৃতি তাহার সমস্ত পরবর্তী জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে। নীলা ও নেপীর ব্যক্তিত্ব রাজনীতি ও সমাজসেবার রথচক্ররজ্জুর সহিত অচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা পড়িয়াছে। নীলাকে আমরা ঠিক প্রেমিকারূপে উপলব্ধি করিতে পারি না—পিতার সন্দেহপরায়ণতার প্রতিবাদস্বরূপ গৃহত্যাগ করিয়া সে নিজ স্বাধীন জীবন খুঁজিয়া পায় নাই, বোমা-বিস্ফোরণের ঘূর্ণাবর্তে অন্ধ বেগে ঘূর্ণিত হইয়াছে। বরং হীরেনের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কিছু পরিচয় মিলে—কানাইএর উপর তাহার ছুরিকাঘাত এই প্রাণশক্তিরই মুহূর্তের জন্য স্ফুরণ। বিজয়দার পারিবারিক জীবনের বালাই নাই—তাঁহার জীবনের সমস্ত শক্তিই তিনি সমাজসেবায় উৎসর্গ করিয়াছেন, কাজেই এই নিম্নতর স্তরে তিনি বেশ সজীব। এই অর্ধজীবিত, প্রতিবেশের সর্বগ্রাসী প্রভাবে রাহুগ্রস্ত, প্রাণীগুলির মধ্যে মেজকর্তা জরাজীর্ণ সিংহের ন্যায় দৃপ্ত কেশর ফুলাইয়া দণ্ডায়মান। তাঁহার থিয়েটারী অভিনয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে সত্যকার বীরত্বের সুর লাগে। ইহারই প্রাণস্পন্দন লেখক মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন—বাকী সমস্ত চরিত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য স্তর অতিক্রম করে নাই।

(৬)

'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' (আষাঢ়, ১৩৫৪)—তারাশঙ্করের উপন্যাসাবলীর মধ্যে কেবল যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে তাহাই নয়, বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও ইহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। একটা সমগ্র গোষ্ঠীর প্রাণস্পন্দন ও মর্মরহস্য, সমগ্র সমাজবিন্যাসের মূলতত্ত্ব ও অন্তর-প্রেরণা এই যুগান্তকারী উপন্যাসে স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ইহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয় নাই, ব্যক্তি এখানে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইলেও গৌণ; সমাজের পারিপার্শ্বিক চাপ প্রত্যেকের উপরেই গভীর রেখায় মুদ্রিত। এই উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক হিন্দুধর্মের নিম্নবর্ণীয় সমাজ—যে সমাজ বহু শতাব্দীর শিক্ষা-দীক্ষায়, কর্মে ও চিন্তায়, জীবনাদর্শের সর্বস্বীকৃত ও প্রাণমূল-জড়িত প্রভাবে, এক জীবন্ত, অত্যাজ্য সংস্কৃতির আধাররূপে বিকশিত হইয়াছে। এই হাঁসুলি বাঁকের ইতিহাসের অতি সামান্য অংশ মাত্র মানুষের চেষ্টায় রচিত হইতেছে। ইহার মানুষ অধিবাসীগুলি উহাদের ব্যক্তিগত প্রীতি-

দ্বেষ-ঈর্ষা-লালসা-কামনার পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণে আকাশ-বাতাসকে ক্ষুব্ধ করিলেও আসলে এক মহত্তর শক্তির হাতে ক্রীড়নক। উহার বনোয়ারি-করালী-সুচাঁদ-পাখী-নসুবালা-কালো বৌ-পরম প্রভৃতি আপন আপন জীবন কক্ষাবর্তনের পথে চলিতে চলিতে পরস্পরের মধ্যে নানা দুশ্ছেদ্য জটিলতা-জাল সৃষ্টি করিলেও এক দুর্নিরীক্ষ্য, অথচ তাহাদের নিকট অতি প্রত্যক্ষ সুস্পষ্ট দৈব রহস্যের অঙ্গুলি সংকেতে পরিচালিত অক্ষগুটিকা মাত্র। যে মাটি তাহাদের কর্মক্ষেত্র ও জীবনের রঙ্গভূমি তাহার উপরের বায়ুস্তর সদা-সক্রিয়, অদৃশ্য দেবাত্মার পক্ষসঞ্চালনে চঞ্চল। বালক যেমন সূক্ষ্ম সূত্রাকর্ষণে আকাশের ঘুড়ির গতিকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি এই দৈবশক্তি-অধ্যুষিত হাঁসুলি বাঁকে আকাশ-বিহারী কালারুদ্র ও বিল্ববৃক্ষ-সঞ্চারী কর্তাবাবা সমস্ত মানুষের ভাগ্য লইয়া খেলিতেছেন; তাঁহাদের সূক্ষ্ম-সর্বব্যাপী প্রভাব প্রতি মানুষের চিন্তাধারায়, জীবন-রহস্য-উপলব্ধিতে ও স্থূল কর্মপ্রয়াসে সুপ্রকট। এই উপন্যাসে প্রাচীন মহাকাব্যের নিয়তিবাদ, ও দেবতা মানুষের অন্তরঙ্গ সম্পর্কে রচিত, দ্যাবা-পৃথিবীর মিলন-সংবেগ-প্রসূত, দ্বি স্তর-বিন্যস্ত জীবনযাত্রা যেন অতি-আধুনিক যুগের সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রতিবেশে এক আশ্চর্য মন্ত্রকুহকে অক্ষুণ্ণ, অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে।

গ্রন্থটির নামকরণের মধ্যেই ইহার অন্তঃপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে। ইহা ইতিহাস নহে, উপকথা। ইহার জীবনযাত্রা অতিপ্রাকৃতের ঘন-কুহেলিকা-মণ্ডিত; পৌরাণিক কল্পনা, অলৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাস, প্রাচীন কিংবদন্তী ও আখ্যান, সদ্য অতীতের ঘটনা-প্রতিফলিত জীবনদর্শন এ সমস্তই প্রাত্যহিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট। হাঁসুলি বাঁকের কাহারদের জীবনদর্শন অপরিবর্তনীয়ভাবে স্থিরীকৃত—তাহাদের জীবনে যাহা কিছু ব্যতিক্রম ও বিপর্যয়, যাহা কিছু আকস্মিক ও অসাধারণ সবই দেব-লীলা, অদৃশ্য শক্তির দুর্বোধ্য অভিপ্রায় হইতে উৎক্ষিপ্ত। সূর্যালোক ও বায়ুপ্রবাহের ন্যায় এই অলৌকিক সত্তার রশ্মি-বিকীরণ তাহাদের আকাশ-বাতাসের প্রতিটি অণুপরমাণুতে পরিব্যাপ্ত। অশীতিপর বৃদ্ধা সুচাঁদ এই দৈবশক্তির অনুভবকারিণী ও ব্যাখ্যাত্রী; হাঁসুলী বাঁকের জন্মবৃত্তান্ত, উহার অতীত কাহিনী, উহার কৈশোর ও প্রথম যৌবনের সমস্ত উদ্ভট কল্পনা ও অপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা, পারলৌকিক জগৎ হইতে অভ্যাগত প্রতিটি ধ্বনি ও স্পর্শ, দেবতার রোষ ও প্রসাদের প্রতিটি নিদর্শন তাহার স্মৃতির ঐতিহাসিক আধারে অখণ্ড সমগ্রতায় ও প্রথম অনুভূতির গাঢ় বর্ণলেপে অবিস্মরণীয়ভাবে রক্ষিত। সে এই সম্প্রদায়ের prophet বা অধ্যাত্মলোকের সহিত যোগাযোগ-রক্ষার সেতু। তাহার অতীত-স্মৃতিপুষ্ট, তীক্ষ্ণ অনুভূতির বেতার-যন্ত্রে দেব-লোকের নিগূঢ় অভিপ্রায়, আগামী বিপদের ছায়া, বর্তমান ঘটনার তাৎপর্য সমস্তই অভ্রান্ত-ভাবে লিপিবদ্ধ ও বোধগম্য হয়।

সুচাঁদ যে কাহার-সমাজের ঐতিহ্যরক্ষক ও আধিদৈবিক বিপদের সংকেতবাহী, মাতব্বর বনোয়ারি তাহার দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার পরিচালক ও ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ-সাধনের প্রধান হোতা। সুচাঁদের দৃষ্টি অতীত-পরাবৃত্ত ও উর্ধ্বলোক-নিবিষ্ট—বর্তমান তাহার নিকট জীবনধারণের কালাধার হইলেও তাহার মানসলোকে ইহা গৌণ। ঠিক অতীতের ছাঁচে বর্তমান ঢালা হইতেছে কিনা ও কালারুদ্র ও কর্তাবাবার ইঙ্গিত ঠিক মত ইহার মধ্যে অনুসৃত হইতেছে কি না, সে দিকে তাহার অতন্দ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বনোয়ারির সহিত তাহার

সাময়িক মতানৈক্য ঘটিলেও, উভয়ের মধ্যে একটি নিবিড় আত্মিক সংযোগ আছে। বনোয়ারির মনোযোগ বর্তমান ও অতীতের, ঐহিক সুখ-সচ্ছলতা ও চিরাচরিত, দেবনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণের মধ্যে তুল্যরূপে বিভক্ত। সে সুচাঁদের মত সর্বদা অতীত স্মৃতিরোমন্থনে বিভোর নয়, কিন্তু ঐতিহ্যশাসনের প্রতি তাহার অমুল্লঙ্ঘনীয় আনুগত্য। যে মুহূর্তে তাহার প্রতীতি বা সন্দেহ জন্মিয়াছে যে বর্তমানের কর্মধারা অতীত-চক্রচিহ্নিত পথ হইতে লেশমাত্র বিচ্যুত হইয়াছে, অমনি সে গতিশীল রথের রাশ টানিয়া ধরিয়া উহার মোড় ফিরাইয়াছে। সে সাংস্কৃতিক রক্ষণশীলতার চরম ও পরম দৃষ্টান্ত। কোন নূতন, অপরীক্ষিত কর্মপদ্ধতির প্রতি তাহার আপোষহীন বিরোধ ও অপ্রশমিত সংশয়। কুলাচার তাহার জীবন-নিয়ামক ধ্রুবতারা—ইহার লেশমাত্র ব্যতিক্রম তাহার চক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। সমাজপতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ তাহার মধ্যে রূপায়িত—সমগ্র কাহার-সমাজের কল্যাণ-কামনা তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থকে অতিক্রম করিয়া তাহার একাগ্র সাধনার বিষয়। তাহার চরিত্র-পরিকল্পনায় সমাজ-সত্তা ও ব্যক্তি-সত্তা এরূপ নিবিড় একাত্মতায় মিশিয়া গিয়াছে, যাহা উপন্যাস-সাহিত্যে দুর্লভ। কাহাব-বংশের সমস্ত সংস্কার বিশ্বাস, সমস্ত ঐতিহ্যগত মানস রূপ বনোয়ারিতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। তাহার চবিত্র কতটুকু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুশীলনের ফল, কতটাই বা সমষ্টিগত সমাজ প্রেরণার পবিণতি তাহাব ভেদ-রেখা-নি য় অসম্ভব। বনোয়ারিই কাহার-সমাজ, এবং কাহাব-সমাজের ব্যক্তিগত উৎকেন্দ্রিকতা বাদ দিলে যে সর্বসাধারণ সারাংশ অবশিষ্ট থাকে তাহাই বনোযারি।

এই উপন্যাসেব প্রকৃত নায়ক কোন ব্যক্তিবিশেষ নহে, হাঁসুলি বাঁকের প্রাকৃতিক পরিবেশ, অধ্যাত্ম ভাবমণ্ডল ও এই উভয়ের বেষ্টন-রেখায় সংহত একটি মানব-সমাজ। বাস্তবিক সমস্ত সমাজ-মনের এরূপ ভাবঘন, অন্তঃসংগতিশীল, নিবিড় নিশ্ছিদ্র চিত্র যে কোন দেশের কথা-সাহিত্যে বিরল। প্রতিটি ব্যক্তিচরিত্রের ভিতর দিয়া এই সমগ্র সংস্কৃতি ও জীবন-দর্শন আংশিক বা পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত। তাহাদের হিংসা-দ্বেষ, কলহ বিবোধ, লোভ অসংযম, স্বার্থসংঘাত, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সবই এক সমীকরণকারী জীবনবোধেব অন্তর্ভুক্ত। পাখীর কূটনীতি ও শঠতা, পরমের হিংস্র জিঘাংসা, কালো-বৌর মদিব লালসাময় মোহ-বিহ্বলতা, বনোয়ারির ক্ষণিক অসংযম, নসুবালার রমণী সুলভ হাব-ভাব ও আচরণ, পাগলের উদাসীন সংসার-নির্লিপ্ততা ও স্বতঃস্ফূর্ত কবি-মনের বিকাশ যেন একই গভীর-স্তরশায়ী জীবন-রসপ্রবাহের উপর বিভিন্ন রংএর বুদ্‌বুদ্‌লীলা। এই সমাজের সমগ্র চিত্র শুধু যে বাস্তব, নিখুঁত ফটোগ্রাফ তাহা নহে, ইহার উপরে সঞ্চরমান দৈব শক্তি, প্রতিটি কর্মের পিছনে আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণা, চিত্তের নিগূঢ়ে ক্রিয়াশীল ভাব-কল্পনা ও ঐতিহ্য-প্রভাব, এবং ইহার মধ্যে প্রবাহিত একটি প্রাণবৈদ্যুতীপূর্ণ জীবনানন্দলীলা মনোলোকের এই সমস্ত নিগূঢ় পরিচয় এই উপন্যাসে স্বচ্ছ-সুন্দর হইয়া ফুটিয়াছে।

যে জীবন-নীতি কাহার-সমাজের সংসার-যাত্রার পিছনে উদ্দেশ্য ও গতিবেগ যোগাইয়াছে তাহাতে শাসন ও প্রশ্রয়, দেবতার ইচ্ছার নিকট সম্পূর্ণ বশ্যতা ও ইন্দ্রিয়-লালসার যদৃচ্ছ অসংযম এক অদ্ভুত সমন্বয়ে মিলিত হইয়াছে। ইহাদের সামাজিক হীনতা ইহারা শুধু স্বেচ্ছায় নয়, সানন্দে মানিয়া লইয়াছে। উচ্চ বর্ণের হিন্দুর প্রতি ইহাদের মনোভাব শ্রদ্ধা-

বিনয়ে মধুর, অখণ্ডনীয় দৈব বিধানরূপে স্বীকৃত ও সম্পূর্ণভাবে বিদ্বেষ ও হীনম্মন্যতা-মুক্ত। সাম্যবাদ-নির্ভর আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান এই মনোভাবকে দাস-সুলভ ও অজ্ঞতা-প্রসুত বলিয়া ধিক্কার দিবে ও ইহাকে উৎসাদন করাই যে অগ্রগতির একমাত্র উপায় এই মতবাদ সমর্থন করিবে। ইহা সত্য হইতে পারে; কিন্তু আনন্দময় সার্থকতাবোধই যদি সমাজ-সংস্থিতির প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে উগ্র প্রতিযোগিতা ও অপ্রশমিত ঈর্ষ্যা ও অসন্তোষের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন ভবিষ্যৎ সমাজ কি দরিদ্রের মনে অনুরূপ শান্তি ও সংহতিবোধ আনিয়া দিবে? ইহাদের চৌর্যবৃত্তি, সুরাসক্তি ও অবৈধ যৌন লালসা সবই যে বিধাতা তাহাদিগকে নিম্নবর্ণের করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারই বিধানের অঙ্গীভূত—সুতরাং এই সমস্ত পাপাচরণে তাহারা কোন বিবেক-দংশন অনুভব করে না। উচ্চবর্ণের সহিত তাহাদের স্ত্রী-সকলের অবৈধ সংসর্গও তাহারা উপেক্ষার চক্ষে দেখে। এ বিষয়ে যদি তাহাদের কিছু আপত্তি বা প্রতিবাদ থাকে, তাহা নিজেদের পারিবারিক পবিত্রতার জন্য নহে, বরং উচ্চবর্ণের মর্যাদা-হানির সম্ভাবনা-বিষয়ক। তাহাদের নীতিজ্ঞানের এই অদ্ভুত অসঙ্গতিপূর্ণ চিত্রটি যেরূপ অন্তর্ভেদী মনস্তত্ত্বজ্ঞানের সহিত অঙ্কিত ও সামগ্রিক জীবনবোধের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহা উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি-প্রতিভা ও বর্ণিত বিষয়ের সহিত কল্পনাগত সমপ্রাণতার নিদর্শন।

এই শিথিল, অথচ দৈব সমর্থনের দ্বারা দৃঢ়ীভূত, নৈতিক পরিবেশের মধ্যে ভালবাসা উহার সমস্ত বন্য, উদ্দাম শক্তি লইয়া আবির্ভূত হয়। ভদ্র সমাজে যে প্রবৃত্তিকে আত্মপ্রকাশ করিতে নানা দুনিরীক্ষ্য রন্ধ্রপথ ও বিরল অবসরের প্রতীক্ষা করিতে হয়, এই নিম্নশ্রেণীর জন-সমাজে তাহা বর্ষাস্ফীত কোপাইএর দুর্বার বন্যাস্রোতের মতই মানব-জীবনে ঝাঁপাইয়া পড়ে—চারিদিকের উদ্ভিদ প্রকৃতির আরণ্য অজস্রতার মতই ইহার বহু-বিসর্পিত, অন্ধ মাদকতায় চিত্তবিভ্রমকারী, উন্মত্ত প্রকাশ। এই আদিম, অসংস্কৃত প্রবৃত্তির বেগবান উচ্ছ্বাসকে কাহার-সমাজে 'রংএর খেলা' এই চিত্রল (picturesque) বর্ণনার দ্বারা অভিহিত করা হয়। উপন্যাস মধ্যে রংএর খেলার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে ও কাহার-সমাজে প্রধান আলোড়নগুলি ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই ঘটিয়াছে। এই অবৈধ প্রেমের অনিবার্য বিস্ফোরক শক্তির মাধ্যমে মানবের দৈবনিরপেক্ষ স্বাধীন ইচ্ছার স্ফুরণ হইয়াছে। বনোয়ারির প্রথম যৌবনে এই জাতীয় একাধিক অবৈধ হৃদয়-সম্পর্ক ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহার দায়িত্বপূর্ণ মাতব্বরি পদ এদিকে তাহাকে সংযত ও সাবধান করিয়াছে। পূর্ব প্রেমের স্মৃতির রং সে সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার বাহ্য আচরণে সে সমাজ-নেতার উপযুক্ত অনিন্দনীয় আদর্শ অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। নয়ানের মার অসামাজিক মনোভাব ও ঈর্ষ্যা-দ্বেষের আতিশয্যকে সে পূর্ব প্রণয়ের খাতিরে প্রশ্রয় দিয়াছে, কিন্তু তাহার জীবনে শনি প্রবেশ করিয়াছে কালো বৌএর প্রতি তাহার অপ্রতিরোধনীয়, দৈবাভিশপ্ত আকর্ষণের রন্ধ্রপথে। এই ভাগ্য-বিড়ম্বিত প্রণয়ের ফলে কাহার-সমাজে ভূমিকম্পের ফাটল ধরিয়াছে—কালো বৌ দেবরোষের বাহন সর্পদংশনে প্রাণ দিয়াছে। পরমের সহিত বনোয়ারির দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে দেবাসুরের সমুদ্র-মন্থনে হলাহলের ন্যায় এক অসহনীয়, সমাজ-উন্মূলনকারী পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে; এবং ইহার সদ্যো-ফল বনোয়ারির প্রতিষ্ঠা-বৃদ্ধির কারণ হইলেও শেষ পরিণতিতে ইহা সুবাসীর অবিশ্বাসিতায় ও করালীর সহিত সংঘর্ষে বনোয়ারির সম্ভ্রম-মর্যাদার অবসান ঘটাইয়া

উহাকে মরণের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে। অপরাধের এমন অমোঘ, ন্যায়দণ্ডমূলক শাস্তি, নিয়তির এরূপ সূক্ষ্ম বিচার-রহস্য এক গ্রীক ট্র্যাজেডি ছাড়া অন্য কোন সাহিত্যে এত মর্মান্তিকভাবে প্রকটিত হয় নাই ও পাঠকের মনে দৈববিধানের প্রতি এরূপ ভীতিমিশ্র, অথচ ন্যায়ানুমোদিত স্বীকৃতি জাগায় নাই। করালী ও পাখীর প্রণয়সঞ্চার ও উহার ভয়াবহ পরিসমাপ্তি ঐ একই সত্যের পরিপোষক। একমাত্র বসনের প্রেম শান্ত একনিষ্ঠতায় গৌরবমণ্ডিত হইয়া প্রবৃত্তি-প্রধান দুরন্ত হৃদয়াবেগের বিপরীত দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়াছে। আবার পাগলের গ্রাম্য ছড়ায় এই প্রেমের দুর্জ্ঞেয় রহস্য ও অতর্কিত বিস্ফোরণের প্রশস্তি রচিত হইয়াছে। কাহার-সমাজ শুধু যে সমাজ বিরোধী প্রেমের নায়ক-নায়িকার লীলাভূমি তাহা নয়, যে কবি ইহার প্রতি সারস্বত অভিনন্দন জানায় তাহারও প্রসূতি।

বহু শতাব্দীর সংস্কৃতি-পুষ্ট, নিবিড়-ঐক্যবদ্ধ এই সমাজের অবসান আমাদের মনে এক কারুণ্যমণ্ডিত বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ো পরধর্মো ভয়াবহ'—গীতার এই অমর উক্তি বনোয়ারি মনে প্রাণে গ্রহণ করিয়াছিল। করালীর প্রতি তাহার ক্ষমাহীন, অনমনীয় বিরোধিতার মূলই এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাস। কিন্তু সমস্ত সমাজবিন্যাস অধ্যাত্ম-ভাবাত্মক হইলেও মূলত অর্থনৈতিক ভিত্তিনির্ভর। অর্থনীতির গুরুতর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজব্যবস্থাও পরিবর্তিত হইতে বাধ্য। কাহার-সমাজে অতীতেও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটিয়াছে। কিন্তু তখন নীলকর সাহেবদের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায় এই ফাটল মন পর্যন্ত পৌঁছাইবার সুযোগ পায় নাই—বন্যা-দুর্ভিক্ষের পীড়ন দ্রুত উপশমিত হওয়ায় তাহাদের পূর্বতন ঐতিহ্য ও মনোভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু আধুনিক যুগের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও জীবননীতি উচ্চবর্ণের ভাব-তটভূমি উপচাইয়া কাহার-জীবনের সুরক্ষিত বেষ্টনী-রেখাতে আঘাত হানিয়াছে ও উহার মানসলোকে এক অস্বস্তিকর কম্পন জাগাইয়াছে। তাহাদের আধুনিক মুনিবদের স্বার্থপরতা ও সহানুভূতির অভাব তাহাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে ঘনীভূত করিয়া তাহাদের সামগ্রিক চিত্তকে পরিবর্তনোন্মুখ করিয়াছে। মহাযুদ্ধের আহ্বান, যন্ত্রযুগের আত্মকেন্দ্রিক আমন্ত্রণ তাহাদের নির্জন,বাঁশবনের জঙ্গলের দুর্ভেদ্য পরিবেশকে ভেদ করিয়া তাহাদের কানে পৌঁছিয়াছে ও জীবিকার্জনের দুর্দম প্রেরণা তাহাদের বহুশতাব্দীর অধ্যাত্ম-সংস্কার-শাসিত চিত্তে এক কর্তব্যভারমুক্ত, বিলাস-বিভ্রমে লোভনীয়, স্বেচ্ছাচারের অনুবর্তনে নিরঙ্কুশ, অভিনব জীবন-আস্বাদনের রোমাঞ্চ জাগাইয়াছে। যুদ্ধের নির্মম প্রয়োজন কালারুদ্র ও কর্তাবাবার দেবস্থানকে রণসম্ভারের গুদামে পরিণত করিয়া, কোপাইএর ধারের নিবিড়চ্ছায় বৃক্ষরাজি ও বাঁশবনের উৎসাদন করিয়া তাহাদের মনের আধিদৈবিক আশ্রয়কে বিলুপ্ত করিয়াছে—তাহারা এক মুহূর্তে প্রদোষান্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগ অতিক্রম করিয়া প্রয়োজনের পাকা সড়ক ধরিয়া যন্ত্রসভ্যতার কেন্দ্রস্থলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। একটা সমগ্র সভ্যতা, একটা বহুযুগের জীবনাদর্শ, অধ্যাত্মপ্রভাবিত মানব-জীবনের একটা অর্ধমূঢ় অবশেষ যেন আধুনিকতার বিস্ফোরণ-বহ্নিতে নিমেষে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু যদি যুগপ্রভাব ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন এই মধ্যযুগীয় সমাজ-সত্তা-বিলোপের এক মাত্র কারণ হইত, তবে তারাশঙ্করের উপন্যাসটি কেবল সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্যপূর্ণ একটি চিত্ররূপেই পরিচিত হইত। কিন্তু গ্রন্থকারের ঔপন্যাসিক প্রতিভা এই সমস্ত কারণকে এক বিরাট ব্যক্তিত্ব-

পূর্ণ,আধুনিকতার উদ্ধত বিদ্রোহ ও আত্মনির্ভরশীল সাহসিকতার প্রতিমূর্তি পুরুষের মধ্যে সংহত করিয়া ইহার মানবিক আবেদন ও মহাকাব্যোচিত সংঘর্ষ বহুগুণে তীব্রতর করিয়াছে। করালী উপন্যাসের প্রতি-নায়ক ও আগামী যুগের নূতন সম্ভাবনার ধারক ও বাহক। সমস্ত উপন্যাসটি যেন অতীত ও আধুনিক যুগের দুই প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তিসত্তার শক্তি-প্রতিযোগিতার রঙ্গভূমি। বনোয়ারির বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অনমনীয় জীবন-নীতির পিছনে যেমন বহুযুগাগত প্রাচীন আদর্শ ও কুলাচারের সঞ্চিত শক্তি ক্রিয়াশীল, তেমনি করালীর মধ্যে যন্ত্রযুগের আত্মা, উহার নির্ভীক স্বাধীনচিত্ততা, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা ও বিচিত্র কর্মোদ্যম ও উদ্ভাবন-কৌশল লইয়া মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। বনোয়ারি সমাজের সংহত পরাক্রম, শাশ্বত নীতিবোধ ও অপরিবর্তনীয় অন্ধসংস্কারের সহযোগিতায় আপাতত অজেয়রূপে প্রতিভাত হইলেও করালীর একক শক্তি, যে অমিত তেজে ভূগর্ভপ্রোথিত বীজ মাটির কঠিন স্তর ভেদ করিয়া অদম্য প্রাণলীলায় অঙ্কুরিত হয়, তাহারই মত সমস্ত রক্ষণশীল জড়তার উপর শেষ পর্যন্ত জয়ী হইয়াছে। মানবমনের অর্ধ-চেতন স্তরে জীবনকে নূতনরূপে আস্বাদন করিবার যে আকাঙ্ক্ষা গোপন বাসা বাঁধিয়াছে, যুগের সেই অস্পষ্ট, অনুচ্চারিত অভিলাষ তাহাকেই বাহনরূপে অবলম্বন করিয়াছে। বনোয়ারি-নেতৃত্বের অভিভব-পীড়িত কাহারেরা যখন সেই পুরাতন জাঙ্গুল-বাঁশবাদি/কোপাইনদীর ভৌগোলিক সীমার মধ্যে দেহ-পরিক্রমা করিয়াছে, তখন তাহাদের মন নূতন সভ্যতার কেন্দ্র, নূতন ঐশ্বর্যলীলার রঙ্গভূমি, মানব মনীষার নব বিকাশ-তীর্থ, প্রাণশক্তির আতিশয্যস্থরার মাতালখানা চন্নপুর রেলওয়ে ষ্টেশন ও সেখানকার বিরাট, অতিকায় যন্ত্রশালার প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়াই ভবিষ্যতের স্বপ্নজাল রচনা করিয়াছে।

অতীত-ভবিষ্যতের এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে নবীনের জয়ই অবশ্যম্ভাবী, কেননা তাহারই পিছনে প্রাণৈষণা, অগ্রগতির দুর্বার স্পৃহা। যেমন পরম-বনোয়ারির দ্বন্দ্বে অধিকতর প্রগতিশীল ও উন্নততর জীবননীতির প্রতীক বনোয়ারির জয় সুনিশ্চিত,তেমনি সেই একই কারণে বনোয়ারি-করালীর দ্বন্দ্বে দীর্ঘকাল জয়-পরাজয় অনিশ্চিত থাকিলেও শেষ পর্যন্ত বিজয়-লক্ষ্মী নবীনের দিকেই ঝুঁকিয়াছেন। সে নবতর জীবন-প্রেরণার বাহন বলিয়াই কর্তাবাবার বাহন চন্দ্রবোড়া সাপকে পোড়াইয়া মারিবার অকুতোভয়তা সঞ্চয় করিয়াছে। নানা বিচিত্র ঐতিহ্যলঙ্ঘী পরিকল্পনা তাহার মনোলোকের অধিবাসী। পাখীকে নয়নের কাছ হইতে ছিনাইয়া লইতে সে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করে নাই ও সমাজ-সমর্থনের মুখাপেক্ষী হয় নাই। বনোয়ারি কতকটা রং এর খেলার প্রতি তাহার নিজের দুর্বলতা ছিল বলিয়া ও কতকটা প্রেমের স্বাধীন মর্যাদার অনুরোধে এই অসামাজিক সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়াছে। সে করালীকে পোষ মানাইবার জন্য নানা চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু করালীর স্বাধীন-চিত্ততা কোন দলপতির শাসন মানিয়া সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হয় নাই। তাহার দুঃসাহসিক স্পর্ধা ও নভোচারী আকাঙ্ক্ষা সমস্ত কুলাচার ও প্রাচীন/অনুশাসনকে লঙ্ঘন করিয়া আত্মতৃপ্তির নূতন নূতন উপায় খুঁজিয়াছে। দোতালা কোঠা বাড়ী নির্মাণ লইয়া বনোয়ারির সহিত তাহার চরম বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। সমাজশক্তির অযৌক্তিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া সে গ্রাম ছাড়িয়াছে, কিন্তু নিজ নূতন আদর্শ ও জীবননীতি সে তরুণ সমাজে প্রচার

করিয়া গোপনে নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে ও পুরাতনের সম্পূর্ণ উৎসাদনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে। উচ্চবর্ণের সহিত নিম্নবর্ণের সম্পর্কের মধ্যে যে হীনতা ও অপমান প্রচ্ছন্ন ছিল, মনিবের প্রতি কৃষাণের পুরুষপরম্পরাগত, ভক্তিরস-স্নিগ্ধ, নম্র আনুগত্যের মধ্যে যে অবিচার ও শোষণ আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহার তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি উহার স্বরূপ আবিষ্কার করিয়াছে ও নবযুগের সাম্যের দৃপ্তবাণী তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে। তাহার গতি গ্রাম হইতে সহরের দিকে, সামন্ত-তান্ত্রিক, চিরনির্দিষ্ট অবস্থিতি হইতে যন্ত্রযুগের স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে, নির্বিচার ঐতিহ্যানুস্মৃতি হইতে নূতন প্রয়োজনমূলক কর্মপন্থার দিকে। তাহার স্বজাতির ধর্ম ও আচার-কেন্দ্রিক জীবন হইতে সরিয়া সে বৈষয়িক উন্নতি ও ভোগমূলক জীবনে আপনাকে স্থাপন করিয়াছে। বনোয়ারির নিকট হইতে সুবাসীকে অপহরণ করিয়া সে একাধারে নিজ অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছে ও বনোয়ারির উপর নিয়তির নিগূঢ় ন্যায়-বিচারের দণ্ডস্বরূপ হইয়াছে। শেষ যুদ্ধে সে বনোয়ারিকে পরাজিত করিয়া প্রাচীন যুগের অবসান ঘোষণা করিয়াছে ও মাতব্বরি-শাসিত সমাজ-জীবনকে চিরতরে উন্মূলিত করিয়াছে। শেষের দিকে করালীর মনে যে অতর্কিত অতীত-প্রীতির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা চরিত্র-সঙ্গতি ও ঘটনা-পরিণতির দিক দিয়া আকস্মিকতা-দুষ্ট মনে হয়। বনোয়ারির জীবনাদর্শের সঙ্গে তাহার যে দুস্তর ব্যবধান তাহা এরূপ সুলভ ভাবপরিবর্তনের দ্বারা সেতুবদ্ধ হইবার নহে। মনে হয় এখানে লেখকের পক্ষপাতমূলক ভাববিলাস তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও মানব-চরিত্রজ্ঞানকে অভিভূত করিয়াছে।

'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' গভীর সাঙ্কেতিক তাৎপর্যমণ্ডিত ও মহাকাব্যের সংঘাতধর্মী উপন্যাস। কাহারকুলের জীবন-কাহিনীর মধ্য দিয়া লেখক একটি আমূল সংস্কৃতি-বিপর্যয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হিন্দুধর্মের যে সমাজ-সংগঠনী প্রতিভার প্রেরণা উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে, নিম্নশ্রেণীর মধ্যে তাহার লুপ্তাবশেষ অল্পদিন পূর্ব পর্যন্তও পূর্ণ-মাত্রায় সজীব ও সক্রিয় ছিল। এই অন্তিম স্ফুলিঙ্গের নির্বাপণ, এই ধর্মবোধ-চালিত, আচার-সংস্কার-বদ্ধ জীবন-যাত্রার শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ, এক বিরাট প্রাণলীলার দিক্‌পরিবর্তন এই উপন্যাসের মহিমান্বিত ভাব-প্রেরণা। গঠন ও বিষয়বস্তুর উপস্থাপন-কৌশলের দিক দিয়া ইহা অনবদ্য, উপন্যাস-রচনার চরম কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত। ইহার জীবন-ধারা আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক প্রভাবের দ্বারা সমভাবে আকৃষ্ট হইয়া, ব্যক্তিক ও সমষ্টিগত প্রেরণার মধ্যে অদ্ভুত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, এক সর্বাঙ্গসুন্দর, সঙ্গতিপূর্ণ ভাবাবহের মধ্যে, রোমাঞ্চকর প্রারম্ভ হইতে বিষাদ-করুণ, অনিবার্য পরিণতি পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। কর্তাবাবার বাহনের রহস্যময় শিষধ্বনি সমস্ত কাহার-সমাজে যে অতিপ্রাকৃত, অনির্দেশ্য ভীতি-রোমাঞ্চ জাগাইয়াছে তাহাই সমগ্র উপন্যাসের ভাব-জগতের ভূমিকা রচনা করিয়াছে—ইহাই ঔপন্যাসিক সংঘটনের মূল কারণ। এই বাহনকে হত্যা করিয়াই করালী নিজ সমাজের চক্ষে যে পাপ করিয়াছে তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই—সে নিজ আত্মীয়দের নিকট অপাংক্তেয় হইয়াছে। করালীকে ক্ষমা করিয়া বনোয়ারি যে সমস্ত কাহার-সমাজের উপর দেবরোষের অভিশাপ আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে এ সংশয় তাহার সত্তার গভীরতম স্তর পর্যন্ত সঞ্চারিত হইয়াছে। উপন্যাসের সমস্ত কর্মজাল, সমস্ত ঘটনা-পরম্পরা এই আধিদৈবিক প্রভাব ও অলৌকিক

সংস্কারের কেন্দ্র হইতে উদ্ভূত। প্রতিটি কাহার-পরিবারের প্রতিটি চিন্তা-ভাবনা ও কর্মের মধ্যে দেবলোকের অদৃশ্য, কিন্তু অতি স্পষ্টভাবে অনুভূত, প্রভাব সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় অনুস্যূত হইয়াছে। যাহা ঘটিয়াছে তাহা হয়ত অতি তুচ্ছ ও সাধারণ ব্যাপার—কিন্তু ইহার পিছনে যে গভীর একনিষ্ঠ অনুভূতি, পারলৌকিক রহস্যের যে নিগূঢ় সর্বব্যাপী অস্তিত্ব প্রকটিত হইয়াছে, তাহাই এই সাধারণ সংঘটনগুলির উপর মানব-চিত্তের লীলাময় প্রকাশ ও জটিল-সূত্র-গ্রথিত নিয়তিবাদের মহিমা আরোপ করিয়াছে। কাহার-জীবনে যাহা কিছু দ্বন্দ্ব-সংঘাত সমস্তই হয় এই দৈবশক্তির সহিত বোঝাপড়ার আকৃতি না হয় হৃদয়াবেগঘটিত রংএর খেলা হইতে উদ্ভূত।/সব শুদ্ধ মিলিয়া যে সমাজ-চিত্র এই উপন্যাসে অঙ্কিত হইয়াছে তাহা কেন্দ্রগত প্রেরণায় নিবিড়-সংহত, সতেজ প্রাণলীলায় বেগবান, দৃঢ় আদর্শবাদে স্থির, উর্ধ্বলোকের আলো-ছায়ার বিচিত্র অনুভূতিতে রহস্যময়। হিন্দুর অধ্যাত্ম সংস্কৃতির মর্মকথা, হিন্দু সমাজ-সংগঠনের মূলতত্ত্ব, হিন্দু মনের ব্যাকুল অভীপ্সা সমস্তই এই অজ্ঞানান্ধ, মূঢ় সঙ্কীর্ণতার কারাগারে আবদ্ধ কাহার-সমাজের মধ্যে, মৃৎপিণ্ডে চিন্ময়ী চেতনার ন্যায়, ঘটে বিরাট আকাশের প্রতিবিম্বের ন্যায়, তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা, বিলোপের প্রাক্-মুহূর্তে আবিষ্কৃত ও অবিস্মরণীয় উজ্জ্বল বর্ণে ও সুস্পষ্ট রেখায় চিরতরে অঙ্কিত হইয়াছে।

(৭)

'আরোগ্য-নিকেতন' (চৈত্র, ১৩৫৯) তারাশঙ্করের আর একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস। ইহার উপজীব্য জীবন-লীলা নহে, জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম-ছন্দে রূপায়িত জীবন-দর্শন। ইহার অনুভূতি উপরিভাগের বিচিত্র জীবন-চাঞ্চল্যে সীমাবদ্ধ নহে, জীবনের চরম পরিণতি ও আপাত-বৈরী মৃত্যুর গহন-রহস্যময়, গুহা-হিত স্বরূপ-আবিষ্কারে নিয়োজিত। এখানে জীবন-সংঘটন মরণের ছায়াতলে অভিনীত, ইহার বহির্বিকাশগুলি মরণের মহাসঙ্গমে আসিয়া স্তব্ধ হইয়াছে। কাজেই সাধারণ উপন্যাসে জীবন-পদ্ম যেমন সমস্ত পাপড়ি মেলিয়া পূর্ণবিকশিত হয়, জীবনের গতিবেগ ও সম্পর্কজটিলতা যেমন ক্রমবিবর্তনের পথ ধরিয়া চরম পরিণতি লাভ করে, এখানে সেই ব্যাপক সর্বাভিমুখী চলিষ্ণুতা সমুদ্র-সন্নিহিত স্রোতস্বিনীর ন্যায় নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া এক পরম অবসানে আত্মসংহরণ করিয়াছে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে জীবনের লীলাছন্দ ও বিসর্পিত ভাব-বৈচিত্র্য এখানে অনুপস্থিত এবং এই জন্যই কোন কোন সমালোচক ইহাতে তারাশঙ্করের শক্তির ক্ষীয়মানতার পরিচয় পাইয়াছেন। আমার বিচারবুদ্ধি এইরূপ মত-প্রকাশে সায় দিতে পারিতেছে না। প্রতি উপন্যাসেই সমস্যার প্রকৃতির উপর উহার ঘটনাসন্নিবেশ ও জীবনাবেগের রূপায়ণ নির্ভর করে। যে উপন্যাস মৃত্যুর স্বরূপ-উপলব্ধিকেই নিজ বিষয়বস্তু-রূপে নির্বাচন করিয়াছে, যাহা বিভিন্ন চিকিৎসা-প্রণালীর অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্বকেই পরিস্ফুট করিতে ব্যাপৃত, যাহা মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন, শোকবিমূঢ়, আকস্মিক বিপৎপাতে সন্ত্রস্ত-বিহ্বল জীবন-খণ্ডাংশগুলিতেই নিবদ্ধ-দৃষ্টি, তাহাতে জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপ, উচ্ছ্বসিত প্রাণ-প্রবাহ ও চরিত্রাঙ্কনের গভীর-প্রবেশী জটিলতা প্রত্যাশা করা অসঙ্গত। মৃত্যুর খর-কৃপাণে

খণ্ডিত, উহার শৃঙ্গ-আস্ফালনে ছত্রভঙ্গ, উহার বজ্রমুষ্টিতে কৃচ্ছ্রশ্বাসক্লিষ্ট জীবন-সমষ্টি পীত-পাণ্ডুর বর্ণে আমাদের চোখের উপর দিয়া ছায়ামূর্তির প্রেত-শোভা-যাত্রার ন্যায়, উত্তর হিমবায়ু-তাড়িত শুষ্ক পত্রের ন্যায় ধাবমান হইয়াছে। ইহাতে মৃত্যুতত্ত্বই প্রধান, জীবনের সতেজ, বিচিত্র বিকাশ, উহার প্রাণ-যাত্রা-সমারোহ, উহার রক্তিম পরিপূর্ণতা নাই। তত্ত্বাশ্রয়ী, তত্ত্বনির্ভর জীবন আপনার আত্ম-প্রতিষ্ঠিত প্রাধান্যকে বিসর্জন দিয়াই এই উপন্যাসের সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহার জীবনের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ মৃত্যুর গিরিশৃঙ্গ হইতে উৎক্ষিপ্ত নির্ঝরিণীর আকুল আর্তিতে, ক্ষণ-উৎসারিত, পরমুহূর্তে শুষ্ক প্রাণধারার এক চরম সঙ্কটময় ভাবোচ্ছ্বাসে বিঘূর্ণিত হইয়াছে—সবটুকু জীবনাবেগ, ক্ষয়-রোগীর সমস্ত রক্ত গণ্ডদেশে সঞ্চিত হইবার মত, অন্তিম ক্ষণের করুণ আসক্তি ও উদ্‌ভ্রান্ত মতিবিপর্যয়ের মধ্যে জমাট বাঁধিয়াছে। অজাগরের দৃষ্টি-সম্মোহিত পশুর ন্যায় মৃত্যু-বিভীষিকার সম্মুখীন জীবন আপনার স্বভাবধর্ম হারাইয়া দোলকযন্ত্রের (pendulum) কাঁটার মত একবার বামে, একবার দক্ষিণে হেলিয়া বৃথা পলায়নের চেষ্টা করিয়াছে।

জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে সন্ধিস্থাপনের দৌত্যকার্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের উপর ন্যস্ত। ব্যবসায়-মধ্যে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র বৃত্তি আর নাই। চিকিৎসাব্যবসায়ের পিছনে যে মনোভাব ও কর্তব্যনিষ্ঠা বিদ্যমান তাহাই একটি জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতির মানদণ্ড। এই বৃত্তিসম্পর্কিত সদাচার (professional etiquette) বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন চিকিৎসা-পদ্ধতির মধ্যে বিভিন্ন। তারাশঙ্করের উপন্যাসে প্রাচীন আয়ুর্বেদ ও আধুনিক পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের তুলনা-মূলক আলোচনার দ্বারা উভয় পদ্ধতির অন্তর্নিহিত ভাবদৃষ্টি ও জীবন-তাৎপর্যের পার্থক্যটি সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। কবিরাজী চিকিৎসা কেবল ব্যাধি-নিরাময়ের ব্যবহারিক উপায়মাত্র নহে। ইহাতে রোগীর ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ, জীবন-যাত্রানির্বাহের সমগ্র নীতি, সুস্থ জীবনাদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রাখা হইত। ইহা অপরা বিদ্যা হইলেও পরা বিদ্যার সগোত্রীয়, অধ্যাত্ম ভাব-সাধনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। চিকিৎসকের নাড়ীজ্ঞান সমস্ত জীবনরহস্যের ধ্যানোপলব্ধি, গুহাহিত, অসংখ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমবায়-গঠিত প্রাণতত্ত্বের মর্মভেদ। চিকিৎসক এক প্রকার ধ্যানযোগী, ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যায় শারীরতত্ত্বজ্ঞান তাহার পক্ষে কেবল ব্যবহারিক কৌশল নহে, নিগূঢ়, অন্তর্ভেদী দিব্যদৃষ্টি। তাহার চরিত্রও এই ধ্যানযোগের উপযুক্ত নির্লোভ, নিরাসক্ত আদর্শপরায়ণতার প্রতিবিম্ব।

ইহার সহিত তুলনায় আধুনিক ডাক্তারের রোগীসম্বন্ধে মনোভাব সম্পূর্ণ বহির্মুখী ও প্রয়োজনাত্মক। সে বৈজ্ঞানিক, মায়ামমতাহীন মনোভাব লইয়া চিকিৎসা-কার্যে ব্রতী, বিজ্ঞানের অতিরিক্ত অন্য কোনও শক্তি সে স্বীকার করে না। তাহার চিকিৎসা যেমন বহির্লক্ষণনির্ভর, রোগীর প্রতি তাহার কর্তব্যবোধও সেইরূপ তাহার অন্তর্জীবন-নিরপেক্ষ। নূতন নূতন আবিষ্কারের গৌরবে সে দাম্ভিক, বিজ্ঞানের উপর আস্থায় সে অকুণ্ঠ আত্ম-প্রত্যয়শীল, রোগের বিরুদ্ধে তাহার স্পর্ধিত যুদ্ধ-ঘোষণা। তাহার কর্তব্যবোধ রোগীর ব্যক্তি-সীমা ছাড়াইয়া সমস্ত সমাজে পরিব্যাপ্ত—সমাজকল্যাণের জন্য সে যে কোন রোগীকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। কবিরাজী চিকিৎসার বিনয়-নম্র, মাতৃমমতাস্নিগ্ধ, দৈবনির্ভর, অধ্যাত্মরহস্যের স্পর্শলোলুপ মানস প্রবণতার সহিত তুলনায় পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাবিধির

ভাবাবেগহীন নিয়মানুবর্তিতা ও ইহ-সর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর আকাশ-পাতাল পার্থক্য। কবিরাজ জীবন মশায় ও ডাক্তার প্রদ্যোত এই দুইজন বিভিন্ন পদ্ধাতর প্রতিনিধি-চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে ও মানস গঠনে পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী ও সমস্ত উপন্যাস ব্যাপিয়া এই বৈপরীত্যের স্বরূপ ও পরিণতি দেখান হইয়াছে।)

(এই উপন্যাসে এক প্রকারের মনস্তত্ত্ব আছে—ইহা রোগবিকারে কুটিল ও সন্দিগ্ধ, আসন্ন মৃত্যু-বিভীষিকায় আতঙ্ক-বিমূঢ়, কোথাও অতৃপ্ত ভোগপিপাসায় অতি-উচ্ছ্বসিত, কোথাও নৈরাশ্যে ও আসক্তিহীনতায় স্তিমিত-ধূসর, কোথাও বা অতর্কিত উপলব্ধিতে, ভাঙ্গিয়া-পড়া তরঙ্গের মত রোদন-বিবশ। এই রোগশয্যার চারিপাশে স্বাভাবিক জীবন-প্রতিবেশও ভয়াবহের আবির্ভাব-প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ, অনভ্যস্ত প্রয়োজনের কক্ষাবর্তনে সহজছন্দভ্রষ্ট, অস্বাভাবিক মানস উৎকণ্ঠায় অসাড় এবং অনিশ্চিত কল্পনার ও বিবিধ মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার জালে দিশাহারা রোগীর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে নানারূপ মানস প্রতিক্রিয়া কৌতূহল উদ্রেক করে—কেহ শান্ত স্থির, অধ্যাত্ম বিশ্বাসে দৃঢ়, কেহ সমস্ত আত্মসংযম হারাইয়া বেতস-পত্রের ন্যায় কম্পমান, কেহ কূট-বৈষয়িকতার স্বার্থান্ধতায় আবিলদৃষ্টি, কেহ আঘাতের তীব্র আকস্মিকতায় অপ্রত্যাশিত প্রবৃত্তি-নিচয়ের আবির্ভাবে নূতন পরিচয়ে প্রকাশমান। এই সমস্ত রোগজর্জর সত্তার মধ্যে মানবাত্মার নানারূপ তির্যক্ প্রকাশ। রাণা পাঠক, মহাপীঠের মোহান্ত সন্ন্যাসী, ভুবন রায়, গণেশ বায়েন—ইহারা মৃত্যুর সম্মুখে ধীর-স্থির, অচঞ্চল, কেহ বা স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আহ্বান করিতেছে, কেহ বা প্রতিযোগী মল্লযোদ্ধার ন্যায় মৃত্যুর সহিত শক্তি-পরীক্ষায় উৎসুক, কেহ মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া জীবন-মহোৎসব অনুষ্ঠান করিয়া জীবনকে শেষ বিদায়-অভিনন্দন জানাইতে উল্লসিত, কেহ বা জীবনের সমস্ত দেনা শোধ করিয়া দায়মুক্তভাবে মহা অভিযানে বাহির হইতে প্রস্তুত। অন্যদিকে জীবন মশায়ের নিজ পুত্র বনবিহারী, মতির মা, মঞ্জরী, দাঁতু ঘোষাল প্রভৃতি জীবনকে আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য অশোভনরূপে ব্যস্ত, অতৃপ্ত জীবন-পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ, জীবন-রসের শেষ বিন্দু পর্যন্ত উপভোগ করিবার ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষায় উতলা-উন্মাদ। ইহাদের মধ্যবর্তী স্তরে বিপিন অকাল-মৃত্যুর সম্মুখে লজ্জা-কুণ্ঠিত, দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত বীরের ন্যায় আত্মগ্লানিতে মুহ্যমান। মৃত্যুর নিকষকৃষ্ণ যবনিকার উপর ব্যাধির দমকা হাওয়ায় সঞ্চালিত জীবন-দীপশিখার এই বিচিত্র ভঙ্গিমার, নানা ছন্দের ও বিবিধ অন্তরভাবদ্যোতনার ছায়ানৃত্য লেখক এই উপন্যাসে অপরূপ রেখাবর্ণ-সমাবেশে ও তীক্ষ্ণ মনস্তত্ত্বজ্ঞান ও ভাব-ব্যঞ্জনার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন।

এই নিগূঢ়-অন্তর্লোকবিহারী উপন্যাসে নায়ক জীবন মশায় ও নায়িকা পিঙ্গল-কেশিনী, মানবজীবনের রন্ধ্র-সঞ্চারিণী, প্রাণের গভীর রহস্যকেন্দ্রে বীজরূপে অধিষ্ঠিতা মৃত্যুদেবী। এখানে নায়কও সম্পূর্ণরূপে নায়িকার উপর নির্ভরশীল, উহারই তত্ত্বরূপ-নিরূপণে ও রহস্য-নির্ণয়ে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োজিত, উহারই অঙ্গদ্যুতিতে উহার ব্যক্তিসত্তা আলোকিত ও বিকশিত। অন্যান্য চরিত্র কেবল মৃত্যুরহস্য ও নায়কের ব্যক্তিত্ব উদ্ঘাটনে সহায়তা করিয়াছে। ইহাদের অবস্থা সঙ্কট-বিস্ফুরিত চকিত আলোকে মৃত্যুর অবগুণ্ঠিত আনন-মহিমা ও জীবন মশায়ের মনোগহনশায়ী প্রাণসত্তা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। জীবন মশায়ের চরিত্র খুব গভীরভাবে পরিকল্পিত ও রূপায়িত। একদিকে কুলধর্ম ও পারিবারিক

ঐতিহ্য ও অপর দিকে পরিবর্তনশীল যুগের বাস্তব প্রেরণা এই উভয়ে মিলিয়া তাঁহার দ্বৈত প্রকৃতির টানা-পোড়েন বয়ন করিয়াছে। ডাক্তারি ও কবিরাজীর মধ্যে দ্বিধা-বিভক্ত চিত্তই তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতির এই বিদারণ-রেখার ইঙ্গিত বহন করিতেছে। কুলধর্মের মর্যাদার সঙ্গে আধুনিক যুগের ভোগবিলাস-প্রবণতা ও তরুণ বয়সের অসংযম ও ক্ষমতা-মাদকতা মিশিয়া তাঁহার চরিত্রকে প্রাণশক্তির নিগূঢ় রসে পরিপূর্ণ করিয়াছে। তিনি তাঁহার পিতা-পিতামহের চরিত্রের অব্যভিচারী আদর্শনিষ্ঠা ও কর্মযোগের নিরাসক্তি পূর্ণ মাত্রায় পান নাই—ইহার সঙ্গে নূতন কালের রক্ত-চাঞ্চল্য, বৈষয়িক উন্নতির জন্য উদগ্র স্পৃহা, ভাগ্য-পরীক্ষা-ক্রীড়ায় জুয়ারির নেশা মিলিত হইয়া তাঁহার চরিত্রের নির্মলতাকে যে পরিমাণে আবিল করিয়াছে সেই পরিমাণে ইহাব মানবিক আকর্ষণকে বৃদ্ধি করিয়াছে। তাঁহার তরুণ বয়সের রূপমোহ ও নিদারুণ আশাভঙ্গের পর তাঁহার সহিত মন-মেজাজের দিক দিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির স্ত্রীর সহিত অবাঞ্ছিত মিলন, তাঁহার কুলাচারনিষ্ঠা ও ধ্যানাবিষ্টতার, তাঁহার মৃত্যু-রহস্যোদ্ভেদের জন্য আজীবন সাধনার এক বিসদৃশ পটভূমিকা রচনা করিয়াছে। পারিবারিক জীবনের এই তিক্ততা ও একমাত্র পুত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহার অধ্যাত্ম ব্যাকুলতাকে আরও প্রখর করিয়াছে। তাঁহার ব্যর্থতাবোধ ও আত্মগ্লানিই তাহার নাড়ী-পরীক্ষার ভিতর দিয়া অধ্যাত্মলোকের স্পর্শ লাভেব আকাঙ্ক্ষাকে নৈর্ব্যক্তিক সাধনা হইতে ব্যক্তিগত জীবনাকুতির পর্যায়ে লইয়া গিয়াছে—এই অজ্ঞেয়কে জানার ইচ্ছা, এই সূক্ষ্ম অনুভূতিময়, রহস্য-নিবিড় পরিমণ্ডলে আপনাকে বিলীন করিবার চেষ্টা যেন দিব্যৌষধির ন্যায় তাঁহার রক্তস্রাবী অন্তরক্ষতে শান্তিব প্রলেপ লেপন করিয়াছে। তাঁহাব কর্মজীবনে নানা বিরুদ্ধ মন্তব্য ও প্রতিকূল আঘাতও এই ধ্যানতন্ময়তাকে এক গভীর-করুণ তাৎপযমণ্ডিত করিয়াছে। তাঁহাব জীবনের সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি, চিত্তেব সমস্ত অশান্তি ও অন্তর্জ্বালা, প্রতিবেশের সমস্ত নিষ্করুণতা, ভাগ্য-বঞ্চনাব সমস্ত অবিচার, মুখরা, অভিমান-দাবদগ্ধা স্ত্রীর সমস্ত কটুভাষণ যেন এই মৃত্যুগহন, দেহযন্ত্রের জটিলতার অভ্যন্তবে সঞ্চরণশীল অরূপ সত্তার ব্যঞ্জনাময় দিব্যানুভূতি-গভীরতার মধ্যে অবগাহন করিয়া প্রশান্ত জীবন-স্বীকৃতিতে পরিণত হইয়াছে। যন্ত্রণার সূচিবেধের রন্ধ্রেই এই অলৌকিক রহস্যের প্রত্যক্ষ স্পর্শ তাঁহার গভীরতম চেতনায় অনুপ্রবেশ করিয়াছে। জীবনের সবটুকু আকুতি দিয়া তিনি মরণকে অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই মবণ তাঁহার অন্তরে জীবন্ত সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জীবন মশায় যতটুকু কাজ করিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা ঢের বেশী চিন্তা ও অনুভব করিয়াছেন। মৃত্যু-উপলব্ধির অন্তর্গূঢ় আলোকে তাঁহার নিজ প্রাণসত্তা আত্মোপলব্ধির স্পষ্টতায় উদ্ভাসিত হইয়াছে। জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া, সীমা ও অসীমের সঙ্গমস্থলে যে মহা-রহস্যের লীলাভিনয় চলিতেছে তাহার দর্শক ও মর্মজ্ঞরূপে তিনি নিজ ব্যক্তিত্বের নিগূঢ় অনু-ভূতিকেন্দ্রের উপরই উজ্জ্বলতম আলোকপাত করিয়াছেন, পরিপূর্ণ আত্মপরিচয় উদ্‌ঘাটিত করি-য়াছেন। মৃত্যুর গোধূলি-অন্ধকার ভেদ করিবার জন্য তিনি অন্তরে যে দিব্য সাধনার দীপ প্রজ্বলিত করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতিরহস্য স্বচ্ছ ও ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে।

ঘটনা-বিন্যাসের দিক দিয়া জীবন মশায়ের সমগ্র জীবন-কাহিনীটি পরিস্ফুট করিবার যে কৌশল লেখক অবলম্বন করিয়াছেন তাহা সর্বথা সার্থক ও প্রশংসনীয়। এই ঘটনা-

বিন্যাসে ধারাবাহিকতার পৌর্বাপর্য রক্ষিত হয় নাই। কোনও ভাবঘন মুহূর্তে, মানসিক বিপর্যয়ের কোন তরঙ্গোৎক্ষেপে তাঁহার মন পূর্বস্মৃতি-রোমন্থনের উজান বাহিয়া অতীত জীবনের স্মরণীয় অভিজ্ঞতাগুলিকে আবার নূতন করিয়া অনুভব করে ও এইরূপে তাঁহার সমগ্র অতীত জীবনযাত্রা তাঁহার কল্পনায় ও পাঠকের সম্মুখে পুনরভিনীত হয়। এই প্রণালীতে আমরা তাহার তরুণ জীবনে মঞ্জরীর প্রতি মোহাকর্ষণ ও ভূপী বোসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা জানিতে পারি, ও মঞ্জরীর ছলনাময় আচরণ তাহার সমস্ত অন্তরকে কিরূপ বিষাক্ত করিয়াছিল তাহা অবগত হই। এই ভয়ানক আঘাতে তাহার সমস্ত পরবর্তী জীবন ভারকেন্দ্রচ্যুত হইয়া বাহিরের সম্ভ্রম ও প্রতিষ্ঠার দিকে অনিবার্যভাবে ধাবিত হইয়াছে। তাহার অন্তরের অনির্বাণ বহ্নিদাহ আতর বউ-এর ঈর্ষ্যা ও অভিমানের নির্মম খোঁচায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রংলাল ডাক্তারের সহিত তাহার পরিচয় ও শিষ্যত্ব-স্বীকারও এই অতীত পর্যালোচনার মাধ্যমে আমাদের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে। এগুলি কেবল ঘটনা-বিবৃতি নহে, যে আবেগময় পরিমণ্ডল ও ব্যক্তিমানসের তীব্র আকূতির সহিত ইহারা সংশ্লিষ্ট, তাহারই পুনর্গঠন। তাঁহার যৌবন ও প্রৌঢাবস্থার অভাবনীয় চিকিৎসা-সাফল্যের দৃষ্টান্তগুলি তাঁহার বর্তমান যুগের নৈরাশ্যপূর্ণ ও সংশয়-ক্লিষ্ট মনোভাবের বৈপরীত্য সূচনার উদ্দেশ্যেই উদ্ধৃত হইয়াছে। বর্ণনার এই বিশেষ রীতি, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এই আগু-পাছু-হাঁটার গতিভঙ্গী নায়কের ভাবুকতা-প্রধান, অন্তঃসমাহিত প্রকৃতির সহিত বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়াছে—শুধু কালানুসারী একটানা অগ্রগতি তাহার রোমন্থন-প্রবণ, বাহ্য ঘটনাকে জীবন-দর্শনের মধ্যে গলাইয়া লইতে অভ্যস্ত চরিত্রের সহিত খাপ খাইত না।

জীবন দত্তের সুদীর্ঘ চিকিৎসক-অভিজ্ঞতার মধ্যে দুইটি ঘটনা তাঁহার চিকিৎসক-জীবনকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার গভীর অনুভূতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। একটি, তাহার পুত্র বনবিহারীর মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার পূর্বজ্ঞান ও অবিচলিত সংযম ও চিত্ত-প্রস্তুতি, দ্বিতীয়, শশাঙ্কের আসন্ন মৃত্যু-সম্ভাবনায় তাহার তরুণী স্ত্রীকে সাধ মিটিয়া খাওয়াইবার আমন্ত্রণের রূঢ় প্রত্যাখ্যান। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে তাঁহার আপাত-প্রশান্তি আতর বৌ-এর শ্লেষপূর্ণ অনুযোগের অঙ্কুশে আজীবন বিদ্ধ হইয়াছে। এই আঘাতে তাঁহার পারিবারিক জীবনে যে ভাঙন ধরিয়াছে তাহা তাহার নিঃসঙ্গতাকে ঘনীভূত করিয়া তাঁহার জীবনকে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন ও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে—তাহার সমস্ত চিত্তকে বর্তমান-পরাঙ্মুখ করিয়া অতীত-রোমন্থনে নিবিষ্ট করিয়াছে। উপন্যাসের যে সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা এই মর্মান্তিক শোকের পরবর্তী—পুত্রের মৃত্যুর পর পাঁচ বৎসরব্যাপী বৈরাগ্য ও অন্তঃপুর-নিরুদ্ধ জীবন-যাত্রার পর কিশোরের জনসেবার জন্য আহ্বান আবার তাহাকে আশু কর্তব্যের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছে। উপন্যাসে আমরা যে জীবন দত্তের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ পাই, সে তাহার পূর্ব জীবনের প্রেতচ্ছায়া, তাহার ব্যক্তিত্ব লক্ষ্যহীনতা ও জীবনাবেগরিক্ততার রাহুকবলিত। দ্বিতীয় ঘটনায় শশাঙ্কের স্ত্রী তাহার স্নেহ-দুর্বল আমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহাকে যে অপ্রত্যাশিত আঘাত হানিয়াছে, তাহাতে তাহার সমস্ত পূর্ব ধারণা বিপর্যস্ত হইয়াছে ও জীবন ও মৃত্যুর ও চিকিৎসক ও রোগীর সম্পর্ক সম্বন্ধে নূতন করিয়া ভাবিতে বাধ্য হইয়াছে। জীবনের উপর আসন্ন মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া কেবল যে

অশ্রুপ্লাবিত, সমবেদনার জন্য কাঙাল, ভাঙিয়া-পড়া ভাব-প্রবণতাই নহে, লৌহ-কঠিন সত্য-স্বীকৃতি ও সুলভ সান্ত্বনার দৃঢ় প্রত্যাখ্যান—শশাঙ্কের তরুণী স্ত্রী তাহাকে এই নূতন শিক্ষা দিয়াছে।

মহাদেবের নীলকণ্ঠের ন্যায় জীবন মশায়ের সমস্ত অন্তর মৃত্যুবিষজারিত হইয়া নীল হইয়া গিয়াছে; তাঁহার অনুভূতি মৃত্যু-ধ্যানভাবিত হইয়া তাঁহার পরিবার-প্রতিবেশের সর্বত্র মৃত্যুর প্রতিচ্ছায়া সৃষ্টি করিয়াছে। মঞ্জরী তাঁহার কল্পনায় মৃত্যুদূতীরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, আতর বউ মৃত্যুরূপিনী শক্তিরূপে তাঁহার সমস্ত জীবনকে বিষজর্জর ও বেদনা-নীল করিয়াছে। মৃত্যু-স্বরূপের সহিত ধ্যানাধিগম্য গভীর একাত্মতা এই সাদৃশ্য-কল্পনার ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার নিজের মরণ তাঁহার জীবনব্যাপী মৃত্যু-রহস্যভেদ প্রয়াসের অন্তিম পর্ব; মৃত্যুকে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের বিষয়রূপে অনুভব-সাধনার যজ্ঞে পূর্ণাহুতি।

উপন্যাসের প্রকৃত নায়িকা পিঙ্গলকেশিনী, অলক্ষ্য-সঞ্চারিণী, রহস্যাবগুণ্ঠিত-স্বরূপা মৃত্যুদেবী। সমস্ত উপন্যাসে তাহারই কালো ছায়া পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বিচিত্র অবস্থা-ভেদের মধ্যে তাহার আবির্ভাবের আভাস উপন্যাসের ভাব বৈচিত্র্যের মূল উৎস। তাহারই অলক্ষ্য সত্তা নানা আভাসে-ইঙ্গিতে, জীবন-বীণায় নানা রাগিণী বাজাইয়া, মানব-মনের গভীরে নানা আবর্ত-চক্র জাগাইয়া, তাহার ভাষায় ও আচরণে নানা বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার রেখাজাল অঙ্কন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়া ফিরিয়াছে। রাহুগ্রস্ত সূর্যমণ্ডল যেমন কম্পমান রশ্মিজালে, বেদনা-পাণ্ডুর ম্লান আলোকে নিজ অন্তর রহস্য উদ্‌ঘাটিত করে, গ্রহণাভিভূত চন্দ্র যেমন নিজ বক্ষ বিদারণ করিয়া উহার স্নিগ্ধরশ্মির অন্তরাগস্থিত ঊষর মরুভূমি ও পর্বতমালাকে প্রকটিত করে, তেমনি মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন মানবজীবন প্রাত্যহিকতার অবগুণ্ঠন সরাইয়া উহার প্রাণকেন্দ্রের সূক্ষ্মতম, গোপনতম স্পন্দন, উহার হৃৎপিণ্ডের আদিম সংস্কার-অনুভূতিগুলিকে অনাবৃত প্রকাশ্যতায় মেলিয়া ধরে— মৃত্যু-কবলিত জীবনের বেদনা-বিধুর, নগ্ন রূপটি সমস্ত গোপনতার অন্তরাল হইতে বাহিরে আসে। এই মৃত্যু কোন ভয়াবহ বীভৎসতায় আত্মপ্রকাশ করে নাই, ইহা জীবন-সূত্রের কোন আকস্মিক ছেদ নহে, ইহা বিশ্ববিধানের নীরব অথচ অমোঘ ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত, ইহা অন্তরের ধ্বংসবীজের শান্ত পরিণতি। মৃত্যুর এই রূপ-কল্পনা উপনিষদ ও পুরাণের দ্বারা প্রভাবিত; তথাপি ইহা লেখকের বাস্তব পর্যবেক্ষণ ও নিগূঢ় অনুভূতির সাহায্যেই ও পাঠকের ঔচিত্যবোধের সমর্থনে সুস্পষ্ট মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। যে দেশে অধ্যাত্মরহস্যকে অনুভূতিগম্য করিবার জন্য সাধনার শেষ নাই, দিব্য দৃষ্টি যেখানে স্থূল বিশ্লেষণকে উপেক্ষা করিয়া ভগবৎ-প্রকৃতির স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছে, যেখানে দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মাকেই পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়, সেখানে বিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিক যে জীবন-বেষ্টনকারী চরম তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ-গোচর করিতে চেষ্টা করিবেন, জীবনের যে খণ্ডাংশগুলির মধ্য দিয়া ওপারের আলো আংশিকভাবে বিকীর্ণ হইয়াছে সেইগুলির প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিবেন, দার্শনিকের তত্ত্বজিজ্ঞাসা লইয়া জীবন-রস-আস্বাদনে অগ্রসর হইবেন, তাহা প্রাচীন ঐতিহ্যের সার্থক অনুবর্তন ও সম্প্রসারণরূপেই গণনীয়। এখানে ঔপন্যাসিকের জীবন-সাধনা জীবনকে অস্বীকার করে

নাই, জীবন-অন্তরীপের যে সূক্ষ্মাগ্র মৃত্যু-মহাসাগরের কল্লোলিত স্তব্ধতার দিকে বাহু প্রসারিত করিয়াছে তাঁহার মধ্যেই সমুদ্র-রহস্যের পরিমাপ করিতে চাহিয়াছেন। বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব ও কল্পনা-গাম্ভীর্যের দিক দিয়া ইহা এক নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়াছে।

তারাশঙ্করের ছোটগল্প ও বড় উপন্যাস একই সূত্রে গাঁথা, একই দোষগুণের আকর। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর অকৃত্রিম সরলতা চরিত্রসৃষ্টি ও জীবন-সমালোচনায় তুল্যভাবে প্রকটিত। তাঁহার মধ্যে জটিল বিশ্লেষণের আতিশয্য নাই; তাঁহার চরিত্রগুলি সুস্থ, স্বাভাবিক, প্রাণশক্তি-সমৃদ্ধ জীবনযাত্রার প্রতীক। তাঁহার উপন্যাসের কোন দৃশ্য অবিস্মরণীয়ভাবে মর্মমূলে মুদ্রিত হয় না—সর্বত্রই একটা পরিমিত, সুসমঞ্জস ভাব-গভীরতার উচ্ছ্বাস অনুভূত হয়। রাঢ়দেশের সাধারণ জীবনযাত্রার কয়েকটি অধ্যায়, বিশেষতঃ জমিদাবের সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব, তাঁহার উপন্যাসের পৃষ্ঠায় আর্টের চিরন্তন সৌন্দর্যে ধৃত হইয়াছে। তাঁহার উপন্যাসে স্ত্রী-চরিত্র অপ্রধান ও প্রেম গৌণ। স্বাভাবিকতার সীমা লঙ্ঘন না করিয়া, অতিরঞ্জনের রং না ফলাইয়া, বিশ্লেষণের আতিশয্যে চরিত্রসংগতি বিসর্জন না দিয়া যে উচ্চাঙ্গের উপন্যাস লেখা সম্ভব তারাশঙ্কর তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভার স্বর্ণে রাজনৈতিক আবেদনের অপব্যবহাররূপ খাদ মিশানো আছে। এই খাদের পরিমাণ-নিয়ন্ত্রণের উপর তাঁহার ভবিষ্যৎ আর্টের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ভর করিবে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তিনি আশু-জনপ্রিয়তার মোহ অতিক্রম করিয়া চিরন্তনতার দুরূহতর অনুশীলনে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন কি না এই প্রশ্ন সমালোচকের মনে আবর্তিত হইতে থাকিবে। তাঁহার শেষ দুইটি উপন্যাসে তিনি এই মোহ কাটাইয়া ও সার্বভৌম জীবনবোধের স্তরে আপনাকে উন্নীত করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে উপরি-উক্ত আশঙ্কাকে অপনোদন করিয়াছেন।

(৮)

রোমান্স-প্রবণ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। তাঁহার দুইটি ছোট গল্পসমষ্টির ('মেঘমল্লার' ১৯৩১, 'মৌরীফুল' ১৯৩২) মধ্যে তাঁহার এই বিশেষত্বের চমৎকার পরিচয় মিলে। তাঁহার কতকগুলি গল্পে ক্ষীণ ঐতিহাসিকতা রোমান্স-সৃষ্টির হেতু হইয়াছে। 'মেঘমল্লার', 'প্রত্নতত্ত্ব' ও 'দাতার স্বর্গ' এই তিনটি গল্পে বৌদ্ধযুগের প্রতিবেশ-রচনার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু লেখকের প্রকৃত শক্তি প্রাচীন যুগের ঈষৎ-ব্যঞ্জনা-সমন্বিত প্রকৃতি-বর্ণনায়, ঐতিহাসিকতায় নহে। প্রথমোক্ত গল্পে মন্ত্রশক্তির বলে সরস্বতী দেবীর বন্দিনী অবস্থার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। আত্মবিস্মৃতা দেবীর ম্লান, স্তিমিত সৌন্দর্যের সংযত বর্ণনাই ইহার প্রধান প্রশংসা। সুনন্দার সঙ্গে প্রদ্যুম্নের প্রেমের চিত্রটি একটা মধুর কোমল সম্ভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। কিন্তু বৌদ্ধযুগের বিবরণটি বিশেষত্ব-বর্জিত ও বিশেষ জ্ঞানের পরিচয়হীন। 'প্রত্নতত্ত্ব'-এ দীপঙ্করের বিভিন্ন প্রকারের অভিজ্ঞতার ছায়াদৃশ্য স্বপ্নের রহস্যজড়িত অস্পষ্টতার ভিতর দিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু গল্পের মধ্যে মনস্তত্ত্ব-বর্জিত কল্পনারই প্রাধান্য। 'নাস্তিক' একজন হিন্দু দার্শনিকের ধর্মতত্ত্বজিজ্ঞাসার কাহিনী; এখানেও প্রকৃতি-বর্ণনা জীবন-বিশ্লেষণকে নির্বাসন করিয়া একচ্ছত্র রাজত্ব করিয়াছে। 'নব-বৃন্দাবন'-এ ভক্তিরসাত্মক ভাবাবেগের দ্বারা গল্পের নিজস্ব শীর্ণতাকে পূরণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

(পারিবারিক জীবন লইয়া যে কয়েকটি গল্প রচিত হইয়াছে—'উমারাণী', 'উপেক্ষিতা' ও 'মৌরীফুল'—তাহাদের মধ্যে সহানুভূতিস্নিগ্ধ, বিশুদ্ধ করুণ-রস ও যৌন প্রেমের একান্ত বর্জন বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। ইহাদের মধ্যে পরিকল্পনার মৌলিকতা নাই, কিন্তু ভাবের ঐকান্তিকতা ও করুণরসের গভীরতা ইহাদের প্রধান গুণ। 'উপেক্ষিতা' গল্পে অনাত্মীয় নারী-পুরুষের মধ্যে ভাই-বোনের মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠার কাহিনী শরৎচন্দ্রের প্রভাবান্বিত বলিয়া মনে হয়। তবে এই সম্পর্কের মধ্যে জটিলতা অপেক্ষা স্নেহসিক্ত মাধুর্যের উপরই বেশী জোর দেওয়াতে লেখকের নিজস্ব রীতি অনুবর্তিত হইয়াছে। 'মৌরীফুল'-এ একটি সংসার-বুদ্ধিহীনা, একগুঁয়ে, অথচ স্নেহশীলা গৃহস্থ-বধূর করুণ জীবন-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।)

এই ক্ষুদ্র গল্পগুলির মধ্যে যে-গুলি সর্বাপেক্ষা মৌলিকতাগুণসম্পন্ন, তাহারা অতি-প্রাকৃত-বিষয়ক। এই বিষয়ে বিভূতিভূষণের স্বভাব-সুলভ প্রবণতা ও নৈপুণ্য আছে। কতকগুলি গল্পে অনৈসর্গিকের অবতারণা যতদূর সম্ভব ক্ষুণ্ণ করিয়া প্রকৃতির বিজনতার মধ্যে যে অতি-প্রাকৃতের ব্যঞ্জনা আছে তাহাই ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। 'বউচণ্ডীর মাঠ'-এ এক স্বামি-সংসর্গবিমুখা বধূ সম্বন্ধে প্রচলিত লৌকিক প্রবাদ ভৌতিক আবির্ভাব-কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়াছে। 'জলসত্র'-এ জলশূন্য মরুপ্রান্তরে দারুণ পিপাসায় গতপ্রাণা এক কলুবালিকার অশরীরী উপস্থিতি অনুভূত হইয়াছে। 'খুঁটী-দেবতা'য় মুক্ত-প্রান্তরে প্রকৃতির বর্ণ-লীলার মধ্যে দেবতার উদ্ভব-কল্পনার বিশ্লেষণ ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কীট্‌সের কবিতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রাঘবের বিনিদ্র অবস্থার বর্ণনার মধ্যে কতকটা মনস্তত্ত্বমূলক আলোচনার ছাপ থাকিলেও গল্পটির প্রধান আকর্ষণ প্রকৃতি-বর্ণনামূলক।

'অভিশপ্ত' ও 'হাসি' এই দুইটি গল্পের অতি-প্রাকৃত ভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। 'অভিশপ্ত' গল্পে মধ্যযুগের বাঙ্গালা ইতিহাসের সহিত জড়িত এক ভৌতিক কিংবদন্তী তীব্র অনুভূতি ও আশ্চর্য ব্যঞ্জনা-শক্তির সহিত বিবৃত হইয়াছে। কীর্তিরায় ও নরনারায়ণের বিরোধ-কাহিনীতে যে অতর্কিত আক্রমণ ও অমানুষিক প্রতিহিংসার চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা আমাদিগের মধ্য-যুগের হিংস্র, পরাক্রান্ত বর্বরতার সুন্দর পরিচয় দেয়। সুন্দরবনের দুর্গম আরণ্যপ্রদেশের বর্ণনা 'অপরাজিত'এর অনুরূপ দৃশ্যের কথা মনে করাইযা দেয়—বস্তুতন্ত্রতা ও উচ্চতর কল্পনার আভাস উভয় দিক্ দিয়াই ইহা অতুলনীয়। এই ঘোর অরণ্যানীর কেন্দ্রোৎক্ষিপ্ত তীব্র রোদনধ্বনি যেন প্রেতলোকেরই অকৃত্রিম স্বরটি আমাদের কাণে পৌঁছাইয়া দেয় ও আমাদের স্নায়ুশিরায় তাহারই অপার্থিব শিহরণ জাগাইয়া তোলে। 'হাসি' গল্পের ঐতিহাসিক প্রতিবেশ এতটা পরিস্ফুট হয় নাই, কিন্তু অন্ধকার নদীবক্ষে রুদ্ধনিঃশ্বাস প্রতীক্ষার মধ্যে অতর্কিত অট্টহাস্য ছুরিকার মত তীক্ষ্ণতার সহিত আমাদের মর্মমূলে কাটিয়া বসে। প্রেতলোকের সহিত মনুষ্যলোকের বার্তা-বিনিময়ের যে গোপন সুরঙ্গপথ আমাদের অন্তরতলে উৎখাত আছে, বিভূতিভূষণ তাহার চাবীর কৌশলটি আয়ত্ত করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

'কিন্নরদল' (অক্টোবর, ১৯৩৮) গল্পসংগ্রহে তিনটি প্রথম শ্রেণীর গল্প আছে। 'তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প'-এ তন্ত্রসাধনার দ্বারা যোগিনী বশীভূত করার রোমাঞ্চকর কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। বরাকর নদীর নির্জন, চন্দ্রালোকস্নাত, বালুকাস্তীর্ণ দূরদিগন্তে, শালবনের অস্পষ্ট

নীলরেখাঙ্কিত তটভূমিতে, মন্ত্রাকর্ষণে অলোকসম্ভবা সুন্দরীর আবির্ভাব আমাদের মনে এক অজ্ঞাত কৌতূহলমিশ্র ভয়ের শিহরণ জাগায়। সুন্দরীর মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তনশীল মনোভাব—হাস্য হইতে ভ্রুকুটি, প্রেম হইতে জিঘাংসা, সহজ ভাববিনিময় হইতে দুরধিগম্য নীরবতা—তাহার সহিত রহস্যময় সম্পর্কের মধ্যে এক নামহীন ভয়াবহতার সঞ্চার করে। লেখকের গল্পে এই ভীষণ ও রমণীয়ের অদ্ভুত সংমিশ্রণ চমৎকার ফুটিয়াছে। 'বুধীর বাড়ী ফেরা' গল্পে কশাইখানা হইতে পলায়িত একটি গাভীর বিচিত্র মনস্তত্ত্বোদ্‌ঘাটন পাঠককে মুগ্ধ করে। উদার মুক্ত প্রান্তরের সৌন্দর্য, পরিচিত আবেষ্টনের মাধুর্য, মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতির উন্মাদনাপূর্ণ আনন্দ—সমস্ত প্রাণীরই সাধারণ অনুভূতি; মানুষের মত গরুও তাহা নিজ জাতিসুলভ বিভিন্ন উপায়ে উপভোগ করে। 'কিন্নরদল' গল্পে শিক্ষিতা, সুন্দরী, সংগীত-অভিনয়-নিপুণা শ্রীপতির বৌ নিরানন্দ পল্লীসমাজে কেমন করিয়া স্বল্পদিনস্থায়ী একটা আনন্দের ঢেউ বহাইয়া দিল, কি করিয়া ব্যবহার-মাধুর্যে সংকীর্ণমনা পল্লীগৃহিণীদের পরশ্রীকাতরতা ও কুৎসাপ্রিয়তা দ্বারা রচিত অন্তরদুর্গে একটা সপ্রশংস স্নেহের স্থান করিয়া লইল তাহার হৃদয়গ্রাহী বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই বহুগুণান্বিতা বৌটির অকালমৃত্যু প্রত্যেক প্রতিবেশীর মনে একটা করুণ, বেদনাপূর্ণ স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছে—সংসারের উষর মরুদেশে একটা শ্যামস্নিগ্ধ, ছায়াশীতল আশ্রয়ভূমি রচনা করিয়াছে। পরিকল্পনার মৌলিকতার জন্য গল্পটি বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। অন্য দুই একটি গল্পে—যথা, 'একটি দিনের কথা'য় স্থানে স্থানে উৎকর্ষের লক্ষণ থাকিলেও মোটের উপর আঙ্গিকের শিথিলতার জন্য ইহাদের রস জমিয়া উঠে নাই।

'বেণীদির ফুলবাড়ী' (১৯৪১) গল্পসংগ্রহে বিশেষ উচ্চাঙ্গের কোন গল্প নাই। 'তিরোলের বালা' গল্পটিই ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই গল্পে এক উন্মাদগ্রস্তা সুন্দরী তরুণী কেমন করিয়া পাগলামির ঝোঁকে তাহার দাদাকে খুন করিয়া ফেলিল তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। সমস্ত গল্পের মধ্যে অন্তর্নিহিত একটা অনিশ্চিত ভয়াবহ সম্ভাবনা এই রক্তাপ্লুত দুর্ঘটনার মধ্যে শোচনীয়, অথচ আর্টের দিক্ হইতে স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত, পরিণতি লাভ করিয়াছে। 'বাঁশি' গল্পে এক তরুণী বিধবা স্বামীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাহার বাঁশিটিকে কিরূপ ব্যাকুল, একনিষ্ঠ যত্নের সহিত আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে তাহার করুণ কাহিনী। 'কুয়াশার রঙ' গল্পে বহুদিন পরে প্রত্যাগত প্রৌঢ়বয়স্ক প্রতুলের কণার প্রতি যৌবনের স্বপ্নমধুর আকর্ষণ প্রথম সাক্ষাতেই উবিয়া গিয়াছে। বাস্তবতার রূঢ় অভিঘাতে প্রেমের বিলোপ—প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানস বৈশিষ্ট্যের বিশেষভাবে উপযোগী বিষয়। এখানে বিভূতিভূষণ ইহাদের সহিত তুলনায় সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই। নানা অবান্তর বিষয়ের প্রবর্তনে কেন্দ্রীয় সমস্যার তীব্রতা ও অবিভাজ্য আকর্ষণ মন্দীভূত হইয়াছে। ছোট গল্পের আঙ্গিকে বিভূতিভূষণের নিখুঁত পারিপাট্যের অভাব। কতকগুলি গল্প কল্পনা-সমৃদ্ধি ও অনুভূতির গাঢ়তার জন্য খুব চমৎকার হইয়াছে—কিন্তু গঠনের শিথিল আকস্মিকতা, দ্বিধাকম্পিত রেখাঙ্কনপ্রবণতা ও কেন্দ্রসংহতির অভাবের জন্য তাঁহার অনেক গল্পের আর্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের জন্য তিনি চাহেন বিস্তীর্ণ পটভূমিকা, ধীর-মন্থর স্বেচ্ছা-বিচরণ, গল্পের ফাঁকে ফাঁকে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ, দরদী মনের স্মৃতি-রোমন্থন ও স্বপ্নজাল-বয়নের প্রচুর অবসর। ছোট গল্পের সংকীর্ণ অঙ্গনে তাঁহার এই অবাধ স্বাধীনতার

আকাঙ্ক্ষা অপরিতৃপ্ত থাকে বলিয়া তিনি সকল সময় ইহার মাপে নিজেকে সংকুচিত করিতে পারেন না।

(৯)

'পথের পাঁচালী' (১৯২৯) ও 'অপরাজিত' (১৯৩২) দুইখণ্ড—বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই তিন খণ্ডে বিভক্ত বৃহৎ উপন্যাস একটি কল্পনাপ্রবণ, অধ্যাত্মদৃষ্টিসম্পন্ন জীবনের ক্রমাভিব্যক্তির মহাকাব্য নামে অভিহিত হইতে পারে। ইহার মৌলিকতা ও সরস নবীনতা বঙ্গ-উপন্যাসের গতানুগতিকতাশীলতার মধ্যে একটি পরম বিস্ময়াবহ আবির্ভাব। অপুর ন্যায় জীবন্ত ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্রিত চরিত্র বাঙ্গালা উপন্যাস-সাহিত্যে আর দ্বিতীয় নাই। শিশুমনের রহস্যময়তা সম্বন্ধে কাব্যে ও দর্শনে যে সাধারণ উক্তি আমরা শুনিতে অভ্যস্ত, এই উপন্যাসে তাহা পুঞ্জীভূত উদাহরণ ও বিচিত্র প্রমাণের সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্যাপকতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির দিক্ দিয়া এই শৈশব-রহস্যের ইতিহাস ওয়ার্ডসওয়ার্থের Preludeএর সহিত তুলনীয়—অপুর অধ্যাত্মদৃষ্টির কয়েকটি দৃষ্টান্ত অনিবার্যভাবে Prelude-এ কবির তুল্যরূপ অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। শিশুর মনে যে সোনার কাঠি পরিচিত জগতের তুচ্ছতার মধ্যে এক অলৌকিক মায়া-রাজ্য সৃজন করে, বিভূতিভূষণ সেই রূপকথার রাজ্যের রহস্যটি আমাদের আদর্শলোকচ্যুত বয়স্ক অভিজ্ঞতার সম্মুখে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার ইন্দ্রজালশক্তি সর্বসাধারণের গোচরীভূত করিয়াছেন। বিশ্লেষণের মধ্যেও যে ইহার অপরূপ মায়াডোর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয় নাই ইহাই লেখকের চরম কৃতিত্ব।

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে অপুর এক দূর সম্পর্কীয়া বৃদ্ধা পিসি ইন্দির ঠাকুরাণীর লাঞ্ছনা-দুর্গতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সর্বজয়ার নির্মমতা ও দুর্গার স্নেহশীলতা এই প্রসঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ অধ্যায়ের সহিত মূল গ্রন্থের কোন ঘনিষ্ঠ যোগ নাই—ইহা মোটামুটি অপুর পিতৃবংশের পূর্ব-ইতিহাস ও যে কৌলীন্য-প্রথাবিড়ম্বিত পরিবার-ব্যবস্থার যুগ আমাদের চোখের সামনে চিরকালের মত অন্তর্হিত হইল তাহারই করুণ অসহায়তার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র। একবার মাত্র নিজ পরবর্তীজীবনের দারিদ্র্য-অবহেলার মাঝে সর্বজয়া ইন্দির ঠাকুরাণীর কথা স্মরণ করিয়া নিজ যৌবনকৃত অপরাধের জন্য আন্তরিক অনুতপ্ত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে অপু জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার দিদির মনে একটা সানন্দ বিস্ময়ের ভাব জাগাইয়াছে—কিন্তু তাহার নিজের অনুভূতি 'অর্থহীন আনন্দ-গীতি ও অবোধ কল-হাস্যের' অধিক অগ্রসর হয় নাই।

পরের দুইটি অধ্যায়—'আম আঁটির ভেঁপু' ও 'উড়ো পায়রা'তে—অপুর শৈশব-জীবনের আশা-কল্পনা ও ক্রীড়া-কৌতুকের অতি বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই দুইটি অধ্যায়ে নায়িকা অপুর দিদি দুর্গা। অপু এখানে দুর্গার প্রখর অধিনায়কত্বের সর্বতোভাবে অধীন। দুর্গার চরিত্রে এমন একটা তীক্ষ্ণ মৌলিকতা, নির্ভীক বিচরণ-স্পৃহা, নূতন নূতন খেলা উদ্ভাবনের শক্তি ও স্বাবলম্বনপ্রিয়তা আছে, যাহাতে সে আমাদের বিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তাহার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের নিকট আর সকলে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। অথচ তাহাকে আদর্শবাদের দ্বারা বিন্দুমাত্র রূপান্তরিত করা হয় নাই। তাহার মধ্যে সাধারণ দরিদ্র গ্রাম্য বালিকার লোভাতুরতা, আত্মসম্মানজ্ঞানের অভাব, এমন কি প্রলোভনের বশে চুরি করিবার প্রবৃত্তিও

আছে। তথাপি তাহার এমন একটা অদম্য প্রাণশক্তি, অফুরন্ত আহরণের ক্ষমতা আছে যাহাতে তাহার দোষত্রুটি সত্ত্বেও সে আমাদের চিরপ্রিয়, শৈশব-চাপল্যের চিরন্তন প্রতীক হইয়া থাকে।

অপুর জীবনে যে সমস্ত প্রভাব কার্যকরী হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুর্গার সাহচর্যই প্রথম ও প্রধান। দুর্গাই অতি সহজে তাহাদের খেলা-ধূলায় নেতৃত্ব লইয়াছে ; সেই হাত ধরিয়া অপুকে আরণ্য প্রকৃতির রহস্যময় নির্জনতার মধ্যে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, দুর্গা অপুর ন্যায় প্রকৃতির সঙ্গে কোন নিবিড় একাত্মতা অনুভব করে নাই ; বন্য ফল ও উজ্জ্বল লতা-পাতা অপেক্ষা কোন নিগূঢ়তর উপহার সে প্রকৃতি দেবীর প্রসারিত হস্তে দেখিতে পায় নাই। কল্পনা-প্রবণতা, প্রকৃতির ইন্দ্রজালের অনুভূতি ও মন-ব্যাকুল-করা হাতছানি—অপুরই নিজস্ব আবিষ্কার। দুর্গা না জানিয়া তাহাকে প্রকৃতির অন্তঃপুরে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছে ; সে যখন বহিরঙ্গনে দুটা তুচ্ছ ফল-ফুল আহরণে ব্যস্ত রহিয়াছে, তখন অপু অন্তঃপুরের লীলা-খেলা, তথাকার গোপন প্রাণ-স্পন্দন ও অনির্দেশ্য ইঙ্গিতের সহিত পরিচিত হইয়া এক কল্পলোকে উধাও হইয়াছে।

প্রকৃতি-পরিচয়ের মধ্য দিয়া কল্পনার বিকাশ—ইহাই অপুর জীবনের ক্রমাভিব্যক্তির প্রধান কথা। এই কল্পনাপ্রসার আসিয়াছে নানা প্রভাবের বশে—(১) নিশ্চিন্তপুরের ঘন লতাগুল্ম-সমন্বিত পটভূমিকায় রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর অভিনয়-কল্পনায় তাহার কবিত্ব-শক্তির প্রথম উদ্‌বোধন হইয়াছে। দূর দেশ ও অতীতকালের শৌর্যবীর্যের আখ্যায়িকা জন্মভূমির পরিচিত, শ্যামস্নিগ্ধ প্রতিবেশে যেন নিতান্ত আপনার হইয়া তাহার বক্ষোরক্তে দোলা দিয়াছে। (২) আতুরী বুড়ী ডাইনীর সঙ্গে অতর্কিত সাক্ষাৎ তাহার শিশু-মনের সমস্ত অপরিচয়ের ভীতিশিহরণকে তীব্র অভিব্যক্তি দিয়াছে। (৩) গ্রামের পরিচিত সীমা অতিক্রম করিয়া প্রথম প্রবাস-যাত্রা তাহার কৌতূহলের আংশিক তৃপ্তিবিধান ও তাহার মানস-পরিধি-বিস্তারে সহায়তা করিয়াছে। (৪) শকুনের ডিমের সাহায্যে আকাশপথে উড়িবার দুরাকাঙ্ক্ষায় তাহার কল্পনার মধ্যে একটু হাস্যকর অসংগতি ও আতিশয্য সংক্রামিত হইয়াছে। (৫) যাত্রা-দলের আবির্ভাবে তাহার কল্পনা প্রথম সাহিত্যিক অভিব্যক্তির দিকে ঝুঁকিয়াছে—প্রকৃতির সহিত ক্রীড়াশীলতা সক্রিয় সৃজনেচ্ছায় পরিবর্তিত হইয়াছে। এই যাত্রাগানের প্রভাবই অপুর জীবনে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রথম সোপান রচনা করিয়াছে। (৬) ইহার পরবর্তী স্তরে দুর্গার মৃত্যুর পর ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রভাব তাহার এই সাহিত্যিক প্রেরণাকে আরও প্রবলতর করিয়াছে। (৭) এইবার অপুর মনের একটা বহুদিনের সাধ পূর্ণ হইয়াছে—তাহারা নিশ্চিন্ত-পুরের বাস উঠাইয়া কাশী-যাত্রা করিয়াছে, এবং এই যাত্রা উপলক্ষ্য করিয়া নব নব অভিজ্ঞতার প্রবল ঢেউ তাহার শিশু-মনকে প্লাবিত করিয়া সেখানে নূতন সম্ভাবনার বীজ বপন করিয়াছে।

কাশী-যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে অপুর জীবনে শৈশব-অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ও কৈশোরের আরম্ভ। কাশীতে তাহার যে সমস্ত নূতন অভিজ্ঞতার আহরণ হইয়াছে, তাহার মধ্যে বহির্বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু নিশ্চিন্তপুরের নিবিড় তন্ময়তা নাই। তাহার মন চঞ্চলপক্ষ প্রজাপতির মত নানা নূতন দৃশ্যে আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এই আকর্ষণে পূর্বযুগের গভীর আত্মবিস্মৃত একনিষ্ঠতার অভাব। কাশীর অভিজ্ঞতার মধ্যে কোনটি তাহার মনে গভীর ছাপ মারিয়াছিল,

কোন্‌টি তাহার মানসিক পরিণতির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল, তাহা বিশ্লেষণ করা কঠিন; চিত্তবিকাশের গূঢ় রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উপাদানকে পৃথক্‌ভাবে উপলব্ধি করা যায় না। গাছের যেমন, মানুষেরও তেমনি, শৈশব অবস্থায় বৃদ্ধির অনুকূল উপাদানগুলি সহজেই ধরা যায়। কিন্তু শৈশব অতিক্রম করিয়া কৈশোর ও যৌবনে পদার্পণ করিলে গাছ যেমন সূর্যালোক ও বায়ুর অনির্দেশ্য প্রভাবে পুষ্টিলাভ করে, মানুষও তেমনি চারিদিকের প্রতিবেশ হইতে নিগূঢ় রস আহরণ করিয়া পরিণতির পথে অগ্রসর হয়। সুতরাং এই স্তর হইতে অপুর পরিণতির প্রক্রিয়া কিছু দুর্বোধ্য হইবে ইহাই স্বাভাবিক। তথাপি কথক ঠাকুর ও তাহার পিতার সংগীতপ্রিয়তা ও কথকতার পালা-রচনা তাহার মনের কাব্যপ্রবণতাকে আরও গতিবেগ দিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। এই সময়ে তাহার পিতার মৃত্যু তাহাদের অসহায় অবস্থাকে তীব্রতর করিয়া দাসত্বের লাঞ্ছনা ও অপমানের সহিত অপুর পরিচয় ঘটাইয়া দিল। বড়লোকের বাড়িতে আড়ম্বর-ঐশ্বর্যের তীব্র দ্যুতি ও গর্বপূর্ণ, উদ্ধত অবহেলা অপুর অভিজ্ঞতার প্রসার বাড়াইয়াছে ও বড়বাবুর বেত্রাঘাত সর্বপ্রথম তাহাকে গ্লানিকর যন্ত্রণার সঙ্গে পরিচিত করিয়াছে। লীলার সহানুভূতিই এই মরুভূমে একমাত্র নির্ঝর-প্রবাহ। এই অসহ্য অবস্থা হইতে অপ্রত্যাশিত উদ্ধার আসিয়াছে তাহার এক দূর-সম্পর্কীয় দাদামহাশয়ের আহ্বানে। তাহার মা তাহাকে লইয়া নূতন প্রতিবেশের মধ্যে মনসাপোতায় আবার ঘর বাঁধিয়াছে। অপুর ভাগ্য-দেবতা তাহাকে জন্মভূমির পরিচিত আবেষ্টনে না ফিরাইয়া তাহাকে নূতন বৈচিত্র্যের পথে চালিত করিয়াছেন।

মনসাপোতার জীবনে অপু নিজ ভবিষ্যৎ স্থির করিয়াছে। সে মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গ্রাম্য পৌরোহিত্যের সহজ সচ্ছলতা বর্জন করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার দিকে ঝুঁকিয়াছে। এই সময়কার এক স্মরণীয় দিনের অনুভূতি সবিস্তারে বর্ণিতহ ইয়াছে—যেদিন সে মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তিলাভের সংবাদ পাইয়া স্কুল হইতে ফিরিতেছিল, সেদিন প্রকৃতির শ্যাম-স্নিগ্ধ, দীর্ঘপক্ষ্মচ্ছায়া-শীতল চক্ষুতে মাতৃনয়নের পতনোন্মুখ অশ্রুবিন্দু টলমল করিতে দেখিয়াছিল। তাহার পর দেওয়ানপুরে তাহার স্কুল-জীবনে অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব কিছু লক্ষিত হয় না। তাহার ভূগোল ও নক্ষত্রলোক সম্বন্ধে অসাধারণ আগ্রহ, বন্ধুত্বলাভের ক্ষমতা ও ভালোমানুষী ধরনের বেহিসাবী খরচপত্রের অভ্যাস—এইগুলিই তাহার স্কুল-জীবনের বিশেষ সঞ্চয়। মামুজোয়ানের মেলাতে নিশ্চিন্তপুরের বাল্য-সঙ্গী পটুর সঙ্গে সাক্ষাৎ তাহার মনে মোহময় শৈশবের আকর্ষণ আবার নবীভূত করিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে তাহার আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইয়াছে—তাহার মাতার সহিত আজন্ম অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠতার মধ্যে বিচ্ছেদ-রেখা দেখা দিয়াছে। কিন্তু ইহা এক অপুর নহে, সমস্ত যৌবন-ধর্মীরই সাধারণ পরিবর্তন।

কলিকাতার কলেজ-জীবনে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম ছাড়া আর কোন লক্ষণীয় বিশেষত্ব নাই। স্কুল-কলেজের রিক্ত, বালুকা-ধূসর মরুভূমির মধ্যে অপু বিশেষ কোন সঞ্জীবনী অমৃত-নির্ঝর পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এখানে সে স্বাতন্ত্র্যহীন যূথবদ্ধতার প্রভাবে অপর দশ জনের সহিত এক হইয়া গিয়াছে। দুই একটি সতীর্থের সহানুভূতি তাহাকে লঘুভাবে স্পর্শ করিয়াছে মাত্র, কিন্তু তাহার মনে কোন গভীর প্রভাব বিস্তার

করে নাই। মোটের উপর সংসারের রুক্ষ অকরুণতা, কলিকাতা-জীবনের উদাসীন যান্ত্রিকতা অপুর তরুণ, বিকাশোন্মুখ মনের উপর দিয়া তাহার রথ-চক্র চালাইয়াছে—তাহার সমস্ত পূর্ব প্রবণতার বিরোধী এক অবস্থা-বিপর্যয়ের মধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়াছে। দুই একটি নারীর প্রতি আকর্ষণমূলক মনোভাবের প্রথম অঙ্কুর এই অবস্থায় দেখা দিয়াছে, কিন্তু নারী-প্রেম অপুর জীবনে কখনই সর্বগ্রাসী প্রবলতা লাভ করে নাই। লীলার সহানুভূতি দূর গগনের ক্ষীণ নক্ষত্রদীপ্তির ন্যায় তাহার অন্ধকার পথের উপর ম্লান আলোকপাত করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান হ্রাস হয় নাই। হেমলতার সহিত প্রণয়-ব্যাপারটা একটা কৌতুককর পরিণতির মধ্যে পর্যবসিত হইয়াছে।

ইহার ঠিক পরবর্তী স্তরে অপুর জীবনে দুইটি প্রধান ঘটনা ঘটিয়াছে—তাহার মাতার মৃত্যু ও বিবাহ। তাহার পারিবারিক জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। এখানে এইটুকু মাত্র বলা দরকার যে, বিবাহও অপুর মনে গাঢ় প্রণয়-অনুরাগ অপেক্ষা কৌতূহলের অধিক উদ্রেক করিয়াছে। অপর্ণার শান্ত, সংযত শ্রীর মধ্যে মাদকতা কিছুই ছিল না—তাহার দ্বারা এক স্নেহ-বুভুক্ষা ছাড়া অপুর যে আর কোনও গভীরতর প্রয়োজনের তৃপ্তি-সাধন হইয়াছিল তাহা মনে হয় না। অপর্ণা যেন অপুর স্বর্গগতা মাতারই একটা তরুণ সংস্করণ—সেবানিপুণতা, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, গৃহস্থালীর কল্যাণ-সাধন, দুঃখে সহানুভূতি, একটু মৃদু কৌতুকমণ্ডিত হাস্য-পরিহাস-এ সমস্ত বিষয়েই তাহার মাতা ও স্ত্রী এক। তাহার রূপে ও ব্যবহারে চোখ-ঝলসানো উজ্জ্বলতার পরিবর্তে শ্যাম বনানীর স্নিগ্ধতা; সে সংসার-ক্লান্ত হৃদয়ের শান্তিপ্রলেপ, উত্তেজক সুরা নহে। বিভূতিভূষণের সমস্ত স্ত্রী-চরিত্র প্রায় এই ছাঁচে ঢালা।

অপু অপর্ণার সাহচর্যে একটা ক্ষণস্থায়ী শান্তি-নীড় রচনার চেষ্টা করিয়াছে, কখনও মনসাপোতার মাতৃস্মৃতিসমাকুল পুরানো ভিটায়, কখনও বা কলিকাতার সংকীর্ণ জনাকীর্ণতার মধ্যে। কলিকাতার ধূমধূলি-মলিন আকাশের তলে তাহার সমস্ত রঙিন যৌবন-স্বপ্ন ম্লান ও বিশীর্ণ হইয়াছে—তারপর অর্পণার অতর্কিত মৃত্যু তাহার মনকে নিঃসঙ্গ শূন্যতার পাষাণ-ভারে অভিভূত করিয়াছে। তাহার শোকে তীব্রতা নাই, আছে এক প্রকারের গুরুভার অসাড়তা। এই উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় লীলার বিবাহ-সংবাদ তাহার জীবনকে মোহভঙ্গের বিষাদে তিক্ত করিয়াছে।

এই নিদারুণ আঘাত অপুর জীবনকে চরম সার্থকতার পথে লইয়া যাইবার জন্য বিধি-নির্দিষ্ট অঙ্গুলি-সংকেতের মত দাঁড়াইয়াছে। প্রথম অবসাদের প্রভাবে সে দ্রুত অবনতির সোপান বাহিয়া নামিয়া গিয়াছে। চাঁপদানিতে তাহার উদ্দেশ্যহীন, ইতর-সংসর্গে অতিবাহিত জীবন-যাত্রা হইতে তাহার পূর্বতন আদর্শবাদের সমস্ত জ্যোতি নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। এক প্রকারের অলস ক্লান্তি, নিরুদ্যম অপরিচ্ছন্নতা ও তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদে আসক্তি তাহার আজন্মের উচ্চ অভীপ্সাকে ধূলিলুণ্ঠিত করিয়া দিয়াছে। পটেশ্বরীর প্রতি স্নেহপূর্ণ সহানুভূতিই তাহার চাঁপদানি-জীবনের নির্বাপিত-প্রায় আদর্শবাদের শেষ স্তিমিত শিখা। কোন অদৃশ্য প্রেরণায় এই ধূলিশয্যা হইতেই গা ঝাড়িয়া সে একেবারে নীলাকাশের দিকে পক্ষ-সঞ্চালন করিয়াছে।

কাপড়ানি হইতে দ্বিতীয় পূর্বগৌরবের স্মৃতিসমাকুল ভগ্নাবশেষ ও মধ্যপ্রদেশের আরণ্য বিজনতা—বৈপরীত্যের চরম সীমা স্পর্শ করিয়াছে। এই আরণ্য প্রকৃতির বর্ণনা বঙ্গ-সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ্। শুধু মধ্যপ্রদেশের গম্ভীর বিজন অরণ্য নহে, নিশ্চিন্তপুরের গ্রাম্য বন-জঙ্গলের বর্ণনাতেও লেখকের অনন্যসুলভ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক বর্ণনা সম্বন্ধে একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যদিও সমস্ত লেখকের details প্রায় এক প্রকারের, তথাপি যাঁহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি আছে তাঁহারা এই সমস্ত বস্তু-পুঞ্জসমাবেশের মধ্যে এমন একটা নবীনতা প্রবর্তন করেন, দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে এমন একটা প্রাণস্পন্দনের বা ভাবগত ঐক্যের আবিষ্কার করেন যাহার জন্য বর্ণনাটি সম্পূর্ণ তাঁহাদের নিজস্ব হইয়া পড়ে। নিশ্চিন্তপুরের জঙ্গলে লেখক যে সমস্ত বন্য গাছপালা ও লতা-গুল্মের উল্লেখ করিয়াছেন তাহারা ঠিক ভব্য, অভিজাত-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নহে—কোন কবি তাহাদের চারিদিকে একটা সুপরিচিত ভাব-ব্যঞ্জনার পরিমণ্ডল রচনা করিয়া রাখেন নাই। অথচ এই সমস্ত দৃশ্যের সরসতা, শ্যামলতার প্রাচুর্য, অযত্নবিন্যস্ত স্নিগ্ধ ঘন ছায়া—এ সমস্তই বাংলার পল্লীশ্রীর নিজস্ব আবির্ভাব। বিভূতিভূষণ এই বর্ণনাকে সাহিত্যগুণ-সমৃদ্ধ করিয়াছেন—বাংলাদেশের ঝোঁপ-ঝাঁপ, শর-বন, নদীতীরের কাশ-শ্রেণী, দুর্ভেদ্য কাঁটার জঙ্গল তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ সূক্ষ্ম-দর্শিতার কল্যাণে নবলব্ধ আভিজাত্য-গৌরবে সমুদ্র, পর্বত, প্রভৃতি প্রকৃতির বিরাটতর দৃশ্যের সহিত সমকক্ষতার স্পর্ধা করিয়াছে। অরণ্য-বর্ণনায়, ঋতু-পরিবর্তন ও দিবারাত্রির ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অরণ্য ও পর্বতের বর্ণলীলার পরিবর্তনশীলতা আশ্চর্য সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। আর শুধু বাহিরের রংএর খেলা নয়, অরণ্যের ভিতরকার রহস্য, ইহার বিরাট্ নিঃশব্দতা, ইহার অপরিমেয় গভীরতা ও অসীমের ব্যঞ্জনা সমস্তই আমাদের মনে গম্ভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। অরণ্যের নিভৃততম বাণী লেখক অনুভব করিয়াছেন ও এই অনুভূতির ফল আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন।

প্রকৃতির অবাধ বিজনতায় এই নব-দীক্ষার পর অপু বাংলাদেশে ফিরিয়াছে। কয়েক বৎসর প্রবাসের পর বাংলার পরিচিত শ্যামল শ্রী তাহার চোখে আবার নূতন হইয়া দেখা দিয়াছে—সে কবিত্বের অঞ্জন-মাখা দৃষ্টিতে, প্রেমিকের ব্যাকুল প্রতীক্ষা লইয়া আবার জন্ম-ভূমির মায়াময় সৌন্দর্যকে অভিনন্দন জানাইয়াছে। লীলার সহিত সম্বন্ধ মধুর সমবেদনার মধ্য দিয়া প্রেমের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে—অপর্ণার স্মৃতি এই নূতন সম্বন্ধের পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় নাই। কিন্তু লীলার অতর্কিত আত্মহত্যার মধ্যে এই উপচীয়মান প্রেমের অকাল-পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। অপুর হৃদয়সম্পর্কিত জটিলতার মধ্যে লীলার প্রতি মনোভাবই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রেমের লক্ষণাক্রান্ত; অপর্ণার প্রতি ভালবাসায় সরল সহৃদয়তা আছে, প্রেমের তীব্র আবেগ নাই। এই সময় অপুর জীবন একদিক দিয়া পরিণতির উচ্চ শিখরে পৌঁছিয়াছে—সে তাহার আবাল্য-সঞ্চিত মূলধন লইয়া সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হইয়াছে। তারপর একটা হঠাৎ প্রয়োজনে কাশী-যাত্রার উপলক্ষে তাহার জীবনের দ্বিতীয় স্তর উন্মুক্ত হইয়াছে—সেখানে নিশ্চিন্তপুরের বাল্যসহচরী লীলাদির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া আবার তাহার চিত্ত শৈশব-স্মৃতির পবিত্র তীর্থোদকে অভিস্নাত হইয়া নূতন পরিণতির জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। সে আবার

নিশ্চিন্তপুরের পুরাণ ভিটায় স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে ঘুঘুর করুণ উদাস ডাকে উতলা বনচ্ছায়ার মধ্যে ঘর বাঁধিবার সংকল্প করিয়াছে।

এই সংকল্প-গ্রহণ সে একা নিজের জন্য করে নাই, তাহার মাতৃহারা পুত্র কাজলের জন্যও। তাহার একান্ত ইচ্ছা যে, সে যেরূপ প্রতিবেশে শৈশব-জীবন কাটাইয়া প্রকৃতির অপরূপ সম্পদে নিজ মানস ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছে, তাহার পুত্রের তরুণ, আগ্রহ-ভরা হৃদয়েও সেইরূপ মধু-চক্র রচিত হউক। কাজলের শৈশব একেবারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন আবেষ্টনেই অতিবাহিত হইয়াছে—তাহার শিশু-হৃদয়ের অস্ফুট আশা-কল্পনা, তাহার অতৃপ্ত কৌতূহল-ক্ষুধা সমস্তই সহানুভূতিহীন অভিভাবকের কড়া শাসনে মুকুলেই শুকাইবার মত হইয়াছে। সর্বদা বাধা-অবহেলার মধ্যে বাস করিয়া সে এক প্রকারের ভীত, সংকুচিত, বিকৃত মনোভাব অর্জন করিয়াছে। অপু তাহাকে নিজ স্নেহাশ্রয়ে লইয়া গিয়া, তাহার এই অস্বাস্থ্যকর বিকৃতিকে আরোগ্য করিতে চাহিয়াছে, তাহার সমস্ত স্বপ্নময় কল্পনাকে অবাধ প্রশ্রয় দিয়া তাহার হৃদয়ের নবীন সরসতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। কাজলের শৈশব-চিত্রের মধ্যে সূক্ষ্মদর্শিতা ও আকর্ষণের উপাদানের অভাব নাই—তথাপি অপুর বাল্যজীবনের অপূর্ব নিবিড়তার সহিত তুলনায় তাহার জীবন ফিকা ও পানসে দেখাইয়াছে। অপুর নিকট বন্য-প্রকৃতির আবেদন এক দুর্গা ছাড়া আর কাহারও মধ্যবর্তিতায় তাহার কানে পৌছায় নাই। কাজলের সঙ্গে প্রকৃতির যে পরিচয় তাহাতে পদে পদে অপুর নির্দেশ ও প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। অপু তাহার নিকট সৌন্দর্য-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছে, প্রকৃতির মোহময় প্রভাবের মহিমা-কীর্তনে রত হইয়াছে, প্রতি দর্শনীয় বস্তুর প্রতি অঙ্গুলি-সংকেত করিয়া কাজলের পলাতক মনকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। কাজল ও প্রকৃতির মাঝে অপুর প্রভাব ছায়া ফেলিয়াছে, অপুর মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়াই তাহার সৌন্দর্যানুভূতি ঘটিয়াছে। প্রতিভা বংশানুক্রমিক নহে এই বৈজ্ঞানিক সত্য যে কাজলের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ থাকে না। তাহার আগ্রহ-পূর্ণ চঞ্চলতা ও শৈশব-সুলভ ভাব-ভঙ্গী খুব চিত্তাকর্ষক, কিন্তু সে যে দ্বিতীয় অপু হইবে না তাহা সাহস করিয়া বলা যায়।

নিশ্চিন্তপুরে প্রত্যাবর্তন কাজলের পক্ষে কতখানি প্রভাবশীল হইয়াছে তাহা অনিশ্চিত, কিন্তু অপুর পক্ষে ইহা একেবারে মানস পুনর্জন্ম। সে তাহার শৈশবের অমৃতকুণ্ডে আবার তাহার জীবন-যাত্রার কঠোর প্রচেষ্টায় ক্লান্ত পক্ষ সিক্ত করিয়া লইয়া নূতন অভিযানের জন্য শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। বাল্য-স্মৃতি-রোমন্থনের অপরূপ সুখ সে সমস্ত অস্থিমজ্জায় অনুভব করিয়াছে। অতীত দৃশ্য ও অভিজ্ঞতার মধ্যে নিগূঢ় পরিবর্তন উপলব্ধি করিয়া সে নিজ শক্তির বৃদ্ধি ও উন্নতি সম্বন্ধে ধারণা করিয়াছে। এই নিশ্চিন্তপুরে স্বল্প-পরিসর, সংকীর্ণ বনে ঘেরা পরিধির মধ্য দিয়াই সে অসীমের আহ্বান শুনিতে পাইয়াছে। যে দিব্যদৃষ্টি জগতের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া তাহার মর্মতলস্থ গভীর রহস্য-সংকেতটি স্বচ্ছ করিয়া ধরে, জীবনের সমস্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ড-প্রকাশকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিয়া যুগ-যুগান্তর-ব্যাপী অশেষ পরিবর্তনের মধ্যে জীবন-ধারার অনন্ত, অক্ষুণ্ণ পারম্পর্য আবিষ্কার করে, পৃথিবীকে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রাদির জটিল কক্ষাবর্তনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখে ও জন্ম-মৃত্যুর সীমারেখা অতিক্রম করিয়া প্রসারিত জীবনের অসীম, উদার সম্ভাবনায় নিবিড়, সংশয়লেশহীন আনন্দ অনুভব করে, তাহাই তাহার

প্রিয় সন্তানকে নিশ্চিন্তপুরের পরম উপহার। নিশ্চিন্তপুর অপুকে বাল্য-জীবনে কবি করিয়াছিল—প্রৌঢ় বয়সে তাহাকে দার্শনিকের ও যোগীর ধ্যান-দৃষ্টি উপহার দিয়া তাহার দিগ্‌বিজয়-যাত্রার পাথেয় সঞ্চয় করিয়া দিল। এই উচ্চতম দার্শনিক সুরেই এই মহাকাব্যের ন্যায় বিরাট উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

পূর্বোক্ত সার-সংকলনের মধ্যে সমালোচনার যতটুকু প্রয়োজন ছিল তাহা প্রায় সিদ্ধ হইয়াছে। কেবল একটি বিষয়ের একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে—অপুর চরিত্র ও তাহার সামাজিক ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে। অপুর চরিত্রে একপ্রকার উদার আসক্তি-হীনতা, স্নেহ-মায়ায় অনভিভূত, চঞ্চল অগ্রগমনশীলতা আছে। এইজন্য সে জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলিকে নিতান্ত লঘুতার সহিত, অনেকটা অনাসক্তভাবে গ্রহণ করিয়াছে। সংসারের কোন আঘাতেই তাহার ভাব-কেন্দ্র গুরুতরভাবে বিচলিত বা স্থান-চ্যুত হয় নাই। দুর্গার মৃত্যু, পিতা-মাতার মৃত্যু, বিবাহ ও স্ত্রীবিয়োগ এই সমস্ত চিত্তবিক্ষেপকারী ও শোকাবহ সংঘটনেও অপুর চিত্তের মুক্ত স্বাধীনতা, তাহার চঞ্চল সক্রিয়তা আচ্ছন্ন ও অভিভূত হয় নাই। দুর্গা ও পিতার মৃত্যুতে তাহার মনোভাব-বিশ্লেষণের বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই—তবে তাহার ব্যবহারে গভীর কোন শোকের চিহ্ন মিলে না। হয়ত বালকের এইরূপ নিরাসক্ত মনোভাবই স্বাভাবিক; আমরা বয়স্ক মনের মোহাকুলতা ও দুশ্ছেদ্য মায়া-বন্ধন লইয়া বালকের সদানন্দ, মুক্ত প্রকৃতির বিচার করিতে বসি। দুর্গার মৃত্যুতে প্রকৃতির সহিত তাহার তন্ময়তার কোন ব্যাঘাত হয় নাই। পিতার মৃত্যু একটা আকস্মিক বিপৎপাতের ন্যায় তাহাকে বিমূঢ় করিয়াছিল, কিন্তু তাহার চিত্তের স্থিতিস্থাপকতাকে নষ্ট করে নাই। মাতার মৃত্যুতে সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে—যে বন্ধন তাহার অগ্রগতির পায়ে বেড়ির মত ছিল তাহা ছিঁড়িয়া যাওয়াতে সে মুক্তির আরাম অনুভব করিয়াছে। অপর্ণার মৃত্যু তাহাকে অভিভূত করিয়াছে সত্য, কিন্তু এখানেও শোকের প্রাবল্য বা আবেগের গভীরতা নাই, আছে মোহভঙ্গের বিস্বাদ ও শূন্যতার অনুভূতি। এইখানে অপুর চরিত্র-পরিকল্পনায় যেন একটু ত্রুটি আছে। আমরা সাধারণতঃ ভাব-গভীরতার যে মাপকাঠি লইয়া চরিত্রের উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার করি, অপু সেই আদর্শ পূরণ করে না। বোধ হয় গভীরতা ও প্রসারের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক-বিরোধ আছে। অপুর জীবন বৃহৎ হইতে বৃহত্তর পরিধিতে প্রসারিত হইয়াছে, বিচিত্র স্বাদ অনুভবের জন্য সে পরিচিতের গণ্ডি ছাড়িয়া কেবলই সুদূর অপরিচিত দিগন্তের দিকে ডানা মেলিয়াছে; পারিবারিক বন্ধন, দাম্পত্য প্রেম, অপত্যস্নেহ তাহাকে নিশ্চল স্থিতিশীলতার পর্যায়ভুক্ত করিতে পারে নাই। কাজেই যেখানে আমরা একনিষ্ঠ গভীরতার প্রত্যাশা করি, সেখানে আমরা পাইয়াছি বন্ধনহীন, বিরামহীন গতিশীলতা; জটিল ঘূর্ণীপাক ও ক্ষুব্ধ পুনরা-বৃত্তির পরিবর্তে আমরা পাই নদীর চির-চঞ্চল প্রবাহ। অপুর চরিত্র প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমা পর্যন্ত নূতন অভিজ্ঞতা আহরণ ও নূতন প্রভাব আত্মসাৎ করিতে করিতে পরিণতির স্তর হইতে স্তরান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে। সে চরম পরিণতির উচ্চ চূড়ায় আসীন হইয়া আত্মবিশ্লেষণের সাহায্যে নিজ হৃদয়াবেগের গভীরতা মাপ করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই। সুতরাং তাহার সাংসারিক ও পারিবারিক বন্ধন অনেকটা শিথিল হওয়ায় ও জীবনের সন্ধিস্থলগুলিতে গভীর আবেগের আপেক্ষিক অভাবের জন্য অপু সাধারণ ঔপন্যাসিক চরিত্র হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র-প্রকৃতির।

সে যে অত্যন্ত জীবন্ত, মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত জীবন-বৈত্যুতীতে পূর্ণ, তাহা নিঃসন্দেহ। তাহার আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলি তাহার বাস্তব জীবনের ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত; তাহা কেবলমাত্র কাব্যমূলক আকাশ-বিচরণ নহে। আধ্যাত্মিক অনুভবের যে শিখরদেশে সে দণ্ডায়মান, সেখানে সে পায়ে হাঁটিয়া, বাস্তব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াই, পৌঁছিয়াছে, কোন কল্পনা-স্ফীত বায়ুযানের সুলভ সাহায্যে নহে। শৈশব হইতে প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত তাহার প্রত্যেক পদক্ষেপ এই আদর্শের অভিমুখেই চালিত হইয়াছে, পথের প্রত্যেক বাঁক ও মোড়ে ইহার পদচিহ্ন সুস্পষ্ট ও গভীরভাবে অঙ্কিত। প্রকৃতি-বর্ণনা, শৈশব-চিত্র ও বাস্তবতার স্তর বাহিয়া আধ্যাত্মিকতার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গারোহণ—এই ত্রিবিধ প্রভাবের অনবদ্য ভাব-পরিণতি বিভূতিভূষণের উপন্যাসকে বরণীয় করিয়াছে।

বিভূতিভূষণের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা 'দৃষ্টি-প্রদীপ' (১৯৩৫) ঠিক তাঁহার পূর্ব গ্রন্থের উৎকর্ষ রক্ষা করিতে পারে নাই। ইহার নায়ক জিতুর মধ্যে অপুর আকর্ষণী শক্তি ও প্রাণময়তা নাই। জিতুর বাল্যজীবনের মোহ এত নিবিড় নহে—দার্জিলিংএর শৈল-শ্রেণী ও চা-বাগানের দৃশ্যে বিদেশের চোখ-ঝলসানো একটা তীব্র দ্যুতি আছে, নিশ্চিন্তপুরের চির-পরিচিত শ্যামলতার স্নিগ্ধ-সরস, গভীর আবেদন নাই। জিতুর প্রথম প্রকৃতি-পরিচয়ের মধ্যে হৃদয়ের অপেক্ষা চোখের তৃপ্তিই প্রবলতর। তারপর তাহার বাল্যজীবন যে প্রকার গ্লানি ও লাঞ্ছনার মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে তাহাও অপুর অভিজ্ঞতা হইতে বিভিন্ন। অপুর দারিদ্র্যের মধ্যে স্বাধীনতা ও প্রকৃতির সহিত মিলনের অবাধ সুবিধা ও নিবিড় আনন্দ ছিল—যাহাকে অপুব অভাব মনে করা যাইতে পারে তাহা কেবল বস্তুতন্ত্রতার অতিরিক্ত পেষণ হইতে অব্যাহতি। জিতুর জীবন পদে পদে অপমানকর বাধা-নিষেধ ও অকারণ তিরস্কারের দ্বারা বিষাক্ত হইয়াছে। সুতরাং অপুর গভীব অনুভূতি হইতে তাহার জীবন বঞ্চিত। বিশেষতঃ জিতুর প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে তাহার অলৌকিক শক্তি, অদৃশ্য জগতের দুই একটি প্রতিচ্ছায়া প্রত্যক্ষ করিবার ক্ষমতা। এই অনৈসর্গিক বিভূতিকে আমরা ঠিক সহানুভূতির চক্ষে দেখি না—জিতু যেন আমাদের হইতে স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী বলিয়াই আমবা মনে করি। জিতুর পরবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতা ও জীবন-সমালোচনার মধ্যে অপুব নবীন মৌলিকতা যেন অনেকটা ম্লান হইয়াছে--তাহার মধ্যে একটু ধর্মালোচনার প্রাধান্য, একটু নীতিবিদের মঞ্চারোহণের ছায়াপাত হইয়াছে। তাহার প্রকৃতির সহিত অন্তরঙ্গতা ভগবদ্ভক্তির সংকীর্ণ প্রণালীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়াছে—প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি তাহাকে ভগবানের নূতন পরিকল্পনাতেই উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে। তাহার অনুভূতি অনেকটা theological বা ধর্ম-বিচারের প্রভাবান্বিত হইয়াছে—অপুর অবাধ মুক্তি ও অপরিমেয় বিস্তার তাহার নাই। বিশেষতঃ, প্রকৃতি হইতে ভগবান পর্যন্ত অধিরোহণের ব্যাপারে যেন কতকটা কষ্ট-কল্পনা, বর্ণনার মধ্যে উঁচুসুর লাগাইবার একটা চেষ্টাকৃত অধ্যবসায় অনুভূত হয়। অপুর জীবনের সঙ্গে তাহার অধ্যাত্ম অনুভূতির যে একটা সহজ সম্পর্ক আছে, জিতুর দৈবী অনুভূতির মধ্যে সেরূপ বাস্তব ভিত্তির অভাব—তাহার ক্রম-বিকাশের স্তরগুলি সেরূপ সুস্পষ্ট নহে।

আরও একটা দিক দিয়া অপু ও জিতুর মধ্যে একটা মূলগত প্রভেদ আছে। অপুর বন্ধন-হীন, উদার অনাসক্তির সহিত জিতুর আসক্তি-প্রবণতা অতুলনীয়। জিতু উদাসীন সন্ন্যাসীর

মত দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে অন্তরে গৃহী। নীড়-রচনার একাগ্র কামনা, প্রেমের উত্তপ্ত নিবিড় স্পর্শ—তাহার জীবনে প্রধান আকাঙ্ক্ষা। ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতি-রোমন্থন তাহার প্রধান অবলম্বন। মালতীর চিন্তা তাহার সমস্ত প্রকৃতি-সৌন্দর্যোপলব্ধির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়াছে; কহলগাঁয়ের পাহাড় ও নদীর বিচিত্র, পরিবর্তনশীল রূপ প্রেমের ব্যর্থ-মধুর স্বপ্নে উন্মনা হইয়াছে। অপুর প্রকৃতিরহস্যানুসন্ধানের মধ্যে কোন প্রেম-বিহ্বলতা আত্ম-প্রসারণের চেষ্টা করে নাই। জিতুর প্রেমপ্রবণতা মালতীতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া শেষে হিরণ্ময়ীতে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মত অনধিগম্যা প্রিয়ার নিকট সে যে আকুল আবেদন পাঠাইয়াছে, তাহাই তাহার বৈরাগ্যের বহির্বাসপরা মনের অন্তরতম আকাঙ্ক্ষা। এমনকি যে ভগবৎ-প্রেম তাহার প্রধান সাধনার বিষয় ছিল তাহা এই বিরহ-ব্যথায় অভিষিক্ত হইয়া মানুষের প্রতি ভালবাসার অশ্রুসজল কোমলতায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

কিন্তু প্রেমের চিত্রাঙ্কনে লেখকের যে উচ্চাঙ্গের স্বভাব-কুশলতা আছে তাহা বলা যায় না। তিনি প্রকৃতি-বর্ণনার মধ্যে প্রেমের স্বপ্নাবেশ সঞ্চার করিতে পারেন। কিন্তু স্বপ্ন বাদ দিয়া আসল প্রেমের তীব্র আবেগ তাঁহার মনে কোন উত্তেজনা আনে না। সমস্ত মালতী উপাখ্যানটি একটু আজগুবি, অবিশ্বাস্য ধরণের বলিয়া ঠেকে। বিশেষতঃ, ইহা শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'-এ কমললতার অসংকোচ অনুকরণ। বঙ্কিমচন্দ্র বৈষ্ণবের মঠে দেশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—এই স্বপ্নের মধ্যে প্রেমেরও ঈষৎ আমেজ ছিল। শরৎচন্দ্র এবং তাঁহার অনুকরণে বিভূতিভূষণ ইহাকে স্বাধীন প্রেমের লীলা-ক্ষেত্রে পরিণত করিতে চাহিয়াছেন। বৈষ্ণব-সমাজে সমাজ-বন্ধনের আপেক্ষিক শিথিলতাই ইহাদিগকে এই দিকে প্রেরণা দিয়াছে। কিন্তু ইহারা এই অনুকূল প্রতিবেশের সুবিধায় সন্তুষ্ট না হইয়া আবার ইহার মধ্যে আশ্চর্য রূপগুণসমন্বিত নায়িকারও সন্ধান পাইয়াছেন। এই নায়িকারা মতে উদার, রুচি ও অনুশীলনে মার্জিত, সেবাতে অনলস, এমনকি ললিত-কলাতেও কৃতী ও সংযমে অবিচলিত। কমললতা কাব্যজগতের সুরভি নিজ দেহ-মনে বহন করিত, কিন্তু সে নিজে কবি ছিল না। বিভূতিভূষণ মালতীকে কবিপ্রতিভার অধিকারিণী করিয়া তাহাকে একেবারে সরস্বতীর তুল্য পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন। সমস্ত পরিকল্পনার অসম্ভাব্যতা আমাদের বিশ্বাস-প্রবণতাকে অত্যধিক পীড়িত করিতে থাকে। হিরন্ময়ী বিশ্বাস্যতার দিক্ দিয়া মালতী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাহার উপরেও শরৎচন্দ্রের তেজস্বিনী, দৃঢ়সংকল্পা নায়িকাদের ছায়াপাত হইয়াছে। শ্রীরামপুরের ছোট বৌএর ব্যাপারটাও ছেলেমানুষী ও সত্যকার প্রেম এই দুইএর মাঝামাঝি অবস্থায় পৌঁছিয়া অনেকটা আত্মবিমূঢ় ভাবের মধ্যে অবসান লাভ করিয়াছে। মনে হয় যেন এই প্রেম-প্রবর্তনের ব্যাপারে বিভূতিভূষণ নিজ প্রতিভার সহজ নির্দেশের বিরুদ্ধে ঔপন্যাসিকের চিরপ্রথাগত, প্রত্যাশিত কর্তব্য পালন করিয়াছেন।

মোটের উপর জিতুর জীবনে অপুর সুনির্দিষ্ট ঐক্য ও প্রাণ-চঞ্চলতার অভাব। তাহার জীবনেতিহাস যেন শিথিল-বদ্ধ কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদের সমষ্টি। তাহার বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় সে যে সাড়া দিয়াছে তাহার মধ্যে ক্ষীণতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের

অভাব অনুভব করা যায়। তথাপি 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'-এর সঙ্গে তুলনায় হীনপ্রভ হইলেও 'দৃষ্টি-প্রদীপ'-এর জীবন ও প্রকৃতি-বর্ণনার মধ্যে সরসতার অভাব নাই। দার্জিলিং-এ চা-বাগানের জীবন-যাত্রা, দশঘরার জ্যাঠাইমার উদ্ধত ধন গর্ব ও শুচিতার অহংকার ও তাহার মায়ের দীন নম্রতা, বটতলার মেলায় অশিক্ষিত নিমচাঁদের মূঢ় ভক্তি-বিহ্বলতা, প্রভৃতি দৃশ্যের সরস বর্ণনা-ভঙ্গী উপভোগ্য। প্রকৃতি-বর্ণনার মধ্যে পূর্বপরিচিত অসীমের সুর ও গভীর ঐকান্তিকতা ধ্বনিত হইয়াছে। রাতের তারকা-খচিত নীলাকাশের তলে অতিবাহিত রাত্রি, দ্বারবাসিনীর মঠে প্রেমের বিহ্বলতা-ভরা বিনিদ্র জ্যোৎস্নারজনী, কহলগাঁয়ের পাহাড়ের স্মৃতি-বিধুর বিভিন্ন দৃশ্য, গরুর গাড়িতে যাত্রাকালে অরুণোদয়ে ও সন্ধ্যায় ভগবানের চির-পথিক মূর্তির পরিকল্পনা—এই সমস্ত দৃশ্যবর্ণনাই শিল্পচাতুর্যে ও গভীরভাবসঞ্চারে প্রশংসনীয়, যদিও ইহারা 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'-এর মত বক্তার জীবন হইতে স্বতঃউদ্ভূত বলিয়া মনে হয় না। ইহার শেষ সুর লেখকের পূর্ব গ্রন্থেরই অনুরূপ—লৌকিক জীবনের লাভ-ক্ষতিকে তুচ্ছ করিয়া অফুরন্ত, অনন্ত যাত্রা-পথের জয়গান। এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, ভাব-গভীরতাকে বিসর্জন না দিয়া সীমাহীন ব্যাপ্তির দিকে প্রবণতা, এই অধ্যাত্মদৃষ্টি ও অপরাজিত মানবাত্মার ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সা যদি বাংলা সাহিত্যে ও উপন্যাসে স্থায়ী হয়, তবে ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুর্ভাবনার কোন প্রয়োজন নাই।

'আরণ্যক' (এপ্রিল, ১৯৩৯) উপন্যাসটির পরিকল্পনার অভিনবত্ব বিস্ময়কর—ইহা সাধারণ উপন্যাস হইতে সম্পূর্ণ নূতন প্রকৃতির। প্রকৃতির যে সূক্ষ্ম, কবিত্বপূর্ণ অনুভূতি বিভূতিভূষণের উপন্যাসের গৌরব তাহা এই উপন্যাসে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। প্রকৃতি এখানে মুখ্য, মানুষ গৌণ। সীমাহীন আরণ্য প্রকৃতি লেখকের মন ও কল্পনাকে পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছে। ইহার প্রতি ঋতুতে, দিবা-রাত্রির প্রহরে প্রহরে, জ্যোৎস্না-অন্ধকারের বিভিন্ন পটভূমিকায়, পরিবর্তনশীল রূপ ও সূক্ষ্ম আবেদন আশ্চর্যরূপ বস্তুনিষ্ঠা ও কাব্য-ব্যঞ্জনার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। সর্বোপরি ইহার সমস্ত পরিবর্তনশীলতার মধ্যে এক সুগভীর, অপরিমেয় রহস্যবোধ অবিচল কেন্দ্র-বিন্দুর ন্যায় স্থির হইয়া আছে। প্রকৃতির এই ইন্দ্রজাল লেখক কত নিবিড় ও বিচিত্রভাবে অনুভব করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। জন-হীন, বিশাল, আরণ্যপ্রান্তরের জ্যোৎস্না রাত্রি তাঁহার কল্পনাকে বিভিন্নভাবে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে—ইহা কখনও পরীরাজ্যের মায়াময়, অপার্থিব স্বপ্ন-সৌন্দর্য কখনও বা প্রেতলোকের বিভীষিকা জাগাইয়াছে। তেমনি নিঃস্তব্ধ অন্ধকার নিশীথিনী এক গভীরতর রোমাঞ্চকর অনুভূতিকে—যাহাকে বলে cosmic imagination তাহাকেই—স্ফুরিত করিয়াছে; কল্পনাকে সৃষ্টিরহস্যের মর্মস্থলে লইয়া গিয়া সৃষ্টিক্রিয়ার নিগূঢ় আনন্দ-শিহরণ, ও সৃষ্টিকর্তার প্রকৃতি-পরিচয়কে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। আবার আদিম, আরণ্য জাতির সহিত সংস্পর্শ একদিকে বন্য মহিষের রক্ষাকর্তা টাঁড়বারো দেবের কল্পনাকে রূপ দিয়াছে, অন্যদিকে কেবলমাত্র শিক্ষিত মনের পক্ষেই যাহার ধারণা করা সম্ভব সেই যুগ-যুগান্ত-প্রসারিত ঐতিহাসিক কল্পনাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে। দৃশ্যের পর দৃশ্য একদিকে বর্ণপ্লাবনের বিচিত্র সৌন্দর্যে চক্ষু ও মনকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, অপরদিকে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির নিবিড়তায় রূপাতীত ধ্যানতন্ময়তায় মগ্ন

করিয়াছে। প্রকৃতির সহিত মানবমনের এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কাহিনী বাঙ্গালা উপন্যাসে ত নাইই ; ইউরোপীয় উপন্যাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত সুলভ নহে।

এই চেতনাশক্তিসম্পন্ন, নিগূঢ়ভাবে ক্রিয়াশীল প্রকৃতি-প্রতিবেশের মধ্যে মানুষের সংকুচিত উপস্থিতি চমৎকার সামঞ্জস্য-বোধের নিদর্শন। বিরাট অরণ্যের নিকট মানুষ আকারে যেরূপ ক্ষুদ্র, ইহার শক্তিশালী প্রাণব্যঞ্জনার নিকট মানুষের ছোটখাটো প্রচেষ্টা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিও সেইরূপ নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর। এখানে মানুষের জীবন বনের ব্যবধানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিষ্কৃত ভূমিখণ্ডের মতই দ্বীপধর্মী ও ধারাবাহিকতাহীন—প্রকৃতির অনুগ্রহদত্ত, কুণ্ঠিত অধিকার। প্রকৃতি তাহাকে যেটুকু সংকীর্ণ স্থান ছাড়িয়া দিয়াছে তাহার মধ্যেই সে, যেমন বাহিরে, তেমনি অন্তরেও, কোনমতে মাথা গুঁজিয়া আছে। এখানে মানব-মনের সে উদ্দাম চাঞ্চল্য, সে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা, সে আকাশস্পর্ধী পক্ষবিস্তার নাই। নির্জন, আত্মসমাহিত শান্তি, সমস্ত বাহুল্য-আয়োজন-সম্ভারের বর্জন, আকাঙ্ক্ষা-পরিধির নির্মম সংকোচ—এখানকার জীবনবৃত্তির বৈশিষ্ট্য। বহির্ঘটনার আশ্রয়-চ্যুত জীবন কেবল কয়েকটি ক্ষীণ, বিচ্ছিন্ন অনুভূতির সমষ্টি। মানুষের আদিম বৃত্তিগুলি এখানে ইন্ধনহীন অগ্নির মতই ম্লান ও নিস্তেজ। ঝগড়া-বিবাদ ও অত্যাচার আছে, কিন্তু ইহারা অরণ্যের দাবানলের মত হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া অল্পক্ষণ পরে দাহ্য পদার্থের অভাবে নিভিয়া যায়। কৃত্রিম সমাজ-ব্যবস্থায় বিরোধের যে অগ্নি আইন-রচিত চিমনির সাহায্যে ও উভয়পক্ষের প্রচণ্ড জিদে বহুবর্ষ জিয়াইয়া রাখা হয়, এই আরণ্য সমাজে একদিনের লাঠি-বাজিতে তাহার চির-নির্বাণ। এক রাসবিহারী সিংহ ও দ্বিতীয়, নন্দলাল ওঝা এই বন্য সরলতার মধ্যে সভ্যতার জটিল ক্রূরতার প্রতীক—কিন্তু ইহারা বনে বাস করে বলিয়া সোজাসুজি বিনা ছদ্মবেশে হিংস্র-পশু-স্থানীয় হইয়াছে—সভ্য সমাজের আদর্শানুযায়ী নাম ভাঁড়াইবার কোন প্রয়োজন হয় নাই। ইহার মহাজন ধাওতাল সাহু পর্যন্ত সরল বিশ্বাসী, আত্মভোলা লোক—অরণ্যমর্মরের নিগূঢ় মন্ত্র তাহাকে কুসীদজীবী-সুলভ ধূর্ততা ভুলাইয়াছে। এখানে দারিদ্র্যের রুক্ষ ত্বক্ স্নিগ্ধ সন্তোষের শ্যাম-শৈবাল-মণ্ডিত, ভিক্ষার গ্লানি-বর্জিত, মৃত্যুতে বিলয়ের প্রশান্তি ও শোকে অশান্ত তীব্রতার পরিবর্তে বিষণ্ণ, ঘুম-পাড়ানিয়া আচ্ছন্নতা। এখানকার আমোদ-প্রমোদে সহজ আনন্দের ছন্দ-সুষমা, মেলা-পার্বণে লুব্ধ বণিক্-বৃত্তির কোলাহলের স্থলে স্বতঃ-উৎসারিত স্ফূর্তির একদিনব্যাপী উচ্ছ্বসিত জোয়ার। এখানকার সরল পারিবারিক জীবনে সপত্নী-বিদ্বেষ ঈষৎ ব্যঙ্গ-মধুর, সস্নেহ মনোভাবে রূপান্তরিত ; বৃদ্ধ স্বামীর ঘর হইতে তরুণী ভার্যার পলায়ন ফাঁদ পাতিয়া বন্য পাখি ধরার মত করুণ, বেদনাসিক্ত সহানুভূতির বিষয়। এখানে জীবন ও মরণ, কবি-কল্পনায় নহে, প্রতিদিনকার বাস্তব আবর্তনে, "চুপি চুপি কথা কয়"।

এই আরণ্য রাজসভার সভাসদ্‌গুলি নামে ও কার্যে, ব্যবহারে ও হৃদয়বৃত্তিতে প্রতিবেশের সহিত এক সুরে বাঁধা—উদার, অনাসক্ত নিস্পৃহতার ভাব-মণ্ডল-বেষ্টিত। কবি বেঙ্কটেশ্বর, অধ্যাপক মটুকনাথ, উদ্ভিদবিদ্যাবিদ, সৌন্দর্য-পিয়াসী যুগলপ্রসাদ, সাঁওতাল-রাজ দোবরু পান্না ও তাহার প্রপৌত্রী, নিজ সরল পবিত্র হৃদয়ের খাঁটি আভিজাত্যে গৌরবময়ী তরুণী ভানুমতী, স্বভাবশিল্পী, নৃত্যবিশারদ ধাতুরিয়া—সকলের উপরেই আরণ্য মহিমার রাজচ্ছত্র প্রসারিত। অপেক্ষাকৃত প্রাকৃত প্রজাসাধারণও—রাজু পাঁড়ে, জয়পাল কুমার, কুণ্ডা রাজপুতানী,

গণোরী তেওয়ারি, নক্‌ছেদী-তুলসী-মঞ্চী, গিরিধারীলাল, প্রভৃতি—বনস্পতির পার্শ্বে ক্ষুদ্র ঝোপ-জঙ্গলের মত—এই আরণ্য পরিমণ্ডলের সহিত চমৎকার মিশিয়া গিয়াছে। এমন কি বাঙালী ডাক্তার রাখালবাবুর বিধবা স্ত্রী, বিহার-প্রবাসী দরিদ্র বাঙালী ব্রাহ্মণ পরিবারের অবিবাহিতা যুবতী কন্যা ধ্রুবা, জবা—ইহারাও বাঙালী সমাজের বহুশতাব্দীর সাধনা-লব্ধ সংস্কার হারাইয়া এই অরণ্য-সমাজের আভিজাত্য-গৌরবহীন, শ্রম-কর্কশ জীবন যাত্রা অবলম্বন করিয়াছে। সরস্বতী কুণ্ডীর অপরূপ সৌন্দর্যপূর্ণ বনস্থলীর মধ্যে অবসর-প্রাপ্ত হাকিম রায় বাহাদুরের সপরিবারে বনভোজনবিলাস অমৃতহ্রদে মক্ষিকা-নিমজ্জনের মত, ইহার বিসদৃশ অসংগতির দ্বারাই, আরণ্য প্রকৃতিব সুগম্ভীর, অধৃষ্য মহিমাকে স্ফুটতর করিয়াছে।

'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (অক্টোবর, ১৯৪০) বিভূতিভূষণের পরবর্তী উপন্যাস। রাণাঘাটে হোটেল-পরিচালনার অতিজাগ্রত ব্যবসায়-বুদ্ধিব একটি সরস ও উপভোগ্য চিত্র ইহাতে আঁকা হইয়াছে। কিন্তু এই নাগরিক চাতুর্য ও কারবারি মাবপেঁচ বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে লেখক যে সরল, দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তিপরায়ণ, ঘন বাঁশবন ও আগাছার জঙ্গলের আড়ালে অযত্ন-বিকশিত বন্য কুসুমের ন্যায় মৃদুসৌরভপূর্ণ পল্লীজীবনের সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার নিজেরও স্বাভাবিক রুচি ও পাঠকেরও সমধিক তৃপ্তি। হাজারি ঠাকুরের চরিত্রটি চিত্তাকর্ষক, কিন্তু তাহার অদৃষ্টে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে দৈবেব যে প্রসাদ-পরম্পরা পুঞ্জীভূত হইয়াছে, যেরূপ একটানা সৌভাগ্যের স্রোতে, চারিদিক হইতে প্রবাহিত অনুকূল বায়ুর প্রেরণায়, তাহাব জীবনতবী সাফল্যের বন্দরে ভিড়িযাছে তাহা বাস্তব প্রতিবেশ অপেক্ষা রূপকথার সহিতই অধিক সাদৃশ্য-বিশিষ্ট। উপন্যাসটি মোটের উপর রূপকথার লক্ষণান্বিত, এবং বোধ হয় আধুনিক যুগের সমস্যা-ক্ষুব্ধ জীবন-যাত্রাব বৈপরীত্য-সূচনার জন্যই মিষ্ট।

'বিপিনের সংসার' (সেপ্টেম্বব, ১৯৪১) উপন্যাসে বিভূতিভূষণ পুরাতন আবেষ্টনের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করিয়া কতকটা নূতন মনোরাজ্যে পদক্ষেপ করিযাছেন। তাঁহার সমস্ত উপন্যাসেরই একটা সাধারণ লক্ষণ—প্রেমের আপেক্ষিক বর্জন। প্রেমেব দুঃসাহসিকতা ও তীক্ষ্ণ বিক্ষোভের প্রতি তাঁহার একটা প্রকৃতিগত বিমুখতা আছে। তাঁহার বচনায় হৃদয়াবেগ শান্ত, স্নিগ্ধ সমবেদনা, নিরুত্তাপ, দ্রবীভূত কোমলতার আকারেই দেখা দেয়। তাঁহার দাম্পত্য-সম্পর্ক-বর্ণনা এই উষ্ণ আবেগেব অভাবেব জন্যই কতকটা অপূর্ণ বলিয়া ঠেকে। নিষিদ্ধ প্রেমের ত্রিসীমানাতেও তিনি ঘেঁষেন নাই—এই তীব্র হৃদয়-মন্থনে যে অমৃত-হলাহল উঠে তাহা পান করিতে তিনি রুচির দিক দিযা অনিচ্ছুক ও সম্ভবতঃ শক্তির দিক দিয়া অসমর্থ। এই উপন্যাসে কিন্তু নারী-পুরুষের সমাজের অননুমোদিত আকর্ষণকে তিনি অত্যন্ত সাবধানতার সহিত, আগুনে হাত না পোড়াইয়া, ছুঁইয়াছেন। বিপিনের জীবনে মানী ও শান্তি এই দুই বিবাহিতা রমণীর প্রভাব এই উপন্যাসের বর্ণনীয় বিষয। বিপিনের প্রতি ইহাদের মনোভাব সস্নেহ হিতৈষণা ছাড়াইয়া আর এক পর্যায় উপরে উঠিয়াছে—প্রেমের অস্বস্তি, যত মৃদুভাবেই হোক, ইহার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। অবশ্য লেখক এই আকর্ষণেব দৈহিক লালসার দিক্‌টা একেবারে চাপিয়া ইহার উচ্চতর প্রেরণা ও নিষ্কলুষ আবেগের দিকটাই বড় করিয়াছেন। মানীর প্রভাবে তাহার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়াছে, এমন কি তাহার স্ত্রী মনোরমার প্রতি মনোভাবেও মমতাপূর্ণ কোমলতার সঞ্চার হইয়াছে। এই উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু প্রেমের অহেতুক আবির্ভাব

ঘটিয়াছে নারীর হৃদয়ে; বিপিন কেবল তাহাদের আবেদনে, কতকটা নিষ্ক্রিয়ভাবে, সাড়া দিয়াছে মাত্র। স্নেহ-যত্ন কেমন করিয়া প্রেমে রূপান্তরিত হইল তাহার কাহিনী লেখক যবনিকার অন্তরালেই রাখিয়াছেন—মনস্তত্ত্বের পরীক্ষা এড়াইয়া গিয়াছেন। নারীকে গায়ে-পড়া হইয়া পুরুষের প্রেমার্থিনী করিলে ঔপন্যাসিকের কিছু সুবিধা আছে; নারী-হৃদয়ে প্রণয়োদ্ভবের প্রাথমিক স্তরের দুরারোহ সোপানাবলী ভাঙিবার ক্লেশ তাঁহাকে স্বীকার করিতে হয় না। বিশেষতঃ, বিপিনের মধ্যে প্রণয়কে আকর্ষণ করিবার উপযুক্ত কোন গুণের বা মানী ও শান্তির বিবাহিত জীবনে কোন অতৃপ্তির ইঙ্গিতও তিনি দেন নাই। মানীর ক্ষেত্রে না হয় বাল্য-সাহচর্যের একটা মোহময় স্মৃতি ছিল—শান্তির ক্ষেত্রে সেরূপ কোন ক্ষীণ অজুহাতও নাই। কাজেই এই অনায়াস-অঙ্কুরিত প্রেমের প্রভাব যতই সূক্ষ্ম ও মনোজ্ঞ-ভাবে বর্ণিত হউক না কেন, ইহার জন্মের আকস্মিকতা আমাদিগকে তৃপ্তি দিতে পারে না।

লেখকের অভ্যস্ত সংকোচ একবার ভাঙিয়া যাওয়ায়, তিনি যেন একটু অনাবশ্যক বাহুল্যের সহিত উপন্যাসে এই নিষিদ্ধ প্রেমের নানা উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। প্রথম, বিপিনের বিধবা ভগ্নী বীণার সহিত প্রতিবেশী পটলের প্রণয়-সঞ্চার; এই প্রণয় কয়েকটি প্রকাশ্য ও নিভৃত আলাপ-সংলাপের বেশী অগ্রসর হয় নাই। দ্বিতীয়, গ্রাম্য পণ্ডিত বিশ্বেশ্বরের এক বাগ্দী মেয়ের সঙ্গে সমাজ ত্যাগ। এই প্রেমের সহিত আমাদের পরিচয় হয় মরণাপন্ন মেয়েটির রোগশয্যাপার্শ্বে তাহার প্রণয়ীর ব্যাকুল সেবা-শুশ্রূষার মধ্য দিয়া ও ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে তাহার মৃত্যুতে। কাজেই জীবনের সক্রিয়তার ভিতর দিয়া ইহার কোন যাচাই হয় নাই—ইহা মনের মধ্যে কেবল একটা করুণ স্মৃতির সজল রেখা রাখিয়া যায় মাত্র। তৃতীয় দৃষ্টান্ত বিপিনের পিতা বিনোদ চাটুজ্জ্যের প্রতি অধুনা-বৃদ্ধা কামিনী গোয়ালিনীর যৌবন-প্রণয়ের পূর্ব-ইতিহাস—ইহা বিপিনের মনে একটু কোমলতার আভাস দিয়াছে এবং বিপিনের স্বগত চিন্তার বেনামীতে লেখকেরও কিছু সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে। এই ঘটনাটি যেন উপন্যাসের পটভূমিকা রচনা করিয়াছে—ইহা যেন উপন্যাসটিকে প্রেমের উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত করিবার উপযোগী বারিসেচন। প্রকৃতি-চিত্র এখানে অনেকটা সংক্ষিপ্ত; পল্লীজীবনের প্রতি-বেশও, অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায়, নাতিস্ফুট। গ্রন্থকার এই উপন্যাসে একটু নূতন প্রবণতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার অকালমৃত্যু তাঁহার প্রতিভার ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে সমস্ত অনুমান ও কৌতূহলকে রুদ্ধ করিয়া পাঠকের মনে একটা আশাভঙ্গজনিত গভীর অতৃপ্তিরই সৃষ্টি করিয়াছে।

(১০)

বাঙ্গালা দেশের দীর্ঘ-প্রসারিত, বৈচিত্র্যহীন সমভূমির প্রান্তভাগে যেমন একটি পার্বত্য বন্ধুরতা ও আরণ্য দুর্ভেদ্যতার প্রাচীরবেষ্টনী আছে, তেমনি তাহার শান্ত, নিস্তরঙ্গ জীবন-যাত্রার সুদূর পশ্চাৎপটে একটা অসংস্কৃত হৃদয়োচ্ছ্বাস ও বন্য, দুর্বার আবেগের গভীর-রেখাঙ্কিত সীমান্ত-প্রদেশ আছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের আর্যজাতির সহিত তুলনায় বাঙ্গালীর রক্তধারা ও চিত্তবৃত্তিতে আদিম অনার্য প্রভাবের বিচিত্রতর সংমিশ্রণ সুপ্ত আছে। মনের অবচেতন স্তরে সংবৃত এই অতীত সংস্কার কখনও কখনও অতর্কিতভাবে তাহার রক্তে

দোলা দেয়, তাহার জীবনের ধূসরতার মধ্যে এই রক্তরেখা কোন কোন মুহূর্তে ঝিলিক দিয়া উঠে। বাঙ্গালী জীবনের এই প্রখর-রাগদীপ্ত প্রত্যন্ত-প্রদেশ আধুনিক যুগের যে সমস্ত ঔপন্যাসিকের তীব্র কৌতূহল ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করিয়াছে তাহাদের মধ্যে শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও, শ্রেষ্ঠতম। তাঁহার তিন পর্বে সমাপ্ত 'উপনিবেশ' উপন্যাসটি এই ভূগর্ভলুপ্ত খরতর চেতনাধারাকে, এই আদিম আরণ্য সংস্কারকে নূতন করিয়া উপলব্ধি করার একটি চমকপ্রদ প্রচেষ্টা। অবশ্য এই উদ্দেশ্যটি পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে যাইতে হইয়াছে বাঙ্গালা দেশের ভৌগোলিক সীমান্তে, সুন্দরবনের আরণ্য সর্পিলতার শেষ ফণাশীর্ষে, সমুদ্রগর্ভ হইতে সদ্যো-জাগিয়া-ওঠা, কর্দমাক্ত-পিচ্ছিল, জল স্থল আকাশের দুর্দম আসঙ্গলিপ্সা-প্রসূত অপরিণত ভ্রূণ-পিণ্ডের ন্যায় অবয়বহীন চর ইসমাইলে। এখানে মানবজীবনের উপর প্রকৃতি-পরিবেশেরই একাধিপত্য—সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস মানবিক হৃদয়োচ্ছ্বাসের ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করে, দুর্দম ঝটিকালীলার গতিবেগ মানুষের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে সংক্রামিত হয়। চর ইসমাইলের অধিবাসীর মধ্যে, ষোড়শ সপ্তদশ শতকের দুর্ধর্ষ জলদস্যু পোর্তুগিজের আধুনিক বংশধর, আরাকানী ও মগের বন্য, অসামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার রক্তবাহী কয়েকটি নর-নারী, উত্তর ও পূর্ববঙ্গের দুঃসাহসিক ভাগ্যান্বেষী যাযাবর কয়েকটি পরিবার, ও কিছু সংখ্যক সরকারী চাকরী ও নিয়মিত ব্যবসায়ের শৃঙ্খলবদ্ধ, পোষ-মানা কয়েকটি মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সন্তান।

'উপনিবেশ'—তিন খণ্ড (১৯৪৪) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম রচনা এবং ইহাতেই তাঁহার নূতন জীবন-দৃষ্টি নিঃসন্দিগ্ধভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই উপন্যাস-ত্রয়ীতে তিনি বাঙ্গালীর রক্তে আদিম বন্য প্রাণোচ্ছ্বলতার দুর্বার আবেগটি আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম পর্বে ডি-সুজা, জোহান, লিসি, গঞ্জালেশ ও বর্মী-চোরা ব্যবসাদার—প্রাচীন পোর্তুগিজ রক্তধারার ও জলদস্যুতার বাহক—তাহাদের ভালবাসা-বিরাগের উগ্র উন্মাদনা, তাহাদের দুঃসাহসিক বাণিজ্যাভিযান ও নৃশংস জিঘাংসা লইয়া চর ইসমাইলের জীবন-যাত্রায় একটি রক্ত-রঞ্জিত রেখা অঙ্কিত করিয়াছে। ইহারা বাঙ্গালা দেশে স্থায়ীভাবে বাস করে বলিয়া কেবল ভৌগোলিক অর্থে বাঙ্গালী। বাঙ্গালী জীবন-ধারার সহিত তাহাদের জীবন-ধারা মেশে কেবল প্রয়োজনের তাগিদে, আক্রমণ-আত্মরক্ষার আকস্মিক প্রেরণায়। চর ইসমাইলের সমুদ্র তটভূমিতে তরঙ্গের অভিঘাত-চিহ্নিত ফেনিল রেখার ন্যায় এই বহিরাগত জীবন-উদ্বেলতা বাঙ্গালীর শান্ত জীবন-দিগন্তে একটি রক্ত-রাঙ্গা সরু পাড়ের মতই প্রতীয়মান হয়। তার পর দ্বিতীয় উপাদান, মণিমোহন ও বলরাম ভিষগ্‌রত্নের জীবন-সমস্যার জটিলতা-প্রসূত। এই বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ভদ্রতার প্রতীকদের অন্তরে লাগিয়াছে প্রতিবেশ-উদ্ভূত ঝড়ের দোলা। মণিমোহন সরকারী খাজনা আদায় করিতে যে নির্জন দ্বীপের উপান্তে নৌকা ভিড়াইয়াছে, সেই খানে মগ রমণী মাফুন সমুদ্রের ঝড়ো হাওয়ার মত তাহার জীবনের উপর আপতিত হইয়াছে। তাহার ভদ্র, সংস্কার-কুণ্ঠিত, বিধি-নিষেধের ও কর্তব্য-বোধের বেড়ায় সুরক্ষিত জীবন এই দারুণ অভিঘাতে আমূল কাঁপিয়া উঠিয়াছে ও এই দুর্বার আকর্ষণের মদির স্বাদ তাহার সমস্ত রুচিবোধকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে এই প্রভাব তাহার এই জীবনে স্থায়ী হয় নাই—সমুদ্রোত্থিত ভেনাস তাহার চিরজীবনের

সৌন্দর্যলক্ষ্মীতে রূপান্তরিত না হইয়া আবার সমুদ্র-গর্ভে বিলীন হইয়াছে। বলরামের স্ত্রীসম্পর্ক-বঞ্চিত জীবনে মুক্তা আসিয়াছে অনেকটা অযাচিত প্রসাদের মত, কিন্তু উহাদের সম্পর্কটি কোন দিনই সুস্থ, স্বাভাবিক হইয়া উঠে নাই। বনের টিয়া পাখী খাঁচার মধ্যে পোষ মানে নাই, ডানা ঝাপটাইয়া ও ঠোঁট বাঁকাইয়া বরাবরই ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে। মুক্তা-চরিত্র উপন্যাসের সাঙ্কেতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে সুস্পষ্টতা লাভ করে নাই, তাহার অনুরাগ-বিরাগের রহস্যটি কোন দিনই উন্মোচিত হয় নাই। নূতন-ভাসিয়া-ওঠা দ্বীপে, নব-সংগঠিত সমাজে যেমন বহু অতর্কিত আগন্তুক জীবন-প্রেরণার নানা স্রোতোবাহিত হইয়া আবির্ভূত হয়, কিন্তু উহার মধ্যে নিশ্চিন্ত-নির্ভর আশ্রয় খুঁজিয়া পায় না, মুক্তাও সেইরূপ এই দ্বৈপায়ন জীবন-যাত্রার সঙ্গে আপনাকে মিশাইয়া দিতে পারে নাই। বলরামের মধ্যেও প্রেমিকের কোন লক্ষণই নাই—এই বনবিহঙ্গিনীর চিত্ত জয় করার মত কোন সুর তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় নাই। সে এই দুর্লভ, ক্ষণস্থায়ী সৌভাগ্যকে লইয়া বিব্রত-ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে, ইহার অবৈধ আনন্দকে সে যথাসম্ভব গোপন রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। চর ইসমাইলের বিদ্রোহ তাহার রক্ত-কণিকার ক্ষুদ্রতম অংশেও কোন চাঞ্চল্য জাগায় নাই, নব সৃষ্টির অভাবনীয়তার মধ্যে সে পূর্ব সংস্কার ও প্রাচীন প্রথাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। তাহার ত্রস্ত পদক্ষেপ, তাহার কুণ্ঠিত, লজ্জাজড়িত আচরণ, নারীর অতর্কিত আবির্ভাবে তাহার অনিশ্চিত, সংশয়াচ্ছন্ন মনোভাবই মুক্তার সহিত তাহার সম্বন্ধকে প্রেমের মহনীয়তা হইতে দূরে রাখিয়াছে। অবাঞ্ছিত সন্তানের আবির্ভাব-সম্ভাবনা উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বকে ঘনীভূত করিবার উপক্রম করিয়াছে, কিন্তু একটি অতি সাধারণ দুর্ঘটনা এই দ্বন্দ্বের একটা সুলভ সমাধান আনিয়া দিয়াছে। এই উভয়বিধ চরিত্রের মাঝখানে পোষ্টমাষ্টার হরিদাস পালের সংসার-বিমুখ দার্শনিকতা ও দেশ-পর্যটনের তীব্র কৌতূহল একটা নূতন প্রবণতার সন্ধান দিয়াছে। পোষ্টমাষ্টার চর ইসমাইলের জীবন-যাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নহে, কিন্তু উহার শিথিল অসামাজিকতা ও নিঃসঙ্গ আত্মনিমগ্নতা উহার জীবনে সংক্রামিত হইয়া উহাকে বন্ধন ছিন্ন করার প্রেরণা যোগাইয়াছে। চরের জীবন হইতে সে অনির্দেশ্য ভ্রমণের আকৃতি, লক্ষ্যহীন পাদচারণার মাদকতা আহরণ করিয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম খণ্ডের ঘটনার অনুস্মৃতির মধ্যে কাল-পারম্পর্য ঠিক রক্ষিত হয় নাই—জোহানের হত্যার পূর্ববর্তী কাহিনী হত্যার পর বিবৃত হইয়াছে ও গঞ্জালেশের সহিত ডি-সুজার প্রথম পরিচয়ের উপলক্ষ্য ও বর্মী-দ্বারা লিসির অপহরণ কালানুক্রমিকতার অনুসরণ করে নাই। সুতরাং দ্বিতীয় পর্বের মোটামুটি ৫০ পৃষ্ঠা প্রথম পর্বের ঘটনার আগেকার ব্যাপার বর্ণনা করিয়াছে। এই ধারাবাহিকতার ছেদের জন্য ঘটনা-প্রবাহের অগ্রগতি যেন চক্রাবর্তনে পর্যবসিত হইয়াছে। বলরামের সঙ্গে মুক্তার সম্পর্ক-জটিলতার মধ্যে গর্ভজাত সন্তানের আবির্ভাব, ভীতি ও বিরাগের উগ্রতর উত্তেজনা সঞ্চার করিয়াছে। মণিমোহন-মাফুন সমস্যাও, মণিমোহনের অকস্মাৎ-প্রজ্বলিত কামনার স্পর্ধিত দুঃসাহস সত্ত্বেও, মাফুনের অপ্রমত্ত বাস্তববাদ ও যাযাবর জীবনের দুর্নিবার আকর্ষণের জন্য, ভদ্রগোছের সমাধান লাভ করিয়াছে। মণিমোহন-পতঙ্গ আগুনের ধার ঘেঁসিয়া গিয়াছে, কিন্তু দগ্ধ হয় নাই। দ্বিতীয় খণ্ডে নূতন আবির্ভাব ঘটিয়াছে মুকুল গাজীর—তিনি প্রথম ডি-সুজা

বর্মী-কোম্পানির অবৈধ বাণিজ্যের অংশীদাররূপে উপন্যাসে প্রবেশলাভ করিয়া পরে মুক্তাকে বলরামের আশ্রয় হইতে ছিনাইয়া লইয়া উপনিবেশের বর্বর সমাজে নিজ স্বাধীন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। এই সমস্ত নূতন চরিত্র-পরিণতি চর ইসমাইলের আদিম-প্রবৃত্তিমূলক প্রতিবেশের সহিত কি বিশেষ সূত্রে আবদ্ধ তাহা অনেকটা অস্পষ্ট থাকিয়াই যায়। গঞ্জালেশের পোর্তুগিজ রক্ত ও পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য-প্রভাব খুব অতিরঞ্জিত গাঢ় বর্ণে চিত্রিত হইলেও কার্যে ইহার পরিচয় যৎসামান্য মাত্র। মধ্যে মধ্যে সে দুঃসাহসিক প্রেরণায় উত্তেজিত হইয়া উঠে, কিন্তু তাহার ব্যবসায়ী মনোভাব তাহার জলদস্যুর নৃশংস উত্তরাধিকারকে যে স্মৃতি-মাত্রে পর্যবসিত করিয়াছে তাহা তাহার আচরণেই সুস্পষ্ট। মুক্তার অবিশ্বাস্য আচরণের কোন মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা লেখক দিতে চেষ্টা করেন নাই—বেচারা বলরামের প্রতি যাহার এত তীব্র বিরাগ সে গাজী সাহেবের অঙ্কশায়িনী হইবার জন্য এরূপ বিস্ময়কর তৎপরতা কেন দেখাইল লেখক সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। প্রতিবেশের প্রতি অতিমনোযোগই যেন লেখককে মানুষের প্রতি অপেক্ষাকৃত উদাসীন করিয়াছে। বোধ হয় তিনি মনে করিয়াছেন যে সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার উচ্ছ্বাস বা কালবৈশাখীর প্রলয় ঝটিকার মত চর ইসমাইলের প্রতিবেশে মানবের হৃদয়াবেগও অকারণে ও আকস্মিকভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, এবং এই বিস্ফোরণ-প্রবণতায় মগ-রমণী মাফুন ও বাঙ্গালী ঘরের শতসংস্কার-জড়িতা গৃহস্থকন্যা মুক্তার মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই। যিনি আকাশ হইতে বজ্রপাতের জন্য সদা উৎকর্ণ, তিনি অন্তর্দ্বন্দ্বের কার্য-কারণ-নিয়মিত অগ্নিলীলার অনুসরণের ক্লেশ স্বীকার করিতে চাহেন না। তৃতীয় পর্বে প্রাগৈতিহাসিক যাযাবর বর্বরতা এক লম্ফে আধুনিক যুগের উগ্র রাজনৈতিক চেতনার ও সমাজ-জটিলতার স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—দশবৎসরের ব্যবধানে জীবন-যাত্রার ছন্দটি অভাবনীয়রূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য যুদ্ধকালীন বিপর্যয় ও দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কট এই পরিবর্তন-প্রেরণাকে দ্রুততর করিয়া দিয়াছে—মাটির চরে প্রথম শস্যের অঙ্কুরের মত আদিম সংস্কৃতিতে আচ্ছন্ন মনে নূতন বিদ্রোহের বীজ বপন করিয়াছে। যাহারা ঢেউএর তরঙ্গে তরঙ্গে অনিশ্চিত জীবিকার বন্য পশুকে শিকার করিতে অভ্যস্ত, যাহাদের রক্তে দুঃসাহসিকতার জোয়ার ফুলিয়া ফুলিয়া ওঠে, তাহারা যখন প্রকৃতির দাক্ষিণ্য-পুষ্ট, আত্মনির্ভর জীবনে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছে, তখনও তাহাদের উগ্র উন্মাদনা একেবারে স্তিমিত হইয়া যায় নাই—একটা নূতন উপলক্ষ্যকে আশ্রয় করিয়া আবার নূতন উদ্দাম ছন্দে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মহাজন ও আড়তদারের চোরাবাজারি সঞ্চয় ক্ষুধিত কৃষকের সম্মুখে যে মৃত্যু-বিভীষিকা প্রকট করিয়াছে তাহারই বিরুদ্ধে ইহাদের প্রকৃতির আদিম দুর্দমতা অশান্ত ছন্দে দুলিয়া উঠিয়াছে। চর ইসমাইলের কৃষক-আন্দোলন ঠিক প্রগতিশীল সমাজের অভিজ্ঞতা-লব্ধ রাজনৈতিক চেতনা-প্রসূত নহে, ইহা যেন আদিম মানব গোষ্ঠীর বাঁচিবার অন্ধ আবেগ, দুর্জয়, স্বতস্ফূর্ত জীবনাকূতি হইতে উৎসারিত। যে জমির প্রথম পর্বে মজঃফর মিঞার ভণ্ডামির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল, সে তৃতীয় পর্বে একটা দুরন্ত গণবিক্ষোভের নেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ক্ষুদ্র একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিশ্বব্যাপী দাবানল প্রজ্বলিত করিয়াছে।

এই আধুনিক বিক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক শাসন-প্রকরণের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম,

থানা, পুলিশ, ম্যাজিষ্ট্রেট, সুনির্দিষ্ট সমাজ-নিয়ন্ত্রণের সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা ও কার্যক্রম চর ইসমাইলের প্রথম প্রাণোন্মেষের আলগা মাটিতে শিকড় চালাইয়াছে। আমরা যেন এক নিঃশ্বাসে ভগবানের দশ অবতারের প্রথম কয়েকটি স্তর অতিক্রম করিয়া, তাঁহার মৎস্য-কূর্ম-বরাহরূপের অপরিণত ভ্রূণ-সম্ভাবনাকে বহু দূরে ফেলিয়া, জরাজীর্ণ, ধ্বংসোন্মুখ, ক্রূর-কুটিল সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। পরিচিত নামগুলির মধ্যে নূতন তাৎপর্য অঙ্কুরিত হইয়াছে, ঘটনা-বিন্যাসের পূর্ব-খোলসের মধ্যে নূতন শাঁসের আস্বাদ আমাদের রসনাকে বিড়ম্বিত করিয়াছে। উপনিবেশ—অস্থির, অস্ফুট, নানা অজ্ঞাত সম্ভাবনার পথে ধাবমান, আত্মপরীক্ষায় উদ্‌ভ্রান্ত ও স্বপ্নাবেশ-মদির জীবনের প্রতীক্—যেন এক মুহূর্তে প্রস্তর-কঠিন, নিয়মশৃঙ্খলের অমোঘতায় বন্দী মহাদেশে পরিণত হইয়াছে। ডি-সুজার আদর্শ বীর গঞ্জালেশ কিছুদিন লিসির অনুসন্ধানরূপ আলেয়ার পিছনে ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে—তাহার পর যুদ্ধের বিপযয়ে আবার সে বাণিজ্য ছাড়িয়া আত্মরক্ষার তাগিদে চর ইসমাইলের নিরাপদ আশ্রয় খুঁজিয়াছে। তাহার চর ইসমাইলে আগমন হারানো প্রেমের স্মৃতি-রোমন্থনের জন্য নয়, পলাতকের উদ্‌ভ্রান্ত লক্ষ্যহীনতা-প্রণোদিত। এখানে আসিয়া সে যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে তাহা তাহার স্বজাতি ভি-সিলভার পীড়ার সুযোগ লইয়া তাহার সর্বস্ব অপহরণের হেয় তস্করবৃত্তি। লেখক এই পূর্বগৌরবের কঙ্কালের ভবিষ্যৎ জীবনের উপর বীরত্বের কাল্পনিক মুকুট পরাইয়াছেন, এই তথাকথিত "বিদ্রোহী শিশু'কে পূর্বপুরুষের মত দিগ্বিজয়-যাত্রায় প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার যে চিত্র উপন্যাসে অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে এই কল্পনার কোন সমর্থন মিলে না। গঞ্জালেশের মধ্যে অগ্নিশিখা নিঃশেষে নির্বাপিত হইয়া ভস্মে পরিণত হইয়াছে, সে দুরন্ত শৈশব ও শৌর্যদৃপ্ত যৌবন হইতে স্খলিত হইয়া দিশাহারা প্রৌঢ়ত্বের যাযাবর জীবন অবলম্বন করিয়াছে—ষোড়শ শতকের রণদুর্মদ পোর্তুগিজ জলদস্যুর প্রতিনিধিত্ব করিবার তাহার বিন্দুমাত্র যোগ্যতা নাই। সুঁটকি মাছের কারবারে যাহার যৌবন কাটিয়াছে তাহার প্রৌঢ় বয়সের অভিযান যে ছিঁচকে চুরির পযায়ে নামিযাছে ইহা পূর্বাপরসঙ্গতই হইয়াছে।

বলরাম ভিষগ্‌রত্ন ও মণিমোহন এই পরিবর্তিত প্রতিবেশে আরও সাধারণ হইয়া উঠিয়াছে—উপনিবেশের দুরন্ত বেগবান জীবনধারা উহাদের চিত্তে যে ক্ষীণ রহস্যদীপ্তি জ্বালিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে নিবিয়া গিয়াছে। মণিমোহনের এখন একমাত্র পরিচয় যে সে হাকিম, তাহার পদোন্নতি তাহার আত্মস্বাতন্ত্র্যকে গ্রাস করিয়াছে। রাণীর শান্ত, নিস্তরঙ্গ প্রেম উহার নিবিড়, স্নিগ্ধ-শীতল বেষ্টনে তাহার অনুভূতির উপর পুরু, নরম আস্তরণ বিছাইয়া তাহাকে নির্বিঘ্ন নিদ্রায় আচ্ছন্ন করিয়াছে। এক মুহূর্তের জন্য তাহার অতীত জীবনের রোমাঞ্চকর, বিপর্যয়কারী অভিজ্ঞতা মাফুনের প্রহেলিকাময় মূর্তি ধরিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—সেই জ্বালাময়ী বিদ্যুৎরেখা হইতে সভয়ে সে চোখ ফিরাইয়া লইয়া নিরাপদ দূরত্বে সরিয়া গিয়াছে। অস্বস্তিকর রোমান্সের চোখধাঁধানো দীপালি হইতে সে ধূসর মধ্যবিত্ততার পরিচয়-বিলোপী বাষ্পাবরণের তলে আত্মগোপন করিয়াছে। বলরামের পরিবর্তন আরও বিস্ময়কর—সে কেবল প্রেম-ব্যাপারে নয়, ব্যবসায়-ক্ষেত্রেও বিগর্হিত চোরা কারবারের সুড়ঙ্গ-পথের অনুসরণ করিয়াছে। তাহার চরিত্রের এই দিকটার উদ্‌ঘাটন সত্যই

অপ্রত্যাশিত। কে অনুমান করিতে পারিত যে এই প্রাণখোলা, আমোদপ্রিয়, বন্ধুবৎসল লোকটির অন্তরে দুইটি বিপরীতধর্মী, অবৈধ লালসা জটিলতার জাল বিকীর্ণ করিয়াছে। বিপ্লবের আগুনে তাহার গোপন সঞ্চয় ভস্মসাৎ হইয়াছে, আর দশ বৎসর পরে তার হারানো প্রিয়া ক্ষতবিক্ষত দেহ-মন লইয়া ঝটিকা-বিধ্বস্ত পক্ষিণীর ন্যায় আবার তাহার আশ্রয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। বলরামের দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে এবার নিশ্চিত অধিকারবোধের দৃঢ় স্বর ফুটিয়াছে। সে মুক্তাকে স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহার চিকিৎসার জন্য সহরের দিকে যাত্রা করিয়াছে। তাহার জীবনে ভীরু গোপনতার পালা শেষ হইয়াছে। ঔপনিবেশিক জীবন-যাত্রার উপর এইরূপে যবনিকা-পাত ঘটিয়াছে। যেমন ইহার প্রাকৃতিক পরিবেশে ঝটিকার বেগ, সমুদ্র-তরঙ্গের উত্তালতা ও আরণ্য দুর্ভেদ্যতা রহস্যাবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া মানব-নিয়ন্ত্রণের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, তেমনি মানব-চিত্তেও রক্তধারার দুর্বার উত্তেজনা, অনিশ্চিত জীবন-যাত্রার অসম দ্রুত পদক্ষেপ বিধিবদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থার ফলে এক অভ্যস্ত কক্ষপথের শান্ত নিয়মিত ছন্দের অনুবর্তন করিয়াছে। উপনিবেশের মদির-বিহ্বল, স্বপ্ন-উদ্‌ভ্রান্ত চক্ষে এক সুনিশ্চিত প্রৌঢ় বাস্তবতার শান্ত বিষণ্ণ স্বীকৃতি স্থির দীপ্তির প্রদীপ জ্বালাইয়াছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই প্রথম উপন্যাসই তাঁহার অসামান্য শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করে। শব্দপ্রয়োগের তীক্ষ্ণ সঙ্কেতময়তা ও চিত্রধর্মিতায়, বর্ণনার আবেগময় গতিবেগে, প্রতিবেশরচনার কুশলতায় ও অতীত ইতিহাসের বর্ণাঢ্য উদ্‌ঘাটনে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন সর্বত্রই সুস্পষ্ট। তাঁহার শক্তিও যেমন সুপ্রকট, তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও তেমনি সুপ্রচুর। কিন্তু শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে কেবল জোরালো ভাষা ও ব্যঞ্জনা প্রধান বর্ণনার কাব্যধর্মিত্বই যথেষ্ট নহে—উহাতে আরও প্রয়োজন জীবন-দর্শনের গভীরতা, মানবপ্রকৃতির জটিল রহস্যের উন্মোচন। লেখক একটা বিশেষ উপপত্তিমূলক উদ্দেশ্য লইয়াই এই উপন্যাস লিখিয়াছেন ইহাই মনে হয়। অতীত যুগের বংশপরম্পরাগত জীবন-প্রেরণা কিরূপ অলক্ষ্য অনিবার্যতায় আধুনিক জীবনে সংক্রামিত হয় ইহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়। এক হিসাবে দেখিতে গেলে, প্রত্যেক নূতন জাগা মৃত্তিকাস্তর, উপনিবেশের আদিম, অনার্য রূপ প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিস্মৃত-প্রায় জীবনাকৃতিকে, সৃষ্টি-প্রারম্ভের কম্পমান পৃথিবী ও ঝটিকা-মত্ত জলরাশির সহিত মানুষের ছন্দ মিলাইবার প্রাণান্তিক সাধনাকে পুনরুজ্জীবিত করে। পায়ের তলায় কাঁপা মাটি, মাথার উপর ভাঙ্গিয়া-পড়া আকাশ, ও হিংস্র, গ্রাসলোলুপ, সর্পিল তরঙ্গের অবিশ্রাম আঘাত—এই প্রতিবেশে যে জীবনযাত্রা সুরু হয় তাহার মধ্যে অনিবার্যভাবে মানুষের আদিম সংস্কারগুলির আংশিক পুনরাবৃত্তি ঘটে। কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ'-এ যে জীবন-পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহাতে এই অতীতের প্রভাব বিচ্ছিন্ন ও আকস্মিক বলিয়াই মনে হয়—ইহা যেন অতর্কিত আবির্ভাব, আধুনিক জীবনের সহিত কোন অচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ নয়। ডি সুজা, জোহান, গঞ্জালেশ, বর্মী চোরা-ব্যবসায়ী, মাফুন—ইহারা সেই সদ্যোজাত, মূঢ় হিংসায় অন্ধ ও আত্মপরিচয়-হীনতায় রহস্যগহন মানব প্রতিরূপরূপে গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু ইহারা নিজেরাই নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি, ইহাদের প্রাণশক্তি ক্ষীণ, ইহাদের বন্য বর্বরতা আধুনিকতার যাঁতাকলে চূর্ণাস্থি। আধুনিকতার জীবন-কল্লোলে ইহারা ক্ষণস্থায়ী বুদ্‌বুদের মত উঠিয়া বিলীন হইতেছে। বাঙ্গালী জীবনের প্রধান ধারায়

ইহাদের অংশ নিতান্ত নগণ্য—ইহারা বাংলা জননীর শ্যামাঞ্চলে দ্রুত-বিলীয়মান, বিবর্ণ-হইয়া-ওঠা একটি অলক্ষ্য রক্তবিন্দু। ইহাদের জীবনে আকস্মিক উৎক্ষেপের চিত্রসৌন্দর্য থাকিতে পারে, অস্থিমজ্জাগত মানস প্রভাবের তাৎপর্য-গভীরতা নাই। তাহাদের সমস্ত শক্তির নৃশংস আস্ফালন, যুগ-প্রতিনিধিত্বের সমস্ত ছদ্ম গৌরব লইয়া তাহারা ঝটিকাবেগে দিগন্ত-প্রক্ষিপ্ত ধূলার ঘূর্ণীপাক বা শুষ্ক পত্ররাজির ন্যায় বাংলার জীবনযাত্রা হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। আর যে কয়টি আধুনিক মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী এই উপন্যাসের চরিত্রশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে তাহাদের জীবনেও উপনিবেশের স্থায়ী-চিহ্নাঙ্কিত কোন অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে নাই। মণিমোহন বা বলরাম কেহই আদিম, অসংস্কৃত প্রাণোচ্ছ্বাসের খরস্রোতে নিজ জীবনতরণীকে ভাসাইয়া দেয় নাই, পরিচিত কূলের অতিসতর্ক আধুনিক জীবনের নিরাপদ আশ্রয় ও কৃত্রিম সুবিধাই খুঁজিয়াছে। পোষ্টমাষ্টার হরিদাসের নিরাসক্ত, ভ্রাম্যমান জীবন আধুনিক দার্শনিকতারই ফল, ইহাতে পৃথিবীর জন্মকালীন জরাতুরতার কোন ছোঁয়াচ নাই। উপনিবেশের কুমারী-গর্ভকোষে যে নবজাত বৈপ্লবিকতার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে লেখক তাহার উদ্ভব-রহস্য খুঁজিয়াছেন শিশু মানব-সমাজের আকস্মিক, অকারণ বিস্ফোরণ-প্রবণতার মধ্যে—কিন্তু এই জন্মকোষ্ঠীর অকৃত্রিমতায় আমরা আস্থা স্থাপন করিবার মত উপাদান পাই না। এ যেন চকমকি ঠুকিয়া বিদ্যুৎ-শিখা জ্বালিবার ব্যর্থ প্রয়াস। ক্ষুধার হিংস্রতা সব কালেই আছে। কিন্তু জমির সেখের নেতৃত্বে বঞ্চিত কৃষক-সমাজের মধ্যে যে বিক্ষোভ আগ্নেয় দীপ্তিতে শিখা মেলিয়াছে তাহা নখরদন্তায়ুধ প্রাচীন সমাজের রক্ত-কলুষিত শ্বাপদবৃত্তি নহে, ইহার মূল আছে আধুনিক চেতনাপ্রসূত সাম্যবোধ ও অধিকার-প্রতিষ্ঠার ন্যায্যতার মধ্যে। এই উভয়বিধ সংগ্রাম যে একই প্রেরণা হইতে সঞ্জাত, উপনিবেশের কাঁচা মাটিতে যে বিপ্লবের বীজ সহজে অঙ্কুরিত ও দ্রুত বর্ধিত হয়, বৈপ্লবিক আন্দোলনের সফলতার জন্য যে আরণ্যক হিংস্রতার সহায়তা অপরিহার্য—এই মতবাদ যে পরিমাণ কল্পন-বিলাসের ও ভাবোচ্ছলতার পরিচয় দেয়, ঠিক সেই পরিমাণে ইতিহাস-সঙ্কেতের মর্মোদ্‌ঘাটনের পরিচয় দেয় না। 'উপনিবেশ' ইহার বিচ্ছিন্ন খণ্ডাংশে মহনীয়, ইহার ব্যঞ্জনা-শক্তিতে রমণীয়, লেখকের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিতে প্রত্যাশা-চমকিত, কিন্তু ইহার দ্বৈপায়নতা কোন অখণ্ড মহাদেশের সহিত আপনাকে সংযুক্ত করিতে পারে নাই।

(১১)

'উপনিবেশ'-এর আদিম-প্রবৃত্তি-শাসিত, প্রকৃতি-পরিবেশের দোর্দণ্ড প্রতাপের দ্বারা অভিভূত জীবন-নেপথ্য অতিক্রম করিয়া লেখক বহুসংখ্যক দ্রুত-রচিত উপন্যাস-পরম্পরার মধ্য দিয়া আধুনিকতার জনাকীর্ণ জটিলতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' (চৈত্র, ১৩৫১), 'মন্দ্রমুখর' (চৈত্র, ১৩৫২), 'মহানন্দা' 'স্বর্ণসীতা' (শ্রাবণ, ১৩৫৩), ট্রফি (আষাঢ়, ১৩৫৬), লালমাটি (চৈত্র, ১৩৫৮) প্রভৃতি উপন্যাস তাঁহার প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ়তর করিয়াছে ও বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক-গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁহার স্থান নির্দিষ্ট করিয়াছে। এই সমস্ত রচনাতেই তাঁহার কয়েকটি বিশেষ মানস প্রবণতা ও তাঁহার উচ্ছ্বাসময়, সঙ্কেত-দ্যোতনা-দীপ্ত বর্ণনা-ভঙ্গীর পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। প্রায় সমস্ত উপন্যাসেই তাঁহার ইতিহাস-

চেতনা ও রাজনৈতিক বোধের প্রখর প্রাধান্য তাঁহার ঔপন্যাসিক জীবন-দৃষ্টিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'মহানন্দা' ও 'লালমাটি' উপন্যাস-ত্রয়ে বরেন্দ্রভূমির প্রাচীন ইতিহাস ও ভূতত্ত্ব, একদিকে ইহার পৌরুষ-দৃপ্ত সংস্কৃতি ও জনশ্রুতির মধ্যে সংরক্ষিত ঐতিহ্য-গৌরব, অপরদিকে ইহার নদ-নদীর প্রবল-স্রোতধারা-চিহ্নিত, ঢেউখেলানো বিরাট লাল মাটির প্রান্তর-কাহিনীর বাহিরের পটভূমিকা ও অন্তর-প্রেরণার বিস্মৃতপ্রায় মূল উৎসরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সদা-প্রবুদ্ধ ঐতিহাসিক চেতনা এই সুদূর, মহিমান্বিত অতীতকে বাঁচাইয়া তুলিয়া আধুনিক জীবনে ইহার দুর্নিরীক্ষ্য অথচ নিগূঢ়ভাবে ক্রিয়াশীল প্রভাবটি পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছে। যেখানে একটি বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়-গোষ্ঠীর মধ্যে অতীত যুগের সংস্কারটি এখনও সজীব, ও ইহার উচ্ছল প্রাণ-শক্তি কতকগুলি বিশিষ্ট রীতি-নীতি ও আচরণের ভিতর পরিস্ফুট, সেখানে লেখকের এই পশ্চাৎ-অভিমুখী দৃষ্টি ইহাদের জীবনাসক্তি ও জীবনেব মর্যাদাবোধের মূল সূত্রটি উদ্‌ঘাটিত করিয়া মানব প্রকৃতির উপর নূতন আলোকপাত কবিয়াছে। পক্ষান্তরে কোন কোন স্থানে ঐতিহ্যচিত্র উপন্যাসের কাহিনীর সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত না হইয়া কেবল কল্পনা-বিলাস ও বর্ণনা-বৈচিত্র্যের ভঙ্গী-কুশলতা মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে—অতীতের মুখের অবগুণ্ঠন খসিয়াছে কিন্তু ইহাতে ভাষা ফোটে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী'-তে রূপাপুরেব কামার-গোষ্ঠী, 'লাল মাটি'-তে আহীব-সম্প্রদায়, কালোশশী ও মুসলমান সমাজে অপাংক্তেয় জেলে পরিবার—ইহারা অতীত-শাসিত জীবন-যাত্রা ও সমাজের বৃহত্তর সংযোগ-বিচ্ছিন্ন, গোষ্ঠীসংকীর্ণতা-মূলক মনোভাবের উদাহরণ। ইহাদের অন্তর-রহস্যে প্রবেশ করিতে গেলে বিস্মৃত অতীতে জ্বালা প্রদীপেব ক্ষীণ শিখাটির অনুসরণ করিতে হইবে, ইহাদের ক্ষেত্রে অতীত সত্যই জীবিত ও জীবনের নিয়ন্ত্রী শক্তি। দ্বিতীয় প্রবণতার দৃষ্টান্ত 'মহানন্দা' উপন্যাসটিতে উদাহৃত। মহানন্দার যে চমৎকার ব্যঞ্জনাময় বর্ণনা দ্বারা গ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছে তাহার সত্য সার্থকতা উপন্যাসে কোথাও পাই না। হিমালয়ের তুষার-গলা উৎস হইতে বিচ্ছিন্ন মহানন্দার অধুনা-শীর্ণ, বালুকা-বিস্তার-লুপ্ত জলধারাকে বাংলার আদর্শভ্রষ্ট, প্রাণ-প্রবাহের সহিত সংযোগ-রহিত আত্মকেন্দ্রিক জীবনধর্মের প্রতীকরূপে কল্পনা করা আশ্চর্য সঙ্গতিপূর্ণ ব্যঞ্জনাশক্তির পরিচয় দেয়। কিন্তু উপন্যাস মধ্যে এই সঙ্কেতের বিস্তার ও প্রয়োগ দেখা যায় না। কলিকাতায় কল-কারখানায় ধর্মঘট উত্তেজিত করা ও ভুখা মিছিলের নেতৃত্ব করার মধ্যে মহানন্দার প্রভাবেব ইঙ্গিতের কি অনিবার্য পরিণতি আছে তাহা দুর্বোধ্য। যাহারা সহরে গণসংযোগকে বাংলার জাতীয় উজ্জীবনের একমাত্র কার্যকরী কর্মপন্থারূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের মনে মহানন্দার কূলপ্লাবী স্রোতোচ্ছ্বাস, ইহার তীরস্থ আমবাগানের নিবিড়, ছায়াঘন শান্তি, ইহার অধিবাসীবৃন্দের প্রাচীনপন্থী জীবনাকৃতি কি স্বপ্ন-মোহ জাগায়, কি প্রেরণার উদ্রেক করে, ভবিষ্যতের কোন্ ছবিকে কি বর্ণে আঁকিয়া তোলে তাহা অনুভব করা যায় না। মানস প্রবণতার দিক দিয়া নীতীশ ও তাহার গণসংযোগ-প্রয়াসী সহরবাসী সহকর্মীদের কোথায় পার্থক্য? যে মহানন্দা উত্তর বঙ্গের প্রাণধারারূপে যুগ-যুগান্ত ধরিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, যাহা গৌড়ের অপরূপ সমৃদ্ধ সমাজ-সংস্থা, সাম্রাজ্য ও শিল্পকলার প্রেরণা যোগাইয়াছে, হিমালয়-শিখর-নিঃসৃত অজস্র সলিল-প্রবাহ

যাহার কলেবরে তরঙ্গের উত্তাল, যোজনব্যাপী বিস্তার ও মনে বিশুদ্ধ ভাবাদর্শের উন্নত মহিমার সঞ্চার করিয়াছে, একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্কীর্ণ মতবাদের পল্লল-অবরোধে তাহার সমুদ্র-স্বপ্ন সমাধি লাভ করিয়াছে—ইহা অপেক্ষা ঐতিহাসিক তাৎপর্যের বিকৃতি ও উন্নত কল্পনার ধূলিশায়ী পরিণতি আর কি হইতে পারে? অনুরূপভাবে চৈতন্যদেবের সকল বাঁধ-ভাঙ্গা প্রেমধর্মের যে উচ্ছ্বসিত বর্ণনা আমরা গ্রন্থারম্ভে পাই, উপন্যাসে তাহার সার্থকতা কোথায়? যতীশ ঘোষের বৈষ্ণবতার ভান ও মল্লিকার অর্ধচেতন আচার-নিষ্ঠাকে নিশ্চয়ই চৈতন্যধর্মের যোগ্য বিকাশরূপে গ্রহণ করা যায় না। আধুনিক উপন্যাসে অতীত ইতিহাসকে আবাহন করিতে হইলে ইহার মর্যাদা-রক্ষা ও প্রয়োগ-কৌশল উভয় দিকেই সচেতন থাকা প্রয়োজন।

এইবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসাবলীর দ্বিতীয় উপাদান রাজনৈতিক চেতনার বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। আধুনিক উপন্যাসে রাজনীতিমূলক প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের একটা সর্বব্যাপী প্রভাব দেখা যায়। ১৯৩২ সালের আগষ্ট আন্দোলন, স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু-সমস্যা উপন্যাসের পৃষ্ঠাগুলিকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছে। মনে হয় যেন যুগের সমগ্র মানবিক আবেগ ও চরিত্র-পরিচয় এই রাজনীতির খাতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মানুষ যে রাজনৈতিক জীব (political animal) এই নূতন সংজ্ঞা অন্তত বাংলা উপন্যাসে অঙ্কিত চরিত্রাবলির পক্ষে নিখুঁতভাবে প্রযোজ্য। স্বাধীনতা-আন্দোলনের মধ্যে জাতির চিত্তে যে ক্ষণিক অপরিমিত ভাবোচ্ছ্বাসের বাষ্পায়িত আবেগ সঞ্চিত হইয়াছিল, বাংলা উপন্যাস গত বার বৎসর ধরিয়া যেন তাহারই মুক্তি-নিষ্ক্রমণের পথ রচনা করিতেছে। এই সংগ্রামবিক্ষুব্ধ, মুক্তির নেশায় পাগল, একলক্ষ্যাভিমুখী মানবপ্রকৃতির যে আগ্নেয় বিস্ফোরণ, মতবাদের ঘূর্ণীতে আবর্তিত, উদ্‌ভ্রান্ত, যে জীবনরসবিমুখ কৃচ্ছ্রসাধনের ছবি আধুনিক যুগের প্রেক্ষাপটে ফুটিয়া উঠিয়াছে, উপন্যাসে তাহারই কল্পনাস্ফীত, মাত্রাতিসাবী আবেগে অতিরঞ্জিত প্রতিরূপ পাই। এই মুক্তি সংগ্রামের কতটা শাশ্বত সাহিত্যিক মূল্য আছে, পঞ্চাশ বৎসর পরে ইহার প্রতিধ্বনি আমাদের অনুভূতিতে কোন সাড়া জাগাইবে কি না, ও বিপ্লবের বাঁধা বুলি ও সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার মধ্যে মানুষের সত্য পরিচয় কি পরিমাণে নিহিত আছে এই সমস্ত প্রশ্ন অনুচ্চারিত ও অমীমাংসিত থাকিয়াই যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'চাঁর অধ্যায়'-এ ব্যক্তিক স্বাধীন ভাবজীবন ও বিপ্লবীর বহিঃশক্তি-নিরূপিত কক্ষপথের যান্ত্রিক অনুবর্তন—এই দুয়ের মধ্যে মর্মান্তিক পার্থক্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু এই সতর্কবাণী যাঁহারা আধুনিককালে মানবজীবনের কারবারী তাঁহাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কি না সন্দেহ। রাজনীতি-বায়ুগ্রস্ত লেখক আর একটা কথাও বিস্মৃত হন—উপন্যাসের হৃদয়-সমস্যার সমাধান উপন্যাস-বর্ণিত মতবাদের পরিণতিতে হওয়া সম্ভব নয়। রাজনীতির প্রকৃতিই হইল যে ইহা অনন্ত-প্রবাহ, ইহা কোন মুহূর্তে স্থির হইয়া পরিসমাপ্তির ছেদ টানে না, অনন্ত কালচক্রে আবর্তিত হইয়া, অসংখ্য জন-চিত্তের উৎক্ষেপে গতিবেগ আহরণ করিয়া, ইহা অনির্দেশ্য, অনায়ত্ত লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়া চলে। ইহার বাস্তব রূপ অনির্ণেয় সম্ভাবনা ও ক্রমবিবর্তিত ভবিষ্যৎ সাধনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন। সুতরাং উপন্যাসের নায়ক যখন এক বিশিষ্ট মতবাদের মধ্যে

তাঁহার দ্বিধাদ্বন্দ্বের সমাধান খুঁজিয়া পান, তাঁহার অশান্ত চিত্তবৃত্তি ও অনিশ্চিত অনুসন্ধানের চরম নিবৃত্তিতে পৌঁছেন, তখন এই পরিণতি পাঠকের সমর্থন লাভ করিতে পারে না, নায়কের স্বস্তি পাঠকের মনে সংক্রামিত হয় না। পারিবারিক জীবনে সমাধানের ছেদ টানা চলে, বিবাহ, বা মৃত্যু বা চিরবিরহ সমস্যার চরম পরিণতিরূপে, সন্তোষজনক কর্মজাল-সংহরণরূপে পাঠকের চিত্তে স্থান গ্রহণ করে। কিন্তু রাজনীতিতে একটা বিশেষ মতবাদে যাত্রা-সমাপ্তির মধ্যে এই ধারণা গড়িয়া উঠে না। লেখকের কাছে যাহা পূর্ণচ্ছেদের দাঁড়ি, ভিন্ন-মতাবলম্বী পাঠকের নিকট তাহা অবিরাম জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মত উদ্যত সংশয়। সুতরাং রাজনৈতিক উপন্যাসের পক্ষে আর্ট—অনুমোদিত সীমারেখায় থামিয়া যাওয়া দুরূহ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রায় সবগুলি উপন্যাসেই এই প্রবণতার উদাহরণ পাওয়া যায়। 'লাল মাটি'-তে জমিদার ও প্রজার স্বার্থসংঘাত ও হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক বিরোধ উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এই গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এক দিকে রঞ্জন, নগেন, উত্তমা, অন্য দিকে মুসলিম লীগের স্বপ্নবিভোর আদর্শবাদী মাষ্টার আলিমুদ্দিন। আলিমুদ্দিনের মনে আবার মুসলমান জমিদারের উৎপীড়ন অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছে, হিন্দু-মুসলমানের শক্তি-প্রতিদ্বন্দ্বিতার রেখাকে বিদীর্ণ করিয়াছে শোষিত-শোষকের আরও মর্মান্তিক শ্রেণী-বিভাগ। উপন্যাসটি আগাগোড়া একটি সংঘাতময় উত্তেজনা ও আকাশ-বিহারী আদর্শবাদেব পরিমণ্ডলে ভ্রমণশীল—শেষে রঞ্জনের দূরপ্রয়াণ ও বুলেটবিদ্ধ আলিমুদ্দিনের মহিমান্বিত তিরোধানে এই দেবলোকস্পর্ধী মর্ত্য সংগ্রামের অবসান ঘটিয়াছে। লেখক তাঁহার সমাপ্তিসূচক মন্তব্যে এই উঁচু সুবের রেশ টানিয়াছেন, মাতৃভূমির প্রতি উচ্ছ্বসিত ভক্তি-নিবেদনে, অতীত মহিমার সহিত আত্মিক যোগসাধনের সচেতন সংকল্পে, তাঁর লেখনী যেন তরবারির দ্যুতিতে ঝলসিত হইয়া উঠে এই অভিপ্রায়-জ্ঞাপনে তিনি উপন্যাসটিকে গীতি-কবিতার মূর্চ্ছনার সুরে শেষ করিযাছেন। তাঁহার লেখনী সত্যই তববাবির তীক্ষ্ণ দ্যোতনাতে নিজ শক্তির বিস্ময়কব পরিচয দিয়াছে, কিন্তু রণক্ষেত্রে বিঘূর্ণিত অসি-দীপ্তিতে মানব-প্রকৃতির গহনশায়ী রহস্যের কতটুকু আলোকিত হয়? আমরা এই রোসনাই-জ্বালা, অতিরঞ্জিত আবেগের উচ্চভাষণ-মুখর সংগ্রামের মাদকতা হইতে সরিযা আসিয়া একটি ক্ষুদ্র, নেপথ্যচারী পারিবারিক বিচ্ছেদলীলার শান্ত করুণ গভীরতায নিমগ্ন হইয়া যাই। লেখক যে বিশুদ্ধ ঔপন্যাসিক শক্তিতে কাহারও অপেক্ষা হীন নহেন, তাহার প্রমাণ রণকোলাহল হইতে বহুদূরে সংঘটিত ক্রুসাহেবের পারিবারিক বিপর্যয়-বর্ণনার অনাদৃত অধ্যায়গুলি। এইখানেই সর্ববিধ অভিভবমুক্ত, আত্মমহিমায় প্রতিষ্ঠিত জীবন সহজ, মর্মান্তিক সুরে কথা কহিয়া উঠিয়াছে।

'মহানন্দা'-য় প্রতিশ্রুতিপূর্ণ আরম্ভের অপঘাত-মৃত্যুর কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। নীতীশের পারিবারিক ও রাজনৈতিক সমস্যার যুগপৎ আকস্মিক সমাধান আমাদের সম্ভাবনীয়তাবোধকে পীড়িত করে। একই মুহূর্তে তাহার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটিয়াছে ও অলকার রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে তাহার সমাজ-জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু অলকাকে লইয়া আম্র-ছায়াঘন, মহানন্দার তীরবর্তী গ্রামখানিতে সে যে নূতন ঘর বাঁধিবে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের চিত্তে সংশয় থাকিয়া যায়। সেখান হইতে গণসংযোগের বেড়াজাল সমস্ত দেশকে কেমন করিয়া আচ্ছন্ন করিবে? মহানন্দাতে জোয়ারের রুদ্ধ মুখ কি একটি

বিবাহিত পরিতৃপ্তির শান্তচ্ছন্দ নিঃশ্বাসেই খুলিয়া যাইবে ? যে আনন্দ নিজের আয়ত্ত ও যে মুক্তি সহস্রের সম্মিলিত সাধনায় সম্ভব উভয়কে ঔপন্যাসিকের খুশীমত এক গাঁট-ছড়ায় বাঁধিয়া দিলেই কি তাহাদের মধ্যে দাম্পত্য-সম্পর্কের অচ্ছেদ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইবে ?

'মন্ত্রমুখর' ও 'স্বর্ণ সীতা'—আগষ্ট আন্দোলনের ও বিদেশী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যুবশক্তির প্রতিরোধ-প্রয়াসের ভূমিকায় রচিত এক দুর্দান্ত, প্রভুত্ব-প্রিয় জমিদারের উৎপীড়নের কাহিনী। 'মন্ত্রমুখর' আগাগোড়া রাজনীতিমূলক—ইহাতে সংসার-চিত্র প্রায় নাই বলিলেই হয়। মহকুমা সহরের ভৌগোলিক পরিচয় ও ইহার সাধারণ জীবন-যাত্রার কিছুটা বর্ণনা আছে, কিন্তু এগুলি প্রায় অপ্রাসঙ্গিক, দেশব্যাপী বহ্ন্যুৎসবের ক্ষুদ্র আধার ও স্বল্পায়তন পরিবেষ্টনী। অগ্নিশিখায় মানুষগুলির মুখ উদ্ভাসিত ও এই মুখে কিছু কিছু ভাবান্তর—উৎসাহের দীপ্তি, অনিশ্চয়ের উদ্বেগ, বিরোধ ও বিরাগের পাথরের ন্যায় জমাট ভাব, নৈরাশ্যের ছায়া প্রভৃতি—খেলিয়া যাইতেছে। উহাদের আর কোন পরিচয় বা প্রয়োজন নাই। যুদ্ধের নির্মম প্রয়োজনে সুকুমারভাবপ্রধান জীবন হইতে স্বেচ্ছানির্বাসনের প্রতীকরূপে প্রভাস একবার মাত্র উপন্যাসে আবির্ভূত হইয়া পর মুহূর্তেই ছায়াতে বিলীন হইয়াছে; রেখার অন্তর্গূঢ় বেদনা নিমেষমাত্র দীপ্ত হইয়া নীরবতার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে। কিন্তু যেখানে আগুনের শিখা আকাশ ছুঁইয়া জ্বলিতেছে সেখানে ব্যক্তিগত অনুভূতির ক্ষীণ বিদ্যুৎ-ঝলক চোখে পড়িবে কেন ?

'স্বর্ণ সীতা'য় রাজনৈতিক ভূমিকা পাবিবারিক অশান্তির পূর্বসূচনার তাৎপর্যবাহী হইয়াছে। অরুণ ও অনুপমার কৈশোরে মেলামেশার ফলে অনুপমাব মনে দেশপ্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। কিন্তু অনুপমার দাম্পত্য জীবনের অতৃপ্তির সহিত রাজনীতির কোন সংশ্রব নাই। তাহার স্বামী সোমনাথ অস্থিরমতি, যথেচ্ছাচার ও আত্ম-অহমিকার চরম দৃষ্টান্ত। স্ত্রীর সহিত ব্যবহারেও তাহার কোমলতার লেশমাত্র নাই। এ হেন চরিত্র পূর্বরাগের দিনগুলিতে কেমন করিয়া প্রণয়ীর অভিনয় করিয়াছিল ভাবিতে বিস্ময় লাগে। সোমনাথের চরিত্র অবিশ্বাস্য ও ব্যঙ্গাতিরঞ্জনের (caricature) পর্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে হয়। বোধ হয় রাজনীতির আসরে চড়া সুরে গান গাহিতে অভ্যস্ত লেখক পারিবারিক চিত্রাঙ্কনেও এই অতিরঞ্জন-প্রবণতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অনুপমার মধ্যেও জীবনীশক্তির বিশেষ পরিচয় পাই না—সে পাষাণ প্রতিমার মত নীরব সহিষ্ণুতার সহিত তাহার স্বামীর সমস্ত দুর্ব্যবহার ও অভব্যতাকে গ্রহণ করিয়াছে। অরুণের আশ্রয়-যাচ্ঞার মধ্যে তাহার নির্যাতিত প্রকৃতি মুহূর্তের জন্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু প্রত্যাখ্যানের প্রতিক্রিয়া তাহার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক ভাব-বিপর্যয় জাগাইয়াছে। তাহার অরুণের প্রতি প্রতিশোধ লইবার জন্য স্বামীর নিকট আবেদন যেমন চরিত্র-সঙ্গতিহীন, সোমনাথেরও ঘরে আগুন লাগাইয়া প্রতি-বিধানের ব্যবস্থাও তেমনি অভাবনীয়। তাহার বন্দুক, রাইফেল প্রভৃতি মারণাস্ত্রে দক্ষতা ও বীরত্বের আস্ফালনপূর্ণ, উত্তেজনাপ্রবণ স্বভাব এইরূপ গোপন অস্ত্রাঘাতের হীনতা কেন স্বীকার করিল তাহা দুর্বোধ্য। তবে কি তাহার সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র মনুষ্যেতর জীবের প্রতি অগ্নি উদ্গীরণ করিবার জন্য নির্মিত হইয়াছিল ?

(১২)

কম বেশী রাজনৈতিক প্রভাববর্জিত উপন্যাসের মধ্যে 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'ট্রফি' ও 'কৃষ্ণপক্ষ' উল্লেখযোগ্য। 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' উপন্যাসে অতীত ইতিহাস ও অঞ্চলের ভূসংস্থান-বৈশিষ্ট্যের অভ্যস্ত বর্ণনা আছে, কিন্তু ইহাতে উপন্যাসের ঘটনার সহিত ইহাদের যোগসূত্র অনেকটা সহজ ও স্বাভাবিক। ঘটনাবলীর নিজস্ব আকর্ষণী শক্তি ও নাটকীয় সংঘাত পটভূমিকার সহায়তা-নিরপেক্ষ—আপন স্বতন্ত্র মর্যাদায় দণ্ডায়মান। কাহিনী-সংস্থাপনার মধ্যে স্বাভাবিকতা ও ইহার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে একটি উত্তেজনাময়, অথচ সহজ পরিণতি আছে। তা ছাড়া উপন্যাসের সমাজ-চিত্রণে একটা সুসংবদ্ধ অঙ্গবিন্যাস ও সামগ্রিকতার ধারণা জন্মে। রূপাপুরের কামার-গোষ্ঠীর জীবন-নীতির বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে—আলকাপের দলও এই সমাজের আবশ্যকীয় অঙ্গরূপে, দুই পরস্পর-বিরোধী নেতৃত্বের প্রতিযোগিতার উপলক্ষ্যরূপে উপন্যাসে স্থান পাইবার অধিকার অর্জন করিয়াছে। কুমার বিশ্বনাথের চরিত্রে পূর্বপুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবাধ আধিপত্যস্পৃহার খানিকটা প্রভাব থাকিলেও মোটের উপর তিনি আধুনিক জীবনের প্রতিবেশ হইতেই তাঁহার বেপরোয়া যথেচ্ছাচারের প্রেরণা সংগ্রহ করিয়াছেন। বণিক-শক্তির প্রতীক লালাজীর সহিত তাঁহার দ্বন্দ্বের পর্যায়সমূহ ও শেষ পরিণতি অনবদ্য শিল্পবোধ ও ভাবসংযমের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। লালাজীর বিনয় নম্র আচরণের পিছনে শক্তিমত্তার দম্ভ ও আত্মশ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিষ্ঠার কৌশলময় দৃঢ় সঙ্কল্প চমৎকার ভাবে ফুটিয়াছে। তাঁহার পূর্বপুরুষের হীনতার লজ্জাকর স্মরণচিহ্ন কালো ঘোড়ার উপর তাঁহার অদ্ভুত বিরাগ ও ক্রোধ একটি সুন্দর মনস্তাত্ত্বিক উদ্‌ঘাটনের নিদর্শন। অপর্ণার রাজনৈতিক অতীত জমিদার-পত্নীর নৈর্ব্যক্তিক নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে অবলুপ্ত হইলেও শেষ মুহূর্তে ইহার আকস্মিক পুনরুজ্জীবন উপন্যাসেব সংঘাতের মধ্যে একটি নূতন অধ্যায় যোজনা করিয়াছে। বণিকের সহিত শক্তিপরীক্ষায় প্রতি পদে পরাজিত ও আধুনিক জীবনের সহিত খাপ খাওয়াইতে অক্ষম ধ্বংসোন্মুখ জমিদার একটা নূতন চাল চালিয়া নিজ প্রতিষ্ঠার ও সহজ নেতৃত্বের পুনরুদ্ধার সাধন করিয়াছে। সে প্রজার প্রতিনিধিরূপে শ্রেষ্ঠীর সর্বগ্রাসী আধিপত্যকে প্রতিরোধ করিবার অব্যর্থ উপায় আবিষ্কার করিয়াছে। জমিদার-প্রজার সংঘাত ধনী-শ্রমিকের সংগ্রামে রূপান্তরিত হইয়া এক নূতন রণনীতির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজনীতির ভূত ঘাড় হইতে নামিলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ঔপন্যাসিক কৃতিত্ব কিরূপ উচ্চ পর্যায়ের হইতে পারে, 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' তাহার চমৎকার উদাহরণ।

'ট্রফি' আর একখানি সুখপাঠ্য উপন্যাস—ইহার মধ্যে অতিনাটকীয় উচ্ছ্বাস থাকিলেও ইহা প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ। বিক্রমজিতের বহুধা-বিডম্বিত জীবনের, তাহার দৈবাহত প্রেমাকাঙ্ক্ষার কাহিনীটি যেন ঝড়ো হাওয়ার উত্তাল ছন্দে আমাদের অন্তরে দোলা দেয়। অবাঙ্গালী বিক্রমের বাঙ্গালীত্ব-লাভের সাধনা, তাহার কাব্যচর্চা ও প্রেমবুভুক্ষার মাধ্যমে বাঙ্গালীর অন্তরলোকে প্রবেশের ব্যর্থ করুণ প্রয়াস এই জীবন-ইতিহাসকে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে। ক্রূর দৈব তাহাকে বার বার আঘাত হানিয়াই সন্তুষ্ট হয় নাই, তাহার পরাজয়ের মধ্যে পরিহাসের তিক্ততাও সঞ্চারিত করিয়াছে। সে বাঙ্গালীত্বের সাধনায় বীতস্পৃহ হইয়া যখন পরুষ ভাবাবেগহীনতাকেই বরণ করিয়াছে, যখন বাঙ্গালী মেয়ের প্রেম-লাভে হতাশ হইয়া

রাজপুতানার ক্ষাত্রবীর্য-প্রধান বিবাহে তাহার অন্তরজ্বালাকে প্রশমিত করিতে চাহিয়াছে, তখন ভাগ্যের বঙ্কিম কটাক্ষ তাহাকে নূতন লাঞ্ছনার গ্লানি অনুভব করাইয়াছে। সে যখন দৈহিক শক্তি ও রুক্ষ আচরণের দ্বারা প্রেমকুমারীর উপর নিজ দাম্পত্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার সাধনায় রত, তখন প্রেমকুমারী এক বাঙ্গালী যুবকের হৃদয়াবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। যাহাকে সে আজীবন নির্ভরযোগ্য আশ্রয়রূপে খুঁজিয়াছে, তাহাই হঠাৎ শত্রুরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার পারিবারিক জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। শেষে ভাগ্যের একটি নিদারুণ ব্যঙ্গ তাহার বিড়ম্বনার ইতিহাসকে চরম অসঙ্গতিপূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। তাহার প্রথম কৈশোরের প্রিয়া কলেজের সহপাঠিনী মণিকা সেন তাহার ঝটিকা-তাড়িত জীবনের শেষ পোতাশ্রয়রূপে দেখা দিয়াছে। যাহাকে সে প্রথম যৌবনের সমস্ত রঙীন স্বপ্ন ও স্ফটিক-শুভ্র, নির্মল তারুণ্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রেমারতি দিয়া আহ্বান করিয়াছিল, সে আসিল অপগতমোহ, আবিল প্রৌঢ়ত্বের জৈব প্রয়োজনে, জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত জুয়ারির দৈবপ্রসাদ-লোলুপতার মর্যাদাহীন পুরস্কাররূপে। দীর্ঘকাল ব্যবধানে যখন প্রেমের পেলবস্পর্শ পুষ্পমাল্য নায়কের কণ্ঠলগ্ন হইল, তখন ইহা রূপান্তরিত হইয়াছে শ্বাসরোধী লৌহশৃঙ্খলে।

'কৃষ্ণপক্ষ' (১৯৫১) উপন্যাসটির ঘটনা-অংশ আজগুবি, অসম্ভব কাহিনী-সমাবেশে লেখকের খেয়ালীপনার পূর্ণ নিদর্শন। বিবৃতির বঙ্কিমরেখা-বিন্যাস যেন উদ্ভট-কল্পনা-রচিত ব্যঙ্গচিত্র বলিয়াই মনে হয়। শিল্পী প্রতুলের জীবনে যাহা ঘটিয়াছে, আকস্মিকের ঝড়ো হাওয়াতে ইহা যেভাবে নাগরদোলায় দুলিয়াছে তাহা কোন শিল্পীর বাস্তবজীবনে ঘটে না। লেখকের প্রকৃত উদ্দেশ্য কোন শিল্পীর ব্যক্তিগত বাস্তব জীবন চিত্রণ নহে, শিল্পীর মানস জগৎ ও জীবনসমস্যার একটা আদর্শায়িত ও সঙ্কেতময় আলেখ্য-অঙ্কন। ঘটনার এই সম্ভাব্যাতিসারী রেখাজালে শিল্পস্রষ্টার আবেগময় প্রাণসত্তা, শিল্পপ্রেরণার মূলীভূত রহস্য গভীর অনুভূতি ও অদ্ভুত শক্তিমত্তার সহিত মূর্ত হইয়াছে, আকস্মিকতার শিথিলতন্তু-রচিত ফাঁকের ভিতর দিয়া আদর্শ স্বপ্নের বস্তু-স্পর্শ-অসহিষ্ণু কল্পনাভিসার যেন ব্যাকুল পাখা মেলিয়া নীল দিগন্তের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। প্রতুলের জীবনে এক একটি নিদারুণ আঘাত যেন তাহার শিল্পসাধনার এক একটি স্তরের দ্যোতনা, পরিপূর্ণতার পথে এক একটি দুর্লঙ্ঘ্য গিরিসঙ্কটের বাধা। শিল্পী-জীবনের আবেগ-আকূতি, উহার মানস সংস্থিতির এত অন্তরঙ্গ পরিচয় ও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ রূপায়ণ বাংলা উপন্যাসে বড় একটা দেখা যায় না। শিল্প-প্রকৃতির রহস্য-উদ্ঘাটন, চিত্র-বিচারে মন্তব্য ও আলোচনার যাথার্থ্য ও গভীরতা, সৌন্দর্যানুভূতির নিবিড় ও অভ্রান্ত রসবোধ উপন্যাসটির পাতায় পাতায় উদাহৃত হইয়াছে। রচনাটি উপন্যাস-কাহিনীর ছদ্মবেশে শিল্পী মানসেরই অপরূপ রেখা-চিত্র, উহার বাস্তব জগতের সহিত সুদীর্ঘ দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া বোঝাপড়ার রূপক-ইতিহাস।

উপন্যাসটি সম্পূর্ণ রূপকধর্মী না হইলেও উহার চরিত্রগুলির কোন মানবিক-রসপূর্ণ ব্যক্তিজীবন নাই। প্রতুলের মাতা, উহার বন্ধু অপূর্ব, উহার জীবনের পথে যাহারা বন্ধু বা শত্রুরূপে আসিয়া পড়িয়াছে, এমন কি উহার প্রেয়সী সুজাতা—সকলেই তাহার শিল্পী-প্রকৃতিকে উন্মেষিত করিবার উপায় মাত্র, তাহার মানস অভিজ্ঞতার বিচিত্র উপাদান-স্বরূপ। এই মানুষগুলি তাহার শিল্পীমনকে আনন্দে উদ্বেল বা বিরাগে বিমুখ করিয়া

তুলিয়াছে, তাহার চোখে আদর্শের স্নিগ্ধ দীপ্তি বা ভূতগ্রস্তের নিবিড় শঙ্কা ও ক্রূর জিঘাংসা জ্বালাইয়াছে, তাহার চিত্রতুলিকায় নানা রঙের খেলা ও রেখার টানে, জীবনের সুস্থ গ্রহণ বা বিকৃত বর্জনের প্রেরণায় নিজ নিজ প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে। তাহার সমস্ত প্রতিবেশ যেন তাহার অন্তর-লোকে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রকৃতির উপাদানে রূপান্তরিত হইয়াছে—তাহার প্রথম জীবনের স্পর্ধিত আভিজাত্য-মর্যাদা হইতে, আদর্শের সাড়ম্বর স্বাতন্ত্র্য-ঘোষণা, ক্ষুব্ধ বিদ্রোহ ও অস্বীকৃতি, গভীর শূন্যতাবোধ, ক্ষুরধার শ্লেষ ও তীব্র বিকৃতির স্তরের ভিতর দিয়া তাহাকে সহজ জীবনের স্বত-উৎসারিত রূপলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রেম এখানে আসিয়াছে শিল্পীজীবনের এই রক্তক্ষরানো শান্তির, এই কষ্টার্জিত জীবন-সার্থকতার অভিনন্দন-অর্ঘ্য লইয়া, আর্টের মন্দিরে প্রজ্বলিত কল্যাণ-দীপের মূর্তিতে, রণজয়ী বীরের ললাটে বিধাতার স্বহস্তে আঁকা জয়তিলকরূপে। প্রেম এখানে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়া যেন ছবির একটি উজ্জ্বলতম, কোমলতম বর্ণবিন্যাসে পরিণত হইয়াছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনার ক্ষিপ্রতা তাঁহার উদ্ভাবন-কৌশলের বিস্ময়কর নিদর্শন, কিন্তু এই দ্রুত-রচিত উপন্যাস-পরম্পরার মধ্য দিয়া কোন সুনিশ্চিত অগ্রগতি, কোন পরিণত জীবন-বোধের আশ্বাস এখনও লক্ষ্য-গোচর হয় নাই। তাঁহার উপর তারাশঙ্করের প্রভাব সুপরিস্ফুট। রাঢ়ের জীবন-যাত্রা-পরিবেশ ও অতীত সাধনা নারায়ণের বারেন্দ্রভূমির অনুরূপ পরিচয়-প্রদান-প্রয়াসের মূল উৎস—তারাশঙ্করের খামখেয়ালী জমিদারগোষ্ঠী ও উৎসাদিত-প্রায় সামন্ততন্ত্র তাঁহার পরবর্তী ঔপন্যাসিকের প্রেরণারূপে অনুভূত হয়। অবশ্য তারাশঙ্কর তাঁহার পরিণতির স্তরে এই সামন্ততন্ত্র-বিলাস ও রাজনীতি-মোহ অতিক্রম করিয়া শাশ্বত জীবনের উপরই তাঁহার দৃষ্টি ফিরাইযাছেন। রাজনীতির ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের চোরাবালি ও জমিদারের বিলাসব্যসনগ্রস্ত প্রখর ব্যক্তিত্ব-আস্ফালনের অর্ধ-বাস্তব অভিনয় হইতে তাঁহার জীবন-পর্যালোচনার ক্ষেত্রকে সরাইয়া শাশ্বত মানব-মহিমার উপর ইহার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার 'কবি', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'আরোগ্য নিকেতন'-এর মধ্যে অতীতের বিলীয়মান সংস্কৃতির জন্য বিষণ্ণ-করুণ সুর ধ্বনিত হইয়াছে সত্য। কিন্তু এই সমস্ত উপন্যাসে তিনি যে শ্রেণীর মানুষের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহারা অতীতের সতেজ, পূর্ণ জীবনী-শক্তিতে প্রাণময় প্রতিবেশে পুষ্ট,—অতীতের আকাশ-বাতাসে তাহারা নিঃশ্বাস গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া আছে। ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত-সম্প্রদায়ের স্মৃতি-রোমন্থনের রুগ্ন, অক্ষম ভাববিলাস তাহাদের সত্তায় বলিরেখা-কুঞ্চন প্রসারিত করে নাই। নারায়ণের উপন্যাসে এই সামগ্রিক সমাজ-প্রতিবেশে সহজ জীবনবোধের স্ফুরণ, সংস্কৃতির আনন্দ-রসে উপচীয়মান জীবনের সতেজ, বলিষ্ঠ প্রকাশ এখনও পরিপূর্ণ রূপ পায় নাই। জীবনের বহিরঙ্গমূলক পটভূমিকা রচনায় ও ইহার সাময়িক বিক্ষোভে আলোড়িত গতিবেগ-দ্যোতনায় তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। তাঁহার বর্ণনায় বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠে, তাঁহার ইতিহাসবোধ জীবন্ত ও জ্বলন্ত, তাঁহার আবেগ-প্রকাশের ভাষা সাঙ্কেতিকতার রহস্যে ভাস্বর, তাঁহার রাজনৈতিক চেতনা সূর্যকরদীপ্ত হিমাচল-শৃঙ্গের ন্যায় উজ্জ্বল ও ঊর্ধ্বলোকচারী। কিন্তু শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-রচয়িতার পক্ষে এই সমস্ত গুণ বাহ্য, জীবনের নিগূঢ়-রহস্যভেদী অনুভূতির সহিত সমবায়ে ইহারা পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে। নারায়ণের শক্তি অনস্বীকার্য। কিন্তু আমার মনে হয় যে

তিনি এই শক্তি প্রকাশের উপযোগী ক্ষেত্র এখনও খুঁজিয়া পান নাই। তিনি এখনও তরুণ বয়স্ক ; জীবনের সহিত পরিপূর্ণ বোঝাপড়া হইতে হয়ত এখনও তাঁহার কিছু সময় লাগিবে। যে সমস্ত বিচিত্র পাত্রে তিনি জীবনের রস আস্বাদন করিয়া ফিরিতেছেন তাহাদের কারুকার্য চমকপ্রদ, ও জীবন-মদিরার ফেনিল উচ্ছ্বাস তাহাদের সঙ্কীর্ণ আয়তনের মধ্যে উত্তপ্ত ও ঝাঁঝালো হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু যে কমণ্ডলু জীবনের স্নিগ্ধ অমৃতরসে কানায় কানায় পরিপূর্ণ, যাহাতে জীবন-পিপাসার পরম তৃপ্তি সাধিত হইবে, তাহা এখনও তাঁহার শিল্পশালায় পরিকল্পিত ও অনুভূতির গভীরতায় উৎসারিত হয় নাই।

ঊনবিংশ অধ্যায়

পরীক্ষামূলক উপন্যাস

(১)

এই অধ্যায়ে কয়েকটি দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকের রচনা হইতে আধুনিক উপন্যাসের যাত্রাপথ ও প্রবণতা সম্বন্ধে কিছু নির্দেশ লাভের চেষ্টা করা যাইবে। সাধারণতঃ উপন্যাসের গন্তব্য-পথ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা খুব পরিষ্কার না থাকিলে নূতন লেখকেরা সমসাময়িক রাজনীতি ও সমাজনীতিমূলক সংঘটনের সুলভ ইঙ্গিত অনুসরণ বা বিষয়ের নূতনত্ব দ্বারা একপ্রকার অগভীর বৈচিত্র্য সম্পাদনের প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাঁহারা বর্তমানের বন্ধুর পথের পথিক হন রসসন্ধানের কোন প্রকৃত অনুপ্রেরণায় নহে, কেবল অভিনবত্বের মোহে—সুতরাং তাঁহাদের উপন্যাসও খুব উচ্চ অঙ্গের হয় না। অনেকে আবার নূতনত্বের সন্ধানে অকৃতকার্য হইয়া সর্বশেষে প্রতিভাশালী লেখক যে পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন তাহারই অনুসরণে প্রবৃত্ত হন। এই সমস্ত প্রচেষ্টাই যুগসন্ধিক্ষণের দ্বিধা-জড়িত, অনুকরণমূলক পরীক্ষা (experiment)। ইহারা কেবল সাহিত্যধারাকে প্রচলিত প্রণালীতে প্রবহমান রাখিয়া আগন্তুক প্রতিভার নূতন জোয়ারের জন্য প্রতীক্ষা করে।

এই সমস্ত লেখকের মধ্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস ও প্রফুল্লকুমার সরকার উল্লেখযোগ্য। রচনার প্রাচুর্য ও অজস্রতার দিক্ দিয়া শৈলজানন্দ সম্মানজনক উল্লেখের অধিকারী। তাঁহার বড় উপন্যাসের মধ্যে কোনটিই উচ্চাঙ্গের উৎকর্ষ লাভ করে নাই। কয়লা-কুঠির কুলি-মজুর-সাঁওতালদের জীবন-যাত্রা, রীতি-নীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান ও প্রণয়-লীলা হইতে বৈচিত্র্য আহরণের চেষ্টাতেই তাহার প্রধান মৌলিকতা। সাঁওতালদের ব্যবহার ও কথাবার্তায় ঋজু সারল্য ও কৃত্রিম আদব-কায়দার অভাব, এক-প্রকারের গণতান্ত্রিক সাম্যভাব (democratic equality) আছে; এই বিষয়ে শিক্ষিত ভদ্রসমাজের আচার-ব্যবহার হইতে তাহাদের গভীর পার্থক্য। সেইরূপ প্রণয়-ব্যাপারেও তাহাদের মধ্যে একটা অকুণ্ঠিত ইচ্ছা-প্রকাশ ও তীব্র, সংকোচহীন ভাব-পরিবর্তন লক্ষিত হয়। তাহারা ভদ্র সমাজের মানসম্ভ্রম, লোক-লজ্জা ও অসারল্যের ধার ধারে না। সুতরাং এই সমস্ত দিক্ দিয়া সাঁওতাল-জীবন ঔপন্যাসিকের নিকট একটা আকর্ষণের বিষয়। দুঃখের বিষয় সাঁওতাল-জীবনের সমস্যায় যেরূপ লঘু পরিবর্তনশীলতা আছে সেরূপ ব্যাপক গভীরতা নাই, সুতরাং ইহার সাহিত্যিক প্রকাশ ছোট গল্পের পরিধি অতিক্রম করিতে পারে না। সেইজন্য শৈলজানন্দের যাহা কিছু ভাল রচনা সমস্তই ছোট গল্পের পর্যায়ভুক্ত। বড় গল্পের মধ্যে "নারীমেধ" (১৯২৮) নামক গল্প-ত্রয়-সমষ্টিতে আমাদের প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় নারী-নির্যাতনের করুণ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই গল্পগুলির মধ্যে লেখকের করুণ রস-সঞ্চার ও গভীর সহানুভূতির পরিচয় মিলে ও একটিতে Hardy'র বিখ্যাত Tess উপন্যাসের ছায়াপাত লক্ষিত হয়। অন্যান্য উপন্যাসের বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

প্রফুল্লকুমার সরকারের 'বিদ্যুৎ-লেখা' ও 'লোকারণ্য' উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঈর্ষ্যামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সমাজের মূঢ় রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদই তাঁহার উপন্যাসগুলির উদ্দেশ্য। অস্পৃশ্যতা, সামাজিক উৎপীড়ন ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য শ্রমিক আন্দোলনে বৈপ্লবিকতার বিষ-সঞ্চার—ইহারাই ইঁহার বিশেষ আক্রমণের লক্ষ্য। লেখকের ভাষার সংযম ও করুণরস-সঞ্চারের ক্ষমতা আছে, কিন্তু তথাপি চরিত্রগুলি কেবল উদ্দেশ্যের বাহন হওয়াতে তাহাদের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে নাই—সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার প্রতিবেশে চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আত্মগোপন করিয়াছে। ঘটনা-পারম্পর্যের মধ্যে কয়েকটি প্রণয়-সঞ্চার-কাহিনীই উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। প্রথমোক্ত উপন্যাসে লেখকের যুক্তি-তর্ক বেশ সুলিখিত ও সুবিন্যস্ত, কিন্তু এই যুক্তি-ব্যূহের মধ্যে হৃদয়ের আবেগ-ধারা শীর্ণ ও মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। পাত্র-পাত্রীর অন্তর্দ্বন্দ্ব যুক্তি-রাজ্য অতিক্রম করিয়া হৃদয়াবেগের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। দ্বিতীয় উপন্যাসটিতে আকস্মিকতা ও অতি-নাটকীয়তার (melodrama) প্রাদুর্ভাব ও প্রেমের বিরহ-মিলন-বিষয়ে গতানুগতিক ধারার অনুবর্তন উপন্যাসের সরসতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। এই সমস্ত দোষই উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসের অবশ্যম্ভাবী ফল। লেখকের 'বালির বাঁধ' উপন্যাস (এপ্রিল, ১৯৩৪) উদ্দেশ্যমূলক নহে বলিয়া অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এই উপন্যাসে লেখকের আবেগ-গভীরতার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের চিত্রগুলি সুলভ অতি-নাটকীয়তার লক্ষণাক্রান্ত। ভাষা সংযম ও চিন্তাশীলতার দিক্ দিয়া প্রফুল্লকুমার প্রশংসার উপযুক্ত।

সজনীকান্ত দাসের 'অজয়' জীবনকাহিনীর ছদ্মবেশধারী উপন্যাস, 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'র প্রণালীতে লিখিত , কবিত্বপূর্ণ সাংকেতিকতার ভিতর দিয়া নায়ক অজয়ের শৈশব হইতে যৌবনের শেষ পর্যন্ত প্রণয়-অভিজ্ঞতার ইতিহাস। প্রথম, প্রতিবাসিনী ডলি ও ডেজির প্রতি প্রণয়-সঞ্চার , তাহার পর কলিকাতায় নূতন প্রণয়-সম্পর্কের সূত্রপাত—মামাতো বোনের সহপাঠিনী রেণুর সঙ্গে। রেণু অজয়ের পল্লীবালক-সুলভ, সংকুচিত আত্ম-কেন্দ্রিকতার (self-centred state) বাঁধ ভাঙিয়া তাহার জীবনে দীপ্ত প্রণয়শিখা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে। প্রেমের প্রথম আবির্ভাবের কুহেলিকায় অনিশ্চিত মানসিক অবস্থার চমৎকার আভাস কবিতাগুলির মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। রেণু অন্ধকারে, জননী-গর্ভমধ্যে শিশুর প্রাণস্পন্দনের ন্যায়, প্রেমের নিঃশব্দ আবির্ভাব জানিতে পারে। তাহার নিঃসংকোচ অগ্রসর হইতে পলায়নে আত্মরক্ষা করিয়া অজয় কবিতার মারফৎ যে কৈফিয়ৎ দিয়াছে তাহার সারমর্ম এই যে, সে চির-অনাসক্ত, পথিক বৈরাগী ও তাহার নিকট স্থায়ী আশ্রয় লাভের আশা করা ভুল। রেণুর সহিত মিলন ঘটিয়াছে সাংকেতিকতার রহস্যময় যবনিকার অন্তরালে। রেণু আবার বন্যার দুর্বার বেগে চিরকালের মত আত্মসমর্পণ করিতে গিয়াছে, কিন্তু অজয়ের সতর্কবাণী, ভবিষ্যৎ-চিন্তা তাহার আবেগকে বরফের মত জমাইয়া দিয়াছে—সে অজয়কে ছাড়িয়া বিবাহের নিরাপদ আশ্রয়ে শান্তি পাইতে চেষ্টা করিয়াছে।

এদিকে বিবাহিতা ডলির মনে বাল্য-প্রণয়ের স্ফুলিঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া এক নামহীন বেদনায় দীপ্ত হইয়া উঠে। জাগ্রতে স্বামী ও স্বপ্নে তাহার গোপন, অস্বীকৃত প্রেম তাহার হৃদয়ের উপর দ্বৈরাজ্য বিস্তার করে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম অতৃপ্তির অদৃশ্য ব্যবধান থাকিয়া

যায়। ডলি বহুদিন পরে অজয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সুপ্ত বাল্য-প্রণয়কে আবার জাগ্রত করিয়া দেয়। ইতিমধ্যে ষ্টিমার-পার্টিতে আর একটি ভবিষ্যৎ-প্রণয়িনী বিমলার সহিত নায়কের পরিচয় ঘটে।

এই বিরুদ্ধ আকর্ষণের অন্তর্দ্বন্দ্বে নায়কের মনে একটা প্রবল পরিবর্তনের স্রোত আসিয়াছে। তাহার চিত্তে দৈহিক ক্ষুধার প্রচণ্ড উদ্রেক হইয়াছে ও কাম-প্রবৃত্তির বীভৎস চরিতার্থতা-সাধনে সে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। অজয়ের এই পরিণতিতে সর্বাপেক্ষা অভিভূত হইয়াছে রেণু। সে প্রাণপণে আত্মসংবরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু দারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হইয়া তাহার মূর্ছারোগ জন্মিয়াছে। অবশেষে স্বামীর নিকট স্বীকারোক্তি দ্বারা চিত্ত-ভার লঘু করিয়া সে কোন প্রকারে নিজ অসহ্য আবেগ সংযত রাখিয়াছে।

অল্পদিনের মধ্যেই রক্ত-মাংসের কারবারে অজয়ের অরুচি ধরিয়াছে। অস্বাস্থ্যকর উত্তেজনার পর একটা গ্লানিকর প্রতিক্রিয়া আসিয়াছে। পঙ্কস্নানের পর অকস্মাৎ পঙ্কজের ন্যায় তাহার কবি-প্রতিভা বিকশিত হইয়াছে। এই সময় বিমলা তাহার প্রেমাস্পদকে আত্মক্ষয়কারী প্রলোভন হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার নিকট বিনা সর্তে, বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া, আত্মসমর্পণ করিয়াছে। উভয়ে অজয়ের গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া লোকনিন্দা ও কলঙ্কের মধ্যে আশ্রয়নীড় রচনা করিয়াছে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে বিমলার অসুখ ও গ্রামবাসীর উৎপীড়ন তাহাদিগকে আবার নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বাধ্য করিয়াছে।

ডলি, রেণু ও বিমলা একই প্রণয়াস্পদের আকর্ষণরূপ একটা নিগূঢ় সাম্য পরস্পরের মধ্যে অনুভব করিয়াছে। বিমলার গর্ভে যে সন্তান জন্মিয়াছে, তাহার মাতৃত্বে যেন সকলেরই অংশ আছে। ডলি অজয়ের উপর বুদ্ধদেবের অতুলনীয় স্বার্থত্যাগের গরিমা আরোপ করিয়াছে। নিরুদ্দেশ-যাত্রার মধ্যেই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

উপন্যাসটি ভাষা ও ভাবের দিক্ দিয়া, বিশেষতঃ স্থানে স্থানে কবিত্বের সহিত মনস্তত্ত্বের শোভন সামঞ্জস্যের জন্য, প্রশংসার উদ্রেক করে। কিন্তু মোটের উপর একটা ঐক্যের অভাব থাকিয়া যায়। সাংকেতিকতার বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-স্ফুরণ চমকপ্রদ হইলেও, অকম্পিত আলোক-শিখায় পরিণতি লাভ করে না। অজয়ের জীবন-কাহিনী, অল্প কয়েকটি পরিচ্ছেদ বাদ দিলে, না কবিত্ব, না মনস্তত্ত্ব কোন দিক দিয়াই সমন্বয়-সুষমায় পৌঁছে না। চরিত্রগুলি অস্পষ্ট জ্যোতির্মণ্ডলবেষ্টিত, ধূসর রহস্যময় দিগন্ত হইতে উপন্যাসের সহজ-বোধ্যতায় নামিয়া আসে না। উপন্যাসে কাব্যের উপাদান ও সাংকেতিকতার ইঙ্গিতের জন্য যথেষ্ট অবসর আছে। কিন্তু তথাপি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের জন্য যে পরিণত কলা-কৌশল ও মাত্রাজ্ঞানের প্রয়োজন তাহা বর্তমান উপন্যাসে লেখকের আয়ত্তাধীন হয় নাই।

(২)

প্রমথনাথ বিশীর রচনায়—প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের অনেক উপাদান বর্তমান। প্রকৃতি-বর্ণনায় অতি সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি ও রহস্যবোধ, তাহার বাহিরের রূপ ও অন্তরের আবেদনের সুকুমার, কবিত্বপূর্ণ উপলব্ধি, ভাষার ঐন্দ্রজালিক সম্পদ, অর্থগৌরবপূর্ণ, সংক্ষিপ্ত রেখাবিন্যাসে বৃহৎ পটভূমিকার মর্মোদ্ঘাটন, স্থানে স্থানে মন্তব্যের গভীরতা ও চিত্তবিশ্লেষণ-কুশলতা—এই

সমস্ত গুণই উচ্চাঙ্গের ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের ভিত্তিভূমি। কিন্তু তাঁহার রচিত তিনখানি উপন্যাসে—'পদ্মা' (১৯৩৫), 'জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার' (১৯৩৮) ও 'কোপবতী' (১৯৪১) এই উজ্জ্বল সম্ভাবনা ও প্রত্যাশা চরিতার্থ হয় নাই। লেখকের সমস্ত মানস ঐশ্বর্যের কেন্দ্রস্থলে ব্যর্থতার গূঢ়বীজ নিহিত আছে। তাঁহাব প্রকৃতি-প্রতিবেশের সহিত তুলনায় তাঁহার স্বষ্ট চরিত্রগুলি রিক্ত ও নির্জীব। কবিত্বপূর্ণ অনুভূতি ও গভীর চিন্তাশীল মন্তব্যের সংমিশ্রণে ও ভাষা-প্রয়োগের অদ্ভুত নিপুণতায় তিনি যে বিচিত্র, কারুকার্য-খচিত রাজপরিচ্ছদ বয়ন করিয়াছেন, তাঁহার স্বভাব-দরিদ্র নর-নারীর অঙ্গে তাহা মোটেই শোভন হয় নাই। 'পদ্মা'তে বিনয়ের মনে তিনি যে পদ্মার নৈশ-অন্ধকারব্যাপ্ত, নক্ষত্রদীপ্তি-ঝলসিত নির্জনতার অপরিমেয় রহস্যবোধ বা 'কোপবতী'তে বিমলের মধ্যে প্রকৃতির সহিত যে নিগূঢ়তম একাত্মতা-মূলক অন্তর্দৃষ্টির আরোপ করিয়াছেন, তাহাদের এই মহিমান্বিত দার্শনিক অনুভূতি ধারণা করিবার কোন যোগ্যতাই নাই। তাহাদের ব্যবহার ও মানস পরিস্থিতির মধ্যে একটা প্রকাণ্ড, হাস্যকর অসংগতি ও অসামঞ্জস্য প্রকটিত হইযাছে। ববং প্রথম উপন্যাসে বিনয় ও কঙ্কণ কতকটা সজীব হইয়াছে। শেষ উপন্যাস 'কোপবতী'তে বিনয় ও ফুল্লরার মধ্যে জীবনীশক্তির একান্ত অভাব। বিশেষতঃ, ফুল্লরার চরিত্রে নারীসুলভ রমণীয়তার কোন বৈদ্যুতী আকর্ষণ নাই। আরণ্য ভূমিতে বনলক্ষ্মীর প্রতীকস্বরূপ তাহাকে যে পেলব পুষ্পাভরণ-সম্ভারে ভূষিত করা হইয়াছে তাহা তাহার অন্তরমাধুর্যের সহযোগিতায় দৃঢ়-সংবদ্ধ হয় নাই, ঋণ-করা প্রসাধনের মত তাহার শ্রীহীন দেহমন হইতে তাহা স্খলিত হইযাছে। কোপাই নদীকে ফুল্লরার প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে পরিকল্পনাও যে সার্থক হয় নাই তাহার কারণ ফুল্লরার অযোগ্যতা, নদীর দুর্বার প্রাণবেগ ও মুহুর্মুহুঃ-পরিবর্তনশীল ভাব-বৈচিত্র্যের সহিত তাহার প্রতিযোগিতা করিবার একান্ত অক্ষমতা। বিমলের জীবনে নদীর প্রভাব যেন অনেকটা কবিসুলভ কল্পনা-বিলাস, নিয়তির দুর্নিবার আকর্ষণ নহে। মানুষের কামনাক্ষুব্ধ আবর্তের মধ্যে উদাসীন প্রকৃতিকে জড়াইতে হইলে উভয়ের মধ্যে যে নিবিড় আত্মীযতা ফুটাইতে হয় এখানে তাহা পরিস্ফুট হয় নাই।

'জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবাব'-এ পটভূমিকা ও নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে এই ব্যবধান আরও তীব্র অসংগতির সৃষ্টি করিয়াছে। বাংলার জমিদার-সম্প্রদায়ের উদ্ভবের যে কৌতূহল-পূর্ণ ও তীক্ষ্ণ চিন্তাশীলতার আলোকে উদ্ভাসিত সমাজ-প্রতিবেশচিত্র রচিত হইয়াছে,জমিদারের ব্যক্তিগত জীবন-কাহিনী তাহার তুলনায় কত ম্লান ও নিষ্প্রভ দেখায়। মুখবন্ধের সহিত গ্রন্থ এক সুরে বাঁধা নহে। উদয়নারায়ণ, দর্পনারায়ণ, পরন্তপ—ইহাদের মধ্যে শ্রেণীসুলভ দুঃসাহসিকতা ও দুর্ধর্ষতার কোন পরিচয় পাই না। উদয়নারায়ণের বীরত্ব মাঝে-মধ্যে অট্টহাসি দ্বারা খণ্ডিত মৌন গাম্ভীর্য ও অন্দরে আস্ফালনের মধ্যে পর্যবসিত—ইতিহাসের চাকা ঘুরাইবার মত শক্তির উৎস তাহার কোথায় তাহা দেখা যায় না। দর্পনারায়ণ তাহা অপেক্ষাও রক্তহীন। ঘটনাবিন্যাসের শিথিলতা ও লেখকের মনোভাবের উদ্ভট খেয়ালপ্রবণতা উপন্যাসের রসকে জমাট বাঁধিতে দেয় নাই। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর জীবনের সংকট-মুহূর্তগুলির উপর দিয়া লেখক দায়িত্বহীন দ্রুতগতিতে সঞ্চরণ করিয়াছেন—ইহাদিগকে কার্যকারণ-শৃঙ্খলায় গাঁথিয়া গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন নাই। তা ছাড়া উদ্ভট চরিত্র প্রবর্তনের দিকে লেখকের

একটা দুর্বলতা আছে। উদ্ভট চরিত্রগুলিকে পূর্ণমাত্রায় সজীব ও আখ্যায়িকার সহিত সম্পর্কান্বিত করিতে না পারিলে তাহারা লেখকের অনভিপ্রেত হাস্যরসের হেতু হয়—এই কৌতুকবোধ কতকটা তাহাদের বীভৎস অসংগতিতে, কতকটা লেখকের অক্ষমতায়। ইন্দ্রাণীর চরিত্র-পরিকল্পনা যেমন চমৎকার, তাহার বাস্তব স্ফুরণ সেই অনুপাতে নৈরাশ্য-উদ্দীপক। সজীব, প্রাণবেগচঞ্চল নর-নারী-অঙ্কন ঔপন্যাসিকের প্রধান গুণ; ইহার অভাবে অন্যান্য সমস্ত উৎকর্ষ আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়। লেখকের নিসর্গানুভূতি অসাধারণরূপে তীক্ষ্ণ ও গভীর; তাঁহার উপন্যাসের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রকৃতি-চিত্রের অম্লান সৌন্দর্য ঝলমল করিতেছে। ইহার সহিত গভীর চিত্তবিশ্লেষণ ও জীবন্ত সৃষ্টি-কুশলতা যোগ হইলে উপন্যাস-সাহিত্যে লেখকের স্থান খুব উন্নত স্তরে নির্দিষ্ট হইবে।

পদ্মার রহস্যময় সাংকেতিকতা, মানুষের রক্তধারার উপর তাহার দুঃসাহসিকতার ইঙ্গিতপূর্ণ প্রভাব সুবোধ বসুর 'পদ্মা প্রমত্তা নদী'তে (১৯৩৯) সুন্দরভাবে ফুটান হইয়াছে। এই প্রভাব রজতের মাতার অপ্রকৃতিস্থ মস্তিষ্কে এক উদ্‌ভ্রান্তকারী ভীতিবিহ্বলতার রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। রজতের মনে ইহা সুস্থ, নির্ভীক উদারতা ও কৃত্রিম জীবনবিধিকে অস্বীকার করিবার শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। রজতের বাল্যজীবনের চিত্র হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে; শিশুমনের উৎসাহ ও কৌতূহল তাহার প্রতি কার্যে উছলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহার পরবর্তী তরুণ জীবনের রূপটি যেন তাহার শৈশবের স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া ঠেকে না। মনে হয় যেন প্রতিবেশ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনের ভারকেন্দ্র বদলাইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় তাহার রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান, প্রেমের অসহনীয় তীব্র আবেগের প্রথম উপলব্ধি, শোকের নিদারুণ আঘাত, নৈরাশ্য-ক্ষুব্ধ চিত্তে জীবনকে লইয়া ছিনিমিনি খেলা ও শান্তির আশায় বৈরাগ্য-অবলম্বন—এ সমস্ত স্তরগুলি তাহার বাল্যজীবনের ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড় করানো কঠিন। লেখক অবশ্য পুনঃপুনঃ পদ্মার উল্লেখের দ্বারা তাহার জীবনের এই দুই অংশের মধ্যে যোগসূত্র গাঁথিতে, পদ্মার ঘরভাঙ্গা উন্মত্ততার মধ্যে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের বৈরাগ্যের পূর্বাভাস দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু শিশু রজত ও যুবক রজতের মধ্যে ব্যবধান পদ্মার মধ্যবর্তিতায়ও সেতুবদ্ধ হয় নাই। তথাপি উপন্যাসটি মোটের উপর সুলিখিত। প্রণয়িনীর মৃত্যুতে রজতের মনে যে বিপর্যয়ের ঝড় বহিয়া গিয়াছে, লেখক তাহার বিধ্বস্তকারী আলোড়ন আমাদিগকে অনুভব করাইয়াছেন। যমুনা বৈষ্ণবীর বঞ্চিত মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-বুভুক্ষা, কতকটা শরৎচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হইলেও, লেখকের অল্প পরিসরের মধ্যে গভীর ভাবাবেগ ফুটাইয়া তুলিবার শক্তির পরিচয় দেয়।

সুবোধ বসুর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে 'নটী' (১৯৩৭), 'স্বর্গ' (১৯৩৮) ও 'বন্দিনী'র (১৯৩৭) উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার এই সমস্ত রচনাতেই সূক্ষ্ম নিসর্গানুভূতি, কবিসুলভ সুকুমার-ভাবমণ্ডল-সৃষ্টি ও প্রতিবেশ-রচনা, ও ভাষার উপর অধিকার দৃষ্ট হয়। তবে তাঁহার বিষয়বস্তুর মধ্যে ইহার উপযুক্ত গভীরতা বা গৌরব নাই। 'নটীতে' আশালতার কৈশোর জীবন—তাহার রাজীবের প্রতি ব্যর্থ আকর্ষণ, তাহার পল্লী-বালিকাসুলভ লজ্জাসংকোচ, কলিকাতায় তাহার অত্যাচার-জর্জরিত, আত্মমর্যাদা-নাশক অভিজ্ঞতা—একটা সাধারণ সুপরিচিত ধারারই অনুবর্তন। কিন্তু তাহার মণিকা বাইজীতে রূপান্তর সবদিকেই চমকপ্রদ।

ভীরু, বিবেকহীন সমাজের বিরুদ্ধে তাহার বিজাতীয়, বিষজ্বালাপূর্ণ বিদ্বেষ, তাহার মনুষ্যত্বহীন, সমাজভীত পূর্ব প্রণয়ী রাজীবের নিকট তীব্রশ্লেষপূর্ণ, মর্মভেদী অনুযোগ, গণিকাজীবনের সমস্ত সুখ-সমৃদ্ধি ও মিথ্যা সম্ভ্রমের মধ্যে অশান্তির অগ্নিদাহ ও কুলবধূর শান্ত, একনিষ্ঠ জীবনের মধুর স্বপ্নে সাময়িক বিস্মৃতি লাভের প্রয়াস—তাহার অনিচ্ছাকৃত নরকপ্রবাসের তিক্ত, গ্লানিময় ইতিহাস কল্পনার মৌলিকতা ও মনস্তত্ত্ব-উদ্‌ঘাটনের উপাদেয়তা এই দুই দিক্ দিয়াই প্রশংসার্হ।

'স্বর্গ' ঠিক উপন্যাসপদ-বাচ্য নহে—ইহার প্রথম খণ্ডে প্রেমিক-প্রেমিকার স্বল্পকালব্যাপী বিবাহিত জীবনে প্রেমের আদর্শ সুষমা ও নিবিড় নীরন্ধ্র মায়াবিস্তার, লঘু চপলতা ও কৃত্রিম বিরোধের ছদ্ম অভিনয়ের ভিতর দিয়া প্রণয়ের গাঢ় আবেশ বর্ণিত হইয়াছে। প্রশান্ত ও চামেলীর কোন ব্যক্তিগত ইতিহাস নাই, তাহারা প্রেমের পূজারীর সনাতন প্রতিনিধি; আধুনিক যুগের বাধা-বিক্ষেপ ও সুযোগ-অবসর, উভয়েরই সহায়তায় তাহারা পূজার নূতন অর্ঘ্যোপকরণ সংগ্রহ করিয়াছে মাত্র। এই পটভূমিকায় নিয়তির অতর্কিত আঘাতে দম্পতীর জীবনব্যাপী ছাড়াছাড়ি ঘটিয়াছে। পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে মৃতদার প্রশান্তের মৃত্যুর রহস্যময় যবনিকার অন্তরালে পরলোকগতা প্রণয়িনীর অস্তিত্বের ক্ষীণতম আভাস উপলব্ধির প্রাণান্ত চেষ্টা, করুণ, হৃদয়গ্রাহী আকুলতা অভিব্যক্ত হইয়াছে। সে তাহার সমস্ত কল্পনা ও ইচ্ছা-শক্তি একাগ্র করিয়া মৃত্যুর গহন অন্ধকারে প্রেরণ করিয়াছে; কখন স্পর্ধিত দুঃসাহসে, কখন ব্যাকুল অসহায়তায় হারান প্রিয়ার নিকট আমন্ত্রণ পাঠাইয়াছে। মাঝে মধ্যে প্রিয়ার অশরীরী স্পর্শ ক্ষণকালের জন্য তাহার উদগ্র অনুভূতির নিকট ধরা দিয়াছে, কিন্তু পূর্ণ প্রাপ্তির আশা, রহস্যোদ্ভেদের সম্ভাবনা বার বার তাহাকে এড়াইয়া গিয়াছে। শেষ পর্যন্ত প্রশান্তের উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনা স্বর্গ-মর্ত্যের ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া পরলোকের একটা জ্যোতির্ময় রূপসত্তা রচনা করিয়াছে। আধুনিক যুগে মানবের মন এত জটিল ও তাহার আকাঙ্ক্ষা এত সূক্ষ্ম হইয়াছে, তাহার আশা ও অভিলাষ এরূপ সীমাহীন, সংজ্ঞাহীন ব্যাপ্তির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, পরলোক সম্বন্ধে প্রাচীন ও মধ্যযুগের কোন পরিকল্পনাই তাহার তৃপ্তি বিধান করিতে পারে না। পৌরাণিক স্বর্গ, দান্তে ও মিলটনের স্বর্গ, এমন কি আধুনিক কবি রসেটির প্রেমের অনুধ্যান-নিবিড় স্বর্গও তাহার মানস কল্পনার উপযুক্ত প্রতিচ্ছবি বলিয়া মনে হয় না। বর্তমান লেখকের স্বর্গের ছবি কতকটা মধ্য-যুগের Pearl কবিতার রচয়িতার সমধর্মী ও কতকটা রসেটির বস্তু-প্রধান কল্পনার দ্বারা প্রভাবিত মনে হয়। সে যাহাই হউক বঙ্কিমচন্দ্রের পর আর কোন ঔপন্যাসিক মানুষের জীবনের চারিদিকে যে অজ্ঞাত রহস্য-বোধের পরিমণ্ডল প্রসারিত আছে তাহার একটা সুস্পষ্ট, রংএ, রেখায় ও অনুভূতিতে রূপায়িত, আকার দিবার চেষ্টা করেন নাই। সুবোধ বসুর প্রচেষ্টা হয়ত সম্পূর্ণ সার্থক হয় নাই, কিন্তু বিরহী মনের অন্বেষণ-ব্যাকুলতা, অতীন্দ্রিয় আভাস-গুঞ্জনের প্রগাঢ় অনুভূতি লেখকের কল্পনা-সমৃদ্ধির প্রশংসনীয় পরিচয়।

'বন্দিনী' (১৯৩৭) গল্পটিতে পূর্ববঙ্গের পল্লীশ্রীর সৌন্দর্যময় পরিবেষ্টনে যে কাহিনী বিবৃত হইয়াছে তাহা অতি সাধারণ। এখানে এক দীপঙ্কর ছাড়া আর কোন চরিত্রই সজীব মনে হয় না। বল্লাল সেনের কৌলীন্যপ্রথায় অতিমাত্রায় আস্থাশীল নায়িকার পিতামহ নিতান্তই অবিশ্বাস্য ও রূপকথার রাক্ষসজাতীয় সৃষ্টি। এমন কি নায়িকা উত্তরা পর্যন্ত চারিদিকের প্রকৃতি-সৌন্দর্য হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া কোন নিজস্ব রূপ বা আকর্ষণ লাভ করিতে পারে নাই।

এখানে মানুষের রিক্ততা পূর্ণ করিয়াছে প্রকৃতির অজস্র, অকৃপণ সম্পদ্। পশ্চাৎপট চিত্রকে আড়াল করিয়াছে; কাব্যানুভূতি চরিত্রসৃষ্টি ও চিত্তবিশ্লেষণকে একেবারে উপেক্ষণীয়, গৌণ পর্যায়ে ফেলিয়াছে।

(৩)

জীবনময় রায়ের 'মানুষের মন' (১৯৩৭) প্রেম-সমস্যার আলোচনায় অসাধারণ বস্তুতন্ত্রতা ও মননশক্তির জন্য প্রশংসার্হ। অবশ্য সমস্যার উৎপত্তি ও স্থায়িত্ব একটা অবিশ্বাস্য সংঘটনের উপর প্রতিষ্ঠিত। কুম্ভমেলার ভিড়ে কমলার নিশ্চিহ্ন অন্তর্ধান ও রোগের প্রভাবে তাহার আংশিক স্মৃতিবিলোপ উপন্যাসের ভিত্তিভূমি। এই প্রারম্ভিক দুর্বলতা সত্ত্বেও উপন্যাসটির পরবর্তী আলোচনা বিশ্লেষণকুশলতার পরিচয় দেয়। শচীন ও পার্বতীর মধ্যে সম্বন্ধটি খুব সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। শচীন অন্তর্হিতা পত্নী কমলার প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমের ভাব-বিহ্বলতায় পার্বতীর প্রতি তাহার ক্রমবর্ধমান হৃদয়াবেগকে জোর করিয়া কৃতজ্ঞতার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছে, ইহাকে প্রেম বলিয়া স্বীকার করে নাই। পার্বতী ও কমলার বিষয়ে তাহার অনিশ্চিত অবস্থা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব চমৎকারভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। পূর্ব-প্রেমের সাড়ম্বর স্মৃতিপূজার ফাঁকে ফাঁকে পার্বতীর প্রভাব শচীনের মনে অন্ধকারে ছায়াপথের ন্যায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। পার্বতীর মনোভাব অসংবরণীয় প্রেমের পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু তাহার অনুভূতি এতই অভ্রান্ত যে প্রেমের প্রতিদানে ছদ্মবেশী শিষ্টাচার বা কৃতজ্ঞতার নিবেদন তাহার কাছে ধরা পড়িয়া যায়। শেষ পর্যন্ত শচীন পার্বতীর প্রতি তাহার মনোভাবকে সুস্পষ্ট করিবার জন্য তাহার সংসর্গ পরিহার করিয়াছে।

ইতিমধ্যে কমলার পুনঃপ্রাপ্তি তাহাদের পরস্পর সম্পর্কের মধ্যে নূতন জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। তুচ্ছ আত্মসম্মানবোধের খাতিরে প্রেমকে অস্বীকার করার জন্য অনুতপ্তা পার্বতী কমলার পুনরাবির্ভাবে তাহার চিরপোষিত আশার উন্মূলনে নৈরাশ্যক্লিষ্টা হইয়াছে, কিন্তু নিজ অন্তরবেদনা গোপন রাখিয়া সে মিলনোৎসবে সানন্দ সহযোগিতা করিয়াছে। কমলার নিষ্ক্রিয়, আত্মপ্রকাশবিমুখ চিত্ত শচীনের আদর-সোহাগের অপরিমিত উচ্ছ্বাসে আরও সংকুচিত ও বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। শচীনের অন্তরেই সর্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক প্রতিক্রিয়া জাগিয়াছে। কমলার প্রতি তাহার সত্যকার ক্ষীয়মাণ হৃদয়াবেগ বহিঃপ্রকাশের আতিশয্যের দ্বারা উহার পাণ্ডুর রক্তহীনতাকে গোপন করিতে চাহিয়াছে—তাহার স্বামিত্বের সহজ মহিমা যেন ভিক্ষুকের উঞ্ছবৃত্তির মধ্যে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত সে বুঝিয়াছে যে কমলার প্রতি একনিষ্ঠতার অহংকারে পার্বতীর যে উন্মুখ প্রেমকে সে অস্বীকার করিয়াছিল, তাহার দাবী না মিটাইলে, ঋণ শোধ না করিলে তাহার জীবনে আর ভার-সাম্য ফিরিয়া আসিবে না। সুতরাং তাহার জীবনের প্রধান কর্তব্য এই দুই বিরোধী আকর্ষণের সামঞ্জস্য-বিধান, কমলার শুষ্ক ধমনীতে পার্বতীর প্রেমের উষ্ণশোণিত-সঞ্চার। কমলা ও পার্বতীর প্রেমের পার্থক্য একটি সুন্দর উপমায় প্রকাশিত হইয়াছে। কমলার প্রেম মূক অন্ধ মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত বীজ; পার্বতীর প্রেম ইহাকে উন্মুক্ত, আলোকোজ্জ্বল আকাশতলে আহ্বানকারী সৌরকর।

এবার পার্বতী দ্বিধাহীন, ছদ্মবেশবর্জিত, আত্মপরিচয়প্রতিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে।

যে মুহূর্তে শচীনের প্রেম, নিজ অনিবার্য প্রয়োজনের তাগিদে, নিজ সার্থকতার প্রেরণায়, উত্তপ্ত আলিঙ্গন লইয়া তাহার নিকট অগ্রসর হইয়াছে সে মুহূর্তে পার্বতীর আত্মদানে সমস্ত সংকোচ প্রবল, বিশুদ্ধ আবেগধারায় ভাসিয়া গিয়াছে। এক মিলন-রাত্রির পর চির-বিরহ তাহাদের প্রেমের উপর যবনিকাপাত করিয়াছে। কমলার মধ্যে তাহার উত্তপ্ত আবেগ-সন্ধানের ইঙ্গিত ও উপদেশ দিয়া পার্বতী শচীন-কমলার সংসার-জীবন হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

উপন্যাস মধ্যে আর দুইটি গৌণ উপাখ্যান মূল বিষয়ের সহিত শিথিলভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রথমটি, নন্দলাল-মালতীর পারিবারিক জীবনচিত্র। নন্দলাল তাহার গৃহে আশ্রিতা কমলার প্রতি যে স্থূল ইন্দ্রিয়াসক্তি অনুভব করিয়াছে, তাহার প্রতি মালতীর মনোভাব অবজ্ঞা ও ক্ষমাশীলতায় মিশ্রিত ; ইহার মধ্যে হৃদয়াবেগের বাড়াবাড়ি বা কাব্যোচ্ছ্বাস একেবারেই নাই। ইহাদের দাম্পত্য সম্পর্ক পাশ্চাত্ত্য-ভাবগন্ধহীন, ঈষৎ স্নেহমিশ্রিত বাস্তব প্রয়োজনবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। মালতীর বিশেষত্ব তাহার সরলতা ও সুনিপুণ গৃহিণীপণায়, প্রণয়িনী হিসাবে নহে। নন্দলালের মৃত্যু নিতান্ত আকস্মিক, বিপ্লবপন্থীদের গণ্ডিমধ্যে অসতর্ক পদবিক্ষেপের ফল।

গ্রন্থের তৃতীয় আখ্যান সীমা ও নিখিলনাথের শিথিল-গ্রথিত সম্পর্ক-বিষয়ক। এই অংশে বৈপ্লবিক আন্দোলনের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহার যুক্তিবাদমূলক বিশ্লেষণ যেমন চমৎকার, তাহার অন্তর্নিহিত আবেগ-গত প্রেরণা, মৌলিক বিস্ফোরক শক্তি সেই পরিমাণে অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে। লেখকের কল্পনাশক্তি বা আবেগ-গভীরতা তাঁহার মননশীলতার সমকক্ষ নহে। এই বৈপ্লবিক অধ্যায়ের গ্রন্থ মধ্যে বিশেষ সার্থকতা নাই—ইহা উপন্যাসের গতিকে অযথা ভারাক্রান্ত করিয়াছে মাত্র। সীমা একটা বিশিষ্ট মতবাদের প্রতীক, তাহার ব্যক্তিগত জীবন এই মতবাদের অন্তরালবর্তী হইয়া প্রচ্ছন্ন রহিয়া যায়। তাহার কৃচ্ছ্রসাধনা ও দুর্জয় প্রতিজ্ঞার কথা শুনি, তাহাদের অন্তর্নিহিত প্রেরণা গোপনই থাকে। নিখিলনাথের ব্যক্তিত্ব নিতান্ত ম্লান ও নিষ্প্রভ। সে কমলা ও সীমার মধ্যে যোগসূত্র ; আবার সেই কমলার স্বামীর আবিষ্কারক। কিন্তু এই দৌত্যকায ছাড়া গ্রন্থ মধ্যে তাহার আর কোন প্রয়োজন নাই।

উপন্যাসের ভাষার মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই নিপুণ বাক্য-সমাবেশ ও ভাবের সূক্ষ্ম অনুবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়। তথাপি লেখকের ভাষা-প্রয়োগ আতিশয্য-দোষ-মুক্ত নহে। বিশেষণের আধিক্য সময় সময় বাক্যকে ভারাক্রান্ত ও বোধ-সৌকর্যকে প্রতিহত করে। এই সমস্ত দোষ সত্ত্বেও উপন্যাসটির গভীর বাস্তব অনুভূতি ও উন্নত মনন-শক্তি উচ্চ প্রশংসার উপযুক্ত।

(৪)

মনোজ বসুর রচনার মধ্যে তাঁহার 'বন-মর্মর' ও 'নরবাঁধ' (১৯৩৩) এই দুই ছোট গল্পের সমষ্টি তাঁহার কৃতিত্বের নিদর্শন। অতি-প্রাকৃতের খুব সূক্ষ্ম অনুভূতি ও অতীন্দ্রিয় জগতের শিহরণ জাগাইবার অসাধারণ ক্ষমতা—ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। 'বনমর্মর'-এ আরণ্য প্রকৃতির মর্মস্থলে যে অতিপ্রাকৃতের ব্যঞ্জনা গুপ্ত থাকে, তাহা তিনি অতি নিপুণতার সহিত ও মনস্তত্ত্বানুমোদিত উপায়ে ব্যক্ত করিয়াছেন। 'বনমর্মর'ই তাঁহার সর্বপ্রধান গল্প।

গঠনকৌশল, ব্যঞ্জনা-সমাবেশ, সম্ভাবনীয়তার সীমার মধ্যে কল্পনাসংকোচ—এই সমস্ত গুণে ইহা অতিপ্রাকৃত-জাতীয় গল্পের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে।

'নরবাঁধ' গল্পটির মধ্যে নিগূঢ় ঐক্যের অভাব অনুভূত হয়। ইহার মধ্যে যে দুইটি ভাগ আছে তাহার মধ্যে যোগসূত্র অপেক্ষাকৃত শিথিল। প্রথম গল্পে বল্লভ রায়ের বাঁধ দেওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, স্বপ্নে দেবীর নররক্ত-দাবী, বলি-সন্ধানে মৃত্যুঞ্জয়কে প্রেরণ, উত্তেজিত কল্পনার ভিতর দিয়া, দীর্ঘ, প্রতীক্ষা-দুঃসহ অন্ধকার রাত্রির প্রত্যেক মর্মর ধ্বনির, হৃদয়-স্পন্দনের সহিত নিবিড় যোগ-সাধন, বল্লভ ও মৃত্যুঞ্জয়ের অদৃষ্ট-প্রেরিত হইয়া পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় জোয়ারের জলে প্রাণবিসর্জন—এ সমস্তই অতি প্রাকৃতের অপার্থিব শিহরণটি চমৎকারভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। গল্পের দ্বিতীয় খণ্ডে বৈজ্ঞানিক-ও-যন্ত্র-সভ্যতার অভিযানে এই অতি-প্রাকৃতের বিলোপ-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। বিলে সাঁকো বাঁধা, প্রজাদের দারুণ দুর্দশা, প্রজা ও জমিদারের তুমুল সংঘর্ষ, ঘনশ্যাম নায়েবের ক্ষুরধার পাটোয়ারি বুদ্ধি, চাষী প্রজাদের নেশাখোর কলের মজুরে পরিবর্তন ও এই পরিবর্তনের পশ্চাতে আত্মসম্মানলোপের শোকাবহ ইঙ্গিত—এ সমস্তই খুব জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক, কিন্তু এই বিরোধের কোলাহলে প্রেতলোকের রোমাঞ্চকর গুঞ্জন বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। গল্পের শেষে অন্ধকারে ছায়াময় প্রেত-মূর্তিবৎ প্রতীয়মান ভিখারীর দল অতি প্রাকৃতের লুপ্ত-প্রায় সুরটি ফিরাইয়া আনিয়াছে।

'মাথুর' গল্পটির রসও বহুধা বিভক্ত হওয়ার জন্য জমে নাই। ইহার কেন্দ্র হইতেছে ক্ষেত্রনাথ-জগদ্ধাত্রীর অধুনা-বিকৃত ও বিশুষ্ক বাল্যপ্রণয়-স্মৃতি। ক্ষেত্রনাথ একজন ঘোর কৃপণ বিষয়ী; বাল্যপ্রণয়ের মর্যাদা রক্ষা করার মত সরসতা তাহার আর নাই। তথাপি জগদ্ধাত্রীর আবির্ভাবে তাহার পাকা বিষয়-বুদ্ধির মধ্যে ফাটল ধরিয়া বহুকাল-সুপ্ত প্রণয়ের অঙ্কুর উঁকি মারিতেছে। শেষে মাথুর গান শুনিতে শুনিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া সে আপনাকে বৃন্দাবন-প্রত্যাবর্তনোন্মুখ নায়কের সহিত একাত্ম কল্পনা করিয়াছে। জগদ্ধাত্রীর চরিত্রে স্নেহের সহিত তীক্ষ্ণ আঘাতপ্রবণতার সমন্বয় হয় নাই। গল্পের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক বস্তুর অবতারণা ইহার ঐক্যকে বিধ্বস্ত ও রসকে ফিকে করিয়াছে। মনোজবাবু পরবর্তীকালে অনেকগুলি জনপ্রিয় উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহাদের মধ্যে উপন্যাসের কোন নূতন আঙ্গিক বা চরিত্র-পরিকল্পনার কোন স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য উদাহৃত হয় নাই।

বিংশ অধ্যায়

উদীয়মান লেখক সম্প্রদায়

(১)

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'বৃত্ত' (সেপ্টেম্বর, ১৯৪২) উপন্যাসটি আধুনিক মনের যৌন বোধের বিকার ও অতৃপ্তির উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ। অফুরন্ত অগ্রগতি মানব-মনের উচ্চাভিলাষ; অজ্ঞাতসারে চক্রাবর্তন সেই উচ্চাভিলাষের উপর প্রকৃতির ব্যর্থতার অভিশাপ। রামপ্রসাদের সেই সুপরিচিত আধ্যাত্মিক জীবনের খেদোক্তি—'মা আমায় ঘুরাবি কত, চোখ-ঢাকা বলদের মত' সম্পূর্ণ নূতন আবেষ্টনে, সম্পূর্ণ নূতন আদর্শে আস্থাশীল প্রগতিবাদীদের মুখে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। 'বৃত্ত' সেই তৃপ্তিহীন চক্রভ্রমণের কাহিনী।

বিবাহিত প্রেমে অতৃপ্তি, নূতন প্রেমের আস্বাদ-গ্রহণে ঔৎসুক্য মানবমাত্রেরই একটা প্রাকৃত, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। শাস্ত্রকার ও নীতিবিদ্‌গণ মানবের এই সমাজ-ও-শৃঙ্খলা-বিরোধী মনোবৃত্তির তীব্রতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই নানারূপ কড়া বিধি-নিষেধের দ্বারা এই প্রবণতাকে রুদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই পদস্খলনকে সোজাসুজি রূপ-মোহ হইতে উদ্ভূত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই দুর্বলতার প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল, কিন্তু উচ্চতর সমাজ-কল্যাণের জন্য তিনি ইহাকে প্রলোভন বলিয়াই আঁকিয়াছেন এবং ইহাকে জয় করার চেষ্টাতেই মানবচিত্তের উৎকর্ষ ও গৌরবের চিহ্ন দেখিয়াছেন। আধুনিক যুগে এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পিছনে একটা মহান্ আদর্শবাদ আরোপ করিয়া ইহার মাহাত্ম্য-কীর্তন করা হইয়াছে। যে জলন্ত আবেগ হইতে প্রেমের উদ্ভব, কিছুদিন একত্রবাসের ফলে তাহা স্তিমিত হইয়া জড়, অভ্যস্ত গতানুগতিকতার ভস্মরাশিতে পরিণত হয়—কাজেই আত্মার স্বাধীন, বাধাহীন স্ফুরণের জন্যই আবার নূতন আবেগের দীপশিখা হইতে এই নির্বাপিত-প্রায় আলোকটিকে জ্বালাইয়া লইতে হয়। প্রেমের এই পাত্র-পরিবর্তনে লজ্জা-সংকোচের কোন কারণ নাই, কেননা এই উপায়েই জীবনের সার্থকতা, তাহার তেজোগর্ভ, জ্যোতির্ময় স্বরূপের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। এই স্বতঃস্বীকৃতির উপরেই আধুনিক উপন্যাসের প্রেমের আলোচনা ও বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কোন ঔপন্যাসিকই এই প্রেমের চরিতার্থতা কেমন করিয়া জীবনের মহনীয় সম্ভাবনাকে বিকশিত করে তাহার কোন চিত্র আঁকেন নাই। বর্তমান ব্যবস্থার ত্রুটি-অপূর্ণতা, ইহার ক্ষোভ ও অতৃপ্তির ধারণাটি নির্মম বিশ্লেষণ ও পুঞ্জীভূত তথ্য-সন্নিবেশের দ্বারা আমাদের মনে বদ্ধমূল করিয়াছেন; কিন্তু ভবিষ্যতের উন্নততর ব্যবস্থার প্রতি দূর হইতে ইঙ্গিত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। যে দুই একজন অতি-সাহসী লেখক—যথা হাক্সলি ও ওয়েলস্—এই অনাগতের যবনিকা তুলিয়া তাহার বাস্তব জীবনযাত্রা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিকল্পনায় প্রেম একটা বিজ্ঞান-চালিত যন্ত্রশক্তিতে পরিণত হইয়া তাহার সমস্ত মাধুর্য ও বৈদ্যুতী-শক্তি হারাইয়াছে।

বর্তমান উপন্যাসে এই সমস্যাই কয়েকটি স্বল্পসংখ্যক চরিত্রের মানস প্রতিবেশের মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। সত্যবান—অধুনা মধ্যবয়স্ক অধ্যাপক—পনর বৎসর পূর্বে সতীকে বিবাহ করিয়াছে। সতী সমাজের অনুমোদন ও পিতা-মাতার আশীর্বাদ ছাড়া এই বিবাহ করিয়া অনন্যসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু বিবাহের পর সতী তাহার চিত্ত-স্বাধীনতা হারাইয়া গার্হস্থ্য কর্তব্য ও স্বামীর ইচ্ছানুবর্তনে নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সত্যবানের জীবনে আরও উত্তেজক সাহচর্য ও উষ্ণতর প্রভাবের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছে। সুরমার সঙ্গে তাহার ক্ষণিক অন্তরঙ্গতা তাহাকে যৌন সম্বন্ধের বৈপ্লবিক দিকের সহিত পরিচিত করিয়াছে। তারপর তাহার জীবনে সংক্রামিত হইয়াছে বনানীর তরুণ জীবনের নির্ভীক, উত্তপ্ত আবেগ। কিন্তু বনানীর সহিতও তাহার মিলন সার্থক হয় নাই। বনানীর কর্মজীবনের সহিত সে সংস্রবহীন; শুধু মধ্যে মধ্যে কোমল ভাবাবেগের ক্ষেত্রে তাহারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাহার বিবাহের পঞ্চদশবার্ষিক উৎসব-সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টা আত্মবিশ্লেষণের ফলে সে সতীর মধ্যে মননশীলতার পরিচয় পাইয়া তাহার প্রতি বিমুখতা জয় করিয়াছে। সে অনুভব করিয়াছে যে, সে স্ত্রীর নিকট যে স্বাতন্ত্র্য দাবী করে তাহা সম্পূর্ণ নহে, নিজ স্বার্থ ও আত্মাভিমানের দ্বারা সীমাবদ্ধ, চরমপন্থী নহে, মধ্যপন্থী। সে বনানীকে কামনা করিয়াছে সতীর তরুণ জীবনের প্রতিনিধি ও স্মারক হিসাবে, সতীর যৌবন-উন্মাদনার রোমাঞ্চ অনুভবের জন্য। সুতরাং শেষ পর্যন্ত সতীর প্রভাব তাহার জীবনে চিরস্থায়ী ও চিরকাম্য এই ধারণায় স্থির হইয়া সে পুরাতন চিঠিপত্রের সহিত নিজ অতৃপ্ত হৃদয়াবেগকে পোড়াইয়াছে। ইহাই হইযাছে তাহার জীবনে নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির পরিবর্তে ব্যর্থ বৃত্তানুবর্তন।

অন্যান্য সমস্ত চরিত্রের ক্ষেত্রেও এই বৃত্তাঙ্কন-প্রবণতার অভিনয় হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সুরমা প্রগতির পথে সর্বাপেক্ষা বেশী অগ্রসর। সে স্বামী ত্যাগ করিয়া একাধিক পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে, তথাপি তাহার জীবনে ব্যর্থতার ক্লান্তি আসিয়াছে। বিদ্রোহের যে তীব্রতা তাহাকে চরিতার্থতার তৃপ্তি দিতে পারিত, তাহার সামাজিক আবেষ্টন হইতে সেই পরিমাণ দাহিকা শক্তি সে আহরণ করিতে পারে নাই। বিদ্রোহের পরিমণ্ডল প্রস্তুত না থাকিলে ব্যক্তিগত বিদ্রোহের শক্তি সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই বিচ্ছিন্ন, আত্মকেন্দ্রিক বিদ্রোহ-প্রয়াস "পরিবর্তনের সিঁড়ি মাত্র", নূতন বাসগৃহ নহে। 'শেষপ্রশ্ন' ও 'শেষের কবিতা' সম্বন্ধে তাহার মতামতও তাহার গভীর অবসাদ ও মধ্যপন্থী আপোষ-প্রবণতার প্রমাণ। কমলের ক্ষণিকবাদ মত হিসাবে সমর্থনীয়। কিন্তু বাস্তবজীবনে ইহার অবাধ প্রয়োগ যৌন প্রবৃত্তির ন্যায্য সীমার উল্লঙ্ঘন। পক্ষান্তরে অমিত-লাবণ্যের সম্পর্কে যৌন-আকর্ষণকে আদর্শ লোকে উন্নয়নের যে প্রয়াস লক্ষিত হয়, তাহাও অস্বাস্থ্যকর, কেননা ইহা যৌনবোধকে অভদ্র ও অশ্লীল ধরিয়া লইয়া ইহাকে কবিত্বময় প্রতিবেশে স্থানান্তরিত করিয়াছে ও কল্পনার রংএ রাঙাইয়াছে। মোট কথা, এই জৈব সংস্কারকে লইয়া কোন ভাবোচ্ছ্বাসমূলক আতিশয্য বা নূতন মত-প্রচারের উৎসাহ—উভয়ই অসুস্থ মনোবৃত্তির পরিচয়। ইহাকে মনের স্পর্শ হইতে দূরে রাখিয়া নিছক শারীরিক প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করাই যুক্তিযুক্ত। ইহার একনিষ্ঠতাকে সতীত্বের গৌরব বা স্বৈরাচারকে সমাজ-

সংস্কারের প্রেরণাশক্তির মর্যাদা আরোপ করিলে সহজ ব্যাপারকে অনর্থক জটিল করিয়া তোলা হইবে। তাই বনানী যখন সত্যবানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, তখন সুরমা বাধা দেয় নাই। কিন্তু তাহার বুদ্ধি যাহা মানিয়া লইয়াছে, হৃদয় তাহা সমর্থন করে নাই। সেইজন্য নিজের জীবনে দুর্বহ শ্রান্তি অনুভব করিয়া সে অজ্ঞাতবাসে আত্মগোপন করিয়াছে। তাহার কারণ সে নিজেই নির্মমভাবে নির্দেশ করিয়াছে—আধুনিক যুগের মানুষের সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব, মতে ও ব্যবহারে বৈষম্য এক অসাধ্য ব্যাধির বিকার হইতে উদ্ভূত।

বনানী যুদ্ধোত্তর যুগের সন্তান—কাজেই সমাজতন্ত্রবাদ ও শ্রমিকের প্রতি সহানুভূতি সে সহজ সংস্কারের মতই গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তাহার জীবনেও ঐক্য ও শান্তি নাই। তাহার কর্ম-সহচর ও যৌন পরিতৃপ্তির পাত্র বিভিন্ন। তাহার সহপাঠী ও সম্ভাব্য প্রণয়ী শিশির তাহার সমাজনৈতিক মতবাদের অত্যুৎসাহে প্রেম-মমতা প্রভৃতি সুকোমল হৃদয়বৃত্তিকে আপাততঃ ঠাণ্ডা-গুদামজাত (in cold storage) করিয়াছে—সমাজ পুনর্গঠন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে এই সমস্ত দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিবে না। কাজেই হৃদয়াবেগের মোহপরিতৃপ্তির জন্য বনানী মধ্যবয়স্ক ও পূর্বযুগের প্রতিনিধি সত্যবানের আশ্রয় লইয়াছে—চোখে ঘনায়মান ক্লান্তি ও মনে বর্ধমান শূন্যতাবোধ লইয়া কর্মক্ষেত্রে শিশিরেব সহযোগিনী হইয়াছে। এই দ্বিধা-বিভক্ত মন লইয়া সে জীবনের কি চরিতার্থতা প্রত্যাশা করে তাহা বুঝা কঠিন। যৌনবোধের পরিমিত অসংকোচ উপভোগ ও ইহাকে মানসবিলাসের সহিত জড়িত না করার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তাহার মত তাহার মাতার মতের প্রতিধ্বনি, তাহার মাতারই জীবনাভিজ্ঞতা মতবাদরূপে তাহার অনভিজ্ঞ মনে সংক্রামিত হইয়াছে। তাহার স্বতঃস্ফূর্ত লীলাচঞ্চলতা ও নিশ্চিন্ত উপভোগ-স্পৃহা তাহার নব-উন্মেষিত যৌবনের দুঃসাহসিকতারই বিচ্ছুরণ; ইহার মূল কোন সুপ্রতিষ্ঠিত মানস-সাম্যে নিহিত নাই। মনে হয় যৌবনের জোয়ারে ভাটা পড়িলে তাহার এই সরসতাও শুকাইয়া যাইবে; বয়োবৃদ্ধির সহিত সেও সুরমার দ্বিতীয় সংস্করণে রূপান্তরিত হইবে। এই আশা ও আনন্দে পূর্ণ, নবযুগের প্রতীক তরুণীরও বিধিলিপি অনিবার্য ব্যর্থতার চক্রাবর্তন।

এই ব্যর্থতাবোধ অনুভব করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত প্রবীণ মাস্টার মশাইও। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে সীমাবদ্ধ মানস মুক্তির জয়গান করা হইয়াছে, তাহারই প্রভাবে মাস্টার মশাই নিজ জীবনে বৃহত্তর স্বাভাবিক মুক্তিকে আহ্বান করিতে পারেন নাই—তাঁহার তথাকথিত মুক্তি-মন্দিরের চারিদিকে সংকীর্ণতার দেওয়াল তুলিয়াছেন। মানস আভিজাত্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, রোমাণ্টিক সৌন্দর্যোপভোগ—ইহাদেরই নেশায় মশগুল হইয়া তিনি আধুনিক যুগের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধিজীবীর আভিজাত্যাভিমানে তিনি বিবাহ করেন নাই—যদিও রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শের সহিত কৌমার্য-ব্রত গ্রহণের সম্পর্ক মোটেই স্পষ্ট নহে। যাহা হউক শেষ পর্যন্ত বনানীর সংস্পর্শে তিনি নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন—সত্যবানের প্রতি অকস্মাৎ উত্তেজিত ঈর্ষার বিদ্যুৎ-ঝলকে তিনি নিজের মনের রহস্য পাঠ করিয়াছেন। এই আত্মোপলব্ধির অব্যবহিত পরেই প্রশংসনীয় স্বরার সহিত বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া মাস্টার মশাই নিজ জীবনকে বৃত্তানুসরণের চিরাভ্যস্ত কক্ষপথে ফিরাইয়া আনিয়াছেন।

রজতের জীবনে সত্যকার কোন সমস্যারই উদ্ভব হয় নাই। সুরমার সহিত সম্পর্ক তাহার একটা আকস্মিক খেয়াল, ইহার স্থায়িত্ব নির্ভর করিয়াছে তাহার নিষ্ক্রিয়, নিরুৎসাহ সম্মতির উপর। যে মুহূর্তে বাহিরের চাপ আসিয়াছে, সেই মুহূর্তেই এই বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। তাহার জীবনের কক্ষাবর্তন সাময়িকভাবে স্বাধীন ইচ্ছার সরলরেখায় চলিয়া আবার চিরাচরিত প্রথার টানে নির্দিষ্ট চক্রপথে ফিরিয়া আসিয়াছে।

উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর মধ্যে একমাত্র সতীই নিজ চিত্তপ্রসাদ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বিবাহের পর হইতে সে সম্পূর্ণভাবে আত্মবিলোপ করিয়া সংসার-চক্রের কেন্দ্রস্থলে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এই চক্র-বিঘূর্ণনের সহিত সে আপন জীবনগতিকে এমন নিশ্চিহ্নভাবে মিলাইয়া দিয়াছে যে, পৃথিবীর জীব যেমন তাহার আবর্তন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনুভূতিহীন থাকে, সেও তেমনি তাহার নিজস্ব সত্তা সম্বন্ধে সচেতনতা হারাইয়াছে। এই যান্ত্রিক গতির সহিত একাঙ্গীভূত হইয়া সে আপনাকে চিত্তবিক্ষেপ হইতে রক্ষা করিয়াছে ও অক্লান্ত সেবা ও নিজ দৈহিক আকর্ষণের দ্বারা স্বামীর উৎকেন্দ্রিকতার প্রতিষেধ করিতে চাহিয়াছে। তাহার বুদ্ধি সজাগ ও প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন বলিয়াই সে অভীষ্ট ফল লাভে সমর্থ হইয়াছে—তাহার স্বামীর চঞ্চল চিত্তবৃত্তি তাহাকেই বেষ্টন করিয়া ডানা ঝটপট করিযাছে। বিদ্রোহেব জ্বলন্ত অগ্নিশিখাকে সে গার্হস্থ্য প্রয়োজনের চিমনিতে আবদ্ধ করিয়া শান্ত ও নিয়মিত করিয়াছে—তাহারই স্থির আলোকে সে নিজ জীবনকে ব্যর্থতার অন্ধকারাচ্ছন্ন ও নিরানন্দ হইতে দেয় নাই।

গ্রন্থের আঙ্গিকেব বৈশিষ্ট্য বিশেষ সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত মনে হয না। সত্যবানের পঞ্চদশ বর্ষব্যাপী জীবনাভিজ্ঞতাব, দুই ঘণ্টার অতীত-স্মৃতি-পর্যালোচনা ও বর্তমান অনুভূতির চতুর্দিকে বিন্যাস, গঠনশক্তির একটা দুরূহ পরীক্ষা বলিযাই ঠেকে। ঠিক ঐ সময়ের মধ্যে এতগুলি স্মৃতির পুঞ্জীভূত হওযার বিশেষ কোন সার্থকতা দেখা যায না। লাভেব মধ্যে ঘটনার ক্রম-পর্যায় সম্বন্ধে পাঠকেব ধারণা বিভ্রান্ত হয় ও চেষ্টা কবিযা উহাকে আবাব সময়ের পৌর্বাপয সম্বন্ধে সজাগ করিতে হয়। তাহার জীবনসমস্যার উপর বাল্যস্মৃতির কোন প্রভাব লক্ষ্য হয় না—সুতরাং ইহার প্রবর্তন কাহিনীকে অযথা ভারাক্রান্ত করে।

এই উপন্যাসটি সমস্যামূলক—a novel of ideas, সুতরাং চরিত্রবিকাশ এই ideaর স্তরেই সীমাবদ্ধ আছে। সত্যবান ও সতী ছাড়া আব কাহাবও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নাই। সমস্যার ব্যূহপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেকেরই জীবন আরম্ভ, ব্যূহনিষ্ক্রমণ-চেষ্টাই প্রত্যেকের জীবনের ইতিহাস। জীবনের যতটুকু সমস্যার ছায়ায় আচ্ছন্ন, ততটুকুতেই লেখকের কৌতূহল সীমাবদ্ধ। জীবনের নদীকে সমস্যার ক্যানালে পুরিয়া এই সংকীর্ণ সীমার মধ্যে তাহার জলোচ্ছ্বাসের আকুলতা তাঁহার আলোচ্য বিষয়। সুরমার জীবনে সমস্যাব কি করিয়া উদ্ভব হইল, বনানী কিরূপে সত্যবানের প্রেমে পড়িল—সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন ব্যাখ্যা নাই। এগুলি স্বতঃ-স্বীকৃতির মত মানিয়া লইয়া পাঠককে লেখকের অনুসরণ করিতে হইবে। কাজেই এই জাতীয় উপন্যাসের জীবনালোচনা সংকীর্ণ ও একদেশদর্শী। ইহাতে জীবন সম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্ম মন্তব্য আছে, জীবনীশক্তি নাই। যাহা হউক, সমস্যা-প্রধান উপন্যাসই আধুনিক যুগের বিশেষ সৃষ্টি—ইহাতে যেমন আক্ষেপের কারণ আছে, তেমনি আত্মপ্রসাদেরও সুযোগ একেবারে দুর্লভ নহে। আধুনিক মানব ideaর বাহন ও দাস, তাহার জীবনে সমস্যা আবেগকে বজ্রমুষ্টিতে

চাপিয়া ধরিয়াছে। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উপন্যাসটি এই শ্রেণীর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহার আলোচনার মধ্যে তীক্ষ্ণ মননশক্তি এবং নিপুণ বিশ্লেষণ ও প্রকাশভঙ্গী তাঁহার শক্তির পরিচয়।

(২)

বৈপ্লবিক আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবন ছাড়া সাহিত্যেও যে প্রেরণা দিয়াছিল, তাহার প্রচুর নিদর্শন আছে। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' ও শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' প্রমাণ করে যে, বঙ্গসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকেরাও বৈপ্লবিক উন্মাদনার মধ্যে স্থায়ী সাহিত্যের উপাদান ও অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' কল্পনার দ্বারা রূপান্তরিত অতীত সংঘটনের ভিতর দিয়া ভবিষ্যৎ যুগের বিপ্লবাত্মক কর্মপদ্ধতি ও ইহার ব্যর্থতার প্রতি গূঢ় ইঙ্গিত করিয়াছিল। কিন্তু এই সমস্ত আলোচনার মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাব, অসম্পূর্ণ সহানুভূতি ও অবাস্তব কল্পনা-বিলাসের লক্ষণ বিদ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্র এত বড় একটা আবির্ভাবের প্রসব-যন্ত্রণা, ইহার সূতিকাগারের দৃশ্য সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও আত্মবিকাশের উপাসক রবীন্দ্রনাথ বৈপ্লবিকতার আত্মঘাতী, অচেতন যন্ত্রশক্তির ন্যায় মূঢ় প্রচেষ্টার প্রতি খুব সশ্রদ্ধ ছিলেন না। কাজেই তিনি ইহার দুর্বলতা, আত্মপ্রতারণা, সুকুমার অনুভূতি ও উচ্চতম নৈতিক আদর্শের সহিত অসামঞ্জস্যের উপর তীক্ষ্ণ শ্লেষ প্রয়োগ করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'তে বিপ্লব-দর্শনের পূর্ণ সমর্থন আছে—কিন্তু ইহাতে বিপ্লবপন্থীর অন্তঃনিরুদ্ধ বহ্নিশিখা, তাহার হৃদয়ের অনির্বাণ তুষানলের পরিচয় নাই। সব্যসাচী পাষাণ দেবতা, মানুষের সুখ-দুঃখ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, অনুরাগ-বিরাগ তাহার বক্ষপঞ্জরে কোন কোলাহল জাগায় না। কোন্ নিদারুণ অভিজ্ঞতায় তাহার এই নির্মম ঔদাসীন্য দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, দুঃখের কোন্ কামারশালায় আগুনে পুড়িয়া ও হাতুড়ির ঘা খাইয়া তাহার হৃদয় অটল নিঃস্পৃহতার লৌহ-বর্মাবৃত হইয়াছে তাহার কোন ইঙ্গিত আমরা পাই না। আবার তাহাকে অনেকটা অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির মত দেখান হইয়াছে। তাহার কর্মক্ষেত্রের অতি-বিস্তৃত পরিধি, বিধি-ব্যবস্থার অমোঘ শৃঙ্খলা, পুলিসের চোখে ধূলা দিবার অদ্ভুত কৌশল, অপ্রত্যাশিতভাবে আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হইবার ঐন্দ্রজালিক শক্তি, অনুচর ও সহকর্মি-সংঘের উপর সম্মোহন-প্রভাব—এই সমস্তই তাহাকে সাধারণ মানবের বোধগম্যতা ও সহানুভূতির ঊর্ধ্বে অতিমানবের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। আদর্শবাদের শ্বেতদীপ্তি-বিস্ফুরিত মসৃণ তুষার-আস্তরণের নীচে তাহার মানব-হৃদয়টি চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

এই শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে গোপাল হালদারের 'একদা' (১৯৩৯) শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে। এই উপন্যাসে রাজনৈতিক বন্দীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় উচ্চাঙ্গের মনন-শক্তি ও প্রখর জ্বালাময় অনুভূতির চমৎকার সমন্বয় হইয়াছে। ইহার ছত্রে ছত্রে বৈপ্লবিকতার প্রলয়ংকর দাহ ও দীপ্তি, ইহার উন্মত্ত, আত্মঘাতী বিক্ষোভ অনুভব করা যায়। যে সুদূর, অনায়ত্ত আদর্শের মোহে বিপ্লবী জীবনের সুলভ আংশিক সফলতা প্রত্যাখ্যান করে তাহা ইহাতে মর্মভেদী আন্তরিকতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। মনীশ, সুনীল, অমিত—ইহারা একের হাত হইতে অপরের সন্ত্রাসবাদের দীপ্ত শলাকা গ্রহণ করিয়া এই ভয়াবহ দীপালি-উৎসবের অবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখিয়াছে—প্রজ্বলিত হোমানলে একে একে আত্মাহুতি দিয়াছে। সাধারণ প্রতিবেশের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ পদে পদে। মুনসেফ শৈলেন ও এটর্নি সাতকড়ির মধ্যে মূর্ত, জীবনের

ক্ষুদ্র, মেদ-মাংস-বহুল সার্থকতা ইহাদের তীব্র বিরাগ জাগায়। অধ্যাপক ও কলাবিদের মনন-শক্তি-সমৃদ্ধ, সৌন্দর্যানুভূতিতে স্নিগ্ধ, সরস জীবনযাত্রা তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু এই বৈষম্য-পীড়িত, কুৎসিত সমাজ-ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয়ের সৌন্দর্যচর্চা একটা মানস-বিলাসের মতই প্রশ্রয়ের অযোগ্য। এই সমস্ত রুক্ষ, নিরবসর জীবনে স্ত্রীলোকের প্রভাব সহযোগিতা-ভালবাসার পর্যায়ে উঠে না—বৈপ্লবিকতার তীক্ষ্ণ উত্তর হাওয়ায় প্রেমের দলগুলি শুষ্ক, শীর্ণ হইয়া যায়। ইন্দ্রানী, সুর, সুধীরা, সবিতা, সুনীলের বৌদিদিরা আপন আপন রমণীয়তার চকিত ইঙ্গিত লইয়া, হাস্য-কৌতুক-স্নেহ-প্রীতির অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া, উষর মরুভুমির দিগন্তলীন, ক্ষীণ শ্যাম-রেখার ন্যায় সুদূর, দুরতিক্রম্য ব্যবধানে অধিষ্ঠিত। বিপ্লববাদীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক অস্বস্তিকর—পরিবার-মণ্ডলের সহিত তাহার সম্বন্ধের গোপন বিরোধ ও অসামঞ্জস্য। অমিত ও সুনীলের জীবন এক জটিল, বিস্তীর্ণ প্রতারণা-জালে জড়াইয়া গিয়াছে—পিতা-মাতা-ভাই-ভগ্নীর সহিত সহজ, স্নেহ-মধুর সম্পর্ক প্রাণপণ যত্নে আবৃত এক নিদারুণ বিদারণ-রেখায় খণ্ডিত হইয়াছে। এই হীন আত্মগোপন-চেষ্টা তাহাদের প্রতি মুহূর্তের অনুভূতিকে, প্রত্যেকটি কথা ও কাজকে, যেন কাঁটার ন্যায় বিদ্ধ করিয়াছে। অশ্রান্ত আত্মদ্বন্দ্ব ও প্রতিবেশের সহিত মর্মান্তিক বিচ্ছেদই ইহাদের জীবনে সর্বাপেক্ষা গুরুতর অভিশাপ। ইহার সহিত তুলনায় রাজশক্তির ক্ষমাহীন অনুসরণ, অতন্দ্র প্রতিহিংসা যেন একটা গৌণ অসুবিধার মতই অনুভূত হয়। বৈপ্লবিকের জীবনের দিকটা—পুলিসের সহিত লুকোচুরি খেলা, মাথা গুঁজিবার স্থানের জন্য অশান্ত অনুসন্ধান, অর্থাভাবের জন্য ক্লেশ—গভীর সহানুভূতিও তীব্র আবেগের সহিত বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু অন্তরের তীব্র বহ্নিজ্বালার নিকট এই ক্ষুদ্র বহিঃশক্তির অভিভব যেন তুচ্ছ ও উপেক্ষনীয় মনে হয়।

তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী আত্মজিজ্ঞাসা ও গভীর আবেগের সহিত মনীষাদীপ্ত জীবন-বিশ্লেষণ এই উপন্যাসের গৌরবময় বৈশিষ্ট্য। জীবন ও জীবনাদর্শ কি, এই সম্বন্ধে ব্যাকুল অনুসন্ধিৎসা গ্রন্থের প্রতি পাতায় অনুরণন তুলিয়াছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে জীবন জীবিকার্জনের একটা অচেতন যন্ত্র মাত্র। শিক্ষাভিমানী মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী ও ব্যবসায়ীর নিকট জীবন জীবন-বিমুখীনতা—জীবনের গতিবেগকে অস্বীকার করিয়া স্রোতোহীন, সমগ্রতার সহিত নিঃসম্পর্ক, পল্বলের পঙ্ককুণ্ডে আরাম-শয়ন, চোরাবালিতে আটকাইয়া "মরুশয্যায় ধীর-সমাধি"। বুদ্ধিপ্রধান কালচার-বিলাসীর দল জীবনকে সমস্ত বিভ্রান্তকারী, বিক্ষেপ-ক্ষুব্ধ সংস্রব হইতে বাঁচাইয়া স্বপ্ন-সৌন্দর্য-সৃষ্টি, সাহিত্য-আলোচনা, বিস্মৃতিলুপ্ত অতীত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার প্রভৃতি সৌখীন মানস-বিলাসে আত্মনিয়োগ করিতে চাহে। অধ্যাত্মবাদীরা অপার্থিব ধ্যানধারণার কৃত্রিম অভিনয়ে অন্ধ আত্মপ্রতারণাকে বরণ করে। এই সমস্ত বিভিন্ন পথেরই অন্তঃসারশূন্যতা অমিতের সত্যসন্ধানী মনের নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছে—তাহার নিকট এগুলি শুধু "এহো বাহ্য" নয়, ভয়াবহরূপে ভ্রান্তও। সৌন্দর্যানুশীলন ও ইতিহাস-চর্চায় তাহার যে সত্তার বিকাশ হইবে, তাহা ক্ষুদ্র, আত্মকেন্দ্রিক—সুতরাং বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের অনুযোগে তাহার চিত্ত সময় সময় এই আদর্শাভিমুখী হইতে চাহিলেও, সে কঠোর আত্মদমনের দ্বারা এই আপাত-মধুর প্রলোভনকে জয় করে। মানব-জীবনের জয়যাত্রায় তাহার প্রকৃত কার্য—ইতিহাসের কল্পান্তব্যাপী ক্রম-বিকাশের মধ্যে বর্তমান যুগের স্থান নির্ণয়, ও যে অনাগত ভবিষ্যৎ বর্তমানের সমস্ত ক্ষুব্ধ অনিশ্চয়ের মধ্যে

নবজন্ম পরিগ্রহ করিতেছে তাহার সূতিকাগারের দ্বারে দাঁড়াইয়া মঙ্গলশঙ্খ-নিনাদে তাহার প্রত্যুদ্গমন। মহাকালের রথচক্রনির্ঘোষে জীবনের যে গতিচ্ছন্দ লীলায়িত হইয়া উঠিতেছে তাহারই সুরটি বর্তমানের সমস্ত উন্মাদ ছন্দোহীনতার মধ্যে উপলব্ধি করাই তাহার মননশীলতার প্রকৃত পরীক্ষা ও পরিচয়; বিশ্বছন্দের সহিত নিজ জীবনের সংযোগ-সাধন ও এই একাত্মতার আনন্দময় অনুভূতিই তাহার বৃহত্তর সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ। এই মহত্তর চরিতার্থতার সম্ভাবনায় সে তাহার জীবনের সমস্ত অপচয়, খণ্ডিত অসম্পূর্ণতা, আপাতঃ-লক্ষ্যহীন ছুটাছুটি, নিজকে শতধা বিদীর্ণ করিয়া অণু-পরমাণুতে উড়াইয়া দেওয়া, আশাভঙ্গের অসহ্য তিক্ততা মূল্যস্বরূপ দিতে কুণ্ঠিত নহে। তাই সে বুঝিয়াছে যে, ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য বর্তমান যুগকে আত্মবলিদান দিতে হইবে—সৃষ্টি-সুষমা, চিন্তাস্থৈর্য, মনন-ক্রিয়ার স্বচ্ছতা এক হিংস্র, মূঢ় কর্ম-প্রবাহের পঙ্কিল আবর্তে তলাইয়া যাইবে। বৈপ্লবিকতার দিগন্তব্যাপী দাবানলের ধূম্রযবনিকার অন্তরালে নবযুগের অরুণোদয় হইবে।

বিপ্লববাদের দার্শনিক আশ্রয় ইহা অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে আলোচিত হইতে পারে না। কিন্তু উপন্যাসটির দার্শনিক মননশীলতাই ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ নহে। ইহার সহিত মানব-হৃদয়ের চঞ্চল ঘাত-প্রতিঘাত যুক্ত হইয়া ইহাকে উপন্যাসোচিত গুণে সমৃদ্ধ করিয়াছে। যুক্তিবাদের স্থিরতা আবেগ-তাড়িত হইয়া মুহুর্মুহুঃ বিচলিত হইয়াছে। চিন্তার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কর্ম-ক্ষেত্রে ক্ষণে ক্ষণে দ্বিধা-দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। অমিতের মন বারবার সংশয়ক্ষুব্ধ হইয়া উত্তরহীন জিজ্ঞাসার আবর্তে ঘুরপাক খাইয়াছে। যে চিরন্তন, সমাধানহীন প্রশ্ন যুগে যুগে মানব-চিত্তকে মথিত করিয়াছে তাহা বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের বিচিত্র পটভূমিকায়, তাহার পূর্ব সংস্কৃতির ও বর্তমান প্রয়োজনের পরস্পর-বিরোধী আদর্শ-সংঘাতের কুরুক্ষেত্রে, পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। বিপ্লবীর হিংস্র আঘাত ও উন্মত্ত আত্মবলিদানের রক্ত-পিচ্ছিল পথ দিয়াই কি রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্যের বিজয়-অভিযান সম্ভব হইবে? যে আদর্শের উদ্দেশ্য এত মহনীয়, তাহার উপায় কি এত হেয় হইবে? ধ্বংসের তাণ্ডবলীলার মধ্যে নবসৃষ্টির বীজ কি সত্যসত্যই আত্মগোপন করিয়া আছে? এই সংশয়োত্তেজিত প্রশ্ন-পরম্পরার মধ্যেই উপন্যাসের human interest. এই প্রশ্নের কোন বাঁধাধরা উত্তর নাই বলিয়াই ইহা সমাজনীতি ছাড়াইয়া সাহিত্যের উপজীব্য হইয়াছে। স্বাধীন দেশসমূহেও এই প্রশ্ন শ্রেণীবৈষম্য-সমস্যায় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। যাহার জীবন সব দিক দিয়া পরিপূর্ণভাবে সমৃদ্ধ, যিনি জীবনের বিচিত্র রসধারা আকণ্ঠ পান করিয়াছেন সেই মহাকবি রবীন্দ্রনাথও তাঁহার চরম সার্থকতা সম্বন্ধে এইরূপে সন্দিহান হইয়াছেন। তিনি মূঢ়, মূক জনসাধারণের মুখে ভাষা দিতে পারেন নাই বলিয়া খেদোক্তি করিয়াছেন ও ভবিষ্যতের যে কবি এই আদর্শ সফল করিবেন তাহার আবির্ভাবের জন্য ব্যাকুলতা জানাইয়াছেন। Intense living, অনায়ত্ত আদর্শের প্রাণপণ অনুসরণের ইহাই অপরিহার্য অভিশাপ।

উপন্যাসে যে পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে তাহা Virginia Woolf প্রমুখ আধুনিক ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের প্রভাবান্বিত। একদিনের পরিধির মধ্যে পূর্বস্মৃতির পর্যালোচনার সাহায্যে বহুবর্ষ-বিস্তৃত কাহিনীটি পুনর্গঠিত হইয়াছে। অমিত ও সুনীলের পূর্বজীবনে যে সমস্ত অর্থপূর্ণ অধ্যায় বর্তমান পরিস্থিতির সহিত সম্পর্কান্বিত সেগুলি যথাযোগ্য প্রতিবেশে পুনঃসন্নিবিষ্ট

হইয়াছে। অবশ্য অমিতের কলেজ-জীবন, তাহার সহজ বন্ধুপ্রীতি, জ্ঞান-চর্চার পরিকল্পনা, স্বাভাবিক সুস্থভাবে জীবনযাত্রা-নির্বাহের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাহার বর্তমান বিকৃত জীবনাদর্শের সহিত স্মৃতির সূত্রে গ্রথিত—কাজেই সেগুলি অপরিহার্য তুলনার প্রয়োজনে স্বতঃই আসিয়া পড়ে। কিন্তু অমিতের স্মৃতিমন্থন করিয়া সুনীলের প্রাক্-বৈপ্লবিক জীবনের পুনরুদ্ধার ঠিক সেই পরিমাণে স্বাভাবিক ঠেকে না। যেখানে সুনীলের এই অতীত অভিজ্ঞতাসমূহের সহিত অমিতের প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই, সেখানে তাহার স্মৃতিপথ বাহিয়া ইহাদের আবির্ভাবকে কিয়ৎ পরিমাণে কষ্ট-কল্পনা বলিয়া মনে হয়। এইসব স্থানে মাত্র দুই-একটি বিক্ষিপ্ত মন্তব্যের সাহায্যে একের খোলে অন্যের শাঁস অনুপ্রবিষ্ট করাইবার দুর্বল চেষ্টা করা হইয়াছে। সুর বা সুধীরাকে যে কেবলমাত্র গৌণ উল্লেখের দ্বারা আমাদের নিকট পরিচিত করা হইয়াছে, তাহা হয়ত বেমানান না হইতে পারে; কিন্তু ইন্দ্রাণীর প্রভাব এত প্রখর যে তাহাকে সম্পূর্ণ অন্তরাল-বর্তিনী করাতে আমরা ঠিক সন্তুষ্ট হইতে পারি না। অন্ততঃ গ্রন্থমধ্যে ইন্দ্রাণীর স্থান যে ললিতা বা সবিতা অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ হইতে পারে না; কিন্তু তথাপি শেষোক্ত রমণীদ্বয় আমাদের নিকট যত জীবন্ত, ইন্দ্রাণী সেরূপ নহে। তাহার বিপ্লববাদ রূপগৌরবের মত একটা বিলাস-ব্যসন, ময়ূরের সপ্তবর্ণ পেখমের মত মেলিয়া ধরিবার বস্তু—ঠিক দুরূহ জীবনব্রত বা সাধনা নহে। ইহাই তাহার বৈপ্লবিকতার বৈশিষ্ট্য, কিন্তু তাহার সমস্ত প্রকৃতিটি সম্যকভাবে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। এইরূপ দুই একটি ক্ষুদ্র অসংগতি সত্ত্বেও উপন্যাসটির শ্রেষ্ঠত্ব, ইহার আবেদনের তীক্ষ্ণতা অনস্বীকার্য। বৈপ্লবিক মনোভাবের বিশ্লেষণে ও ইহার অসহনীয় অন্তর্জ্বালা ফুটাইয়া তোলার অসাধারণ ক্ষমতায় ইহা এই জাতীয় উপন্যাসের শীর্ষস্থানীয়।

ইহার দ্বিতীয় খণ্ড—'আর এক দিন'-এ বৈপ্লবিক জীবনের পরবর্তী অধ্যায়, সক্রিয় সন্ত্রাসবাদের অবসানে সাধারণ জীবনযাত্রার অনুবর্তন-প্রয়াস বর্ণিত হইয়াছে। দীর্ঘ কারাবাসের পর যখন বিপ্লবী মুক্তি পায় ও বৈপ্লবিক কর্মপন্থার উন্মাদনা তাহার প্রৌঢ় জীবন হইতে নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন তাহার দেহে মনে যে অদ্ভুত রূপান্তর ঘটে তাহাই এই দ্বিতীয় খণ্ডের বর্ণনীয় বস্তু। এই পরিবর্তিত অবস্থায়ও সে ঠিক সাধারণ প্রতিবেশের সহিত একটা সুস্থ সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে না। যে উন্মত্ত প্রেরণা তাহাকে সন্ত্রাসবাদের বিভীষিকার দিকে অনিবার্যভাবে ঠেলিয়া দিয়াছিল তাহা কর্মের সোজা পথে মুক্তি না পাইয়া চিন্তা ও মননের মধ্যে জটিলতা-জাল রচনা করিতে থাকে, মনের অন্ধ গহ্বরে আত্মকেন্দ্রিক আবর্তনের মধ্যে নিঃশেষিত হয়। আগুনের দিকে তাকাইয়া যাহার চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছে সে সাধারণ জীবনযাত্রার সহজ গতি-ছন্দটি অনুভব করিতে পারে না। নিঃশেষিত আগ্নেয়গিরির চারিদিকে অঙ্গার-স্তূপের ন্যায়, তাহার নির্বাপিত-বহ্নি জীবনকে ঘিরিয়া এক ম্লান-উদাস, সর্বদা-বিশ্লেষণ-তৎপর, জীবনাবেগশূন্য দার্শনিকতার বালুকা-বলয় পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। জীবন-নদীর তীরে দাঁড়াইয়া সে ঢেউ গোনে, তাহার বেগবান প্রবাহে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহে না। প্রখর মধ্যাহ্ন দীপ্তিকে এড়াইয়া সে ম্লান অপরাহ্ণ-স্বপ্নের অলস কল্পনাজাল বুনিতে থাকে। হয়ত সে আমাদিগকে তাহার পরিণত জীবন-দর্শনটি উপহার দেয়, কিন্তু বর্তমানের ঘটমান জীবন তাহার নিকট কোন নূতন প্রেরণা, কোন অপ্রত্যাশিত স্রোতোবেগ

আহরণ করে না। ভূতপূর্ব বৈপ্লবিক তাহার অতীত জীবনের অগ্নিময় অভিজ্ঞতার স্মৃতি-অন্তরালে বর্তমানের প্রতি একটা সুদূর নির্লিপ্ত মনোভাব পোষণ করে—সে হয়ত নিজের অজ্ঞাতসারে প্রগতিশীল না হইয়া অতীত-পন্থী হইয়া পড়ে। উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে বৈপ্লবিকতার এই নিরুত্তাপ, আত্মমগ্ন পশ্চাৎ-পরিণতিই অঙ্কিত হইয়াছে—ইহাতে প্রচুর জীবন-সমালোচনা ও মননশীলতার পরিচয় আছে—জীবনের কলোচ্ছ্বাস নাই।

(৩)

বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের প্রসার যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এই দাবী সহজেই করা যায়। ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথের হাতে যৌবনের পরিপূর্ণ, নিটোল সৌন্দর্য লাভ করিয়াছিল—প্রৌঢ় জীবনের সমস্যা-সঙ্কুলতাও তাঁহারই প্রবর্তন। শরৎচন্দ্রের প্রতিভা ঠিক ছোট গল্পের উপযোগী ছিল না ; কিন্তু অতি-আধুনিক ঔপন্যাসিকগণ ইহাতে সৃষ্টির মৌলিকতা ও দৃষ্টি-ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। সীতা ও শান্তা দেবীর কয়েকটি রচনা, অচিন্ত্যকুমারের 'অকাল বসন্ত', তারাশঙ্করের 'জলসা ঘর', ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পুতুল ও প্রতিমা', 'মৃত্তিকা' ও 'ধূলিধূসর' অগ্রগতির নিশ্চিত নিদর্শনরূপ উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সুবোধ ঘোষের দুইখানি গল্প-সংগ্রহ-গ্রন্থ—'ফসিল' (১৯৪১) ও 'পরশুরামের কুঠার' ইহার আর্টকে নূতনভাবে রূপায়িত করিয়াছে। পরিকল্পনার মৌলিকতা ও আলোচনার বিস্ময়কর বৈচিত্র্য—ছোটগল্পের এই উভয়বিধ উৎকর্ষই গ্রন্থ দুইখানির মধ্যে প্রচুরভাবে বিদ্যমান। ছোটগল্প-লেখকের আবিষ্কারকের চক্ষু থাকা চাই—তিনি জীবনের এমন সমস্ত খণ্ডাংশ নির্বাচন করিবেন যাহারা সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়, যাহারা যুগপৎ অপ্রত্যাশিত ও রস-সমৃদ্ধ। সুবোধ ঘোষের প্রত্যেক গল্পের উপরই এই অসাধারণত্বের ছাপ লক্ষিত হয়—ভূগর্ভে প্রোথিত খনিজ সম্পদের ন্যায় তিনি মানবমনের অনেক গোপন, রহস্যাবৃত স্তর, জীবন-সংঘটনের অনেক বিচিত্র, অভিনব রেখাচিত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। জীবনের বিরল-পথিক সীমান্ত-প্রদেশ হইতে তিনি কত না মৃদুসৌরভ-পূর্ণ বন্য ফুল চয়ন করিয়াছেন।

মাতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুক, ও সেই অপরাধের অমোঘ শাস্তিস্বরূপ অপরিচিত সন্তানের কামনার বিষয়ীভূতা, অতিক্রান্ত—যৌবনা রূপজীবিনীর অনির্বাণ লালসা (পরশুরামের কুঠার) ; ভগ্নস্তূপে পরিণত মন্দির ও দেবমূর্তির সহিত প্রায় একাঙ্গীভূত, অতীত গৌরবের স্বপ্নে বিভোর ও অতীত আদর্শের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাশীল পিতার সহিত আধুনিক মনোভাবাপন্ন পুত্রের সংঘর্ষ (ন তস্থৌ) ; অভ্রের খনির ওভারম্যান যুবকের জীবনে ইরানী যাযাবরী ও খনির তিমির গর্ভের প্রস্তর-কঠিন লাবণ্যের প্রতীক কুলি রমণীর দ্বৈত আহ্বান—প্রথমটি যেন দিগন্তলীন রঙের মায়া-মরীচিকা, দ্বিতীয়টি পাতালপুরীর মৃত্যুগহন আকর্ষণ (উচলে চড়িনু) ; পাগলা সাহেবের বাঙালী সমাজের ভদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতর স্তরের সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার খেয়ালে অদ্ভুত ক্রমাবরোহণ-প্রবৃত্তি (শক থেরাপী) ; মোটর-চালকের নিজ পুরাতন কুদর্শন ট্যাক্সির উপর আশ্চর্য মমত্ববোধ (অযান্ত্রিক) ; ফাঁসির আসামীর মৃতদেহের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের অনিবার্য উচ্ছ্বাসে জেলের সিপাহীর নিয়মভঙ্গ—তাহার সুদৃঢ়, যন্ত্রবদ্ধ নিয়মানুবর্তিতার দুর্গে ফাটল ধরা (দণ্ডমুণ্ড) ; পারিবারিক জীবনের প্রচ্ছন্ন

অর্থনৈতিক ভিত্তির আবিষ্কারের ফলে, মোহভঙ্গে নির্মম এক ভদ্র শিক্ষিত যুবকের চরিত্রভ্রংশ ও বিশ্বাসঘাতকতা (গোত্রান্তর)—এই সার-সংকলন হইতে তাঁহার বিষয়-বৈচিত্র্যের ধারণা করা যায়।

কিন্তু বিষয়-বৈচিত্র্য অপেক্ষা পটভূমিকা-রচনায় লেখক উচ্চতর কৃতিত্বের অধিকারী। কোন বিশেষ ঘটনা-পরিস্থিতি বা অন্তরের সূক্ষ্ম, অলক্ষ্যপ্রায় আবেগ ফুটাইয়া তুলিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার সংক্ষিপ্ত, ব্যঞ্জনাগূঢ় বাক্যাবলী তীক্ষ্ণধার বর্ষা-ফলকের মত বর্ণিত বিষয়ের মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া তাহার অন্তরতম রূপটি উদ্‌ঘাটিত করে। স্বল্প কয়েকটি সুনির্বাচিত রেখায়, অর্থ-ভূয়িষ্ঠ সামান্য কয়েকটি মন্তব্যে পাঠকের সম্মুখে এক বর্ণোজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠে, এক অসীম সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। এই atmosphere বা অন্তর-প্রতিবেশ-রচনায় লেখক অসাধারণ শিল্প-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। 'পরশুরামের কুঠার'-এর 'ন তস্থৌ' গল্পে ভগ্নস্তূপে পরিণত সুপ্রাচীন বিষ্ণুমন্দির, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, বিকলাঙ্গ দেবমূর্তি ও "জরাজীর্ণ, শ্রীহীন কল্যাণঘাট মৌজার" বর্ণনা যে রসঘন, আবেশময় পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আমাদের মনকে ভৌতিক রোমাঞ্চের মত অধিকার করিয়া বসে। এই মোহময় পরিবেষ্টন অনুভূতির তীব্রতায় ও প্রকাশভঙ্গীর অনবদ্য, ব্যঞ্জনাপূর্ণ সৌন্দর্যে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর সহিত তুলিত হইবার অযোগ্য নহে। এক অস্তমান জ্যোৎস্না রজনীর শেষ যামে, ক্ষীণ, তামাটে চন্দ্রালোকে অবিশ্বাসী, বিরুদ্ধভাবাপন্ন সোমনাথের মনেও এই মৃত্যু-কবলিত দেবমন্দির ইহার প্রভাবের যাদু বিস্তার করিয়াছে। কল্যাণঘাটের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার গতিচ্ছন্দও যেন এই মন্দিরের সুরে বাঁধা—আধুনিকতার সমস্ত বিক্ষেপ ও চাঞ্চল্য যেন এক প্রস্তর-ঘন ঔদাস্য ও নিশ্চলতায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এখানে পাত্রীনির্বাচন হয় কাব্য-নাটকের নায়িকা বা শাস্ত্রবর্ণিত দেবী-মূর্তির লক্ষণের সহিত মিলাইয়া—এখানে চিকিৎসা চলে আধ্যাত্মিকতায় মোড়া ব্যবসায়-বুদ্ধির সাহায্যে, কেননা কবিরাজ পারিশ্রমিক হিসাবে টাকা পয়সা লন না, লন সাত্ত্বিক দানের অন্তর্ভুক্ত রৌপ্য ও তাম্রখণ্ড। এখানে স্নেহব্যাকুল পিতা মনে করেন যে, সুলক্ষণা কন্যার সহিত বিবাহ-বন্ধনে বাঁধিতে পারিলে পুত্রের বিমুখ, বিদ্রোহী চিত্তকে প্রাচীন সংস্কৃতি ও জীবনাদর্শের আশ্রয়ে স্থির করা যাইবে। এখানে আধুনিক তরুণীর চোখে হাসির আভা যেন সর্বনাশের বিদ্যুৎ-ঝলকের ন্যায় বিস্ময়-বিমূঢ় চিত্তকে নামহীন আতঙ্কে শিহরিত করে। গল্পের সর্বত্রই এই আশ্চর্য ভাব-সমন্বয়ের নিদর্শন।

'গরল অমিয় ভেল' গল্পে মানবপ্রকৃতির একটি বিচিত্র উচ্ছ্বাসের আলোচনা হইয়াছে। মালা বিশ্বাসের যৌবনের শুভলগ্ন বহিয়া গিয়াছে, রূপমুগ্ধ নয়নের সপ্রশংস অর্ঘ্য-আহরণের দীর্ঘ-দিন-ব্যাপী চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, রূপহীনাকে আড়াল করিয়া বিস্মৃতি ও উপেক্ষার যবনিকা নামিয়া আসিয়াছে; সজ্জাসমারোহ ও আত্মপ্রচার প্রতিহত হইয়া আত্মগ্লানির উপাদান যোগাইয়াছে। এমন সময়ে এক অচিন্তনীয় সুযোগ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। সহরের এক অনামিক কুৎসা-রটনাকারী কয়েকটি তরুণীর প্রণয়-ইতিহাসের গ্লানিকর অধ্যায়-গুলির উপর অভ্রান্ত ইঙ্গিত ও নিপুণ বক্রোক্তির দ্বারা এক ঝলক সন্ধানী আলোকপাত করিয়াছে। যে তরুণীরা এই আক্রমণের লক্ষ্য তাহাদের মনে কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হইয়াছে—এক অভিনব পুলক-হিল্লোলে অভিষিক্ত হইয়া তাহাদের ম্লান,

মুমূর্ষু যৌবন আবার যেন নবজীবন লাভ করিয়াছে। এই দৃশ্য বঞ্চিতা মালার মনে ক্ষোভের দীর্ঘশ্বাসের সহিত নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছে। সে নিজের নামেই এক কুৎসালিপি রচনা করিয়া তাহার সম্বন্ধে ক্ষীয়মান আগ্রহকে আবার জাগাইতে চাহিয়াছে—এই নবজাগ্রত কৌতূহলের অনুকূল বাতাসে নিজ অবসন্ন, ধূলি-মলিন যৌবনের বিজয়-পতাকা উড়াইবার শেষ চেষ্টা করিয়াছে। নীতিবাগীশ চৌধুরী মহাশয়ের জীবনে অবরুদ্ধ যৌন-ক্ষুধার কোন ইঙ্গিত না থাকাতে, তাঁহাকেই এই কুৎসালিপির রচয়িতারূপে নির্দেশ আমাদের মনে অবিশ্বাসের চমক জাগায়।

'কর্ণফুলীর ডাক' আর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। বর্তমান মহাযুদ্ধের আবর্তে দেশব্যাপী উদ্‌ভ্রান্তি ও বিহ্বলতা ও একটি ক্ষুদ্র, দরিদ্র সংসারে ভাঙন ইহার বর্ণনীয় বিষয়। গল্পের নায়ক ইতিহাসের টান তাহার রক্তের মধ্যে একটু বিচিত্রভাবে অনুভব করিয়াছে। সে ইতিহাসের কঠোর বস্তুতন্ত্রতা ও অমোঘ নিয়মানুগতার পরিবর্তে গ্রহণ করিয়াছে ইহার উষ্ণ ধাতুস্রাবের ন্যায় বিগলিত হৃদয়াবেগ। মহাযুদ্ধের সমুদ্রমন্থনে যে অমৃত-গরল ফেনায়িত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই দিয়া সে হৃদয়ের পানপাত্র পূর্ণ করিয়া লইয়াছে। চট্টগ্রামের অখ্যাত পল্লীতে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ-চেষ্টায় প্রাণবিসর্জনের সংকল্প ঠিক ঐতিহাসিক যুক্তিবাদের অনুবর্তন নহে; ইহা ভাবাবেগমত্ততার রঙ্গিন নেশা। লেখক ইতিহাসের বিবর্তন ধারার যে আশ্চর্য রূপ-ব্যঞ্জনা, বহির্ঘটনার অন্তরালে ইহার অন্তরলীলার যে আভাস দিয়াছেন, তাহা ঠিক এই আত্মোৎসর্গপ্রবণতার দিব্যোন্মাদের সহিত খাপ খায়। জড় হইতে জীব, চেতনা হইতে সৌন্দর্য ও মহিমা, নিয়তি-পারতন্ত্র্য হইতে আত্মনিয়ন্ত্রণের যে ঊর্ধ্বমুখী অভিযান মানব-ইতিহাসের মেরুদণ্ডস্বরূপ তাহাকে ঋজু ও লক্ষ্যে স্থির রাখিয়াছে, লেখক সেই নিগূঢ় রহস্যকে নিম্নলিখিতরূপ ভাষার ইন্দ্রজালে বন্দী করিয়াছেন।

"সে ইতিহাসের মানুষ। যে মানুষের মনের বনের শাখায় পৃথিবীর সুখ-দুঃখের পাখীর দল কলরব করে ফেরে। প্রতিমুহূর্তের সংগ্রামে সুন্দর এই পৃথিবীর রূপের বালাই নিয়ে সে এক এক সময় মুগ্ধ হয়ে যায়। যে দ্বন্দ্বের মহিমায় হিমগিরি আকাশ ছুঁয়েছে, ধানের ক্ষেত হয়েছে সবুজ, চেতনার রঙে রাঙা হ'য়ে উঠলো মানুষ। যে পরিবর্তনের স্রোতে পদার্থ গলে গিয়ে হলো প্রবৃত্তি—সুখের হাসি, বিরহের বেদনা। মানুষ যেখানে স্বয়ং বিধাতা হয়ে আপন পরিণাম গড়ে তোলে আপন হাতে।" শুষ্ক ঘটনার শৈবালদলের আবরণের অন্তরালে ইতিহাসের রক্তিম, দলের পর দলে, বর্ণে-গন্ধে বিকাশমান, হৃৎপদ্মের কি অপরূপ উদ্‌ঘাটন!

বোমা পড়িবার সম্ভাবনায় আমাদের মূঢ়, সংক্রামক আতঙ্কের হাস্যকর অসংগতি ও বাতিকগ্রস্ত বিশৃঙ্খলা—কাণ্ডজ্ঞানহীন পলায়নের সমস্ত বীভৎসতা লেখক একটি ধারালো মন্তব্যের খোঁচায় নগ্নভাবে প্রকটিত করিয়াছেন। মহাযুদ্ধের গতি ও পরিণতির যে ছবি তিনি স্বল্প পরিসরের মধ্যে, কয়েকটি ব্যঞ্জনাগূঢ় শব্দপ্রয়োগে আঁকিয়াছেন তাহা সাধারণ লেখকের বহুভাষিতা ও অস্পষ্ট ধূম্রজালরচনার মধ্যে আপনার তীক্ষ্ণ বৈশিষ্ট্যে সূর্যালোকস্পৃষ্ট গিরিশৃঙ্গের মতই উজ্জ্বল ও লক্ষণীয় হইয়া থাকে। এই মহাসংগ্রামের অন্তর্নিহিত সত্য, রাজনৈতিক আদর্শবাদের পার্থক্যের অজুহাতে যাহারা অস্বীকার করিতে চাহে, তাহাদের বিভ্রান্তি, উটপাখির চোখ-বোজা আত্মপ্রতারণা, লেখক কত সহজে ও অল্প কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন!

প্রবাসী গ্রামের ছেলের প্রতি গ্রামবৃদ্ধদের সাগ্রহ আমন্ত্রণ-জ্ঞাপনের মধ্যে তাঁহার ইতিহাস-পুষ্ট কল্পনা মানব-সমাজের প্রাথমিক যুগের গোষ্ঠী-প্রীতির প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছে। গল্পের সর্বত্র বলিষ্ঠ মনন-শক্তি ও সূক্ষ্মদর্শী কল্পনার ছাপ সুপরিস্ফুট।

'উচলে চড়িনু' গল্প হিসাবে একেবারে অনবদ্য নহে। দিনেশের জীবনে বিরোধী আকর্ষণের মধ্যে ঠিক ভারসাম্য রক্ষিত হয় নাই। বিলাসীর অনায়াস-লব্ধ, নানা সুখদুঃখে পরীক্ষিত কিন্তু অনেকটা অনিচ্ছার সহিত স্বীকৃত ভালবাসা উহার মদিরতা ও তীক্ষ্ণ স্বাদ হারাইয়াছে। যাযাবরীর প্রেম অপ্রত্যাশিত, অসাধারণ ও পৌরুষ-ধর্মের উত্তেজক বলিয়াই, লোলুপতা জাগাইয়াছে। কাজেই এই শেষোক্ত মরীচিকাকে করায়ত্ত করার প্রয়োজনে বিলাসীর প্রাণ পর্যন্ত জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত অনাদরে, অবহেলায় আবর্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ঘরের গাভীকে কসাইএর হাতে সঁপিয়া দিয়া মায়ামৃগীকে ধরিবার জন্য সোনার ফাঁদ পাতা হইয়াছে। এইরূপ সর্বস্বপণ জুয়াখেলার যাহা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তাহাই ঘটিয়াছে—বন্য হরিণী স্বর্ণজাল সমেত উধাও হইয়াছে। লেখকের বিরুদ্ধে পাঠকের অভিযোগের প্রধান কারণ এই যে, বিলাসীকে কখনও যাযাবরীর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিনী রূপে দেখান হয় নাই, দিনেশ কখনও তাহার প্রতি কোন সত্যকার টান অনুভব করে নাই। সে ভাগ্যের প্রতি গাত্রজ্বালা প্রশমনের জন্যই মাঝে মধ্যে এই অন্ত্যজ প্রেমকে বুকে টানিয়াছে—কিন্তু পাতালপুরীর হৃদয়দৌর্বল্য মর্ত্যের আলোকে লজ্জিত হইয়াছে। এই ভারসাম্যের অভাবে গল্পটির রস পূর্ণভাবে জমাট বাঁধে নাই।

এই ত্রুটি সত্ত্বেও গল্পটিতে লেখকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও প্রকাশনৈপুণ্যের নিদর্শন প্রচুরভাবে বিক্ষিপ্ত আছে। অভ্রখনির অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথের বাহিরের রূপ ও অন্তরের প্রেরণা সমান কৌশলের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। সেখানে ব্যবসায়ীর নখরাঘাত, জীবনের আদিম ইঙ্গিত, প্রেমের আবেগ-রক্তিমা সবই আপন আপন স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়াছে। আবার ইরাণী যাযাবরীর জীবনযাত্রার রহস্য চঞ্চলতা ও নীড়-বিধ্বংসী, অফুরন্ত গতিবেগ লেখকের ভাষার মধ্যে ধৃত ও ধ্বনিত হইয়াছে। "কেমন এই পথিক মানুষের দল, মেরুমরালের পাখার মত পথের প্রেমে যাহাদের স্নায়ু-শিরা সতত চঞ্চল।···ভাষা, গান, উৎসব সবই পথ থেকে কুড়িয়ে নেয়। যেখানে পায় তুলে নেয় নতুন পাপপুণ্য, নতুন রক্ত, নতুন ব্যাধি। দিনেশের জানতে ইচ্ছে হয়, ওরা কাঁদতে জানে কি না। না শুধু হাসির ফুৎকারে জীবন উড়িয়ে নিয়ে যায় আয়ুর সীমানায়?"

'তমসাবৃতা' গল্পে ধূলগড়া গ্রামে আকস্মিক দারিদ্র্য যে রুক্ষ শ্রীহীনতা বিস্তার করিয়াছে তাহার পটভূমিকায় তাঁতীর ছেলে মোহনবাঁশি ও বাউড়ীর মেয়ে জবার অসামাজিক প্রণয়ের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। জবার মনে তাহার পূর্বস্বামী দয়ারামের সংসর্গে আহৃত বেশভূষার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে আভিজাত্যবোধ বিবস্ত্রপ্রায় কোন বাউড়ী যুবকের সঙ্গে তাহার ঘর বাঁধার পক্ষে প্রবল অন্তরায় ও সুবেশ মোহনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের হেতু হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাহার এই প্রসাধন-মোহ তাহার জাতীয় সংস্কারকে হঠাইয়া তাহাকে মোহনের নিকট আত্মসমর্পণে উৎসুক করিয়াছে। কিন্তু পর মুহূর্তেই রক্তের দুরতিক্রম্য টান তাহাকে তাহার বিবস্ত্রা স্বজাতীয়াদের দলে মিশিয়া, নৈশ অন্ধকারের লজ্জাহারী যবনিকার আশ্রয়ে মাঠে কাজ করিতে পাঠাইয়াছে। জবার ব্যক্তিগত সমস্যা অপেক্ষা গ্রামের সমষ্টিগত দুর্দশার চিত্রটিই অধিকতর মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। চড়া দামে সঞ্চিত শস্য-বিক্রয়ের মূঢ় অবিবেচনা দুঃসহ

গ্লানিরূপে সমস্ত গ্রামের বক্ষে পুঞ্জীভূত হইয়াছে—উহার স্বাচ্ছন্দ্যের আশা, মুমূর্ষু শিল্পসত্তার পুনরুজ্জীবনের কল্পনা দূরে সরিয়া গিয়াছে "বেলাশেষের ছায়ার মত"। এই নিঃস্বতার ঘ্রাণ দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়া নানা বিচিত্র প্রকারের শোষণশক্তিকে আকৃষ্ট করিয়াছে—মৃতপশুর মাংসলুব্ধ শকুনি-পালের ন্যায়। এই শোষকগোষ্ঠী যে প্রলোভনের নাগপাশ ছড়াইয়াছে তাহাতে বন্দী হইয়াছে শুধু বর্তমান নহে, ভবিষ্যৎ, শুধু, মজুদ সম্পত্তি নহে, অনাগত শস্য-সম্পদের সম্ভাবনা পর্যন্ত। তাহাদেব উৎসবেব ছদ্মসজ্জার পিছনে আছে অভাবের শীর্ণ কঙ্কাল, সন্ত্রস্ত হাসির পিছনে, ঠেকাইতে-না-পারা দুর্ভাবনার প্রতিচ্ছায়া। "চারিদিকের বাসি ও বিবর্ণ ফুল, শুকনো পাতা আর রুক্ষ মাটির সঙ্গে ওরা ছন্দে ছন্দে মিলে গেছে।" এই দুর্দশার নিম্নতম গহ্বব হইতে সৃষ্টিবিপর্যয়ের প্রলয়-নাগিনীব মত বাহির হইয়াছে "বিবসনা মৃত্তিকা-বধূর দল", বহুসহস্র বৎসরেব সভ্যতার আবরণ যাহাদের অঙ্গ হইতে জীর্ণপত্রের ন্যায় স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা বিদ্রোহ করে নাই, বিদ্রোহ ইহাদের ধাতে নাই—বোধ হয় যেন, বসুমতীর অঞ্চলতলেই ইহারা শেষ আশ্রযেব জন্য প্রতীক্ষমানা। রিক্ততার এমন করুণ ও গ্লানিকর চিত্র বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে বিরল।

পূর্ববর্তী রচনা 'ফসিলের' সহিত তুলনায় 'পরশুবামেব কুঠার'-এ লেখকের শক্তি আরও পবিণত, গল্পের পবিকল্পনায়, মননশক্তি ও সার্থক ব্যঞ্জনায় সর্বত্রই ক্রমোন্নতির নিদর্শন পরিস্ফুট। কিন্তু 'ফসিল'-এও এই সমস্ত গুণেব যথেষ্ট পবিচয় মিলে। অতি সাধারণ বিষয়ে পূর্ণ রসের উদ্বোধনে ছোটগল্পের যে উৎকর্ষ তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত 'অযান্ত্রিক'। অর্ধসচেতন যন্ত্র ও তাহাব চালকের মধ্যে যে একটা মধুব, মান-অভিমান-মিশ্র, স্নেহে উদ্বেল, নিষ্ঠায় অবিচল, হতাশায় হিংস্র হৃদয়-সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহা দেখাইয়া লেখক যেন আমাদেব অনুভূতির একটা নূতন স্তর খুলিযা দিয়াছেন। বোধ হয বিশুদ্ধ গল্প হিসাবে এইটি সমুদয় সংগ্রহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। 'ফসিল' গল্পটিতে অঞ্জনগড় নেটিভ ষ্টেটের শাসন-সমস্যার জটিলতা কয়েকটি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত ও সুনির্বাচিত তথ্যের সাহায্যে স্ফটিক-স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণহীন, স্তিমিত সমারোহ, প্রজাব ভাল মন্দ সর্ব বিষয়েই রাজশক্তির যথেচ্ছাচার-প্রবণতা, একদিকে নামমাত্র রাজার অভ্রভেদী আত্মগরিমাবোধ, অন্যদিকে ইউরোপীয় বণিকসংঘের কূট ষড়যন্ত্রজাল ও ইহাদের অঙ্গুলিসংকেতে মূঢ় প্রজাসাধারণের বিদ্রোহোন্মুখতা—এই সমস্ত বিপরীত তরঙ্গের মাঝে মুখার্জির আদর্শবাদ ও উদারনীতির বানচাল, রাজা ও বণিক-সংঘের মধ্যে চিরন্তন বিরোধ ও সাময়িক স্বার্থসাম্যের প্রয়োজনে সহযোগিতা, রাজশক্তির গুলিতে ও ব্যবসায়ীর অব্যবস্থায়, খনির তিমির গর্ভে রক্তাক্ত মৃত ও নিঃশ্বাসবায়ুরুদ্ধ জীবিতের একত্র সমাধি—এই সমস্ত মিলিয়া দেশীয় রাজ্যের শাসনতন্ত্র ও জীবনযাত্রার এক আশ্চর্য উজ্জ্বল ও তথ্যবহুল চিত্র আমাদের সম্মুখে রূপায়িত হয়। 'দণ্ডমুণ্ড'-এ আছে অনুকুল সিপাহীর নৈশ পাহারার অপূর্ব বর্ণনা, যেখানে অজ্ঞাত সম্ভাবনার শিহরণে রাত্রি রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, আঁধারের সহিত মনের কল্পনা মিশিয়া ক্ষণিক ভ্রান্তির ছায়ালোক সৃষ্টি করে, যেখানে দিনের লৌহ-কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলা মুহূর্তের আত্মবিস্মৃতিতে কল্পনা-বিলাসের কুজ্ঝটিকায় বিলীন হয়। 'সুন্দরং' গল্পে সৌন্দর্য সম্বন্ধে ময়না-ঘরের শব-ব্যবচ্ছেদের ভিত্তিতে গঠিত এক নূতন আদর্শ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বহিরাবরণের ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া দেহান্তঃপুরের নাড়ী-শিরা-ধমনীর

জটিল জাল-বেষ্টনীর মধ্য দিয়া, অস্থি-মজ্জা-বিন্যাসের আশ্রয়ে দৈহিক রূপের এক অভিনব মূর্তি প্রকটিত হয়, যাহা মানবের স্থূল, অনভ্যস্ত দৃষ্টির নিকট এখনও অনমুভূত। সৌন্দর্য সম্বন্ধে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে, সূক্ষ্মরুচি সুকুমারের কদর্যদর্শন ভিখারীর মেয়ের প্রতি আকর্ষণ লেখকের অপ্রত্যাশিত, চমকপ্রদ পরিণতি সৃষ্টি করিবার অদ্ভুত নৈপুণ্যের পরিচয়। 'গোত্রান্তর'-এ শিক্ষিত বেকার ভদ্র যুবক সঞ্জয় বুঝিয়াছে যে, পারিবারিক সম্পর্কের স্নেহ-প্রীতিভক্তি প্রভৃতি আপাতঃ-নিঃস্বার্থ সদ্‌গুণসমূহ প্রকৃতপক্ষে ছদ্মবেশী ব্যবসায়-বুদ্ধি; কাজেই এগুলির মূলোচ্ছেদ করিয়া জীবনকে খাঁটি স্বার্থপরতার নীতিতে চালাইতে হইবে। ইহারই ক্রমপরিণতি মিলে চাকরী-গ্রহণ, পুরাকালের বর্বর ডাইন ও ডাইনীর প্রতীক নেমিয়ার ও রুক্মিণীর সঙ্গে কলঙ্কিত সহযোগিতা, মিলে ধর্মঘট বাধাইয়া প্রভুর প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টা, ক্যাশের চাবি চুরিতে দুর্বল সম্মতি ও শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা নিজ পাতালমুখী সাধনায় সিদ্ধিলাভ। গল্পটির ঘটনা-বিন্যাস খুব সুনিপুণ নহে—মিলের আবহাওয়া-রচনার মধ্যে অনেক ফাঁক রহিয়া গিয়াছে, কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তা ও ফাঁকিতে ভুলিবার প্রবৃত্তি বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করে—সঞ্জয়ের ব্যবহারও ঠিক অভিনয়কৌশলের আদর্শ বলিয়া অভিনন্দনযোগ্য নহে। তথাপি রচনা-নৈপুণ্য, মন্তব্যের তীক্ষ্ণ যৌক্তিকতা ও যাথার্থ্য ও স্থানে স্থানে সাংকেতিকতার সুষ্ঠু প্রয়োগ গল্পটিকে উপভোগ্য করিয়াছে। গল্পের শেষ কয়টা ছত্র এই আভাস-নৈপুণ্যের সুন্দর উদাহরণ—সঞ্জয়ের ধূর্ত জম্বুকবৃত্তির উপর এক ঝলক সন্ধানী-আলোর নিক্ষেপ।

গল্পসংগ্রহগুলির ছোটখাট ত্রুটির আভাস পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের আঙ্গিক সব সময় নিখুঁত হয় নাই। অনেকগুলি গল্পের রসধারা শাখা-পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, সকলে মিশিয়া মূল প্রবাহকে পুষ্ট ও স্রোতোবেগপূর্ণ করে নাই। আকস্মিকতার রেখাগুলি সর্বদা কেন্দ্রাভিমুখী হয় নাই। 'ফসিল' গল্পটির নামকরণ ঠিক সার্থক মনে হয় না। কেননা মূল বিষয়ের সহিত ভূগর্ভ-সমাহিত মৃতদেহগুলির ফসিলে পরিণতির যোগসূত্র অতি সামান্য। 'দণ্ডমুণ্ড'-এ অনুকূলের অতর্কিত পরিবর্তনে সামঞ্জস্যহীনতার নিদর্শন সম্পূর্ণ গোপন করা যায় না। 'গোত্রান্তর' ও 'উচলে চড়িনু' গল্পদ্বয়ে ঘটনা-বিন্যাসের ত্রুটির কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 'তমঃাবৃতায়' জবার চলচ্চিত্ততার সঙ্গে গ্রামের শীর্ণ, দারিদ্র্য-পিষ্ট রিক্ততার যোগ খুব নিবিড় হইয়া উঠে নাই। 'পরশুরামের কুঠার'-এও ধনিয়ার জীবনসমস্যা যোগসূত্রহীন তথ্যের বাহুল্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে—তাহার শেষ জীবনের অস্বাভাবিক পরিণতির দিকে এই নিঃসম্পর্ক ঘটনাগুলি একযোগে অঙ্গুলি-সংকেত করে নাই। মাতৃত্বের কর্তব্যের প্রতি অবহেলা করিয়া সে যে সম্ভাব্য সন্তানেরই কামোপভোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একদল মাতৃহন্তা পরশুরামেরই সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা তাহার জীবনের চরম ট্র্যাজেডি নয়, একটা গৌণ অসুবিধা মাত্র। সে যেমন সন্তান-পরিত্যাগেও উদাসীন, তেমনি সন্তানের লোলুপ বাহুবিস্তারেও অবিচল রহিয়াছে। এই ঘৃণিত সম্ভাবনার ন্যক্কারজনক শিহরণ ধনিয়ার মন হইতে পাঠকের মনে সংক্রামিত হয় নাই—লেখক যেন গল্পের একেবারে উপসংহারে খিড়কির দরজা দিয়া ইহাকে প্রবেশ করাইয়াছেন।

'শুক্লাভিসার' (এপ্রিল, ১৯৪৪) গল্পসমষ্টিতে উপরি-উক্ত গুণ ও দোষের নূতন উদাহরণ মিলে। প্রতিবেশ-রচনায় অসামান্য নৈপুণ্য, দুই একটি সংক্ষিপ্ত, সাংকেতিকতায় তীক্ষ্ণ,

উক্তির সাহায্যে একটা বিশেষ পরিস্থিতির মর্মোদ্‌ঘাটন ও বিষয়ের চমকপ্রদ অসাধারণত্বের সঙ্গে, গঠনের শিথিল অসংলগ্নতা অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হইয়াছে। মনে হয় গল্পগুলির বিষয়বস্তু যেন প্রতিবেশের নিকট গৌণ হইয়া পড়িয়াছে—ইহারা যেন সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত ফ্রেমের মধ্যে আলগা, অস্পষ্ট পোঁচের ছবি। 'শুক্লাভিসার' গল্পে ত্রিপাঠী ও পুষ্করের মধ্যে দোদুলচিত্ত বরুত্রী পুষ্করের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া ত্রিপাঠীর উদার মহানুভবতার পক্ষপুটে গর্ভস্থ সন্তান সহ আশ্রয় পাইয়াছে। গল্পটি নানাবিধ সূক্ষ্ম, কিন্তু অসমাপ্ত ইঙ্গিতে পূর্ণ। ত্রিপাঠীর হৃদয়াবেগ-হীন হিতৈষণায় ও তাহার অন্তর-রহস্যের অপরিচয়ে বরুত্রীর মনে যে নীরব ক্ষোভ জাগিয়াছে তাহার নিবৃত্তি হইয়াছে ত্রিপাঠীর নিরুদ্ধ প্রেমের অনিবার্য প্রকাশে অথবা তাহার আত্মোৎ-সর্গের পূতকারী উচ্ছ্বাসে—তাহা অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। সেইরূপ বরুত্রীর প্রতি পুষ্করের আকর্ষণের মধ্যে অন্যান্য প্রদেশবাসীর সম্পর্কে বাঙালীর আত্মম্ভরি আভিজাত্য-গৌরব ও তাহার ভদ্র পরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রার প্রতি সনাতন পক্ষপাতিত্ব অনিশ্চয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। কাজেই বরুত্রী যখন আদর্শে সহযোগিতাকেই প্রেমের অবিচল ভিত্তিরূপে দাবী করিয়াছে, তখন পুষ্করের ভালোবাসা সেই পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া পিছাইয়া আসিয়াছে। 'একতীর্থা' গল্প এক বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রীর শিষ্যাবাৎসল্য ও সিনেমাপ্রীতির চমৎকার বর্ণনা। বীণা দিদিমণির বঞ্চিত, স্নেহবুভুক্ষু হৃদয় ভূতপূর্ব ছাত্রীদের সহিত একত্র ছায়াচিত্র দেখিয়া, প্রেক্ষাগৃহের অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে তাহাদের আচরণের সংগতি-অসংগতির নির্দেশ দিয়া, তাহাদের বিবাহিত জীবনের আনন্দ-ব্যর্থতার পরিমাপ করিয়া এক বিষাদমণ্ডিত তৃপ্তি খুঁজিয়াছে। 'বৈর-নির্য্যাতন'-এ বোমাবর্ষণের অভিযানে ব্রতী বাঙালী বৈমানিক দিলীপ দত্তর অন্তর্দ্বন্দ্ব অপেক্ষা ঊর্ধ্ব-ব্যোমবিহারী তাহার চোখে পৃথিবীর যে অনভ্যস্ত, বিচিত্র-পরিবর্তনশীল রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহারই উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় তাহার দৃঢ়সংকল্পে শিথিলতা আসিয়াছে অহিংসা-নীতি-পরায়ণা শোভার প্রভাবে নহে, রসিদ খলিপার মামাবাড়ির প্রতি মমতায়। ডোরার সোৎসাহ সমর্থন ও শোভার তীব্র বিরোধিতা অপেক্ষা বাল্যস্মৃতির এক অতর্কিত উদ্বোধন তাহার জীবনে কেন অধিক কার্যকরী হইল তাহার রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। 'নতুন শালিক' গল্পে কাঁকুলিয়ায় শহর-পাড়াগাঁয়ের দ্বন্দ্ব মানুষের হৃদয়ে সংক্রামিত হইয়া ধনী-দরিদ্রের বিরোধে এবং সুধা ও মীর্ণার খাঁটি ও মেকী আন্তর্জাতিকতার সংঘর্ষে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। পশুজগৎকে উপলক্ষ্য করিয়া অন্তরের এই প্রচ্ছন্ন বিমুখতা বিস্ফোরকের ন্যায় সশব্দে ফাটিয়া পড়িয়াছে। 'ভাট-তিলক রায়' গল্পটি অপূর্ব মৌলিকতায় সমুজ্জ্বল। পুরাকালের স্মৃতির আধার ভাট তিলক রায় আধুনিকতার এলোমেলো, কেন্দ্রভ্রষ্ট কর্মজটিলতার সম্মুখে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অতীতের চারণ আধুনিক যুগে কুলি-ধর্মঘটের প্ররোচকে পর্যবসিত হইয়াছে। যে যুগে রাজপুত্র হরিণীর প্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত হইত, মানুষের আদিম সত্তা সৌন্দর্যবোধের প্রথম পাপড়িতে বিকশিত হইত, ক্ষাত্রশক্তি কুটিল নীতির বর্ম উপেক্ষা করিয়া হেলায় আত্মপ্রাণ বিসর্জন দিত, তিলক রায় সেই যুগের আবহাওয়ায় মানুষ। বর্তমান যন্ত্র সভ্যতার যুগে তাহার অন্তরের সমস্ত কল্পনা-প্রবণতা ও সংস্কার এক অস্পষ্ট সন্দেহে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই দানবীয় যন্ত্রশক্তির সহিত কিছুদিন সহযোগিতার ব্যর্থ চেষ্টার পর সে ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে—ইহার গভীর-প্রোথিত মূলে ডিনামাইট লাগাইয়া

পাথর-স্তম্ভের সঙ্গে নিজ জীবনকেও অণুপরমাণুতে উড়াইয়া দিয়াছে। তাহার যে সাংকেতিক পরিচয় যন্ত্রযুগের আদর্শ-নিয়ন্ত্রণহীন, মূঢ় প্রচেষ্টার সংস্পর্শে কতকটা আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল, তাহার মৃত্যু তাহাকে সেই পরিচয়ের অম্লান মহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং লেখক তাহার এই পরিচয়ই গল্পটির শেষে আমাদের মনে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। 'কালাগুরু' গল্পে এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের ভারতীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ও উদার, ক্ষমাস্নিগ্ধ শাসন-প্রণালী শেষ পর্যন্ত পশু-বল-প্রয়োগে অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। গল্পের এই তথ্যকাঠামোর মধ্যে লেখকের ব্যঞ্জনাশক্তি অপরূপ ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে। প্রভাত-ফেরীর গান যেন প্রেতলোকের শব্দমরীচিকা। ইহার উৎস সিপাহী-বিদ্রোহ সময়ের এক রক্তাক্ত কিংবদন্তীর শোকাবহ স্মৃতি। টেনব্রুক সাহেব গেজেটিয়ারের বিবৃতি পরিবর্তন করিয়া জাতি-বিদ্বেষের এই বিষপ্রস্রবণ রুদ্ধ করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় আত্মা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা বদলাইয়াছে—উহার শাশ্বত শুভ্রজ্যোতিঃ এক ভীরু, হিংস্র, গোপন-সুড়ঙ্গচারী কুটিলতার উষ্ণশ্বাসে আবিল হইয়া পড়িয়াছে।

'জতুগৃহ' (১৩৫৯) সুবোধ ঘোষের সর্বাধুনিক গল্পসংগ্রহ। ইহাতে লেখকের নূতন নূতন বিষয় নির্বাচনে অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রায় পূর্বের মতই উদাহৃত। 'জতুগৃহ' গল্পটিতে শতদল ও মাধুরীর—এক বিবাহ-সম্পর্কবিচ্ছিন্ন ও নূতন সম্পর্কে আবদ্ধ পূর্বদম্পতির—রেলওয়ে ষ্টেশনের প্রতীক্ষাগারে হঠাৎ দেখা হওয়ায় উভয়ের যে মানস আলোড়ন জাগিয়াছে তাহারই বর্ণনা আছে। উভয়েরই পূর্ব-স্মৃতি অতীত জীবনের মাধুর্য ও স্বাভাবিকতায় পৌঁছিবার পূর্বে যে লজ্জা, সংকোচ ও অস্বস্তির বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়াছে লেখক বিশেষভাবে সেই মধ্যবর্তী স্তরের সঞ্চারী ভাবসমূহের উপরই জোর দিয়াছেন। গল্পের শেষে মহিলাটির নূতন স্বামী আসিয়া পড়াতে এই ক্ষণিক মোহজাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া এক করুণ বঞ্চনা-বোধের মধ্যে বিলীন হইয়াছে। 'কাঞ্চন-সংসর্গাৎ' ও 'দুঃসহধর্মিনী আধুনিক নরনারী-সম্পর্কের নবোদ্ভিন্ন জটিলতার দুইটি-দিকের উপর আলোকপাত করিয়াছে। প্রথমোক্ত গল্পে হঠাৎ-ধনী অটলনাথ ও তাঁহার সাধু সহযোগী কান্তিকুমার উভয়েই লেখকের ব্যঙ্গের লক্ষ্য, কিন্তু এই শরনিক্ষেপ কান্তি-কুমারের ক্ষেত্রে আরও বিষদিগ্ধ ও মর্মান্তিক হইয়া বিঁধিয়াছে। যেখানে দুর্নীতি ও অপরাধ সুস্পষ্ট বা সামান্য একটু ভণ্ডামির আড়ালে অর্ধ-সংবৃত, সেখানে আর কৌতুক ও ব্যঙ্গবোধ শাণিত হইয়া উঠিবার অবসর পায় না—অটলনাথের শরক্ষেপজর্জর দেহে আর তীর বিঁধিবার নূতন স্থান নাই। কিন্তু কান্তিকুমার—শর্করাবাহী বলদ, অসাধু ব্যবসায়ের সাধু সহকর্মী, যে নীতিশাস্ত্রের তুলাদণ্ডে হৃদয়াবেগের পরিমাপ করিতে দৃঢ়সংকল্প, যে অধীর প্রেমকে ধৈর্যের মন্ত্রে শান্ত করিতে চাহে—সেই কান্তিকুমার নিঃসন্দেহে শিকার-যোগ্য নূতন জন্তু। তাহার অবিচলিত ধর্মনিষ্ঠার সাত্ত্বিক উত্তরীয়ের তলে তাহার পৌরুষ নিশ্চিন্ত আশ্বাসে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ও তাহার নিষ্ক্রিয়ত্বের ফলে তাহার প্রণয়িনী অটলনাথের কাঞ্চন-মূল্যের নিকট আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। 'দুঃসহধর্মিণী'তে স্বামী, স্ত্রীর রূপ, গুণ ও চটুল লীলা-বিলাসের মূল্যে বৈষয়িক উন্নতি খুঁজিয়াছে; শেষে তাহারই নীতির চরম প্রয়োগের উদ্যোগ তাহার মনে এক বিষম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া তাহার অনুসৃত উপায়ের হেয়তা সম্বন্ধে তাহাকে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন করিয়াছে। 'হঠাৎ গোধূলি লগ্নে' এক তরুণ স্বামীর দাম্পত্য সৌভাগ্য

বিষয়ে অত্যধিক আত্মপ্রসাদ ও অশোভন প্রচার এক অবাঞ্ছিত পরিণতির সূচনা করিয়াছে—বন্ধুকে পরিহাস করিবার জন্য সে স্ত্রীকে যে কপট প্রেমনিবেদনের অভিনয়ে প্ররোচিত করিয়াছে, তাহার মধ্যে কেমন করিয়া যেন আন্তরিকতার সুর লাগিয়া গিয়াছে। 'বারবধূ' গল্পে সহধর্মিণীর মিথ্যা পরিচয়ের ছদ্ম-গৌরব-মণ্ডিতা বারবনিতা লতা বরাকরের কলোনীর ভদ্র সমাজে মিশিবার প্রয়োজনে কুলবধূর শালীনতার অভিনয় করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু কিছু দিনের যোগাযোগের ফলে এই অভিনয়ই তাহার জীবনে সত্য হইয়া উঠিল; শেষে প্রসাদ যখন আভার প্রতি সদ্যোজাত আকর্ষণে তাহাকে জীবন হইতে চিরবিদায়ের প্রস্তাব জানাইল, তখন লতা বিনা অপরাধে প্রত্যাখ্যাতা সাধ্বী স্ত্রীর ন্যায় অভিমান-ভরা খেদোচ্ছ্বাসে তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিল। বেশ্যার ইতর প্রতিশোধ-স্পৃহা, হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গার কদর্য অশালীনতা এক অকস্মাৎ-উদ্বুদ্ধ সম্ভ্রম-লোলুপতার যাদুদণ্ডস্পর্শে কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল।

'অলীক' গল্পটির গল্পাংশ কতকগুলি অসম্ভাব্য ঘটনাকে সম্ভবরূপে দেখানোর রূপকথাধর্মী প্রয়াস। কিন্তু ইহার প্রধান আকর্ষণ হইল অলীকের ফাঁকি-প্রবঞ্চনাভরা জীবনের পাষাণ স্তর হইতে স্নেহ-মায়া-মমতার নির্ঝরোৎসারের চিত্র—আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল মানব-চিত্রাঙ্কনে সাংকেতিকতার সার্থক প্রয়োগ। এই সাংকেতিক নির্দেশই গল্পটিকে বাস্তবের গ্লানি-বীভৎসতা হইতে এক সুকুমার ব্যঞ্জনাপূর্ণ রূপক-রাজ্যে উন্নীত করিয়াছে। যাহা ঘটিয়াছে তাহাকে গৌণ করিয়া আকাঙ্ক্ষা-লোকের করুণ সুষমা প্রধান হইয়াছে।

সর্বাপেক্ষা মৌলিক পরিকল্পনা রূপ পরিগ্রহ করিযাছে 'চতুর্ভুজ-ক্লাব' গল্পে। চারিজন কিশোরের সম্মিলিত জীবন-যাত্রায় অকস্মাৎ একজনের পরিণীতা নববধূ আসিয়া এক বিপরীত স্রোতের টান সৃষ্টি করিল। প্রথমদিকে পক্ষপাত ও একাধিপত্যের কোন চিহ্ন দেখা যায় নাই—বধূ যেন কৈশোর-গোষ্ঠীর অঙ্গীভূত হইয়া খেলাধূলায় একজন নূতন সঙ্গীরূপে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এই দৃঢ়বদ্ধ, অচ্ছেদ্য সম্পর্কের মধ্যে স্বত্বপ্রতিষ্ঠার ঈর্ষ্যা ও পরিধিসংকোচজাত বিদারণ-রেখা দেখা দিয়াছে ও এই বিচ্ছেদ-প্রবণতার পরিণতিতে বালিকা বধূ স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ও তাহার স্বামীত্বের অংশীদারদের মুখের উপর বাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়াছে। আর যেখানে চলে চলুক, দাম্পত্য ব্যাপারে যৌথ কারবার চলে না এই সত্যই গল্পটিতে প্রমাণিত হইয়াছে।

'জতুগৃহ' গল্পসমষ্টির বিষয়-বৈচিত্র্য পূর্বোক্ত আলোচনায় পরিস্ফুট হইয়াছে। লেখকের উদ্ভাবন-কৌশল অক্ষুণ্ণ থাকিলেও তাঁহার মনীষার প্রখর দীপ্তি ও মনোভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য যে পুনরাবৃত্তির ফলে খানিকটা নিষ্প্রভ হইয়াছে এইরূপ ধারণাই জন্মে। আঙ্গিক-বিন্যাসের দিক দিয়াও পূর্বের শিথিলতা সংহতি-নিবিড়তায় পৌঁছায় নাই। সমাজ-জীবনে সর্বদা অসাধারণ ব্যতিক্রমকে খুঁজিতে গেলে জীবনবোধের গভীরতা খেয়ালী কল্পনা-বিলাসে পর্যবসিত হয়; লেখকের ঘটনা-বিন্যাস ও জীবনের তাৎপর্য-বিশ্লেষণ সর্বজন-স্বীকৃত গভীরতম জীবন-সত্যের নির্দেশ দেয় না। ঘটনাবলী লেখকের লঘু উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত হইয়া, তাঁহার মননসূত্রে শিথিল-গ্রথিত হইয়া খানিকটা আল্‌গাভাবেই ঝুলিতে থাকে। শিল্প-বোধের চতুর আলিম্পন জীবন-রহস্যের স্বতঃস্ফূর্ত রূপরেখাকে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়—

প্রসাধন-কৌশল অঙ্গসৌষ্ঠবকে গৌণ পর্যায়ে ফেলে। শ্রীসুবোধ ঘোষের ছোট গল্পের কারুকার্য ও শিল্পসমাবেশের অকুণ্ঠিত প্রশংসা করিয়াও জীবনধর্মিতার দিক হইতে ইহার প্রতি কিছু সংশয় পোষণের অবসর আছে বলিয়া মনে হয়।

'তিলাঞ্জলি' (১৯৪৪) সুবোধ ঘোষের প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। তাঁহার ছোটগল্পগুলির মধ্যে যে গঠন-শৈথিল্য লক্ষিত হইয়াছে, উপন্যাসের বিশালতর পরিধির মধ্যে তাহা প্রচুরতর অবসর পাইয়াছে। গত দুর্ভিক্ষের বিপর্যয়কারী অভিজ্ঞতা ও এই সংকটকালে কর্তব্যনির্ধারণে বিভিন্ন মতবাদের সংঘর্ষ উপন্যাসের পটভূমিকা রচনা করিয়াছে। এই বিক্ষুব্ধ প্রতিবেশের মধ্যে শিশির ও সিতার পারস্পরিক আকর্ষণের দীপশিখাটি দ্বিধা-কম্পিত ও ধূম্রবিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিবেশ-রচনার মধ্যে দুইটি স্তর আছে—প্রথমটি, মতবাদের বিতর্কমূলক ও দ্বিতীয়টি, দুর্ভিক্ষের সংস্কৃতি-বিধ্বংসী,সভ্যতার মূলোচ্ছেদকারী নিদারুণ বিশৃঙ্খলার বর্ণনাবিষয়ক। তর্কবিতর্কে লেখকের তীক্ষ্ণ মননশীলতা ও যুক্তিবাদের পরিচয় মেলে—কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যিকের উদার অপক্ষপাতের একান্ত অভাব। তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মপদ্ধতিকে যে শাণিত বিদ্রূপ-বাণে বিদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে কুৎসা রটনা করিয়াছেন তাহার সপক্ষে তিনি কোন হেতু দেখান নাই। কাজেই পাঠককে ইহা আপ্ত বাক্যের ন্যায় মানিয়া লইতে হয়। সমস্ত আলোচনাটি সাহিত্য অপেক্ষা প্রচারকার্যেব সমধর্মী বলিয়া ঠেকে। জাগৃতি সংঘের আদর্শ অনুসরণ যে একটা অমার্জনীয় অপরাধ তাহাই ঘোষণা করিবার অতিরিক্ত ব্যগ্রতাতেই লেখক যেন মাত্রাজ্ঞান হারাইয়াছেন। সাহিত্যকে সাংবাদিকতার স্তরে নামাইলে উহার যে মর্যাদাহানি অবশ্যম্ভাবী এখানে তাহাই ঘটিয়াছে। 'কর্ণফুলির তীরে' গল্পে অনবদ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি ও দূরপ্রসারী অর্থব্যঞ্জনার সহায়তায় লেখক যে যুদ্ধবিষয়ক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এখানে কি তিনি তাহারই সম্পূর্ণ বিপরীত মত-প্রচারের দ্বারা তাঁহার কংগ্রেস-বিরোধিতা পাপের সাড়ম্বর প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিয়াছেন? মতবাদ ভ্রান্ত কি যথার্থ—সাহিত্যে এ প্রশ্ন অবান্তর না হইলেও গৌণ। এখানে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, ভ্রান্ত মত সংশোধনের জন্য লেখক যে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছেন তাহা সার্থক সৌন্দর্যসৃষ্টির কিরণসম্পাতে প্রসন্নতর হইয়া উঠে নাই। পক্ষান্তরে কংগ্রেসের জয়ঘোষণাব মধ্যেও প্রচারকের উচ্চকণ্ঠ অশোভনভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেসকর্মী অবনীনাথ, অরুণা, জ্যোৎস্না ও কংগ্রেস মতে নূতন দীক্ষিত ইন্দ্রনাথ—ইহাদের কাহারও ব্যক্তিগত জীবন দলগত আবেষ্টন হইতে স্বাতন্ত্র্য-অর্জনে সক্ষম হয় নাই।

দুর্ভিক্ষপীড়িত জনতার যে চিত্র উপন্যাসে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে লেখকের স্বকীয়তার ছাপ আছে। এই মন্বন্তরের ছবি বিভিন্ন ঔপন্যাসিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আঁকিয়াছেন। কেহ বা ইহার অন্তর্নিহিত করুণ রসটিকে নিঃশেষে ক্ষরিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবার্দ্রতার সনাতন ধারাকে পুষ্ট করিয়াছেন। কেহ বা ইহাতে মনুষ্যত্বের চরম অবমাননার হীনতা অনুভব করিয়া সংযত-গম্ভীর আবেগের সহিত নিজ ক্ষোভ ও আত্মগ্লানি প্রকাশ করিয়াছেন। আবার কেহ বা সাইরেনের বিপদ-সংকেতের সহিত এই মূঢ়, গ্লানিকর বিশৃঙ্খলাকে সংযুক্ত করিয়া এই সমস্ত দৃশ্যে আসন্ন প্রলয়ের পূর্বাভাস-মহিমা অনুভব করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুবোধ ঘোষ অনেকটা দ্বিতীয় ধারা অনুসরণ করিলেও ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য প্রবর্তনে সক্ষম

হইয়াছেন। তিনি এই আশ্রয়চ্যুত, অণু-পরমাণুতে বিচ্ছিন্ন, সর্বস্বহারা নিরন্নদের অভিযানে এক উৎকট বীভৎসতা ও অসংগতিই লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা, তীব্রশ্লেষাত্মক মন্তব্য ও উপমা-নির্বাচন সমস্তই ইহার করুণ রসের দিক্‌টা আড়াল করিয়া ইহার শোচনীয় অসামঞ্জস্যের দিক্‌টাই বড় করিয়া তুলিয়াছে। বিপিন, টুনার মা, টুনা ও পুনি কেউটানি সকলে মিলিয়া যে বায়ুবিতাড়িত শুষ্ক-পত্রের ন্যায় একটা প্রেতনৃত্যের ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করিয়াছে তাহার কারুণ্য অপেক্ষা বীভৎসতাটাই চিত্তকে অভিভূত করে। শোকের পরিমিত বর্ণনা সমবেদনার উদ্রেক করে; যখন ইহা উৎকট অসামঞ্জস্য ও উন্মাদ বিশৃঙ্খলার রূপ পরিগ্রহ করে, তখন ইহার প্রতিক্রিয়া হয় গভীর আত্মধিক্কারের জুগুপ্সায়। নরক-যন্ত্রণার দৃশ্য যদি মর্ত্যলোকবাসীর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়, তবে এক ন্যক্কারজনক অনুভূতির চাপে পিষ্ট হইয়া তাহাদের স্বাভাবিক সমবেদনা অসাড় হইয়া পড়ে।

এই বিতর্কমূলক ও বর্ণনাত্মক আবেষ্টনের মধ্যে শিশির ও সিতার কাহিনী আকর্ষণ-বিকর্ষণের বৈশিষ্ট্যে ও মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের কুশলতায় উপন্যাসোচিত অর্থগৌরবে মণ্ডিত হইয়াছে। শিশিরের স্বদেশপ্রেমের সহিত শিল্পানুরাগ মিশ্রিত হইয়া তাহার মনোভাবকে বৈচিত্র্য দিয়াছে। সে শিল্পসাধনার পথ দিয়া দেশসেবার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তাহার মনের পরিবর্তন-স্তরগুলির মৌলিক প্রেরণা অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে। তাহার সিতার প্রতি আকস্মিক মোহে ও অবনীনাথের প্রতি সহসা-উচ্ছ্বসিত ঈর্ষ্যাবশে কংগ্রেসের আদর্শবর্জন, জাগৃহি সংঘে যোগদান ও সেখানকার কর্মপদ্ধতিতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পুনরায় পূর্বনীতিতে প্রত্যাবর্তন, তাহার আত্মমর্যাদাবোধের অতর্কিত লোপ ও পুনরাবির্ভাব—এই সমস্ত পরিবর্তন-পরম্পরা কেবল খেয়ালের সূত্রে গ্রথিত বলিয়া মনে হয়। উপন্যাসমধ্যে সিতার চরিত্রই সর্বাপেক্ষা জটিল ও সূক্ষ্মভাবে আলোচিত। তাহার মধ্যে প্রেম ও ঐশ্বর্য-মোহ এই উভয় বিরোধীভাবের দ্বন্দ্ব প্রকট হইয়াছে। তাহার সম্বন্ধে চরম কঠোর সত্য তাহার এক প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ী, জয়ন্ত মজুমদারের প্রমুখাৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে—সে নিজেকে ছাড়া আর কাহাকেও ভালবাসে না। প্রেমের সুকুমার অনুভূতি ও আদর্শবাদ, ইহার সমস্ত উদার, আত্মবিলোপী হৃদয়াবেগের অন্তরালে সে এক বদ্ধমূল আত্মপ্রীতিকেই পোষণ করিয়া আসিয়াছে।

উপন্যাসটির মধ্যে লেখকের অভ্যস্ত প্রকাশ-নৈপুণ্য, ভাষার তীক্ষ্ণ সাংকেতিকতার প্রাচুর্য ও স্থানে স্থানে বিশ্লেষণ-কুশলতা থাকিলেও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের সহিত ব্যক্তিগত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের নিবিড় সমন্বয় সাধিত হয় নাই। আঙ্গিকের শিথিলতা, ঘটনাবিন্যাসের স্বেচ্ছাচারিতার জন্য বিভিন্ন অধ্যায়ের বিচ্ছিন্ন রসধারা এক অপরিহার্য ঐক্যের দিকে অগ্রসর হয় নাই। অনেক সময় ক্ষণস্থায়ী আবেগ ফুটাইয়া তুলিবার মোহে চিরন্তন রসবিশুদ্ধির দাবী রক্ষিত হয় নাই। ছোট গল্পের ও উপন্যাসের আঙ্গিকের পার্থক্য লেখক এখনও সম্পূর্ণ অধিগত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

'গঙ্গোত্রী' (১৩৫৪) সুবোধ বাবুর আর একখানি রাজনৈতিক আন্দোলন-সংক্রান্ত উপন্যাস। কিন্তু এখানে রাজনীতি গৌণ বা পটভূমিকা-রচনার কার্যে নিয়োজিত। আসলে এই রাজনৈতিক উত্তেজনাকে উপলক্ষ্য করিয়া একটি গ্রামের জীবন-যাত্রায় ও উহার অধিবাসীদের মধ্যে কয়েকজনের জীবনে যে তরঙ্গ-বিক্ষোভ ও হৃদয়া-

বেগের দ্রুত-পরিবর্তনশীল জটিলতার উদ্ভব হইয়াছে লেখক তাহাই আঁকিতে চাহিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সাংকেতিক রীতি ও ভাবোচ্ছ্বাস-প্রধান তির্যক বর্ণনাভঙ্গীর সাহায্যে এই সংঘাতসংকুল চিত্রটিকে ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আসলে এই বিষয়টি এইরূপ আলোচনার উপযোগী নহে। স্পষ্ট-চরিত্র সম্বন্ধে লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও স্বচ্ছ পরিকল্পনা না থাকিলে ও তাহারা পাঠকের আগ্রহপূর্ণ সমবেদনা উদ্রিক্ত না করিতে পারিলে তাহাদের জীবন-সমস্যা-চিত্রণে এইরূপ ব্যঞ্জনাগর্ভ কাব্যোচ্ছ্বাস অপপ্রয়োগ বলিয়াই মনে হয়। এখানে মান্দারগাঁয়ের আত্মার কথা লেখক পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহার সামগ্রিক সত্তার মধ্যে এরূপ কোন সূক্ষ্ম-চেতনা-বিশিষ্ট আত্মা পাঠকের অনুভূতিতে জাগ্রতই হয় নাই। তার পর মাধুরী, বাসন্তী, কেশব, অজয়, সঞ্জীব বাবু ও সারদা—ইহাদের জীবন-কাহিনী অনাবশ্যক-ভাবে জটিল ও ঘাত-প্রতিঘাতের অহেতুক পৌনপুনিকতায় অস্পষ্ট ও আবিল হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিহিসাবে ইহাদের কোন পরিচয় না দিয়াই হঠাৎ ইহাদের মধ্যে নানা সম্পর্ক-জটিলতার কল্পনা যেন ইন্দ্রজাল-প্রদর্শিত মায়া-বৃক্ষে ফল ধরার মত মনে হয়। বিশেষত মাধুরীর চরিত্রের দুর্জ্ঞেয়তা প্রহেলিকার পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে—ইহা যে কেবল পাঠকের বোধশক্তিকে প্রতিহত করিয়াছে তাহা নহে, লেখকেরও ইহার সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় না। সে কবে কোন্ অজ্ঞাত অতীতে কেশবকে কি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তাহাই নদীতরঙ্গে মগ্নশৈলের ন্যায় তাহার সমস্ত জীবনে আবর্ত রচনা করিয়াছে, কিন্তু এই শুষ্ক প্রতিশ্রুতি কেবল তথ্যের কঠিন বাধা ছাড়া হৃদয়াবেগের কোন দুর্বার অনুভূতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও সে পরিতোষকে প্রণয়ীরূপে গ্রহণ করিয়াছে, কেশবের প্রতি তাহার মনোভাব গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে অস্থিরভাবে ও অকারণে আন্দোলিত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত অজয়ের অনুমিত অনুরাগের উপর ভিত্তি করিয়া তাহার চিত্ত অজয়ের প্রতি অনিবার্য-ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। বাসন্তী আবার কেশবের প্রতি গোপন অনুরাগ পোষণ করে, এবং সে কোন অজ্ঞাত কারণে এক অদ্ভুত কৃচ্ছ্রসাধন-স্পৃহার বশবর্তী হইয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামে অনুরাগহীন বিবাহে সম্মতি দিয়াছে। সে মাধুরীকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে বিচার করিয়াছে ও কেশবের নিকট হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। এমন কি প্রৌঢ় সঞ্জীব বাবুও সারদার প্রতি অনুরাগের স্মৃতিকে সম্বল করিয়া মহকুমা সহরে বৈষয়িক জীবন কাটাইয়াছেন—গ্রামে ফিরিয়া সারদার সহিত বোঝাপড়ার পর তাঁহার জীবনে শান্তি আসিয়াছে। সমস্ত উপন্যাস ব্যাপিয়া এই অন্তর-সম্পর্কের-জোয়ার-ভাটা খেলিয়াছে। কিন্তু ইহাদের ব্যক্তিগত জীবনে পাঠকের কিছুমাত্র আগ্রহ সৃষ্টি না করায় ও ইহাদের মানস পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্যে কোন নির্ভরযোগ্য কারণ না থাকায় ইহাদের সমস্ত দ্বন্দ্ব কেবল কথার মারপেঁচে পরিণত হইয়াছে। বরং ভজু বাউড়ি সমস্ত ঔপন্যাসিক চরিত্রের মধ্যে খানিকটা জীবন্তরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। এই উপন্যাসটির মধ্যে রূপক-রীতি ও বিশ্লেষণ-চাতুর্যের অসার্থক প্রয়োগই উদাহৃত হইয়াছে।

সুবোধ ঘোষের সাংকেতিকতার প্রতি প্রবণতা পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে তাঁহার 'ত্রিযামা' উপন্যাসে। তাঁহার এই রূপক-ধর্মিতা ইতিপূর্বে উপযুক্ত বিষয় ও পরিকল্পনার গভীরতার অভাবের জন্যই ব্যর্থ হইয়াছিল—ইহার ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত আলোক-

কণাগুলি সংহত জ্যোতির্মণ্ডলের পরিবর্তে একটা অস্পষ্ট মরীচিকার সৃষ্টি করিয়াছিল। বিশেষত রাজনৈতিক বিষয়ের মতবাদ-প্রাধান্য ও বুদ্ধিসর্বস্বতা এইরূপ রহস্য-দ্যোতনার পক্ষে ঠিক অনুকূল নহে। 'ত্রিযামা' উপন্যাসে তাঁহার শিল্পীমনের রূপকাকৃতি এক আবেগ-গভীর জীবন-কাহিনীর সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্ব ও স্বচ্ছ আত্মবিকাশের মধ্যে নিজ ভাস্বর প্রতিচ্ছবি খুঁজিয়া পাইয়াছে। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের বর্ণনাত্মক অভিধানের মধ্যেই এক অন্তর্লোকের ব্যঞ্জনাময় ছায়াপাত হইয়াছে—আনন্দসদনের ছেলে, ফুলবাড়ী ও হ্যাপি নুকের মেয়ে যেন তাহাদের জীবনের স্থূল ঘটনার চারিদিকে বহিঃপ্রতিবেশ ও অন্তরাত্মার বিচ্ছুরিত আলোক-গঠিত এক একটি বিদেহী ভাব-পরিমণ্ডল রচনা করিয়াছে। প্রভাত-সন্ধ্যার দৃশ্যপটের মধ্যে যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু-অংশের মধ্য দিয়া আলো-আঁধারে বোনা, বর্ণপ্লাবনে তরঙ্গায়িত, ইন্দ্রিয়াতিসারী মায়া-আবরণটিই বড় হইয়া অনুভূতিগম্য হয়, তেমনি ইহাদের জীবনে যাহা ঘটিয়াছে তাহা মনোরহস্যের আভাসে, অন্তরোৎক্ষিপ্ত আবেগ ও কল্পনার গাঢ় বর্ণ-প্রলেপে, গভীরশায়ী আত্মার অতর্কিত আত্মোদ্‌ঘাটনের দীপ্তিতে এক নিগূঢ় প্রাণলীলার দ্যোতনা-রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। ঘটনা-রূপক-রসে জারিত হইয়া, অন্তরসত্যের স্বচ্ছতায় অবগাহন করিয়া একটি সূক্ষ্ম ভাবলোকের স্পন্দনে রূপান্তর লাভ করিয়াছে।

কুশল, নবলা ও স্বরূপার অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাত, মানসলোকের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উহাদের সুনির্দিষ্ট রূপ ও মনস্তাত্ত্বিক যাথার্থ্য না হারাইয়া সমগ্রপরিবেশব্যাপ্ত বিস্তার ও ব্যক্তিসত্তার গহনলোক-নিহিত গভীরতা অর্জন করিয়াছে। স্বরূপার দীর্ঘদিনব্যাপী নীরব প্রতীক্ষা ও বাহ্যবিক্ষেপহীন আকুলতা তাহার জীবনসংগ্রামদীর্ণ, দারিদ্র্যের আঁচে ঝলসানো রুক্ষ জীবনের কৃচ্ছ্রসাধনের ছন্দে নিয়মিত। নবলার ভোগৈশ্বর্যপুষ্ট, নীতিজ্ঞানহীন সংসারের অবিমিশ্র সুবিধাবাদের আরামশয়নে সুখসুপ্ত ও মাতৃশাসনের প্রখরতায় আত্মপরিচয়হীন, পরমুখাপেক্ষিতায় লালিত জীবনে ভালবাসা আসিয়াছে এক অশ্রান্ত গতিবেগ ও মুহুর্মুহু খেয়ালী পরিবর্তনশীলতার অশান্ত ছন্দে। তাহার মাতৃশাসিত অপরিণত জীবনে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি কোনও দিন স্ফুরিত হয় নাই; কাজেই আত্মপরিচয়ের অভাবে সে ভালবাসার স্বরূপেরও সত্য পরিচয় লাভ করে নাই। দেবী রায়ের সহিত তাহার প্রেম ছেলেমানুষী দৌড়-ঝাঁপ, অবিরত ছুটিয়া চলার উত্তেজনার পর্যায় অতিক্রম করে নাই—আপনাকে-না-জানা কামনার প্রতীক্, টু-সিটার কারটি তাহাদের মৃগতৃষ্ণাতাড়িত পারস্পরিক আকর্ষণের একাধারে বাহিরের আশ্রয় ও অন্তরের সার্থক প্রতিরূপ। কুশলকে সে ঠিক প্রত্যাখ্যান করে নাই, তাহাকে ভুলিয়া প্রবলতর শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে মাত্র। মাতার প্রকৃতির পরিচয়লাভের বিভ্রান্তকারী অভিজ্ঞতার পর একবার মাত্র তাহার ব্যক্তিত্ব ক্ষণিকের জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল—কুশলের নিকট লিখিত পত্রে পথনির্দেশলাভের জন্য ব্যগ্রতা তাহার সমস্যাপীড়িত মনের এই ক্ষণিক সচেতনার সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু মাতার কঠিন আদেশ ও নিঃসংকোচ লালসা আবার তাহার ক্ষণোদ্ভিন্ন ব্যক্তিসত্তাকে সম্মোহিত ও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে বিনা প্রতিবাদে দেবী রায়ের সহিত সম্পূর্ণ হৃদয়াবেগহীন, যান্ত্রিক বিবাহ-সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া লইল। দেবী রায়ের তথ্যোদ্‌ঘাটনের ফলে সে বিশেষ বিচলিত হয় নাই—তাহার জীবনে অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাব আর কোন বিস্ময়ের সৃষ্টি করিবে

না। সে যেন এক মুহূর্তে কৈশোরের বিলাস-স্বপ্ন-বিভোরতা হইতে প্রৌঢ়ত্বের রসলেশহীন, নির্বিকার মোহভঙ্গের পর্যায়ে আসিয়া থামিয়া গিয়াছে—এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যৌবন তাহার জীবন হইতে চিরনির্বাসিতই রহিয়া গেল।

দেবী রায়, মৃগেনবাবু ও নন্দা দেবী সকলেই প্রতীক-ধর্মীরূপে চিত্রিত। তাহারা এক একটি প্রবৃত্তিরই রূপকোর্ধায়ণের নিদর্শন, সম্পূর্ণরূপে জটিলতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ববর্জিত। মৃগেন বাবুর মনে দাম্পত্য অধিকার লাভের স্পৃহা বা ঈর্ষ্যা কোনদিনই জাগে না—তাঁহার সমস্ত জীবন স্ত্রীর ইচ্ছানুবর্তনে আত্মনিয়োজিত; এই আত্মনিরোধের ফলে মাঝে মধ্যে পরিপূর্ণ শ্রান্তি ও অবসাদ তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত তাঁহার মধ্যে কোন বিদ্রোহ-প্রবণতা ভস্মাচ্ছাদনের মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎক্ষেপ করে নাই।

দেবী রায়ও এক সরলরেখায় জীবনকে ছুটাইয়া দিয়াছে। মেয়ে হইতে মায়ে প্রণয়-পাত্রীর পরিবর্তন তাহার এই ঋজু, বেগবান জীবন-ধারায় বিন্দুমাত্র যাত্রাবিরতি বা আবর্ত-বিক্ষোভের সৃষ্টি করে নাই। এই একরোখা জীবনগুলিই সাংকেতিকতার ক্যামেরায় ধরিয়া রাখার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। জটিল, অন্তর্দ্বন্দ্বসংকুল, বিস্তৃত পরিধির মধ্যে প্রসারিত জীবন-কাহিনীর মধ্যে সার্বভৌম ব্যঞ্জনা থাকিতে পারে; কিন্তু রূপক-দ্যোতনার ছোট আয়নার মধ্যে এইরূপ জীবন প্রতিবিম্বিত করা যায় না। কাজেই দেবী রায় তাহার টু-সিটার কারের মত সর্বদাই সামনের দিকে ছুটিয়া চলে। কুশলের সহিত সংগ্রামে তাহার ধূর্ততার দিক খানিকটা অভিব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু মোটের উপর উহার চরিত্রের সরল-রেখাঙ্কিত সুবোধ্যতাই উহার আসল পরিচয়।

নন্দা দেবীর মধ্যে যে অসাধারণ জটিলতার সম্ভাবনা দেখা যায়, লেখকের রূপকবিলাসের ফলে তাহা একটি অস্পষ্ট দ্যোতনায় পর্যবসিত হইয়াছে। তাহার প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি, নীতি-জ্ঞানের একান্ত অভাব, দুর্নিবার লালসা ও পারিবারিক শুচিতা ও শালীনতা সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ বে-পরোয়া অবজ্ঞা—এত বড় একটা বিরাট, অসামাজিক ব্যক্তিত্ব রূপকের ঠুনকো রঙ্গীন কাচাধারে রক্ষিত হওয়ার মত নহে। হ্যাপিনুক ও শুকতারার গৃহসজ্জার আড়ম্বরে ও চায়ের টেবিলে, প্রসাধনের সৌখীন দ্রব্য-সম্ভারের মধ্যে, লঘু পাদক্ষেপে ও নূতন মোটর গাড়ীর স্ফীত গৌরবে একটা ছোট সহরের পথে ঐশ্বর্য-দৃপ্ত যাতায়াতে, স্বামী ও কন্যার প্রতি মৃদু তর্জন-তিরস্কারে এ হেন সমুদ্রের মত অতলস্পর্শ গভীর ও তরঙ্গোচ্ছ্বাস-ক্ষুব্ধ হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া যায় না। কিন্তু প্রতিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে স্বকীয় গৌরবে প্রতিষ্ঠা ও প্রদর্শন করিতে গেলে সাংকেতিকতার ভারসাম্যগত সামঞ্জস্য বিধ্বস্ত হয়। কাজেই স্বভাব-হিংস্রা ব্যাঘ্রীকে দেখান হইয়াছে বিলাসিনী, প্রভুত্বপ্রিয়া নারীর নিরীহ রূপে। বাস্তবের মসৃণ, ভাবসুষমার সীমাবদ্ধ সংস্করণই রূপকের সুকুমার, পরোক্ষ আভাস-ইঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিতে পারে।

কুশলের চরিত্রের পরিবর্তন আসিয়াছে দুঃখময় অভিজ্ঞতা, তাহার পিতার আদর্শ-প্রভাব, প্রাচীন মূর্তির প্রতি তাহার শিল্পী-মনের অনুরাগ ও পুরাকীর্তির পুনরুদ্ধার ও তাৎপর্য-বিশ্লেষণের প্রতি তাহার আন্তরিক নিষ্ঠার ভিতর দিয়া। প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসটির রূপক-গৌরবের মূল উৎস হইতেছে এই অপরূপ দেহসৌষ্ঠব ও আত্মিক মহিমা-সমন্বিত শিলামূর্তি-

সমূহ ও তাহাদের আশ্রয়স্থল হরভবন। ইহারাই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় প্রভাব—উহার মানব চরিত্রগুলি এই আদর্শ রূপলোকের ছায়াতলে নিজ নিজ অংশ অভিনয় করিয়া গিয়াছে। কুশলের ব্যক্তিগত জীবন ও সাংস্কৃতিক অনুশীলন-নিষ্ঠা পরস্পরের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাহার অলস, আত্মকেন্দ্রিক, সাংসারিক উন্নতিকামী মন এই অতীত যুগের ধ্যান-সমাহিত, অতীন্দ্রিয় প্রেরণায় প্রাণময়, প্রশান্ত জীবনায়নের সংস্পর্শে আসিয়াই আদর্শে স্থির ও সংকল্পে অটুট হইয়া উঠিয়াছে। এই রূপলোকের আলোকে সে আপন জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়াছে—ফুলবাড়ীর মেয়ের রিক্ত মহিমা ও শুকতারার মেয়ের অস্থির আত্মরতির পার্থক্য বুঝিয়াছে। গঙ্গাধরের আশ্রয়-প্রার্থিনী গঙ্গামূর্তির কল্লোলিত প্রশান্তি তাহার জীবনকে এক স্নিগ্ধ প্রত্যাশায় ও পরিপূরক শক্তির আজীবন অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তাহার জীবন-সমস্যার সহিত এই কলাবিচারের সমস্যা অচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া গিয়াছে। অতীত ভারতের সাধনার নিদর্শনরূপ এই শিলামূর্তিগুলির প্রকৃত তাৎপর্য-উদ্‌ঘাটন তাহার নিজের জীবনের পথ-সন্ধানের সহিত সমার্থবাচক হইয়াছে। স্বরূপার সহিত তাহার মিলন-সম্ভাবনা যখনই উজ্জ্বল হইয়াছে, তখনই এই মূক-মৌন সৌন্দর্যলোকের চাবি-কাঠি সে খুঁজিয়া পাইয়াছে। যখনই সংশয় সন্দেহ তাহার মনে বিভ্রান্তি ঘটাইয়াছে তখনই সে এই রূপতত্ত্বের গোলোকধাঁধায় পথ হারাইয়াছে ও এই ভগ্ন ও বিকলাঙ্গ মূর্তিস্তূপ তাহার নিকট মরীচিকার আলেয়া জ্বালিয়াছে। শেষ অধ্যায়ে মিলনের সার্থকতায় সে এই গোধূলিছায়াচ্ছন্ন শিল্পসৃষ্টির নিগূঢ় অর্থ পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। স্বরূপার সহিত তাহার সম্বন্ধের দ্রুত পরিবর্তনশীল, বাধা-ক্ষুণ্ণ পর্যায়গুলি যেমন মনস্তত্ত্ব তেমনি রূপকসঙ্গতির দিক দিয়া অনবদ্য হইয়াছে। স্বরূপার আত্মোৎসর্গশীল ও সূক্ষ্ম-অনুভূতি-সম্পন্ন প্রকৃতি সিদ্ধির মুহূর্তে এক দুর্নিরীক্ষ্য সংকোচের ব্যবধান অনুভব করিয়া পিছাইয়া আসিয়াছে। আবার নবলার আমন্ত্রণ উভয়ের মনেই বিপরীত তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মিলন-মুহূর্তটিকে বিলম্বিত করিয়াছে। এমন কি নবলার বিবাহের পর যখন সমস্ত বাহিরের বাধা কাটিয়া গিয়াছে, তখন কুশলের মন অকস্মাৎ আবিষ্কার করিয়াছে যে, সে নবলার প্রতি উদাসীন নহে ও স্বরূপাকে অনন্যনিষ্ঠ চিত্ত সমর্পণের অধিকার তাহার নাই। শেষ পর্যন্ত আত্ম-অবিশ্বাস স্থির প্রত্যয়ের মধ্যে বিলীন হইয়াছে ও গঙ্গাধর-প্রত্যাশিনী গঙ্গার মূর্তির মধ্যে সংশয়হীন এক নিশ্চিন্ত প্রতীক্ষার স্থির জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়াছে।

সমস্ত উপন্যাসটির মধ্যে এই রূপকব্যঞ্জনার বহিরাবরণভেদী আলোক কুশল হস্তে, অভ্রান্ত সঙ্গতিবোধের সহিত বিন্যস্ত হইয়াছে। শুধু চরিত্র-পরিকল্পনায় ও বিশ্লেষণে নহে, সাধারণ বর্ণনা ও আখ্যানের মধ্যেও এই তির্যক-প্রসারী রঞ্জন-রশ্মির কম্পন অনুভব করা যায়। ত্রিযামা রজনীর নানা বিভীষিকাময় অন্ধকার প্রহরের আবর্তনের পরে উষার নির্মল জ্যোতির উদ্ভাসন, নীলকণ্ঠ পাখীর নীড়—হইতে—বাহিরে—আসা, প্রভাত-আলোক-প্রত্যুদ্‌গামী গীত সবই এই রূপকের রেশটি বহন করিয়া আনিয়াছে। মনস্তত্ত্বজ্ঞানের নিপুণ প্রয়োগ, আখ্যান-বস্তুর কুশল সন্নিবেশ ও সর্বোপরি ব্যঞ্জনা-বিন্যাসের সার্থক পরিবেশনে এক অপরূপ ভাবসঙ্গতিপূর্ণ আবহ-সৃষ্টিতে উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের একটি বিভাগের শীর্ষস্থানীয় রূপে গণ্য হইতে পারে।

ছোট গল্পের ত্রুটি-উল্লেখের সময় ইহা মনে রাখা উচিত যে, অতি-আধুনিক উপন্যাসে গঠন-সুষমার আদর্শ অনুসৃত হইতেছে না। আধুনিক যুগের তথ্যভারাক্রান্ত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, সমস্যাপীড়িত মন উপন্যাসের সীমাহীন আধারে নিজ সমস্ত পুঞ্জীভূত বোঝা উজাড় না করিয়া স্বস্তি পাইতেছে না—এই বিভ্রান্তকারী বিশৃঙ্খলার মধ্যেই সমাধানের পরশ-পাথর খুঁজিয়া ফিরিতেছে। কাজেই আজ উপন্যাস সমস্ত বিশ্বব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞানের, অপরীক্ষিত সত্য ও মানস জিজ্ঞাসা-কৌতুহলের বাহন হইয়া উঠিয়াছে। হৃদয়ের প্রত্যেক সমস্যাই আজকাল অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিবেশের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বলিয়া অনুভূত হইতেছে—পটভূমিকার অনির্দেশ্য বিশালতায় ইহার আকৃতি-প্রকৃতির বিশেষ রূপ অস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু উপন্যাসের বৃহত্তর ক্ষেত্রে যদি এই অবান্তর-প্রক্ষেপকে স্বীকার করা অনিবার্য হইয়া উঠে, অন্ততঃ ছোট গল্পকে এই প্রবণতা হইতে মুক্ত না-রাখার কোন সংগত কারণ নাই। উপন্যাসের বিশাল জলাভূমিতে আলেয়ার আলো ইতস্ততঃ জ্বলিয়া উঠুক, কিন্তু ছোট গল্পের ক্ষুদ্র, পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণে একটিমাত্র দীপশিখা তাহার স্নিগ্ধ, সংহত রশ্মি বিকীরণ করুক। উপন্যাসের আঙ্গিকের অপরিহার্য শিথিলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ছোট গল্পের গঠন আরও দৃঢ়সংবদ্ধ ও কেন্দ্রাভিমুখী হওয়া উচিত। ললিতকলার এই শৈথিল্যকে সর্বত্র অবারিত প্রশ্রয় দিলে মানবের মনীষা দীর্ঘ শতাব্দীর অনুশীলনে অর্জিত একটি বিশিষ্ট সম্পদ্, বিদগ্ধ মনের একটি মূল্যবান্ আভিজাত্য-পরিচয় হারাইয়া ফেলিবে। সুতরাং আশা করা যায় যে, সুবোধ ঘোষের মত একজন শ্রেষ্ঠ ও মনন-শক্তি-সমৃদ্ধ শিল্পী গঠন-সৌষ্ঠবের দিকে একটু অবহিত হইয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ রচনার উৎকর্ষ আরও উন্নত ও অনবদ্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিবেন।

একবিংশ অধ্যায়

উপন্যাসের পরীক্ষামূলক নবরূপায়ন—বনফুল

(১)

উপন্যাসের উদ্ভব-যুগে আমরা দেখিয়াছি যে, বহুবিধ উৎস হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া ও মানবচিত্তবিশ্লেষণরূপ উদ্দেশ্যের একনিষ্ঠতায় উহাদিগকে সংহত করিয়া এই নূতন ধরণের সাহিত্য গড়িয়া উঠে। উপন্যাসের স্বর্ণযুগে এই ভাব-ও-গঠন-সংহতি উহার সমস্ত বৈচিত্র্য ও আখ্যান-বস্তুর নানামুখীনতার মধ্যেও উহাকে একটি নিবিড় আঙ্গিক-সমতায় প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু উহার আভ্যন্তরীণ শিথিলতা ও বহুধা-বিভক্ত হইবার প্রবণতা একেবারে প্রতিরুদ্ধ হয় নাই। লেখকের অপক্ষপাত সত্যচিত্রণ যে কোন কারণে—হয় অতিরিক্ত উদ্দেশ্যপরতন্ত্রতায় অথবা জীবন-কৌতূহলের অনিয়ন্ত্রিত আতিশয্যে, কিংবা মেজাজের খেয়ালী ভ্রাম্যমানতায়—বিচলিত হইলে উহার অন্তরের বিদারণ-রেখাটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে ও উহার মধ্যে সংমিশ্রিত বিভিন্ন খণ্ডাংশগুলি ঐক্যবন্ধন অস্বীকার করিয়া আবার আপন আপন স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। অতি-আধুনিক যুগে উপন্যাসের এই বিকেন্দ্রীকৃত রূপ আবার প্রকট হইয়া উঠিতেছে। কেননা এযুগে মানবজীবন সম্বন্ধে নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসাকে অতিক্রম কবিয়া এতৎ-বিষয়ক নানাবিধ অভিনব মতবাদ, উহার প্রবৃত্তিসমূহের উদ্ভট ব্যাখ্যা, তথা-কথিত বৈজ্ঞানিক নিয়মশৃঙ্খলার লৌহনিগড়ে মানব-মনের অগণিত ও অপ্রত্যাশিত ক্রিয়াগুলিকে বাঁধিবার চেষ্টা, দ্রুত-পরিবর্তনশীল সমাজ-প্রতিবেশে সম্ভাবিত সমাজবিন্যাসের কাল্পনিক রূপান্তরে উহার অচিন্তিতপূর্ব প্রতিক্রিয়ার কাহিনীই প্রাধান্যলাভ করিতেছে। যে ব্যক্তিসত্তার দৃঢ় রেখাবিন্যাস ও নানাপ্রকার বাহ্য অভিভবের মধ্যে অটুট মহিমা পূর্ববর্তী উপন্যাসের কেন্দ্রস্থ বিষয় ছিল তাহা বর্তমানযুগে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া অবস্থা-শাসিত ও মতবাদ-প্রভাবিত অনির্দেশ্যতার কুহেলিকায় অর্ধ-বিলীন হইয়াছে। চরিত্র এখন ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, বা মতবাদের পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উত্তাপে বাষ্পায়িত হইয়া নানা কিম্ভূতকিমাকার আকার ধারণ করিয়াছে। এখন মানবাত্মা উহার স্বতন্ত্র, আত্মনির্ভর মহিমা হারাইয়া স্বাধীনতা-সংগ্রাম, জনসেবা বা অন্য কোনও আদর্শবাদমূলক প্রচেষ্টার সহযোগিতায় নিজ চরিত্র-সমুন্নতির পরোক্ষ পরিচয় দিতেছে, রণক্ষেত্রের কৃত্রিম উন্মাদনার সাহায্যে সে গৌরব-মণ্ডিত হইয়া উঠিতেছে। সহজ জীবনের শান্ত ছন্দে তাহার জীবনের কি রূপ ফুটিয়া উঠিত তাহা কেবল আমাদের অনুমানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রতিবেশ-শৃঙ্খলিত মানবসত্তা সম্বন্ধে লেখকের কৌতূহল ক্রমশ গৌণ হইয়া আসিতেছে; তাহার মুখ্য আকর্ষণ, নানা বিপরীত ঝটিকায় আন্দোলিত, বিরুদ্ধ মতবাদের তাড়নায় অস্থির, প্রাচীন সংস্কৃতি ও জীবনের নৈতিক আশ্রয়ের উন্মূলনে ভারকেন্দ্রচ্যুত সমাজ-পটভূমিকা। অরণ্যে বন্য পশুর ন্যায় এই সমাজ-অরণ্যের গোলোকধাঁধায় পথহারা মানুষ উদ্ভ্রান্ত লক্ষ্যহীনতায় ছোটাছুটি করিয়া মরিতেছে—তাহার পলায়নের ত্রস্ততা, তাহার আত্মগোপন ও আত্মরক্ষার মূঢ় প্রয়াস-পরম্পরা, মুহুর্মুহু ভূমিকম্পের বিপর্যয়ের মধ্যে স্থির হইয়া দাঁড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টাসমূহ আধুনিক উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য।

উপরি-উক্ত মন্তব্যসমূহ শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে বনফুলের রচনার মধ্যে বিশেষ সমর্থন লাভ করে। বনফুলের রচনায় পরিকল্পনার মৌলিকতা, আখ্যানবস্তু-সমাবেশে বিচিত্র উদ্ভাবনীশক্তি, তীক্ষ্ণ মননশীলতা ও নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া মানবচরিত্রের যাচাই পাঠকের বিস্ময় উৎপাদন করে। উপন্যাসের আঙ্গিক বা রূপরীতির মধ্যে নানা নূতনত্বের প্রবর্তনও তাঁহার অন্যতম প্রশংসনীয় কৃতিত্ব। তাঁহার খেয়ালী ও দুঃসাহসিক কল্পনা মানুষকে নানা অসাধারণ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া তাহার অপ্রত্যাশিত মানস প্রতিক্রিয়াগুলিকে বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষামূলক মনোবৃত্তি ও হাস্যরসিকের উৎকেন্দ্রিকতা-বিলাসের সহিত উপস্থাপিত করিতে আগ্রহশীল। তাঁহার দ্রুত-সঞ্চরণশীল ও বৈচিত্র্য-পিয়াসী মন কোন এক স্থানে স্থির হইয়া ব্যক্তিসত্তার গভীরে অনুপ্রবেশ করিতে অনভ্যস্ত ও হয়ত অসমর্থ। খেয়ালের দমকা হাওয়া, পরীক্ষার অদম্য কৌতূহল, অন্বেষণের বহুচারী প্রেরণা ও অসঙ্গতি-আবিষ্কার-ও-উপভোগের তির্যক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহাকে উপন্যাস-শিল্পের কেন্দ্রীয় আদর্শ অপেক্ষা উহার প্রত্যন্ত-প্রদেশের অনিশ্চিত সীমারেখার প্রতি অধিক আকৃষ্ট করিয়াছে। উপন্যাসের সামগ্রিকতা ও ভাবনিষ্ঠা তাঁহার হাতে বিক্ষিপ্ত-বিখণ্ডিত হইয়া আদিম যুগের অসম্পূর্ণ পিণ্ডাবস্থায় ফিরিবার প্রবণতা দেখাইয়াছে—অথচ মননের শাণিত দীপ্তি ও ক্ষিপ্রগতি, মন্তব্য-আলোচনার উৎকর্ষ তাঁহার আধুনিক মনের পরিচয় বহন করে। তিনি গভীর অনুভূতির অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইবার শ্রম স্বীকার না করিয়া তাঁহার মানস দ্রুতির বায়ু-সঞ্চালনে চারিদিকে স্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়াছেন। তাঁহার রচনায় আদিম যুগের বিকলাঙ্গ বস্তুসমাবেশ ও আধুনিক যুগের সর্বত্রচারী, অতিমাত্রায় নব-নব-পরীক্ষা-প্রবণ, পথিকৃৎ মানসিকতার এক আশ্চর্য ও খানিকটা বিসদৃশ সমন্বয় ঘটিয়াছে। একদিকে যেমন তাঁহার শিল্পীমন নূতন সৌন্দর্যের আকর্ষণ অনুভব করিয়াছে, অন্যদিকে তাঁহার ডাক্তারী ছুরি উপন্যাসের অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের দ্বারা উহার বিভিন্ন জাতীয় উপাদানগুলিকে পৃথক করিয়া নিজ বৈজ্ঞানিক কৌতূহল মিটাইতে চাহিয়াছে। তাঁহার শক্তিমত্তার চিহ্ন সর্বত্র সুপরিস্ফুট, কিন্তু এই শক্তির সহিত শক্তি-প্রয়োগে ঔদাসীন্য ও অবহেলার ভাবও মিশিয়া আছে। তিনি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচনা করিতে যতটা আগ্রহশীল, তাহার অপেক্ষা স্বল্পতম উপাদানে ও ক্ষীণতম ভাবসূত্রের অবলম্বনে উপন্যাস-জাতীয় সৃষ্টি সম্ভব কি না তাহা প্রমাণ করিতে অনেক বেশী বদ্ধপরিকর। উপন্যাসের কঙ্কালের উপর রক্ত-মাংসের একটা সূক্ষ্ম আবরণ দিয়া, নিজের মনোধর্মী প্রাচুর্যের ফুৎকার-বায়ু উহার নাসারন্ধ্রে সঞ্চার করিয়া, যবনিকার অন্তরাল হইতে পুতুলবাজির নিয়ন্ত্রণ-সূত্রে আকর্ষণ করিয়া, উহাকে জীবন্ত ও প্রাণশক্তি-সমৃদ্ধ করা যায় কি না এই পরীক্ষাই তাঁহার উপন্যাস-রচনার মুখ্য প্রেরণা বলিয়া মনে হয়। পক্ষান্তরে, মনস্তত্ত্বঘটিত জটিল সমস্যা ও প্রাগৈতিহাসিক মানবের বিবর্তন-ধারার সরস ও তথ্যপূর্ণ চিত্র প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে প্রবর্তন করিয়া তিনি যে উপন্যাসের পরিধি-সম্প্রসারণে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহাও তাঁহার কৃতিত্ব-পরিমাপকালে স্মরণ করিবার যোগ্য।

(২)

বনফুলের রচনার প্রথম পর্বে যে কয়েকখানি উপন্যাস রচিত হইয়াছে, তাহারা তাঁহার

ডাক্তারি জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে। রোগগ্রস্ত জীবনে মানব মনস্তত্ত্বের যে বিকৃত, সমস্ত সংযমের বাঁধ-ভাঙ্গা, আত্মকেন্দ্রিক রূপটি উদ্ঘাটিত হয়, লেখকের কৌতূহল উহারই পর্যবেক্ষণে ও চিত্রাঙ্কনে। ইহার সঙ্গে লেখকের নিজের একটি কাব্যপ্রবণ, আত্মভোলা, মননক্রিয়াবিষ্ট ব্যক্তিসত্তারও পরিচয় মিলে। এই উভয় উপাদানের সমাবেশেই লেখাগুলির উপন্যাসধর্মিত্ব অনুভূত হয়। ডাক্তারের দিনলিপি বা পূর্বস্মৃতিমন্থন, কবি-প্রেমিকের আত্মবিশ্লেষণমূলক ভাবোচ্ছ্বাস ও দার্শনিকের ঈষৎ উদাস, দূরদিগ্‌বলয়-প্রসারিত জীবনালোচনা মিলিয়া এক প্রকারের উপন্যাস গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত রচনায় মানব-মনস্তাত্ত্বিক অংশগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ—এগুলিকে কোনও বৃহত্তর তাৎপর্য-সূত্রে গাঁথিয়া তোলার কোন চেষ্টাই দেখা যায় না। মনোজগতের এই তারকাগুলি এক একটি সঙ্কীর্ণ কক্ষপথকেই আলোকিত করিতেছে, তাহাদের রশ্মিসমূহ সংহত হইয়া মানবের পারস্পরিক সম্পর্কের অন্তহীন রহস্য ও জটিলতার সন্ধান দেয় না। 'তৃণখণ্ড' (১৩৪২), 'বৈতরণী-তীরে' (১৩৪৩), 'কিছুক্ষণ' (১৩৪৪), 'অগ্নি' (১৩৫৩), 'সে ও আমি' (১৩৫০) প্রভৃতি রচনাকে এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

'তৃণখণ্ড'-এ ডাক্তারি ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতার মারফৎ এক ভাবুক লেখকের মানবজীবনের অসহায়তার উপলব্ধি বিবৃত হইয়াছে। অসুস্থ জীবনের নানা প্রকার স্ববিরোধ-প্রবণতা, করুণ আত্মপ্রবঞ্চনা বিভিন্ন রোগের কাহিনীর মধ্য দিয়া অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। কাহিনীগুলির মধ্যে লেখকের মননশীলতা ও সূক্ষ্ম অনুভবশক্তি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন খণ্ডাংশগুলি কোন পূর্ণ সত্যের ইঙ্গিতে তাৎপর্যপূর্ণ হয় নাই। কাল-স্রোতে ভাসমান তৃণখণ্ডগুলি অজানার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে, কখনও কখনও স্রোতে হাবুডুবু খাইতে খাইতে উহাদের নিম্নদিকটা উল্টাইয়া গিয়া অতর্কিত অনুভূতির সূর্যকিরণে ঝিকমিক করিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ইহারা ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া মানব-মনের গভীরশায়ী রহস্যরূপ মত্ত মাতঙ্গকে বাঁধিবার শক্তি অর্জন করে নাই। 'বৈতরণী-তীরে' গ্রন্থে ডাক্তারি অভিজ্ঞতার আর একটা ভয়াবহ, বীভৎস দিক উদ্ঘাটিত হইয়াছে—যাহারা আত্মহত্যার পথে অস্বাভাবিক, জ্বালাময় মৃত্যু বরণ করিয়া শব-ব্যবচ্ছেদ-কক্ষে ডাক্তারের তীক্ষ্ণধার ছুরির বিদারণ-রেখাচিহ্নিত হইয়াছে, সেই প্রেতমূর্তিগুলি হঠাৎ এক দুর্যোগময় রাত্রে ডাক্তারের স্মৃতি-সমুদ্র আলোড়িত করিয়া তাহার চারিদিকে ভিড় জমাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রেতলোকের রহস্যবোধের পরিবর্তে মানবিক অন্তর্জ্বালা ও কৌতূহলই বেশী মাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহারা সকলেই জানিতে চাহে যে, ডাক্তারের ছুরির তীক্ষ্ণাগ্রভাগে তাহাদের অন্তরের গোপন ব্যথা কতটা বাহিরে আসিয়াছে—ইহারা পৃথিবীর ঝগড়াঝাঁটির জের পরলোকে পর্যন্ত টানিয়া আনিতে চাহে। ডাক্তারের নিজের পারিবারিক বিপৎপাত ও প্রণয়-লোলুপতা তাহাকে এই প্রেতলোকের আসরে প্রধান শ্রোতা হইবার যোগ্যতা দিয়াছে, এই বীভৎস অপরাধ-স্বীকৃতির ঐক্যতানে সে নিজের জীবন-সমুত্থিত একটি অনুরূপ সুর মিলাইয়াছে। পাপ ও অসংযত কামনার নানা অনুতাপ-বিদ্ধ, অন্তর্জ্বালা-জর্জরিত খণ্ড চিত্র একত্র সমাবিষ্ট হইয়া গ্রন্থখানির মূল সুরে খানিকটা ঐক্যের সঞ্চার করিয়াছে।

'কিছুক্ষণ' গ্রন্থে ট্রেণ-দুর্ঘটনায় একটা ছোট ষ্টেশনে প্রতীক্ষমান যাত্রীগুলির স্বল্পকালীন একত্রাবস্থিতির মধ্যে যে ছোট-খাট মানবিক সম্পর্কের সূচনা হইয়াছে, ক্ষুদ্র সংঘাতের যে মৃদু কম্পন জাগিয়াছে তাহাদের একটি সরস, উপভোগ্য চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন গভীর তত্ত্ব নাই, আছে ঝিরঝিরে নদীর মৃদু ঢেউএর ন্যায় একটি সরল ঘটনা প্রবাহ ও উহাতে প্রতিবিম্বিত মানব-প্রকৃতির একটি অস্পষ্ট ছায়ারূপ। বিভিন্ন জনসমষ্টির বিভিন্ন-প্রকার আচরণ, কাহারও ইতরতা, কাহারও ভয় ও ধৃষ্টতা, কোন পরিবারের দুর্ভাগ্যের করুণ, বেদনাময় ইঙ্গিত, কাহারও বা অপরিচিতের সহিত বন্ধুত্ব জমাইবার আগ্রহ, ষ্টেশন-কর্মচারীদের পয়েন্টসম্যানকে বাঁচাইবার জন্য ছেলেমানুষী ষড়যন্ত্র—এই সমস্তই জলে ঢিল ফেলিবার ফলে তরঙ্গবৃত্ত-প্রসারের ন্যায় এই ক্ষুদ্র দুর্ঘটনার কেন্দ্র হইতে উৎক্ষিপ্ত মৃদু কম্পনরেখারূপে চিত্রিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মাখন বাবুর চরিত্র ও দাম্পত্যজীবন আপেক্ষিক স্পষ্টতা লাভ করিয়াছে। লেখক এখানেও ডাক্তারি ছাত্র, তবে খানিকটা সংবেদনশীল হৃদয় ছাড়া গ্রন্থমধ্যে তাহার বিশেষ ব্যক্তি-পরিচয় পাই না। স্বল্পতম উপকরণের সাহায্যে ঔপন্যাসিক রস-সৃষ্টি-প্রয়াসের ইহা একটি সুন্দর নিদর্শন।

'অগ্নি' (১৩৫৩) সময়ের দিক দিয়া অনেকটা পরবর্তী হইলেও রচনা-ভঙ্গীতে প্রথম পর্বের অনুরূপ। ইহার গঠন-প্রণালী প্রথম পর্বের ন্যায় episodic, অর্থাৎ ইহা নানা খণ্ড-উপাখ্যানের সমবায়ে গঠিত ও নানা বিচ্ছিন্ন ভাবোচ্ছ্বাসের একমুখীনতায় কেন্দ্রসংবদ্ধ। ইহার বিষয় বাংলা উপন্যাসের অতি-পরিচিত আগষ্ট-আন্দোলন, তবে ইহার উপস্থাপনায় উচ্ছ্বাসাধিক্য ও কাব্যময়তার সঙ্গে বনফুলের অভ্যস্ত স্বকীয়তার নিদর্শন মিলে। অংশুমান এই আগষ্ট আন্দোলনের নেতা ও ধ্বংসাত্মক কার্যের প্ররোচকরূপে ধৃত হইয়া কারাগারে বন্দী ও তাহার নিকট স্বীকারোক্তি আদায় করিবার জন্য পুলিশী জুলুমে অতিষ্ঠ। সে এই কারাকক্ষে বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধে একখানি বই পড়িবার অনুমতি পাইয়াছে এবং সদা-উত্তেজিত ও একনিষ্ঠ কল্পনার বশে বিজ্ঞান-রাজ্যের সমস্ত মহারথিবৃন্দকে তাহার তীব্র মানস সংঘাতের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্নরূপে অনুভব করিতেছে। তাহার নিঃসঙ্গ চিন্তাজাল ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের নির্মম প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত কার্যাবলীর নীতি-বিশ্লেষণের মধ্যে এক একজন বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক তাহার উত্তপ্ত কল্পনায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়া নিজ জীবন-অভিজ্ঞতা ও সত্যানুভূতি হইতে তাহাকে আশ্বাস দিতেছেন ও তাহার ক্ষীয়মান মানস শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিতেছেন। বৈজ্ঞানিকগোষ্ঠী ছাড়া আর যে-সমস্ত দিব্য আত্মা কারাকক্ষে অংশুমানের নিকট প্রেরণা বহন করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ছিলেন জয়দেব-বর্ণিত শ্রীভগবানের দশম বা কল্কি অবতার ও স্বামী বিবেকানন্দ। হয়ত ইঁহারা ক্ষাত্র শৌর্যের ও সংগ্রামশীলতার আদর্শরূপেই অংশুমানের মানস অবস্থার সহিত বিশেষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। যেমন মধ্যযুগের চিত্রাবলীতে দেবদূত ও ধর্মসাধকদের প্রতিকৃতিতে আমরা একটি জ্যোতির্বলয়-বেষ্টনী দেখিতে পাই, তেমনি অংশুমানের আত্মমগ্ন চিন্তা এক একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্পর্শে আদর্শ লোকের দিব্যবিভামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। এই আদর্শ-কল্পনা-বিহারের ফাঁকে ফাঁকে বাস্তব জগতের দারোগা, CID প্রভৃতির আনাগোনা, স্বাধীনতা-অভিযানের মধ্যে যে অদম্য শৌর্যের ইতিহাস আছে তাহার উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ-বিকীরণ

ও ইহাদের সঙ্গে অংশুমানের পূর্বস্মৃতি-অবগাহন উপন্যাসটিকে বস্তু-জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশ অন্তরা সেনের মানস বিপর্যয়ের কাহিনী। প্রথম অংশে কল্পনার আধিক্যের প্রতিষেধক স্বরূপ দ্বিতীয় অংশে কমিউনিজমের তীক্ষ্ণ ও মনন-সমৃদ্ধ মতবাদ-বিশ্লেষণ প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। অন্তরা ও তাহার প্রণয়ী ও পতিত্বে বৃত নীহার সেন উভয়েই কমিউনিষ্ট দলের উৎসাহী সভ্য ও সমর্থক ছিল। নীহার ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ডেপুটিগিরি গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাহার পূর্ব মতবাদে অবিচলিত—এই চাকরী-গ্রহণ তাহার রণকৌশল মাত্র, পূর্ব আদর্শের প্রত্যাহার নয়। সে আগষ্ট আন্দোলনকে নির্মম হস্তে দমনে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখাইয়াছে, কেননা ইংরেজ রাশিয়ার মিত্রশক্তি ও মহাযুদ্ধের সঙ্কটমুহূর্তে বিশৃঙ্খলাসৃষ্টির অর্থই হইল ফাশিষ্ট-শক্তির বিজয়ের পথ পরিষ্কার করা। সুতরাং নৃশংস নির্যাতনের মধ্যেও তাহার বিবেকে কোন দ্বন্দ্ব দেখা দেয় নাই। কিন্তু অন্তরার মানস ইতিহাস সম্পূর্ণ বিপরীত। সে কমিউনিজমের ফাঁকি সম্বন্ধে অত্যন্ত উগ্রভাবে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের বহু-বিঘোষিত সাম্যবাদ যে পরশ্রীকাতরতার ছদ্মবেশ মাত্র তাহা সে বুঝিয়াছে। কিন্তু এই মত-পরিবর্তনের মূলে যাহা ক্রিয়াশীল তাহা নূতন সত্য আবিষ্কার নহে, অংশুমানের ব্যক্তিত্বের নিগূঢ় আকর্ষণ ও তাহার বীরোচিত আচরণের মুগ্ধকারী প্রভাব। অংশুমানের জন্য অন্তরার অন্তর্দ্বন্দ্ব সংক্ষেপে কিন্তু শক্তিমত্তার সহিত বর্ণিত হইয়াছে—তাহার অস্বস্তি, উদ্দেশ্যহীন গতিবিধি ও মানস উদ্ভ্রান্তি সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে। কিন্তু তাহার শেষ পরিণতি—পুলিশ ইন্‌সপেক্টরকে ট্রেণ হইতে ফেলিয়া দিয়া হত্যা—একটু আকস্মিক ও তাহার চরিত্রের সহিত সঙ্গতিহীন বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য আগষ্ট আন্দোলনের অগ্নিযুগে, দেশব্যাপী বিক্ষোভ ও উত্তেজনার মধ্যে, অন্তরার পক্ষে এইরূপ সাংঘাতিক কার্যানুষ্ঠান, হত্যার অতর্কিত সঙ্কল্প-গ্রহণ ঠিক অস্বাভাবিক নাও হইতে পারে। তবে তাহার চরিত্রের যে পূর্ব পরিচয় আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে এরূপ নৃশংস, বে-পরোয়া ভাবের কোন ইঙ্গিত মিলে না। শেষ দিনে ফাঁসিমঞ্চের সম্মুখে অংশুমান ও অন্তরা একই চরম শাস্তির বন্ধনে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছে।

'সে ও আমি' উপন্যাসটি লেখকের আঙ্গিক-বিষয়ক অভিনবত্ব-প্রবর্তন-প্রয়াসের একটি দৃষ্টান্ত। ইহাতে কোন পূর্বাপর-সম্বন্ধ আখ্যায়িকা আবিষ্কার করা অত্যন্ত দুরূহ। ইহার মধ্যে যাহা সত্যই ঘটিয়াছে, যাহা বর্তমানে ঘটিতেছে, যাহা ঘটিতে পারিত কিন্তু ঘটে নাই, ও যাহা রূপকরূপে নায়কের চিন্তাধারার মধ্যে একটি বিশিষ্ট অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত দিতেছে—এ সমস্তই মিশিয়া গিয়া এক কুয়াশাচ্ছন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের মত চোখে ধাঁধা লাগাইতেছে। বাস্তব ঘটনা, অতীত ও বর্তমান, তীব্র-আকৃতি-প্রসূত স্বপ্ন-বিভ্রম, উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনাজাল, অন্তর-সত্তার দ্বিধা-বিভক্ত বহিঃপ্রকাশ—সবই অঙ্গাঙ্গীরূপে পরস্পর-সংযুক্ত হইয়া মনোলোক-গহনতার একটি রূপকচিত্র রচনা করিয়াছে। মেঘলা দিনের মেঘ-চোঁয়ানো ঘোলাটে আলোর সাহায্যে বেলার পরিমাপের মত আখ্যানের ক্রম-পরিণতি-নির্ণয় অনেকটা অনুমান-সাপেক্ষ। 'সে ও আমি' উপন্যাসের এই নামকরণের বিশেষ তাৎপর্য্যটি লেখক সম্পূর্ণ পরিষ্কার না করিলেও তাঁহার উদ্দেশ্য কতকটা অনুধাবন করা যায়। রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার ন্যায় 'সে'

নায়কের সত্তারই একটি অন্তরশায়ী রূপ—তাহার জীবনের সমস্ত জটিলতাজাল, আত্মপ্রবঞ্চনা, স্ব-বিরোধী অভিপ্রায়সমূহের কেন্দ্রস্থ সত্য পরিচয়, তাহার স্বচ্ছ ও ধূম্রাবরণভেদী অন্তর্দৃষ্টি, তাহার গহন কামনালোক হইতে উদ্ভূত, অভিসারিণী নারীরূপে পরিকল্পিত আত্মবোধ। অবশ্য এই অন্তর্গূঢ় পরিকল্পনাটি যে উপন্যাসে সার্থক রূপ লাভ করিয়াছে এরূপ দাবী করা যায় না। 'সে' অকস্মাৎ নায়কের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাহার অনেক গোপন দুর্বলতা প্রকাশ করিয়াছে, তাহাকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করিয়া তাহার আত্মসম্ভ্রম ও আত্ম-সন্তুষ্টিকে বিড়ম্বিত করিয়াছে ও শেষ পর্যন্ত তাহাকে সদুপদেশ দিয়া তাহাকে ভবিষ্যৎ জীবনের নির্দেশ দিয়াছে। কিন্তু সে যে নায়কের অন্তর-সত্তারই ছায়া, তাহার আত্ম-পরিচয়েরই একটি অভ্রান্ত মানদণ্ড তাহা মনস্তাত্ত্বিক অনিবার্যতার সহিত প্রতিপন্ন হয় নাই। তাহার আবির্ভাবের আকস্মিকতা ও পৌনঃপুনিকতা, তাহার চটুল ও সময় সময় উদ্দেশ্যহীন সংলাপ, তাহার মুরুব্বিয়ানা চাল ও অলৌকিকত্বের ভড়ং অস্খলিত মনস্তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা খেয়ালী কল্পনা-বিলাসেরই অধিক অনুরূপ। নায়কের অবচেতন মন যে মূর্তি ধরিয়া তাহার চেতন-সত্তার সম্মুখীন হইয়াছে ও তাহাকে আত্মপরিচয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে—লেখকের এই অভিপ্রায়-নিহিত তত্ত্ব উপন্যাসোচিত রসস্ফূর্তি পাইয়াছে কি না সন্দেহ।

এই পূর্বস্মৃতি, কল্পনা, রূপক ও ঘটমান কাহিনী যে দুর্নিরীক্ষ্য আঙ্গিকের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রেমসিন্ধু ও মালতীর হৃদয়সম্পর্ক-জনিত সমস্যাই খানিকটা সুস্পষ্ট হইয়াছে। প্রেমসিন্ধু মালতীর পিতার অর্থসাহায্যে আই. সি এস পাশ করিবার উদ্দেশ্যে বিলাত গিয়া সেখানে অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতায় নিজ ভবিষ্যৎকে নষ্ট করিয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যে মহত্ত্বের কিছু স্পর্শ ছিল, সেই জন্য মালতীর কপটতামূলক প্রত্যাখ্যান-পত্রের আক্ষরিক অর্থ করিয়া সে মালতীর উপর সমস্ত অধিকার প্রত্যাহার করিয়াছে ও গবেষণাব্রতী গোবর-গণেশ রমেশের সঙ্গে মালতীর বিবাহের পথ নিষ্কণ্টক করিয়াছে। কিন্তু এই আকর্ষণের বীজ তাহার অন্তরের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে—যতই সে এই প্রেমকে অস্বীকার করিয়াছে, ততই ইহার গোপন অস্বস্তি প্রচ্ছন্ন বহ্নির দাহিকা-শক্তির ন্যায় তাহার সুখশান্তি বিধ্বস্ত করিয়াছে ও উহাকে একদিকে নানা স্বপ্নব্যোমন্থনে আবিষ্ট ও অন্যদিকে নানা খাপছাড়া, এলোমেলো কাজের গোলোকধাঁধায় ঘুরাইয়া মারিয়াছে। শেষ পর্যন্ত মালতী তাহার প্রতি ভালবাসার পরোক্ষ পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু প্রেমসিন্ধুর বিবেক-সত্তা তাহাকে গরীবের মেয়ে মিনতিকে বিবাহ করিবার উপদেশ দিয়া তাহার উদ্‌ভ্রান্ত লক্ষ্যহীনতাকে একটা স্থির পরিণতিতে লইয়া গিয়াছে। উপন্যাসটিতে আঙ্গিকের অভিনবত্ব লক্ষণীয়, ও চরিত্র-বিশ্লেষণও নানা কল্পনা-স্বপ্নের বিচিত্র ছায়াছবির রূপান্তরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সচেতন মনের রূপরেখার পরিবর্তে অবচেতন কামনালোকের স্বপ্নসঞ্চরণই এখানে চরিত্র-পরিচিতির প্রধান অঙ্গ ও উপায়রূপে গৃহীত হইয়াছে। লেখকের কলাকৌশল ও চিত্রণ-নৈপুণ্য প্রশংসনীয়, কিন্তু উপন্যাসের ভবিষ্যৎ রূপের কতটা সার্থক ইঙ্গিত ইহার মধ্যে নিহিত আছে তাহা সংশয়ের বিষয়।

(৩)

পরবর্তী পর্বে 'দ্বৈরথ' (বৈশাখ, ১৩৪৪) 'মৃগয়া' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭), ও 'নির্মোক' (অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭) লেখকের উপন্যাস-রচনার আর একটি স্তরের নিদর্শন। এগুলিতে লেখক

মোটামুটি উপন্যাসের নির্দিষ্ট গঠন-প্রণালীরই অনুবর্তন করিয়াছেন ও আঙ্গিকের ব্যাপারে তাঁহার পরীক্ষামূলক মনোভাবকে অনেকটা সংযত করিয়াছেন। 'দ্বৈরথ'-এ পারিবারিক সম্পর্কের দিক দিয়া নিকট আত্মীয় দুই জমিদারের পরস্পর রেষারেষি ও প্রতিযোগিতা-সংগ্রামের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্ত নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী এই দ্বৈরথ-যুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার রণনীতি অবলম্বন করিয়াছে। একজন দুর্দান্ত গোঁয়ার ও হঠকারী, আর একজন শান্ত ও মার্জিতরুচি, কিন্তু বাহিরের এই পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের অন্তরে একই প্রকারের অনমনীয় দার্ঢ্য ও শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিষ্ঠার দৃঢ়সংকল্প ক্রিয়াশীল। ইহারা হয়ত পূর্বশতকের জমিদার গোষ্ঠীর খাম-খেয়াল ও নিরঙ্কুশ শক্তিমত্ততার যথার্থ প্রতিচ্ছবি, কিন্তু ইহাদের গোষ্ঠী-পরিচয় অতিক্রম করিয়া ব্যক্তিসত্তারহস্যের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। স্থানে স্থানে ইহাদের চরিত্র-চিত্রণে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের প্রবণতা দেখা যায়, কিন্তু মোটের উপর লেখক ঘটনার চমকপ্রদ অনুসরণেই সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন, চরিত্র-রহস্য উদ্‌ঘাটনে তাঁহার সেরূপ আগ্রহ নাই। কল্পনার প্রবলবায়ু-তাড়িত হইয়া ঘটনার পর ঘটনা দ্রুতগতি ছায়াচিত্রের ন্যায় আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কোথাও রহিয়া-সহিয়া উপভোগ করার, ঘটনার পিছনকার মানস প্রেরণা পর্যন্ত অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করার অবসর নাই।

'নির্মোক' উপন্যাসে আবার ডাক্তারী জীবনের অভিজ্ঞতা বিষয়বস্তুরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এবার খণ্ডাংশের সাংকেতিক অর্থগূঢ়তার পরিবর্তে ধারাবাহিক জীবন-কাহিনী উপন্যাসের অবয়ব গঠন করিয়াছে। বেকার বিমল যে আত্মজীবনী সুরু করিয়াছিল, চাকরী পাওয়ার পর তাহাতে আকস্মিক ছেদ পড়িয়াছে। আবার একেবারে পরিসমাপ্তিতে এই আত্মজীবনীর পরিত্যক্ত সূত্র পুনঃসংযোজিত হইয়াছে। প্রারম্ভে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি ও সেখানকার শিক্ষার ইতিহাস, শেষে ডাক্তারী জীবনের পরিণত-অভিজ্ঞতা-প্রসূত দার্শনিক মূল্যায়ন। মাঝের অধ্যায়গুলিকে এই দৃষ্টিভঙ্গী-পরিবর্তনের কারণ-নির্দেশরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। মোটামুটি এই জীবন ইতিহাসে অসাধারণ কিছু নাই, আধুনিক দলাদলি ও প্রতিষ্ঠান-পরিচালনার অধিকার লইয়া নীতিজ্ঞানহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে প্রায় প্রত্যেক চাকুরে ডাক্তারের সাধারণ জীবনই ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে। রোগীর চিকিৎসা-ব্যবস্থা ও তাহাদের সহিত আচরণের মানবিকতা, হাসপাতাল কমিটির সদস্যদের মন যোগাইয়া চলা, নানা মেজাজের লোকের সঙ্গে পরিচয়, অন্যান্য স্থানীয় ডাক্তারের সঙ্গে ঈর্ষ্যা-দ্বেষ-সহযোগিতা-মিশ্রিত সম্বন্ধের তারতম্য, সামাজিক মেলা-মেশায় প্রীতি-সৌহার্দের সঙ্গে কুৎসা-কলঙ্করটনার যুগপৎ প্রাদুর্ভাব—ইত্যাদি বিষয়ই উপন্যাসের পৃষ্ঠাগুলিকে অধিকার করিয়া আছে। একটি উপভোগ্য, সরস কাহিনী-বিবৃতি ও এই প্রসঙ্গে চরিত্রের কিছু স্বল্প আভাস—ইহাই উপন্যাসটির আকর্ষণ। কোথায়ও কোন গভীর উপলব্ধি বা অনুপ্রবেশের চিহ্ন পাওয়া যায় না।

'মৃগয়া' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭) রচনাটি একাধারে লেখকের বিষয়-নির্বাচনে ও পটভূমিকা-রচনায় অনায়াস-নৈপুণ্য ও সঙ্গে সঙ্গে উহাদের সার্থকতম প্রয়োগ সম্বন্ধে শৈথিল্য ও ঔদাসীন্যের নিদর্শন। লেখক যেন উপন্যাসের একটি চমৎকার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া নিজের খেয়ালী কল্পনা-বিলাস ও দায়িত্ব-পালনে অসহিষ্ণু, যদৃচ্ছ সংক্রমণশীল মনোভাবের

প্রভাবে ঐ পরিকল্পনাটিকে অসমাপ্ত রাখিয়াই গ্রন্থটি শেষ করিয়াছেন। গদ্য-ছন্দ-প্রধান কাব্য, গদ্য ও নাটকে লেখা এই রচনাটি লেখকের ত্রিধা-বিভক্ত প্রকৃতিরই যেন যথার্থ প্রতিরূপ। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা ও চরিত্রসমূহের প্রারম্ভিক পরিচয় গদ্য কবিতার মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিসদৃশ, পরিহাস-তরল বাহনের মধ্য দিয়া লেখক জমিদার-পরিবারের তিন ভ্রাতা, তাহাদের তিন স্ত্রী, ও অন্যান্য পরিজন ও পারিষদবর্গ-সমন্বিত গ্রাম-পরিমণ্ডলের যে চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে চরিত্র-বিশ্লেষণ, সরস বিবৃতি ও জীবনরস-উচ্ছলতার অপূর্ব সমন্বয় আমাদের চিত্তকে একটি পরিণাম-রমণীয় প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা-চঞ্চল করিয়া তোলে। বিশেষত ভাইদের চরিত্র ও তাহাদের দাম্পত্য সম্পর্কের বিশিষ্টতার মধ্যে একটি উচ্চাঙ্গের ঔপন্যাসিক সম্ভাবনা নিহিত আছে বলিয়া আমরা অনুভব করি। গদ্যে রচিত ঘটনা-বহুল দ্বিতীয় খণ্ড 'পথে' অভিজাত-বংশীয়দের অনেকটা গৌণ স্থান দিয়া মৃগয়া-ব্যাপারে অনুগামী প্রাকৃত শিবির-সহচরদের ছোট-খাট হৃদয়-সংঘাত, ও যাত্রা-পথে বিঘ্ন-বিপদ-বিসদৃশ-সংঘটনের চিত্রকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। উচ্চবংশীয়দের অন্তরে যে ভাবের ঢেউ উঠিয়াছে তাহারই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ, একটা মৃদুতর কম্পন যেন সহচরদের অন্তরেও অনুরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিতেছে। বৃহৎ সরোবরে বড় মাছের আলোড়নের সঙ্গে ছোট-ছোট পুঁটি-সফরী-মাছেরও উল্লম্ফন সমগ্র পরিবেশকে একটা উদ্বেল প্রাণোচ্ছলতায় স্পন্দিত করিয়াছে। তৃতীয় খণ্ড 'প্রান্তরে', জ্যোৎস্না-প্লাবিত ফাঁকা মাঠে যে সারি সারি তাঁবু খাটান হইয়াছে তাহারই অনভ্যস্ত পরিবেশে পরিচিত নর-নারীর এক অভূতপূর্ব, অপরূপ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। সারা জীবনের ছদ্মবেশ, লৌকিক মানসম্ভ্রম-অভিনয়ের বহিরাবরণ যেন জ্যোৎস্নাধারার ও গোহুনিয়ার নৃত্যের মাদকতায় একমুহূর্তে খসিয়া পড়িয়াছে। বড় বাবু মদ খাওয়া ভুলিয়া বড় বৌএর রূপ সম্বন্ধে প্রথম সচেতন হইয়াছেন; বড় বউ তাঁহার জীবন-ব্যাপী আত্মনিরোধকে এক অবারিত আত্ম-উন্মোচনের অদম্য প্রেরণায় বিসর্জন দিয়াছেন—প্রৌঢ় দম্পতি আজ চন্দ্রালোকে পাশাপাশি বসিয়া সমস্ত ব্যবধান সরাইয়া পরস্পরের অতি নিকটবর্তী হইয়াছেন। মেজ বাবু ও মেজ বৌ আজ দাম্পত্য-নিবিড়তায় পরস্পরের মধ্যে ফাঁককে পুরাইয়া ফেলিয়াছেন। মেজ বাবুর বন্য দুর্বারতা আজ স্বেচ্ছায় বশ্যতা মানিয়াছে; মেজ বৌএর অতন্দ্র গৃহিণীপনা আজ প্রথম যৌবনের বসন্ত-পবনে ঈষৎ বিচলিত, আজগুবি খেয়ালের মাদকতায় আত্মবিস্মৃত। শেষে তিনি তাঁহার চিরকালের কর্তব্যবদ্ধ পদাতিক জীবন ছাড়িয়া স্বামীর সহিত হাতীর পিঠে সওয়ারি হইয়াছেন, জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তরের মধ্যে এক স্বপ্নময় কল্পনাবিলাসের অনির্দেশ্য আহ্বানকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ছোট বাবু ও ছোট বৌএর দাম্পত্য লীলা আরও উদ্দাম ছন্দে ও চমকপ্রদ স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ছোট বৌ পুরুষের ছদ্মবেশে স্বামীর সহিত বাদল ডাক্তারের মোটর-বাইকের পার্শ্ব-আসন অধিকার করিয়া তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের বেড়ী-পরা চঞ্চলতাকে এক নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছা-বিহারে সম্প্রসারিত করিয়াছেন। এক উতলা বায়ু যেন প্রত্যেককেই তাহার অভ্যস্ত জীবন-যাত্রার ভার-কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত করিয়া, তাহার আত্মসংবৃতির যবনিকা সম্পূর্ণ অপসারিত করিয়া, তাহার গহন-মন-সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাগুলিকে মুক্তি দিয়াছে ও তাহার সত্তার একটি নূতন পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। এমন কি বৃদ্ধা

ঠাকুরমা পর্যন্ত অজ্ঞাতসারে হরিনামের জপের মালার পরিবর্তে স্মৃতির তলদেশে সুপ্ত অতীত প্রেমের প্রতীক স্বরূপ শুষ্ক ফুলের মালা অঙ্গুলিতে আবর্তিত করিয়া চলিয়াছেন। শেক্স-পিয়ারের নাটকের ন্যায় যেন কোন রহস্যময় দৈবশক্তি নর-নারী-সংঘের সমস্ত সতর্কতাকে প্রতিহত করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের গোপন অভিলাষের ছন্দে পরিচালিত করিতেছে। উষা হীরেনের সঙ্গে দোলনায় দোল খাইতেছে, নূতন জামাই সুরেন কোন-না-কোন অজুহাতে উষার বান্ধবী মীনার নিত্যসহচররূপে আবিষ্কৃত হইতেছে। প্রাত্যহিক জীবনের অলক্ষিত প্রবণতাগুলি এই জ্যোৎস্নারজনীর কুহক-মন্ত্রে সুস্পষ্টরূপে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছে। ছোট ছেলেপিলেদের আবদারে হরিশখুড়ো যে রূপকথা শোনাইয়াছেন—যাহাতে রাজকন্যা চম্পাবতী তাহার প্রণয়-ভিখারী সূর্যদেবকে চোরকুঠরিতে বন্দী করিয়া জ্যোৎস্নার চির-রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—তাহাতেই যেন এই আখ্যায়িকার মর্মবাণী ধ্বনিত হইয়াছে। এক অবাস্তব মায়া বাস্তব জীবনের প্রখর সূর্যালোককে অভিভূত করিয়া প্রত্যেক চিত্তে স্বপ্নাবেশের ক্ষণিক বিভ্রান্তিকে চিরন্তন সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত কবিযাছে। এমন কি যে বাঘ-শিকারের জন্য এত রাজকীয় আয়োজন, সেই বাঘও এই জ্যোৎস্না-বিহ্বলতাব বশবর্তী হইয়া বাঘিনীর গা চাটিতে চাটিতে শিকারীর লক্ষ্যের বাহিবে প্রণয়-অভিসার-যাত্রায় আত্মগোপন করিয়াছে। এই স্বপ্নমায়াভরা রজনীতে দুইটি সক্রিয় শক্তি আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে—এক কৌমুদীর কুহক-মন্ত্র, অপরটি গোহমনির মদিরা-বিহ্বল পরী-নৃত্য। উপন্যাসেব কঠোর বাস্তবতা এক গীতিকবিতার অনির্দেশ্য সাঙ্কেতিকতায় বিলীন হইয়াছে।

(৪)

বনফুলেব রচনার তৃতীয় পর্বের উপন্যাসগুলি—'মানদণ্ড' (১৩৫৫), 'নবদিগন্ত' (১৩৫৬), 'কষ্টিপাথর' (১৩৫৮), 'পঞ্চপর্ব' (১৩৬১), 'লক্ষ্মীব 'আগমন' (১৩৬১) খানিকটা বিষয়গত ও রীতিগত পবিবর্তনেব নিদর্শন। এগুলি মোটামুটি ঘটনা ও মনস্তত্ত্ব-প্রধান, ইহাদের মধ্যে এক 'লক্ষ্মীব আগমন' ছাডা অন্যত্র স্বপ্নময় সাঙ্কেতিকতা ও আখ্যানেব ধারাবাহিকতা-পরিহারের প্রভাব তাদৃশ লক্ষণীয় নহে। 'মানদণ্ড'-এ বৈজ্ঞানিক আদর্শবাদ, খেয়ালী ও ললিতকলামত্ত আভিজাত্যবোধ, হিংসাপ্রণোদিত ও ধ্বংসাত্মক মন্ত্রে দীক্ষিত রাজনৈতিক মতনিষ্ঠা ও দ্রুত পরিবর্তনের হাওয়ায় আন্দোলিত, রাজনৈতিক মতবাদ ও মানবিক কোমলতার মধ্যে দ্বিধাবিভক্তচিত্ত নারী-প্রকৃতি—এই সব নানা বিপরীত-ধর্মী চরিত্র, ঘটনার এক অদ্ভুত ও আজগুবি আলোডনে পরস্পরের উপর উৎক্ষিপ্ত হইয়া, এক দারুণ বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। এতগুলি বিভিন্ন রকমের উৎকেন্দ্রিক চরিত্রের একত্র সমাবেশ যে রস উৎপাদনের হেতু হইয়াছে তাহা প্রধানত উদ্ভট-অসঙ্গতিমূলক। তথাপি লেখকের সৃষ্টি-নৈপুণ্যে চরিত্রগুলি একেবারে অবাস্তব হয় নাই। মেঘসুন্দর ব্যঙ্গা-তিরঞ্জন-জাতীয় হইলেও লেখকের সহানুভূতি-স্পর্শে জীবন্ত। তুঙ্গশ্রী প্যাঁচালো বুদ্ধিতে হিরণ্যগর্ভের নিকট হার মানিয়া ক্রমশ উহার চরিত্র-গৌরব ও কর্ম-পদ্ধতির জন্য উহার প্রতি অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছে। কেশব সামন্তের প্রতি তাহার ক্রমবর্ধমান বিরাগ তাহার চরিত্রে খানিকটা অন্তর্দ্বন্দ্বের উত্তেজনা সঞ্চার করিয়াছে। হিরণ্যগর্ভ ঘোরতর

আদর্শবাদী হইলেও, formula অনুসারে জীবন যাপন করিলেও তাহার সহজ সহৃদয়তা ও সপ্রতিভতা, তাহার কৌতুক-প্রবণতা ও ফিকির-ফন্দী-নৈপুণ্য, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে তাহার মৌলিক চিন্তাপদ্ধতি তাহাকে আদর্শ পুরুষের অবাস্তবতা হইতে উদ্ধার করিয়া প্রাণবায়ু-চঞ্চল করিয়াছে। সকলের উপর লেখকের বে-পরোয়া কল্পনা সম্ভব-অসম্ভব, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকের ভেদ-রেখা বিলুপ্ত করিয়া অপ্রতিহত বেগে অগ্রসর হইয়াছে। পাঠকের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য তাঁহার কোন মাথা-ব্যথা নাই। চুল চিরিয়া বিচার-বিশ্লেষণ করিলে যাহা সংশয় ও অবিশ্বাস উৎপাদন করিত, লেখকের প্রচণ্ড আত্ম-প্রত্যয়, তাঁহার নিজের নিঃসংশয় ভাল-লাগা, তাঁহার কল্পনা-কৌতুকের নিরঙ্কুশ -লীলা-প্রবাহ সেই সমস্ত আপত্তিকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। বানরের উপর টাইফয়েড-বীজাণুর পরীক্ষা কার্যকরী হওয়াতে তুঙ্গশ্রীর মুখে যে প্রসন্নতা দেখা দিয়াছে, তাহা যেন প্রেমের অরুণরাগের অগ্রদূত-রূপেই লেখক পরিকল্পনা করিয়াছেন। সুতরাং মনে হয় যে উপন্যাসে সঞ্চিত কৌতুকরস যে মিলনের মধুররসের পূর্বাবস্থা এই ইঙ্গিত দিয়া লেখক উপন্যাসের খাপছাড়া ঘটনাগুলিকে আরও অপ্রত্যাশিত-চমক-চকিত করিয়াছেন।

'নবদিগন্ত' বনফুলের পক্ষে অনভ্যস্ত, অথচ প্রচলিত রীতি-সম্মত উপন্যাস। এই উপন্যাসে মনস্তত্ত্বমূলক আলোচনাই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে, এবং এই আলোচনার সহিত লেখকের সরস ও কৌতুককর কল্পনা মিশ্রিত হইয়া মনস্তত্ত্বের গাম্ভীর্য অনেকটা লঘু হইয়াছে। সূর্য চৌধুরী ও তাঁহার বন্ধু গোবিন্দ সান্যালের পারস্পরিক মনোভাব-বিনিময় এই কূট মনস্তত্ত্বের পরিচয় দেয়। দিবসের দিবাস্বপ্নবিভোরতার মধ্যেও মানস ক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট নিয়মাধীনতার দৃঢ় বেষ্টনীরেখা আছে। কিন্তু উপন্যাসের কেন্দ্রস্থ বিষয় জীবনচর্যার কতকগুলি পরীক্ষামূলক নবরূপায়ণ-প্রচেষ্টা। দিবস ধনী পিতার আশ্রয় ছাড়িয়া মেসের চাকরের হীন বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে—শারীরিক শ্রমের মর্যাদা দ্বারা সে বুদ্ধিসর্বস্ব জীবনের ফাঁকিকে পূরণ করিতে চাহিয়াছে। আবার রঞ্জনা দিবসের সহিত একঘরে রাত্রি যাপন করিয়াও কলুষিত যৌন আকর্ষণকে প্রতিরোধ ও অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছে। দিবসের বাসস্থানও বেশ্যাপল্লীতে ও সে বস্তিবাসিনী নারীদের সহিত একটা নিষ্কলুষ আত্মীয়তা-সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। দিবসের বন্ধু কিরণ ট্রাম কণ্ডাক্টারির সঙ্গে কবিত্ব চর্চাও করিয়া থাকে। উর্মি সমস্ত যৌন সংস্কার বিসর্জন দিয়া কিরণের শুভানুধ্যায়িনী বান্ধবীরূপে তাহার সহিত অন্তরঙ্গতা-প্রার্থিণী হইয়াছে। এতগুলি সনাতন সংস্কারের ব্যতিক্রম ও স্পর্ধিত উপেক্ষা যে উপন্যাসে স্থান পাইয়াছে, তাহা আর যাহাই হউক বিশুদ্ধ বাস্তবধর্মী বলিয়া দাবী করিতে পারে না। এগুলি লেখকের মানবসমাজ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নিরীক্ষা-মূলক কল্পনারই নিদর্শন। অবশ্য বাস্তব আলোচনা-পদ্ধতি ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ-নির্দেশের সাহায্যে এই কল্পনাক্রীড়াকে যতদূর সম্ভব বস্তুজগতের প্রতিচ্ছবিরূপে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। গহনচাঁদ ও তাঁহার পারিষদবর্গ এক আদর্শবাদ-প্রধান, ভাবরসসিক্ত পরিমণ্ডল গঠন করিয়াছেন, কিন্তু উপন্যাসমধ্যে তাঁহাদের, সঙ্গীতের সুরভি বায়ু-হিল্লোল প্রবাহিত করা ছাড়া, আর বিশেষ কোন কার্যকারিতা নাই। ইহাদের মধ্যে চুনীলাল অবশ্য সুবিধাবাদের ও বিষয়বুদ্ধির একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত, কিন্তু তাহার চারিপাশের ভাব-কুয়াসার অস্পষ্ট পরিবেশে

তাহার বাস্তবতাবোধ নিজ প্রকৃতিধর্মের পূর্ণ অনুশীলনের সুযোগ পায় নাই। শেষ পর্যন্ত দিবস তাহার খেয়ালী কৃচ্ছ্রসাধন ত্যাগ করিয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান-অনুশীলনের পথে ফিরিয়া গিয়াছে; কিন্তু এই সহজ পথে ফেরার ব্যাপারেও তাহার খেয়ালপ্রবণতা ও আত্মসম্মানজ্ঞানের মাত্রাহীন আতিশয্য প্রকট হইয়াছে। বিলাত যাইবার খরচ সে পিতার নিকট হইতে স্বাভাবিক অধিকারবশে গ্রহণ না করিয়া হরিদাস বাবুর বদান্যতার নিকট ঋণ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। ইহার নীতিগত পার্থকটি দুর্বোধ্য বলিয়াই মনে হয়। রঞ্জনার সহিত তাহার সম্বন্ধটি অনির্ণীত রহিয়াই গেল ও রঞ্জনা সম্বন্ধে তাহার যে কোন বিশেষ কর্তব্য আছে তাহাও তাহার আচরণ হইতে অনুমান করা গেল না। উপন্যাসটি সুখপাঠ্য ও স্থানে স্থানে শক্তিমত্তার পরিচয় দেয়; কিন্তু ইহাতে খেয়ালী কল্পনার ও আকস্মিক সংঘটনের এত বেশী প্রাদুর্ভাব যে ইহা সমগ্রভাবে কোন গভীর জীবন-বোধের ধারণা জন্মাইতে পারে না। কল্পনাবিলাসকে মনস্তত্ত্বের জালে আবদ্ধ করিলেও উহাকে সত্য জীবন-চেতনায় রূপান্তরিত করা যায় না—উপন্যাসটি হইতে এই সিদ্ধান্তেই আসিতে হয়।

'পঞ্চপর্ব' ডিটেকটিভ-জাতীয় উপন্যাস। নানারূপ চমকপ্রদ ঘটনার সন্নিবেশ, রহস্যের জাল-বয়ন ও শেষে রহস্যোদ্ভেদের কৌশলময় পরিণতি—উপন্যাসে এইরূপ বস্তুবিন্যাসই পাওয়া যায়। সুতরাং এখানে চরিত্র-সৃষ্টি বা গভীর জীবনবোধ অপেক্ষা ঘটনা-বৈচিত্র্য ও ইহার সাহায্যে পাঠকের ঔৎসুক্য-উৎপাদনই প্রধান স্থান অধিকার করে। তথাপি মোটের উপর এই নিম্নতর স্তরেও ইহা লেখকের রচনার মুন্‌সিয়ানা ও ঘটনা-সন্নিবেশে কুশলতার পরিচয় বহন করে। এখানে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ পর্যন্ত বাঙ্গালা দেশ বিভাগের ফলে যে উদ্বাস্তু-সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সর্বরিক্ত, প্রতিবেশচ্যুত, করুণ দিকটাই ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বনফুলই একমাত্র ঔপন্যাসিক যিনি ইহার বৈষয়িক বিপর্যয়ের দিক, ইহার মধ্যে কূট-বুদ্ধি-প্রয়োগের অবসরটি লক্ষ্য করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের বেদনাময় কাহিনী, হিন্দু পুরুষের প্রাণরক্ষার জন্য ধর্মান্তর-গ্রহণ ও হিন্দু নারীর ধর্মরক্ষার জন্য প্রাণ-বিসর্জন এই উপন্যাসে ঘটনা-হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এই বর্ণনার মধ্যে কোন শোকোচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠে নাই। কিন্তু পাকিস্থান-হিন্দুস্থানের মধ্যে সম্পত্তি-বিনিময়ের আইন-ঘটিত জটিলতা, উত্তরাধিকার-নির্ণয়ের দুরূহতা ও অনিশ্চয় ও বৈষয়িক লাভের জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস দেশ-বিভাগ সমস্যার সুদূর প্রসারী ও বহুমুখী প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের চিত্তকে সচেতন করিয়া তোলে। এই বহু-আলোচিত, বাদানুবাদ-তিক্ত ও ভাবাতিশয্যে পিচ্ছিল বিষয়ের যে একটা নূতন দিক বনফুলের রচনায় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহা তাঁহার চিন্তার মৌলিকতার একটি প্রশংসনীয় নিদর্শন।

'লক্ষ্মীর আগমন' (কার্তিক, ১৩৬০) উপন্যাসের ছদ্মবেশে একটি জ্যোৎস্নারাত্রের স্বপ্নময় কল্পনা-পদ্ম। ইহার প্রধান উপাদান হইল কৌমুদী-ব্যঞ্জনাময় ভাবাবহের কুহক-সৃষ্টি। কোজাগরী পূর্ণিমার যে শঙ্খধবল চন্দ্রিকা-জাল পৃথিবীকে মায়াময় করিয়া উহাকে লক্ষ্মীর পাদপীঠে পরিণত করে, তাহাই এই গল্পের আকাশ-বাতাসের সূক্ষ্ম ভাবদেহ গঠন করিয়াছে।

ইহার আধুনিকতা ইহার ঘটনা-বিন্যাসে, ইহার চরিত্র-সমস্যা-উপস্থাপনায়, ইহার সুকুমার তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত-সন্নিবেশে ও ইহার বাইরের সীমা-ছাড়ানো অন্তর্মুখীনতায়। যে কল্পনার জোয়ারে প্রকৃত-অতিপ্রাকৃতের সীমা ভাসিয়া যায়, যাহা মনের অস্ফুট অভিলাষকে শরীরী মূর্তি-রূপে ফুটাইয়া তোলে, যাহা লৌকিককে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহার স্থূল অবয়বের মধ্যে অলক্ষিত-ভাবে অলৌকিক ব্যঞ্জনার সঞ্চার করে, তাহাই নিবিড় জ্যোৎস্নাবেশ-রূপে উপন্যাসের অন্তঃ-প্রকৃতির মধ্যে অনুস্যূত হইয়াছে। ইহার মানব চরিত্রগুলি যেন এই জ্যোৎস্না-সমুদ্রের এক একটি ফেন-শুভ্র বুদ্‌বুদ্। ইহার পুরুষগুলি—অভিভাবকত্বে স্নেহপরায়ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ সুখেন, দ্বিজু, বিজু, রাজু এই ভ্রাতৃত্রয়, ইহারা যেন জ্যোৎস্নার মাদকতার এক একটি কণিকা—ইহাদের বিভিন্ন পথ ও সমস্যা যেন চরাচরব্যাপী পূর্ণিমারজনীর শুভ্র আস্তরণে ঢাকা পড়িয়া এক হইয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সুখেন নিরাসক্ত সন্ন্যাসীর ন্যায় অপরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থায় ব্যস্ত, দ্বিজু ও বিজু প্রেমের নেশায় মশগুল, কিশোর রাজু নারীপ্রেমের উগ্রতর মদিরা ধরিবার পূর্বপ্রস্তুতিরূপ সিগারেটের নেশার শিক্ষানবীশী করিতেছে। কিন্তু ইহারা সকলেই জ্যোৎস্না-তুফান-তাড়িত খড়কুটার ন্যায় অসহায়, স্বাধীন-ইচ্ছাহীন। সুখেন গল্প বলিতে বলিতে হাজারবার খেই হারাইয়া ফেলে, অন্তর্গূঢ় প্রেরণার সূত্রে জড়াইয়া পড়ে। দ্বিজু ও বিজুর প্রেমজনিত মানস-অস্বস্তি, চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায়, এই জ্যোৎস্নারজনীর ইন্দ্রজালে বারে বারে উদ্বেলিত হইয়া উঠে—বিজুর কাব্যতত্ত্বব্যাখ্যা প্রেমিকের ভাব-গদগদ প্রিয়া-প্রশস্তির রূপে সামান্য (general) হইতে বিশেষে প্রযুক্ত হইয়া নূতন তাৎপর্য গ্রহণ করে। এই মায়ামুগ্ধ, অশরীরী প্রভাবের আনা-গোনায় রহস্যময় প্রতিবেশে অবনীশ ও নিমাই ডাক্তার খানিকটা বহিরাগত প্রক্ষেপের মতই ঠেকে। অবনীশ যে সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত চন্দ্রালোক-রহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছে তাহাতে অন্তত যে তাহার অনুভূতিশীলতার পরিচয় দিয়াছে। সে যে এই সর্বব্যাপী গূঢ়সঞ্চারী ভাবরোমাঞ্চের অঙ্গীভূত হইয়াছে তাহা তাহার ভাবভঙ্গি ও মন্তব্য হইতেই পরিস্ফুট। আগ্রহশীল, কৌতূহলাবিষ্ট শ্রোতারূপেও সে উপন্যাসে একটা ন্যায্য অধিকার অর্জন করিয়াছে। তথাপি সে যে মৃদুলাকে লাভ করিবার যোগ্য পাত্র, মানবরূপিণী লক্ষ্মীকে প্রেম-বন্ধনে বাঁধিবার উপযুক্ত অধিকারী, তাহার সম্বন্ধে এইরূপ উচ্চ ধারণা আমাদের মনে জন্মে না। নিমাই ডাক্তারের পূর্বতন তিক্ত প্রেম-অভিজ্ঞতা-তাহাকে এই দিব্যালোক-বিহারের খানিকটা স্বত্ব দিয়াছে। সে চন্দ্রাহত বলিয়াই চন্দ্রকিরণে সঞ্চরণে তাহার যোগ্যতা জন্মিয়াছে। তথাপি তাহার উপস্থিতি অনেকটা অভাবাত্মক (negative); সে অনুভব করে না, সতর্ক করে। আকাশ-পৃথিবীব্যাপী জ্যোৎস্নাপুলক তাহার নৈরাশ্যতিক্ত মনে একমাত্র লুব্ধক নক্ষত্রের ক্ষণিক উজ্জ্বলতায় সঙ্কুচিত হইয়াছে। সুখেনের মন হইতে জাতিভেদের আপত্তি দূর করিবার জন্য তাহার আমন্ত্রণ স্বভাবে অসার্থক। জ্যোৎস্নার নীরব মন্ত্র অবলীলাক্রমে যে অসাধ্য-সাধনে সক্ষম, সেই কাজের জন্য মানব প্রতিযোগীরূপে নিমাইএর আবির্ভাব ও সাধারণ যুক্তি-তর্কের দ্বারা তাহার মত-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস প্রতিবেশের সহিত অসমঞ্জস বলিয়া মনে হয়।

নারীচরিত্রসমূহের মধ্যে নিরু ও ফুলি স্বল্প কয়েকটি রেখাতে আভাসিত, তাহাদের পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। নিরু শিক্ষিতা, ঈষৎ দারিদ্র্যকুন্ঠিতা ও সূক্ষ্মতর অনুভূতিসম্পন্না,

তাহার প্রেম সহজেই উদ্রিক্ত ও সামান্য মাত্র উপলক্ষে উদ্বেলিত হইয়া পড়ে। ফুলি অপেক্ষাকৃত স্থূল উপাদানে গঠিত ও অনেকটা আত্মতৃপ্ত। পূর্ণিমা রজনীর প্রভাব ও মৃদুলার ভবিষ্যদ্দর্শী ব্যবস্থাপনা তাহার চরিত্রে প্রেমিকোচিত সূক্ষ্ম অনুভূতির উদ্বোধনে সহায়তা করিয়াছে। সে অনেকটা অজ্ঞাতসারে রামধনের রুগ্ন স্ত্রী ও কাঁদুনে ছেলেটার যত্ন করিতে প্রণোদিত হইয়াছে ও সোয়েটার বোনার পরীক্ষানবিসিতে উত্তীর্ণ হইয়া সুখেনের চিত্ত জয় করিয়াছে। লক্ষ্মীদেবীর সান্নিধ্যে ও তাঁহার নির্দেশ অনুসরণে সেও কিয়ৎ পরিমাণে তদ্‌ভাবভাবিত হইয়া উঠিয়াছে। সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ পরিকল্পনা মৃদুলা-চরিত্রে মূর্ত হইয়াছে। সুখেন নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যে গল্পটি শেষ করিয়াছে তাহাতে মৃদুলার শৈশব-ইতিহাস-রহস্য মানবিকতার সীমা অতিক্রম করিয়া একেবারে পৌরাণিক অতিপ্রাকৃত অবতার-বাদে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। কুড়ান মেয়ে সোজাসুজি লক্ষ্মীপূজার প্রতিমার জ্যোতির্মণ্ডল মধ্যে অবলুপ্ত হইয়াছে। পরে অবশ্য সে মানবিকতার ছদ্মবেশ বজায় রাখিবার জন্য প্রতিমার অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে ও সুখেনের মাতুলপরিবারে প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধা ও প্রকাশ্য অবজ্ঞার মধ্যে লালিত-পালিত হইয়াছে। তাহার মানবজন্মের ইতিহাস তাহার নিগূহিত দেবলীলার হঠাৎ স্ফ বণে মানব অভিজ্ঞতাব অতীত এক অতলস্পর্শ রহস্য-গভীরতায় নিমগ্ন হইয়াছে। জ্যোৎস্নার দিগন্তপ্লাবী বর্ষণ যেন কোন এক অজ্ঞাত প্রক্রিয়ায় এই শান্ত, স্বল্পভাষী, আত্মগোপনশীল অথচ সর্বদর্শী মেয়েটিব মধ্যে সংহৃত হইয়াছে—রজনীর সমস্ত মায়া, কল্লোলিত জ্যোৎস্নাসমুদ্রের সমস্ত ভাব-আলোড়ন এই মায়াবিনীর অন্তর-কন্দরে বন্দী হইয়া কয়েকটি সাধারণ কথা-বার্তা, দুই একটি সামান্য সাংসাবিক কাজের ছন্দে স্থির অচঞ্চল রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মাঝে মধ্যে কাহারও কাহারও চোখে ইহার মানবিক ছদ্মবেশ হঠাৎ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, একটি জ্যোৎস্নার রেখা তাহাব শান্ত মুখমণ্ডলের উপর পড়িয়া উহার অন্তর্নিহিত দেব-মহিমাকে হঠাৎ অবারিত করিয়াছে, অন্ধকাবের একটি ক্ষীণ অন্তরাল উহার অর্ধস্ফুট দেহভঙ্গিমাকে অপার্থিব ভাবগহনতায় আচ্ছন্ন করিয়াছে। কেহ কেহ দ্ব্যর্থহীনভাবে তাহার মধ্যে অতিপ্রাকৃত শক্তির লীলা দেখিয়াছে। তাহার যেটুকু পরিচয় উপন্যাসে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় সে যেন অন্তর্যামীরূপে সকলের মনের কথা টের পায়, সকলের অকথিত ইচ্ছাকে সফল করে, ভবিষ্যতের প্রত্যেক প্রয়োজন পূর্বানুমান-বলে অবগত হইয়া তাহার পূবণের ব্যবস্থা করে। তাহার অন্তর্য্যামিত্ব, নিখুঁত ব্যবস্থাপনা ও পরার্থপরতা এবং অন্তরালবর্তী আত্মগোপনশীলতাই তাহার দেবপ্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ। তাহাকে যদি কেহ কেবল গৃহিণীপনায় সুদক্ষ কাজের মেয়ে বলিয়া মনে করে তাহাতে আপত্তির বিশেষ কারণ নাই; কিন্তু এই উদ্বেলিত জ্যোৎস্নাপারাবারের তীরে দাঁড়াইয়া, জ্যোৎস্নার বিভ্রান্তিকর মাদকতা অনুভূতির মধ্যে গ্রহণ করিয়া ও লেখকের বর্ণনা-ভঙ্গীর ইঙ্গিত সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সচেতন হইয়া মেয়েটিকে কেবল মর্তলোক-চারিণী বলিয়া উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করে না। গ্রন্থখানি উপন্যাস নয়, দেবলোকের রহস্যানুভূতিকে মানব মনে সার্থকভাবে সংক্রামিত করার একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প-প্রচেষ্টা।

(৫)

বনফুলের চতুর্থ পর্বের রচনায় 'স্থাবর' (১৩৫৮) ও 'জঙ্গম'-এ (১৩৫০) আর একপ্রকার

নূতন উপস্থাপনা-রীতি উদাহৃত হইয়াছে। ইহারা পাশ্চাত্ত্য দেশের এক শ্রেণীর আধুনিক উপন্যাসের ন্যায় মহাকাব্যের বিশাল আয়তন ও সামগ্রিক সমাজ-প্রতিবেশের অন্তর্ভুক্তিকে আঙ্গিকের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। 'স্থাবর' রচনার দিক্ দিয়া পরবর্তী হইলেও শিল্পকলা ও ঔপন্যাসিক পরিকল্পনার দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত অপরিণত। এই উপন্যাসে লেখকের উদ্ভাবনী-শক্তি ও প্রাগৈতিহাসিক অতীতের অনুমানসিদ্ধ, কুহেলিকাময় কাহিনীকে চিত্রের মধ্যে সুস্পষ্ট, উজ্জ্বল রূপ দিবার ও মানবিক কল্পনা ও আবেগের সহিত যুক্ত করার আশ্চর্য ক্ষমতা অভিব্যক্ত হইয়াছে। আদিম মানব-ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের ধারণা ও যুগে যুগে ও পরিবর্তিত প্রতিবেশে মানবের বোধশক্তি ও সূক্ষ্মতর অনুভূতির উন্মেষের কাহিনী এই উপন্যাসের বর্ণনীয় বিষয়। যাহা মুখ্যত বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয় ও আদিম মানবগোষ্ঠির বিবরণ-সংগ্রহে ব্যাপৃত নৃতত্ত্ববিদের আলোচনার বস্তু ছিল তাহা ঔপন্যাসিক রীতি ও হৃদয়াবেগ-চিত্রণের অনুগামী হইয়াছে। লেখক ধারাবাহিক কাহিনী ও বিভিন্ন প্রতিবেশ বর্ণনার সাহায্যে এই অস্পষ্টরূপে উপলব্ধ মানব অগ্রগতির রেখাচিত্রটি পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। দলপতির অসপত্ন-অধিকার-পীড়িত ও রিপুশাসিত আদিম মানবের যাত্রারম্ভ-কালে সে কেবল পশুত্ব হইতে কিঞ্চিন্মাত্র উন্নত হইয়াছে। কেবল ক্ষুধা ও কাম এই দুই জৈব প্রবৃত্তির তাড়নায় সে অন্ধভাবে পরিচালিত হইয়াছে। এমন কি কামের সহিত যে ভালবাসার একটা কম-বেশী শিথিল সংযোগ থাকে তাহার ক্ষেত্রে উহারও অভাব ছিল। নারী-মাংসের রূপক নহে আক্ষরিক অর্থটাই তাহার জানা ছিল। তাহার অগ্রগতির প্রথম কয়েকটি পদক্ষেপ প্রতিযোগী যুবক, শিশু ও নারীর অকুণ্ঠিত হত্যার দ্বারা ভয়াবহ ও ন্যক্কারজনক। ধীরে ধীরে একত্র-বাসের ফলে ও পরস্পর-নির্ভরতার প্রয়োজনে পারিবারিক জীবনের প্রথম অঙ্কুর উন্মেষিত হইল। সর্বব্যাপী মূঢ় আতঙ্ক ও সর্বগ্রাসী ক্ষুধার অভিভবের মধ্যে উচ্চতর অনুভূতির স্ফুরণ জাগিল। যে গাছ, পাথর, অগ্নি তাহাকে প্রকৃতির দুরন্ত ক্রোধ রক্ষা করিতে সহায়তা করিয়াছে তাহারাই তাহার মনে দৈবশক্তির প্রথম ইঙ্গিত দিয়াছে। তাহার অন্ধ, প্রবৃত্তি-শাসিত মনে দয়া-মায়া-কৃতজ্ঞতা-ভালবাসা প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিসমূহ ধীরে ধীরে জাগিয়াছে। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে দলবদ্ধ হইবার প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করিয়াছে। অর্ধস্ফুট মানব মনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা এই চিত্রটি উপন্যাসধর্মী হইয়াছে।

মানব-সমাজের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহার ক্রমবর্ধমান বিস্তার ও জটিলতা মানবের জীবন-ইতিহাসের অধ্যায়গুলির মধ্যে উদাহৃত হইয়াছে। পশুকে পোষ মানান ও শস্যের প্রথম সংগ্রহ ও পরে উৎপাদনের দ্বারা মানব তাহার খাদ্যসমস্যার চিরন্তন সঙ্কটকে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ইতিমধ্যে প্রেমের লীলা আরও মাদকতাপূর্ণ, ছলনাময় ও বিভ্রান্তি-জনক হইয়া উঠিয়াছে—ক্ষুধা-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের বিচিত্র-নিগূঢ় আকর্ষণ ক্রমশঃ মানবের নিয়ামক শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর ইহার সহিত মানবের অধ্যাত্মবোধ নানা বিকৃত রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। লোকান্তরিত পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মা মানব-কল্পনার নিকট আবির্ভূত হইয়া তাহার মনকে নিবিড় অপ্রাকৃত ভীতিতে আবিষ্ট করিয়াছে—এই ভীতির মোহ স্বাধীন চিন্তাশক্তির দ্বারা অপনোদন করিতে মানুষকে বহুদিন লাগিয়াছে। গোষ্ঠীদলপতি ক্রমশঃ অলৌকিক শক্তির অধিকারীরূপে, তন্ত্র-মন্ত্র-ইন্দ্রজাল-বিদ্যার পারংগমরূপে প্রতিভাত

হইয়াছে। নানা রহস্যময় ক্রিয়া-কাণ্ডের ভিতর দিয়া মানুষ দৈবশক্তির পরিচয়লাভের চেষ্টা করিয়াছে। ক্রমশ বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা ও মিত্রত্বের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে—এক দল অন্যদলকে আক্রমণ করিয়া শক্তিবৃদ্ধি করিতে চাহিয়াছে। এইরূপে নানা কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীর মধ্য দিয়া, নানা সুষ্ঠু কল্পনার সার্থক প্রয়োগে, আদিম মানুষের অর্ধ-বিকশিত, নানা মূঢ় সংস্কার ও ধারণার জালে আচ্ছন্ন চিত্তের উপর আলোকপাত করিয়া লেখক মানবের অগ্রগতির ইতিহাসকে বৈদিক যুগের সংস্কৃতির সমীপবর্তী করিয়া আনিয়াছেন। রচনাটি অন্ধকারময় আদিম যুগের জীবনযাত্রার উপর পরিণত ঔপন্যাসিক রীতির ও তথ্যানুবর্তী বিশ্লেষণ কুশলতার বিস্ময়কর প্রয়োগের উদাহরণ-রূপে উল্লেখযোগ্য।

তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ 'জঙ্গম' উপন্যাসটিকে বনফুলের ঔপন্যাসিক সৃষ্টির সার্থকতম নিদর্শনরূপে অভিনন্দিত করা যাইতে পারে। এই উপন্যাসে আধুনিক জীবন-যাত্রার বিরাট-সুদূর-প্রক্ষিপ্ত দিগ্‌বলয় ও কেন্দ্রভ্রষ্ট, বিশৃঙ্খল, বহুমুখী, স্বপ্নসঞ্চরণবৎ লক্ষ্যহীন প্রচেষ্টার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ইহা যেন একটা উদ্‌ভ্রান্ত, আদর্শের আশ্রয়হীন জীবনলীলার মহাকাব্য—এক সীমাহীন সমুদ্র-বিস্তারের তটাভিমুখী তরঙ্গ-পরম্পরার অকারণ ওঠা-পড়া। এই বিরাট রঙ্গমঞ্চে কত অভিনেতা-অভিনেত্রী নিছক জীবন-প্রেরণার উচ্ছ্বাসে কত খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ নাটকেব দৃশ্য অভিনয় করিতেছে। এই অভিনয় অর্ধপথে থামিয়া যাইতেছে, কোন অখণ্ড তাৎপর্য ইহার মধ্যে রূপ পাইতেছে না; বিচ্ছিন্ন দৃশ্যগুলি কোন উদ্দেশ্যগত ঐক্য-সূত্রে বাঁধা পড়িতেছে না। এই অসংলগ্ন দৃশ্য-পরম্পরা এক বিরাট, উদ্বেলিত, নানা শাখাপথে ঢুকিয়া-পড়া ও শুকাইয়া-যাওয়া প্রাণোচ্ছ্বাসের পরোক্ষ পরিচয়রূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সমবেত হইয়াছে; কিন্তু ইহারা যে কোন্ নীতির সপক্ষে বা বিপক্ষে যুদ্ধ করিতেছে, কোন্ আদর্শের নেতৃত্বে পরিচালিত হইতেছে, কোন্ নিগূঢ় উদ্দেশ্যের বাহনরূপে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা দুর্বোধ্য থাকিয়া যাইতেছে। এই অবারণ চলা, অকারণ শক্তির প্রযোগ ও অপচয়, নানা পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার দ্বিধা, জীবনমত্ততার পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনোচ্ছ্বাস, দার্শনিক নিরীক্ষাব দৃষ্টিবিভ্রমকারী ঘূর্ণী-চক্র—ইহাই আধুনিক জীবন।

এই অস্থির, অশান্ত, পাকে-পাকে বিঘূর্ণিত আলোড়নরাশি—উপন্যাসের নায়ক শঙ্করের মস্তিষ্কে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহার অনুভূতি-কেন্দ্রে যথাসম্ভব সংহত হইয়া একটা জীবন-তাৎপর্যবোধের উদ্দীপক হেতুরূপে দেখা দিয়াছে। অবশ্য উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রই যে প্রত্যক্ষভাবে শঙ্করের সম্পর্কে আসিয়া তাহাকে প্রভাবিত করিয়াছে তাহা নয়; অনেকেই তাহার সহিত নিঃসম্পর্ক ও তাহাদের সম্বন্ধে তাহার কেবল পরোক্ষ জ্ঞান আছে। এই সমস্ত চরিত্রের অবতারণা কেবল দৃশ্যাবলীর বৈচিত্র্য-সম্পাদনের জন্য বা আধুনিক জীবনের জটিল-প্রকরণ বহুলতা-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য। আবার কোন কোন লোকের সাহচর্যে শঙ্করের বহিরঙ্গমূলক অভিজ্ঞতা বাড়িয়াছে মাত্র, ইহাদের প্রভাব তাহার অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার ব্যক্তি-সত্তাকে পুষ্ট করে নাই। সুতরাং শঙ্করের জীবনদর্শন-পরিণতির বিষয়ে ইহাদের খুব যে একটা সার্থকতা আছে তাহা স্বীকার করা যায় না। তবে ঢেউ-খেলানো তড়াগে মাছের দল যেমন ইতস্তত দ্রুত সঞ্চরণ করিয়াই বড় হইয়া উঠে,

তেমনি বর্তমান যুগের নানাঘাত-প্রতিঘাত-সংক্ষুব্ধ, বেগবান ও বিচিত্ররসাশ্রয়ী জীবন ধারার স্রোতবাহিত হইয়াই তরুণের সংবেদনশীল চিত্ত স্বীয় গঠন ও পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ কলিকাতা মহানগরীর আবিল, নানা শাখা-প্রশাখায় প্রবহমান জীবনস্রোতে কোন যুবককে ছাড়িয়া দিলে সে যে কতরকমের হাবুডুবু খাইবে, কত বিচিত্র সন্তরণ-কৌশল প্রদর্শন করিবে ও নানা ঘাট-আঘাটায় থামিতে থামিতে শেষ পর্যন্ত কোন্ তটভূমিতে নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাইবে তাহার অভাবনীয়তা আমাদের সমস্ত মানব-চরিত্রাভিজ্ঞতা ও পূর্বানুমানকে বিপর্যস্ত করিবে। শঙ্করের ক্ষেত্রে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে—আকস্মিকতার স্পর্শে তাহার চরিত্রে অপ্রত্যাশিতের স্ফুরণ হইয়াছে। তাহার বন্ধুরাও যে তাহার জীবন-বিকাশের পথে বিশেষ অন্তরঙ্গ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। ভন্টু নিজে খানিকটা কৌতূহলোদ্দীপক চরিত্র, তাহার উদ্ভট আচরণ ও অদ্ভুত, অর্থহীন ভাষাতত্ত্ব-প্রয়োগ তাহার উৎকেন্দ্রিক জীবনবোধের নিদর্শন। কিন্তু বিবাহোত্তর জীবনে সে অনেকটা স্তিমিত ও বৈশিষ্ট্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। যে পরিবারের জন্য সে চরম আত্মোৎসর্গ ও কৃচ্ছ্র-সাধন করিয়াছে তাহার সহিত তাহার সম্পর্ক একদিন হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে ও এই বিচ্ছেদের ফলে তাহার সম্ভাবিত মানস প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে লেখক একেবারে নীরব। ভন্টু বন্ধুহিসাবে শঙ্করের জীবনে খানিক সরসতা ও সমবেদনা আনিয়াছে মাত্র, কিন্তু ইহার অতিরিক্ত কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তাব কবে নাই। এমন কি যে উৎপলের সঙ্গে তাহার আজীবন সৌহার্দ্য ও সমপ্রাণতা, যে তাহাকে জনসেবার একটা বিরাট আদর্শের পরিকল্পনা ও উহাকে রূপ দিবাব উপযোগী কর্মক্ষেত্র যোগাইয়াছে, তাহারও প্রভাবের কোন বিশেষ নিদর্শন শঙ্কর-চবিত্রে দেখা যায় না। বরং উৎপলের প্রতি খানিকটা ঈর্ষ্যা ও তাহার সহিত কর্ম-নীতির পার্থক্যটিই বিশেষ করিয়া প্রকট হইযাছে। সুতরাং উপন্যাসটি ঠিক শঙ্কবকেন্দ্রিক হয় নাই। শঙ্কর-জীবনেব পটভূমিকায় ইহাদের খানিকটা গৌণ, অথচ প্রয়োজনীয় স্থান আছে এই পর্যন্ত বলা যায।

তথাপি শঙ্কবেব জীবন-পর্যালোচনাই এই সুবৃহৎ উপন্যাসের কেন্দ্রস্থ অভিপ্রায়, সুতবাং এই কেন্দ্রীয় চরিত্র-উপস্থাপনায লেখকের কৃতিত্বের বিচারই সমালোচনার প্রধান বিষয় হওযা উচিত। শঙ্করের মধ্যে যে সমস্ত প্রবণতা আমবা লক্ষ্য কবি, তাহাদের মধ্যে প্রধান অবদমিত যৌন আকাঙ্ক্ষা, দ্বিতীয় সাহিত্যিক প্রতিভা, তৃতীয় চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও চতুর্থ জনকল্যাণ-বিধানের প্রেরণা। বন্ধু উৎপলকে বিদেশ-যাত্রার প্রাক্কালে বিদায় দিতে গিয়া বন্ধুপত্নী সুরমার সলজ্জ-মধুর, শালীনতাপূর্ণ আচরণ অকস্মাৎ তাহার অন্তরে সুপ্ত যৌন কামনাকে উগ্রভাবে উদ্রিক্ত করিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ষ্টেশনে উপস্থিত বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে মিষ্টিদিদি ও রিণি প্রত্যক্ষভাবে শঙ্করের কামনা-বহ্নিতে ইন্ধন সংযোগের হেতু হইল। হাওড়া ষ্টেশন হইতে ফিরিবার পথে মূর্ছিতা বারবনিতা মুক্তার সহিত অতর্কিত যোগাযোগ এই হুতাশনে ঘৃতাহুতির উপায় উন্মুক্ত করিল। ইহার পব রিণিকে ঘিরিয়া তরুণ মনের অর্ধ-অবাস্তব মোহ-রচনা তাহার চিত্তকে দাহ্য উপাদানে পরিপূর্ণ করিল। মিষ্টিদিদির চটুল হাবভাব ও কামপ্রবৃত্তি উদ্দীপনার প্রায় প্রকাশ্য প্ররোচনা তাহার প্রথম পদস্খলন ঘটাইয়া তাহার অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে রিণির সহিত প্রণয়-স্বপ্ন

চূর্ণ হওয়াতে সে সমস্ত সংযম হারাইয়া মুক্তার সংসর্গে আত্মবিস্মৃতি খুঁজিয়াছে। মুক্তার হিতৈষণা-প্রণোদিত, রূঢ় প্রত্যাখ্যানে তাহার এই কামের নেশা টুটিয়াছে ও সে অনেকটা স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। এই যৌন উপভোগের অভিজ্ঞতা তাহার মানস পরিণতিতে কি উপাদান যোগাইয়াছে তাহা লেখক স্পষ্টভাবে বলেন নাই; তবে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, ইহা তাহার কৈশোর জীবনের স্বপ্নবিলাসের অবসান ঘটাইয়া তাহাকে কিয়ৎপরিমাণে জীবনের সত্য পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কিন্তু এই যৌন লালসার দুর্বারতা তাহার জীবন হইতে কোনদিনই বিলুপ্ত হয় নাই। সে অমিয়াকে বিবাহ করিয়াছে, শুধু আদর্শের খাতিরে নহে, শুধু পিতার বিরুদ্ধে নিজ স্বাধীন মত প্রতিষ্ঠার জন্য নহে, তাহার নারীসঙ্গপিপাসু মনের গোপন প্ররোচনায়ও বটে। অবশ্য অমিয়ার সহিত তাহার বিবাহিত জীবনে কোন উত্তাপ সঞ্চারিত হয় নাই; অমিয়ার শান্ত, স্বামীনির্ভর জীবন ও নিজ অধিকারবোধ সম্বন্ধে তাহার একান্ত নিস্পৃহতা শঙ্করের বাত্যাতাড়িত জীবনে নিশ্চিন্ত ও স্থির আশ্রয়ের আরাম আনিয়া দিয়াছে। স্ত্রী অপেক্ষা মেয়েই তাহার স্নেহকে অধিক উদ্রিক্ত করিয়াছে। অমিযার সহিত আচরণে তাহার পূর্বজীবনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ একবারও শিখায়িত হইয়া উঠে নাই—বোধ হয় তাহাব পূর্ব অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে তাহার প্রত্যাশা ও আগ্রহকে সংযতই করিয়াছে। কিন্তু সুরমার মোহ তাহার মনে বাববার প্রবল ও সময় সময় অসংবরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। অথচ সুরমাব আকর্ষণ তাহার রূপলাবণ্যের জন্য নহে, তাহার মার্জিত রুচি, অভ্রান্ত সঙ্গতিবোধ ও স্নিগ্ধ-মধুর শিষ্টাচারের জন্যই। এই আকর্ষণ শঙ্করের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে ইহা আমাদিগকে জানানো হইয়াছে, কিন্তু ইহার রহস্য উন্মোচিত হয় নাই। শঙ্করের রুচিতে সুরমাকেই কেন বিশেষ কবিয়া ভাল লাগিল তাহার মূল শঙ্করের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেখানো হয় নাই।

শঙ্করের সাহিত্যিক জীবনের বর্ণনা প্রসঙ্গে তাহার এক সাংবাদিক গোষ্ঠীর সহিত মিশিয়া যাওয়ার কাহিনীই প্রাধান্য লাভ করিযাছে। এই সাংবাদিক গোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিশিষ্ট মতবাদ ও আদর্শ, উহাদের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ্যা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উগ্র আত্মসম্মানবোধ ও উদগ্র আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তি, খানিকটা বে-পরোয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা ও উদ্দাম তার্কিকতা—শঙ্করের জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে। এই তর্ককোলাহলমুখর মজলিশে শঙ্করের সাহিত্য-চর্চা যতখানি অগ্রসর হউক আর না হউক, তাহার সামাজিকতা ও আত্মপ্রত্যয় অনেকখানি বাড়িয়াছে। শঙ্কর নিজেও বুঝিয়াছে যে, এই কবির লড়াইএর প্রতিবেশ ঠিক কাব্য-সাধনার অনুকূল নহে, সে মাঝে মধ্যে মনের মধ্যে একটা গ্লানি ও ব্যর্থতাবোধও অনুভব করিয়াছে। তথাপি তীক্ষ্ণ শ্লেষ-বিদ্রূপের প্রয়োগ-নিপুণতায়, সমাজের বিরুদ্ধ মতবাদীদের ভণ্ডামি ও দুর্নীতিকে চাবুক মারার ভিতর দিয়া তাহার অন্তরের জ্বালা খানিকটা প্রশমিত হইয়াছে ও সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে। বিবিধ প্রকৃতির লোকের সহিত মেলা-মেশায় মানুষের চরিত্র-বৈচিত্র্য সম্বন্ধেও তাহার অভিজ্ঞতা বাড়িয়াছে। লোকনাথবাবু ও নিপুদার সহিত তাহার সম্বন্ধ কেবল সাহিত্যিক গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই—তাহাদের অন্তরের জটিলতা ও বিকৃতির পরিচয়ও সে পাইয়াছে। মোটের উপর এই অধ্যায়ে শঙ্করের চরিত্রে একটা দৃঢ়তা ও পরিণতি আসিয়াছে। কৈশোরের

রূপমুগ্ধতা ও ভাববিলাস হইতে প্রৌঢ় জীবনের জনসেবা ও প্রতিষ্ঠান-পরিচালনার দায়িত্বপূর্ণ ভারগ্রহণে যে পরিবর্তন, তাহার প্রস্তুতি আসিয়াছে মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে সংগ্রামশীলতার অনুশীলনে।

ইহার পর শঙ্কর উৎপলের আমন্ত্রণে দেশে ফিরিয়া বন্ধুর জমিদারি-পরিচালনার ভার লইয়াছে ও উৎপলের পরিকল্পনানুযায়ী গ্রামোন্নয়নের উদ্দেশ্যে বহুমুখী কার্যধারার প্রবর্তন করিয়াছে। এই অনুষ্ঠানসমূহ মোটামুটি অধুনা সুপরিচিত সরকারী পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার আদর্শ অনুসরণ করিয়াছে। এখানে শঙ্কর ভারতের দরিদ্র, অক্ষম, পরমুখাপেক্ষী, আত্মোন্নতি-বিমুখ জনসাধারণের সত্য পরিচয় লাভ করিয়াছে। ইহারা দুঃখ ও অভাবে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়াও জীবনের সহজ আনন্দ হইতে বঞ্চিত নহে। ইহাদের উন্নতির জন্য সমস্ত চেষ্টাই ইহারা ব্যর্থ করিয়া দিবে—ইহারা পালপার্বণে অপরিণামদর্শী অমিতব্যয়িতার তাগিদে তাহাদের সমস্ত সঞ্চয় নষ্ট ও অসঙ্কোচে ঋণজালে নিজদিগকে জড়িত করিবে। সমবায়-সমিতি স্থাপন করিয়াও ইহাদিগকে মহাজনের কবল হইতে উদ্ধার করা যায় না। ইহারা মদ খাইবে, চুরি করিবে, অবৈধ যৌন সংসর্গে লিপ্ত হইবে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন লইয়া বৈজ্ঞানিক যুগের নির্দেশ উল্লঙ্ঘন করিবে। অথচ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির কিছুটা ইহাদের মধ্যেই সজীব আছে। তা ছাড়া উপকারী ভদ্রলোক সম্বন্ধে ইহাদের একটা সহজ অবিশ্বাস ও বিমুখতা আছে। এই ভদ্রলোকেরা যে মার্জিত রুচি, পরিচ্ছন্ন পোষাক ও খানিকটা জ্ঞানের উন্নত গরিমা লইয়া ইহাদের প্রতি মুরুব্বিয়ানা করিবে, ইহাদের শিশুর ন্যায় শাসন ও তর্জন করিবে ও ভাল হইবার পথ দেখাইয়া দিবে ইহা ইহারা কিছুতেই মনে-প্রাণে স্বীকার করিবে না। নটবর ডাক্তারই উহাদের প্রকৃত হিতৈষী, শঙ্কর নহে। এই অভিজ্ঞতার ফলে শঙ্করের বইএ-পড়া ধারণা ও রূপকথাসুলভ মোহ বহু পরিমাণে বিপর্যস্ত হইয়াছে ও অশিক্ষিত, মূঢ় গ্রামবাসীর উন্নয়নের প্রায়-অসম্ভাব্যতা বিষয়ে সে অবহিত হইয়াছে। এই অংশে গ্রাম্য চরিত্রের ও জীবনযাত্রার সরস বর্ণনা ও প্রচুর উদাহরণের সহিত সমাজ-তত্ত্বের মনীষা-দীপ্ত বিশ্লেষণ সংযুক্ত হইয়াছে। সমস্ত গ্রাম-সমাজ যেন উহার অগণিত জনসমাবেশ ও এই জনগণের বিচিত্র চরিত্র ও জীবনানুভূতি, উহাদের রীতি-নীতি, সংস্কার-বিশ্বাস, বেদনা-আনন্দের সম্ভার লইয়া আমাদের সম্মুখ দিয়া বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মত চলিয়া গিয়াছে। জীবনের চঞ্চল, বেগবান প্রবাহ আমাদের উপলব্ধিকে কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া যেন একটা অজ্ঞাত প্রাণোচ্ছ্বাসের লীলানৃত্যে ছুটিয়া চলিয়াছে। জীবনের এই পূর্ণতা, ছোটখাট বৈচিত্র্যের মধ্যে এক অখণ্ড ঐক্যের সার্থক ব্যঞ্জনাতেই উপন্যাসটির গৌরব। লেখক কোন চরিত্রকেই খুঁটিয়া বিচার করেন নাই, কাহারও অন্তর-রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখান নাই, কিন্তু সকলে মিলিয়া এক বিরাট জীবনযাত্রার অঙ্গরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। মেলার অভিযাত্রী জনসংঘের ন্যায় সকলেই জীবনের বিপুল আনন্দ-যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করিয়াছে—তাহাদিগকে ঘিরিয়া জীবনের মহোৎসব-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। শঙ্করের মত যে দুই একজন দার্শনিক প্রকৃতির লোক এই চলমান জনসমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া উহাকে লক্ষ্য ও পরিমাপ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা সমুদ্রের অগণিত ঢেউ গুণিবার ব্যর্থ প্রয়াসে বিব্রত ও অভিভূত হইয়াছে। সময় সময় শঙ্কর তাহার ব্যক্তিগত জীবনাসক্তির দ্বারা এই নাম-পরিচয়-

চিহ্নিত, অথচ প্রকৃতপক্ষে অনামিক জনতার সান্নিধ্য হইতে দূরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, নিজের সঙ্কীর্ণ কামনার কক্ষাবর্তনে এই বিরাট সৌরমণ্ডলের যাত্রাপথ হইতে সরিয়া গিয়াছে। এই অপসরণ-প্রবণতাই তাহার আত্মকেন্দ্রিকতার নিদর্শন। শেষ পর্যন্ত শঙ্কর যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে তাহা বিপরীত রকমের ভাববিলাসের পর্যায়ভুক্ত। সে ঠিক করিয়াছে যে, চাষীদের সহিত মাঠে খাটিয়া, তাহাদের সহিত অভিন্ন জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া, নিজ উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তির অভিমান সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া সে উহাদের সত্যিকার হিতসাধনের অধিকার অর্জন করিবে। বলা বাহুল্য যে, এই সমাধানও একটা বিপরীতমুখী ভাবোচ্ছ্বাস-প্রসূত এবং গ্রহণযোগ্য নহে। চাষীদের মধ্যে নামিয়া আসিয়া নহে, উহাদের জীবনমান দীর্ঘ প্রচেষ্টার দ্বারা উন্নত করিয়া, উহাদের চিত্তকে উন্নততর জীবননির্দেশের প্রতি অনুকূল ও গ্রহণশীল করিয়া জনসাধারণের উন্নয়ন সম্ভব হইবে। হয়ত ঔপন্যাসিকের গ্রন্থসমাপ্তির নির্দিষ্টকালে ও সীমিত পরিধিতে এই ফল পাওয়া যাইবে না, হয়ত উপন্যাসের পাতায় এই পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার সমগ্রতা উদাহৃত হইবে না, কিন্তু তত্ত্বান্বেষীর নিকট এইটিই মুক্তির একমাত্র পথ বলিয়া মনে হয়। ঔপন্যাসিক যদি একধারে জীবন-রসিক ও তত্ত্বদর্শী হইতে চাহেন, তবে হয়ত তাঁহাকে এই উভয় আদর্শের মধ্যে একটির নিকট অপরটিকে বলি দিতে হইবে।

উপন্যাসটির প্রধান গুণ ইহার বিস্ময়কর সৃষ্টি-প্রাচুর্য। অন্ধকার রাত্রিতে জোনাকিপুঞ্জের ন্যায় এই উপন্যাসে শত শত প্রাণকণিকা জীবনরস-পানে মত্ত হইয়া ইতস্তত ছোটাছুটি করিতেছে। প্রত্যেক চরিত্রই তাহার স্বল্প আবির্ভাব-কাল ও কর্মপরিধির মধ্যে জীবন্ত। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে ভন্টু, করালীচরণ বকসি, ভন্টুর বাবা বাকু, মুক্তানন্দ ব্রহ্মচারী, অপূর্ব পালিত, ওরিজিন্যাল দশরথ বাবু—এগুলি যেন ডিকেন্সের অতিরঞ্জন-প্রবণতা-প্রসূত উৎকেন্দ্রিক চরিত্রের উদাহরণ। লেখক এক একটি ফুৎকারে ইহাদের মধ্যে প্রাণবায়ু সঞ্চার করিয়া ইহাদিগকে যদৃচ্ছসঞ্চরণের ছাড়পত্র দিয়াছেন। এছাড়া অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ ও অপরাধ-চক্রে নিয়ত ভ্রাম্যমাণ চরিত্রেরও অভাব নাই। মৃন্ময়ের সমস্ত জীবন ভাবাতিরেকের চরম দৃষ্টান্ত। সে অপহৃতা প্রথমা পত্নীর উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রেমপত্র লেখে, দ্বিতীয়া পত্নীর প্রতি উদাসীন থাকে ও যখন সেই দুর্বৃত্ত অপহারকের নাম জানিতে পারে, তখন তহবিল ভাঙ্গিয়া একই জেলে ভর্তি হয় ও সুযোগ খুঁজিয়া তাহার জীবনব্যাপী প্রতিহিংসা-ব্রতের উদ্‌যাপন করে। উৎপলও কৌতুক-রসিক, নির্লিপ্ত গোছের লোক—সে অনেকটা নিস্পৃহভাবে ও অপরের মধ্যবর্তিতায় সাহিত্য-চর্চা ও জনসেবার সহিত আপনাকে সংশ্লিষ্ট করে। সে কখনও নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয় নাই, পরের উপর কার্যের ভার দিয়া উদাসীন দর্শকের ন্যায় দূর হইতে দেখে। কিন্তু তাহার এই আপাত-ঔদাসীন্যের মধ্যে যে দৃঢ়সঙ্কল্প প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহার গ্রাম্য সমাজে অত্যাচারের প্রতিবিধানের প্রচণ্ডতায় ও মহাযুদ্ধে সৈনিকরূপে যোগদানে। মুখুজ্যে মশায় সম্পূর্ণরূপ আদর্শ চরিত্র—বঙ্কিম যুগের পরোপকারী সন্ন্যাসীর আধুনিক সংস্করণ। সন্ত্রাস-বাদ ও রহস্যপ্রধান উপন্যাসের ন্যায় নারীসম্ভোগের জন্য নানা কৌশলময় ব্যবস্থার অবলম্বনও উপন্যাসের বিশাল পরিধিতে বিধৃত জীবন-চিত্রের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। বুদ্ধিজীবিসম্প্রদায়ের মধ্যে নৈতিক শিথিলতা ও পারিবারিক সম্পর্ক-বিকারের উদাহরণ পাই অধ্যাপক মিত্র ও গুপ্তের জীবনে।

স্ত্রীচরিত্রগুলি আরও বিচিত্র ও বহুমুখী। প্রাচীন প্রথার গোঁড়া সমর্থক কুন্তলা দেবী হইতে আধুনিক সংস্কৃতির ছদ্মবেশধারিণী স্বভাব-স্বৈরিণী মিষ্টিদিদি—এই দুই বিপরীত সীমার মধ্যে নানা স্তর ও প্রবণতার প্রতীক নারী-চরিত্র স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়াছে। হাসির মত নিষ্ঠাবতী পতিব্রতা, বেলা মল্লিকের মত দৃপ্ত আত্মসম্মান-জ্ঞানে অটল, মুক্তা ও ফুলশরিয়ার মত আচরণে চরিত্রহীনা, কিন্তু অন্তরে নানা উচ্চ বৃত্তির অধিকারিণী, চুনচুনের মত নীরব ও রহস্যময়ী, শৈলর মত বিবাহিত জীবনে অতৃপ্ত, অমিয়া, সুরমা ও ভন্টুর বৌদিদির মত হৃদয়-সমস্যাহীন ও গৃহকর্মে সন্তুষ্টভাবে নিয়োজিত—নারী-বৈচিত্র্যের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে। লেখক দুই একটি তুলির টানে ইহাদিগের মধ্যে সনাতন-রমণীর কোন-না-কোন দিক ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু কাহারও অন্তরের গভীরে অবতরণ করেন নাই। এক ঝিলিক আলো, একটু অস্ফুট দীর্ঘশ্বাস, অন্তর-বেদনার একটু ক্ষণিক চাঞ্চল্য, মনোভঙ্গীর একটু বিসর্পিত উচ্ছ্বাস, নীরবতার পিছনে অনুদ্‌ঘাটিত রহস্যের একটুখানি ইঙ্গিত—ইহাতেই ইহাদের নারী-সুলভ দুজ্ঞেয়তা ও হৃদয়াবেগের কথঞ্চিৎ পরিচয় মিলে। সংসারের ঘূর্ণীচক্রে আবর্তিত হইয়া বা আকস্মিকতার ধাক্কায় যাহারা পরস্পরের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, সেইসব নর-নারীর সম্পর্ক-বৈচিত্র্যের মধ্যে যে অপরূপ জাল বয়ন হইতেছে, লেখকের দৃষ্টি তাহারই প্রতি নিবদ্ধ। এই জালের ফাঁক দিয়া মানুষগুলির যে অস্ফুট মুখ দেখা যায়, লেখক তাহার বেশী আমাদের দেখাইতে উৎসুক নহেন।

আখ্যায়িকা-গ্রন্থনের ভিতর দিয়া লেখকের মননশীলতা ও সরস বর্ণনা-কৌশল এই দুইই পরিস্ফুট হইয়াছে। এত জটিল ও বিরাট ঘটনাপুঞ্জ ও কর্মশীলতার মধ্যে তাঁহার স্বচ্ছন্দ-বিচরণ সত্যই প্রশংসার্হ। কোন হৃদয়-জটিলতার ফাঁকে তিনি ধরা পড়েন নাই বলিয়া তাঁহার মনোভাবের মধ্যে ক্ষীণ ঔৎসুক্যপূর্ণ নিরপেক্ষতাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবনের দুর্বোধ্যতার তিনি কোন ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন নাই, উদার দৃষ্টি দিয়া ইহার বিসর্পিত বিস্তারকে লক্ষ্য করিয়াছেন। মানুষের অন্তরের জটিলতা নহে, সমাজ-ব্যবস্থার দুর্বোধ ও দুরতিক্রম্য প্রভাব, জীবনদৃশ্যের নানা অতর্কিত বিকাশ ও বর্ণ-বৈচিত্র্য তাঁহার বর্ণনাশক্তি ও বিশ্লেষণ-প্রবণতাকে উদ্রিক্ত করিয়াছে। তাঁহার ছোট গল্পসমূহের মধ্যে ব্যঙ্গ-রসিকের, জীবনের অসঙ্গতির প্রতি তীক্ষ্ণ কৌতূহলের মনোভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি ছোটগল্পের শিল্পরূপ ও ঘটনা-বিন্যাসের যথাযথতা লইয়া বিশেষ মাথা ঘামান নাই—স্বল্পতম পরিসরের মধ্যে ইহার অন্তর্নিহিত পরিহাসটুকু ব্যক্ত করিয়া, অতর্কিতের ধাক্কায় পাঠককে খানিকটা চকিত করিয়া, গল্প শেষ করিয়াছেন। কথামালা, হিতোপদেশ প্রভৃতি প্রাচীন গল্প সংগ্রহে যেমন গল্পের নীতিকথাটুকুই লেখকের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, আধুনিক যুগের বনফুলের গল্পে তদনুরূপ ব্যঙ্গাত্মক অসঙ্গতিটুকু ফুটাইয়া তোলাই যেন গল্পরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার বহু-অনুশীলিত, কুতূহলী মন, তাঁহার পরীক্ষা-প্রবণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁহার জীবনের প্রতিবেশ ও বহিরঙ্গ-বিন্যাস সম্বন্ধে মানস আগ্রহ, তাঁহার নূতন নূতন পরি-কল্পনার চমকপ্রদ আবেদন ও সমস্ত মিলাইয়া বুদ্ধির দ্রুতগামী ক্ষিপ্রতা তাঁহাকে আধুনিক যুগের উপন্যাসিক গোষ্ঠীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট আসন দিয়াছে। নূতন যুগে উপন্যাসের যে রূপান্তর-

সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, নিজ শিল্প-সুষমা ও স্বভাবধর্ম কিয়ৎপরিমাণে বিসর্জন দিয়াও ইহার মধ্যে যে নানাবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান-পরীক্ষা-নিরীক্ষা-কল্পনার তাত্ত্বিক ও ছান্দসিক রূপটি আত্মসাৎ-করণের প্রবণতা লক্ষিত হইতেছে, বনফুলের উপন্যাসাবলী সেই আসন্ন পরিবর্তনের সংবেগ-বায়ুতে পাল মেলিয়া দিয়া অগ্রসর হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

সৃজ্যমান উপন্যাস-সাহিত্য

(১)

উপন্যাসের মত প্রতিদিন নব নব রূপে সৃজ্যমান, নূতন নূতন প্রেরণায় প্রাণবন্ত, পাঠকের রুচি ও তাগিদা মিটাইবার প্রয়োজনে অবিরত আত্মপ্রসারণশীল সাহিত্যের আলোচনায় কোন সীমা-রেখা টানা স্বতঃই অসম্ভব; সমালোচক যেখানে পরিসমাপ্তির ছেদ টানিবেন, ঠিক সেই গণ্ডির অব্যবহিত পরেই নূতন সৃষ্টির অভ্যুদয় তাঁহার সীমা-নির্ধারণ-প্রয়াসকে বিপর্যস্ত করিয়া, তাঁহার শ্রেণীবিভাগের পরিপাটি বিন্যাসকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া, মানচিত্রের মসৃণতাকে বিদীর্ণ করিয়া দিবে। যুগের প্রারম্ভ বা পরিসমাপ্তি কোনটাই কালের নির্দিষ্ট সীমায়নের শাসন মানে না। সাহিত্যের ইতিহাসকে একেবারে অতি-আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রসারিত করিলে হয় অনেক জীবিত লেখকের প্রতিশ্রুতিপূর্ণ রচনাকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বাদ দিতে হইবে, নতুবা সাধারণ-লক্ষণ-নির্দেশের সুশৃঙ্খলতাকে বিসর্জন দিয়া সদ্যোপ্রকাশিত গ্রন্থতালিকা হইতে নামচয়নপূর্বক আলোচনার কলেবরকে অসম্ভব রকম স্ফীত করিতে হইবে। সুতরাং এই উভয়-সঙ্কটের মধ্যে একটা সুবিধাজনক মধ্যপন্থা গ্রহণ ছাড়া উপায়ান্তর নাই। অন্যান্য সাহিত্য-শাখার সহিত তুলনায় উপন্যাসের অবিচ্ছিন্ন অগ্রসর-শীলতা ও অফুরন্ত বৈচিত্র্য-প্রকরণ আলোচনার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করে। কাব্য যতই প্রগতিশীল ও নিরীক্ষাপ্রবণ হউক না কেন উহার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত প্রথানুগত্য আছে। কাব্যে বৈপ্লবিক অভিনবত্ব কিছুদিন পরে একটি প্রথার সৃষ্টি করে এবং এই প্রথার রাজত্বকাল বেশ কিছুদিন স্থায়ী হয়। আজকাল আমরা যাহাকে আধুনিক কবিতা বলি, তাহা এখন আর ঠিক আধুনিক নহে, প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত কাব্য-রীতির কোথাও বা মৌলিক, কোথাও বা অনুকরণাত্মক অনুবর্তন। কিন্তু উপন্যাসে ভারতের ইতিহাসে দাস-রাজবংশের দ্রুত নৃপতি পরিবর্তনের ন্যায় স্বল্পকালের ব্যবধানে আদর্শ ও রচনারীতির একটা ত্বরিত ভাঙ্গাগড়া চলিতেছে। ইহার কারণ উপন্যাসের আঙ্গিকের স্থিতি-স্থাপকতা ও ঔপন্যাসিক সৃষ্টি-প্রেরণার অতর্কিত অভিনবত্ব। উপন্যাসের গঠন কংক্রিটে গাঁথা নয়, ঘটনার ও মানব-মনের চলতি প্রবাহের কোমল পলিমাটি দ্বারা রচিত। তা ছাড়া ঔপন্যাসিক যে মনোভাব লইয়া উপন্যাস লিখিতে বসেন, তাহার মধ্যে যে ক্রিয়াশীল প্রাজাপত্য-লীলা তাহা কাব্যরচনার ন্যায় এতটা ঐতিহ্য-শাসিত নহে, বহু পরিমাণে স্ব-তন্ত্র। প্রবহমান ঘটনাধারা ভাবনা-কল্পনার স্বচ্ছন্দ বায়ু-তরঙ্গ-তাড়িত হইয়া উপন্যাসের তটভূমিতে যে কি ভাবে প্রহৃত হইবে, কিরূপ বঙ্কিম সুষমা-বেষ্টনীতে উহার রেখা-চিত্র অঙ্কিত করিবে, সুঁড়িপথে উহার অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করিয়া উহার ভূমিসংস্থানের কি রূপান্তর-সাধন করিবে তাহা পূর্বতন ঐতিহ্যের দৃষ্টান্তে নির্ণয় করা যায় না। এই স্বাতন্ত্র্য-বিকাশের উদাহরণগুলি

কালের দিক দিয়া যতই আধুনিক হউক, উপন্যাসের রীতি-বৈচিত্র্য উদাহৃত করিবার জন্য ইহাদের আলোচনা অনেকটা অপরিহার্য। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'আরণ্যক' 'মহাস্থবির জাতক', 'সাহেব-বিবি-গোলাম', 'পাতালে এক ঋতু'—এই কয়টি দৃষ্টান্ত হইতেই ইহা স্পষ্ট-প্রতীয়মান হইবে যে, ইহাদের আবির্ভাব উপন্যাসের প্রাক-নির্ধারিত রূপ-রীতির সাহায্যে পূর্ব হইতে অনুমান করা যাইত না।

সুতরাং বর্তমান অধ্যায়ে উপন্যাসের নবতম যাত্রাপথ ও প্রবণতার কিছু পরিচয় দিবার জন্য অচিরকাল পূর্বে প্রকাশিত কিছু কিছু উপন্যাসের আলোচনা করিতে হইবে। বলিয়া রাখা ভাল যে, এই আলোচনা কেবল ভবিষ্যৎ পরিণতির ইঙ্গিতগুলি সুস্পষ্ট করিবার জন্য, চূড়ান্ত মূল্য নির্ধারণের অভিপ্রায়ে নহে।

(২)

আমাদের চোখের সামনে যে উপন্যাস-সাহিত্য সৃষ্ট হইয়া চলিয়াছে উহার মধ্যে কতকগুলি সুস্পষ্ট ধারা লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক মতবাদ ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের আবেগময় সাধনা ইহাদের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে। ঔপন্যাসিকের বিষয়-নির্বাচন প্রধানত সমসাময়িক ঘটনাবলীর জনপ্রিয়তা ও জনমনে অভাবনীয় আলোড়ন জাগাইবার শক্তির উপর নির্ভরশীল। ঔপন্যাসিক অনেকটা সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপিত গণ-আন্দোলনগুলির দিকে চোখ রাখিয়াই নিজ সাহিত্য-সাধনার প্রেরণা আহরণ করেন। তাঁহারা মনে করেন যে, যাহা বহু লোককে আকর্ষণ করিতেছে তাহা স্বতঃই সাহিত্য-সৃষ্টির উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। এইরূপ চিন্তাধারার ফলে, ঘটনার আপাত-আকর্ষণীয়তার উপর অতিরিক্ত আস্থা স্থাপনের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহিত্য দ্রুত সাংবাদিকতার পর্যায়ে নামিয়া আসিতেছে। গণ-আন্দোলনের যে বিপুল উত্তেজনা জোয়ারের বানের মত সাহিত্যের উভয় তট প্লাবিত করিয়া ছুটিয়া আসে, তাহার মধ্যে যদি কোন চিরন্তন ভাব-তাৎপর্য, সার্বভৌম প্রেরণা না থাকে, তবে তাহা জোয়ারের উচ্ছ্বাসের মতই ক্ষণস্থায়ী হইবে। পৃথিবীতে যে সমস্ত বিরাট ভাব-জাগরণ ও রাজনৈতিক উৎক্ষেপ ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে এক ফরাসী-বিপ্লবই শাশ্বত সাহিত্যিক আবেদনে কালজয়ী রূপ গ্রহণ করিয়াছে, কেননা ইহার মধ্যে মানব-মর্যাদার এক চিরন্তন স্বীকৃতি, বস্তুবিপর্যয়ের ভিতর এক আত্মার উদ্বোধনকারী ভাব-সত্য প্রতিষ্ঠা ইহাকে সাময়িকতার ঊর্ধ্বে লইয়া গিয়াছে। অচিরকাল পূর্বে যে রুশ-বিপ্লব ঘটিয়া গেল, তাহা মানবিক অধিকারের আরও ব্যাপকতর সম্প্রসারণ ও গণরাজ-প্রতিষ্ঠার আরও বাস্তব রূপায়ন সত্ত্বেও, মানবচিত্তে আত্মিক সত্যের সূক্ষ্মতর সঞ্চরণশীলতার রূপ গ্রহণ করিতে পারিল না। হয়ত ইহার অর্থনীতির উপর অত্যধিক জোর, মানবের খাওয়া-পরার মানের উন্নয়নের জন্য অতি-আগ্রহ, ইহার কল-কারখানা-রাষ্ট্র-সংগঠনের বস্তু-কাঠামোর উপর একান্ত নির্ভরশীলতা, ও জাতির কল্যাণের জন্যই সমস্ত জাতীয় চিন্তা ও কর্মধারার কঠোর নিয়ন্ত্রণ, জাতির ঐহিক শক্তি ও সুখ-বৃদ্ধির জন্য ইহার স্বাধীন আত্মার নিগূঢ় অবমাননা ইহার ভাবগত আবেদনকে সংকুচিত করিয়াছে।

ইহার বাস্তব সংগ্রামশীলতার সাফল্যই ইহার ভাবজগতে আপেক্ষিক বিফলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশে আগষ্ট-আন্দোলন ও বাস্তহারা-সমস্যা আপাতত আমাদের সাহিত্যসৃষ্টিকে ও বাস্তববোধকে প্রবলভাবে অভিভূত করিয়াছে ইহা সত্য; কিন্তু ইহাদের মানস প্রতিক্রিয়া একটা অস্পষ্ট বিহ্বল ভাবোচ্ছ্বাসের পর্যায় ছাড়াইয়া কোন নিগূঢ় ভাবানুভূতির ধ্রুব দীপ্তিতে পরিণতি লাভ করে নাই। আগষ্ট-আন্দোলনের বিচ্ছিন্ন ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী ও ব্যাপক প্রতিরোধ-প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া জাতির বিদেশী অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার যে দৃঢ়সংকল্প প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সংকল্পটির ললাটে সাহিত্যিক অমরতার জয়-তিলক ভাস্বর হইয়া উঠে নাই। ইহার কারণ আমাদের সাহিত্যিক অক্ষমতা ততটা নহে, যতটা ইহার অন্তর্নিহিত ভাব-অনিশ্চিতি। তেমনি উদ্বাস্তু-সমস্যার মধ্যে জাতির যে শোচনীয় দৌর্বল্য ও চরম অসহায়তা উদাহৃত হইতেছে, তাহার ঔপন্যাসিক প্রতিরূপও তেমনি করুণ ও বীভৎস রসের মধ্যে অনিশ্চিতভাবে আন্দোলিত হইতেছে।—এই বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা-শেকড়-ছেঁড়া-উন্মূলনের দুঃস্বপ্ন-আবর্তনের মধ্যে কোন স্থির মানবিক আবেগের নিঃসংশয় সুরটি, কোন হৃদয়ের গভীরশায়ী, অন্তরের অন্তস্তল হইতে উত্থিত হাহাকার-ধ্বনি বাজিয়া উঠিতেছে না। যেমন রাজনৈতিক স্তরে আমরা বক্তৃতায় আত্মসম্মোহিত হইয়া এই নিদারুণ দুর্ভাগ্যের কোন প্রতিকার খুঁজিয়া পাইতেছি না, তেমনি সাহিত্যিক স্তরেও এক বোবা গুঞ্জন, এক মূঢ় উদ্‌ভ্রান্তি, মৃত্যুতাড়িত পশুর চোখে এক আর্ত বিভীষিকার প্রতিচ্ছায়া ছাড়া ইহার আর কোন সার্থকতর রূপ দিতে আমাদের সাহিত্যিকেরাও কৃতকার্য হইতেছেন না। দান্তের নরকে আর্ত জীবনের হাহাকারের মধ্যে এক স্থির অধ্যাত্ম বিশ্বাসের ঐকতান শোনা যায়; আধুনিক বাংলার নরকে মর্মবিলাপও নানা বেসুরো, আত্মকেন্দ্রিক চীৎকার-ধ্বনিতে বিভক্ত হইয়া উহার ভাবসঙ্গতি ও রসমর্যাদা হারাইয়াছে।

এই রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত ও দেশত্যাগের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ও প্রীতি-মধুর জীবনযাত্রা রমেশচন্দ্র সেন ও অমরেন্দ্র ঘোষ প্রমুখ পরিণতবয়স্ক লেখকদের রচনার উপজীব্য বিষয়রূপে গৃহীত হইয়াছে। এই উপন্যাসগুলিতে চিরদিনের জন্য হারানো ও শতস্মৃতিবিজড়িত মাতৃভূমিকে এক আদর্শায়িত ভাবমাধুর্য-রোমন্থন-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া রমণীয়ভাবে কল্পনা করিবার স্বাভাবিক প্রবণতাই ক্রিয়াশীল। ইহাদের মধ্যে তীক্ষ্ণ স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ব্যক্তিচিত্র অপেক্ষা সামগ্রিক পল্লীজীবনের শান্ত ছন্দ, পল্লীবাসীর পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংঘর্ষে বিচিত্রায়িত জীবনধারার ছবি আঁকার দিকে ঝোঁক বেশী। পূর্ব বঙ্গের নদ-নদী ও প্রাকৃতিক পরিবেশ জীবনযাত্রাকে যেরূপ নিগূঢ়ভাবে প্রভাবিত করে সে সম্বন্ধেও লেখকেরা বিশেষভাবে সচেতন। উপন্যাসগুলিতে প্রধানতঃ মুসলমান চাষী ব্যবসায়ীর জীবন কাহিনী, তাহাদের সামাজিক আচার ও ধর্মসংস্কার, তাহাদের জীবনাবেগ-অভিব্যক্তির বিশেষ উপলক্ষ্য ও ছন্দটি রূপ পাইয়াছে—ইহাদের সহিত নিম্নশ্রেণী হিন্দুদের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কটিও চিত্রিত হইয়াছে। মোটের উপর এই জাতীয় উপন্যাসের মধ্যে অতীত জীবনযাত্রার তিরোভাবের জন্য করুণ দীর্ঘশ্বাস, অনুচ্চারিত অথচ অনুভূতিগম্য মৃদু খেদোচ্ছ্বাস পাঠকের চিত্তে একটি সজল স্পর্শ রাখিয়া যায়। বাস্তব জীবনের ছবি, বস্তুনিষ্ঠতার সহিত রূপায়িত হইতে গিয়া, যুগধর্মে ও লেখকদের বিশেষ মনোভাবের জন্য, দূর হইতে দৃষ্ট দিগন্ত-রেখার ন্যায়, স্বপ্ন-সুষমামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

রাজনৈতিক সংগ্রাম ও রাষ্ট্রচর্চার পর্যায়ভুক্ত উপন্যাসসমূহের মধ্যে দুইখানি উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য-গুণমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে—একখানি সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' ও অপরটি দীপক চৌধুরীর 'পাতালে এক ঋতু'। প্রথম উপন্যাসটিতে কারাগারে বন্দী একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামের যোদ্ধার মৃত্যুমুহূর্ত-প্রতীক্ষায় দুর্বিষহ, স্মৃতিভারাকুল ও কল্পনা জাল-বয়নে রুদ্ধশ্বাস, অন্তিম জীবনের দুঃস্বপ্ন-বিভীষিকার এক অদ্ভুত ব্যঞ্জনাপূর্ণ ও আবেগ-তপ্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। আসন্ন মৃত্যুসম্ভাবনা তাহার সমস্ত অনুভূতিকে এমন একাগ্র ও একলক্ষ্যাভিমুখী করিয়াছে যে, ইহারই টানে তাহার পূর্বজীবনের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত স্মৃতি-সূত্রগুলি অনিবার্যভাবে এই সর্বগ্রাসী ভাবকেন্দ্রে সংহত হইয়াছে। মরণের অঙ্গুলিস্পর্শে জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা, ইহার বিচ্ছিন্ন খণ্ডাংশগুলি, ইহার ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে আবর্তিত আশা-কল্পনাসমূহ নানাতারসমন্বিত বীণার ন্যায় এক দুঃসহ-করুণ, উদ্দাম-ক্ষুব্ধ সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে। বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার বহুমুখী কর্মোদ্যম, তরুণ মনের বিচিত্র স্বপ্নবিলাস, অসম্ভব আদর্শকে রূপ দিবার জন্য নানা অসম্পূর্ণ প্রয়াস, উত্তেজনার তরঙ্গে তরঙ্গে ছুটিয়া-চলা শক্তির অভিযান ও উহাকেও বহুদূরে ফেলিয়া আগাইয়া-যাওয়া কল্পনার অভিসার—জীবনের এই বিরাট প্রবাহ বিলোপের সংকীর্ণ গিরিসংকটে প্রবেশোন্মুখ হইয়া এক দুর্দম, ফেনিল সঙ্গীতো-চ্ছ্বাসে ছন্দিত হইয়াছে। বিপ্লবের বস্তুরূপটি মানবাত্মার অপ্রশমিত আর্তির নিবিড় স্পর্শে একটি সূক্ষ্মতর ভাবসত্তা অর্জন করিয়াছে।

রাষ্ট্রসর্বস্ব জীবনবোধের সহিত ঐতিহাসিক কল্পনা ও মনন-তীক্ষ্ণ সমাজ-বিশ্লেষণ যুক্ত হইয়া 'পাতালে এক ঋতু'র আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ভারতে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার সম্ভাব্য রূপ, শাসন-ব্যবস্থা ও মানবিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি লেখক এই উপন্যাসে কল্পনা সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই কমিউনিষ্ট বিপ্লবের প্রধান ও অপরাপর নায়ক সবই মধ্যবিত্ত পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক জীবন হইতে আগত। পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্র ও সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় ধর্মাত্মক জীবনদর্শনের সমন্বয়ে যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ গত শতাব্দীর শেষ দিকে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারই ধ্বংসজীর্ণতার ফাটল হইতে এই সমাজ-বিপ্লবের কীটসমূহ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের নির্মমতম আক্রোশ এই মধ্যবিত্ত-শাসিত, বুদ্ধিজীবী, খানিকটা আদর্শনিষ্ঠার হাল্‌কা অভিনয় ও খানিকটা পারিবারিক জীবনের সুকোমল হৃদয়বৃত্তির স্বপ্নাবেশের সংমিশ্রণে গঠিত অন্তসঙ্গতিহীন সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। আবার বিপ্লব-নায়কদের মনে পূর্বতন আদর্শের প্রতি একটা করুণ, দুর্বল, মরিয়াও-না-মরা মোহের জন্য বাহিরের সংঘর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মানবিক অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতাও সমতালে বাড়িয়াছে। ভারতীয় কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের প্রধান নেতা দীপক চৌধুরী নিজ কুলধর্মের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, পারিবারিক স্নেহ-ভক্তি-আনুগত্যের দাবী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া, প্রিয়জনের চিরপোষিত আদর্শের প্রতি মর্মান্তিক আঘাত হানিয়া নূতন রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকার ক্রয় করিয়াছে। কিন্তু এই সিংহাসনে বসিয়া সে শান্তি পায় নাই। বিবেকের দংশন, নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিলোপ, পূর্বজীবনের বেদনাময় স্মৃতি, অবদমিত হৃদয়বৃত্তির চাপা ক্রন্দন লৌহ যবনিকার অন্তরাল হইতে এক করুণ গুঞ্জনধ্বনি তুলিয়াছে। গুপ্তচরবৃত্তির নীরন্ধ্র প্রয়োগ, কপট-শিষ্টাচার ও মৌখিক আনু-

গত্যের অন্তরালে প্রতিযোগিতার সদা-জাগ্রত ঊর্ধ্বাভিলাষ, প্রতি-মুহূর্তে নিয়মিত জীবন-যাত্রার যান্ত্রিকতা—এই সমস্ত মিলিয়া এক শ্বাসরোধকারী, অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে।

কিন্তু এই ব্যক্তিজীবনসম্ভূত অস্বস্তিকে বাদ দিলে ও ক্ষমতালাভের জন্য অবলম্বিত উপায়ের নীতিহীনতাকে অনিবার্য রণকৌশলের পর্যায়ে ফেলিলে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা মোটামুটি সত্যনিষ্ঠ ও পক্ষপাতিতাবর্জিত। ইহার কর্মপন্থা ক্রূর ও নির্মম, ইহার ব্যক্তিস্বাধীনতার উন্মূলন সামগ্রিক ও আপোষহীন, ইহার দলগত যন্ত্রপরিচালনা নিশ্ছিদ্র ও কার্যকারী শক্তিতে অতুলনীয়, ইহার যুক্তিবাদ ও ঐতিহাসিক প্রয়োজনের ব্যাখ্যা গাণিতিকভাবে নির্ভুল ও উচ্চতর নীতির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অস্পৃষ্ট। ইহা দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের জন্য মোটেই চিন্তিত নহে, দৈবদুর্বিপাককে ইহা বিরুদ্ধবাদীদের উৎসাদনের অস্ত্ররূপে অকুণ্ঠিত-ভাবে প্রয়োগ করে। ভারতীয় জীবনে ইহার বাস্তব প্রয়োগ প্রধানতঃ দুইটি বাধার সম্মুখীন হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহা ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া প্রবল প্রতিরোধ উদ্রিক্ত করিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ ইহা কৃষকের ভূমিতে ব্যক্তিস্বত্ব অস্বীকার করিয়া ও সকলকে মজুর হিসাবে রাষ্ট্রের অধীনে কাজ করিতে বাধ্য করিয়া ভূমিগতপ্রাণ কৃষকের মনে বিদ্রোহ জাগাইয়াছে। চৌধুরী-বংশের মেয়ে কুকু যৌন জীবনের তৃপ্তি ও নির্ভর হইতে উচ্ছিন্ন হইয়া ভুষণ্ডির মাঠে পুরাতন সমাজবোধ, সম্ভ্রম-মর্যাদা ও দাম্পত্য জীবনের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে। বাস্তহারা অবনী মণ্ডল ও ধর্মপ্রাণ ওবাইদ মোল্লা পুরাতন ধর্মের আকর্ষণকে নূতন করিয়া অনুভব করিবার উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত স্বাধীন-জীবন-স্ফুরণের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে ও নবরাষ্ট্র উহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগে বিপ্লবকে উল্টাইবার এই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিয়াছে। গ্রন্থের প্রতিশ্রুত তৃতীয় খণ্ডে এই সংগ্রামের শেষ পরিণতি দেখান হইবে লেখক এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত দীপক চৌধুরীর আত্মকাহিনী কোন চমকপ্রদ রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারে নাই—তাহার আত্মবিলাপ ও পাঠকের মনে একটা রোমাঞ্চকর, অভাবনীয় প্রত্যাশা জাগাইবার কলাকৌশল কোন সার্থক ফলশ্রুতির দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। কমিউনিষ্ট নীতির বীজ ভারতীয় সংস্কৃতির ভূমিতে উপ্ত হইয়া যে বৃক্ষের জন্ম দিয়াছে তাহা হয়ত বিষবৃক্ষ হইতে পারে, কিন্তু ইহা কোন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অরণ্যতরুর নিরবচ্ছিন্ন বিস্ময় উৎপাদন করে না। লেখকের রচনাশক্তি ও মননশীলতা উচ্চ কৃতিত্বের অধিকারী কিন্তু তাঁহার শাণিত ও সুমার্জিত ধীশক্তি কমিউনিজম-বৃত্রাসুরের বধোপযোগী বজ্রাস্ত্র নির্মাণ করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ।

(৩)

নবীন ঔপন্যাসিকদের রচনায় শ্রমিক-কৃষক ও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের চরিত্রাঙ্কনের একটু নূতন ধরণের প্রবণতা দেখা যাইতেছে। ইতিপূর্বে ইহাদের যে উপন্যাসে স্থান দেওয়া হইত তাহা রাজনৈতিক বা শ্রমিক আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার জন্য। ইহারা কেবল ধনিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অস্ত্ররূপেই, এক তীব্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভের

মুখপাত্ররূপেই উপন্যাসে আবির্ভূত হইত। তাহাদের দারিদ্র্য, অমর্যাদা ও অর্থনৈতিক সমস্যাই উপন্যাসের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে তাহাদের জীবন-যাত্রার একটা নূতন রূপ উপন্যাসের বিষয়ীভূত হইয়াছে। তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে মানিয়া লইয়া, সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ফলে তাহারা যেটুকু অধিকার অর্জন করিয়াছে তাহাকেই ভিত্তি করিয়া তাহারা জীবনের একটা নূতন রীতি ও ছন্দকে, জীবনকে উপভোগ করিবার উপযোগী একটা বিশেষ রুচিবোধ ও মূল্যমানকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আগ্নেয়গিরি চিরকালই যে অগ্নি উদগীরণ করিতে থাকিবে এমন কোন শাশ্বত নিয়ম নাই। অগ্নিস্রাব নিবৃত্ত হইলে, আভ্যন্তরীণ উত্তাপ স্তিমিত হইলে, লোকে পর্বতের অঙ্গারদগ্ধ, গলিত ধাতুর জমাট-বাঁধা পিণ্ডে আকীর্ণ সানুদেশে কুটির নির্মাণ করিয়া জীবনধারণের একটা পাকাপাকি রকম-ব্যবস্থা করিয়া লয়। আমাদের কল-কারখানার কুলি-মজুর, অর্ধ-বুভুক্ষু, প্রাচীন জীবনাদর্শের আশ্রয়-চ্যুত, একটা অনির্দেশ্য শূন্যতাবোধে উদ্‌ভ্রান্ত চাষী-ব্যবসায়ী নূতন যুগের চিত্ত-বিনোদনের স্থূল আয়োজনকে, নূতন রুচির আদর্শ ও সহকর্মিতাব নিবিড়-হইয়া-ওঠা আকর্ষণকে স্বীকার করিয়া জীবনের একটা নূতন ছন্দ-তাৎপর্য অনুভব করিবার পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহাদের মধ্যে বৃত্তির পূর্বতন মর্যাদাবোধ নাই, ইহাদের কণ্ঠে প্রসাদী সঙ্গীত ধ্বনিত হয় না, পল্লীজীবনের সহস্র টান ইহাদের শিরা-স্নায়ুজালের মধ্যে আর পূর্বের মত অনুভব করে না। ইহারা সিনেমা দেখে, ইতর স্ফূর্তির উত্তেজনায় গা ভাসাইয়া দেয়, মদ ও তাড়ির নেশায় জীবনের যান্ত্রিক একঘেয়েমি ভুলিতে চাহে ও কাহারও সহিত গলাগলি ভাব ও কাহারও সহিত ফাটাফাটি ঝগড়া করিয়া জীবনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক রিক্ততাব কঙ্কালকে মানবিক সম্পর্কের মসৃণ আস্তরণে আবৃত করিতে খোঁজে। যে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ভিতর দিয়া এই নূতন শ্রেণী-সমাজের উদ্ভব, তাহার প্রভাব উহাদের মনের তলদেশে প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল থাকে; একটু খুঁড়িলেই এই অন্তরশায়ী চেতনার উত্তাপ বাহিরে ফুটিয়া উঠে। তথাপি রাজনীতির প্রত্যক্ষ-প্রভাব-বর্জিত জীবনবোধই সাম্প্রতিক উপন্যাসে ইহাদের পরিচয়রূপে উপস্থাপিত হইয়াছে।

এই নবছন্দায়িত, নূতন জীবনবোধের সম্ভাবনায় অঙ্কুরিত গণজীবনের ছবি যে সমস্ত উপন্যাসে আঁকা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমরেশ বসুর 'জি. টি. রোডের ধারে', 'শ্রীমতী কাফে' ও বিমল করের 'ত্রিপদী'। 'শ্রীমতী কাফে' তে (অগ্রহায়ণ, ১৩৬০) ভজু লাট, ভুলু গাড়োয়ান, চরণ, মণিয়া প্রভৃতি মানুষগুলি রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিবেশে বাস করে, রাজনৈতিক ঝড়-ঝাপটা তাহাদের জীবনপথকে বারবার বিপর্যস্ত করে, তথাপি তাহাদের প্রাণসত্তা যেন রাজনীতির উপর নির্ভরশীল নয়। যে পাখীরা ঝড়-বিক্ষুব্ধ নীড়ে বাস করে, ঝড় উঠিলে যাহারা কুলায় ছাড়িয়া দিকদিগন্তরে উড়িয়া যায়, যাহাদের জীবনবোধের মধ্যে অতর্কিত বিপদের আশঙ্কা গোপন অস্বস্তির মত পীড়া দেয়, অথচ যাহাদের কল-কাকলী এক অদম্য, নিগূঢ়শায়ী প্রাণশক্তির উৎস হইতে নিঃসৃত, তাহাদের সহিত এই ভাগ্যহত, জুয়ারি জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, অথচ প্রাণবেগচঞ্চল নর-নারীর তুলনা হয়। 'শ্রীমতী কাফে'-তে রাজনৈতিক বিক্ষোভ একটি প্রধান স্থান অধিকার করে, উপন্যাসের নর-নারীর স্তিমিত প্রাণধারা এই জোয়ারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, ইহারই উত্তাপ তাহাদের শিরা-স্নায়ুতে বিচিত্র স্বপ্নাবেশের

সৃষ্টি করে। উত্তেজনা প্রশমিত হইলে আবার ইহারা ঝিমাইয়া-পড়া, অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় ফিরিয়া যায়। 'জি. টি রোডের ধারে' রাজনীতির প্রত্যক্ষ-প্রভাবশূন্য, যদিও যন্ত্র-শিল্প-সংশ্লিষ্ট শ্রমিক জীবনের অনিশ্চয়তা, ছাটাইএর ভয় ও সমাজবন্ধন ও মানবিক সম্পর্কের অনিয়মিত, নীতিহীন শিথিলতা এই উপন্যাসের জীবনচিত্রের পটভূমিকায় সুপরিস্ফুট হইয়াছে। এই বস্তিবাসীদের সমস্ত জীবন-প্রচেষ্টা ও পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে একটা করুণ উদ্‌ভ্রান্তি, জীবনের কৃপণ হস্ত হইতে যতটুকু দাক্ষিণ্য আদায় করা যায় তাহার জন্য একটা রুদ্ধশ্বাস ব্যস্ততা, একটা ক্ষণিক, বঞ্চনাপ্রবণ আরামের জন্য সম্ভ্রমবোধহীন কাঙ্গালপনা অসুস্থ দেহে রোগবিকাশের লক্ষণের মত উগ্রভাবে প্রকট হইয়াছে। ইহাদের জীবন একটু অসম, অস্বাভাবিক ছন্দের দোলায় অস্থির ও অশান্ত। ইহাদের হাসি-কান্না, আমোদ-ব্যসন, ভালবাসা-বিরাগের মত্ত আতিশয্য ও মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তনশীলতা, পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ—মিতালির দ্রুত ওঠা-নামা, খেয়ালের ক্ষণিক উচ্ছ্বাসে অতর্কিত মোড় ফেরা এবং অপরিণতবুদ্ধি শিশুর ন্যায় এক বলিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণের নিকট আত্মসমর্পণের জন্য ব্যগ্রতা—এ সমস্তই গণজীবনের এক নূতন বিন্যাসরীতি, মানবিক বৃত্তিসমূহের এক অজ্ঞাত-পূর্ব কক্ষাবর্তনের সূচনা করে। ইহাদের সম্মিলিত জীবনোচ্ছ্বাস যেন মৌচাকের মধুমক্ষিকাদলের স্ফুটবাক্ গুঞ্জনধ্বনির ন্যায় শোনায়। ইহাদের আবেগের মধ্যে স্থির ছন্দ-নিয়ন্ত্রণের অভাব বলিয়াই ইহার বহিঃপ্রকাশ অস্বাভাবিকরূপে তীব্র ও মাত্রাতিরিক্ত। ইহাদের ভালবাসা কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়ে, অপরিমিত সোহাগে নিঃশেষিত হয়, হঠাৎ-টানে ছিঁড়িয়া যায়; ইহাদের প্রণয়-প্রতিযোগিতা অন্ধকারে নিঃশব্দ-সঞ্চার সরীসৃপের মত অকস্মাৎ বিষদাঁত বসাইয়া দেয়, কখনও বা ক্ষুব্ধ নৈরাশ্যে উৎকট আত্মপীড়নের গহ্বরে মাথা লুকায়। এখানে জীবনের রুগ্ন, শীর্ণ, বঞ্চিত রূপটি বড় করুণভাবে আত্মপ্রকাশ করে। মৃত্যুপথযাত্রী শিশু বিলাত গিয়া বড়লোক হইবার স্বপ্ন দেখে, যে জীবন এ যাত্রায় তাহাকে ফাঁকি দিল তাহার অনাস্বাদিত মাধুর্য কল্পনার সাহায্যে উপভোগ করে। রূঢ় সত্য শঙ্কাতুর, আত্মবঞ্চনাপ্রবণ মাতার নিকট হইতে অনেক স্নেহময় ছলনার দ্বারা গোপন করিতে হয়। অনেক মিথ্যা কলহ মিটাইতে হয়, অনেক অলীক অভিমানে সান্ত্বনা দিতে হয়, অনেক ব্যর্থ প্রণয়ের জ্বালাকে আশার স্নিগ্ধস্পর্শে প্রশমিত করিতে হয়, অনেক অবুঝ ঝোঁককে শান্ত করিয়া ঠিক পথে চালাইতে হয়। এই উপন্যাসের ছন্নছাড়া জীবন-জটিলতার কেন্দ্রস্থলে বসিয়া যে ব্যক্তি জট ছাড়াইয়াছে ও সূত্র-সংযোজনের কৌশলে প্রত্যেকটি জীবনকে সরল পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিয়াছে সে গোবিন্দ ছুতার ওরফে ফোব-টোয়েনটি। তাহারই নির্ভুল ও স্নেহশীল পরিচালন-নৈপুণ্যে, তাহার মানবচরিত্রজ্ঞানপ্রসূত কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রণে আমরা এই বস্তির বিকৃত, তির্যকরেখাঙ্কিত, পারস্পরিক সম্পর্কের বহুমুখী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-সমাবেশে দুর্বোধ্য জীবনযাত্রার সত্য ও সহজ রূপটি প্রত্যক্ষ করিতে পারি।

বিমল করের 'ত্রিপদী' উপন্যাসে কয়লা-কুঠির শিল্পাঞ্চলে তিন বন্ধুর—মন্মথ, চারু ও দেবলের ইয়ারকি-ফূর্তির রঙীন সূতায় জড়ানো, একত্রীভূত জীবনের বিসর্পিত গতি, নানা দমকা হাওয়ায় আল্‌গা হওয়া ও খুলিয়া-যাওয়া বিচ্ছেদ-প্রবণতার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য এই বন্ধুত্রয়ের মধ্যে যোগসূত্র নিতান্তই আকস্মিক ও পল্‌কা; এক জায়গায় বসিয়া মদ খাওয়া ও হল্লা করা ছাড়া ইহাদের মধ্যে আর কোনও গভীরতর সমপ্রাণতার নিদর্শন নাই। তথাপি এই ইতর

আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়াও তাহাদের মধ্যে যে খানিকটা সত্যিকার সৌহার্দ্য ও যৌথজীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন কি, চারুর সহিত বকুলের বিবাহিত সম্পর্কের উপরেও এই যৌথ প্রভাব খানিকটা প্রসারিত হইয়াছিল। তাহার পর মন্মথর সাংসারিক জ্ঞান ও স্বেচ্ছাকৃত সংযমের জন্যই অপর দুই বন্ধু হৃদয়ের অধিকারের অংশীদারত্ব প্রত্যাহার করে। কিন্তু তথাপি দেখা গেল যে রক্ত যেমন জলের চেয়ে ভারি, তেমনি নারীর আকর্ষণ বন্ধুত্বের বন্ধন অপেক্ষা শক্তিশালী। সার্কাসের দলের মেয়েদের লইয়াই এই ত্রয়ীর সম্পর্কে বিচ্ছেদ-রেখা পড়িল। লীলাবতীর প্রণয়-অর্জনের তাগিদে দেবল তাহার দৈহিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া পূর্ব-প্রণয়ী আয়ারকে স্থানচ্যুত করিল। চারুর কোমলতর প্রকৃতি এই মোহিনীর আকর্ষণ-জালে জড়াইয়া পড়িয়া তাহার পূর্ব-প্রণয়িনীর প্রতি বিশ্বস্ততা ও বন্ধুত্বের মর্যাদারক্ষা এই উভয় প্রকার কর্তব্যকেই অস্বীকার করিল। লীলাবতী শেষ পর্যন্ত দেবলের অসুর শক্তি অপেক্ষা চারুর কোমল নমনীয়তাকেই বেশী পছন্দ করিয়া তাহাকে আশ্রয় করিয়াই নিরুদ্দেশ-যাত্রার পথে পদক্ষেপ করিল। এই আকস্মিক আঘাত দেবলের প্রাণোচ্ছল সত্তার উপর নিদারুণ প্রতিক্রিয়া জাগাইল। সে কম্পাউণ্ডারের ভ্রাতুষ্পুত্রী, শিক্ষা-দীক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনায় উচ্চতর পর্যায়ভুক্ত গৌরীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। লীলাবতী তাহার মনে যে শূন্যতাবোধ জাগাইযাছিল, তাহা পূর্ণ করিবার একটা প্রবল প্রয়োজনবোধ তাহার মনে চিরন্তন বুভুক্ষার ন্যায় অশান্ত শিখায় জ্বলিতে লাগিল। যাহার প্রেমের চেতনা একবার উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে সে আর ভাটিখানায় বন্ধু-সংসর্গে তৃপ্তি পায় না—প্রণয়ের উগ্র সুরা যাহার রক্তে নেশা জাগাইয়াছে, সে আর বন্ধুত্বের জলো মদের স্বাদ অনুভব করে না। যখন সে বুঝিয়াছে যে, গৌরী তাহার অপ্রাপনীয়া তখন সেও পরিচিত আবেষ্টনের মায়া কাটাইয়া অজানা পথে উধাও হইয়াছে। ত্রয়ীর মধ্যে একা মন্মথই বাকী রহিল—তাহার হিসাবী ব্যবসায়বুদ্ধি ও প্রেমের উত্তাপ-অসহিষ্ণু, ইতর-ব্যসনরত ভোগাসক্তি তাহাকে প্রণয়ের দুর্গম পথের পথিক হইতে দেয় নাই। এই উপন্যাসে এক দেবলের চরিত্রই খানিকটা গভীরভাবে আলোচিত হইয়াছে, অন্যান্য চরিত্রের পরিচয় খুব আল্‌গা ভাবেই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু লেখকের কৃতিত্ব প্রতিবেশ-রচনার সুষ্ঠু সঙ্গতিবোধ ও রূপায়ন-কৌশলে, সার্কাসের ভিতরকার জীবনের ব্যঞ্জনাময় চিত্রণে ও আখ্যান-বিন্যাসের সুপরিকল্পিত ও সুমিত সীমানির্দেশে। এখানেও আমরা আধুনিক যুগে মানবের মিলন-ক্ষেত্রের যে অভাবনীয় প্রসার ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে সমাজ-জীবনের এক নূতন গঠনসূত্রের পূর্বাভাস অনুভব করি।

(৪)

আধুনিক যুগে নানা নূতন গবেষণা ও তথ্যসংগ্রহের ফলে যে ঐতিহাসিক চেতনা উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে, তাহারই প্রেরণায় তরুণ ঔপন্যাসিক-গোষ্ঠীর মধ্যে কেহ কেহ ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রচনার দিকে ঝুঁকিয়াছেন। এই সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক উপন্যাস কিন্তু অতীত-যুগের আদর্শকে অনুসরণ না করিয়া ভিন্ন পথে চলিয়াছে। ইহাতে যুদ্ধ-বিগ্রহের উন্মাদনা নাই বা রোমান্সের চকিত অভাবনীয়তাও দীপ্তি বিকীরণ করে না। কোন ইতিহাস-বিশ্রুত

নায়কও ইহার কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইহার ঘটনার রশ্মিজাল ও ভাবকল্পনার উর্ধ্ব-চারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে না। এগুলি নিতান্তই তথ্য-সংকলন ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি-রচনার সাহায্যে যুগের বাস্তব পরিচয়টি পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করে। বর্তমান যুগের ইতিহাস ব্যক্তিকেন্দ্রিক নহে, জনসাধারণের জীবনযাত্রার রীতি ও অর্থনৈতিক মানের বিবরণ। কাজেই ইতিহাসের পরিবর্তনের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া ঐতিহাসিক উপন্যাসও এখন মাটির কাছাকাছি নামিয়া আসিয়াছে। পূর্বতনকালে অতীত জীবনচিত্র-পুনর্গঠনের ব্যাপারে যে কল্পনাশক্তির সৃষ্টি-ধর্মী, অন্ধকার-নিরসনকারী প্রয়োগের অবসর ছিল, এখন তাহার কোন ক্রিয়া দেখা যায় না। সে যুগের মনেরও যে চমকপ্রদ অভাবনীয়তা, আদর্শ-নিষ্ঠা, অধ্যাত্ম সাধনা ও অতিপ্রাকৃত সংস্কারে মেশানো আলো-আঁধারি রহস্যগহনতা ছিল, তাহা বর্তমান যুগের শিক্ষা-দীক্ষার সমীকরণ-প্রভাবে অনেকটা বৈশিষ্ট্যহীন ও সাধারণধর্মী হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজ-শাসনের প্রবর্তনে দেশেব শিল্প-বাণিজ্য কি করিয়া ক্ষয় পাইল, সাধারণ পণ্যদ্রব্যের মূল্য কি করিয়া বাড়িয়া গেল, বেকার-সমস্যার উদ্ভব হইল ও স্থানচ্যুত শিল্পীরা কৃষির ক্ষেত্রে ভিড বাড়াইল, নূতন আইন-কানুন, কল-কারখানা, রেল প্রতিষ্ঠা, ভিটে-মাটি হইতে গৃহস্থের ব্যাপক উচ্ছেদ জনসাধারণের মনে কি বিস্ময়-উৎকণ্ঠা-মিশ্রিত প্রতি-ক্রিয়ার সৃষ্টি করিল—এই সমস্ত অর্থনীতির মূল কথাগুলাই গল্পের সাহায্যে ও সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের জীবনযাত্রার মাধ্যমে উপন্যাসে বলা হইয়াছে। সদ্যো-অতীত যুগের চরিত্রসমূহও খুব জীবন্ত হইয়া উঠে নাই, তাহাদের সমস্যার গুরুভার তাহাদের জীবন-শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। দূরের ইতিহাসেব কুহেলিকা যেমন হাতছানি দিয়া টানে, কাছের ইতিহাসের ধূলি-যবনিকার আডালে সেরূপ কোন রহস্যময় আমন্ত্রণের আকর্ষণ নাই।

এই নূতন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির উদাহরণ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গৌড মল্লার', সমরেশ বসুর 'উত্তরঙ্গ' ও স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যাযের 'চন্দনডাঙ্গার হাট' প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। 'গৌড মল্লার' সুদূর অতীতের কাহিনী, 'উত্তরঙ্গ' ও 'চন্দনডাঙ্গার হাট' অদূর অতীতে সংঘটিত ইংরেজ বাণিজ্য-পত্তনের ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান-গঠনের ইতিহাস। 'উত্তরঙ্গ'-এ সিপাহী-বিপ্লবের রণক্ষেত্র হইতে পলায়িত এক হিন্দুস্থানী সিপাহীর সেন-পাড়া-জগদ্দলের এক বাগদী-পরিবারে আশ্রয়গ্রহণ ও ঐ পরিবারভুক্ত হইয়া যাওয়ার কথা বলা হইয়াছে। তৎকাল-প্রচলিত অন্ধ ধর্মসংস্কার তাহাকে মনসার কৃপায় পুনর্জীবিত মৃত-ব্যক্তি ও মনসার অনুগ্রহভাজন—এই পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাহার পুনর্জন্ম ও গ্রামে আবির্ভাব সমকালীন বলিয়া গৃহীত হওয়ায় তাহার পূর্ব ইতিহাস সম্বন্ধে সমস্ত কৌতূহল প্রশমিত হইয়াছে। তাহার আসুরিক শক্তি ও যৌন আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার সঙ্গে শিশুসুলভ সরলতা ও পারিবারিক আনুগত্য মিশ্রিত হইয়া তাহাকে একাধারে সমাজের মধ্যে বিশিষ্টতা ও সমাজ-জীবনের সহিত সহজ সংযোগ দিয়াছে। কাঞ্চন বৌর উপর অধিকার লইয়া তাহার সহিত নারায়ণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ যুগবৈশিষ্ট্যের একটি সত্য ইঙ্গিত দেয়—কিছুদিন পূর্বে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে নারী যে কখনও কখনও বীর্যশুল্কা ছিল ও এইরূপ অবৈধ সম্পর্ক যে সমাজপতির অনুগ্রহে সমাজ-সমর্থন লাভ করিতে পারিত জীবনযাত্রার এই পরিচয়ই ইহাতে নিহিত আছে। তথাপি লখাই স্বভাবতঃ শান্ত ও সমাজ-শাসনের বাধ্যই ছিল, সে যে অসামাজিক যৌন-

আকর্ষণ স্বীকার করিয়াছে, সে জন্য নারীর দিক হইতেই প্ররোচনা বেশী আসিয়াছে। কিন্তু গ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় কল-কারখানার প্রতিষ্ঠায় গ্রামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার ভাঙ্গন—গ্রামের চাষা-কারিকর অভাবের তাড়নায় চটকলে কাজ করিতে যাইতে বাধ্য হইয়াছে ও কারখানার নূতন আবহাওয়া ও কুঠিয়াল সাহেবদের অসংকোচ ইন্দ্রিয়-লালসা ও যথেচ্ছাচার তাহাদের সমস্ত শৃঙ্খলাবোধ ও ধর্মসংস্কারকে উন্মূলিত করিয়াছে। রেল-গাড়ীর প্রচলনও উৎপন্ন শস্যকে বিদেশে চালান দিয়া কৃষকের আর্থিক স্বচ্ছলতাকে নষ্ট করিয়াছে। উচ্চবর্ণের জীবনচিত্রও অল্পাধিক পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে—সেন বাবুদের প্রবাদ-বাক্যে পরিণত বদান্যতা, সংস্কৃত টোলের ছাত্রের আদিরসপ্রবণতা ও সৌন্দর্যমুগ্ধতা, প্রথম ইংরেজী শিক্ষার উন্মাদনা, 'দুর্গেশনন্দিনী'র শিক্ষিত মহলে বিপুল সমাদর ও বিস্মিত অভিনন্দন প্রভৃতিও সংক্ষিপ্তভাবে উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এক মুহূর্তের জন্য অশ্বারোহী-বেশে আবির্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু গেঁয়ো লোকের নিকট তাঁহার পরিচয় যুগান্তরকারী সাহিত্য-স্রষ্টারূপে নয়, উচ্চপদস্থ হাকিমরূপে। যাহা হউক, মোটের উপর উপন্যাসের গ্রাম্য নর-নারীর জীবনছন্দটি, তাহাদের জীবনের সামগ্রিক রূপ ও ভাব-দ্যোতনা অতীত যুগের চিহ্নাঙ্কিত হইয়াছে ও তাহাদের স্বাভাবিকত্ব আমরা মোটামুটিভাবে মানিয়া লই।

'চন্দনডাঙার হাট্'-এ বিদেশী-বণিকের অত্যাচারে ও বিদেশী সূতা ও কাপড়ের আমদানিতে বাঙ্গালার বস্ত্রশিল্পের বিপর্যয়ের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। বাঙ্গালী দালালের সহযোগিতা ও ঘরভেদী বিভীষণের অংশ অভিনয়ের ফলেই তাঁতির উৎসাদন দ্রুততর ও নিশ্চিততর হইয়াছে। জমিদার তাঁতিদের রক্ষা করিতে গিয়া সিপাহীর গুলিতে প্রাণ হারাইয়াছেন ও সমাজের স্বাভাবিক নেতা ও রক্ষকের অভাবে সমাজও ছন্নছাড়া হইয়া পড়িয়াছে। এই অর্থনৈতিক সংগ্রামের পটভূমিকায় রতন ও চন্দ্রা, ও প্রহ্লাদ ও নীরুর প্রেমের কাহিনীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এই প্রেমচিত্রগুলি আধুনিক যুগের ছাপমারা বলিয়া মনে হয়। উপন্যাসের মানুষগুলির চলা-ফেরা, কথাবার্তা ও জীবন-নীতির মধ্যেও অতীত যুগ-বৈশিষ্ট্যসূচক কোন লক্ষণ দেখা যায় না। সূতা-কাটুনির দুঃখ নিবেদন করিয়া যে চিঠিখানি 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এই গ্রামেরই এক হতভাগিনীর লেখা—এই কল্পনার দ্বারা লেখক তাঁহার উপন্যাসে একটি ঐতিহাসিকতার সুর ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু একটু অনুধাবন করিলেই বোঝা যাইবে যে, এই চিঠির মনোভাব ও সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে যে মনোভাব ও জীবনদৃষ্টি ফুটিয়াছে তাহা এক নহে। Thackeray-র Esmond-এ Spectator হইতে উদ্ধৃত রচনাগুলির সহিত সমগ্র উপন্যাসের রচনাভঙ্গী এমনই অভিন্ন যে, উপন্যাসটি Spectator এর সমকালীন বলিয়া মনে হয়, ইহা যে পরবর্তী যুগের কল্পনাপ্রসূত এরূপ ধারণা হয় না। যাহা হউক সাম্প্রতিক লেখকের মধ্যে অচিরগত অতীতের সত্য পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করিবার, উহার জীবনযাত্রার মধ্যে আমূল রূপান্তরের ক্রমবিবর্তিত ছন্দটি নিরূপণ করিবার যে প্রেরণা দেখা দিয়াছে, উহার তথ্যানুসন্ধিৎসার সহিত প্রাণ-প্রতিষ্ঠাকারী কল্পনার সংযোগ ঘটিলেই আমরা উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক উপন্যাসের পুনরুজ্জীবন প্রত্যক্ষ করিব এরূপ আশা যুক্তিসঙ্গতভাবে পোষণ করা যাইতে পারে।

(৫)

গার্হস্থ্য পল্লীজীবনের সাধারণ রূপ ও সমস্যাগুলি অনেকটা অবিকৃত অবস্থায় ও বস্তুনিষ্ঠ মনোভাবের সহিত আলোচিত হইয়াছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাসগুলিতে। ইহা হইতে মনে হয় যে, অতিরিক্ত আদর্শবাদ, ভাবোচ্ছ্বাস ও মনস্তাত্ত্বিক ঘোর-প্যাঁচের আতিশয্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আবার সহজ জীবনযাত্রায় প্রত্যাবর্তন কোন কোন ঔপন্যাসিককে আকৃষ্ট করিতেছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দ্বীপপুঞ্জ', 'দেহমন' (বৈশাখ, ১৩৫৯) ও 'দূরভাষিণী' (আশ্বিন, ১৩৫৯) উপন্যাসগুলিতে এই পরিবর্তনের সুস্পষ্ট নিদর্শন মিলে। ইহাদের মধ্যে 'দ্বীপপুঞ্জ' সম্পূর্ণ পল্লীজীবনের কাহিনী ও উহার ছোটখাট-সমস্যা ও হৃদয়-সংঘাতের মনোজ্ঞ ও বাস্তবানুসারী চিত্র। নানা-পরিবার-সমন্বিত, প্রতিবেশীর মধ্যে বিরোধ ও সদ্ভাব-সহৃদয়তার ক্ষণভঙ্গুর ঢেউএ স্পন্দিত, তাহাদের পারস্পরিক প্রভাবে আত্মকেন্দ্রিকতার কক্ষপথ হইতে মুহুর্মুহুঃ বিচলিত সমগ্র গ্রাম্যজীবনের দৈনন্দিন সংসারযাত্রা এখানে অঙ্কিত হইয়াছে। লেখকের মন্তব্য পরিমিত, উপলক্ষ্যেব সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ও মনস্তত্ত্বের আড়ম্বর-বর্জিত হইলেও চরিত্র-বৈশিষ্ট্য-উদ্‌ঘাটনের ইঙ্গিতবাহী। নবদ্বীপ তাহার উচ্ছৃঙ্খল পুত্র মুরলীর আচরণে একসঙ্গে লজ্জিত ও গর্বিত , এই শাসন-প্রশ্রয়, লজ্জা-গৌরবের সংমিশ্রণেই তাহার পিতৃপ্রকৃতি গঠিত। উপন্যাস মধ্যে প্রধান সমস্যা মঙ্গলার সহিত তাহাব স্বামী সুবল ও প্রেমিক মুরলীর সম্পর্ক-জটিলতা-বিষয়ক। স্ত্রীর পরপুরুষাসক্তির আবিষ্কারে সুবলের আচরণ সঙ্গত ও স্বাভাবিক হইয়াছে। কিন্তু মুরলীর ফাঁদে ধবা দিবার সময় মঙ্গলার মনোভাব অনেকটা অনিশ্চিতই রহিয়া গিয়াছে। সুবলের সহিত সম্পর্কে সুদীর্ঘ আত্মনিবোধই তাহার নূতন আকর্ষণে আত্মসমর্পণেব মূল কারণ বলিয়া মনে হয়—তাহার দৃঢ় চরিত্র ও পাতিব্রত্য খ্যাতির নীচে যে গোপন অতৃপ্তিব ফাঁক ছিল সেই ফাঁক দিয়াই কলঙ্কিত প্রেম তাহাব অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। মুরলীর প্রতি তাহার সতীস্ত্রীসুলভ ঘৃণা ও অবজ্ঞাব মধ্যে তাহাব বে-পরোয়া আচরণের জন্য একটা সপ্রশংস স্বীকৃতিও প্রচ্ছন্ন ছিল—ইহাই আক্রমণ মুহূর্তে তাহাব প্রতিরোধ-শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করিয়া দিয়াছে। মুবলীব কামনার নিবিড় আলিঙ্গন যখন তাহার দেহকে বেষ্টন কবিয়া ধরিয়াছে তখন তাহাকে যেন অনেকটা সম্মোহিত ও অসাড় বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু তাহার পরবর্তী আচরণ প্রমাণ করে যে, তাহার দেহের অধঃপতনে তাহার মনেরও সায় ছিল। গ্রাম্য লম্পট মুরলীর ভোগবাসনায় আবিল ও আত্মতৃপ্তিতে স্থূল মনোলোকে ভাবের আনা-গোনা সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে, তথাপি মনে হয় যে, তাহার মান-অপমান-জ্ঞানহীন, লালসাময় চরিত্রে কিছুটা মহত্তর উপাদান যেন আত্মপ্রকাশের জন্য প্রতীক্ষমান। লক্ষ্য করিবাব বিষয় এই যে, লেখক কোথাও মঙ্গলার এই অবৈধ প্রেমকে আদর্শ-দীপ্তিমণ্ডিত করেন নাই—ইহা তাহার মনের কক্ষে কক্ষে ধূমায়িত হইয়াছে, কোথাও সুস্পষ্ট উপলব্ধি ও অসঙ্কোচ প্রকাশের উগ্র-শিখায় জ্বলিয়া উঠে নাই। অশিক্ষিত পল্লীনারীর যে রোমান্সের নায়িকা হইতে কোন ইচ্ছা নাই তাহার প্রমাণ শেষ দৃশ্যে মঙ্গলার সুবলকে প্রাণপণে আঁকডাইয়া ধরিয়া জলে ডোবা হইতে আত্মপ্রাণ-রক্ষার ব্যাকুল প্রচেষ্টা। সে আত্মহত্যার সংকল্প গ্রহণ করিয়া নৌকায় উঠিয়াছিল, কিন্তু মরণের সামনা-সামনি দাঁড়াইয়া জীবন-মমতাই তাহার মনে জয়ী হইল। মনে হয় যে, ইহা তাহার ভাবী-জীবনের ইঙ্গিত

—সে সুবলকে ধরিয়াই সংসার-নদীর ঘোলা জলে নিমজ্জন হইতে আপনাকে রক্ষা করিবে। মঙ্গলার চরিত্র-বিশ্লেষণে আরও একটু গভীরতা প্রত্যাশা করা যাইতে পারিত, কিন্তু মোটের উপর পল্লীজীবনের সংকীর্ণ গণ্ডি ও সরল ধারার মধ্যে যতটুকু মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা থাকা স্বাভাবিক, লেখক তাহা নিপুণতা ও পরিমিতি-জ্ঞানের সহিত পরিবেশন করিয়াছেন।

'দেহমন' উপন্যাসে রুবি অবাধ যৌন সম্পর্কে আস্থাশীল, দেহ-সৌন্দর্যের বিনিময়ে ভোগ-বিলাস-পরিতৃপ্তির জন্য উৎসুক আধুনিক এক শ্রেণীর তরুণীর প্রতিনিধি। তাহার পরিকল্পনার মূলে আছে নারী-প্রগতির একটি বিশেষ theory. রুবির জীবন এই theory-র ছাঁচে ঢালা —সে যাহা ভাবে, যাহা বলে, যাহা করে সবই এই পূর্বধারণার মূর্ত বিকাশ। কিন্তু theoryর কৃত্রিম বাষ্পস্ফীত তাহার সত্তার মধ্যে জীবনের সহজ নিঃশ্বাসবায়ু প্রবাহিত। তাহার সংলাপের মধ্যে আঘাত-প্রতিঘাতের তীক্ষ্ণতা, চরিত্র-দ্যোতক স্বাভাবিকতা ও উদ্দাম জীবন-শক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। কুহেলিকার অস্পষ্টতা-ঘেরা দ্বীপে জাতা মৎস্যগন্ধা theoryর ব্যবধান অতিক্রম করিয়া সহজ জীবনের পদ্মগন্ধা নারীতে পরিণত হইয়াছে। উমা ও বিভাস প্রখর ব্যক্তিত্বের স্বকীয়তায় মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-জীবনের বৈশিষ্ট্যহীন, বাঁধা ছকের জীবনযাত্রা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে। কিন্তু উপন্যাসের যেটি প্রধান সমস্যা—উমা ও বিভাসের সহিত রুবির সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন—সেটির সম্বন্ধে বিশেষ আলোকপাত হয় নাই। উমার সহিত তাহার গলায়-গলায় ভাব, তাহার অন্তরঙ্গ সখিত্ব এক মুহূর্তেই ঈর্ষ্যার আঁচে ঝলসাইয়া গিয়া নিবিড় ঘৃণা ও বিদ্বেষে পরিণত হইযাছে। কিন্তু বিভাসের শুচিবায়ুগ্রস্ত বিমুখতা রুবির কলঙ্কিত জীবন-কাহিনীর সহিত পরিচিত হইবার পর যে কেমন করিয়া বেপরোয়া, উদ্ধত প্রণয়-আকর্ষণে রূপান্তরিত হইল তাহার রহস্য অনুদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে। হয়ত বাস্তব জীবনে এইরূপ অতর্কিত পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, কিন্তু উপন্যাসে আমরা এই পরিবর্তনের বিবৃতিতে সন্তুষ্ট হই না, ইহার আভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণ প্রত্যাশা করি। লেখক সে প্রত্যাশা পূর্ণ করেন নাই। তাঁহার উপন্যাসেব নামকরণ প্রেমের আকর্ষণের মধ্যে দেহ ও মনের যে বিভিন্নরূপ অংশ ও আবেদন আছে তাহার স্বীকৃতি ও স্বতন্ত্র অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কাযতঃ দেখা গেল যে, বিভাসের প্রেম যে কেবল রুবির মানস সঙ্গের জন্যই আকাঙ্ক্ষিত তাহা তাহার পরিবার ও সমাজ স্বীকার করে নাই—সুতরাং উহার মধ্যে দৈহিক লালসা প্রত্যক্ষভাবে না থাকিলেও দেহ মনের আধার বলিযা ইহা অপরিহার্যভাবে দেহ পর্যন্ত প্রসারিত হইতে খুঁজিয়াছে। Theory-প্রভাবিত জীবনরূপায়নের মধ্যে লেখক যে এতটা উত্তপ্ত জীবনীশক্তি ও বাস্তববোধ সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছেন ইহাতেই তাঁহার কৃতিত্ব।

দূরভাষিণী (আশ্বিন, ১৩৫৯) টেলিফোনে কাজ-করা মেয়েদের জীবন-কাহিনী ও হৃদয়-চর্চার ইতিহাস। কিন্তু ইহাদের যে সমস্যা তাহা যে কোন অফিসে চাকরী-করা তরুণী-সম্বন্ধে প্রযোজ্য, টেলিফোনের সঙ্গে ইহার বিশেষ কোন সংশ্রব নাই। মধ্যবিত্ত সংসারের দারিদ্র্যের পীড়নে অকস্মাৎ অনভ্যস্ত জীবনযাত্রার জোয়ালে-বাঁধা এই মেয়েদের বঞ্চিত, বুভুক্ষু হৃদয়ে ভালবাসার জন্য একটা প্রবল আকুতি জাগিয়া উঠে, কিন্তু যান্ত্রিক কর্তব্য-পালনের ভিতর দিয়া তাহাদের স্বভাব-সৌকুমার্য ও আবেগের সরসতা শুষ্ক হইয়া যায়। ইহাই তাহাদের জীবনের ট্রাজেডি। তাহারা ভালবাসাকে আকর্ষণ করে, কিন্তু পরুষ, ঝাঁজালো

মেজাজের জন্য উহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। আত্মমর্যাদা-সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন, অপ্রসন্ন চিত্তে ক্ষোভ সহজেই সঞ্চিত হয় ও সামান্য-মাত্র উপলক্ষ্যে ফাটিয়া পড়ে। আবার কর্মসূত্রে পুরুষের সহিত অবাধ মেলামেশা উভয় পক্ষেই একটা অলীক প্রেমের ভ্রান্তি সৃষ্টি করে। বীণা ও মৃন্ময়ের সম্পর্ক এই প্রতিকূল প্রতিবেশ-প্রভাবে সংশয়ে আবিল ও আত্ম-পরিচিতির অনিশ্চয়তায় হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে—উপচিকীর্ষা ও কৃতজ্ঞতা প্রেমের ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়া মোহভঙ্গে আরও তিক্ত প্রতিক্রিয়া জাগাইয়াছে। কমলার সমস্যা অন্যবিধ—সে স্বামীর অমতে চাকরী লইয়া, স্বামীর অন্যায় জিদে ও তাহার নিজের স্বাধীন-চিত্ততার বাড়াবাড়িতে নিজ দাম্পত্য সম্পর্ককে বিধ্বস্ত করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত বীণা মৃন্ময়ের রূঢ় প্রত্যাখ্যানের দুঃখ ভুলিবার জন্য ও নিজের মাতৃমনোভাবের তৃপ্তির জন্য অসহায়, অস্থিরমতি, শিশুর ন্যায় আত্মকেন্দ্রিক ও পরনির্ভরশীল শিল্পী কমলার দাদা বিমলকে বিবাহ করিয়াছে। কমলার মৃত্যুতে একই প্রকারের শোক-বিহ্বলতা এই দুই বিপরীত-প্রকৃতি নর-নারীর মধ্যে একটা স্নেহ-বন্ধন রচনা করিয়াছে। বীণার মত মেয়ের উদ্‌ভ্রান্ত, স্থির-অবলম্বনহীন, ও নানা কাজের হৈ-চৈ-এর মধ্যে আত্মবিস্মৃতি-খোঁজা জীবনে বিবাহ যেন প্রেমের পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়াই, টেলিফোনের ডাকের মত আকস্মিকভাবেই হাজির হয়। মৃন্ময় বিবাহ সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত মন ঠিক করিতে পারে নাই—বীণার প্রতি তাহার একটা অস্বীকৃত আকর্ষণ যেন রহিয়াই গিয়াছে। যে সাংবাদিক এই গল্প-রচয়িতারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহার মন্তব্য ও উপন্যাসের গঠন ও প্রেরণার সমস্যা বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কল্পনা, ঔপন্যাসিক রসটিকে ঘনীভূত না করিলেও, উহার বাস্তব উপভোগ্যতা বাড়াইয়াছে।

একটি নির্ভেজাল সংসার-জীবনের বেদনা-মথিত, অথচ না-পাওয়া সুখের বঞ্চনা-বিধুর ছবি অঙ্কিত হইয়াছে প্রতিভা বসুর 'বিবাহিতা স্ত্রী' উপন্যাসে (বৈশাখ, ১৩৬১)। এই উপন্যাসে জীবনের যে স্থূল, বস্তুতন্ত্র, নির্লজ্জ অধিকার-প্রয়োগের দ্বারা বিড়ম্বিত দাম্পত্য সম্পর্ক রূপায়িত হইয়াছে তাহার মধ্যে কোলমূলভ ভাববিলাস বা কল্পনাপুষ্ট আদর্শবাদের স্থান নাই। প্রমীলার চরম ইতরতা, অমার্জিত, অশালীন রুচি ও নীরন্ধ্র স্বার্থপরতার যে ছবি আঁকা হইয়াছে তাহার রেখা-বিন্যাস ও বর্ণপ্রলেপের মধ্যে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, চিত্রকরের তুলির কোন অনিশ্চিত কম্পন অনুভূত হয় না। বোধ হয় গ্রন্থকর্ত্রী নারী বলিয়াই নারীচিত্র-অঙ্কনে এতটা নির্মম, ভাবলেশহীন বাস্তববোধের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন। অথচ প্রমীলা যে অতিরঞ্জনের জন্য অস্বাভাবিক বা অবিশ্বাস্য হইয়া পড়িয়াছে তাহা নহে—তাহার মধ্যে যে বাস্তবতার বীজ নিহিত তাহাই পারিবারিক দৃষ্টান্ত ও অনুকূল প্রতিবেশের সহায়তায় এইরূপ উৎকট আতিশয্যে পল্লবিত হইয়াছে। তাহার প্রাণকেন্দ্র কোন মানবিক সম্পর্কের কোমল ভূমিকে আশ্রয় করে নাই, লোভ ও স্বার্থপরতার নীরস, নিরেট পাষাণখণ্ডের মধ্যেই তাহার প্রতিষ্ঠা। পিতা যজ্ঞেশ্বরের প্রতি তাহার আনুগত্যের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির কোন স্পর্শ নাই—যে মুহূর্তে পিতার সহিত তাহার স্বার্থের সংঘাত ঘটিয়াছে সেই মুহূর্তেই সে তাহার আজীবন স্নেহসম্পর্ককে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাহার স্বার্থবুদ্ধির স্প্রিংএ দম-দেওয়া যান্ত্রিক গতির পরিবর্তনে সে একবার যজ্ঞেশ্বর, আর একবার তাহার ঘৃণিত, অবজ্ঞাত স্বামী সুনির্মলের পায়ে মাথা কুটিয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাহার অটল আত্মবিশ্বাস ও অসংকোচ আত্মপ্রসারণ সমস্ত

বাধা-বিঘ্নের উপর জয়ী হইয়া তাহাকে ভাঙ্গা সংসার ও জ্বলিয়া-পুড়িয়া যাওয়া গৃহস্থালীর অবিসংবাদিত একাধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—পাথর ও মাথার সংঘর্ষে পাথরেরই টিঁকিয়া থাকার শক্তি প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রমীলার বিরুদ্ধে যে সমস্ত শক্তি প্রতিরোধের উদ্যম করিয়াছিল, তাহাদের সকলের মধ্যেই একটা উচ্চতর জীবনাদর্শপ্রসূত দুর্বলতা পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহার শাশুড়ী হিরণ্ময়ী, স্বামী সুনির্মল ও মাতা সুধাময়ী তাহার প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির স্রোতোচ্ছ্বাসে তাড়িত হইয়া দাঁড়াইবার দৃঢ় ভূমি পান নাই। মা ও ছেলের মধ্যে একটু সূক্ষ্ম অভিমান, একটু নীতিগত পার্থক্য উহাদের প্রতিকূলতাকে সংহত হইতে দেয় নাই, প্রমীলা এই দ্বিধা-বিভক্ত, চলচ্চিত্ততায় চঞ্চল ও আত্ম-অবিশ্বাসী বিরোধের মাঝখানে স্থির অটল পাষাণমূর্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। মাতা-পুত্রের মধ্যে এই ঈষৎ অভিমান-স্পৃষ্ট-মনান্তর সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় বহন করে। হিরণ্ময়ী, সুনির্মল, সুধাময়ী সকলেই ব্যর্থ, সকলেই ভদ্র সংস্কারের, মিথ্যা পারিবারিক আদর্শের মোহে বিমূঢ়, সকলেই আত্মবিশ্লেষণের চক্রাবর্তনে অগ্রগতির পথে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই যোগ্যতমের উদ্বর্তননীতির ফলে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিয়াছে।

এই অত্যন্ত স্থূল ও রুক্ষ বস্তুতান্ত্রিক পরিবেশে একটি বিপরীত স্নিগ্ধ-করুণ প্রেমেব রোমান্স ভীরু পুষ্প-সৌরভের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুনির্মল ও শকুন্তলার মনেব স্বপ্নময় প্রণয়াবেশটি তুলির অতি লঘুটানে, বর্ণবিন্যাসের অতি সূক্ষ্ম কারুকাযে, একটি সুকুমার, আত্মবিস্মৃত অনুভূতিব রূপে উপন্যাসের শ্বাসরোধী দাবদগ্ধ আবহাওয়ায় ফুটিয়া উঠিযাছে। এই প্রেম-চিত্রাঙ্কনে কোন আতিশয্য, কোন অপরিমিত ভাবোচ্ছ্বাস, কোন সচেতন কাব্যস্পর্ধী প্রয়াস নাই—ধূলিজঞ্জালস্তূপের মধ্যে অকস্মাৎ-বিকশিত ফুলের ন্যায় ইহা যেন কুৎসিতের মর্মস্থলে সুন্দরের অলক্ষিত অভিযান। যে প্রাকৃতিক নিয়মে অসহ্য গুমোটের পব গ্রীষ্ম অপবাহ্ণে মেঘের স্নিগ্ধ শ্যামলতা সারাদিনব্যাপী তাপের উপশমরূপে আবির্ভূত হয, ঠিক সেই নিয়মেই প্রমীলার জুগুপ্সিত সংসর্গের পরে মনের নিদারুণ শূন্যতা ও অস্বস্তির হাত হইতে রক্ষার জন্য শকুন্তলাব সুধা-সিঞ্চিত স্নেহস্পর্শ সুনির্মলের প্রতি প্রসারিত হইয়াছে। এই বোমান্স বাহিব হইতে আরোপিত নহে, ইহা উপন্যাসের অন্তর-লোক হইতে স্বতঃ-সমুত্থিত, ইহার ভাব-সাম্যরক্ষার সুষ্ঠু উপায়স্বরূপ উন্নত শিল্পবোধেব দ্বারা প্রবর্তিত। রোমান্স এখানে উদগ্র বা অতিমুখর হইয়া উঠে নাই, ইহাব সংযত সুষমা ও কুণ্ঠিত মাধুর্য, মরুভূমিব উপরে প্রসারিত স্বচ্ছনীল আকাশের ন্যায়, উপন্যাসের ঊষর, বস্তুপিণ্ডপীড়িত ভূমিসংস্থাব সহিত এক অদ্ভুত ছন্দ-সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছে।

উপন্যাসটির আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহার গার্হস্থ্য জীবনের পরিপূর্ণ ও সার্থক রসাস্বাদন। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপ্রধান যুগে পরিবাব উহার স্বতন্ত্র ভাবসত্তা হারাইয়া কেবল একটা বৈষয়িক আশ্রয়-ভূমির হীনতর পর্যায়ে অবনমিত হইয়াছে। আজকাল পারিবারিক জীবন কেবল মাথা-গোঁজার ঠাঁই, ইহা কেবল বিচ্ছেদ ও মনোমালিন্যের উপলক্ষ্য ও কারণ, কেবল উদ্ভিদ্যমান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যরূপ পক্ষী-শাবকের ভঙ্গপ্রবণ আশ্রয় ডিমের খোলস। ইহা টানিয়া রাখে না, কাটিয়া যাইবার প্রেরণা যোগায়; ইহা শান্তির নীড় নহে, অশান্তির বিস্ফোরক শক্তির আধার। সুতরাং আধুনিক উপন্যাসে পরিবার-জীবনের এই অভাবাত্মক,

আদর্শসংঘাত ও রুচি-বৈষম্যের উত্তেজক রূপটিই পরিস্ফুট হইয়াছে। এমন কি মহিলা-ঔপন্যাসিকদের রচনাতেও পরিবারের সমষ্টিগত সত্তা-সম্বন্ধে চেতনা ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। এই দিক দিয়া বর্তমান উপন্যাসটি একটি অসাধারণ ব্যতিক্রম। হিরণ্ময়ী যে সংসারের কর্ত্রী-পদে প্রতিষ্ঠিত, যাহার সেবা-পরিচর্যা তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত, সেই সংসারটি তাঁহার কাছে একটি জীবন্ত সত্তা। ইহার আনন্দ-রস, ইহার পুরুষ-পরম্পরাসংক্রামিত সমৃদ্ধি-সম্ভার, ইহার স্মৃতি ও ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠান, ইহার অলঙ্কার-সঞ্চয়েব মধ্যে পূর্বপুরুষের আশীর্বাদের সঞ্চার, ইহার সুখ ও আরামের উত্তপ্ত স্পর্শ-মাখানো গৃহসজ্জা ও আসবাবপত্র—সমস্ত মিলিয়া পরিবারজীবনের একটি ভাবঘন, রস-সমৃদ্ধ, বস্তু-অতিসাবী মহিমা রূপ পাইয়াছে। পরিবার সম্বন্ধে পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গির পুনরুদ্ধাবের নিদর্শনরূপে এই উপন্যাসটি এক নূতন ভবিষ্যতের নির্দেশ বহন করিতেছে।

(৬)

কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগেব মধ্যে ফেলা যায় না এমন কয়েকখানি উচ্চাঙ্গের উপন্যাস সাম্প্রতিক কালে বচিত হইয়াছে। ইহাদেব মধ্যে বিমল মিত্রের 'সাহেব-বিবি-গোলাম', প্রেমাঙ্কুব আতর্থীব 'মহাস্থবির জাতক' ও সতীনাথ ভাদুড়িব 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উল্লেখ-যোগ্য। 'সাহেব-বিবি-গোলাম' সম্পর্কে যে বাদবিতণ্ডার তুমুল ঝড় উঠিয়াছিল, তাহা উহার সাহিত্যিক উৎকর্ষেব সহিত নিঃসম্পর্ক ও প্রধানতঃ লেখকের ঋণগ্রহণের নৈতিকতামূলক। যদি উপন্যাসেব কোন অংশ অন্য লেখক হইতে বিনা স্বীকৃতিতে উদ্ধৃত হইয়া থাকে, তাহা সমসাময়িক যুগের রং ফলানোর উদ্দেশ্যে—ইহা নীতির দিক দিয়া দোষাবহ হইতে পারে, কিন্তু লেখকেব শক্তির দৈন্যই যে তাঁহার ঋণগ্রহণেব কারণ ইহা প্রমাণিত হয় নাই। এই উপন্যাসে লেখক তারাশঙ্কব-প্রবর্তিত ক্ষয়িষ্ণু জমিদাব-গোষ্ঠীব জীবন-চিত্রণ-ধারার অনুসরণ কবিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাব মৌলিকতা দৃশ্যপট-পরিবতনে ও চিত্রাঙ্কনেব সামগ্রিকতায় ও ব্যঞ্জনা-ধর্মিত্বে। উপন্যাসবর্ণিত জমিদাব-গোষ্ঠী পল্লীগ্রামের ভূস্বামী নহেন, কলিকাতার বুনিয়াদী ধনী পবিবার—ইহাদের সঙ্গে মৃত্তিকাব যোগ খুব যৎসামান্য। ইহাদেব মধ্যে আদিম বর্বর শক্তির কোন নিদর্শন নাই, ইহারা ঐশ্বর্যলাভের গোড়া হইতেই বিলাস-ব্যসনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিযা, নানা বিচিত্র খেয়াল চরিতার্থতাকেই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিয়া, নানা জটিল পারিবাবিক প্রথা ও আচাবের জালে আপনাদেব স্বাধীন জীবন-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে কুণ্ঠিত ও বিড়ম্বিত করিয়া নিজেদের জীবনের উপব জড়তা ও অবক্ষয়েব ছাপ গভীর রেখায় অঙ্কিত করিয়াছেন। মেজবাবু, ছোটবাবু, ছুটুকবাবু– ইহাবা সকলেই অকর্মণ্য ধনীর দুলালের একটু সামান্য ইতর-বিশেষ সংস্করণ, যদিও ছুটুকবাবু শেষ পর্যন্ত আধুনিক শিক্ষার কল্যাণে খানিকটা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছেন ও ধনীবংশের সামগ্রিক বিলুপ্তি হইতে যুগোপ-যোগী মানস বৃত্তির সাহায্যে আত্মরক্ষায় সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের আসল আকর্ষণ ঠিক বাবুদের চরিত্র-চিত্রণে নহে, পর্দাঢাকা অন্দর মহলের অনামিকতার উপর উজ্জ্বল নাম-স্বাক্ষবে, ও ভৃত্যরাজতন্ত্রেব অলিগলি-সন্ধানী, মূঢ় প্রভুভক্তির সহিত তীক্ষ্ণ স্বার্থবুদ্ধির সংযোগ-বৈশিষ্ট্যের উদ্‌ঘাটনে। রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে আমরা যে ভৃত্যরাজতন্ত্রের কথা শুনিয়াছি, এখানে

তাহারই একটি পরিপূর্ণ, ব্যক্তিত্বদ্যোতনায় তীক্ষ্ণ ও সমগ্রপরিবেশব্যাপ্তিতে প্রসারিত ছবি পাই। এখানে মনিব ও গৃহিণীদের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ ফুটিয়া উঠে ঝি-চাকরের সহযোগিতায়, তাহাদের পরোক্ষভাবে ব্যক্ত ইচ্ছার সাগ্রহ রূপায়নে। কর্তার মদের গেলাস ও গৃহিণীর প্রসাধনের উপকরণ ইহারা হাতে হাতে যোগাইয়া ইহাদের মনের অর্ধব্যক্ত অভিপ্রায়কে বাস্তব রূপ দান করে, ইহাদের নিরালম্ব, বায়ুভূত সত্তাকে রক্ত-মাংসের উপকরণে রূপান্তরিত করে। ভৃত্যের অক্সিজেন গ্যাস নিঃশ্বাসবায়ুতে টানিয়া ইহারা পূর্ণ জীবনীশক্তি লাভ করে—এ পুতুল-নাচের দড়িটি তাহাদেরই কর-ধৃত।

উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রগুলি মোটামুটি সুপরিচিত শ্রেণীবিন্যাসেরই অনুবর্তন করিয়াছে—উহারা পূর্ণতরভাবে অঙ্কিত, কিন্তু উৎকটভাবে মৌলিক নহে। ইহার সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ আবিষ্ক্রিয়া নারী-চরিত্রের মধ্যে উদাহৃত। অভিজাতবংশের সমস্ত ব্যাধিগ্রস্ত বিকার নারীসত্তায় এক সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়ায়, এক উদাসীন জীবন-নির্লিপ্ততায়, এক সর্বস্বপণ জুয়াড়ি মনোবৃত্তিতে, এক দুর্নিরীক্ষ্য চারিত্রিক অবক্ষয়ে রূপায়িত হইয়াছে। ছোটবৌঠাকুরাণীর জীবন-ইতিহাস বংশানুক্রমিক অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার এক অনিবার্য ভয়াবহ পরিণতি। যে সুস্থ, সুনিশ্চিত দাম্পত্য জীবন নারীর রমণীয়তার সহজ বিকাশের মূলে, তাহার সুচিরস্থায়ী নিরোধ যে একটা নিদারুণ বিপর্যয় ঘটাইবে তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও মনস্তত্ত্বসম্মত। ছোট বৌ স্বামীকে বশ করিবার জন্য হিন্দু নারীর চিরপোষিত সংস্কারকে বিসর্জন দিয়া মদ ধরিয়াছে—হতভাগিনী মনে করিয়াছে যে রূপের নেশার ক্ষীয়মান আকর্ষণ মদের নেশার দ্বারা পুষ্ট হইয়া পলাতক প্রেমকে ধরিয়া রাখিবে। এই গণিকাবৃত্তির অনুকরণ যে ভদ্র মহিলার পক্ষে আত্মহত্যারই সামিল ইহা সে বুঝিয়াও বুঝে নাই। শেষ পর্যন্ত স্বামীর ভালোবাসা অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু মদের নেশা তাহার জীবন-সহচর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার সমস্ত আচরণে এক করুণ উদ্‌ভ্রান্তি, এক বিষণ্ণ ভাগ্যবশ্যতা, স্প্রিং-ভাঙ্গা ঘড়ির মত এক অনিয়মিত ছন্দস্পন্দ, হঠাৎ উত্তেজনা ও নিদারুণ অবসাদের মধ্যে এক ইচ্ছাশক্তিহীন আবর্তন ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভূতনাথের সহিত তাহার সম্বন্ধ এক অদ্ভুত অনির্দেশ্যতায় আচ্ছন্ন হইয়াছে, ইহার মধ্যে অসহায়ের আশ্রয়-নির্ভরতা, সহানুভূতি-কাঙ্গাল মনের কৃতজ্ঞতা, বঞ্চিত চিত্তের আত্মবিস্মৃতি, চাকরের প্রতি মুনিবের হুকুম-চালানো জোরের সঙ্গে এক ফোঁটা প্রেমের মাধুর্য-নির্যাস মিশিয়া এক বহু-বিমিশ্র মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। অপরাহ্নের নানাবর্ণের মেঘ-যবনিকার অন্তরালে অস্তোন্মুখ সূর্যের শীর্ণক্লিষ্ট আভাসের মতই এই সম্বন্ধটি প্রেম-দীপ্তির একটু করুণ, আসন্ন নির্বাণের ছায়াচ্ছন্ন, স্তিমিত প্রকাশরূপে প্রতীয়মান হয়। শুক্তির অভ্যন্তরে ব্যাধিক্ষতের নিদর্শনরূপ মুক্তার ন্যায়, ছোটবৌ এই ক্ষয়জীর্ণ, মনোবিকারগ্রস্ত অভিজাতবংশের মর্মলালিত রুদ্ধশোণিত-সঞ্চয়ের প্রতিরূপ একটি অপরূপ-রক্তিম, অথচ বেদনা-পাণ্ডুর লাবণ্যবিন্দু।

কলিকাতার বুনিয়াদী-বংশের এই বিরাট প্রাসাদ, শোষণক্রিয়া ও ঐশ্বর্য-মদিরার এই উদ্ধত বুদ্‌বুদ্ অনেক অতীত স্মৃতির সমাধি-আশ্রয়রূপে আমাদের সামনে দাঁড়াইয়া আছে। ইহার যুগে যুগে কত কীর্তি-অখ্যাতির কাহিনী, কত বিলাস-বিভ্রম-উৎসব-সমারোহের স্মৃতি, ইহার মহলে মহলে কত দীর্ঘশ্বাস ও অপ্রকাশিত হৃদয়-বেদনার চাপা রোদন, ইহার অন্ধকার কক্ষে কক্ষে কত ভৌতিক রোমাঞ্চের শিহরণ, ইহার প্রাণলীলার বিচিত্র কলধ্বনি ও মৃত্যুর বজ্র-দীর্ণ

আকস্মিকতা—সমস্তই এই উপন্যাসের আকাশ-বাতাসে অলক্ষ্য সত্তায় সঞ্চরণশীল। ইহার অগণিত কর্মচারী, মোসাহেব, আশ্রিত-অনুগৃহীত, খানসামা-দারোয়ান-কোঁচোয়ান আপন আপন কক্ষপথে অপরিবর্তনীয় জড়পদার্থের ন্যায় পুরুষানুক্রমে ঘুরিতেছে-ফিরিতেছে—ইহাদের যৌথ জীবনের মৃদু কলরব প্রাসাদের খোঁপে খোঁপে অলিন্দে অলিন্দে নির্বিঘ্নে আশ্রিত পারাবত-গুঞ্জনের সহিত মিশিয়া এক স্বপ্নাবেশময়, ঝিমাইয়া-পড়া, পৃথিবীর অন্তর্লীন ছন্দসঙ্গীতের ন্যায় ঐকতান-ঝংকার তুলিতেছে। এই স্মৃতিময়, যুগচিহ্নাঙ্কিত সত্তায় বিরাজিত অট্টালিকাই উপন্যাসের সত্যিকার নায়ক—নগর-উন্নয়নের রথচক্রে ইহা যখন ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, তখন ব্যক্তি-বিশেষের মৃত্যু অপেক্ষা ইহার বিলুপ্তি আরও মর্মান্তিকভাবে করুণ—একটা সমগ্র জীবনযাত্রা ও জীবনদর্শনের তিরোভাব আমাদের মনে এক অব্যক্ত শূন্যতাবোধ ও বেদনার উদ্রেক করে।

'মহাস্থবির জাতক'—ঠিক উপন্যাসধর্মী নহে, লেখকের আত্মজীবনীর মধ্য দিয়া পূর্বস্মৃতি-পর্যালোচনা। ইহার প্রথম আবির্ভাবের সময় ইহা যে প্রত্যাশার চমক জাগাইয়াছিল, পরবর্তী খণ্ডসমূহে ঠিক সেই প্রত্যাশা রক্ষিত হয় নাই। লেখকের জীবনে ঘটনাবৈচিত্র্য কৌতূহলের উদ্রেক করে, তাঁহার সরস বর্ণনাভঙ্গী ও মৃদু রসিকতা বিশেষভাবে উপভোগ্য, তবে জীবনদর্শনের কোন অখণ্ড গভীরতা তাঁহার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইতে উৎসারিত হয় কি না সন্দেহ। প্রথম খণ্ডে বোধ হয় লেখকের শৈশব স্মৃতির স্পর্শ, শিশু-চিত্তের নিগূঢ় ভাব-কল্পনা উপন্যাসটির বিশেষ আকর্ষণীয়তার মূলে ছিল। কিন্তু পরবর্তী খণ্ডগুলিতে লেখক যখন স্বপ্নাবিষ্ট শৈশব-জীবন ছাড়াইয়া কৈশোর ও যৌবনের, কোন গভীর মনস্তাত্ত্বিক মূলের সহিত অসম্পৃক্ত, খেয়ালী ঘূর্ণিবায়ুতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঘরছাড়া জীবনের বর্ণনা করিয়াছেন, তখন প্রথম খণ্ডের সুরবৈশিষ্ট্যটি কাটিয়া গিয়াছে। উপন্যাসটি নিছক পথিক-জীবনের পথচলার কাহিনীতে পর্যবসিত হইযাছে ও লেখকের বিশিষ্ট সত্তাটি যেন দৃশ্য ও অনুভূতির দ্রুত পরিবর্তনের বিস্ময়-চমকের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাঁহাব পথের ধারে যে সমস্ত স্বল্প পরিচিত নর-নারী ক্ষণেকেব জন্য ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে, যে সমস্ত আকস্মিক ঘটনা ভাগ্যের মোড় ফিরাইয়াছে ও মনকে কৌতূহল-রসে আপ্লুত করিয়াছে তাহাদের মধ্যে লেখককে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সমস্ত অনুভূতির কেন্দ্রস্থলে অটুট আত্মমর্যাদায় আসীন, সকলের মধ্যে আত্ম-পরিণতির উপাদান-সংগ্রহে তৎপর একটি ব্যক্তিসত্তার সুস্পষ্ট পরিচয় মিলে না। এখানে যেন পথ বড হইয়া পথিক-চিত্তকে আড়াল করিয়াছে। 'মহাস্থবির জাতক'-এর ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের মধ্যে ইহার কাহিনীর ও লেখক-মনের আর কি নূতন রূপ উদ্ঘাটিত হইবে তাহা অবশ্য পূর্বানুমানের দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না; তবে ইহাতে যে যুগপরিচয়টি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার সাহিত্যিক উপভোগ্যতা অনস্বীকার্য।

আশাপূর্ণা দেবীর 'বলয়গ্রাস' উপন্যাসে যথেষ্ট শক্তিমত্তার নিদর্শন পাওয়া যায়। অতি আধুনিক যুগে শিক্ষা-দীক্ষার সমতা ও কর্ম-ও-ভাব-সাহচর্যের জন্য নারীর ও পুরুষের মধ্যে সুর ও অনুভূতির পার্থক্য আর সাহিত্যে শোনা যায় না। আমরা অগ্রগতির মধ্য দিয়া ক্রমশঃ এমন একটা স্থানে পৌছিতেছি যেখানে শ্রেণী-নির্বিশেষ সমাজের মত এক নারী-পুরুষ-সাধারণ সংস্কৃতি ও সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে। নারী এখন পুরুষের মত কথা কয়, চিন্তা করে, তাহার

অনুভূতির সৌকুমার্য ও হৃদয়াবেগের আতিশয্য মননের দ্বারা সংযত ও নিয়ন্ত্রিত, তাহার ভাবোচ্ছ্বাসের তীক্ষ্ণাগ্র ধার পারিপার্শ্বিকের চাপে ও পরিণত শিল্পবোধের প্রভাবে অনেকটা কুণ্ঠিত। সুতরাং আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসটির মধ্যে নারীর বিশিষ্ট সুর আবিষ্কার করা হয়ত কাল্পনিকতারই প্রশ্রয় দিবে। তথাপি টুনির ভাগ্যবিড়ম্বিত, অভিমান-বিকৃত মনের পিছনে শিশু-চরিত্রে যে অন্তর্দৃষ্টি, স্নেহবঞ্চিত শিশু-হৃদয়ের সমস্ত মানস বিপর্যয়ের সহিত যে গভীর পরিচয় ও সমবেদনার স্পর্শ মিলে তাহা নারীরই বিশেষ অনুভূতিরূপে গ্রহণ করা অযৌক্তিক হইবে না। টুনির অন্তরলোকের মধ্যে যে অস্পষ্ট আলোড়ন, অন্ধকারের মধ্যে পথ খোঁজার যে তীব্র আকূতি, যে বাঁধ-ভাঙ্গা উচ্ছ্বাস, যে সন্ত্রস্ত আত্মসংকোচন, যে উদ্ধত, আঘাত-প্রবণ বিদ্রোহ এক তুমুল ঝড় তুলিয়াছে তাহা লেখিকা প্রশংসনীয় ভাবাবেগ, কলাসংযম ও তাৎপর্য-ব্যঞ্জনার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতা, নানা পরিবারে আশ্রয়-গ্রহণ, মানব সমাজের দংষ্ট্রানখর-ভীষণ শ্বাপদবৃত্তির সহিত সংস্পর্শ তাহার মৌলিক বিকারকে আরও তীব্র ও অনমনীয় করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত, তাহার চিত্তে অভিমানই জয়ী হইয়া মাতার ব্যগ্র-প্রসারিত বাহুবন্ধনকে সবলে ঠেলিয়া দিয়াছে। মণির রোগতপ্ত মনের নিরুদ্ধ মাতৃস্নেহ তাহার অশান্ত অনুসন্ধিৎসা ও ভারকেন্দ্রচ্যুত জীবনে এক চির-অতৃপ্ত ক্ষুধার হাহাকার চমৎকারভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ছোটখাট চরিত্রের মধ্যে তরুবালার নীরব আনুগত্যের অকস্মাৎ স্পর্ধিত বিদ্রোহে পরিবর্তন, বীণাপাণির স্থূল ও দাম্ভিক আত্মপ্রসাদ ও হিংস্র আক্রমণ-কৌশল, শরৎশশীর বৌ ও লীলার প্রতি স্নেহে ও সন্দেহে জড়িত অনিশ্চিত মনোভাব, বিভাদির মনে লীলার প্রতি অকস্মাৎ ঈর্ষ্যার উচ্ছ্বাস—এ সমস্তই লেখিকার মনস্তত্ত্ব-জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। উপন্যাসটি নাটকীয় ইঙ্গিত ও সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ, তবে সাধারণ পারিবারিক জীবনে অতি-নাটকীয়ত্বের আরোপ খানিকটা কৃত্রিম অবাস্তবতার সন্দেহমুক্ত হয় না। টুনির সহিত মণির আকার-সাদৃশ্য যদি এতই সুস্পষ্ট যে, উহা একদিনকার আগন্তুকের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না, তবে মহালক্ষ্মীর বহু-জনাকীর্ণ সংসারে উহা অলক্ষিত ছিল কেমন করিয়া? টুনির জন্মরহস্য অন্ততঃ যে প্রবীণ ম্যানেজারের অজ্ঞাত ছিল না তাহা মহালক্ষ্মীর সহিত তাহার সংলাপেই ধরা পড়ে। কিন্তু এত আশ্রিত-প্রতিপাল্য-পরিচারক-পরিচারিকা-সমন্বিত পরিবারে যে আর কাহারও মনে এই সন্দেহ উদিত হয় নাই, সকলেই যে নির্বিচারে টুনিকে তরুবালার মেয়ে বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, মণির দীর্ঘকালব্যাপী শয্যাশায়িত্ব ও অসুখ লইয়া যে কাহারও মনে কোন কৌতূহল জাগে নাই ইহা অনেকটা অবিশ্বাস্য বলিয়াই মনে হয়। এই ইচ্ছাকৃত অন্ধতার যবনিকা খাটাইয়া লেখিকা উহারই আড়ালে এক রোমাঞ্চকর, গোপন রহস্য অনুসরণ ও উদ্‌ঘাটনের ব্যস্ততায় মুখর রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করিয়াছেন।

সতীনাথ ভাদুড়ির 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে অভিনব বিষয়-নির্বাচনের নিদর্শন। বাঙ্গালী বাঙ্গালার বাহিরে যে-সমস্ত অঞ্চলে স্থায়িভাবে বসবাস করে তাহাদের সাধারণ অধিবাসীর জীবনধারার সহিত সে মিশিতে পারে না তাহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ প্রায়ই শুনা যায়। সাহিত্যও যে এই সমস্ত প্রদেশের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সামাজিক বৈশিষ্ট্য, জীবনছন্দের নূতন গতি হইতে বিশেষ কোন প্রেরণা পায় নাই এ অভিযোগও

অন্ততঃ আংশিকভাবে সত্য। বনফুল ও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কোন কোন রচনায় বিহার-প্রদেশের জীবনচিত্র সাহিত্যের বিষয়রূপে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এই অভিযোগের সর্বাপেক্ষা সারবান খণ্ডন পাওয়া যায় 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এ। এই উপন্যাসের নায়ক অবশ্য ঢোঁড়াই; কিন্তু ইহার প্রধান অবলম্বন উত্তর বিহারের সুদূর পল্লী-অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীর জীবনযাত্রা। লেখক ইহাদের অন্ধ সংস্কার-বিশ্বাস, বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত সমাজ-রীতি, ইহাদের পারস্পরিক মিলন-বিরোধের সূত্র, এমন কি ইহাদের মুখের ভাষা, সর্বদা-ব্যবহৃত প্রবাদ-বাক্যসমূহ ও জীবনের বিশিষ্ট উপলক্ষ্যে সদা-উদ্ধৃত তুলসীদাসী রামায়ণের শ্লোকমালা পর্যন্ত এই উপন্যাসে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহার সমস্ত আকাশ-বাতাস যেন অধিবাসীদের মানস সংকীর্ণতার মাপে সংকুচিত হইয়াছে; উহাদের মাথার উপর খুপড়ির চালের ন্যায় মনের উপর খুব নীচু বাতাবরণ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। জীবনচিত্রাঙ্কনের এই অন্তঃসঙ্গতি, অভ্রান্ত মাত্রাবোধ, অজ্ঞ, সভ্যতার আলোকবর্জিত মানসলোকে এরূপ নিখুঁত অনুপ্রবেশ এই উপন্যাসটির বিশেষ কৃতিত্ব।

(৭)

বাংলা উপন্যাসের ধারা ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্যের শাখাপথ বাহিয়া অগ্রসর হইতেছে। আজ ইহার অন্তঃপ্রেরণা কেবল ইহার নিজের দেশের প্রত্যক্ষ সমাজ-বিবর্তনের ভিতর সীমাবদ্ধ নহে। আজ সমগ্র বিশ্বের মধ্যে যেখানে নূতন জীবন-পরীক্ষা চলিতেছে, যেখানে বিজ্ঞান ও দর্শন নূতন জীবনভাষ্য রচনার চেষ্টা করিতেছে, যেখানে পুরাতন অভিজ্ঞতার সীমা অতিক্রান্ত হইতেছে, তাহারই সম্মিলিত প্রভাব এই গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমির উপর আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। অধুনা নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা অভাবনীয়রূপে বাড়িয়া গিয়াছে। ইহারই অনিবার্য ফলস্বরূপ উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতা আজ আর কোথাও সমাপ্তি-রেখা টানিবার ভরসা পাইতেছেন না। উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বিচারের মানদণ্ড দিনে দিনে রূপ বদলাইতেছে—সুবলয়িত সুষমার পরিবর্তে এখন জীবন অসমশীর্ষ অগ্নিশিখার ন্যায় সমস্ত রেখাবন্ধনী অস্বীকার করিয়া ছোট বড় নানা আকারের জিহ্বায় উহার প্রতিবেশকে লেহন করিতেছে। এখন প্রতিবেশ আত্মার আরামের বাসগৃহ নহে, শ্বাসরোধী কারাগার; উহা মানুষের শক্তির উৎস নহে, শোষণের যন্ত্র। মানুষের অন্তর-লোকের জটিল, পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তিসমূহের একক মূল কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা উহার সমগ্র মানচিত্রকে বদলাইয়া দিতেছে। উপন্যাস-সাহিত্য আজ এই রূপান্তরের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া অন্তরে ও বাহিরে সংশয়াবিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে—এই সংশয়-ভীরু মনোভাব লইয়াই উপন্যাসের ইতিহাস-রচয়িতা এই দীর্ঘ পরিক্রমায় ছেদ-রেখা টানিয়া দিলেন।

সমাপ্ত

নির্দেশিকা